ঐচ্ছিক জীববিজ্ঞান

ড: রবীন্দ্রনারায়ণ পাল



সম্পূর্ণ পরিমার্জিত একাদশ সংস্করণের ভূমিকা

বিনীতভাবে জানাই আমাদের **'ঐচ্ছিক জীববিজ্ঞান'**-ই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ প্রবর্তিত পাঠ্যক্রম (1974) অনুযায়ী রচিত সর্বপ্রথম পুস্তক। বস্তুতঃ 1975 খ্রীষ্টাব্দে এই বইটি প্রকাশিত হবার পর জীববিজ্ঞানকে মাধ্যমিক স্তরে অন্যতম ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পঠন-পাঠনের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। বিগত বৎসরগুলিতে প্রায় প্রতিটি শিক্ষাবর্ষে শুভানুধ্যায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকার পরামর্শমত বইটিকে নানাভাবে পরিমার্জিত ক'রে ছাত্রোপযোগী করার চেষ্টা করে এসেছি। কিন্তু পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের সূচনায় প্রশ্নপত্রের ধারা যেমনটি ছিল, আজ এতকাল পরে তার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে।

বস্তুত এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাঠ্যবিষয়ের পুনর্মূল্যায়ন এবং বিষয়বস্তুর সংযোজন-পরিমার্জন আবশ্যিক মনে হওয়ায় বর্তমান সংস্করণে বইটি আদ্যন্ত পুনর্লিখিত হ'ল। বিষয়বস্তুর শুধু প্রশ্নোত্তরমুখী বিন্যাসই নয়, প্রচুর নূতন কিন্তু প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং ঔৎসুক্য নিবারণের অজস্র উপকরণও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হ'ল। অনেকের দাবী অনুযায়ী বিশেষ কয়েকটি অধ্যায়ের পুনর্বিন্যাস এবং পুরাতন চিত্রের পরিবর্তে সন্নিবিষ্ট অসংখ্য সুচিহ্নিত নূতন চিত্র-সম্ভার আঙ্গিক শ্রীবৃদ্ধির সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীর কাছে বইটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় ক'রে তুলবে বলে বিশ্বাস। এছাড়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুযায়ী পৃথক পৃথক সংজ্ঞাই শুধু নয়, সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও জীবনধারার অন্তর্গত প্রতিটি প্রাণীর পারস্পরিক বহিরাকৃতিগত পার্থক্য সংযোজিত হ'ল—যা এই ধরনের বইয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন এবং অভিনব। পৃথক পৃথক উদাহরণ না দিয়ে সুস্পষ্টভাবে দাবী করা যায়, বর্তমান সংস্করণে বইটির সর্বাঙ্গে অজস্র অভিনবত্বের ছাপ সুস্পষ্ট—যা প্রতিটি পাঠক-পাঠিকাকে বইটি সম্বন্ধে কৌতূহলী ও মনোযোগী ক'রে তুলবে।

প্রসঙ্গতঃ যে কথাটি বারবার মনে আসে সেটি হ'ল, এই পুস্তকের সবটুকু অভিনবত্বের নির্যাস শুষে নিয়ে নূতন মোড়কে পরিবেশন ক'রে কৃতিত্বের দাবী করার মতো গুণীজনের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তবু এইটুকু সান্ত্বনা, অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী—যাঁরা বইটির উন্নতিকল্পে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বইটিকে সম্পৃক্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করিনি। এইসব শুভানুধ্যায়ীর গঠনমূলক সমালোচনার মর্যাদার আলোকে বইটি কতদূর উদ্ভাসিত হ'ল সে বিচারের ভার রইল তাঁদের উপর। আগামীতেও আদর্শ পাঠ্য-পুস্তকের মান বজায় রাখতে জীববিজ্ঞানের প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে যে কোন সমালোচনা কৃতজ্ঞচিত্তে গৃহীত হবে।

জানুয়ারী, 1989
কলিকাতা

বিনীত—
রবীন্দ্রনারায়ণ পাল

বইটির পরিমার্জনায় যাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য

শ্রীঅজয় চ্যাটার্জী (পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ), শ্রীমতী নিভা পাত্র (তুরঙ্গ অঞ্চল শিক্ষানিকেতন), শ্রীআশীষ দাশ (বিজয়গড় বিদ্যাপীঠ), শ্রীমানস কৃষ্ণ পাহাড়ী (নাজিরবাজার হাইস্কুল), শ্রীযোগেশচন্দ্র মণ্ডল (কুমীরমারী হাইস্কুল), শ্রীযামিনীভূষণ দাস (বারুইপাড়া রাখাল বিদ্যাপীঠ), জনাব রমজান আলি শেখ (বড় আন্দুলিয়া হাইস্কুল), শ্রীঅমিতকুমার পাল (রামপুর বিবেকানন্দ মিশন বিদ্যামন্দির), জনাব আবদুস সত্তার (নারায়ণপুর হাইস্কুল), শ্রীঅমিয় কান্তি ব্যানার্জী (আলবাধা হাইস্কুল), শ্রীভূপতিপ্রসাদ মণ্ডল (বেলসিংহ শিক্ষায়তন), শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভৌমিক (চানসেরপুর হাইস্কুল), শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ভুঁইয়া (কল্যাণচক জি. এম. ইন্সটিটিউশান), শ্রীতারাশঙ্কর পাল (চান্দ্রা কল্যাণ সংঘ হরিজন হাইস্কুল), শ্রীরমাপদ বেরা (কেদারপুর রামনন্দ হাইস্কুল), শ্রীশ্রীপতিচন্দ্র মহাপাত্র (খাগদা পি. হাইস্কুল), শ্রীঅনিলকুমার নাথ (বিদ্যানগর বিদ্যামন্দির), শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল (হোদল নারায়ণপুর হাইস্কুল), শ্রী টি. কে. মণ্ডল (পাঠান-খালি আদর্শ বিদ্যাপীঠ), শ্রীশ্রীপতিচরণ বেরা (আর. এস. বাণী বিদ্যাপীঠ), শ্রীঅর্ধেন্দু ব্যানার্জী (রঙ্গবেলিয়া হাইস্কুল), শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাশ (রাজারমঠ আর. কে. এ. এইচ. এস. স্কুল), শ্রীনিত্যরঞ্জন ওঝা (ধনেশ্বরপুর জি. সি. এস. সদন), শ্রীনারায়ণ দাস মন্ডল (বিষ্ণুপুর শ্রী আর. কে. বিদ্যায়তন), শ্রীবাসুদেব খাঁ (কৃষ্ণগঞ্জ অনিল স্মৃতি হাইস্কুল), শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত (কুরুন্নাহার হাইস্কুল), শ্রীরামপ্রণব পাত্র (ছোটনাকদনা আদিবাসী হাইস্কুল), শ্রীপরেশচন্দ্র সামন্ত (তাল-পুর পাঠশালা), শ্রীদিলীপ দাশ (কাশেমনগর এন. এ. জে. হাইস্কুল), শ্রীসুনীল-কুমার সামন্ত (গোপীনাথপুর দেবায়তন বিদ্যাপীঠ), শ্রীতুষারকান্তি বেরা (চংগ্রাচক জগদীশ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ), শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ (ব্যান্ডেল মহাকালি হাইস্কুল), শ্রীদীপঙ্কর বারিক (রামজীবনপুর বি. এল. ইন্সটিটিউশান), শ্রীনন্দ-দুলাল শেঠ (কৃষ্ণবাটি হাইস্কুল), শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ), শ্রীসমীরকুমার পাল (মধুবাটী সুরোবালা বিদ্যামন্দির)।

● প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ●

নতুন দশ বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় জীববিজ্ঞানের গুরুত্ব আরোপ অত্যন্ত সময়োপযোগী। প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে চারপাশের চেনা-জানা পরিবেশে তার নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে মাধ্যমিক শিক্ষার সুরু থেকেই সচেতন হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই এই নূতন পাঠ্যক্রম।

পৃথিবীতে জীবনের স্থায়িত্বলাভের মূল কৌশল এবং জীবজগতের কেন্দ্রমণি মানুষের শারীরবৃত্তীয় নানাবিধ কার্যকলাপ জীববিজ্ঞানের প্রধান আলোচনার বিষয়। কিন্তু প্রচলিত জীববিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় উদ্ভিদ ও প্রাণী। সেই দিক থেকে জীবন-বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের অবশ্যই কিছু প্রভেদ আছে। তাই জীবন-বিজ্ঞানের পরিপূরক হিসাবে জীববিজ্ঞানের পঠন-পাঠন অপরিহার্য। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এই বিশেষ দিকটির কথা চিন্তা করেই উৎসাহী ও উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য ঐচ্ছিক জীববিজ্ঞান পাঠের সুযোগ রেখেছেন।

অধিকাংশ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান পঠন-পাঠনের বন্দোবস্ত ছিল। সুসজ্জিত পরীক্ষাগার থাকায়, সেখানে জীবন-বিজ্ঞান চর্চার অনুকূল পরিবেশ ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে। বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিশেষ করে আমার ছাত্র-ছাত্রীরা, যাঁরা ঐসব বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন, তাঁদের একান্ত অনুরোধে নব প্রবর্তিত পাঠ্যক্রম অনুসারে ঐচ্ছিক জীববিজ্ঞান লেখার প্রেরণা পেয়েছি।

অতি অল্প সময়ে অসংখ্য ছবির মাধ্যমে বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। ডঃ শ্রীমতী দেবী কুণ্ডু, শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ ও ডঃ শ্রীকল্যাণ কুমার কুণ্ডু, তাঁদের বইয়ের বহু ছবি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

সেপ্টেম্বর, 1975
কলিকাতা

রবীন্দ্রনারায়ণ পাল

• BIOLOGY (ADDITIONAL) •

॥ Syllabus ॥

(The Board will hold no Practical Examination in Biology)

Course Content	*Demonstration*	*Practical*
I. *General Principles of Biology.*		
(1) Outline classification of plants and animals, with common examples.	(1) plant and animal kingdoms by charts, models and *actual specimens.*	(1) Collection and dry presevation of parts of a plant.
(2) Characteristics of living and non-living objects. Differences between plants and animals.	(2) Methods of collection and preservation of specimens.	(2) Collection and preservation of life stages of tadpoles or mosquito or butterfly.
(3) Interdependence of plants and animals.	(3) Carbon and Nitrogen cycles by charts.	(3) Drawing of the parts of a microscope and of parts of a cell.
(4) Structure of a typical plant cell and animal cell and their functions. Outlines of cell division (amitosis and mitosis) treated in elementary manner (details excluded). Elementary knowledge of cell differentiation into tissues and organs.	(4) Parts of a microscope, structure of cell. Movement of protoplasm. Different types of tissues in plants and animals, by charts and explanation about their functions. Blood film of a fish or a toad.	
(5) General notion about evolution, adaptation and heredity. (No question should be set from this.)		

Course Content	*Demonstration*	*Practical*
II. *General features and modes of living of the following Organisms.* (Histology & details of internal organs excluded)		
A. Plants: 1. Mustard and Paddy, 2. Fern, 3. moss, 4. Mucor, 5. Spirogyra.	Charts, models and *actual specimens.*	Drawing of the specimens mentioned in the Course Content.
B. Animals: 1. The earthworm, 2. The fish (including gills), 3. The toad, 4. The lizard, 5. The guineapig.	Charts, models and *actual specimens.* Accessory respiratory structures of Koi, Singhi and Magur. Drowning experiment.	Drawing of the external features of the specimens mentioned in the Course Content.
III. *Study of type specimens.* *A. Plants* Dhatura (Histology excluded).		
(1) *Root:* Parts of the root and their functions.	Charts, models and *actual specimens.* Different types of modified roots by charts and actual specimens. Internal structure of a root by chart. Experiments on (a) Osmosis and (b) Root pressure.	
(2) *Stem:* Parts of the stem and heir functions.	Different types of modified stem, by charts and specimens.	

Course Content	*Demonstration*	*Practical*
	Internal structures of a stem by chart. Phototropism and geotropism by charts and experiments. Ascent of dyes to show conduction.	
(3) *Leaf*: Parts of the leaf and their functions.	Different types of leaves, by charts and actual specimens. Internal structure of a dorsiventral leaf by chart. Experiments on (a) Transpiration. (b) Photosynthesis. (c) Respiration.	Collection and dry preservation.
(4) *Flower*: Parts of flower and the functions. Pollination and fertilization.	Common flowers by charts, models and specimens.	Collection and dry preservation.
(5) *Fruit*:	Different types of fruits by charts and specimens.	
(6) *Seed*: Structure and Germination of seeds of, (a) Gram, (b) Castor, (c) Maize. Conditions necessary for germination.	Different types of germination. Experiments showing conditions necessary for germination.	
(7) *Dispersal of fruits and seeds*:	Various examples of dispersal, by charts and specimens.	Collection of specimens.

Course Content	*Demonstration*	*Practical*
B. Animals : (Histology excluded).	External features of a frog.	Dissection and drawing of the alimentary system of toad.
Gross anatomy of a toad and general functions of the organs.	Dissected specimens showing different organ systems. Circulation of blood. Dissected specimen of Guineapig showing different organ systems. Gross anatomy and general viscera of Earthworm.	
V. Organisms in relation to human life. *A. Plants* : (a) Cotton, (b) Jute, (c) Paddy, (d) Coconut. *B. Animals* : (a) Earthworm, (b) Housefly, (c) Mosquito, (d) Honey bee.		

সূচীপত্র

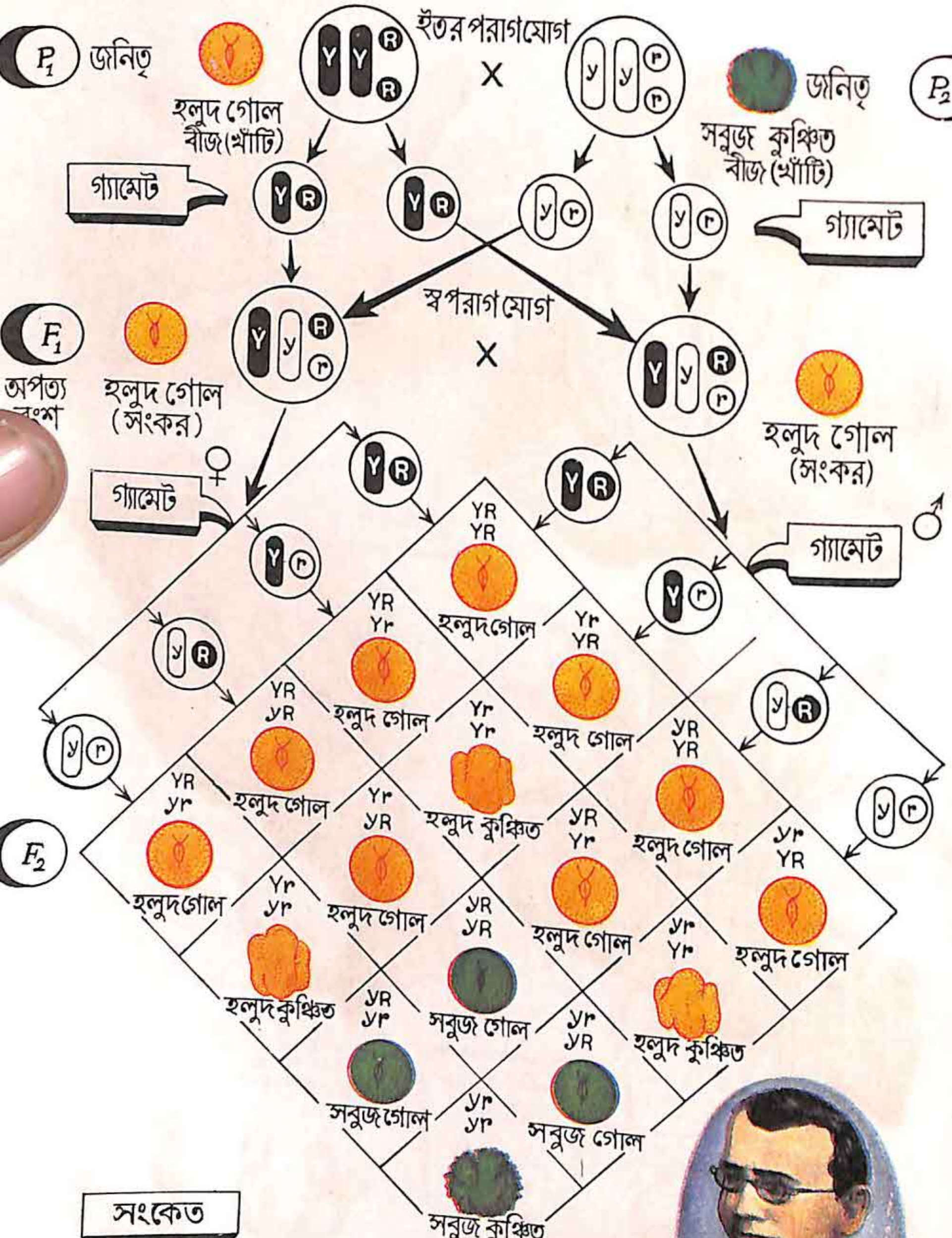
[প্রথমার্ধ]

বিষয় পৃষ্ঠা

[দ্বিতীয়ার্ধ]

প্রথমার্ধ


ডায়োনিয়া
পতঙ্গভুক
স্যারাসিনিয়া
অর্কিড
র‍্যাফ্লেসিয়া
পরাশ্রয়ী
কয়েকপ্রকার স্বভোজী ও পরভোজী উদ্ভিদ
পরজীবী
অ্যাগারিকস
মৃতজীবী
ঈস্ট



সংকেত

Y = হলুদ (প্রকট)
R = গোল (প্রকট)
y = সবুজ (প্রচ্ছন্ন)
r = কুঞ্চিত (প্রচ্ছন্ন)

হলুদ গোল	9
হলুদ কুঞ্চিত	3
সবুজ গোল	3
সবুজ কুঞ্চিত	1

মেণ্ডেলের দ্বিসংকর পরনিষেকের পরীক্ষা



গ্রেগর যোহান মেণ্ডেল
(1822-1884)

অবতরণিকা 1
[Introduction]

1.1. বিজ্ঞান [*Science*] :

বিজ্ঞান কথার অর্থ বিশেষভাবে জ্ঞান। কোন বিষয় সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে, প্রমাণের কষ্টিপাথরে যাচাই করার পর, তা থেকে পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণ করাকে **বিজ্ঞান** বলে। বিজ্ঞানের শাখা প্রধানতঃ দুটি—**জড়-বিজ্ঞান** (Physical Science) ও **জীববিজ্ঞান** (Biology)।

1.2. জীববিজ্ঞান বা বায়োলজি [*Biology*] :

জীব প্রাণচঞ্চল। জীবদেহে প্রাণের লক্ষণ পরিস্ফুট। অগণিত পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ এবং অসংখ্য গাছ-পালা—প্রত্যেকেরই প্রাণ আছে।

● **প্রাণের সংজ্ঞা** (Definition of life) ঃ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনোন্মুখ পরিবেশে মানিয়ে নিতে ইচ্ছুক জটিল সুসংবদ্ধ প্রোটোপ্লাজম বা জীবপঙ্কের সুনির্দিষ্ট শক্তির বহিঃপ্রকাশই জীবন।

প্রাণের অধিকারী বস্তুমাত্রই জীব। **জীব সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভাণ্ডারই জীববিজ্ঞান।** জীববিজ্ঞান বা **বায়োলজি** কথাটি প্রাচীন দুটি গ্রীক শব্দ *bios* ও *logos* (*bios* = জীবন + *logos* = আলোচনা বা জ্ঞান) থেকে এসেছে। **লামার্ক** (Lamarck) ও **ট্রাভিরেনাস** (Traviranus) নামক দুজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পৃথক পৃথকভাবে শব্দটি উদ্ভাবন করেন। 1801 খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিজ্ঞানী-মহলে বায়োলজি কথাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

● **জীববিজ্ঞানের সংজ্ঞা** (Definition of Biology) ঃ বিজ্ঞানের **যে** শাখায় জীবজগতের অন্তর্গত জীবাণু থেকে মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকের বাঁচার প্রয়াস, শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপের মূল প্রকৃতি, পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সম্পর্ক, স্বাভাবিক বিকাশ, স্থায়িত্ব—এমনকি বিবর্তনের মূল সূত্র, অর্থাৎ জীবন-সংক্রান্ত সকল দিকের আলোচনা করা হয় তাকে **জীব-বিজ্ঞান** বলে।

1.3. জীববিজ্ঞানের প্রধান শাখাসমূহ [*Major branches of Biology*] :

জীববিজ্ঞান প্রধান দুটি শাখায় বিভক্ত। জীববিজ্ঞানের যে শাখার আলোচ্য বিষয় উদ্ভিদ, তাকে বলে **উদ্ভিদবিদ্যা** বা **বোটানি** (Botany)।

বোটানি কথাটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ **বোটেন** (*botane* = উদ্ভিদ বা হার্ব) থেকে। জীববিজ্ঞানের অপর শাখাটির আলোচ্য বিষয় প্রাণী, সেটিকে বলে **প্রাণিবিদ্যা** বা **জুওলজি** (Zoology)। জুওলজি কথাটির উৎপত্তি হয়েছে, *zoon* = প্রাণী ; *logos* = আলোচনা বা জ্ঞান থেকে।

1.4. জীবের বৈশিষ্ট্য [*Characteristics of living objects*] :

(1) অধিকাংশ জীব **চলাফেরা করতে পারে**।

(2) জীবের নির্দিষ্ট **আকার** ও **আয়তন** আছে।

(3) উত্তেজিত হলে **জীবদেহে প্রতিক্রিয়া হয়** এবং এই প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশই **সাড়া** (Response)।

(4) পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতাকে অভিযোজন বলে। জীবের **অভিযোজন ক্ষমতা আছে**।

(5) জীবদেহে **'প্রাণের ভৌত ভিত্তি'** (physical basis of life) বা **প্রোটোপ্লাজম** আছে।

(6) প্রোটোপ্লাজমের বৃদ্ধির ফলে **জীবদেহের বৃদ্ধি ঘটে**।

(7) জীবদেহে **পুষ্টি, শ্বসন, ক্ষরণ, রেচন** প্রভৃতি বিবিধ বিপাকীয় **কাজ চলে**।

(8) পরিণত জীব জনন-ক্রিয়ার দ্বারা **বংশবিস্তার করে**।

(9) জীবের **জরা** ও **মৃত্যু** আছে।

(10) জীবের জীবনকাল বিভিন্ন পর্যায় বা **জীবন-চক্রের** (Life-cycle) মাধ্যমে অতিবাহিত হয়।

1.5. জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাসমূহ [*Different branches of Biology*] :

জীববিজ্ঞানের দিক দুটি—**শুদ্ধ** (Pure) ও **ফলিত** (Applied)। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জ্ঞানলাভ করলে কৃষি, মৎস্য-চাষ, পশম-উৎপাদন, বন-সম্প্রসারণ প্রভৃতি নানা দিক থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন হয়, তাকে বলে ফলিত জীববিজ্ঞান। ফলিত জীববিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করতে গেলে শুদ্ধ জীববিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা দরকার। শুদ্ধ জীববিজ্ঞান মোটামুটি নিম্নলিখিত শাখাগুলিতে বিভক্ত ঃ—

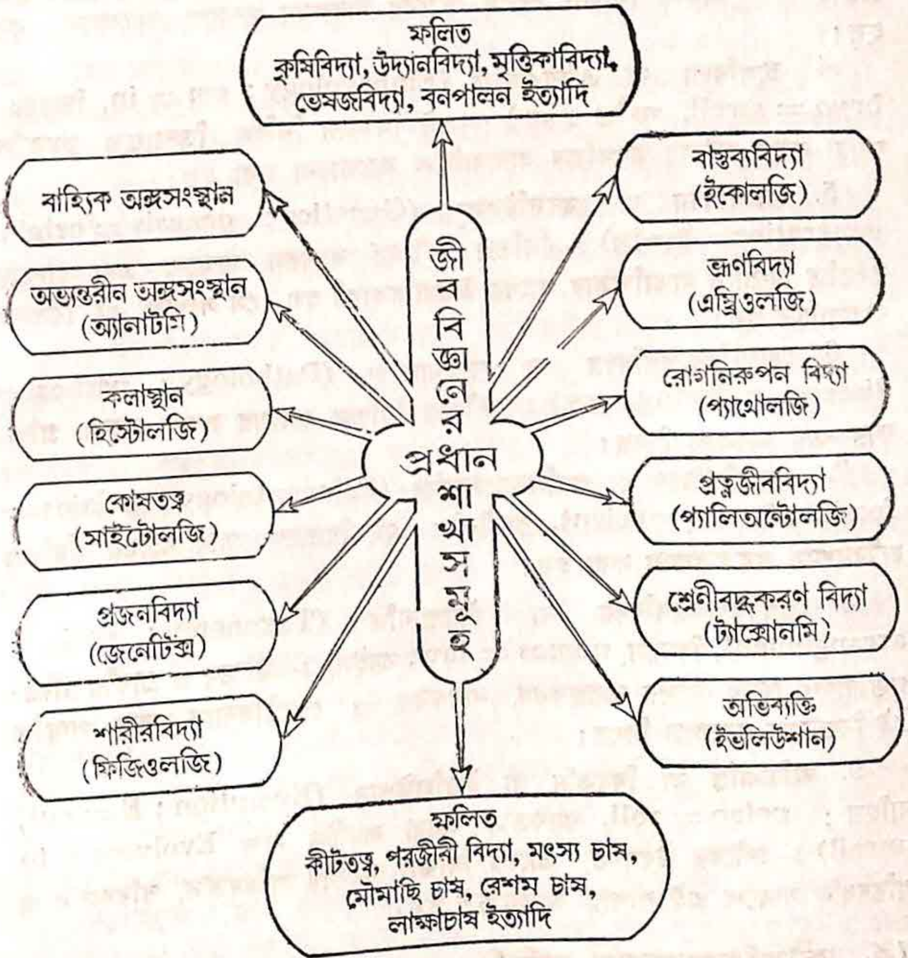
1. **অঙ্গসংস্থান** বা **মরফলজি** (Morphology ; *morphe* = form or shape, আকার ; *logos* = discourse, আলোচনা বা জ্ঞান) ঃ—এই শাখায় জীব-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকৃতি ও গঠন আলোচনা করা হয়।

এটির দুটি ভাগ, যেমন—

(i) **বাহ্যিক অঙ্গসংস্থান** বা **এক্সটারনাল মরফলজি** (External morphology) ঃ—এই বিভাগে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গ—যেমন,

ফ্ল, পাতা, কান্ড এবং চোখ, কান ইত্যাদির **বাহ্যিক গঠন** সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

(ii) **অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংস্থান বা ইণ্টারনাল মরফলজি বা অ্যানাটমী** (Internal morphology or Anatomy ; *ana* = asunder, উপরে ; *temnin* = cut, কাটা) ঃ—উদ্ভিদ ও প্রাণীর **অভ্যন্তরীণ গঠন** এই বিভাগের আলোচ্য বিষয়। এটি আবার দুভাগে বিভক্ত ঃ—



চিত্র 1.1—জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাসমূহ।

(a) **কলাস্থান** বা **হিস্টোলজি** (Histology ; *histos* = tissue, কলা ; *logos* = discourse, আলোচনা বা জ্ঞান) ঃ—এই বিভাগে **কলা** বা **কলা-তন্ত্রের** আকৃতি, গঠন ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচিত হয়।

(b) **কোষতত্ত্ব** বা **সাইটোলজি** (Cytology ; *kytos* = cell, কোষ) ঃ—এই বিভাগে **কোষের গঠন ও কার্যকলাপ** আলোচিত হয়।

2. **শারীরবিদ্যা** বা **ফিজিওলজি** (Physiology ; *physis* = nature of life, প্রাণের প্রকৃতি ; *logos* = discourse, আলোচনা বা জ্ঞান) ঃ—পুষ্টি, বৃদ্ধি, শ্বসন, জনন প্রভৃতি **জৈবিক কার্যকলাপ ও বিপাক পদ্ধতি** এই বিভাগে আলোচিত হয়।

3. **বাস্তব্যবিদ্যা** বা **ইকোলজি** (Ecology ; *Oikos* = house, বাড়ী) ঃ—এই বিভাগে জীবের **বাসস্থান, পরিবেশের সঙ্গে সম্বন্ধ, পরিবেশের প্রভাব ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জীবের অবস্থান** সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

4. **ভ্রূণবিদ্যা** বা **এম্ব্রিওলজি** (Embryology ; *em* = in, ভিতরে ; *bryo* = swell, স্ফীত হওয়া) ঃ—এই বিভাগে নিষিক্ত ডিম্বাণুর ক্রমবৃদ্ধি দ্বারা **নতুন জীবের উৎপত্তির ধারাবাহিক আলোচনা** করা হয়।

5. **প্রজননবিদ্যা** বা **জেনেটিকস্** (Genetics ; *genesis* = origin, generation, উৎপত্তি) ঃ—বিভিন্ন জীবের **বংশক্রম** সম্বন্ধে এবং সন্তান সন্ততি কিভাবে **মাতাপিতার গুণের উত্তরাধিকারী** হয়, সে সম্বন্ধে এই বিভাগে আলোচিত হয়।

6. **রোগ-নিরূপণবিদ্যা** বা **প্যাথোলজি** (Pathology ; *pathos* = disease, suffering, রোগ) ঃ—জীবের বিভিন্ন **রোগের লক্ষণ, কারণ, প্রতিকার**—এর আলোচ্য বিষয়।

7. **প্রত্নজীববিদ্যা** বা **প্যালিঅণ্টোলজি** (Palaeontology ; *palaios* = fossil, জীবাশ্ম ; ancient, প্রাচীন) ঃ—এই বিভাগে আদি যুগের বিভিন্ন **জীবাশ্মের পর্যালোচনা** করা হয়।

8. **শ্রেণীবন্ধকরণবিদ্যা** বা **ট্যাক্সোনমি** (Taxonomy ; *taxis* = arrangement, বিন্যাস, *nomos* = law, আইন) ঃ—উদ্ভিদ ও প্রাণীর চরিত্রগত লক্ষণ দেখে তাদের **সনাক্তকরণ, নামকরণ ও শ্রেণীবিন্যাস করার পদ্ধতি** এই বিভাগের আলোচ্য বিষয়।

9. **অভিব্যক্তি** বা **বিবর্তন** বা **ইভলিউশান** (Evolution ; *E* = out, বাহির ; *volvo* = roll, আবর্তন অথবা ল্যাটিন শব্দ Evolvere = to unroll) ঃ—**জীবের উৎপত্তি, তাদের বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন** সম্বন্ধে এই শাখায় আলোচিত হয়।

1.6. জীববিজ্ঞানের পরিধি, গুরুত্ব ও প্রয়োগ [*Scope, Importance and application of Biology*] :

জীববিজ্ঞানের ছাত্রের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, সে বিজ্ঞানের বিশেষ যে শাখা সম্বন্ধে আগ্রহী সেটি কতটা সমৃদ্ধ, তার পরিধি কতদূর বিস্তৃত, জীববিজ্ঞান পাঠের উপযোগিতা কি এবং কেনই বা বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে।

এইসব প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতে গিয়ে সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার যে, বিজ্ঞানের একটি সুপ্রাচীন শাখা হ'ল জীববিজ্ঞান। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঊষা-লগ্ন থেকে মানুষ জীববিজ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত।

মানুষ সর্বোন্নত জীব এবং তার প্রয়োজন বহুমুখী। তার মুখ্য প্রয়োজন খাদ্য, আশ্রয় ও পরিচ্ছদ ছাড়াও মানুষের প্রয়োজনের ক্ষেত্র সুদূর প্রসারী। মানুষ তার উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় বস্তুকে করায়ত্ত করতে সক্ষম হ'য়েছে। বিজ্ঞানের যে শাখায় এ কাজটি সম্ভব সেটি হ'ল জীববিজ্ঞান। বর্তমানে জীববিজ্ঞানের নানা কলাকৌশল প্রয়োগে নানাদিকে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হ'য়েছে। এককভাবে বিজ্ঞানের আর কোন শাখা এতটা সমাদর ও গুরুত্ব দাবী করতে পারেনি—ইদানিংকালে যা পেরেছে জীববিজ্ঞান। সভ্যতার বিকাশের ছায়াসঙ্গী সমস্যা। সমস্যা জর্জরিত মানুষের সামনে সমাধানসূত্রের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা তুলে ধরতে জীববিজ্ঞানের অবদান উল্লেখের দাবী রাখে। নীচের আলোচনা থেকে জীববিজ্ঞানের পরিধি, গুরুত্ব ও প্রয়োগ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়।

(1) **খাদ্যোৎপাদনে :** আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রধান ও প্রাথমিক সমস্যা জনবিস্ফোরণ। জনবিস্ফোরণের সঙ্গে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার সামঞ্জস্য রাখার একমাত্র উপায় পর্যাপ্ত খাদ্যোৎপাদন। জীববিজ্ঞানের একাধিক প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলে একদিকে **অধিক ফলনশীল বীজ, বীজ-শূন্য ফল, ফলের সংখ্যা ও আকার বৃদ্ধি** সহ উন্নতমানের খাদ্য উৎপাদন যেমন সম্ভব হ'য়েছে অন্যদিকে তেমনি অধিক পরিমাণে দুগ্ধ উৎপাদন, উন্নত জাতের গবাদি পশু ও পোলট্রি জীব সৃষ্টি সম্ভব হ'য়েছে।

অন্যান্য সহযোগী শাখার সহায়তায় কিভাবে এমনটি সম্ভব হ'য়েছে তা নিয়ে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

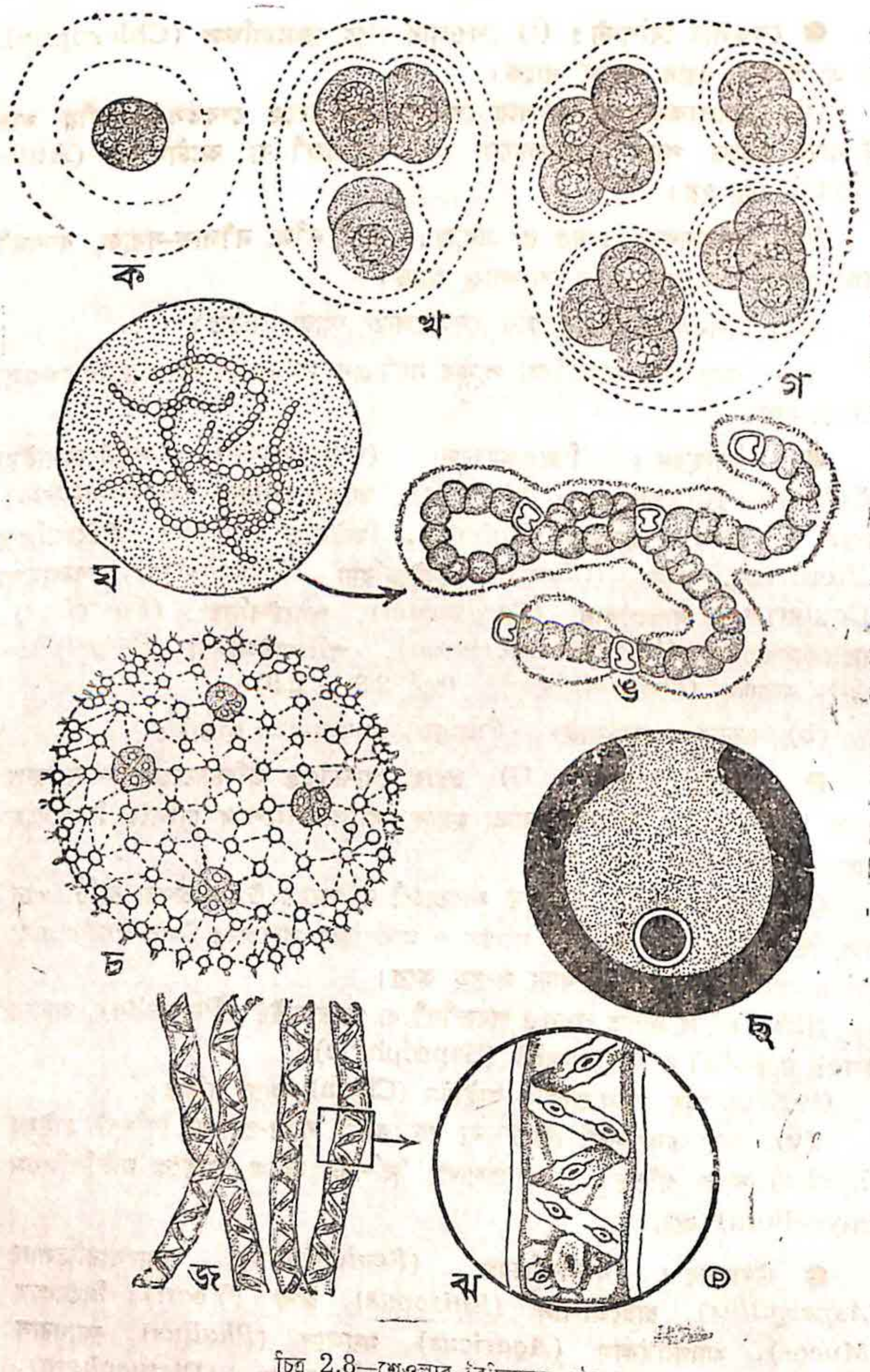
(a) **অধিক ফলনশীল বীজ :** প্রধানত **প্রজননবিদ্যার** (Genetics) সহায়তায় **সংকরায়ণ পদ্ধতি** (hybridization) অনুসরণে উন্নত ফলনশীল নানা জাতের ধান, ভুট্টা, গম, পাট, তুলা, সয়াবীন, ডালশস্য, সরিষা, মুলা, আলু, পেঁয়াজ, টমেটো ইত্যাদি উৎপাদন সম্ভব হ'য়েছে। 'জাপানী প্রথায়' চাষ মাধ্যমে ধানের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব হ'য়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে চুঁচড়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি ধান গবেষণা কেন্দ্রে অধিক ফলনশীল ও সম্ভাব্য রোগ গতিরোধক্ষম নতুন নতুন প্রজাতির ধান সৃষ্টির কাজে সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

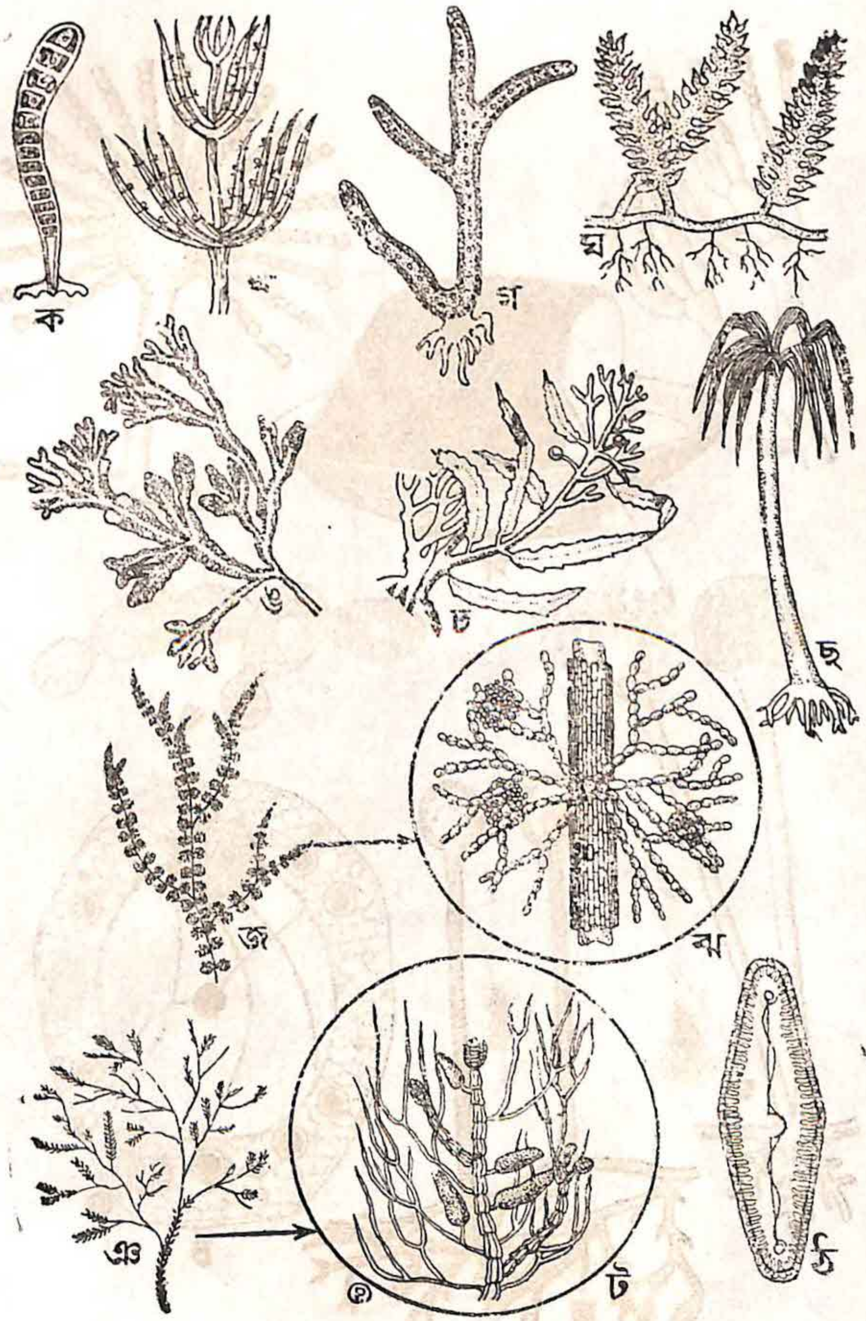
● কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উচ্চ ফলনশীল বীজ ●

* **ধান** (Paddy) :

● **আউস ধান :** **সাটিকা** (চুঁচড়া—12), **ধাইলান** (চুঁচড়া—6), আঁশকাঁটা (বাঁকুড়া—6)।



চিত্র 2.8—শেওলার বৈচিত্র্যময় গঠন ঃ
ক-গ—গ্লিওক্যাপ্‌সা ; ঘ ও ঙ—নস্টক ; চ—ভলভক্স ;
ছ—ক্লোরেল্লা ; জ ও ঝ—স্পাইরোগাইরা।



চিত্র 2.9—শেওলার বৈশিষ্ট্যময় গঠন ঃ
ক—ইউলোথ্রিক্স ; খ—কারা ; গ—ভাউচেরিয়া ; ঘ—কলারপা ; ঙ—ফিউকাস ;
চ—সারগেসাম ; ছ—পসটেলসিয়া ; জ-ঝ—ব্যাট্রাকোস্পারমাম ;
ঞ-ট—পলিসাইফনিয়া ; ঠ—ডায়াটম।

- **আমন ধান :** **বাদকলমকাটি** 65 (বাঁকুড়া—1), **রাধুনী পাগল** (বাঁকুড়া—35), **রূপসাল** (চুঁচড়া—13), **বাসমতি** (বাঁকুড়া—33)।
- **বোরো ধান :** চুঁচড়া বোরো—1, চুঁচড়া—1 ইত্যাদি।

* **গম** (Wheat) :
কল্যাণসোনা, সোনালিকা, সোনারা—64, N.P. 710, T.P. 698।

* **ভুট্টা** (Maize) :
গঙ্গা 101, **গঙ্গা সফেদ, অম্বর, ডেকান, জহর, কিষাণ, সোনা, বিজয়, বিক্রম** ইত্যাদি।

* **সয়াবীন** (Sayabean) :
DS 73-16, DS 75-2-4, DS 74-20-2, এবং DS 76-1-37 (প্রোটিন 42·75% এবং তেল 19·76%)

* **সরিষা** (Mustard) :
পুসা কল্যাণী, পুসা বোল্ড, পুসা বরণী ইত্যাদি।

* **পাট** (Jute) :
(i) **মিঠাপাট :** JRO—623, JRO—620, চুঁচড়া গ্রীণ।
(ii) **তিতাপাট :** JRC—212, D—154, ফুলেশ্বরী, ধলেশ্বরী ইত্যাদি।

(b) **বীজশূন্য ফল উৎপাদন এবং ফলের আকার ও সংখ্যাবৃদ্ধি :** বীজশূন্য ফল উৎপাদনে জীববিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব ও সেগুলির প্রয়োগ অত্যন্ত ফলপ্রদ। জিব্বারেলিন ও অক্সিনজাতীয় হরমোন প্রয়োগে বীজশূন্য ফলের গাছ (যেমন, পেয়ারা, আঙুর, কমলালেবু ইত্যাদি) উৎপাদন ও ফলের আকার এবং সংখ্যাবৃদ্ধি সম্ভবপর হ'য়েছে।

(c) **মাটি নির্বাচন :** জীববিজ্ঞানের সহযোগী শাখা—**মৃত্তিকাবিদ্যার** (Soil science) সাহায্যে অধিক ফলনের উপযুক্ত মাটি নির্বাচন সম্ভবপর। এই শাখার সাহায্যে মাটির ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন এবং জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা হয়। মাটি সংক্রান্ত গবেষণায় **জীবাণুতত্ত্ব** (Microbiology) বিশেষ সহায়ক।

(d) **কীটপতঙ্গ দমন :** জীববিজ্ঞানের **কীটতত্ত্ব** (Entomology) নামক বিশেষ একটি শাখার জ্ঞান প্রয়োগে ক্ষতিকর ও ফসল নষ্টকারী কীট-পতঙ্গের দমন সহজতর হয়।

(e) **ভাইরাস, ছত্রাক ও জীবাণু দমন :** ভাইরাস, ছত্রাক ও নানারকম জীবাণু ফসলের কম ক্ষতি করে না। যথা সময়ে এদের দমন বা এদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারলে শস্যহানী রোধ করা যায়। জীববিজ্ঞানের উপযুক্ত শাখায় জ্ঞানার্জন করতে পারলে তবেই এ কাজে দক্ষতা আসে।

(f) **কীটনাশক, ভাইরাস ও ছত্রাকনাশক ঔষধাদি উৎপাদন ও প্রয়োগ :** এইসব ক্ষতিকর জীব থেকে শস্য রক্ষা করার একমাত্র উপায় যথোপযুক্ত ঔষধ উৎপাদন। উপযুক্ত ঔষধ উৎপাদন, সেগুলির সুষ্ঠু প্রয়োগ কেবল জীব-বিজ্ঞানের জ্ঞানের মাধ্যমেই সম্ভবপর।

(g) **মৎস্য চাষ :** **পিসিকালচার** (Pisciculture) ও **ফিসারী** (Fishery) নামক জীববিজ্ঞানের দু'টি বিশেষ শাখায় মৎস্য প্রতিপালন ও মৎস্য চাষ সম্বন্ধে গবেষণা চলে। ইদানিং কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি প্রয়োগে মাছের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি করা সম্ভব হ'য়েছে।

(h) **উন্নত জাতের পশু-পাখী উৎপাদন :** উন্নত জাতের পশু-পাখী উৎপাদন মাধ্যমে পর্যাপ্ত দুধ, ডিম, মাংস ইত্যাদি উৎপাদনের কাজে **ডেয়ারী** (Dairy) ও **পোলট্রি** (Poultry) শিল্পের অবদান উল্লেখযোগ্য।

(i) **মৌমাছি পালন :** বিজ্ঞানের যে শাখায় বিজ্ঞানসম্মত মৌমাছি পালন সম্ভবপর তাকে **এপিকালচার** (Apiculture) বলে। এই পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ মাধ্যমে বাগানে বা উঠোনে মৌমাছি পালন সম্ভবপর। ফুলের প্রকৃতি অনুযায়ী মধুর গুণমানের তারতম্য ঘটে।

(2) **রোগপ্রতিরোধে :** **ভেষজবিদ্যা** (Pharmacognosy) ও **চিকিৎসা-বিদ্যা** (Medical Science)-এর যুগ্ম প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ধরনের ভয়াবহ রোগ প্রতিরোধ করার উমতা বহুলাংশে আয়ত্তাধীন।

(3) **শস্যের রক্ষণাবেক্ষণ :** গুদামজাত শস্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজে **উদ্ভিদ-রোগবিদ্যা** (Plant pathology), **ছত্রাকবিদ্যা** (Mycology), **পতঙ্গবিদ্যা** (Entomology) ইত্যাদি জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান বিশেষ ফলপ্রদ। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো, জীব দিয়ে জীবকে নির্মূল করার পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রদ। এই প্রক্রিয়াকে **জৈব-নিয়ন্ত্রণ** (Biological control) বলা হয়।

(4) **রোগনিরূপণে :** **বহুমূত্র, ধবল, কালোমূত্র** (Alkaptenuria), **অ্যালবিনো** (albino) প্রভৃতি রোগ নিরূপণে জীববিদ্যার অবদান উল্লেখযোগ্য। জীববিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এইসব বিপাকঘটিত গুরুত্বপূর্ণ রোগের কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর।

(5) **পরজীবী তত্ত্ব :** এমন অনেক পরজীবী আছে যারা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিদেহকে পোষকরূপে পছন্দ করে। এতে পোষক ক্রমশঃ ক্ষীণকায় হয় এবং একসময় মারা যায়। জীববিজ্ঞানের জ্ঞান এইসব পরজীবীকে সনাক্ত করতে এবং সংশ্লিষ্ট রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

(6) **মানব প্রজননবিদ্যায় :** **বর্ণান্ধতা** (Colour blindness), **হিমো-ফিলিয়া** (haemophilia) প্রভৃতি **জিনত্রুটিজনিত বংশগত রোগ**। এইসব মারাত্মক রোগ যাতে মানুষকে বংশপরম্পরায় পঙ্গু ক'রে রাখতে না পারে—সেজন্য মানব প্রজননবিদ্যার জ্ঞান মানুষকে রোগগুলি প্রতিরোধ করার উপায় সম্বন্ধে

সচেতন করতে সমর্থ। এইসব রোগ নিয়ন্ত্রণের উপায় হ'ল সম্ভাব্য রোগের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'য়ে তবেই বিবাহের যোগাযোগ করা।

(7) **শিল্পোদ্যোগে ঃ**

(a) **রেশম শিল্পে ঃ** উন্নত মানের রেশম উৎপাদনের জন্য জীব-বিজ্ঞানের যে শাখায় গবেষণা চলে তার নাম **সেরিকালচার** (Sericulture)।

(b) **লাক্ষা শিল্পে ঃ** কাঠ, চিনামাটি, পাথর প্রভৃতি অলঙ্করণে এবং সেগুলির দীর্ঘস্থায়ী পালিশ করতে লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। এছাড়া শীল করার কাজে বা গ্রামোফোন ডিস্ক তৈরী করতে যে গালা লাগে তা লাক্ষা থেকে তৈরী হয়। লাক্ষা চাষ (Lac culture) জীববিজ্ঞানের পরিণত একটি শাখা। প্রসঙ্গত রাঁচির **নামকুম** (Namkum) লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র উল্লেখের দাবী রাখে।

(c) **বস্ত্র শিল্পে ঃ** তুলা ও পাট বস্ত্রশিল্পের প্রাণস্বরূপ। জীববিজ্ঞানের সাহায্যে অধিক ফলনশীল তুলা ও পাটের যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হ'য়েছে।

(d) **চা শিল্পে ঃ** উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের জ্ঞান চা শিল্পকে সমৃদ্ধ হ'তে সাহায্য করেছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত মানের চা-উৎপাদন সম্ভবপর হ'য়েছে বলে বিশ্বের দরবারে ভারতের চা আজ বিশেষভাবে সমাদৃত।

(8) **বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ঃ** বন ও বন্যপ্রাণী দেশের সম্পদ। বন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ বিজ্ঞানের যে শাখায় হ'য়ে থাকে তাকে **বনপালন** বা **ফরেস্ট্রি** (Forestry) বলে। এদিকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ব্যবস্থাও (Wild life management) জীববিজ্ঞানের অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষিত হয়। বন সংরক্ষণ ও বনের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ তাই অত্যন্ত জরুরী। মানুষের অবহেলায় ও অত্যাচারে বনই শুধু নয় অসংখ্য বন্যপ্রাণী আজ বিলুপ্তির পথে। জীববিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখায় জ্ঞান বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে যথেষ্ট সহায়ক।

(9) **পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে বা পরিবেশ শোধনে ঃ** পরিবেশ শোধন বা পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা করা প্রতিটি মানুষের প্রাথমিক দায়িত্ব। কিভাবে কলকারখানায় দূষিত রাসায়নিক ও গ্যাসীয় পদার্থ নদ-নদী, খাল-বিলের জলকে বিষাক্ত করে, কিভাবে যানবাহনের পরিত্যক্ত ধোঁয়া (কার্বন মোনক্সাইড ইত্যাদি) মানুষের ফুসফুসে ক্যানসারের বীজ বপন করে, কিভাবে D.D.T. (ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরো ইথেন), B.H.C. (বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড) ইত্যাদি নানাবিধ কীটনাশক মনুষ্য জাতির সমূহ বিপদ ডেকে আনে সে সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করতে জীববিজ্ঞান যথেষ্ট সাহায্য করে।

(10) **জনস্বাস্থ্য রক্ষায় ঃ** জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সহরাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত জলাধার ও পাইপলাইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে কিভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক,

শেওলা ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ জীববিজ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব।

(11) **তৈল সন্ধানে**ঃ প্রয়োজনের তুলনায় বিভিন্ন জ্বালানী সরবরাহ আজ বিশ্ব সমস্যা। সমুদ্রগর্ভে বা সম্ভাব্য অন্যান্য স্থানে তৈলানুসন্ধানের কাজে জীববিজ্ঞানের বিশেষ দুটি শাখা—**প্রত্নজীববিজ্ঞান** (Palaeontology) ও **প্রত্ন-রেণুবিজ্ঞান** (Palaeopalynology) সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছে।

(12) **জনবিস্ফোরণ রোধে**ঃ জন্মনিয়ন্ত্রণের নিত্য নতুন পন্থা আবিষ্কার ছাড়াও জীববিজ্ঞানীরা অধিক ফলপ্রসূ ঔষধ আবিষ্কারের সাধনায় নিরলস গবেষণায় রত। এঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জনবিস্ফোরণ রোধে ইতিমধ্যেই উল্লেখ-যোগ্য ফল পাওয়া গেছে।

(13) **বন্যা ও ভূমিক্ষয় রোধে**ঃ বন্যা ও ভূমিক্ষয় রোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্য জীববিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা সম্মিলিতভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন. এঁদের সম্মিলিত প্রয়াস অনেকাংশে ফলপ্রসূ হয়েছে।

(14) **সমুদ্রবিদ্যায়**ঃ সমুদ্রের অফুরন্ত সম্পদ মানুষের কাজে লাগাতে **সমুদ্রবিদ্যা** (Oceanography) নামক জীববিজ্ঞানের বিশেষ শাখাটির অবদান গুরুত্বপূর্ণ। সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে মনুষ্যখাদ্য, ঔষধ ইত্যাদি উৎপাদনের সম্ভাবনা নিয়ে জীববিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখায় নিরন্তর গবেষণা চলেছে।

(15) **মহাকাশ গবেষণায়**ঃ বিশেষ এই ক্ষেত্রেও জীববিজ্ঞানের কল্যাণ হস্ত প্রসারিত। এককোষী শেওলা—**ক্লোরেল্লা** (*Chlorella*) খাদ্য ও অক্সিজেন উৎপাদনের উৎস হিসাবে মহাকাশ যানে ব্যবহৃত হয়।

(16) **বিনোদনে**ঃ চিত্ত বিনোদনে জীববিজ্ঞানের অবদান অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ। সুবিশাল জলাশয় এবং তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ যেমন মানুষের চিত্তকে উদ্বেলিত করে, তেমনি বিচিত্র প্রাণী, গহন অরণ্য, পুষ্পশোভিত বাগিচা, অভয়া-রণ্য, চিড়িয়াখানা, জাতীয় উদ্যান, মৎস্য, কুমীর ও পক্ষী প্রকল্প মানুষের চিত্ত বিনোদনে সহায়তা করে। জীববিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখা এইসব বিনোদন সামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ, উৎপাদন ও সংরক্ষণে সহায়তা করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ 2
[Classification of Plants and Animals]

2.1. সূচনা [*Introduction*]:

বিশাল পৃথিবীর দিকে দিকে প্রাণের স্পন্দন। প্রাণময় বস্তুই জীব। জীবগোষ্ঠীর প্রধান দুই অংশীদার উদ্ভিদ ও প্রাণী। পৃথিবীর জলে, স্থলে এমনকি অন্তরীক্ষেও এরা ছড়িয়ে আছে। এদের সংখ্যা অগণিত। প্রায় পাঁচ লক্ষের উপর জীবিত উদ্ভিদ-প্রজাতি ও দশ লক্ষের মতো জীবিত প্রাণী-প্রজাতির কথা এ পর্যন্ত জানা গেছে। প্রতি বৎসর নতুন নতুন জীব আবিষ্কৃত হচ্ছে—জানার পরিধিও বাড়ছে। তবু যারা অজানা রইল, তাদের সংখ্যা কল্পনাতীত।



চিত্র 2.1—ক্যারোলাস লিনীয়াস।

জানা-অজানা উদ্ভিদ সম্বন্ধে পরিকল্পিত জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে এবং সামগ্রিকভাবে জীবের মঙ্গলের জন্য বিজ্ঞানী মহলে নিরন্তর সাধনা চলেছে। চারিত্রিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণীকে বিভিন্ন শ্রেণী বা বিভাগে ভাগ করার প্রচেষ্টা তারই ফলশ্রুতি।

● **শ্রেণীবিভাগের সংজ্ঞা** [Definition of Classification] ঃ **পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার করে জীবকে নিজ নিজ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা বা কোন গোষ্ঠীর জীবকে ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠীতে বিন্যস্ত করার নাম শ্রেণীবিভাগ** (Classification)।

জীববিজ্ঞানের যে শাখায় শ্রেণীবিভাগ-সংক্রান্ত আইনকানুন আলোচিত হয়, তাকে **শ্রেণীবন্ধকরণবিদ্যা বা ট্যাক্সোনমি (Taxonomy** ; গ্রীক *Taxis* = বিন্যাস + *nomos* = আইন) বলে। সুইডিস-বিজ্ঞানী **ক্যারোলাস লিনীয়াস**

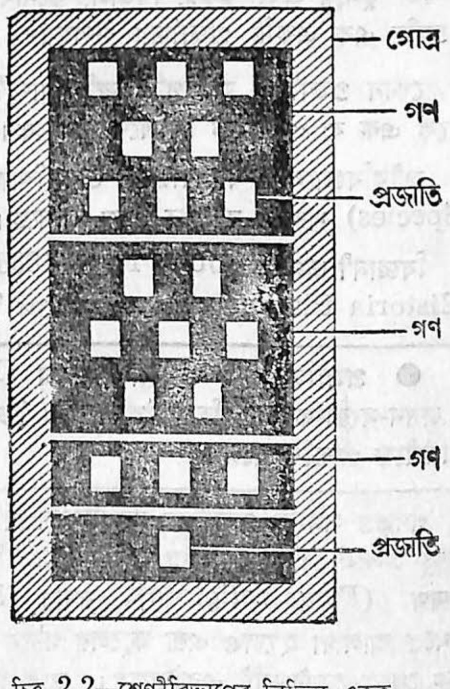
(Carolus Linnaeus, 1707-1778) শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতির জনক বলে পরিচিত (চিত্র 2.1.)।

2.2. শ্রেণীবিভাগের উদ্দেশ্য [*Purpose of Classification*] :

জীবের শ্রেণীবিভাগ করার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ তিনটি, যেমন—

(1) **সনাক্তকরণ** (Identification)—বহুর মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসকে বেছে নেওয়ার অর্থ সনাক্তকরণ। শ্রেণীবিভাগের ফলে সনাক্তকরণ সহজ হয়, সময় বাঁচে। **অভিধানে শব্দগুলি বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকে বলে, অল্প সময়ে অজস্র শব্দের মাঝে প্রয়োজনীয় শব্দটি খুঁজে বার করা সহজ হয়।** আবার, লেখকের নামানুসারে বা বিষয়বস্তু অনুসারে বইয়ের শ্রেণীবিভাগ করা থাকে বলে, গ্রন্থাগারিক অতি দ্রুত অভীষ্ট বইটি বেছে দেন। তেমনি প্রস্তুতকারকের নামানুসারে ঔষধ সাজানো থাকে বলে, ঔষধ-বিক্রেতা কাল-ক্ষেপ না করে ঔষধ সরবরাহ করতে পারেন। সেইভাবেই শ্রেণীবিভাগ-পদ্ধতি অনুসরণে উদ্ভিদ ও প্রাণীকে সহজে সনাক্ত করা যায়।

(2) **প্রাথমিক জ্ঞান-লাভ** (Aquisition of fundamental know-ledge)—পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেকটি জীব সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান আহরণ করা কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রাথমিক জ্ঞান লাভের জন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীকে নির্দিষ্ট কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। এইভাবে শ্রেণীভুক্ত করার পর প্রতিটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি জীব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলেই ঐ গোষ্ঠীর অন্যান্য জীব সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা জন্মায়।



চিত্র 2.2—শ্রেণীবিভাগের বিভিন্ন একক সম্বন্ধে ধারণা।

(3) **পারস্পরিক সম্বন্ধ নিরূপণ** (Determination of relative affinity)—শ্রেণীবিভাগের মাধ্যমে এক জীব-গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য জীব-গোষ্ঠীর সম্বন্ধ নিরূপণ করা সহজ। বিবর্তন (Evolution)-এর পথে এদের কোন্‌টি অনুন্নত বা কোন্‌টি উন্নত বিচার করা শ্রেণীবিভাগের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য।

2.3. শ্রেণীবিভাগের একক [*Units of Classification*] :

(1) প্রজাতি বা স্পিসিজ (Species) : প্রজাতি বা স্পিসিজ (Species)-কে সাধারণত শ্রেণীবিভাগের নিম্নতম একক ধরা হয়। প্রজাতি **বলতে এমন কতকগুলি জীব বোঝায়, যাদের দেহগঠনে ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে** সাদৃশ্য আছে। উদাহরণ হিসাবে **মটর গাছকে** (*Pisum sativum*) ধরলে একই মাঠের মটর গাছের উচ্চতা, ফলের আকার, ফুলের রং প্রভৃতি বিষয়ে অল্পবিস্তর তারতম্য থাকলেও তারা গঠন ও ফুলের আকৃতির দিক থেকে একই রকম, অর্থাৎ একে অন্যের অনুরূপ। এই সাদৃশ্য থেকে এটাই মনে করা স্বাভাবিক যে, মটরগাছগুলি একই বংশোদ্ভূত এবং তারা নিজেদের মধ্যে জননক্ষম। সুতরাং মটরগাছগুলি একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত।

আগে কেবলমাত্র অঙ্গসংস্থানগত বৈশিষ্ট্যের বিচারে প্রজাতিকে চিহ্নিত করা হ'ত। ইদানিং প্রজননবিদ্যা, কোষতত্ত্ব, শারীরবৃত্ত প্রভৃতি শাখাগুলির থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকেও শ্রেণীবিভাগের কাজে ব্যবহার করা হয়। মটরগাছের মতো বট, অশ্বত্থ, ডুমুর এবং কুকুর, বিড়াল, কুনোব্যাঙ, কোলাব্যাঙ, রুইমাছ, কাতলামাছ ইত্যাদি এক একটি প্রজাতির উদাহরণ।

কোন প্রজাতির অন্তর্গত জীবগোষ্ঠী অন্য কোন প্রজাতির জীবগোষ্ঠী থেকে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যে পৃথক।

জীববিজ্ঞানের ধ্যানধারণা উপলব্ধির অনেক আগে থেকেই **স্পিসিজ** (Species) **শব্দটি** ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে।

বিজ্ঞানী **জন রে** (John Ray) 1886 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর **'হিস্টোরিয়া প্ল্যান্টেরম'** (Historia Plantarum) নামক গ্রন্থে স্পিসিজ শব্দটি ব্যবহার করেন।

● **প্রজাতি বা স্পিসিজের সংজ্ঞা** (Definition of Species) **: দৈহিক ও জনন-সংক্রান্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একে অপরের অনুরূপ জীব-গোষ্ঠীকে প্রজাতি বলে।**

গণভুক্ত সমস্ত প্রজাতির জননাঙ্গসংক্রান্ত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় একই। কিন্তু অঙ্গজ বৈশিষ্ট্যে তারা অল্পবিস্তর ভিন্ন। **বট** (*Ficus bengalensis*), **অশ্বত্থ** (*Ficus religiosa*), **রবার** (*Ficus elastica*) প্রভৃতি গাছগুলি দেখতে আলাদা হ'লেও এরা ফুলের গঠনে ও জননসংক্রান্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মোটামুটি একইরকম। তাই বিভিন্ন প্রজাতির হওয়া সত্ত্বেও এদের '*Ficus*' গণভুক্ত করা হ'য়েছে। তেমনি ব্যাঙের দুটি প্রজাতি **রাণা টাইগ্রিনা** (*Rana tigrina*) ও **রানা হেক্সাডেকটাইলা** (*Rana hexadactyla*) '*Rana*' গণভুক্ত। কোন গণের অন্তর্ভুক্ত এক বা একাধিক প্রজাতি নিঃসন্দেহে একই বংশোদ্ভূত। নীচের উদাহরণ থেকে **গণবোধ** (concept of genus) সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হবে।

মনে কর, একটি রবারের চাদরকে টেবিলের একটি বিন্দুতে পেরেক দিয়ে আটকে দেওয়া হ'ল। রবারের চাদরটিকে গণের সঙ্গে তুলনা করলে সেটিকে যেদিকে খুশী প্রসারিত করা যায়। প্রসারণে রবারের আয়তন বাড়ে। এক্ষেত্রে গণে প্রজাতির সংখ্যা বাড়ে। সংকোচনে রবারের পরিধি ছোট হয়, অর্থাৎ গণে প্রজাতির সংখ্যা কমে। তবে প্রজাতির সংখ্যা কম বা বেশী যাই হোক না কেন পেরেকটি **(টাইপ স্পিসিজ, type species)** সব সময় গণের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(2) **গণ বা জেনাস (Genus)** ঃ এক বা একাধিক প্রজাতির সম্মিলিত গোষ্ঠীর নাম **গণ** বা **জেনাস** (Genus)।

● **গণের সংজ্ঞা** (Definition of Genus) ঃ **একই বংশোদ্ভূত এক বা একাধিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রজাতির সম্মিলিত গোষ্ঠীর নাম গণ বা জেনাস।**

---

(3) **গোত্র** বা **ফ্যামিলি** (Family) ঃ জননাঙ্গ-সংক্রান্ত প্রধান কয়েকটি চরিত্রের দিক থেকে সম্বন্ধযুক্ত নিকটতম কতকগুলি গণ একত্রে বা এককভাবে গঠন করে **গোত্র** বা **ফ্যামিলি** (Family)।

আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে গোত্রকে এমন একটি উচ্চ আসনে বসানো হয়েছে যার সঙ্গে গণ, প্রজাতি প্রভৃতি এককগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বস্তুত গোত্র সাধারণভাবে এক একটি সর্বোচ্চ ধাপকে নির্দেশ করে।

গোত্রের অন্তর্গত প্রথম গণটির শেষে উভয় ক্ষেত্রে -ceae এবং প্রাণীর ক্ষেত্রে -idiae জুড়ে গোত্রের নামকরণ করা হয়।

● **গোত্রের সংজ্ঞা** (Definition of Family) ঃ **এক বা একাধিক প্রজাতি মিলে যেমন একটি গণ গঠন করে তেমনি একই বংশোদ্ভূত এক বা একাধিক গণ একত্রে একটি গোত্র গঠন করে।**

এইভাবেই কতকগুলি গোত্র নিয়ে **বর্গ** বা **অর্ডার** (Order), কতকগুলি বর্গ নিয়ে **শ্রেণী** বা **ক্লাস** (Class)। কতকগুলি শ্রেণী নিয়ে **বিভাগ বা ডিভিশান** (Division) অথবা **পর্ব** বা **ফাইলাম** (Phylum)। সর্বোপরি কয়েকটি বিভাগ নিয়ে গঠিত হয়—**উদ্ভিদরাজ্য** (Plant Kingdom) বা **প্রাণি-রাজ্য** (Animal Kingdom)।

নীচে জীব-জগতে শ্রেণীবিভাগের বহুল প্রচলিত এককগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখানো হ'ল ঃ—

		উদাহরণ	
রাজ্য ↓ ↑	(Kingdom)	উদ্ভিদরাজ্য	প্রাণীরাজ্য
পর্ব বা বিভাগ ↓ ↑	(Phylum) (Division)	গুপ্তবীজী	কর্ডাটা
শ্রেণী ↓ ↑	(Class)	দ্বিবীজপত্রী	আম্ফিবিয়া
বর্গ ↓ ↑	(Order)	মালভেলিস	সালিয়েনসিয়া
গোত্র ↓ ↑	(Family)	মালভেসি	বুফোনিডি
গণ ↓ ↑	(Genus)	হিবিসকাস*	বিউফো†
প্রজাতি	(Species)	রোজা-সাইনেনসিস*	মেলানোস্টিকটাস†

2.4. দ্বিপদ নামকরণ বা বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার [*Binomial nomenclature*] :

উদ্ভিদ, প্রাণী ও অন্যান্য যে কোন জীবের প্রত্যেকেরই নিজস্ব নাম থাকা দরকার। নাম আছে ঠিকই, কিন্তু মজার কথা একই প্রাণী বা উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রদেশে—এমনকি, বিভিন্ন অঞ্চলে এক বা একাধিক নামে পরিচিত। এতে সাধারণ লোকের সুবিধা হলেও জীববিজ্ঞানীদের বিশেষ অসুবিধা হয়। এক দেশের বিজ্ঞানী অন্য দেশের বিজ্ঞানীকে বোঝাতে পারেন না, ঠিক কোন্ প্রাণী বা উদ্ভিদটির কথা তিনি বলতে চাইছেন। **তাই বিশ্বের তাবৎ বিজ্ঞানী যাতে এক ডাকে কোন নির্দিষ্ট জীবকে চিনে নিতে পারেন, সেজন্য প্রতিটি জীবের বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific name) রাখার পদ্ধতি চালু হয়েছে।**

সঠিক বৈজ্ঞানিক নামকরণ পদ্ধতি অনেক নিয়মকানুনের উপর নির্ভর করে। তবে এটা অনেক আগেই ঠিক হয়েছে, **প্রতিটি প্রাণী ও উদ্ভিদের নিজস্ব নামের দুটি অংশ বা পদ থাকবে** ; দুটি পদ দ্বারা পূর্ণাঙ্গ নাম দেওয়ার পদ্ধতিকে দ্বিপদ নামকরণ বলা হয়। যেমন মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম **হোমো সেপিয়েন্স** (*Homo sapiens*), কেঁচোর বৈজ্ঞানিক নাম **ফেরিটিমা পোস্থুমা**

[* হিবিসকাস রোজা-সাইনেনসিস (*Hibiscus rosa-sinensis*) = জবা
† বিউফো মেলানোস্টিকটাস (*Bufo melanostictus*) = কুনোব্যাঙ]

(*Pheretima posthuma*), সোনা ব্যাঙের নাম **রাণা টাইগ্রিনা** (*Rana tigrina*) ইত্যাদি। উদ্ভিদের বেলায়ও ঐ একই নিয়ম। আমের নাম **ম্যানজিফেরা ইনডিকা** (*Mangifera indica*), ভুট্টার নাম **জিয়া মেইজ** (Zea *mays*), নারকেলের নাম **ককস নুসিফেরা** (*Cocos nucifera*) ইত্যাদি। **প্রথম** অংশ অর্থাৎ হোমো, ফেরিটিমা, রাণা, ম্যানজিফেরা, জিয়া, ককস প্রভৃতি **হল গণ নাম** (Generic name) এবং দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ সেপিয়েন্স, পোস্থুমা, টাইগ্রিনা, ইনডিকা, মেইজ, নুসিফেরা হল **প্রজাতি নাম** (Specific name)। দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতির জনক **ক্যারোলাস লিনীয়াস**। তিনি তাঁর বিখ্যাত **গ্রন্থ সিস্টেমা নাতুরি** (Systema naturae)-তে দ্বিপদ নামকরণের প্রস্তাব রাখেন।

গণ বা **জেনাসের নামের আদ্যক্ষর সব সময় বড় হরফের** (Capital letter) এবং **প্রজাতি** বা **স্পিসিজের নামের আদ্যক্ষর সব সময় ছোট হরফে** (Small letter) লিখতে হয়। যেমন, *Homo*-র আদ্যক্ষর '*H*' বড় হরফের কিন্তু বাকি অক্ষরগুলি ছোট হরফের। আবার *sapiens*-এর আদ্যক্ষর ও অন্যান্য অক্ষরগুলি সব ছোট হরফের। **বিজ্ঞানসম্মত নাম ছাপতে বাঁকা হরফ** (Italics type) **ব্যবহৃত হয়। হাতে লেখার সময় বাঁকা হরফে প্রকাশ করা যায় না বলে নামের নীচে লাইন টেনে দিতে হয়।**

যে বিজ্ঞানী উদ্ভিদ বা প্রাণীর নামকরণ করলেন তাঁর নাম জানা দরকার। তাই নিয়ম হয়েছে Italics-এ লেখা **দ্বিপদ নামের শেষে কোন কমা বা যতিচিহ্ন না দিয়ে সাধারণ হরফে বিজ্ঞানীর নাম দেওয়া থাকবে**। যেমন, রঙ্গন ফুল গাছের নামকরণ করেন লিনীয়াস (Linnaeus)। রঙ্গনের নাম *Ixora coccinea*-র শেষে Linnaeus নাম থাকবে ; অর্থাৎ, সঠিক নাম হবে **ইক্সোরা কক্সিনিয়া লিনীয়াস** (*Ixora coccinea* Linnaeus)। Linnaeus নামটিকে সংক্ষেপে Linn. অথবা কেবল L.-ও লেখা যায়।



চিত্র 2.3—আঁদ্রে সিসালপিনো।

2.5. শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি [*System of classification*] :

জীবের শ্রেণীবিভাগ করার প্রয়াস সম্ভবত ভারতেই সুরু। 3000 B.C. আগে 'ঋগ্বেদ' এবং 'মনু' ও 'অগ্নি-পুরাণ' প্রভৃতি হিন্দু-গ্রন্থে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের প্রথম আভাস পাওয়া যায়। তারপর গ্রীকযুগ থেকে সুরু করে (370 B.C.) আজ পর্যন্ত বহু বিজ্ঞানী নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতির প্রস্তাব রেখেছেন। **আঁদ্রে সিসালপিনোকে** (1519-1603) প্রথম উদ্ভিদ

ট্যাক্সোনমিস্টের সম্মান দেওয়া হয় (চিত্র 2.3)। তিনি প্রথমত স্বভাব (habit) এবং দ্বিতীয়ত ফল ও বীজের ভিত্তিতে উদ্ভিদজগতের শ্রেণীবিভাগ করেন।

শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি প্রধানতঃ তিনটি—যেমন, **কৃত্রিম** (Artificial), **স্বাভাবিক** (Natural) ও **অভিব্যক্তি নির্দেশক** (Phylogenetic)।

● **কৃত্রিম পদ্ধতি** (Artificial classification) ঃ একটি বা মাত্র কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ করার পদ্ধতি হল কৃত্রিম। এর প্রধান অসুবিধা, নিকট আত্মীয় জীব দূরের কোন পৃথক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। **লিনীয়াসের পদ্ধতিকেই আদর্শ কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি বলে মনে করা হয়।**

● **স্বাভাবিক পদ্ধতি** (Natural classification) ঃ স্বাভাবিক শ্রেণীবিভাগে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া



চিত্র 2.4—জর্জ বেন্থাম।



চিত্র 2.5—যোশেফ ডালটন হুকার।

হয়। ফলে আত্মীয় যোগসূত্র-স্থাপনকারী চরিত্রগত লক্ষণের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। **ডি. ক্যানডোল, বেন্থাম** (চিত্র 2.4) ও **হুকার** (চিত্র 2.5) নামক বিজ্ঞানীদের পদ্ধতি স্বাভাবিক।

● **অভিব্যক্তি নির্দেশক পদ্ধতি** (Phylogenetic classification) ঃ বিবর্তনগত ও জিনঘটিত সম্বন্ধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সর্বাধুনিক শ্রেণীবিভাগটি হল অভিব্যক্তি নির্দেশক পদ্ধতি। **এঙলার** (চিত্র 2.6), **হাচিনসন** (চিত্র 2.7), **টিপো** প্রভৃতি বিজ্ঞানী অভিব্যক্তি নির্দেশক পদ্ধতির সমর্থক।

2.6. উদ্ভিদরাজ্য [*Plant Kingdom*] :

পরিচিত ও অপরিচিত অসংখ্য উদ্ভিদ নিয়েই উদ্ভিদরাজ্য। কেবলমাত্র তৃণ, গুল্ম বা বৃক্ষরাজিই নয়, অগণিত অণুবীক্ষণিক উদ্ভিদও এই উদ্ভিদরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। রূপে, গুণে বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদকুলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্বভাবতই এক নয়। গঠন, আকৃতি, এমনকি প্রকৃতি বিচারেও উদ্ভিদরাজ্য অনুপম বৈচিত্র্যের অধিকারী। তাই বিশেষ কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন সুনির্দিষ্ট রীতি ছাড়া সমগ্র উদ্ভিদরাজ্য সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়।



চিত্র 2.6—অ্যাডলফ্ এঙলার।



চিত্র 2.7—জন হাচিনসন।

নির্দিষ্ট কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে অজানা, অচেনা, উদ্ভিদকে অতি দ্রুত সনাক্ত করা যায়। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের ভিত্তিতেই উদ্ভিদজগৎ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী তাঁদের নিজ নিজ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। প্রত্যেক পদ্ধতিরই কিছু-না-কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে।

আমাদের দেশে জর্জ **বেন্থাম*** (George Benthan—1800-1884) এবং **স্যার যোশেফ ডালটন হুকার** (Sir Joseph Dalton Hooker—1817-1911) -এর শ্রেণীবিভাগ-পদ্ধতিই সর্বাধিক প্রচলিত।

বেন্থাম ও হুকারের শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি অনুসরণে উদ্ভিদরাজ্যকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—A. **উপরাজ্য—ক্রিপ্টোগ্যামিয়া** (Cryptogamia ; গ্রীক *Kryptos* = প্রচ্ছন্ন + *gamos* = বিবাহ) বা **অপুষ্পক উদ্ভিদ**

* (i) বেন্থাম-হুকারের বই-এর নাম—"জেনেরা প্ল্যান্টেরাম" (Genera Planterum)—এটি তিন খণ্ডে বিভক্ত।
(ii) আলোচিত মোট গোত্রের সংখ্যা = 202।
(iii) বর্ণিত সপুষ্পক উদ্ভিদের মোট প্রজাতির সংখ্যা = 97205।

= Nonflowering Plants) এবং B. উপরাজ্য—ফ্যানারোগ্যামিয়া (Phanerogamia ; গ্রীক *Phaneros* = ব্যক্ত + *gamos* = বিবাহ) বা **সপুষ্পক উদ্ভিদ*** = (Flowering Plants)।

উদ্ভিদরাজ্য

A. উপরাজ্য-ক্রিপ্টোগ্যামিয়া (Subkingdom—Cryptogamia)	B. উপরাজ্য-ফ্যানারোগ্যামিয়া (Subkingdom—Phanerogamia)

A. **উপরাজ্য-ক্রিপ্টোগ্যামিয়া** [Cryptogamia] বা **অপুষ্পক উদ্ভিদ গোষ্ঠী :**

ফুল উদ্ভিদের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। ফুল থেকে ফল ও বীজ হয়। ফল ও বীজ থেকে নতুন নতুন উদ্ভিদ জন্মায়। কিন্তু এমন অনেক নিম্ন-শ্রেণীর উদ্ভিদ আছে, যাদের দেহে ফুল ফোটে না। স্বভাবতই এইসব উদ্ভিদে ফল ও বীজ উৎপন্ন হয় না। **ফুল উৎপাদনে অক্ষম উদ্ভিদকে অপুষ্পক উদ্ভিদ** বলে। অপুষ্পক উদ্ভিদগোষ্ঠী **ক্রিপ্টোগ্যামিয়া উপরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।** অপুষ্পক উদ্ভিদের দেহ অত্যন্ত সরল অথবা মূল, কাণ্ড ও পাতাসদৃশ অংশে বিভক্ত। মূল, কাণ্ড ও পাতার অনুপস্থিতি বা উপস্থিতির উপর নির্ভর করে অপুষ্পক উদ্ভিদকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

1. **সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদগোষ্ঠী** বা **থ্যালোফাইটা** (Thallophyta ; গ্রীক *Thallus* = অপৃথকীকরণযোগ্য দেহ + *phyton* = উদ্ভিদ) :

● **থ্যালোফাইটার বৈশিষ্ট্য :**

(i) থ্যালোফাইটাভুক্ত উদ্ভিদের দেহ অত্যন্ত সরল।

(ii) এক বা একাধিক কোষের সমন্বয়ে গঠিত হলেও এই গোষ্ঠীভুক্ত **উদ্ভিদদেহ কখনই মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভেদিত নয়।**

(iii) নিম্নস্তরের প্রাচীন এই অপৃথকীকরণযোগ্য উদ্ভিদদেহকে **থ্যালস** (Thallus) বলে।

(iv) সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ জলে বা আর্দ্রভূমিতে জন্মায়।

থ্যালোফাইটা প্রধানত দুভাগে বিভক্ত :—

(a) **শেওলা** বা **অলগি**† (Algae ; *alga* = সমুদ্রের আগাছা) :

---

* অনেকে এদের স্পারম্যাটোফাইটা (Spermatophyta ; গ্রীক Sperma = বীজ + phyton = উদ্ভিদ) বা স্পারম্যাটোফাইটস বলেন।

† বহুবচন ; একবচন অলগা (Alga)।

● **শেওলার বৈশিষ্ট্য :** (i) শেওলার দেহে **ক্লোরোফিল** (Chlorophyll) বা ঐ জাতীয় **রঞ্জক পদার্থ** থাকে।

(ii) **সালোকসংশ্লেষ চালিয়ে শেওলা নিজ দেহে শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য উৎপাদন করতে পারে।** শেওলাকে তাই **স্বভোজী** বা **অটোফাইট** (Autophyte) বলা হয়।

(iii) সাধারণতঃ এদের রং সবুজ। তবে **নীল, নীলাভ-সবুজ, বাদামী, লাল** প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের শেওলাও আছে।

(iv) শেওলার দেহ-প্রাকার সেলুলোজ দ্বারা গঠিত।

(v) আর্দ্রস্থান, খাল, বিল, পুকুর, নদী এবং সমুদ্রে বিভিন্ন ধরনের শেওলা পাওয়া যায়।

● **উদাহরণ :** **গ্লিওক্যাপ্‌সা** (*Gleocapsa*), **স্পাইরোগাইরা** (*Spirogyra*), **ক্লোরেল্লা** (*Chlorella*), **অসিলেটোরিয়া** (*Oscillatoria*), **নস্টক** (*Nostoc*), **ভলভক্স** (*Volvox*), **ফিউকাস** (*Fucus*), **ইউলোথ্রিক্স** (*Ulothrix*), **কারা** (*Chara*), **ভাউচেরিয়া** (*Vaucheria*), **কলারপা** (*Caulerpa*), **সারগেসাম** (*Sergassum*), **পসটেলসিয়া** (*Postelsia*), **ব্যাট্রাকোস্পারমাম** (*Batrachospermum*), **পলিসাইফনিয়া** (*Polysiphonia*), **ডায়াটম** (*Diatom*) প্রভৃতি (চিত্র 2.8 ও 2.9)।

(b) **ছত্রাক** বা **ফাইজাই*** (Fungi ; *fungus* = ছাতা) :

● **ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য :** (i) **ছত্রাক গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদদেহে ক্লোরোফিল থাকে না।** সেজন্য **শেওলার মতো ছত্রাক সালোকসংশ্লেষ চালিয়ে নিজদেহে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না।**

(ii) ছত্রাক জীবিত বা মৃত স্বভোজী উদ্ভিদের উপর অথবা রুটি, পচা ফল, ভিজা চামড়া, সারগাদা বা গলিত ও মৃত জৈব পদার্থের উপর জন্মায় এবং সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে।

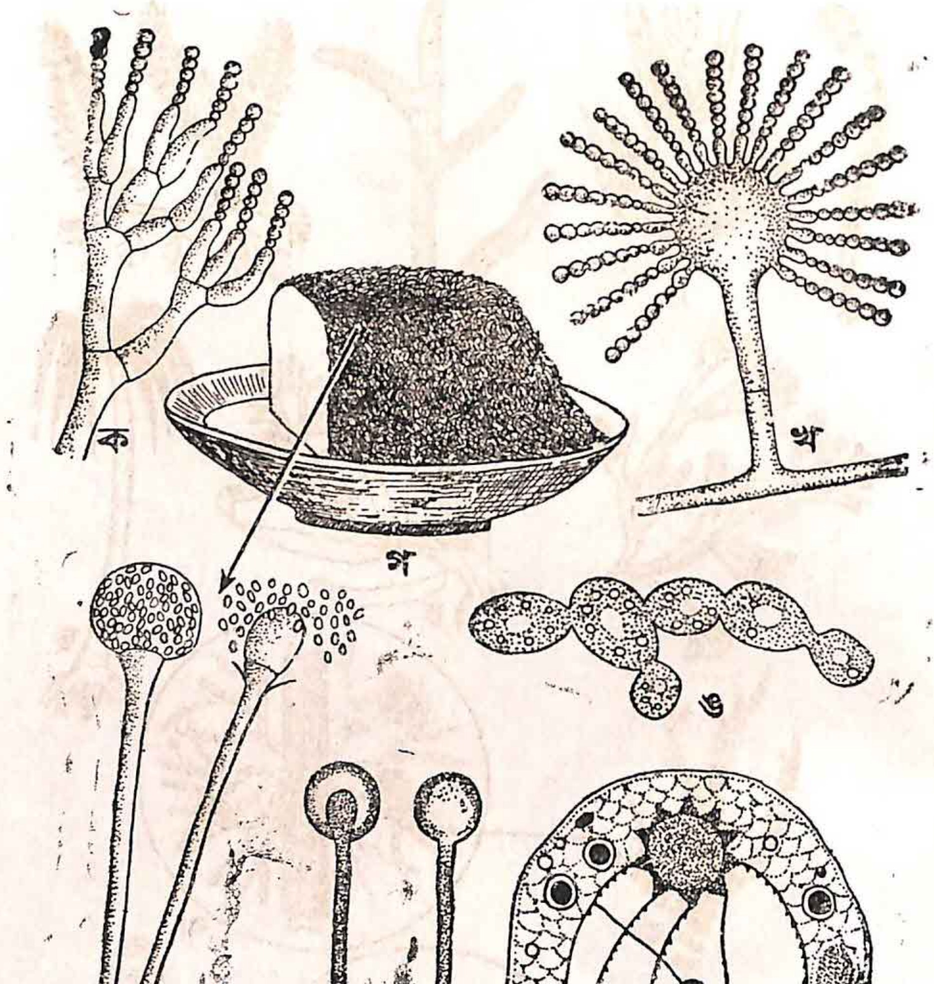
(iii) অর্থাৎ ছত্রাক কখনও **পরজীবী** বা **প্যারাসাইট** (Parasite), আবার কখনও **মৃতজীবী** বা **স্যাপ্রোফাইট** (Saprophyte)।

(iv) ছত্রাকের কোষ-প্রাকার কাইটিন (Chitin) দ্বারা গঠিত।

(v) দেহ **এককোষী** (ঈস্ট) বা বহুকোষী শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট **হাইফা** (hypha) দ্বারা গঠিত। শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট ছত্রাক দেহকে **মাইসিলিয়ম** (mycelium) বলে।

● **উদাহরণ :** **পেনিসিলিয়ম** (*Penicillium*), **অ্যাস্পারজিলাস** (*Aspergillus*), **রাইজোপাস** (*Rhizopus*), **ঈস্ট** (*Yeast*), **মিউকোর** (*Mucor*), **অ্যাগারিকাস** (*Agaricus*), **ফ্যালাস** (*Phallus*), **ক্ল্যাথরাস** (*Clathrus*), **ফোমিস** (*Fomes*), **ডিকটিওফোরা** (*Dictyophora*),

* বহুবচন ; একবচন ফাঙ্গাস (Fungus)।



চিত্র 2.10—বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক ঃ
ক—পেনিসিলিয়ম ; খ—অ্যাস্পারজিলাস ; গ-ঘ—রাইজোপাস ; ঙ-চ—ঈস্ট ; ছ—মিউকোর।



চিত্র 2.11—ছত্রাকের বৈশিষ্ট্যময় গঠন-বৈচিত্র্য ঃ
ক—অ্যাগারিকাস (বৃদ্ধির বিভিন্ন দশা) ; খ—ফ্যালাস ; গ—ক্ল্যাথরাস ; ঘ—ফোমিস ; ঙ—ডিকটিওফোরা ; চ—লাইকোপার্ডন (পাফ্‌বল) ; ছ—গিয়েস্টার ; জ—সায়াথাস।

লাইকোপার্ডন (*Lycopardon*), গিয়েস্টার (*Geaster*), সায়াথাস (*Cyathus*), পলিপোরাস (*Polyporus*), পাকসিনিয়া (*Puccinia*) প্রভৃতি (চিত্র 2.10 ও চিত্র 2.11)।

2. **মসজাতীয় উদ্ভিদগোষ্ঠী** বা **ব্রায়োফাইটা** (Bryophyta ; গ্রীক *bryon* = মস + *phyton* = উদ্ভিদ) ঃ

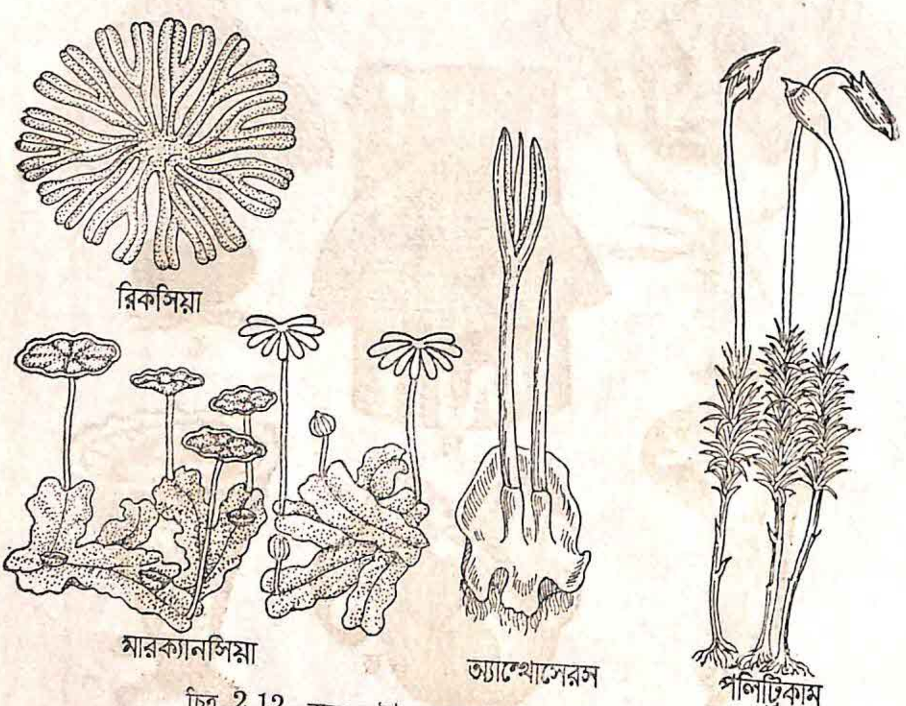
● **ব্রায়োফাইটার বৈশিষ্ট্য ঃ** (i) ব্রায়োফাইটা থ্যালোফাইটার চেয়ে কিছুটা উন্নত অপুষ্পক উদ্ভিদগোষ্ঠী।

(ii) **ব্রায়োফাইটাভুক্ত উদ্ভিদের দেহ কান্ড ও পাতায় বিভেদিত হতে পারে, কিন্তু দেহে কখনই মূল থাকে না।**

(iii) মূলের কাজ **রাইজয়েড** (Rhizoid ; গ্রীক *Rhizo* = মূল + *eidos* = আকার) নামে একপ্রকার সূতোর মতো অংগ দ্বারা সম্পন্ন হয়।

(iv) প্রাচীন ব্রায়োফাইটের দেহে কান্ড বা পাতা থাকে না।

(v) **উন্নত ব্রায়োফাইটের দেহ তথাকথিত কান্ড ও পাতাসদৃশ অংগে বিভেদিত।**



চিত্র 2.12—ব্রায়োফাইটাভুক্ত বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ।

(vi) ব্রায়োফাইটার পাতা ও কান্ড আদর্শ শ্রেণীর নয় বলে কান্ডকে **কলিড** (Caulid) এবং পাতাকে **ফাইলিড** (Phyllid) বলে।

(vii) এদের দেহে জাইলেম, ফ্লোয়েম ইত্যাদি সংবহন কলা নেই।

(viii) ব্রায়োফাইট স্যাঁতসেঁতে, ভিজে, ঠান্ডা পরিবেশে, বিশেষত উঁচু পার্বত্য এলাকায় জন্মায়।

(ix) **এরা প্রত্যেকেই লিঙ্গধর উদ্ভিদ** বা **গ্যামেটোফাইট** (Gametophyte)।

● **উদহরণ ঃ রিকসিয়া** (*Riccia*), **ম্যারক্যানসিয়া** (*Marchantia*), **অ্যান্থোসেরস** (*Anthoceros*), **পলিট্রিকাম** (মস) (*Polytrichum*) প্রভৃতি (চিত্র 2.12)।

3. **ফার্নজাতীয় উদ্ভিদগোষ্ঠী** বা **টেরিডোফাইটা** (*Pteridophyta*, গ্রীক *Pteris* = ফার্ন + *phyton* = উদ্ভিদ) ঃ

● **টেরিডোফাইটার বৈশিষ্ট্য ঃ** (i) টেরিডোফাইটা ব্রায়োফাইটা থেকে কিছু উন্নত গোষ্ঠীর উদ্ভিদ।

(ii) এদের **দেহ তথাকথিত কান্ড, পাতা ও মূল—এই তিন অংশে বিভেদিত**।

(iii) এদের দু'ধরনের পাতা হয় ; ক্ষুদ্রাকার সূক্ষ্ম পাতাগুলি **মাইক্রোফাইলাম** (Microphyllum) এবং বড় প্রসারিত পাতাগুলি **মেগাফাইলাম** (Megaphyllum)।

(iv) **অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে টেরিডোফাইটা সর্বাপেক্ষা উন্নত।**

(v) অধিকাংশ টেরিডোফাইটাভুক্ত উদ্ভিদই আর্দ্র, শীতল এবং ছায়াঘন পার্বত্য পরিবেশ পছন্দ করে।

(vi) এরা প্রত্যেকেই **রেণুধর উদ্ভিদ** বা **স্পোরোফাইট** (Sporophyte)।

(vii) অধিকাংশ পত্র পরিবর্তিত হ'য়ে **রেণুপত্রমঞ্জরী** (Sporophyll) গঠন করে।

(viii) রেণুপত্রের কক্ষে **রেণুস্থলী** (Sporangium) উৎপন্ন হয়।

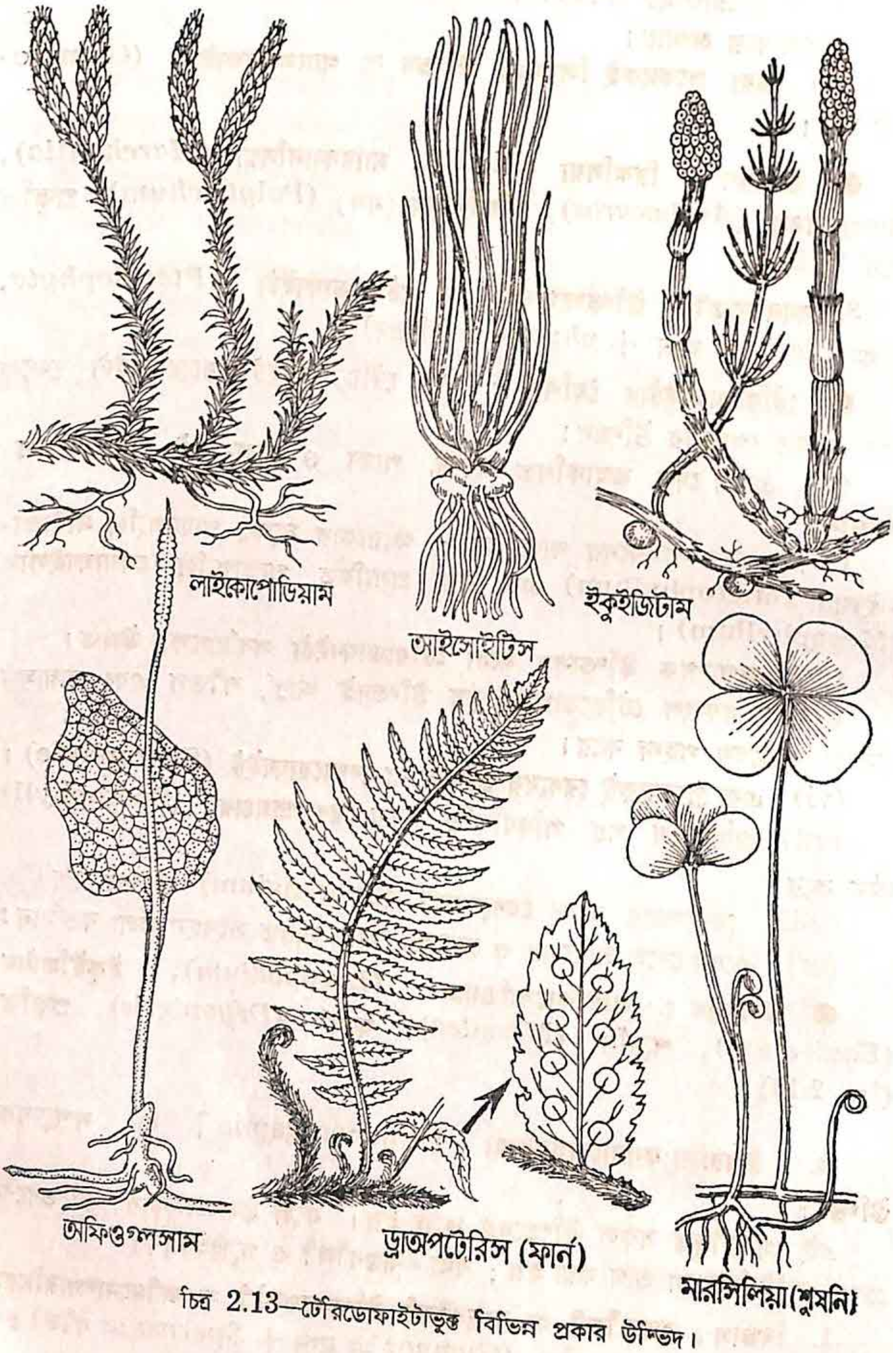
(ix) এদের দেহে জাইলেম ও ফ্লোয়েম দ্বারা গঠিত সংবহন কলা বর্তমান।

● **উদাহরণ ঃ লাইকোপোডিয়াম** (*Lycopodium*), **ইকুইজিটাম** (*Equisetum*), **শুষনি** (*Marsilea*), **ফার্ন** (*Dryopteris*) প্রভৃতি (চিত্র 2.13)।

B. **উপরাজ্য-ফ্যানারোগ্যামিয়া** [Phanerogamia] বা **সপুষ্পক উদ্ভিদ** ঃ

এই গোষ্ঠীভুক্ত সকল উদ্ভিদেই ফুল হয়। ফুল উৎপাদনকারী উদ্ভিদকে প্রধান দুটি বিভাগে ভাগ করা হয় ; যথা—ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী।

1. **বিভাগ ঃ ব্যক্তবীজী** বা **নগ্নবীজী উদ্ভিদগোষ্ঠী** বা জীমনোস্পারমিয়া (Gymnospermia) ; গ্রীক (*Gymnos* = নগ্ন + *Sperma* = বীজ) ঃ



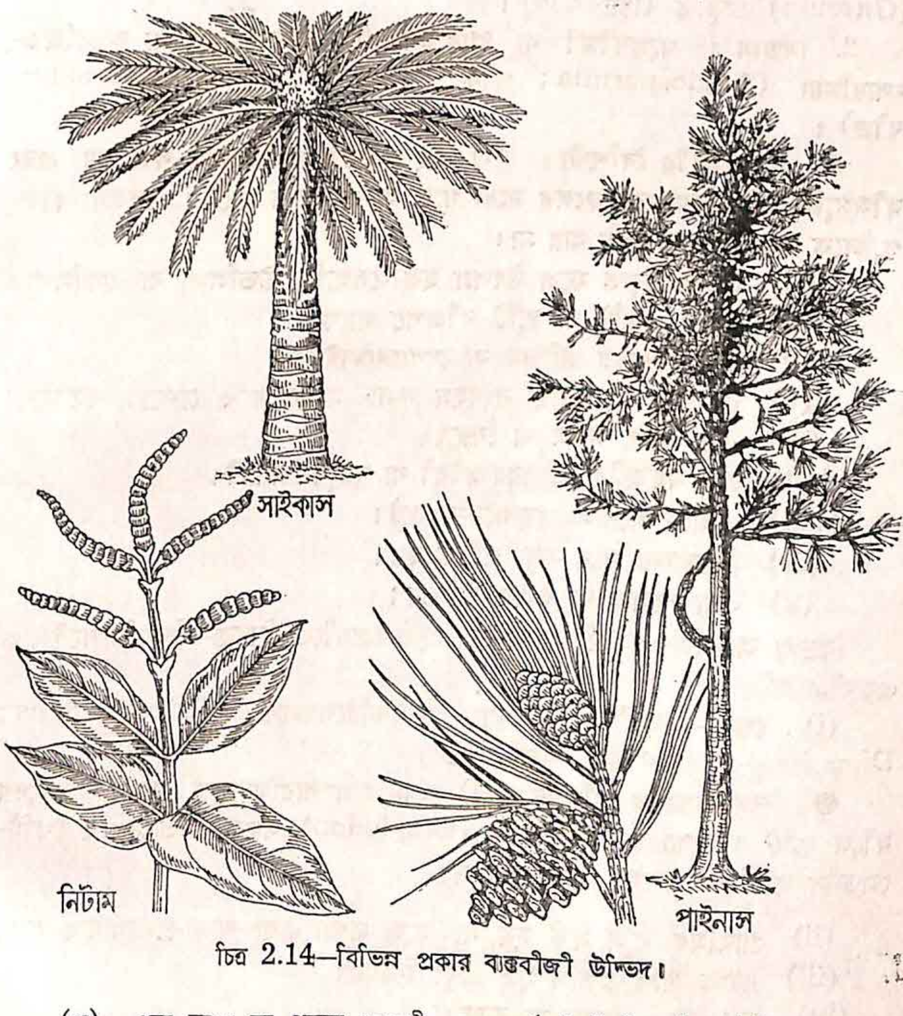
চিত্র 2.13—টেরিডোফাইটাভুক্ত বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ।

● **নগ্নবীজীর বৈশিষ্ট্যঃ** (i) সপুষ্পক বা ফ্যানারোগ্যামিয়াভুক্ত উদ্ভিদ হলেও যাদের বীজ ফলের মধ্যে লুকানো থাকে না, সেইসব উদ্ভিদকে ব্যক্তবীজী বা নগ্নবীজী বলা হয়।

(ii) এই **গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদে কখনও ফল হয় না**। সেজন্য **বীজগুলি নগ্ন** বা **অনাবৃত** (naked) থাকে এবং বাইরে থেকে বীজগুলিকে দেখা যায়।

(iii) দেহ **মূল, কান্ড ও পাতায়** বিভক্ত।

(iv) এদের প্রত্যেকেই **রেণুধর উদ্ভিদ** বা **স্পোরোফাইট** (Sporophyte)।



চিত্র 2.14—বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ।

(v) এরা বৃক্ষ বা গুল্ম জাতীয় বহুবর্ষজীবী চিরহরিৎ উদ্ভিদ।

(vi) এদের অধিকাংশের রেণুপত্রগুলি পুং ও স্ত্রী **রেণুপত্রমঞ্জরী** (Sporobilus) গঠন করে।

(vii) এদের পাতা দু'প্রকার—**সবুজ পর্ণপত্র** (foliage leaf) ও **শল্ক পত্র** (scale leaves)।

(viii) বীজে এক বা বহু বীজপত্র থাকে।

(ix) এরা স্থলজ উদ্ভিদ।

(x) এদের ফুলে প্রত্যক্ষ পরাগযোগ হয়।

(xi) নিষেকের পূর্বেই সস্য উৎপন্ন হয়।

● **উদাহরণ ঃ সাইকাস** (*Cycas*), **পাইনাস** (*Pinus*), **নিটাম** (*Gnetum*) প্রভৃতি (চিত্র 2.14)।

2. **বিভাগ ঃ গুপ্তবীজী** বা **আবৃতবীজী উদ্ভিদগোষ্ঠী** বা **অ্যানজিওস্পারমিয়া** (Angiospermia ; গ্রীক *Angeion* = আধার + *sperma* = বীজ) ঃ

● **গুপ্তবীজীর বৈশিষ্ট্য ঃ** (i) **এই গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদে ফল হয় এবং বীজগুলি স্বাভাবিকভাবে ফলের মধ্যে গুপ্ত** বা লুকানো থাকে। সেজন্য বীজগুলিকে বাইরে থেকে দেখা যায় না।

(ii) এদের প্রকৃত ফুল উৎপন্ন হয়—সেগুলি উভলিঙ্গ বা একলিঙ্গ।

(iii) বীজে একটি বা দুটি বীজপত্র থাকে।

(iv) এরা রেণুধর উদ্ভিদ বা **স্পোরোফাইট**।

(v) এদের দেহে উন্নত সংবহন কলা—জাইলেম ও ফ্লোয়েম বর্তমান।

(vi) এরা বৃক্ষ, গুল্ম বা বিরুৎ।

(vii) এরা বর্ষজীবী, দ্বিবর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী।

(viii) এখানে পরোক্ষ পরাগযোগ ঘটে।

(ix) নিষেকের পরে সস্য গঠিত হয়।

(x) এরা স্থলজ বা জলজ উদ্ভিদ।

বিভাগ অ্যানজিওস্পারমিয়া আবার দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী।

(i) **শ্রেণী—দ্বিবীজপত্রী** বা **ডাইকটিলেডনস** (Dicotyledons ; *Di* = দ্বি + *cotyledon* = বীজপত্র) ঃ

● **দ্বিবীজপত্রীর বৈশিষ্ট্য ঃ** (i) অ্যানজিওস্পারমিয়াভুক্ত যেসব উদ্ভিদের বীজে দুটি **বীজপত্র** বা **কটিলেডন** (Cotyledon) থাকে, তাদের ডাইকটিলেডনস বা দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ বলে।

(ii) প্রাথমিক মূল নষ্ট হয় না—মূল লম্বা এবং শাখা-প্রশাখাযুক্ত হয়।

(iii) কাণ্ড শাখা-প্রশাখাযুক্ত এবং নিরেট।

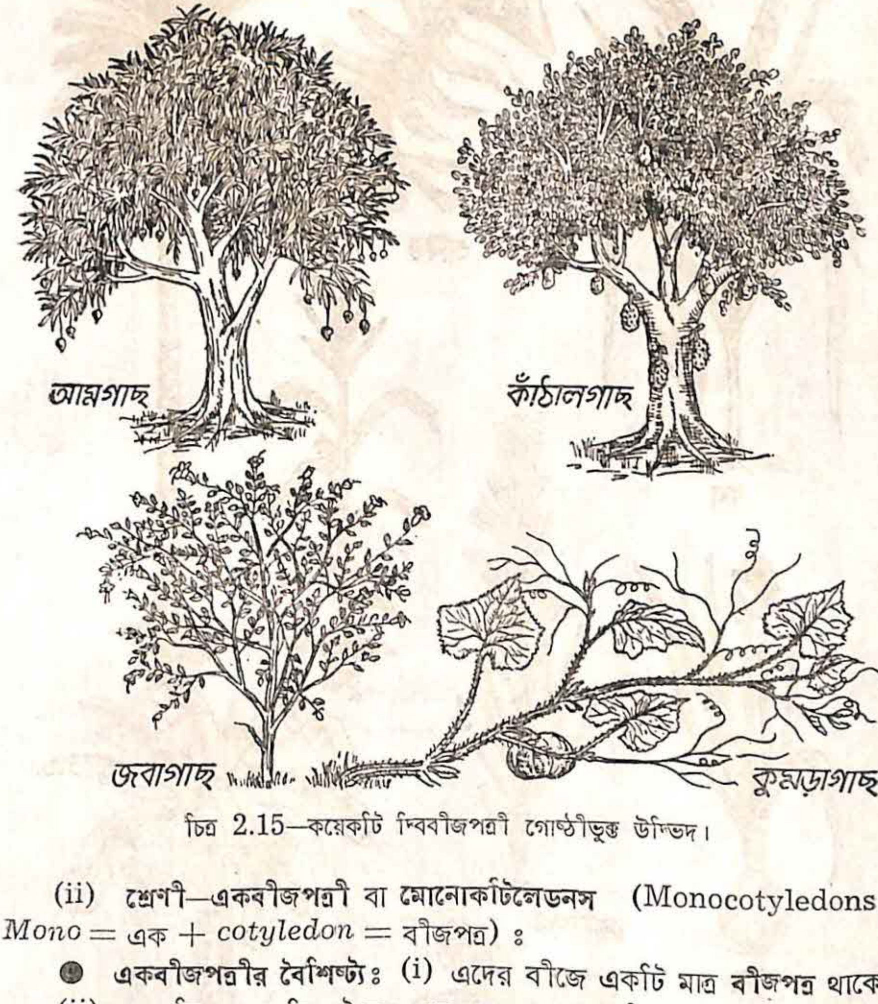
(iv) এরা বিরুৎ, গুল্ম বা বৃক্ষ।

(v) এদের পাতার শিরাবিন্যাস **জালিকাকার**।

(vi) কাণ্ডের নালিকা বাণ্ডিল **মুক্ত** (open) এবং বলয়াকারে সজ্জিত।

(vii) বীজের অঙ্কুরোদ্গম প্রধানত **মৃৎভেদী**।

● উদাহরণ ঃ ছোলা, রেড়ি, আম, কাঁঠাল, ডালিম, জবা, কুমড়া ইত্যাদি (চিত্র 2.25)।

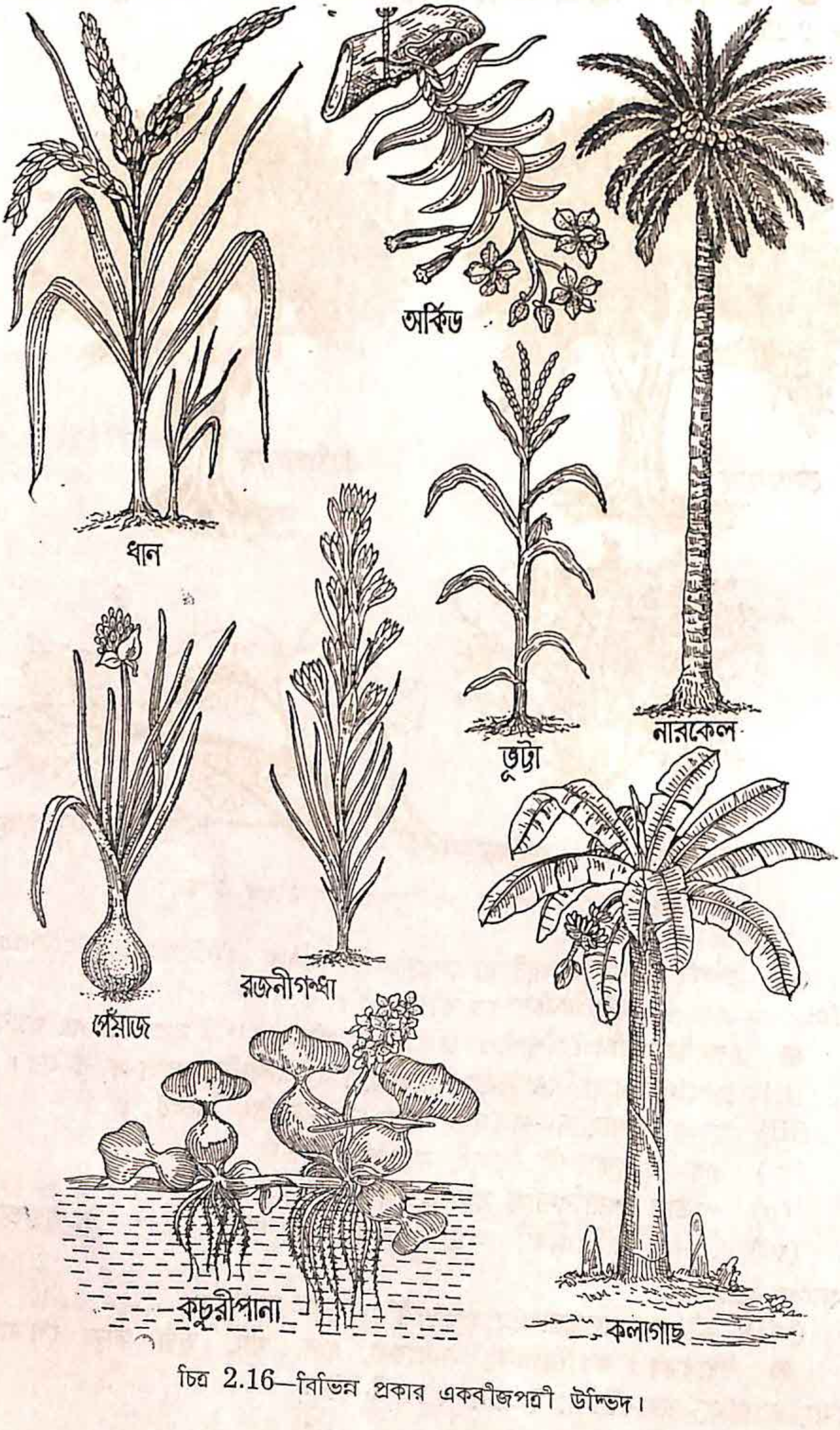


চিত্র 2.15—কয়েকটি দ্বিবীজপত্রী গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদ।

(ii) শ্রেণী—একবীজপত্রী বা মোনোকটিলেডনস (Monocotyledons ; $Mono$ = এক + $cotyledon$ = বীজপত্র) ঃ

● **একবীজপত্রীর বৈশিষ্ট্য ঃ** (i) এদের বীজে একটি মাত্র **বীজপত্র থাকে।**
(ii) প্রাথমিক মূল বিনষ্ট হয়—গুচ্ছমূল বা অস্থানিক মূল সৃষ্টি হয়।
(iii) কাণ্ড শাখাহীন—পর্বমধ্য ফাঁকা বা কদাচিৎ নিরেট ।
(iv) এরা অধিকাংশই বিরুৎ, কদাচিৎ বৃক্ষ।
(v) পাতার শিরাবিন্যাস **সমান্তরাল।**
(vi) এদের নালিকাবাণ্ডিলগুলি **বদ্ধ** (closed) এবং বিক্ষিপ্তভাবে বিন্যস্ত থাকে।
(vii) বীজের অঙ্কুরোদ্গম **মৃৎবতী** (hypogeel)।

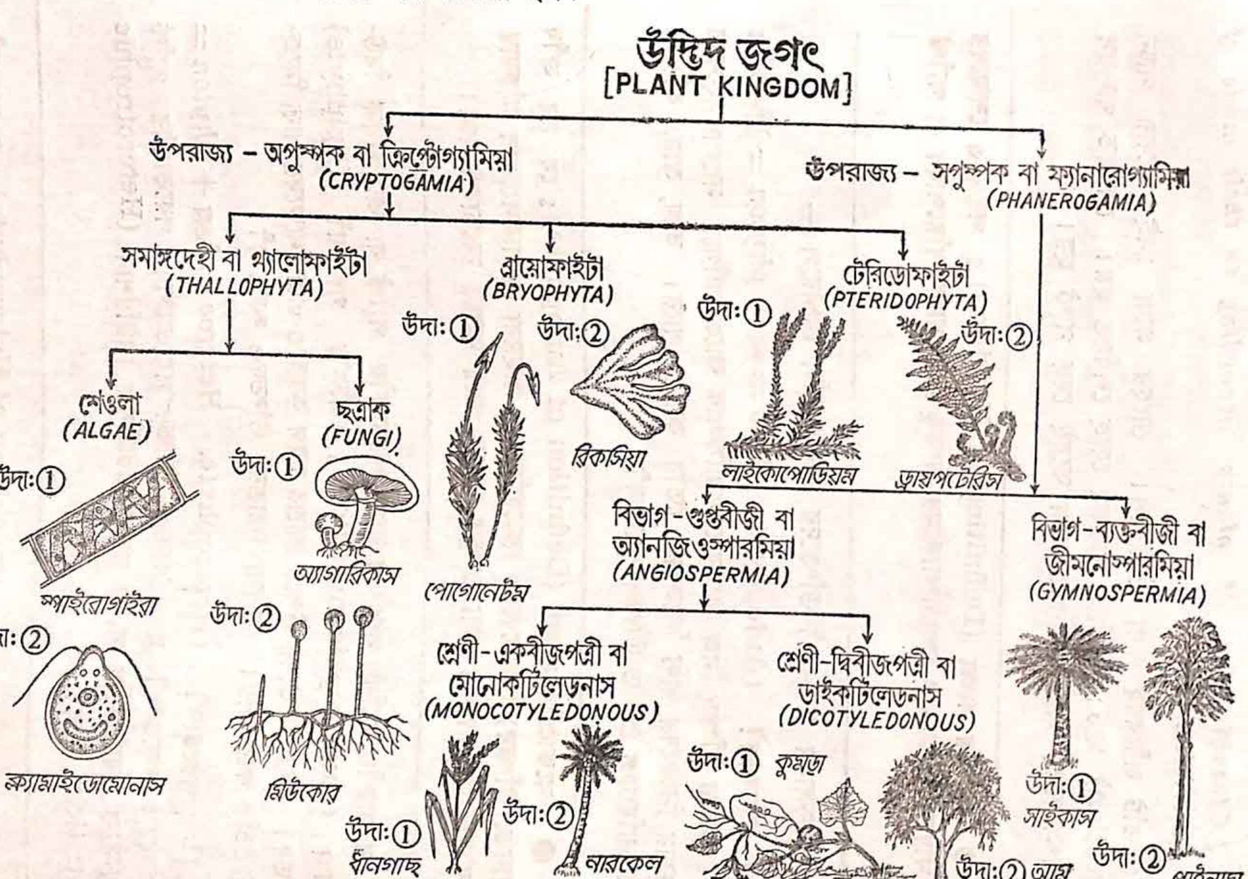
● **উদাহরণ ঃ কচুরিপানা, নারকেল, ধান, গম, ভুট্টা, তাল, পেঁয়াজ, কলা, অর্কিড্, রজনীগন্ধা** ইত্যাদি (চিত্র 2.16)।



চিত্র 2.16—বিভিন্ন প্রকার একবীজপত্রী উদ্ভিদ।

নীচে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের ছক দেওয়া হল।

৩



চিত্র 2.17—উদ্ভিদ জগতের চিত্রনির্ভর শ্রেণীবিভাগ।

2.7. পরিপোষণ বা পুষ্টি অনুসারে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ *[Classification of plants according to their mode of nutrition]* :

প্রতিটি জীবেরই খাদ্য প্রয়োজন। দেহের মধ্যে সেই খাদ্যের পাচন (digestion) ঘটে। পাচিত খাদ্যরস দেহে শোষিত হয়। শোষিত খাদ্যরস প্রোটোপ্লাজমের অংশে পরিণত হলে তবেই দেহ পুষ্ট হয়।

● **পুষ্টির সংজ্ঞা** (Definition of Nutrition) ঃ **পাচন ও শোষণের পর খাদ্যরসের দৈহিক প্রোটোপ্লাজমের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে পরিপোষণ বা পুষ্টি বলে।**

পুষ্টিসাধন অনুযায়ী উদ্ভিদের বিভাগগুলি নিম্নরূপ ঃ—

I. **স্বভোজী** (Autophyte, *Auto* = স্ব + *phyton* = উদ্ভিদ) ঃ এই গোষ্ঠীর উদ্ভিদ নিজ দেহের ক্লোরোফিলকে কাজে লাগিয়ে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে পারে। **আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, নারিকেল** প্রভৃতি উদ্ভিদ স্বভোজী।

● **স্বভোজীর সংজ্ঞা** (Definition of Autophyte) ঃ **যে সব জীব (প্রধানতঃ উদ্ভিদ) নিজ দেহের ক্লোরোফিলের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে তাদের স্বভোজী বলে।**

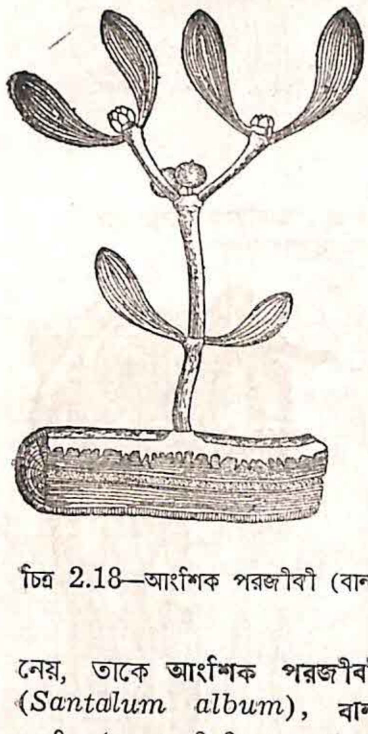
স্বভোজীর পুষ্টি পদ্ধতির নাম **স্বভোজীয় পুষ্টি** বা **অটোট্রফিক নিউ-ট্রিশান** (Autotrophic nutrition)। **অর্কিড পরাশ্রয়ী** (Epiphyte) উদ্ভিদ। অন্য উদ্ভিদের উপরে আশ্রয় গ্রহণ করলেও এরা নিজেদের খাদ্য নিজে-রাই তৈরি করে নেয়। সেজন্য পরাশ্রয়ী উদ্ভিদও স্বভোজী।

II. **পরভোজী** (Heterophyte, *Heteros* = ভিন্ন + *phyton* = উদ্ভিদ) ঃ স্বভোজী ছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদ পরভোজী। পরভোজীর পুষ্টি পদ্ধতিকে **পরভোজীয় পুষ্টি** বা **হেটারোট্রফিক নিউট্রিশান** (Heterotrophic nutrition) বলে।

● **পরভোজীর সংজ্ঞা** (Definition of Heterophyte) ঃ **যে সব জীব নিজ দেহে ক্লোরোফিল না থাকায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না এবং সেজন্য পরের উপর নির্ভর করে তাদের পরভোজী বলে।**

পরভোজী চার প্রকার ঃ—(i) **পরজীবী**, (ii) **মৃতজীবী**, (iii) **মিথোজীবী** এবং (iv) **পতঙ্গভুক উদ্ভিদ**।

(i) **পরজীবী** বা **প্যারাসাইট** (Parasite, *Parasitos* = পরের খাদ্য আত্মসাৎকারী + *phyton* = উদ্ভিদ) ঃ জীবন্ত কোন উদ্ভিদ দেহে **চোষক-মূল** বা **হস্টোরিয়া** (Sucking root or Haustoria) প্রবেশ করিয়ে আশ্রয়দাতার (Host) দেহ থেকে তৈরী খাদ্য শুষে নিয়ে যারা বেঁচে থাকে, তাদের পরজীবী বলে। যে পরজীবী আংশিকভাবে নিজের খাদ্য তৈরি করে



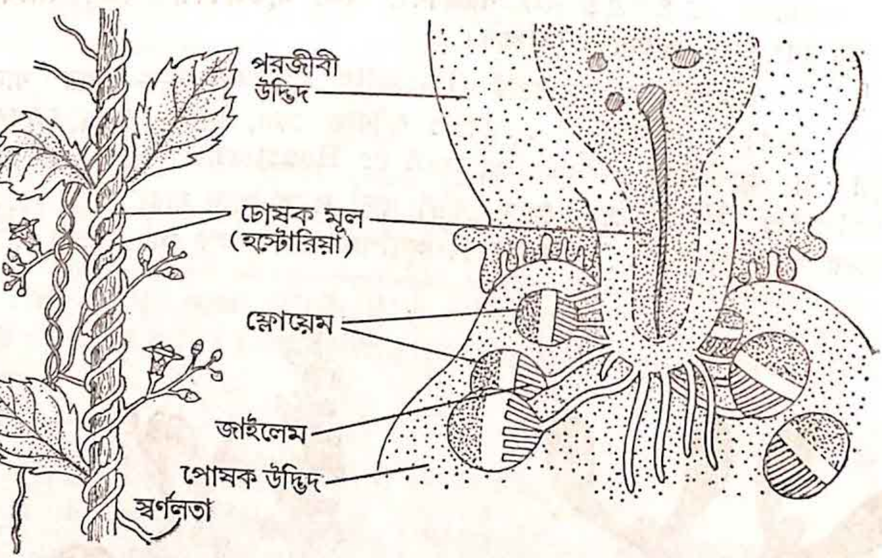
চিত্র 2.18—আংশিক পরজীবী (বান্দা)।



চিত্র 2.19—পূর্ণ পরজীবী (বেনে-বৌ)।

নেয়, তাকে **আংশিক পরজীবী** (partial parasite) বলে। যেমন—**চন্দন** (*Santalum album*), **বান্দা** (*Viscum*) (চিত্র 2.18)। সম্পূর্ণভাবে পরনির্ভর পরজীবীকে **পূর্ণ পরজীবী** (Total parasite) বলে। যেমন—**স্বর্ণলতা** (*Cuscuta*) (চিত্র 2.20), **বেনে-বৌ** (*Orobanche*) (চিত্র 2.19), **ব্যালানোফোরা** (*Balanophora*), **র‍্যাফ্লেসিয়া** (*Rafflesia*) (চিত্র 2.21) ইত্যাদি।

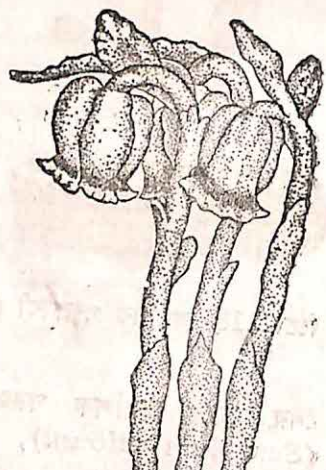
● **পরজীবীর সংজ্ঞা** (Definition of Parasite) ঃ **যে সব উদ্ভিদ জীবিত আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের দেহ থেকে খাদ্য ও পুষ্টিরস শোষণ করে পুষ্ট হয় তাদের পরজীবী বলে।**



চিত্র 2.20—বাঁদিকে—পূর্ণ পরজীবী উদ্ভিদ—স্বর্ণলতা ; ডানদিকে—প্রস্থচ্ছেদে পোষক উদ্ভিদ ও পরজীবী উদ্ভিদের চোষক মূলের সম্বন্ধ।



চিত্র 2.21—পূর্ণ পরজীবী ঃ
A—র‍্যাফ্লেসিয়ার মুকুল ; B—পরিণত ফুল।

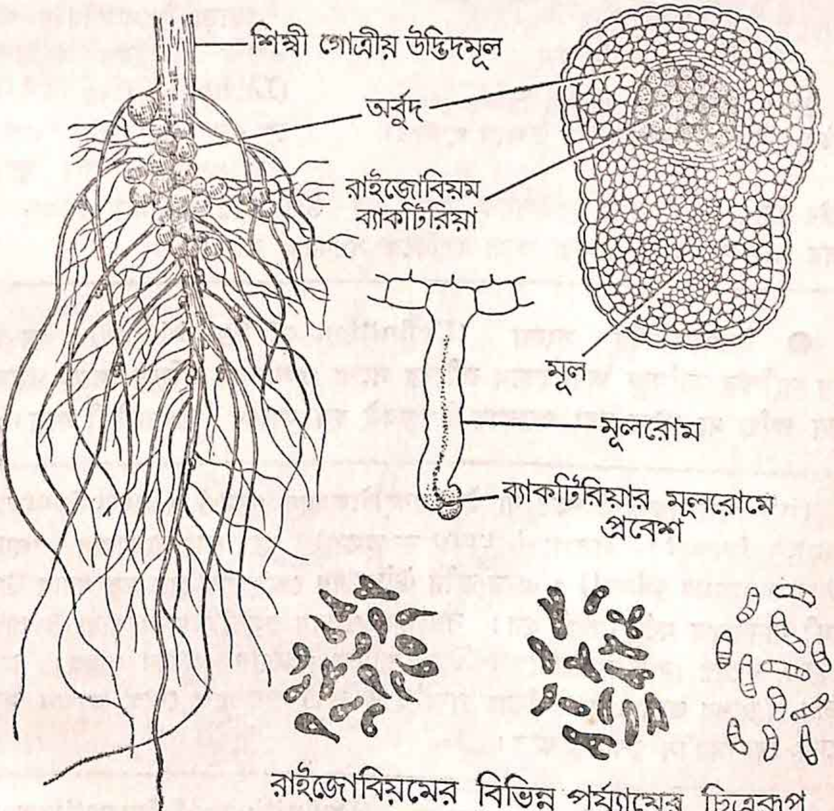


চিত্র 2.22—আংশিক মৃতজীবী মোনোট্রোপা।

(ii) মৃতজীবী বা স্যাপ্রোফাইট (Saprophyte, *Sapros* = গলিত + *phyton* = উদ্ভিদ) ঃ জীবদেহে অথবা গলিত উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহজাত

জৈব পদার্থের উপর যারা জন্মায় তাদের মৃতজীবী বলে। মৃতজীবীও আংশিক বা পূর্ণ হতে পারে। অধিকাংশ ছত্রাক, যেমন—অ্যাগারিকাস (ব্যাঙের ছাতা), পলিপোরাস, পেনিসিলিয়াম, মিউকোর, ঈস্ট প্রভৃতি পূর্ণ মৃতজীবী। পক্ষান্তরে, মোনোট্রোপা (*Monotropa*, চিত্র 2.22) নামে বিশেষ এক প্রকার সপুষ্পক উদ্ভিদ আংশিক মৃতজীবী।

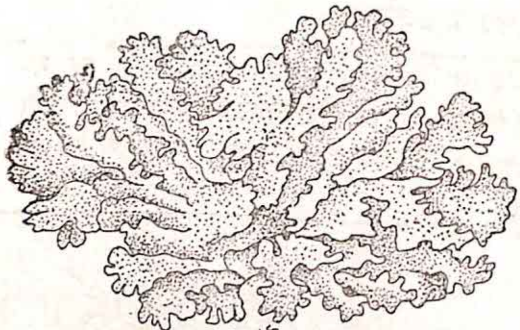
● মৃতজীবীর সংজ্ঞা (Definition of Saprophyte) : **যে সব ক্লোরোফিলবিহীন উদ্ভিদ পচা-গলা উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহাবশেষ অথবা ভিজা কাঠ, ভিজা চামড়া, জ্যাম, জেলি, গোবর প্রভৃতি জৈব পদার্থ থেকে পুষ্টিরস শোষণ করে তাদের মৃতজীবী বলে।**



চিত্র 2.23—শিম্বী গোত্রীয় উদ্ভিদে (মটর) রাইজোবিয়ম ব্যাকটিরিয়া দ্বারা অর্বুদ সৃষ্টি ; উপরে ডানদিকে মূলের অর্বুদযুক্ত অংশের প্রস্থচ্ছেদ।

(iii) **মিথোজীবী** বা **অন্যোন্যজীবী** বা **সিমবায়ণ্ট** (Symbiont, $Sym =$ একত্রে $+ \ bios =$ জীবন) : দুটি ভিন্ন জীব স্বভাবগতভাবে একে অপরের কোনরূপ অনিষ্ট না করে খাদ্যের জন্য একে অপরের দেহ-সংলগ্ন

থেকে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করলে তাদের মিথোজীবী বলে। **মটরগাছ ও রাইজোবিয়ম** (*Rhizobium*) **ব্যাকটিরিয়া** মিথোজীবীর দৃষ্টান্ত (চিত্র 2.23)। রাইজোবিয়ম নামক মিথোজীবী ব্যাকটিরিয়া মটরমূল (বা অন্যান্য শিম্বী গোত্রীয় উদ্ভিদমূলে) অর্বুদ (Nodule) সৃষ্টি করে। সেই অর্বুদে বায়ুর নাইট্রোজেন আবদ্ধ হয়। অর্বুদ মাটিতে মিশে সেখানে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য নাইট্রেটের মাত্রা বৃদ্ধি করে। মটরগাছ কার্বোহাইড্রেট সরবরাহ ক'রে ব্যাকটিরিয়ার কাছ থেকে নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্য সংগ্রহ করে।



চিত্র 2.24—শেওলা ও ছত্রাকের মিলিত প্রয়াসে গঠিত লাইকেন মিথোজীবীত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এছাড়া মিথোজীবীর আর একটি উদাহরণ **লাইকেন** (Lichen) (চিত্র 2.24)। শেওলা ও ছত্রাক একত্রে লাইকেন গঠন করে। ছত্রাক মাটির রস শোষণ ক'রে শেওলাকে দেয়—এই উপকারের বিনিময়ে শেওলা ঐ রসের সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত ক'রে ছত্রাককে সরবরাহ করে।

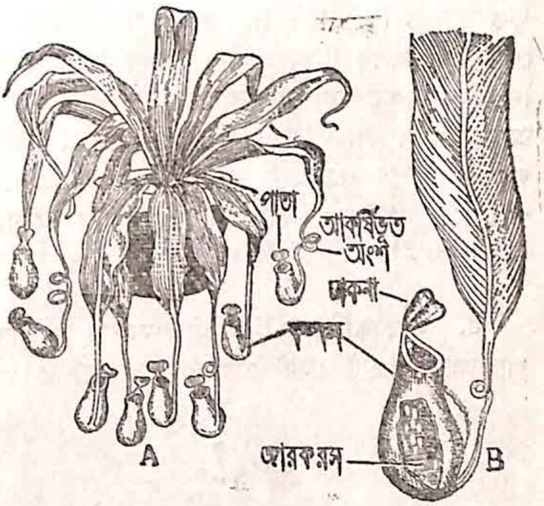
● **মিথোজীবীর সংজ্ঞা** (Definition of Symbionts) ঃ **যে-সব জীব পুষ্টির তাগিদে অন্য কোন জীবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত থেকে তাদের কোন ক্ষতি না ক'রে বরং পরস্পর উপকৃতই হয় তাদের মিথোজীবী বলে।**

(iv) **পতঙ্গভুক উদ্ভিদ বা ইন্‌সেক্‌টিভোরাস প্ল্যাণ্ট** (Insectivorous plant, *Insect* = পতঙ্গ + *voro* = ভক্ষণ) বা **কারনিভোরাস প্ল্যাণ্ট** (Carnivorous plant) ঃ এ-জাতীয় উদ্ভিদের দেহে পোকামাকড় ধরার উপযোগী নানারকম ফাঁদ তৈরী হয়। সালোকসংশ্লেষ দ্বারা শর্করা খাদ্য উৎপাদন করলেও, এদের দেহে নাইট্রোজেনঘটিত প্রোটিন খাদ্যের অভাব থাকে। সেই অভাব পূরণের জন্য এরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে কীট-পতঙ্গকে দেহে আবদ্ধ ক'রে তাদের দেহনির্যাস শোষণ করে।

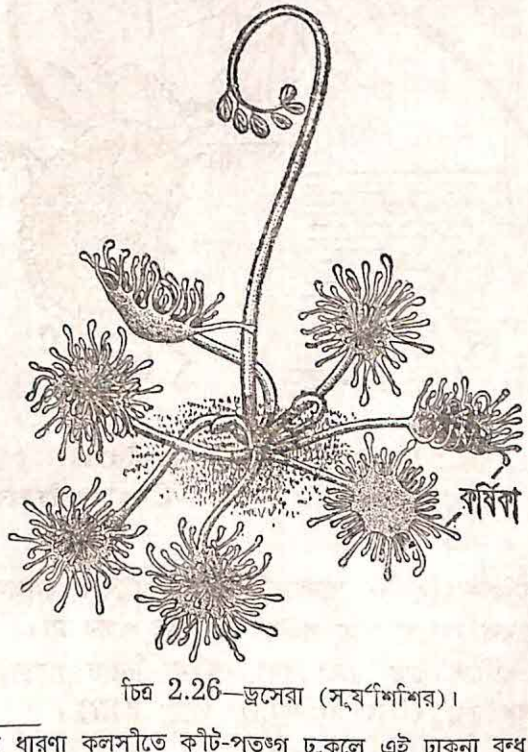
● **পতঙ্গভুক উদ্ভিদের সংজ্ঞা** (Definition of Insectivorous plants) ঃ **স্বভোজী হয়েও যে-সব উদ্ভিদ তাদের দেহে নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্যের অভাব পূরণের জন্য পোকামাকড় ধরে তাদের পতঙ্গভুক্ত উদ্ভিদ বলে।**

পতঙ্গভুক্ত উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রকারঃ—

1. **ঘটপত্রী** (Pitcher plant)ঃ ঘটপত্রী গাছের পাতার আগা রূপান্তরিত হয়ে কলসী গঠন করে। কলসীর মুখে একটি উজ্জ্বল ঢাকনা* থাকে। ঐ উজ্জ্বল ঢাকনার আকর্ষণে বহু দূর থেকে কীট-পতঙ্গ উড়ে আসে। কলসীর পিচ্ছিল কিনারায় বসামাত্র কীট-পতঙ্গ কলসীর ভিতরে পড়ে যায় এবং কলসীর মধ্যে সঞ্চিত জারক রসে ডুবে মরে। জারক রসের সাহায্যেই কীট-দেহের পরিপাক ঘটে এবং ঘটপত্রী সেই দেহ-নির্যাস শোষণ করে পুষ্ট হয়। উদাহরণঃ **নেপেনথিস** (*Nepenthes*) (**চিত্র 2.25**)।



চিত্র 2.25—নেপেনথিস ঃ A. ঘটপত্রী (গাছ) ; B. একটি বিবর্ধিত পাতা।

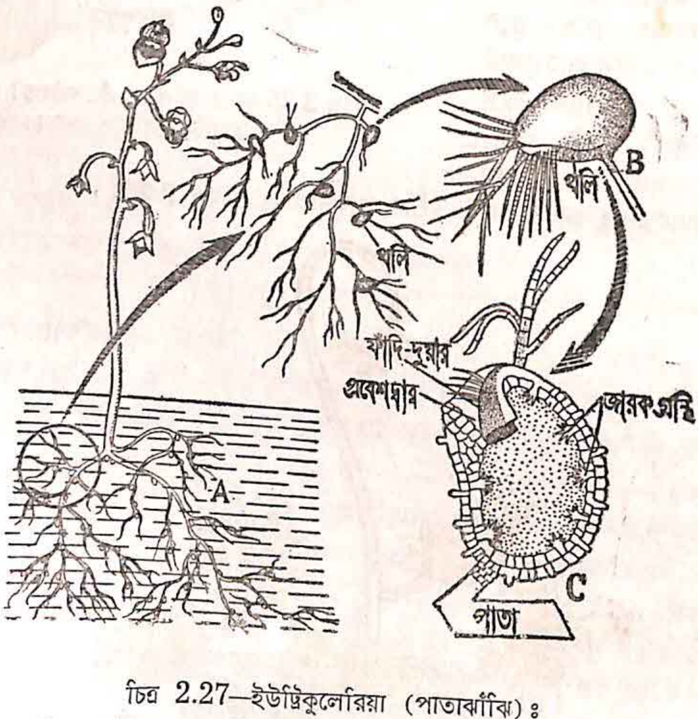


চিত্র 2.26—ড্রসেরা (সূর্যশিশির)।

* অনেকের ধারণা কলসীতে কীট-পতঙ্গ ঢুকলে এই ঢাকনা বন্ধ হয়ে যায়। এ-ধারণা ভুল। কীট-পতঙ্গকে আকৃষ্ট করা ছাড়া ঢাকনাটি অন্য কোন ভাবে ব্যবহৃত হয় না।

2. **সূর্যশিশির** (Sundew) ঃ সূর্যশিশির বিশেষ এক ধরনের পতঙ্গভুক উদ্ভিদ। এদের পাতার আকৃতি হাতের তালুর মতো। পাতার চারদিক থেকে আঙুলের মতো সাজানো কর্ষিকা বা টেনটাকল থাকে। কর্ষিকার আগায় নিঃসৃত একপ্রকার রস সূর্যের আলোয় ঝলমল করে। ঐ ঝলমলে রসের আকর্ষণে পতঙ্গ উড়ে এসে পাতায় বসে। বসামাত্র কর্ষিকাগুলি ভিতর দিকে গুটিয়ে গিয়ে পতঙ্গকে চেপে ধরে। ঘটপত্রীর মতো একইভাবে পতঙ্গের পরিপাক ঘটে ও তাদের দেহনির্যাস শোষিত হয়। উদাহরণ ঃ **ড্রসেরা** (*Drosera*) (চিত্র 2.26)।

3. **পাতাঝাঁঝি** (Bladderwort) ঃ পাতাঝাঁঝি জলে জন্মায়। এদের পাতাগুলি ছোট ছোট থলিতে রূপান্তরিত হয়। কীট-পতঙ্গের প্রবেশদ্বার,



চিত্র 2.27—ইউট্রিকুলেরিয়া (পাতাঝাঁঝি) ঃ
A—স্বাভাবিক পরিবেশে ; B—বিবর্ধিত থলি ; C—থলির ভিতরের অংশ।

অর্থাৎ থলিমুখে ফাঁদি-দুয়ার ও অন্তর্মুখী শল্ক থাকে। সেজন্য কীট-পতঙ্গ একবার ভেতরে প্রবেশ করলে আর বাইরে আসতে পারে না। সেখানে যথারীতি পতঙ্গ-দেহ পাচিত হয় এবং দেহনির্যাস নিয়ম মতো শোষিত হয়। উদাহরণ ঃ **ইউট্রিকুলেরিয়া** (*Utricularia*) (চিত্র 2.27)।

উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ

(পুষ্টিসাধন অনুযায়ী)

- স্বভোজী (Autophyte)
  - সাধারণ (General) যথা ঃ আম, জাম
  - পরাশ্রয়ী (Epiphyte) যথা ঃ অর্কিড
- পরভোজী (Heterophyte)
  - পরজীবী (Parasite)
    - পূর্ণ (Total) যথা ঃ স্বর্ণলতা
    - আংশিক (Partial) যথা ঃ চন্দন
  - মৃতজীবী (Saprophyte)
    - পূর্ণ (Total) যথা ঃ আগারিকাস
    - আংশিক (Partial) যথা ঃ মোনোট্রোপা
  - মিথোজীবী (Symbiont) যথা ঃ মটর গাছ ও রাইজোবিয়ম
  - পতঙ্গভুক (Insectivorous) যথা ঃ ঘটপত্রী, সূর্যশিশির, পাতাঝাঁঝি

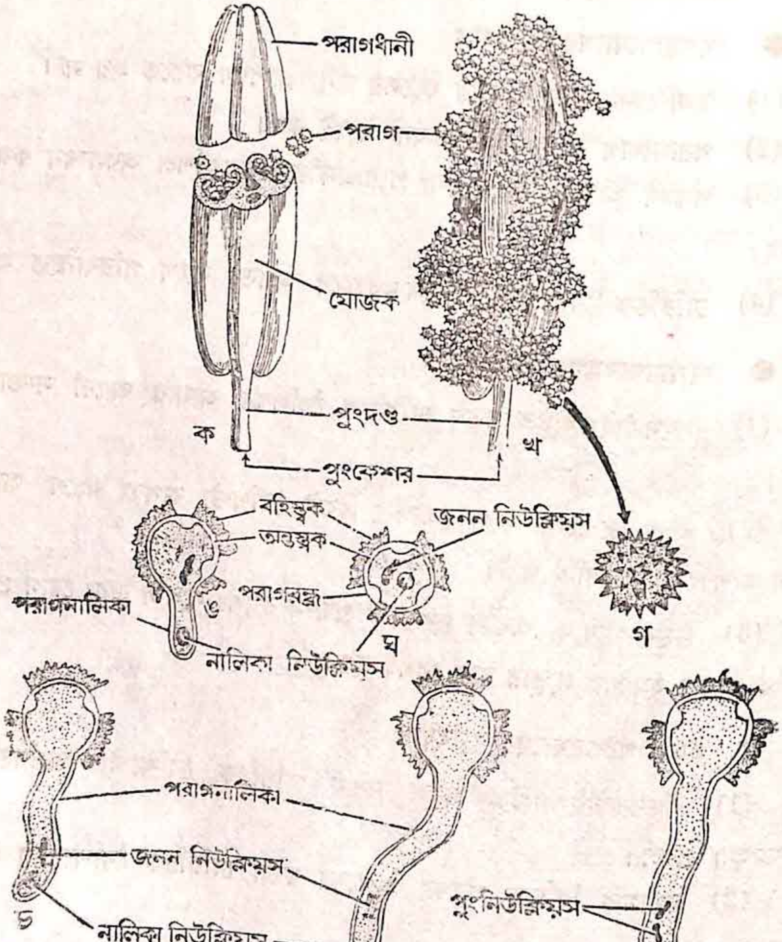
2.7A. স্বভোজী ও পরভোজীর পার্থক্য *[Differences between Autophyte and Heterophyte] :*

স্বভোজী (Autophyte)	**পরভোজী** (Heterophyte)
(1) সব সবুজ উদ্ভিদ (পরাশ্রয়ী সহ) স্বভোজী।	(1) পরজীবী, মৃতজীবী, মিথোজীবী ও আংশিকভাবে পতঙ্গভুক উদ্ভিদেরা পরভোজী।
(2) এদের দেহে ক্লোরোফিল বর্তমান।	(2) এদের দেহে ক্লোরোফিল নাই।
(3) ক্লোরোফিলের সাহায্যে এরা নিজ-দেহে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে—অর্থাৎ এরা স্বনির্ভর।	(3) পতঙ্গভুক উদ্ভিদ ছাড়া নিজদেহে ক্লোরোফিল না থাকায় এরা খাদ্য তৈরী করতে পারে না। খাদ্যের জন্য এরা স্বভোজীর উপর নির্ভরশীল।
(4) এরা প্রধানতঃ তরল ও গ্যাসীয় প্রকৃতির সরল ও অজৈব উপাদান সংগ্রহ ক'রে পুষ্ট হয়।	(4) এরা প্রধানত কঠিন ও তরল, জটিল খাদ্য গ্রহণ ক'রে পুষ্ট হয় (পরজীবীরা সরল খাদ্য গ্রহণ ক'রে পুষ্ট হয়)।
(5) এদের পুষ্টি পদ্ধতি হোলো-ফাইটিক।	(5) এদের পুষ্টি পদ্ধতি হেটারো-ফাইটিক।

(2) ইতর পরাগযোগ নানারূপ বাহকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সেজন্য পরাগযোগের নিশ্চয়তা কমে।

13.24. নিষেক বা গর্ভাধান [*Fertilization*]:

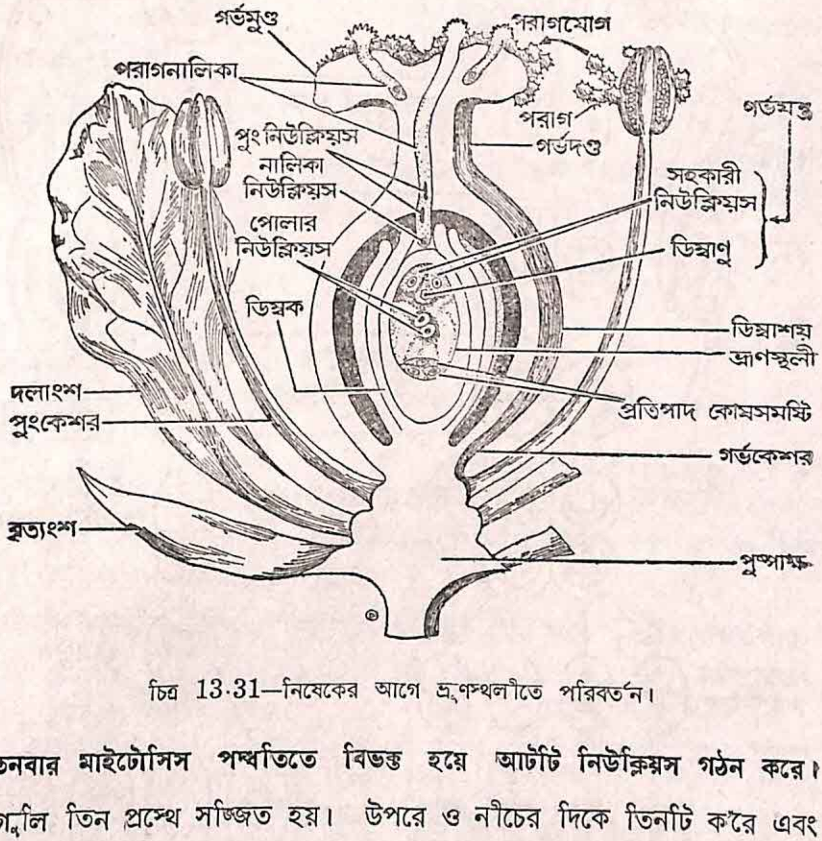
গর্ভমুণ্ডের সংস্পর্শে এসে পরাগ অংকুরিত হয় এবং পরাগনালিকা গঠন করে। পরাগনালিকা গর্ভদণ্ড ভেদ ক'রে প্রথমে ডিম্বাশয় ও পরে ডিম্বকে



চিত্র 13·30—নিষেকের আগে পরাগে পরিবর্তন।

পৌঁছায়। পরাগনালিকার আগায় থাকে একটি **নালিকা বা নালী নিউক্লিয়স** (Tube nucleus) এবং পিছনে থাকে লম্বা **জনন নিউক্লিয়স** (Generative

nucleus)। জনন নিউক্লিয়স থেকে দুটি **পুং-নিউক্লিয়স** বা **শুক্রাণু** (Sperm) উৎপন্ন হয়। এদিকে **ডিম্বক-মধ্যস্থ ভ্রূণস্থলীর নিউক্লিয়স পর পর**



চিত্র 13.31—নিষেকের আগে ভ্রূণস্থলীতে পরিবর্তন।

তিনবার মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়ে আটটি নিউক্লিয়স গঠন করে। এগুলি তিন প্রস্থে সজ্জিত হয়। উপরে ও নীচের দিকে তিনটি ক'রে এবং মধ্যে দুটি নিউক্লিয়স থাকে। 13.31 চিত্রে উপরের তিনটি নিউক্লিয়সের মধ্যে নীচেরটি **ডিম্বাণু** (Egg or Ovum)। **শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলনকে নিষেক বলে।** ডিম্বাণু-সংলগ্ন নিউক্লিয়স দুটিকে **সহকারী নিউক্লিয়স** বা **সাইনারজিডস** (Synergids) বলা হয়।

ভ্রূণস্থলীর মধ্যস্থলের নিউক্লিয়স দুটি হ'ল **পোলার নিউক্লিয়স** (Polar nucleus)। পোলার নিউক্লিয়স দুটি মিলিত হয়ে **সেকেন্ডারী** বা **নির্ণীত নিউক্লিয়স** (Secondary or definitive nucleus) গঠন করে।

33

2.7B. পরজীবী, মৃতজীবী ও মিথোজীবীর পার্থক্য *[Differences among Parasite, Saprophyte and Symbiont]* :

পরজীবী (Parasite)	মৃতজীবী (Saprophyte)	মিথোজীবী (Symbiont)
(1) পুষ্টির জন্য পরজীবী সজীব পোষকের উপরে নির্ভরশীল।	(1) পুষ্টির জন্য মৃত ও পচনশীল জৈব ও অজৈব পদার্থের উপরে নির্ভরশীল।	(1) পুষ্টির জন্য অঙ্গাঙ্গী জড়িত দুটি জীব পরস্পর নির্ভরশীল।
(2) পরজীবী পোষকের চরম ক্ষতি করে ও নিজেরা উপকৃত হয়।	(2) মৃতজীবী দ্বারা পোষকের ক্ষতির প্রশ্ন ওঠে না—কারণ এরা মৃত জৈব বা অজৈব পদার্থ শোষণ ক'রে পুষ্ট হয়।	(2) অঙ্গাঙ্গী জড়িত দুটি জীব পরস্পর কোন ক্ষতি না করে বরং উপকৃতই হয়।
(3) সজীব পোষকদেহ থেকে এরা সরল ও তরল খাদ্য শোষণ করে।	(3) এরা মৃত জৈব বা অজৈব পদার্থ থেকে জটিল বা অর্ধ জটিল পৌষ্টিক পদার্থ শোষণ করে।	(3) এরা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে সরল খাদ্য গ্রহণ করে।
(4) এদের পুষ্টি পদ্ধতির নাম পরজীবীয় পুষ্টি।	(4) এদের পুষ্টি পদ্ধতির নাম মৃতজীবীয় পুষ্টি।	(4) এদের পুষ্টি পদ্ধতির নাম মিথোজীবীয় পুষ্টি।
(5) উদাহরণ—স্বর্ণলতা, র‍্যাফ্লেসিয়া ইত্যাদি।	(5) উদাহরণ—বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক।	(5) রাইজোবিয়ম ব্যাকটিরিয়া ও শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদ মূল, লাইকেন ইত্যাদি।

2.7C. হোলোফাইটিক পুষ্টি ও হোলোজোয়িক পুষ্টির পার্থক্য *[Differences between Holyphytic nutrition and Holozoic nutrition]* :

হোলোফাইটিক পুষ্টি (Holophytic nutrition)	হোলোজোয়িক পুষ্টি (Holozoic nutrition)
(1) স্বভোজী উদ্ভিদদের পুষ্টি পদ্ধতিকে হোলোফাইটিক পুষ্টি বলে।	(1) পরভোজী প্রাণীদের পুষ্টি পদ্ধতিকে হোলোজোয়িক পুষ্টি বলে।
(2) এই পদ্ধতিতে সবুজ উদ্ভিদ নিজেরাই নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করে নেয়।	(2) এই পদ্ধতিতে খাদ্যের জন্য প্রাণীকে স্বভোজী উদ্ভিদের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করতে হয়।

হোলোফাইটিক পুষ্টি (Holophytic nutrition)	হোলোজোয়িক পুষ্টি (Holozoic nutrition)
(3) সংশ্লেষ ও আত্তীকরণ—এই দুটি পর্যায়ে এই পুষ্টি সম্পন্ন হয়।	(3) খাদ্যগ্রহণ, পাচন, খাদ্যরস শোষণ ও অপাচিত অংশের বর্জন—এই চারটি পর্যায়ে এই পুষ্টি সম্পন্ন হয়।
(4) এই পুষ্টি পদ্ধতিতে তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় সরল ও জৈব উপাদান গৃহীত হয়।	(4) এই পুষ্টি পদ্ধতিতে কঠিন ও তরল অবস্থায় জটিল খাদ্য গৃহীত হয়।

2.8. প্রাণিরাজ্য *[Animal Kingdom]* :

আমাদের এই পৃথিবী অগণিত প্রাণীর বাসভূমি। পৃথিবীর পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাণীদের গঠন, আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য চমকপ্রদ। এত বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার মধ্যেও কিছু কিছু প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, জৈব বিবর্তনের পথে এইসব প্রাণী নিগূঢ় সম্বন্ধে বাঁধা। একদিকে যেমন সংখ্যাতীত সহজ ও সরল-দেহী প্রাণী আছে, অন্যদিকে তেমনি অসংখ্য উন্নত জটিল-দেহী প্রাণী বর্তমান।

সরল থেকে ক্রমশঃ জটিল প্রাণীর দেহ-গঠন, আকৃতি-প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বা পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ করা হয়। চেনা, অচেনা সব প্রাণী নিয়েই **প্রাণিরাজ্য**। প্রাণী **এককোষী**[1] (Unicellular) বা **বহুকোষী** (Multicellular)। এককোষী প্রাণীদের **প্রোটোজোয়া** (Protozoa) **উপরাজ্য** (Sub-kingdom)-ভুক্ত এবং বহুকোষী প্রাণীদের **মেটাজোয়া** (Metazoa) উপরাজ্যভুক্ত প্রাণী বলা হয়।

---

[1] আজকাল প্রোটোজোয়া বা আদ্যপ্রাণীকে অনেকে কোষবিহীন (Acellular or Noncellular) প্রাণী বলেন। অবশ্য কোষ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণায়, টার্মটিকে খুব অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। তবে একটি বহুকোষী প্রাণী অনেকগুলি কোষের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি কোষ এক একটি নিউক্লিয়স দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং প্রতিটি কোষকে নির্দিষ্ট কাজই কেবল করতে হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, বাঁচার জন্য প্রোটোজোয়া বা আদ্যপ্রাণীর একটিমাত্র কোষকে সব কাজই করতে হয়। অর্থাৎ একটিমাত্র কোষ দ্বারা গঠিত দেহই বহুকোষী প্রাণীর (Metazoa) সামগ্রিক দেহের সংগে তুলনীয়। তাছাড়া, এককোষী প্রাণীকে অন্য কোন কোষের উপর নির্ভর করতে হয় না—তারা স্ব-নির্ভর। পক্ষান্তরে, বহুকোষী প্রাণীর কোষগুলি একে অন্যের উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এককভাবে তাদের পক্ষে বাঁচা মোটেই সম্ভব নয়। বিজ্ঞানী ডোবেল (Dobell) তাই প্রোটোজোয়া বা আদ্যপ্রাণীকে এককোষী প্রাণী না বলে কোষবিহীন প্রাণী বলতে চান। সেই অর্থে অ্যামিবা, মনোসিসটিস প্রভৃতি কোষবিহীন প্রাণী।

প্রাণিরাজ্য

A. উপরাজ্য প্রোটোজোয়া (এককোষী)
(Sub-kingdom Protozoa)

B. উপরাজ্য মেটাজোয়া (বহুকোষী)
(Sub-kingdom Metazoa)

এককোষী প্রাণী থেকেই কালক্রমে বহুকোষী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। প্রাণিরাজ্যকে কেবলমাত্র এককোষী ও বহুকোষী—এই দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করলে নানা অসুবিধা দেখা দেয়। তাই অগণিত প্রাণী সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান আহরণের জন্য পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রাণিরাজ্যকে বিশেষ কতকগুলি গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। বিশেষ বিশেষ কতকগুলি লক্ষণ দেখেই এই গোষ্ঠীভুক্তি সম্ভবপর। **একই আকৃতি, স্বভাব ও চরিত্রের প্রাণীগুলিকে এক একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকৃত সম্বন্ধ বিচার করে গোষ্ঠীভুক্ত করাই সঠিক বৈজ্ঞানিক রীতি।**

সম্বন্ধ বিচার করার সময় প্রাণিরাজ্যের বিপুল বৈচিত্র্য বিজ্ঞানীদের করেছে বিস্ময়-বিহ্বল। কোন কোন প্রাণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এমনই অদ্ভুত যে, সেখানে নিকটতম দুই গোষ্ঠীর প্রাণীর কিছু না কিছু চরিত্র বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান। এইসব নানা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, জৈব অভিব্যক্তির ক্রমানুসারে প্রাণিরাজ্য মোটামুটি **এগারোটি** প্রধান **ফাইলাম**[1] (Phylum) বা **পর্বে** বিভক্ত।

এখানে প্রধানতঃ **পার্কার ও হ্যাসওয়েল** (Parker and Haswell) প্রণীত এবং **মার্শাল ও উইলিয়ামস** (Marshall and Williams) সম্পাদিত (Text Book of Zoology, Vol. I, প্রকাশকাল 1962 এবং Vol. II, প্রকাশকাল 1972) পুস্তকে প্রকাশিত শ্রেণীবিভাগ অনুসৃত হ'ল।

1 একবচন, (ফাইলা Phyla, বহুবচন)।

প্রাণিরাজ্য
(Animal Kingdom)

উপরাজ্য—প্রোটোজোয়া (এককোষী প্রাণী)
(Sub-Kingdom)

↓

পর্ব 1. প্রোটোজোয়া
(Phylum) (Protozoa)

উপরাজ্য—মেটাজোয়া (বহুকোষী প্রাণী)

↓

বিভাগ—নন-কর্ডাটা
(Division) (Non-Chordata)
বা
ইনভার্টিব্রাটা (অমেরুদণ্ডী)
(Invertebrata)

↓

উপবিভাগ
(Sub-division)
প্যারাজোয়া
(Parazoa)

↓

পর্ব 2. পরিফেরা
(Phylum) (Porifera)

উপবিভাগ
(Sub-division)
এণ্টেরোজোয়া
(Enterozoa)

↓

পর্ব 3· নিডারিয়া (Cnidaria)
পর্ব 4. টিনোফোরা (Ctenophora)
পর্ব 5. প্ল্যাটিহেলমিনথিস (Platyhelminthes)
পর্ব 6· অ্যাস্কেলমিনথিস (Aschelminthes)
পর্ব 7· আনেলিডা (Annelida)
পর্ব 8· আর্থ্রোপডা (Arthropoda)
পর্ব 9· মলাস্কা (Mollusca)
পর্ব 10. একাইনোডারমাটা (Echinodermata)

কর্ডাটা
(Chordata)

↓

পর্ব 11. কর্ডাটা
(Phylum) (Chordata)

A. **উপরাজ্য—প্রোটোজোয়া** (Sub-kingdom Protozoa) :

প্রোটোজোয়া উপরাজ্যের অধীনে একটিমাত্র পর্ব। এই পর্বটিও প্রোটোজোয়া নামে পরিচিত। **এককোষী সমস্ত প্রাণীকেই প্রোটোজোয়া পর্বভুক্ত করা হয়।**

1. **ফাইলাম প্রোটোজোয়া*** বা **পর্ব** আদ্যপ্রাণী (Phylum Protozoa ; গ্রীক *protos* = প্রথম + *zoon* = প্রাণী) : [প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 30,000]

● **প্রোটোজোয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য :**

(1) **প্রাণিরাজ্যের সর্বাপেক্ষা সরল ও ক্ষুদ্রাকৃতি প্রাণিকুল।**

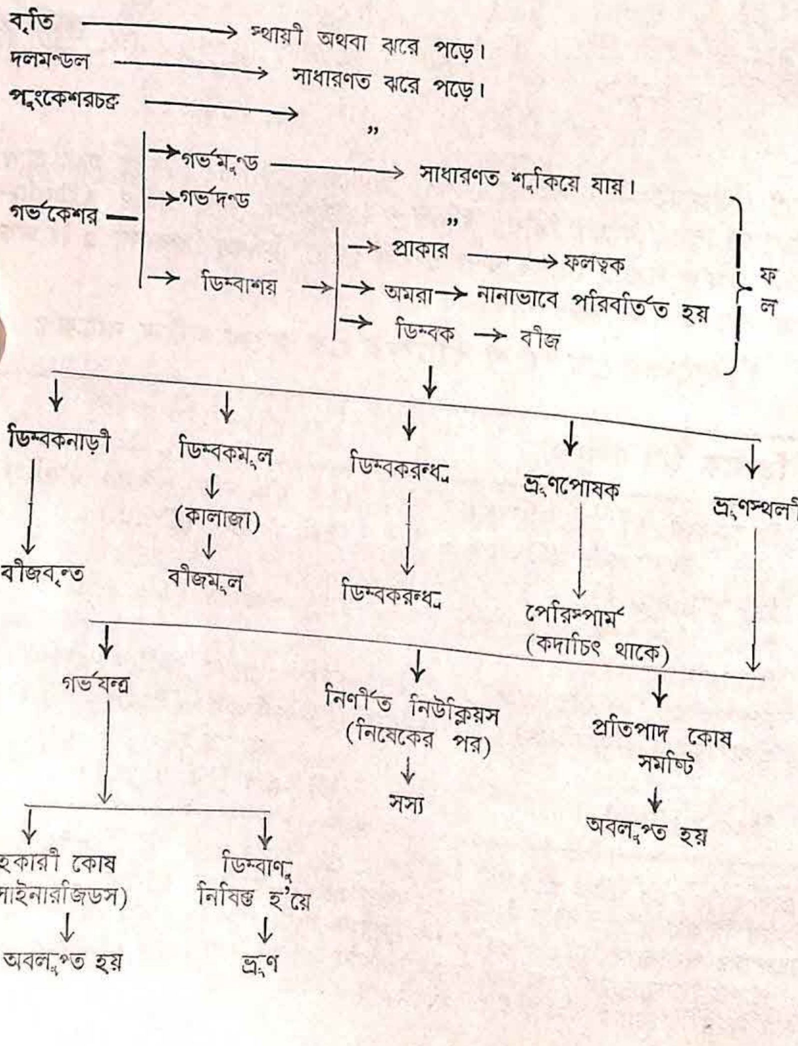
(2) **দেহ এককোষী** ; মাত্র একটি কোষই যাবতীয় প্রয়োজনীয় জৈবিক কাজ সম্পাদন করে।

* গোল্ডফাস (Goldfuss, 1822) সর্বপ্রথম প্রোটোজায়া শব্দটি ব্যবহার করেন। গ্রীক শব্দ Protos=প্রথম ও zoon=প্রাণী থেকে প্রোটোজোয়া নামকরণ করা হয়েছে।

13.27. ফুলের বিভিন্ন অংশের ফল ও বীজে রূপান্তর *[Transformation of different parts of a flower to different parts of fruit and seed]* :

বীজ ও ফল গঠন প্রকৃতপক্ষে একটি জটিল ও সময় সাপেক্ষ পদ্ধতি। ঐ সময় গাছের দৈহিক বৃদ্ধি পারতপক্ষে বন্ধ থাকে। বর্ষজীবী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফল ও বীজ হওয়ার অল্প সময় পরে গাছের মৃত্যু ঘটে, সেক্ষেত্রে ঐ ফল ও বীজই বংশপরম্পরায় গাছের অস্তিত্ব বজায় রাখার একমাত্র হাতিয়ার।

নীচের ছকে ফুলের কোন্ অংশ ফল ও বীজের কি কি অংশ গঠন করে তা দেখানো হ'ল ঃ—



13.28. জবাফুল ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি এবং এই ফুলের বিভিন্ন অংশ সাজাবার পদ্ধতি [*Procedure of dissection of Chinarose flower and method of display of its different parts*] :

(A) **প্রয়োজনীয় উপকরণ** (Requisites) ঃ

(1) একটি মোমযুক্ত ব্যবচ্ছেদ ট্রে (Dissecting tray)।
(2) একটি জবা ফুল (Chinarose flower)।
(3) একটি হাতলযুক্ত সোজা সূচ (Pointed needle)।
(4) একটি সমাবতল ক্ষুর (Plano-concave razor)।
(5) একটি কাচের স্লাইড (Glass slide)।
(6) একটি কভার স্লিপ (Cover slip)।
(7) একটি ওয়াচ গ্লাস (Watch glass)।
(8) একটি বুরুশ (Brush)।
(9) কয়েকটি আলপিন (Pin)।
(10) কয়েক টুকরো ব্লটিং পেপার।
(11) একটি সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Simple microscope)।

(B) **পদ্ধতি** (Procedure) ঃ

(1) একটি মোমযুক্ত, পরিষ্কার ও শুখনো ডিসকটিং ট্রে নেওয়া হল। ট্রের উপরে একটি বড় মাপের পরিষ্কার ব্লটিং পেপার বিছানো হ'ল এবং ব্লটিং পেপারের চার কোণায় চারটি আলপিন এমনভাবে মোমে গেঁথে দেওয়া হ'ল যাতে ব্লটিং পেপারটি টানটান থাকে। ব্লটিং পেপারে অল্প জল ছিটিয়ে দেওয়া হ'ল।

(2) এরপর বাঁহাতের তর্জনী, মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধৃত ফুল-টিকে বৃন্তের দিক থেকে প্রথমে বৃতিকে লম্বালম্বিভাবে এবং পরে বৃতির গোড়ার দিক বৃত্তাকারে এমনভাবে কাটা হ'ল যাতে দলমণ্ডলের কোন ক্ষতি না হয়।

(3) কর্তিত বৃতি অংশ সাবধানে ফুল থেকে পৃথক ক'রে এনে বৃতি-টিকে ছড়িয়ে দিয়ে তার অঙ্কদেশ ট্রের ব্লটিং পেপারের উপর রেখে আলপিন দিয়ে গেঁথে দেওয়া হ'ল।

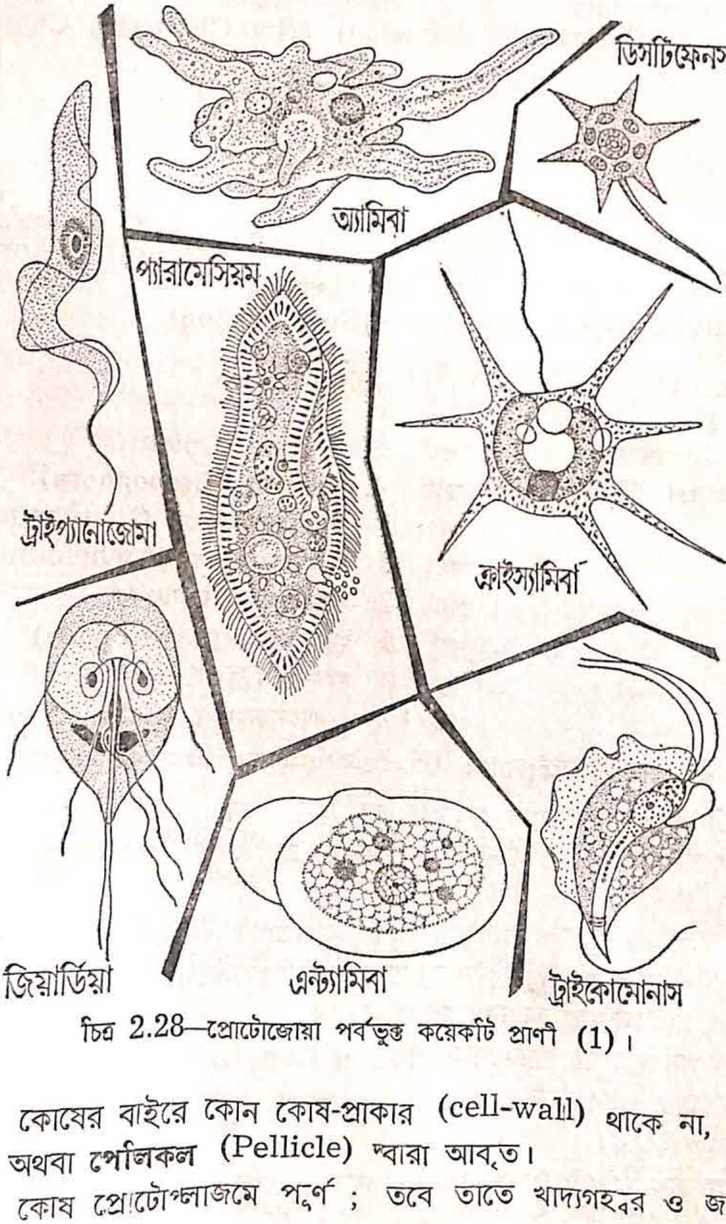
(4) এরপর ফুলের দলাংশগুলি সাবধানে ছাড়িয়ে একইভাবে ট্রের ব্লটিং পেপারের মাঝামাঝি সাজিয়ে আলপিন দিয়ে আটকে দেওয়া হ'ল।

(5) এবার বাঁহাতে ফুলের বৃন্তটিকে ধরে ব্যবচ্ছেদিত ফুলের বাকি অংশ টেবিলের উপর রাখা হ'ল। তারপর ডানহাতে হাতলযুক্ত একটি সোজা সূচ নিয়ে তার সাহায্যে ডিম্বাশয় ও গর্ভদণ্ড থেকে আঠালো পাতলা পর্দাটিকে ছাড়িয়ে নেওয়া হ'ল। এবার সেটিকে ব্লটিং পেপারের ডানদিকে রাখা হ'ল।

(3) কতকগুলি প্রোটোজোয়াভুক্ত প্রাণী দলবদ্ধভাবে উপনিবেশ গ'ড়ে বাস করে।

(4) প্রোটোজোয়া পর্বভুক্ত **অধিকাংশ** প্রাণীকে **খালি** চোখে দেখা যায় না। তাদের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়। এই কারণে এদের **আণুবীক্ষণিক প্রাণী** (Microscopic animal) বলা হয়।

(5) এদের দেহে এক বা **একাধিক নিউক্লিয়াস** থাকে।



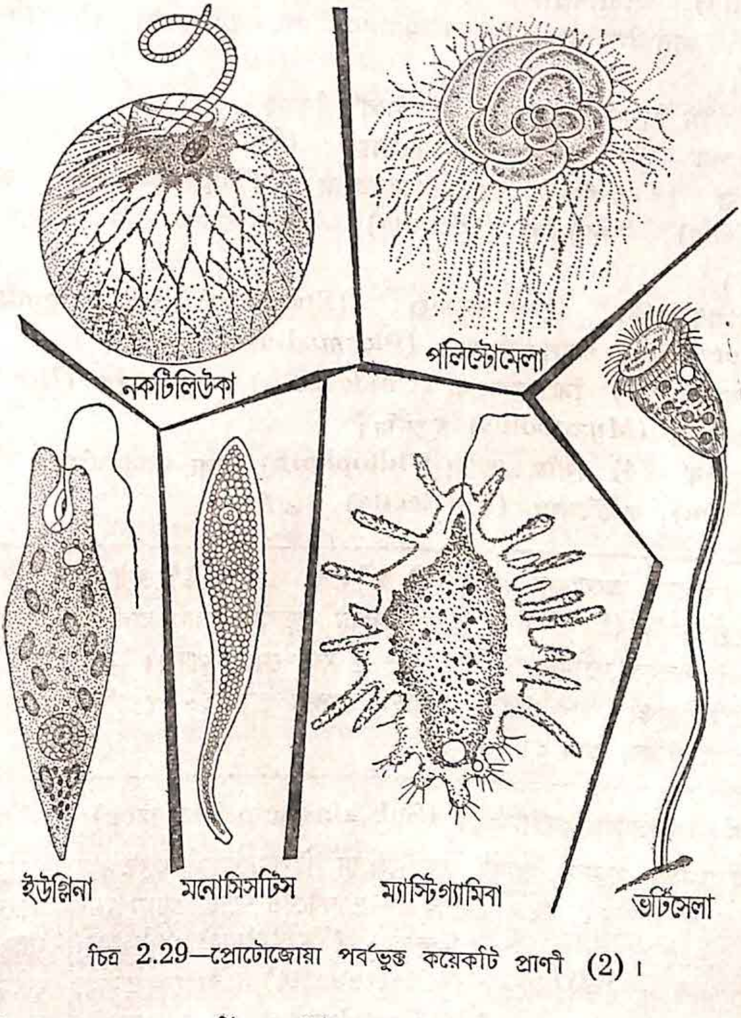
চিত্র 2.28—প্রোটোজোয়া পর্বভুক্ত কয়েকটি প্রাণী (1)।

(6) কোষের বাইরে কোন কোষ-প্রাকার (cell-wall) থাকে না, অর্থাৎ দেহ নগ্ন অথবা **পেলিকল** (Pellicle) দ্বারা আবৃত।

(7) কোষ প্রোটোপ্লাজমে পূর্ণ ; তবে তাতে খাদ্যগহ্বর ও জলগহ্বর দেখা যায়।

(8) সংকোচনশীল গহ্বর (Contractile vacuole) দ্বারা কোষদেহ থেকে দ্রবীভূত রেচনপদার্থ নিষ্কাশিত হয় ও দেহের জলসাম্য বজায় থাকে।

(9) প্রোটোপ্লাজম থেকে উৎপন্ন **ক্ষণপদ, ফ্ল্যাজেলা, সিলিয়া** প্রভৃতির সাহায্যে প্রাণী চলাফেরা করে। **স্পোরোজোয়া** (Sporozoa)-র কোন **চলন** অঙ্গ নাই।

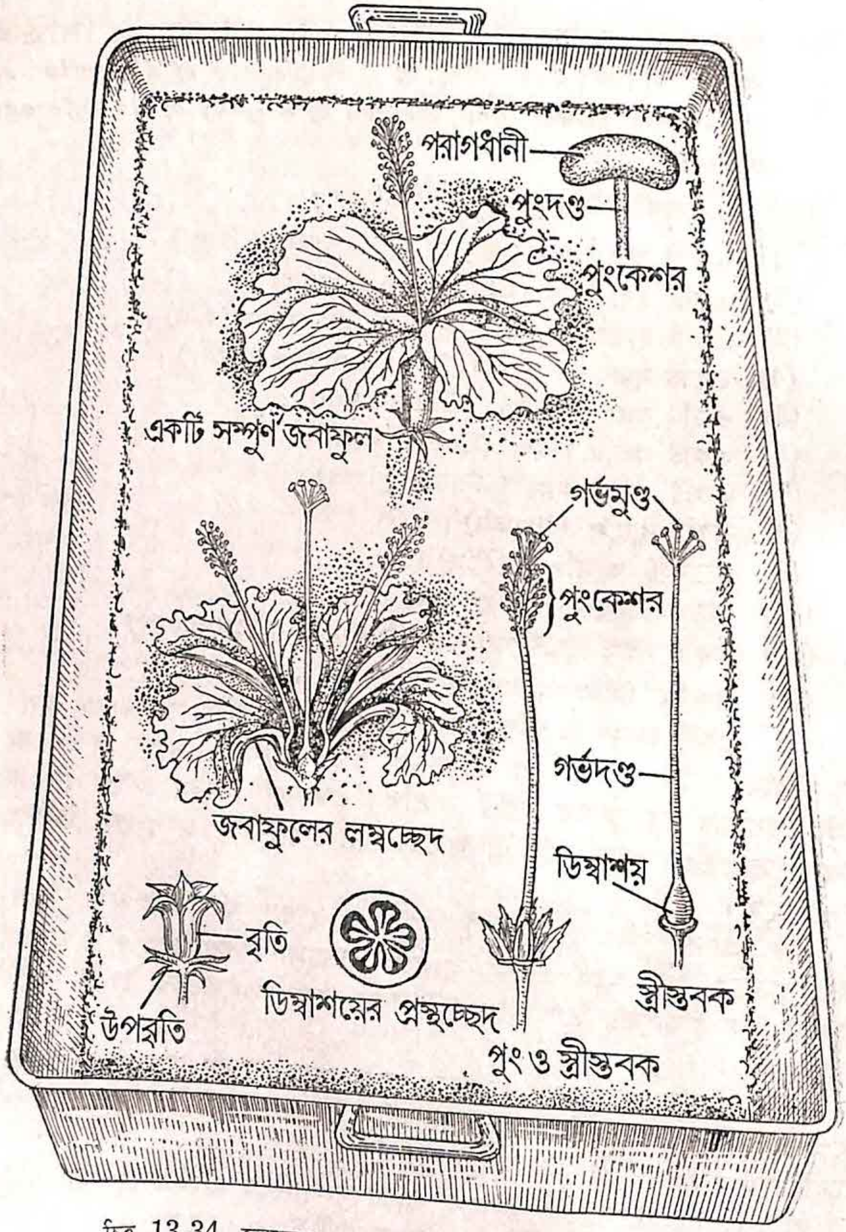


চিত্র 2.29—প্রোটোজোয়া পর্বভুক্ত কয়েকটি প্রাণী (2)।

(10) বাতাস, জল, মাটি—সর্বত্রই এদের দেখা যায়।

(11) এই পর্বভুক্ত প্রাণী **স্বাধীনজীবী, মিথোজীবী** বা **পরজীবী**।

(12) **অযৌন** বা **যৌন পদ্ধতিতে জনন** সম্পাদন করে। কোরকোদ্গম, দ্বিভাজন ও বহুভাজন প্রক্রিয়াগুলি অযৌন পদ্ধতি ; সংযোগ ও সংগম যৌন পদ্ধতি।



চিত্র 13·34—জবাফুল ও জবাফুলের ব্যবচ্ছেদিত বিভিন্ন অংশের সজ্জা পদ্ধতি।

● **সতর্কতা** (Precaution) ঃ ফুলের বিভিন্ন অংশ ব্যবচ্ছেদের সময় নীচের সতর্কতাগুলি অবশ্যই পালন করা দরকার ঃ—

(1) বৃতি থেকে বৃত্যংশগুলি যেন আলাদা না হয়।

(2) ডিম্বাশয় থেকে গর্ভদণ্ড যেন পৃথক না হয়।

● **ডিম্বাশয়ের প্রস্থচ্ছেদকরণ** (Section cutting of the ovary) ঃ

(1) প্রথমে ডিম্বাশয় থেকে গর্ভদণ্ডটিকে পৃথক করা হ'ল।

(2) এরপর বাঁহাতের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ফুলের গর্ভাশয়টিকে এমনভাবে ধরা হ'ল যাতে ডিম্বাশয়ের গর্ভদণ্ডের দিকে সামান্য অংশ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সামান্য উপরে থাকে।

(3) তারপর একটি ধারালো সমাবতল (Planoconcave) ক্ষুরের অবতল অংশ উপরের দিকে রেখে ক্ষুরটিকে এমনভাবে ধরা হ'ল যাতে ক্ষুরের হাতল এবং ফলাটি পরস্পরের সমকোণে বিন্যস্ত থাকে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি ফলা ও হাতলের সংযোগস্থলের সামনের দিকে এবং তর্জনী ও মধ্যমা খুরের হাতলের পিছনে থাকে।

(4) এবার ক্ষুরের ফলার উপরের দিকে দু'-এক ফোঁটা জল নিয়ে ক্ষুরটিকে সামনে-পিছনে চালনা করে ডিম্বাশয়ের বেশ কিছু প্রস্থচ্ছেদ নেওয়া হ'ল।

(5) প্রস্থচ্ছেদগুলি একটি ওয়াচ গ্লাসের জলে রাখা হ'ল।

● **সতর্কতা** (Precaution) ঃ

(1) প্রস্থচ্ছেদ নেবার সময় ক্ষুরটি যাতে অনুভূমিক তলে থাকে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়।

(2) প্রস্থচ্ছেদ সর্বদা একটানে কাটা দরকার—পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নয়।

(3) ছেদ সর্বদা সূক্ষ্ম, পাতলা ও সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

● **স্লাইডে প্রস্থচ্ছেদ মাউন্ট করার পদ্ধতি** (Procedure of mounting of cross sections) ঃ

(1) একটি স্লাইডের ঠিক মাঝখানে এক ফোঁটা গ্লিসারিন রাখা হ'ল।

(2) ওয়াচ গ্লাসের জলে ভাসমান সবচেয়ে পাতলা ও সর্বদিক থেকে ভাল একটি ছেদকে বুরুশের সাহায্যে তুলে স্লাইডের উপরে রাখা গ্লিসারিনের মধ্যে স্থাপন করা হ'ল।

(3) এবার বাঁ-হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী ও মধ্যমার সাহায্যে একটি কভার স্লিপ ধ'রে স্লাইডের মাঝখানে রাখা প্রস্থচ্ছেদের কাছাকাছি অবস্থিত গ্লিসারিনকে স্পর্শ করানো হ'ল। এবার কভার স্লিপের অন্য প্রান্ত হাত দিয়ে ধরে নিডলের সাহায্যে এমনভাবে ধরা হ'ল যাতে কভারস্লিপ স্লাইডের সঙ্গে 45° কোণে অবস্থান করে। এখন সূচটিকে ধীরে ধীরে এমনভাবে সরিয়ে

● **উদাহরণ ঃ** **অ্যামিবা** (*Amoeba*), **এণ্ট্যামিবা** (*Entamoeba*), **ক্রাইস্যামিবা** (*Chrysamoeba*), **ডিস্টিফেনস** (*Distephanus*), **ট্রাইকোমোনাস** (*Trichomonas*), **নকটিলিউকা** (*Noctiluca*), **ইউগ্লিনা** (*Euglena*), **ট্রাইপ্যানোজোমা** (*Trypanosoma*), **পলিস্টোমেলা** (*Polystomella*), **প্যারামেসিয়ম** (*Paramoecium*), **জিয়ার্ডিয়া** (*Giardia*), **মনোসিসটিস** (*Monocystis*), **প্লাসমোডিয়াম** (*Plasmodium*), **ম্যাস্টিগ্যামিবা** (*Mastigamoeba*), **ভর্টিসেলা** (*Vorticella*) ইত্যাদি।

[পর্বটি নিম্নলিখিত চারটি উপপর্বে* বিভক্ত ঃ

উপপর্ব—(1) **সার্কোম্যাসটিগোফোরা** (*Sarcomastigophora*)—যথা, **ইউগ্লিনা** (*Euglena*), **ট্রাইপ্যানোজোমা** (*Trypanosoma*), **অ্যামিবা** (*Amoeba*), **জিয়ার্ডিয়া** (*Giardia*), **ট্রাইকোমোনাস** (*Trichomonas*) ইত্যাদি।

উপপর্ব—(2) **স্পোরোজোয়া** (*Sporozoa*)—যথা, **মনোসিসটিস** (*Monocystis*), **প্লাসমোডিয়াম** (*Plasmodium*) ইত্যাদি।

উপপর্ব—(3) **নিডোস্পোরা** (*Cnidospora*)—যথা, **নসিমা** (*Nosema*), **মিক্সোবোলাস** (*Myxobolus*) ইত্যাদি।

উপপর্ব—(4) **সিলিওফোরা** (*Ciliophora*)—যথা, **প্যারামেসিয়ম** (*Paramoecium*), **ভর্টিসেলা** (*Vorticella*) ইত্যাদি।]

[বর্তমানে অনেকেই এককোষী জীবকে—তা সে উদ্ভিদই হ'ক বা প্রাণীই হ'ক—প্রোটিস্টা (Protista) নামে একটি বড় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলছেন। এদের প্রোটিস্ট (Protist)-ও বলা যেতে পারে। এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণী ছাড়া ব্যাকটিরিয়া, স্লাইম মোল্ড প্রভৃতিও প্রোটিস্টার অন্তর্গত জীব বলে উল্লেখ করা হয়।]

(B) **উপরাজ্য মেটাজোয়া** (Sub-kingdom Metazoa) ঃ

বহুকোষী সমস্ত প্রাণী মেটাজোয়া উপরাজ্যের অন্তর্গত। মেটাজোয়া দশটি পর্বে বিভক্ত। তবে বহুকোষী প্রাণীদের দুটি প্রধান ভাগ আছে। যে প্রাণীর দেহে **মেরুদণ্ড** বা **শিরদাঁড়া** (Vertebral column) নাই, তাকে **অমেরুদণ্ডী** বা **ইনভার্টিব্রেট** (Invertebrate) এবং যে প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড আছে, তাকে **মেরুদণ্ডী**† (Vertebrate) প্রাণী বলে।

---

* হনিগবার্গ ও সহযোগীদের (Honigberg et al, 1964) শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি অনুযায়ী।

† আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ডের পরিবর্তে শরীরের মধ্যে লম্বালম্বি বিস্তৃত একটি অস্থিদণ্ড (Skeletal rod) থাকে। এই দণ্ডকে নোটোকর্ড (Notocord) বলে।

2. **ফাইলাম পরিফেরা বা পর্ব ছিদ্রাল প্রাণী** (Phylum Porifera ; গ্রীক *Porus* = ছিদ্র + *ferre* = বহন করা) : [প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 5,000]

● **পরিফেরা পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য :**

(1) পরিফেরা পর্বভুক্ত প্রাণিদেহেই সর্বপ্রথম বহুকোষের আবির্ভাব ঘটেছে।

(2) কোন কোন প্রাণী উদ্ভিদের মতো শাখা-প্রশাখাযুক্ত।

(3) প্রতিটি শাখার প্রান্তস্থ ছিদ্রকে **অসকুলম** (Osculum) বলে।

(4) এই জলজ প্রাণীগুলির **অধিকাংশই সামুদ্রিক** ; এরা স্পঞ্জ নামে সর্বাধিক পরিচিত।

(5) **দেহাভ্যন্তরে অসংখ্য নালিকা দ্বারা গঠিত নালিকাতন্ত্র** (Canal system) **বর্তমান**। নালিকার মধ্যে দিয়েই জলস্রোতের মাধ্যমে খাদ্য ও অক্সিজেন পরিবেশিত হয়।

(6) বহির্গাত্রে অসংখ্য ছিদ্র বা **অস্টিয়া** (Ostia) থাকায়, এই প্রাণীগুলিকে **ছিদ্রাল প্রাণী** বলে।

(7) দেহের ভিতরে নলাকারে বিন্যস্ত লম্বা গহ্বরটি **প্যারাগ্যাসট্রিক গহ্বর** (Paragastric cavity) নামে পরিচিত।

(8) দেহের কাঠামো লাইম, সিলিকা অথবা **স্পনজিন** (Spongin) নামক পদার্থে গঠিত।

(9) দেহ-প্রাকারে **কোয়ানোসাইট** (Choanocyte) নামে ফ্লাজেলাযুক্ত বিশেষ এক প্রকার কোষ থাকে।

(10) এক বা বহু অক্ষযুক্ত **স্পিকিউল** (Spicule) দেহকে খাড়া রাখে।

(11) **দেহে কোন নার্ভ নাই,** প্রতিটি কোষ অনুভূতি বহন করে।

(12) **কোরকোদ্গম একটি অতি সাধারণ অযৌন জনন প্রক্রিয়া।** নিষেক নামক যৌন পদ্ধতিতেও জনন সম্পাদিত হয়।

(13) কোন না কোন বস্তুর সঙ্গে সংলগ্ন থাকে বলে, এই **প্রাণিগুলি চলাফেরা করতে পারে না।** স্পঞ্জের এটি একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পুকুর, ডোবা এবং মিঠা জলে স্পঞ্জিলা নামে স্পঞ্জ* দেখা যায়।

● উদাহরণ : সাইকন (*Sycon*), স্পঞ্জিলা (*Spongilla*), ইউস্পঞ্জিলা (*Euspongilla*), হিস্পোস্পঞ্জিয়া (*Hispospongia*), স্যামোক্লিমা (*Psammoclema*), ক্ল্যাথরিনা (*Clathrina*), পোটেরিয়ন (*Poterion*) ইত্যাদি।

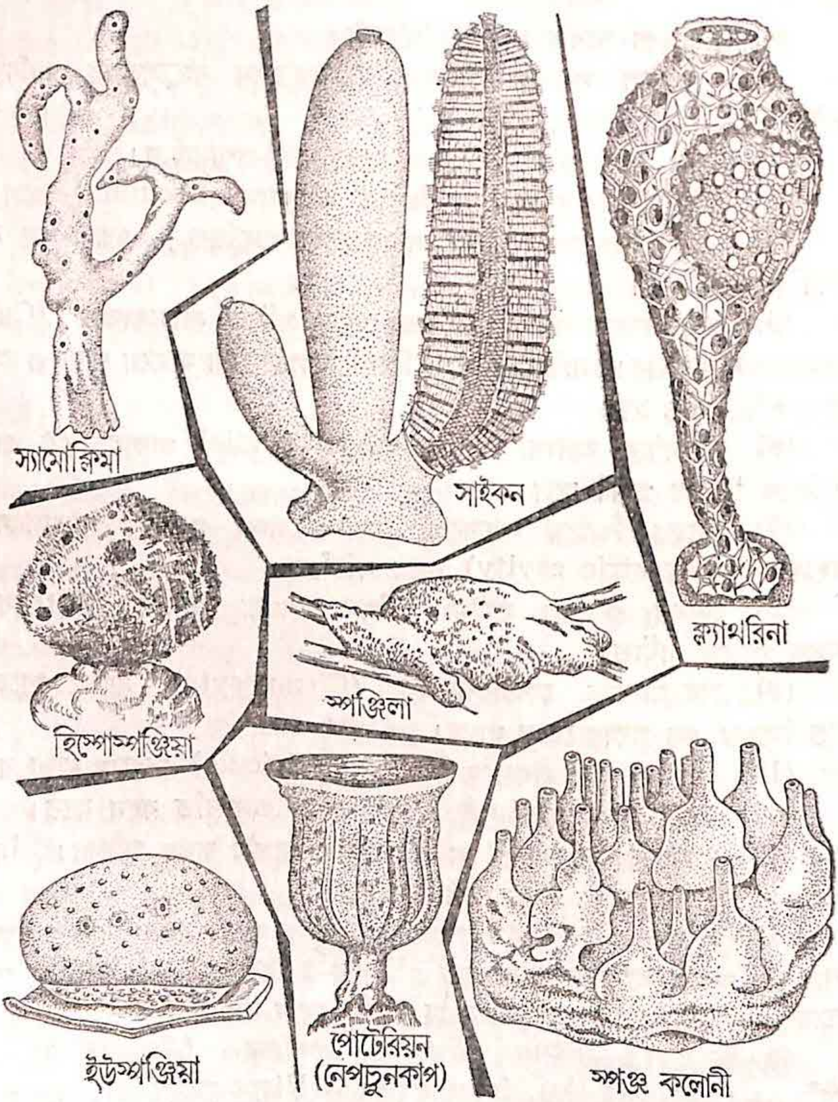
[পরিফেরা নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত :

ক. **ক্যালকেরিয়া** (Calcaria)—যথা সাইকন, ক্ল্যাথরিনা (*Clathrina*)।

---

* এই পর্বভুক্ত কয়েকটি প্রজাতি থেকে বাথস্পঞ্জ (Bath sponge) উৎপন্ন হয় ; সুতরাং এদের অর্থনৈতিক গুরুত্বও কম নয়।

খ. হেক্সাক্‌টিনেলিডা (*Hexactinellida*)—যথা, গ্লাসস্পঞ্জ।
গ. ডিমোস্পঞ্জি (*Demospongiae*)--যথা, স্পঞ্জিলা, ইউস্পঞ্জিলা।]



চিত্র 2.30—পরিফেরা পর্বভুক্ত কয়েকটি প্রাণী।

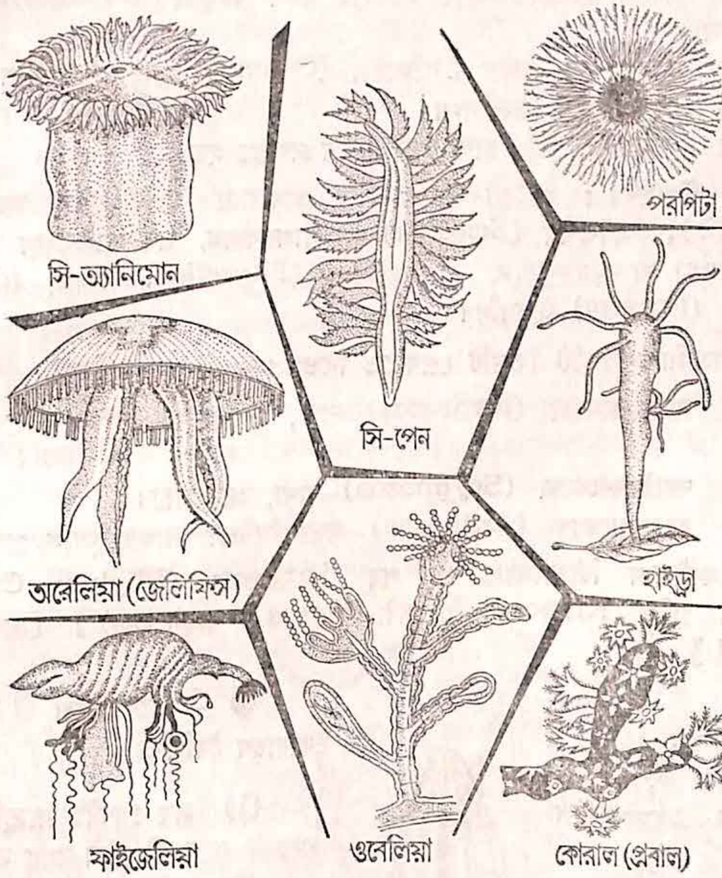
3. **ফাইলাম নিডারিয়া বা পর্ব নিডারিয়া** (Phylum Cnidaria ; গ্রীক *Knide* = কাঁটা) ঃ [প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 10,080]

● **নিডারিয়া পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ**

(1) পর্বভুক্ত প্রায় সমস্ত প্রাণী (হাইড্রা ছাড়া) **সমুদ্রবাসী**।

(2) পরিণত প্রাণীর দেহ **অরীয়-সুষম** (Radially symmetrical)।

(3) দেহে একটি মাত্র নালী থাকে, নালীটিকে **সিলেনটেরন** (Coelenteron) বা **গ্যাসট্রোভ্যাসকুলার গহ্বর** (Gastrovascular cavity) বলে। দেহে অন্য কোন পৃথক খাদ্যনালী নাই।



চিত্র 2.31—নিডারিয়া পর্বভুক্ত কয়েকটি প্রাণী।

(4) দেহে একটিমাত্র স্থায়ী ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রটিকে মুখ বলে। **মুখই পায়ুছিদ্রের কাজ করে**; পৃথক পায়ু নাই।

(5) মুখকে ঘিরে **টেনটাকল** বা **কর্ষিকা** (Tentacle) বর্তমান।

(6) দেহ-প্রাকার দুটি স্তরে বিন্যস্ত কোষগুচ্ছ দ্বারা গঠিত। বাইরের স্তরটি **এক্টোডার্ম** (Ectoderm) এবং ভিতরেরটি **এণ্ডোডার্ম** (Endoderm)। এই দুই স্তরের মধ্যে জেলির মতো বিশেষ পদার্থটিকে **মেসোগ্লিয়া** (Mesoglea) বলে। কোষগুলি দুটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে। সেজন্য এই পর্বভুক্ত প্রাণীদের **দ্বি-স্তরবিশিষ্ট প্রাণী** (Diploblastic animal) বলে।

(7) এক্টোডার্মে বিন্যস্ত শিকার ধরার উপযোগী কোষগুলিকে **নিমাটোসিস্ট** (Nematocyst) বলে।

(8) পরিণত প্রাণীদেহের আকার দু'প্রকার। নলাকার দেহ **পলিপ** (Polyp)—যেমন হাইড্রা ; এবং ছত্রাকার দেহ **মেডুসা** (Medusa)—যেমন জেলিফিস।

(9) একাকী বা একত্রে **উপনিবেশ** (Colony) রচনা ক'রে বাস করে।

(10) একলিঙ্গ বা উভলিঙ্গ।

(11) অযৌন ও যৌন পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন হয়।

● **উদাহরণ ঃ হাইড্রা** (*Hydra*), **ওবেলিয়া** (*Obelia*), **অরেলিয়া** (*Aurelia*), **সী-পেন** (*Sea-Pen*) বা **সাগরকলম, সী-অ্যানিমোন** (*Sea-anemone*) বা **সাগরকুসুম, ফাইজেলিয়া** (*Physalia*), **প্রবাল** (*Coral*) **পর্পিটা** (*Porpita*) ইত্যাদি।

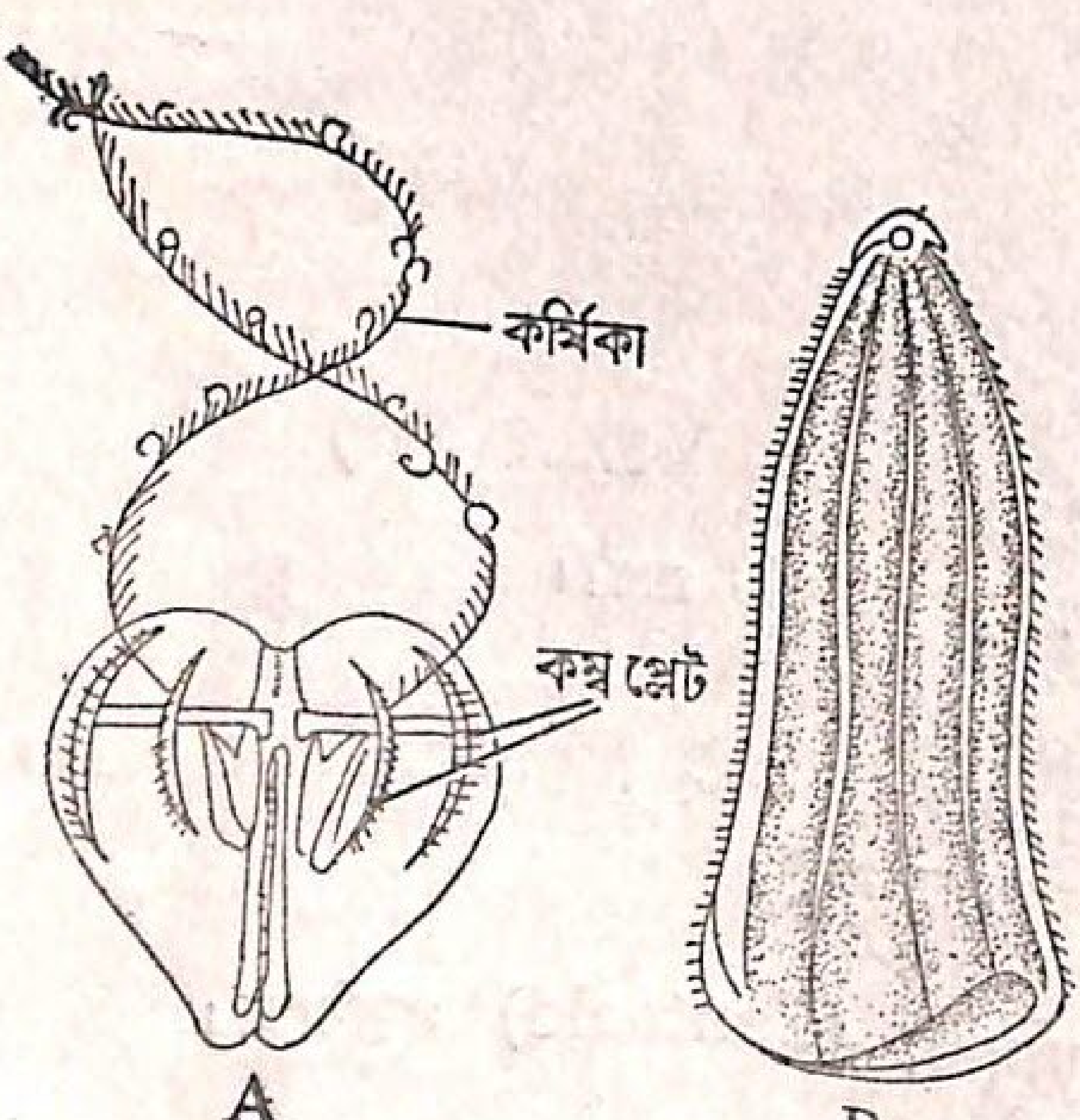
[নিডারিয়া পর্বটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ—

(1) **হাইড্রোজোয়া** (Hydrozoa)—যথা, হাইড্রা, ওবেলিয়া, ফাইজেলিয়া ইত্যাদি।

(2) **স্কাইফোজোয়া** (Scyphozoa)—যথা, অরেলিয়া।

(3) **অ্যান্থোজোয়া** (Anthozoa)—যথা, বিভিন্ন সাগর কুসুম, প্রবাল।]

4. **ফাইলাম টিনোফোরা** বা **পর্ব টিনোফোরা** (Phylum Ctenophora ; গ্রীক *Ktenos* = চিরুনী, *Phoros* = ধারণ করা) ঃ [প্রজাতির সংখ্যা 81]



চিত্র 2.32—টিনোফোরা পর্বভুক্ত প্রাণী ঃ
A—হর্মিফোরা ; B—বেরো।

● **টিনোফোরা পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ**

(1) সব প্রাণীই সামুদ্রিক—কখনই কলোনী গঠন করে না।

(2) পলিপদশা থাকে না, এদের বৈশিষ্ট্য কেবল পরিণত প্রাণীতে বা ভ্রূণে দেখা যায়।

(3) দেহকলা তিন স্তরে বিন্যস্ত।

(4) দেহত্বকে **নিডোব্লাস্ট** কোষ নাই।

(5) সিলিয়ার সাহায্যে চলাফেরা করে। সিলিয়াগুলি একত্রে চিরুনী প্লেট (কম্ব প্লেট) গঠন করে।

(6) কর্ষিকা থাকলে তাদের সংখ্যা দুই। প্রতিটি কর্ষিকা সংকুচিত হ'য়ে একটি থলির মধ্যে গুটিয়ে থাকতে পারে।

(7) মুখছিদ্রের বিপরীত প্রান্তে (aboral end) একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (sense organ) বর্তমান।

(8) স্ত্রী ও পুরুষ জননঅংগ একই প্রাণীতে থাকে, অর্থাৎ প্রাণী উভলিংগ।

(9) জীবনচক্রে জনুক্রম নেই।

(10) কোথাও কোথাও রূপান্তর (metamorphosis) লক্ষ্য করা যায়।

● **উদাহরণ ঃ হর্মিফোরা** (*Hormiphora*), বেরো (*Beroe*) (চিত্র 2.32), **প্লিউরোব্রাকিয়া** (*Pleurobrachia*) ইত্যাদি।

[টিনোফোরা পর্বটি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ—

(1) **টেন্টাকুলাটা** (Tentaculata)—যথা, হর্মিফোরা।

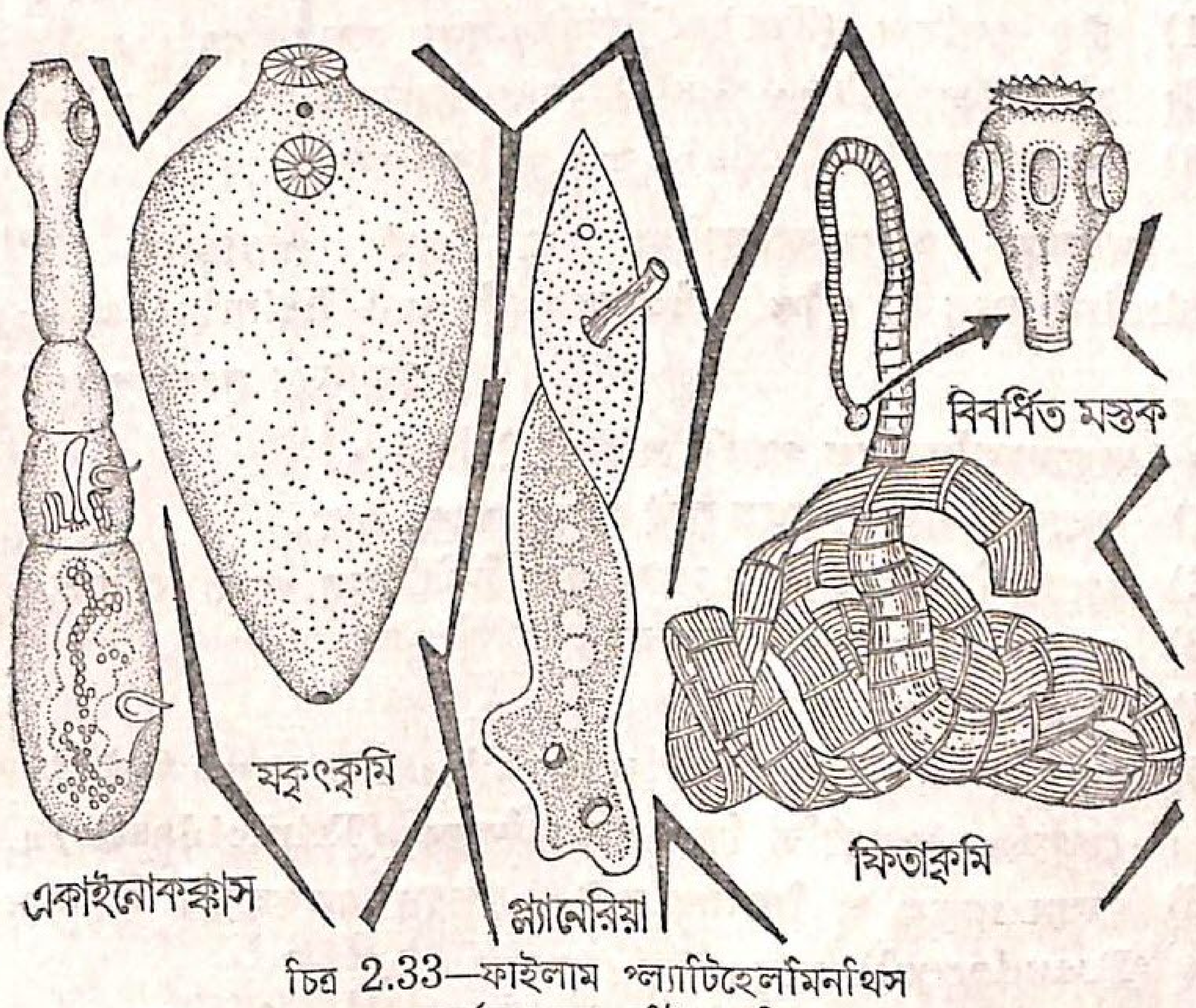
(2) **নুডা** (Nuda)—যথা, বেরো।]

5. **ফাইলাম প্ল্যাটিহেলমিনথিস বা পর্ব চ্যাপ্টাক্রমি** (Phylum Platyhelminthes ; গ্রীক *Platys* = চ্যাপ্টা, *helminthes* = ক্রমি) ঃ

[প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 10,000]

● **এই পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ**

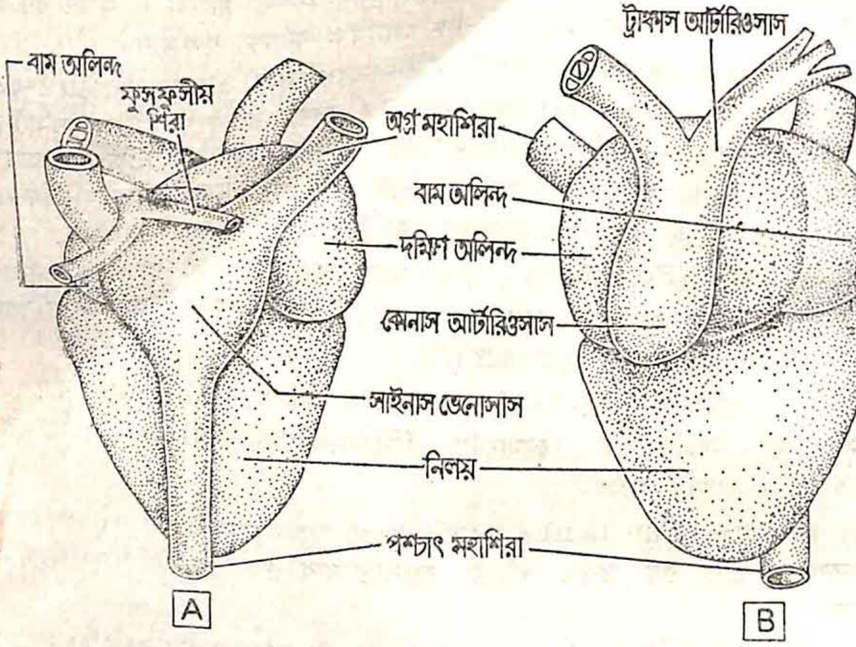
(1) **দেহ ফিতার মতো** লম্বা এবং ওপর থেকে নীচের দিকে ক্রমশঃ চ্যাপ্টা।



চিত্র 2.33—ফাইলাম প্ল্যাটিহেলমিনথিস পর্বভুক্ত কয়েকটি প্রাণী।

(2) দেহ সমদ্বিপার্শ্বীয়।

প্রকোষ্ঠ। একটি **সাইনাস ভেনোসাস** (Sinus venosus) ও একটি **কোনাস আর্টারিওসাস** (Conus arteriosus) হ'ল আনুষঙ্গিক প্রকোষ্ঠ।



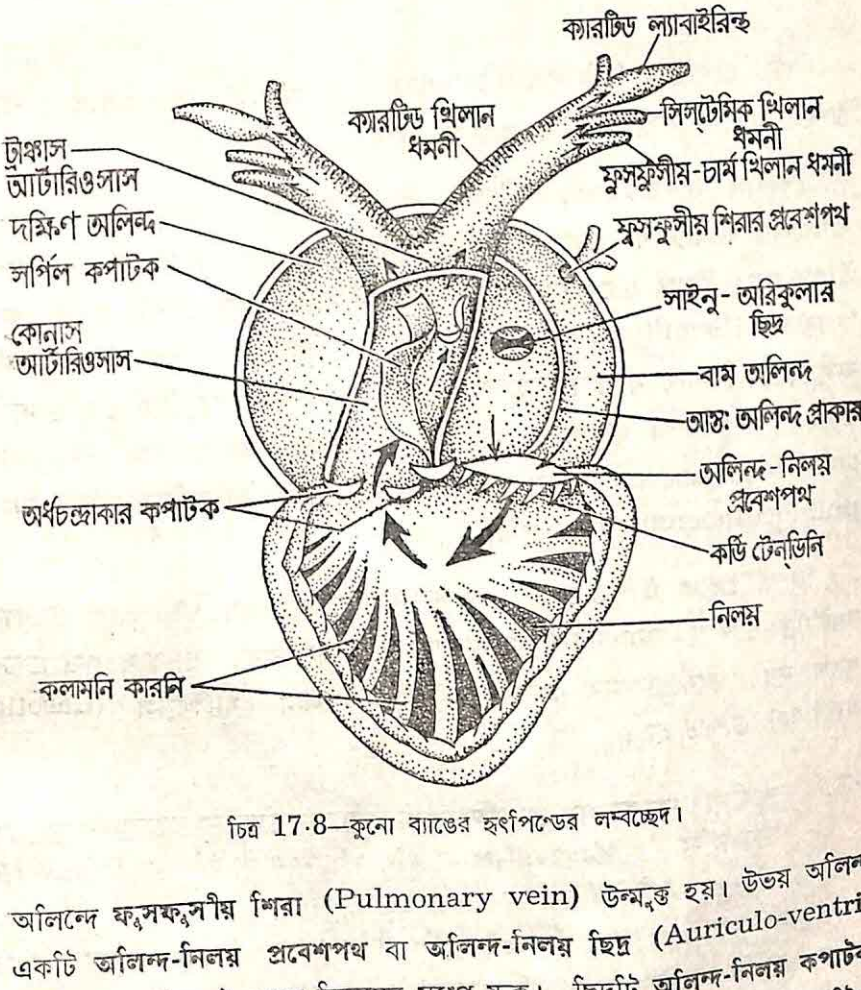
চিত্র 17·7—ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের বহিরাকৃতি ঃ
A—অঙ্কদৃশ্য ; B—পৃষ্ঠদৃশ্য।

সাইনাস ভেনোসাস (Sinus venosus) ঃ কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত ত্রিকোণাকার থলির মতো অঙ্গটি সাইনাস ভেনোসাস। দুটি **অগ্র মহাশিরা** (Pre caval veins) ও একটি **পশ্চাৎ মহাশিরা** (Post caval vein)-র মিলনে সাইনাস ভেনোসাস গঠিত হয়। সাইনাস ভেনোসাস প্রকৃতপক্ষে একটি **গ্রাহক প্রকোষ্ঠ** (Receiving chamber)। দুটি অগ্র মহাশিরা ও একটি পশ্চাৎ মহাশিরা মাধ্যমে কুনো ব্যাঙের সর্বাঙ্গ থেকে দূষিত রক্ত সাইনাস ভেনোসাসে আসে।

সাইনাস ভেনোসাস **সাইনু-অরিকুলার ছিদ্র** (Sinu-auricular aperture) দ্বারা দক্ষিণ অলিন্দের সঙ্গে যুক্ত। ছিদ্রটি **সাইনু-অরিকুলার কপাটক** (Sinu-auricular valve) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই ছিদ্রপথেই সাইনাস ভেনোসাস থেকে রক্ত দক্ষিণ অলিন্দে নেমে আসে।

অলিন্দ (Auricles) ঃ কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডে অলিন্দের সংখ্যা দুই—একটি **দক্ষিণ অলিন্দ** (Right auricle) ও অন্যটি **বাম অলিন্দ** (Left

auricle)। দক্ষিণ অলিন্দটি অপেক্ষাকৃত বড়। অলিন্দ দু'টি আন্তঃ অলিন্দ প্রাকার (Inter-auricular septum) দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পৃথক থাকে। বাম

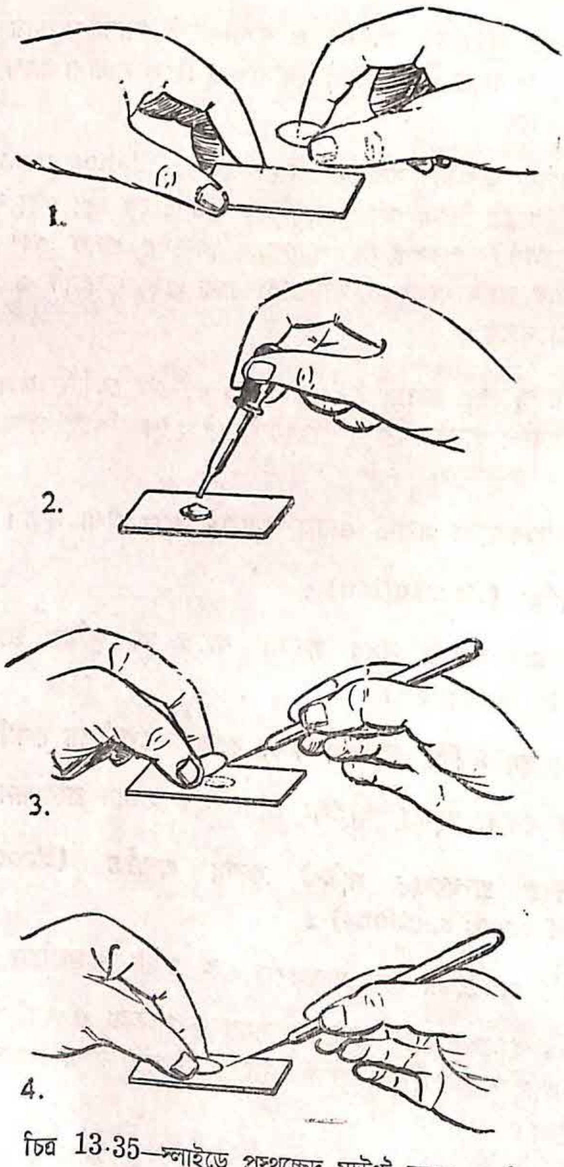


চিত্র 17·8—কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ।

অলিন্দে ফুসফুসীয় শিরা (Pulmonary vein) উন্মুক্ত হয়। উভয় অলিন্দ একটি অলিন্দ-নিলয় প্রবেশপথ বা অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র (Auriculo-ventricular aperture) দ্বারা নিলয়ের সঙ্গে যুক্ত। ছিদ্রটি অলিন্দ-নিলয় কপাটক (Auriculo-ventricular valve) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অলিন্দ দু'টিও প্রকৃতপক্ষে হৃৎপিণ্ডের গ্রাহক প্রকোষ্ঠ।

নিলয় (Ventricle) ঃ ত্রিকোণাকার ও পুরু পেশীবহুল নিলয়টি একটি **অবিভক্ত প্রেরক প্রকোষ্ঠ** (Forwarding chamber)। **করোনারী সালকাস** (Coronary sulcus) নামক একটি আড়াআড়ি ভাঁজ থাকার জন্য বাইরে থেকে অলিন্দ দু'টিকে নিলয় থেকে পৃথক করা যায়। নিলয়ের মধ্যে নিলয়ের অন্তঃ-

নেওয়া হ'ল যাতে কভার স্লিপের মাঝখানে ছেদটি থাকে এবং সেটি সম্পূর্ণ-ভাবে কভার স্লিপ দ্বারা ঢাকা পড়ে।



চিত্র 13.35—স্লাইডে প্রস্থচ্ছেদ মাউণ্ট করার পদ্ধতি।

(4) কভার স্লিপের বাইরে গড়িয়ে আসা অতিরিক্ত **গ্লিসারিন ব্লটিং** পেপারের সাহায্যে শুষে নেওয়া হ'ল।

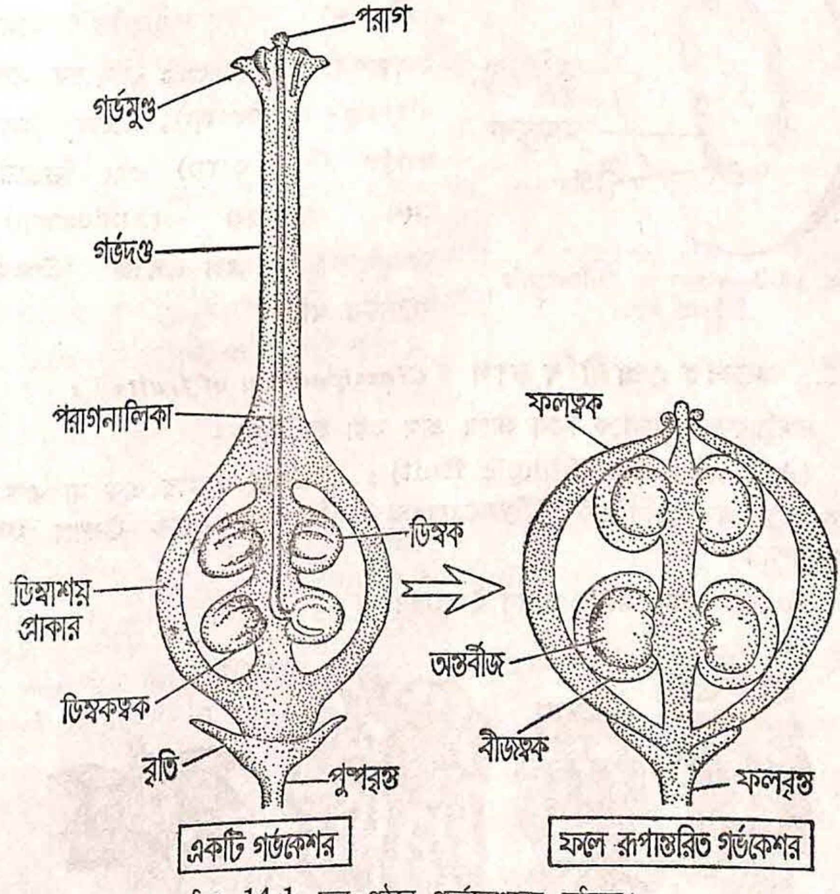
ফল **14**

[Fruit]

14.1. সূচনা *[Introduction] :*

● **ফলের সংজ্ঞা** (Definition of Fruit) **ঃ পরিণত, পরিপক্ক ও নিষিক্ত ডিম্বাশয়কে ফল বলা হয়।**

ফুলের স্ত্রী-অংগ গর্ভকেশর। প্রধানত গর্ভকেশরের ডিম্বাশয় অংশ থেকেই ফল গঠিত হয়। ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন ফল **প্রকৃত ফল** (True fruit)। উদাহরণ—**কুমড়ো, বেগুন, আম** প্রভৃতি।



চিত্র 14·1—ফল গঠনে গর্ভকেশরের ভূমিকা।

● **প্রকৃত ফলের সংজ্ঞা** (Definition of true fruit) **ঃ ফুলের গর্ভকেশরের ডিম্বাশয় অংশ থেকে গঠিত ফলকে প্রকৃত ফল বলে।**

[অ্যাস্কেলমিনথিস শ্রেণীটি পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—
(1) নিমাটোডা (Nematoda), (2) নিমাটোমরফা (Nematomorpha), (3) রোটিফেরা (Rotifera), (4) গ্যাসট্রোটিকা (Gastrotricha) এবং (5) কাইনোরিঙ্কা (Kinorhyncha)।]

7. **ফাইলাম আনেলিডা বা পর্ব অঙ্গুরীমাল** (Phylum Annelida ল্যাটিন = *annulus* = আংটি ; *lidos* = আকৃতি) ঃ

[প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 9,000]

● **আনেলিডা পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ**

(1) লম্বা দেহ অনেকগুলি আংটির মতো খণ্ড খণ্ড অংশ দ্বারা গঠিত। খণ্ডগুলিকে **সোমাইট** (Somite) বা **মেটামিয়ার** (Metamere) বলে। খণ্ডগুলি ভিতরে ও বাইরে সমান স্পষ্ট।

(2) দেহ সমদ্বিপার্শ্বীয়।

(3) দেহ **কিউটিকল** দ্বারা আবৃত।

(4) দেহ-গহ্বরটি প্রকৃত সিলোম (True coelome)।

(5) দেহ-প্রাকারে ক্ষুদ্র **সিটা** (Seta) অথবা **প্যারাপোডিয়া** (Parapodia) বর্তমান এবং এগুলির সাহায্যেই প্রাণী চলাফেরা করে।

(6) অঙ্গুরীমাল প্রাণীর **পৌষ্টিক নালী সম্পূর্ণ** ; অর্থাৎ, মুখ ও পায়ুছিদ্র বর্তমান।

(7) দেহের রক্ত **বন্ধ রক্তনালীর** মাধ্যমে চলাচল করে।

(8) খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত কুণ্ডলীকৃত **নেফ্রিডিয়া** (Nephridia)-র সাহায্যে রেচনক্রিয়া **সম্পন্ন** হয়।

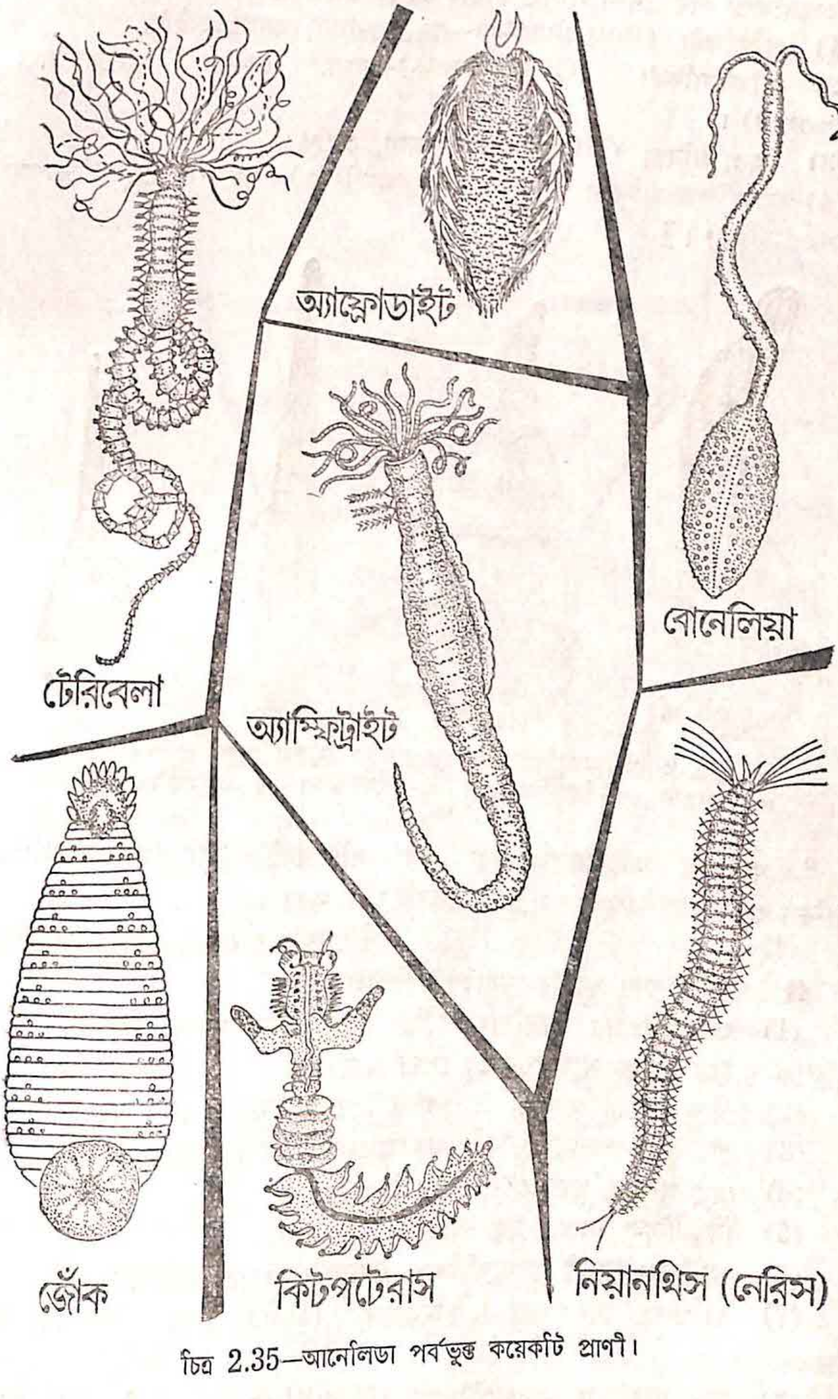
(9) **ত্বকের মাধ্যমেই শ্বসন চলে।**

(10) দুটি সেরিব্রাল **নার্ভ গ্যাংলিয়া** (Nerve ganglia) ও **প্রতি খণ্ডে গ্যাংলিয়া-যুক্ত একজোড়া নার্ভরজ্জু** (Nerve cord with segmentally arranged ganglia) দ্বারা নার্ভতন্ত্র গঠিত।

(11) সাধারণতঃ উভলিঙ্গ প্রাণী।

● **উদাহরণ ঃ** কেঁচো (Earthworm) ; জোঁক* (Leech), **নিয়ানথিস** (*Neanthes*) (নেরিস), টেরিবেলা (*Terebella*), **কিটপটেরাস** (*Chaetopterus*), অ্যাফ্রোডাইট (*Aphrodite*), অ্যাম্ফিট্রাইট (*Amphitrite*), বোনেলিয়া (*Bonelia*) প্রভৃতি।

* প্রায় 300 প্রজাতির জোঁক আছে। হিরুডো—রক্তচাপ কমাবার জন্য প্রাচীনকালে এদের সাহায্যে রক্তমোক্ষণ করা হত ; হিরুডিনারিয়া—গরু, ভেড়া, মহিষ প্রভৃতির **দেহ** থেকে এরা রক্ত শোষণ করে ; হিমাডিপ্সা—স্থলবাসী জোঁক ; গ্লসিফনিয়া—শামুক, **ঝিনুক** প্রভৃতির উপর পরজীবী হিসাবে মিঠা জলে বাস করে [চিত্র 2.36]।



চিত্র 2.35—আনেলিডা পর্বভুক্ত কয়েকটি প্রাণী।

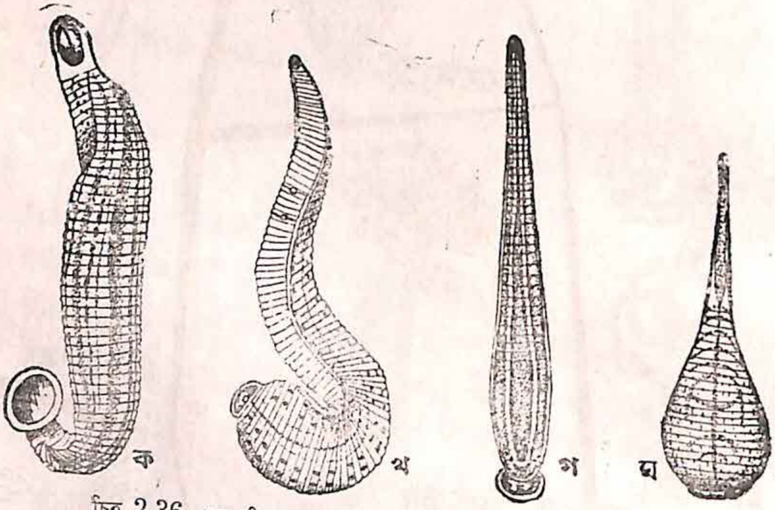
[আনেলিডা পর্ব নিম্নলিখিত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

(1) **পলিকিটা** (Polychaeta)—যথা, নেরিস, অ্যাফ্রোডাইট।

(2) **অলিগোকিটা** (Oligochaeta)—যথা, কেঁচো, অ্যালোসোমা (*Allosoma*)।

(3) **হির্‌ডিনিয়া** (Hirudinea)—যথা, জোঁক।

(4) **আর্কিআনেলিডা** (Archiannelida)—যথা, প্রোটোড্রিলাস (*Protodrilus*)।]



চিত্র 2.36—আনেলিডা পর্বভুক্ত প্রাণী ঃ বিভিন্ন প্রকার জোঁক ঃ
ক—হির্‌ডো ; খ—হির্‌ডিনারিয়া ; গ—হিমাডিপ্সা ; ঘ—গ্লসিফনিয়া।

8. **ফাইলাম আরথ্রোপডা** বা **পর্ব সন্ধিপদী** (Phylum Arthropoda ; গ্রীক *arthros* = সন্ধি ; *podos* = পদ) ঃ

[প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 9,23,000]

● **আরথ্রোপডা পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ**

(1) আরথ্রোপডার সমদ্বিপার্শ্বীয় **দেহ বহ্‌ খণ্ডে বিভক্ত**। খণ্ডগ্‌লিকে বাইরে থেকে স্‌স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

(2) দেহে জোড়া **পদ** বা **উপাঙ্গ** (Appendage) বর্তমান।

(3) পদ ও উপাঙ্গগ্‌লি নির্দিষ্ট কতকগ্‌লি খণ্ডে বিভক্ত।

(4) দেহ **মস্তক, বক্ষ** এবং **উদরে** বিভক্ত।

(5) **কিউটিকল** দ্বারা দেহ আব্‌ত।

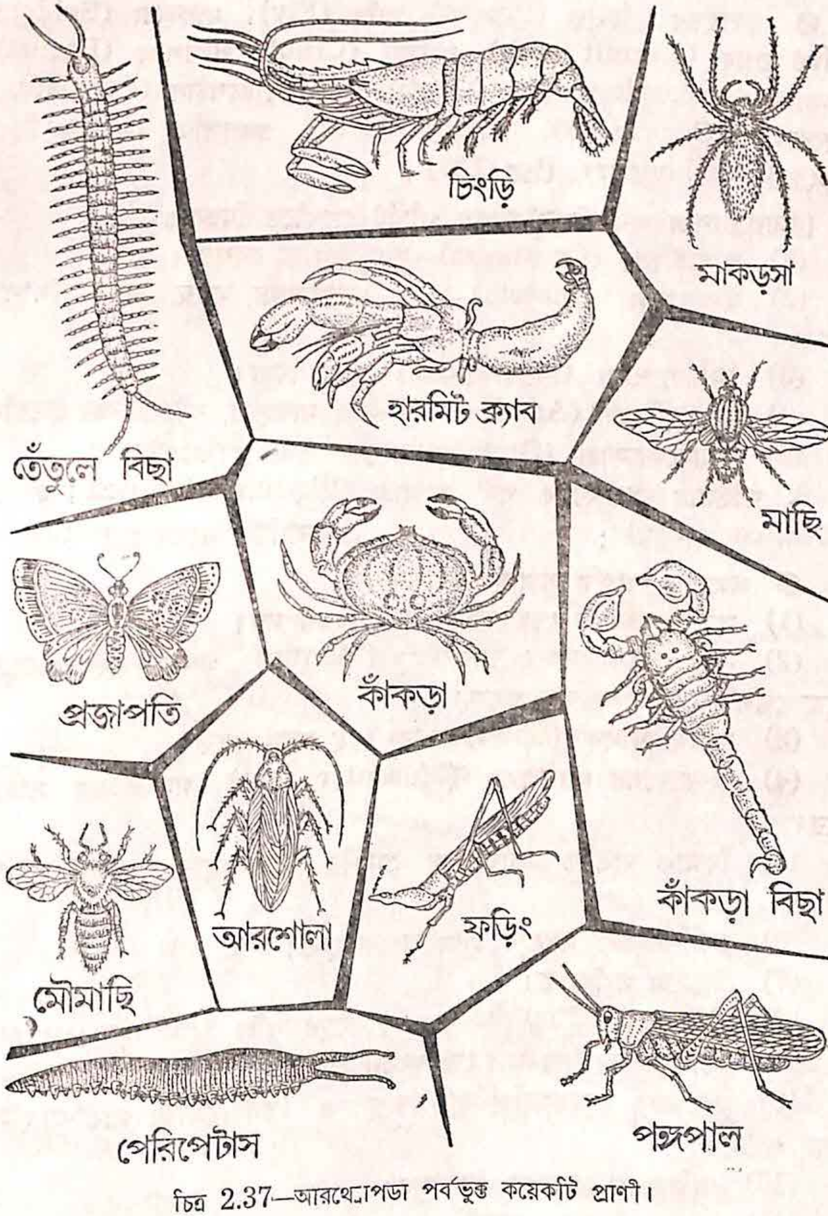
(6) **পৌষ্টিক নালী সম্প্‌র্ণ**, ম্‌খ উপাঙ্গের দ্বারা আব্‌ত।

(7) সংক্ষিপ্ত দেহগহ্বর **হিমোসিল** (Haemocoel) হিসাবে কাজ করে।

(8) **নির্মোচন** বা **একডাইসিস** (Moulting or Ecdysis) প্রথায় খোলস ত্যাগ করে।

(9) পৌষ্টিক নালীর পৃষ্ঠদেশে হৃৎপিণ্ড অবস্থিত।

(10) অধিকাংশ প্রাণীই পুঞ্জাক্ষি (Compound eye)-র অধিকারী।



চিত্র 2.37—আরথ্রোপডা পর্বভুক্ত কয়েকটি প্রাণী।

(11) দেহের অগ্রপ্রান্তে পৃষ্ঠদেশে মস্তিষ্ক অবস্থিত। প্রতি খণ্ডের একটি করে মিলিত গাংলিয়া-যুক্ত নিরেট অঙ্কীয় নার্ভরজ্জু দ্বারা নার্ভতন্ত্র গঠিত।

(12) সাধারণতঃ একলিঙ্গ, স্ত্রী ও পুরুষের আকৃতিগত পার্থক্য বর্তমান।

● উদাহরণ : চিংড়ি (Prawn), মাছি (Fly), মাকড়সা (Spider), হারমিট ক্র্যাব (Hermit crab), কাঁকড়া (Crab), পঙ্গপাল (Locust), কাঁকড়াবিছা (Scorpion), বিছা (Centipede), পেরিপেটাস (Peripatus), আরশোলা (Cockroach), মৌমাছি (Bee), প্রজাপতি (Butterfly), ফড়িং (Grasshopper) (চিত্র 2.37)।

[আরথ্রোপডা পর্ব নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত :

(1) ক্রাসটেসিয়া (Crustacea)—যথা, চিংড়ি, কাঁকড়া।

(2) ইনসেক্টা (Insecta)—যথা, আরশোলা, মাছি, মশা, পিঁপড়া ইত্যাদি।

(3) মিরিয়াপোডা (Myriapoda)—যথা, বিছা।

(4) অ্যারাকনিডা (Arachnida)—যথা, মাকড়সা, কাঁকড়াবিছা ইত্যাদি।

(5) ওনাইকোফোরা (Onychophora)—যথা, পেরিপেটাস।]

9. **ফাইলাম মলাস্কা বা পর্ব কম্বোজ** (Phylum Mollusca ; ল্যাটিন *mollusca* = নরম) ; [প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 10,000]

● **মলাস্কা পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য :**

(1) সমদ্বিপার্শ্বীয় দেহ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত নয়।

(2) নরম দেহ-যন্ত্রসমূহ ম্যানটল্ (Mantle) নামক দেহ-প্রাকারের পুরু পেশীর ভাঁজে আবৃত থাকে।

(3) **কঠিন খোলক** (Shell) দ্বারা দেহ ঢাকা থাকে।

(4) অঙ্কদেশের **মাংসলপদ** (Muscular foot) গমনাগমনে সাহায্য করে।

(5) ঝিনুক ব্যতীত অধিকাংশ প্রাণীর মুখ-গহ্বরকে ঘিরে কর্ষিকা থাকে।

(6) পৌষ্টিকতন্ত্র সম্পূর্ণ এবং কুণ্ডলীকৃত।

(7) সিলোম সংক্ষিপ্ত।

(8) টেনিডিয়া (Ctenidia) বা ফুসফুস থলি (Pulmonary sac) নামক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঙ্গের সাহায্যে শ্বসন চালায়।

(9) নার্ভতন্ত্র কতকগুলি নার্ভরজ্জু ও তিন জোড়া নার্ভ-গ্যাংলিয়া দ্বারা গঠিত।

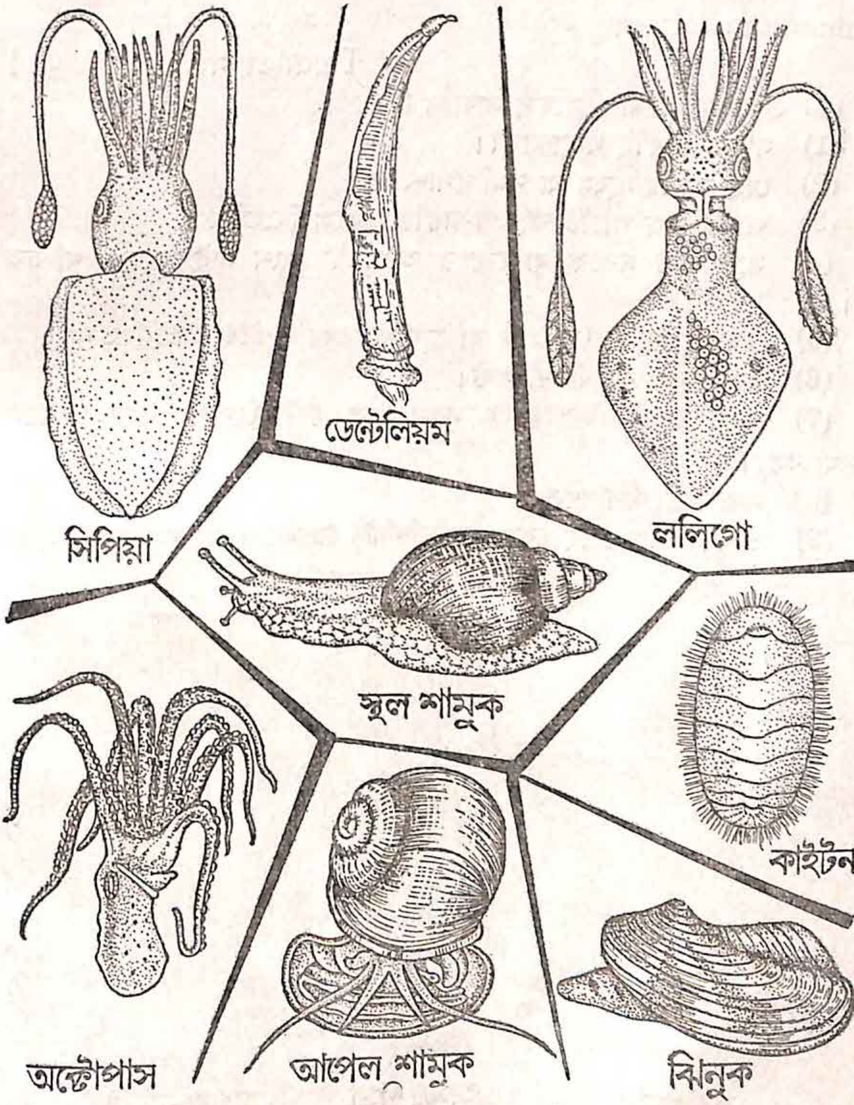
(10) অধিকাংশ মলাস্কা একলিঙ্গ।

(11) স্থলবাসী বা জলবাসী।

● উদাহরণ : শামুক (*Snail*), সিপিয়া (*Sepia*), ঝিনুক (*Unio*), অক্টোপাস (*Octopus*), ডেণ্টেলিয়ম (*Dentalium*), কাইটন (*Chiton*), ললিগো (*Loligo*) প্রভৃতি।

[মলাস্কা পর্ব নিম্নলিখিত ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

(1) মোনোপ্ল্যাকোফোরা (Monoplacophora)—যথা, নিওপিলিনা।
(2) অ্যাম্ফিনিউরা (Amphineura)—যথা, কাইটন।



চিত্র 2.38—মলাস্কা পর্বভুক্ত কয়েকটি প্রাণী।

(3) স্ক্যাফোপডা (Scaphopoda)—যথা, ডেন্টেলিয়ম।
(4) বাইভালভিয়া বা পেলিসাইপডা (Bivalvia or Pelecypoda)—যথা, ইউনিয়ো (ঝিনুক)।

(5) **গ্যাসট্রোপডা** (Gastropoda)—যথা, শামুক, পাইলা ইত্যাদি।

(6) **কেফালোপডা** (Cephalopoda)—যথা, সিপিয়া, অক্টোপাস ইত্যাদি।]

10. ফাইলাম একাইনোডারমাটা বা পর্ব কণ্টকত্বক্ (Phylum Echinodermata ; গ্রীক *echinos* = কণ্টক + *dermatos* = ত্বক) ঃ

[প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 5,500]

● **একাইনোডারমাটা পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্যঃ**

(1) **সমস্ত প্রাণীই সমুদ্রবাসী।**

(2) দেহ অরীয়-সুষম বা **সমদ্বিপার্শ্বীয়।**

(3) **অরীয়** দেহ পাঁচটি **আন্তর-অরীয়** অঞ্চলে বিভেদিত।

(4) সুনির্দিষ্ট মস্তক বা দেহের অগ্রবর্তী অংশ নাই, **দেহও খণ্ডিত** নয়।

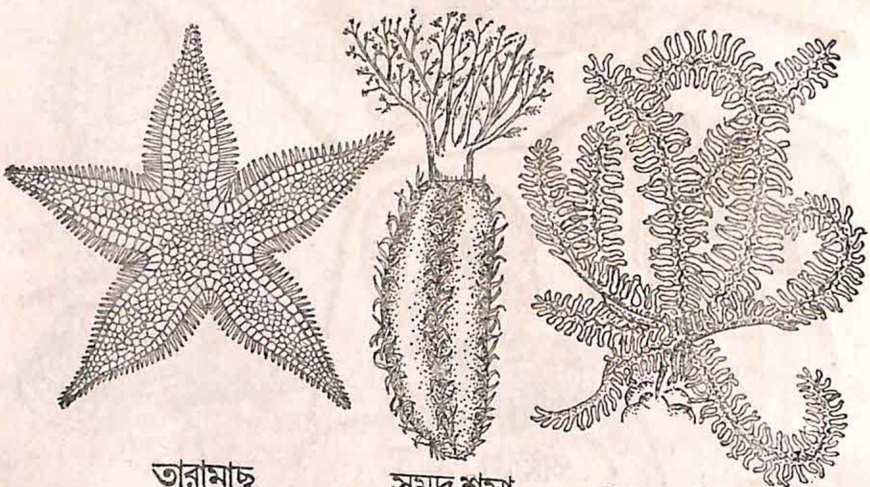
(5) দেহত্বক্ **গুটি** (wart) বা **চূনাপাথরময় কণ্টকে** আচ্ছাদিত।

(6) দেহ-গহ্বর বড় ও সুস্পষ্ট।

(7) **নালীপদ** (Tube-feet) নামে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংগ চলাচলে সাহায্য করে।

(8) নার্ভতন্ত্র অপরিণত।

(9) অধিকাংশের দেহে কোন সুনির্দিষ্ট রেচনতন্ত্র বা শ্বসনতন্ত্র নাই।



চিত্র 2.39—একাইনোডারমাটা পর্বভুক্ত কয়েকটি প্রাণী।

(10) পৌষ্টিকনালীর অন্তর্বর্তী অংশকে ঘিরে থাকা থলির মতো **অংগুরীনালী** (Ring vessel) থেকে উৎপন্ন পাঁচটি **অরীয় নালী** (Radial

canals) সম্মিলিতভাবে **জলনালীতন্ত্র** (Water vascular system) গঠন করে।

(11) অধিকাংশ প্রাণীই একলিঙ্গ। তবে বাইরে থেকে পুরুষ ও স্ত্রী চেনা কষ্টকর।

● উদাহরণ : **তারামাছ** (Starfish) ; **সমুদ্র-শশা** (Sea-cucumber) ; **সমুদ্র-লিলি** (Sea-Lily) বা **অ্যাণ্টিডন** (*Antedon*)।

[একাইনোডারমাটা পর্ব নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত :

(1) **অ্যাসটেরইডিয়া** (Asteroidea)—যথা, তারামাছ।

(2) **অফিউরইডিয়া** (Ophuroidea)—যথা, অফিউরা।

(3) **একাইনইডিয়া** (Echinoidea)—যথা, সামুদ্রিক আরচিন।

(4) **হোলোথুরইডিয়া** (Holothuroidea)—যথা, সমুদ্র-শশা।

(5) **ক্রিনইডিয়া** (Crinoidea)—যথা, সমুদ্র-লিলি।]

পূর্বে উল্লেখিত নয়টি পর্বকেই **অকর্ডাটা** (Achordata) রূপে চিহ্নিত করা হয়।

11. **ফাইলাম কর্ডাটা বা পর্ব কর্ডাটা** (Phylum Chordata ; গ্রীক *chorde* = দড়ি) ; [প্রজাতির সংখ্যা 45,000]

● **কর্ডাটা পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য :**

(1) জীবনের কোন-না-কোন অবস্থায় দেহের পৃষ্ঠদেশে মধ্যরেখা-বরাবর **নোটোকর্ড** (Notochord ; *noton* = পশ্চাৎ + *chorde* = সূত্র) থাকে।

(2) উন্নত কর্ডাটার দেহে **মেরুদণ্ড** (Vertebral column) বর্তমান।

(3) দেহে পৃষ্ঠদেশ-বরাবর একটি **ফাঁপা স্নায়ুসূত্র** (Dorsal hollow nerve cord) বর্তমান। ফাঁপা স্থানটি **স্নায়ুরস** (Spinal fluid) দ্বারা পূর্ণ থাকে।

(4) দেহ সমদ্বিপার্শ্বীয়।

(5) দেহের মধ্যে একটি **সুস্পষ্ট দেহগহ্বর** থাকে।

(6) অন্ততঃ ভ্রূণাবস্থাতেও গলবিলের দুপাশে **গলবিলীয় ফুলকা-ছিদ্র** (Pharyngeal gill slit) বর্তমান।

(7) দেহের কাঠামো **অন্তঃকঙ্কাল** দ্বারা গঠিত।

(8) **রক্ত-সংবহন তন্ত্র বদ্ধ।**

(9) জীবনের কোন-না-কোন অবস্থায় **লেজ থাকে।**

(10) সাধারণতঃ **সরলাক্ষির** অধিকারী।

● **কর্ডাটা পর্ব প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত :**

(A) **প্রোটোকর্ডাটা** (Protochordata)।

(B) **ভার্টিব্রাটা** (Vertebrata)।

(A) **প্রোটোকর্ডাটা ঃ** এদের দেহ জীবনের কোন-না-কোন অবস্থায় নোটোকর্ড থাকে, তবে তা কখনই মেরুদণ্ডে রূপান্তরিত হয় না।

প্রোটোকর্ডাটা নিম্নলিখিত তিনটি উপপর্বে বিভক্ত ঃ

(1) উপপর্ব হেমিকর্ডাটা* (Subphylum Hemichordata) ঃ

(i) সামুদ্রিক প্রাণী।

(ii) দেহ নরম, কেঁচোর মতো দেখতে, তবে লম্বায় অনেক ছোট।

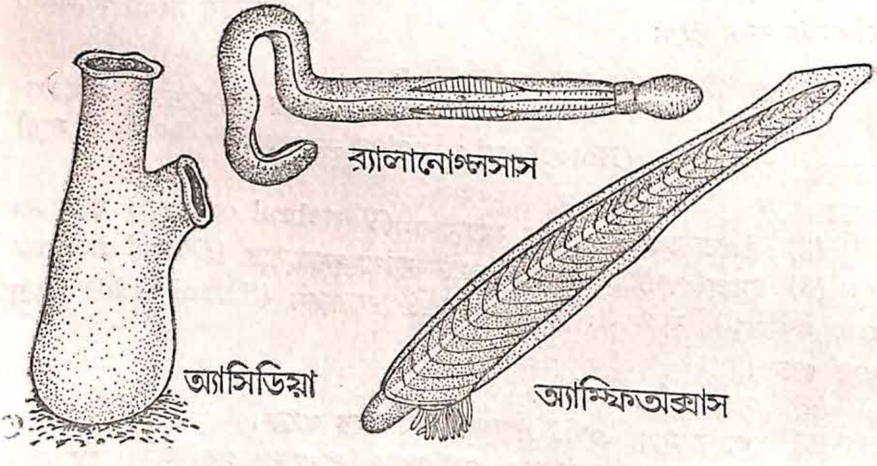
(iii) দেহের অল্প স্থান অধিকার করে সংক্ষিপ্ত নোটোকর্ড অবস্থিত।

● উদাহরণ ঃ **ব্যালানোগ্লসাস** (*Balanoglossus*) (চিত্র 2.40)।

(2) **উপপর্ব ইউরোকর্ডাটা** (Subphylum Urochordata) ঃ

(i) ভ্রূণাবস্থায় লেজের দিকে নোটোকর্ড দেখা যায়, তা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় বিলুপ্ত হয়।

(ii) পূর্ণাঙ্গ প্রাণী দেখতে থলির মতো। দেহ কৃত্তিকাবরণী (cuticle) দ্বারা আবৃত।



চিত্র 2.40—প্রোটোকর্ডাটাভুক্ত কয়েকটি প্রাণী।

(iii) জন্মাবার পর চলাফেরা করার ক্ষমতা থাকলেও, পরে সেই ক্ষমতা লোপ পায়। এজন্য এদের একই স্থানে আবদ্ধ থাকতে হয়।

● উদাহরণ ঃ অ্যাসিডিয়া (Ascidia) (চিত্র 2.40)।

---

* কোন কোন প্রাণিবিজ্ঞানীর মতে এদের প্রকৃত নোটোকর্ড নাই। সেজন্য তাঁরা কর্ডাটা পর্ব থেকে এদের পৃথক করে বিশেষ এক অমেরুদণ্ডী পর্বভুক্ত করার পক্ষপাতী। সুতরাং হেমিকর্ডাটার শ্রেণী-বিন্যাসে বিতর্কের অবকাশ আছে।

(3) **উপপর্ব কেফালোকর্ডাটা** (Subphylum Cephalochordata) ঃ

(i) মাছের মতো প্রাণী হলেও এদের দেহে **একটিমাত্র পাখনা** থাকে। পাখনাটি পিঠ থেকে সরু হয়ে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত।

(ii) নোটোকর্ড মাথা থেকে আরম্ভ হয়ে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত।

(iii) সামুদ্রিক প্রাণী, সমুদ্রের ধারে বালির মধ্যে গর্তে বাস করে ; গর্ত থেকে মুখ বের করে খাদ্যের সন্ধান করে।

(iv) **গলবিলীয় ছিদ্র বর্তমান।**

● উদাহরণ ঃ অ্যাম্ফিঅক্সাস (*Amphioxus*) (চিত্র 2.40)।

(B) **ভার্টিব্রাটা বা মেরুদণ্ডী প্রাণী** ঃ ভ্রূণাবস্থায় নোটোকর্ড থাকলেও পরে সেটা অস্থিময় মেরুদণ্ড গঠন করে।

উপপর্ব ভার্টিব্রাটা (Subphylum Vertebrata) দুটি অধি-শ্রেণী (Superclass)-তে বিভক্ত ঃ—

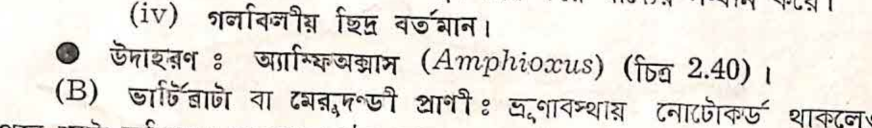
1. **অধিশ্রেণী** (Superclass) **আনাথা** (Agnatha ; $a =$ বিহীন $+$ *gnathos* $=$ চোয়াল) ঃ

(1) আঁশবিহীন ও **চোয়ালবিহীন প্রাণী।**

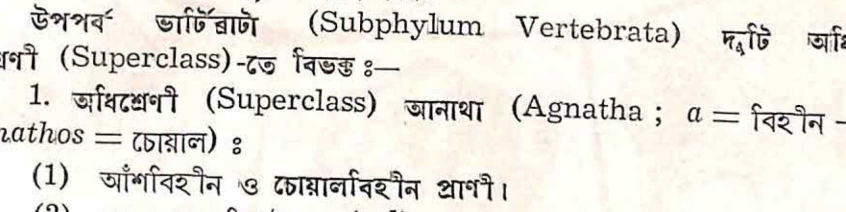
(2) দেহ লম্বাকৃতি ইলের (eel) মতো।

(3) অনুষ্ণশোণিত প্রাণী।

(4) মাছের মতো, তবে **জোড়া পাখনা** থাকে না।



ল্যামপ্রে



হ্যাগফিস

চিত্র 2.41—উপপর্ব ভার্টিব্রাটা ও আনাথাশ্রেণীভুক্ত কয়েকটি প্রাণী।

● **উদাহরণ ঃ ল্যামপ্রে** (*Lamprey*), **হ্যাগফিস** (*Hagfish*) (চিত্র 2.41) ইত্যাদি।

আনাথার অন্তর্গত শ্রেণীসংখ্যা একটি, যথা—শ্রেণী **সাইক্লোস্টোমাটা** (Class Cyclostomata)।

2. **অধিশ্রেণী** (Superclass) **ন্যাথোস্টোমাটা** (Gnathostomata) ঃ

(1) **চোয়ালযুক্ত** প্রাণী। মুখছিদ্র উপরের ও নীচের চোয়াল দ্বারা আবদ্ধ।

(2) অনুষ্ণ বা উষ্ণশোণিত প্রাণী।

(3) দেহে জোড়া পাখনা বা প্রত্যঙ্গ বর্তমান।

প্রাকার থেকে **কলাম্নি কার্নি** (Columnae carnae) নামক বহু পেশীগুচ্ছ উৎপন্ন হয়। এই পেশীগুলি থাকার ফলে নিলয় গহ্বরে অনেক খাঁজের সৃষ্টি হয়।

কর্ডি টেনডিনি (Chordae tendinae) নামক সুতার ন্যায় অসংখ্য পেশীর উপরে অলিন্দ-নিলয় কপাটক অবস্থান করে।

কোনাস আর্টারিওসাস (Conus arteriosus) : কুনো ব্যাঙের দক্ষিণ অলিন্দের অঙ্কদেশে নিলয়ের ডানদিক থেকে নলাকার কোনাস আর্টারিওসাস উত্থিত হয়। নিলয় ও কোনাস আর্টারিওসাসের সংযোগস্থলে তিনটি **অর্ধচন্দ্রাকার কপাটক** (Semilunar valve) বর্তমান। কোনাসের গহ্বরটিও একটি অনুদৈর্ঘ্য বিন্যস্ত **সর্পিল কপাটক** (Spiral valve) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়। দক্ষিণ দিকের অংশটি **কেভাম অ্যাওর্টিকাম** (Cavum aorticum) এবং বাম দিকের অংশটি **কেভাম পালমোকিউটেনিয়াম** (Cavum pulmocutaneum) নামে পরিচিত।

নিলয় থেকে উত্থিত কোনাস আর্টারিওসাস-এর অগ্রবর্তী অংশ **ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস** (Truncus arteriosus)-এ বিভক্ত হয়। ট্রাঙ্কাস হৃৎপিণ্ডের অংশ নয়। তবে ট্রাঙ্কাস থেকেই **ক্যারটিড খিলান ধমনীগুলি** (Carotid arches) উত্থিত হয়।

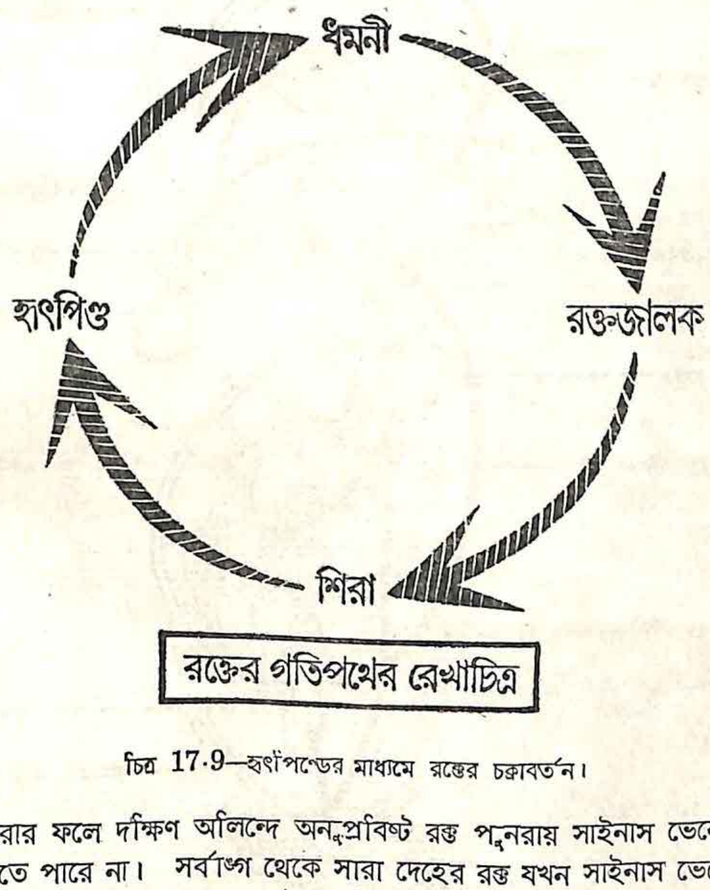
17.5. কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দিয়ে রক্তের চক্রাবর্তন [*Mechanism of circulation of blood through the heart of Toad*] :

কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডে **দ্বিচক্রী** (Double circuit) প্রথা অনুসৃত হয়। এদের একটি **সিস্টেমিক চক্র** (Systemic circuit) এবং অন্যটি **ফুসফুসীয় চক্র** (Pulmonary circuit)। সিস্টেমিক চক্র মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড দেহের প্রতিটি অঙ্গে বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করে এবং অশুদ্ধ রক্ত ফিরিয়ে আনে। ফুসফুসীয় চক্র মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ফুসফুসে যায় এবং সেখানে পরিশ্রুত হবার পরে রক্ত পুনর্বার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে।

জীবিতাবস্থায় হৃৎপিণ্ড সর্বক্ষণ পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হ'য়ে উভয় চক্র মাধ্যমে রক্তের সুষ্ঠু চক্রাবর্তনে সহায়তা করে। হৃৎপিণ্ডের এই সঙ্কোচন

ও প্রসারণকে যথাক্রমে **সিস্টোল** (Systole) এবং **ডায়াস্টোল** (Diastole) বলে।

হৃৎপিণ্ডের প্রসারিত অবস্থায় অক্সিজেনবিহীন অপরিস্রুত রক্ত দু'টি **প্রি-কেভাল** (Pre-caval) এবং একটি **পোষ্ট-কেভাল** (Post-caval) শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের সাইনাস ভেনোসাসে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে সাইনাস ভেনোসাস সংকুচিত হ'লে সেখানে সঞ্চিত অপরিস্রুত রক্ত সাইনু-অরিকুলার ছিদ্রপথে দক্ষিণ অলিন্দে পৌঁছায়। দক্ষিণ অলিন্দের প্রাকার ভাঁজ হ'য়ে বাধার



চিত্র 17·9—হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্তের চক্রাবর্তন।

সৃষ্টি করার ফলে দক্ষিণ অলিন্দে অনুপ্রবিষ্ট রক্ত পুনরায় সাইনাস ভেনোসাসে ফিরে যেতে পারে না। সর্বাঙ্গ থেকে সারা দেহের রক্ত যখন সাইনাস ভেনোসাস মাধ্যমে দক্ষিণ অলিন্দে আসে, সেই একই সময়ে ফুসফুস থেকে পরিস্রুত রক্ত ফুসফুসীর শিরা মাধ্যমে বাম অলিন্দে পৌঁছায়।

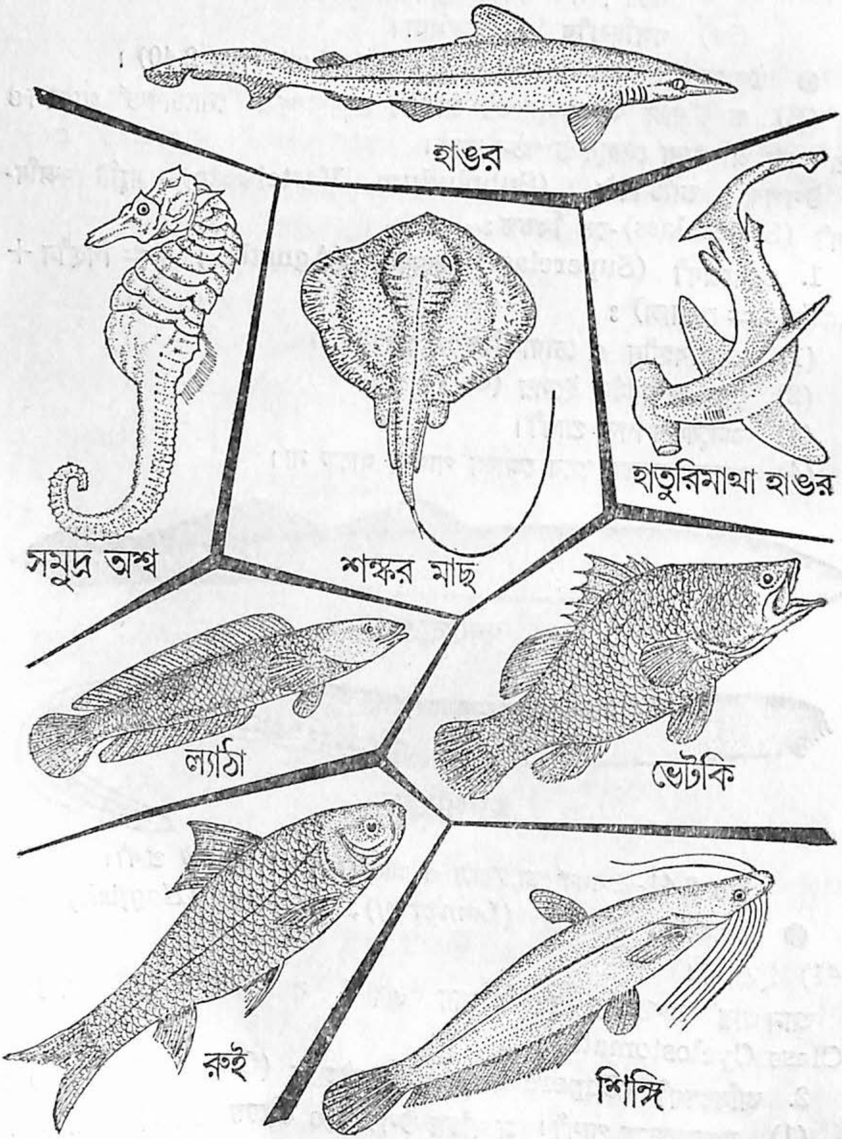
অলিন্দদ্বয় রক্তপূর্ণ হওয়া মাত্র, একই সঙ্গে সংকুচিত (সিস্টোল) হয়, এদিকে ঐসময় নিলয়ের প্রসারণ বা ডায়াস্টোল দশা চলে। ফলে **দক্ষিণ অলিন্দ থেকে অপরিস্রুত রক্ত এবং বাম অলিন্দ থেকে পরিস্রুত রক্ত অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র-পথ মাধ্যমে নিলয়ে নেমে** আসে। দক্ষিণ অলিন্দ ও বাম অলিন্দের মাঝখানে

অধিশ্রেণী ন্যাথোস্টোমাটা নিম্নলিখিত ছটি শ্রেণীতে বিভক্তঃ

I. শ্রেণী (Class) কনড্রিকথিস (Chondricthyes) বা ইলাসমোব্রাঙ্ক (Elasmobranchii)

● প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ

(1) এই শ্রেণীর প্রাণীদের অন্তঃকঙ্কাল তরুণাস্থিময় (Cartilagenous)।



চিত্র 2.42—কনড্রিকথিস ও অস্টিকথিস শ্রেণীভুক্ত কয়েকটি প্রাণী।

(2) দেহ আণুবীক্ষণিক প্ল্যাকয়েড আঁশ (Placoid scale) দ্বারা আবৃত।

(3) এদের মস্তকের অঙ্কদেশে মুখছিদ্র অবস্থিত।

(4) দেহে সাধারণতঃ 5 জোড়া ফুলকাছিদ্র বর্তমান ; ফুলকাছিদ্রগুলি মস্তকের দু'পাশে সরাসরি বাইরে মুক্ত।

(5) কানকো (operculum) দ্বারা ফুলকা আবৃত নয়।

(6) লেজ হেটারোসারকাল (heterocercal) প্রকৃতির।

(7) পাখনাগুলি রশ্মিযুক্ত, পুরুষ মাছের শ্রোণী পাখনায় ক্ল্যাসপার (Clasper) বর্তমান।

(8) বায়ুথলি (Swim bladder) নাই।

(9) অবসারণী (Cloaca) বর্তমান।

(10) সকলেই সামুদ্রিক।

● **উদাহরণ** ঃ হাঙর বা সার্ক বা **স্কোলিওডন** (*Scoliodon*), হাতুরী-মাথা হাঙর বা **স্ফাইরনা** (*Shpyrna*), শঙ্কর মাছ বা **ট্রাইগন** (*Trigon*), ইলেকট্রিক রে বা **টর্পেডো** (*Torpedo*) ইত্যাদি।

II. শ্রেণী (Class) **অস্টিকথিস** (Osteichthyes)

● **প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ**

(1) এগুলি অস্থিময় অন্তঃকঙ্কাল (Bony endoskeleton) বিশিষ্ট মাছ।

(2) দেহ **সাইক্লয়েড** (Cycloid), **গ্যানয়েড** (Ganoid), অথবা **টিনয়েড** (Ctenoid) আঁশে আবৃত।

(3) মুখটি মস্তকের অগ্রপ্রান্তে অবস্থিত।

(4) ফুলকা প্রকোষ্ঠের মধ্যে (Gill chamber) 4 জোড়া ফুলকা বর্তমান।

(5) ফুলকা প্রকোষ্ঠ কানকো দ্বারা আবৃত।

(6) লেজ **হোমোসারকাল** (Homocercal) বা **ডাইফিসারকাল** (Diphy-cercal)।

(7) দেহে বায়ুথলি বিদ্যমান।

(8) অবসারণী নাই—পায়ু আছে।

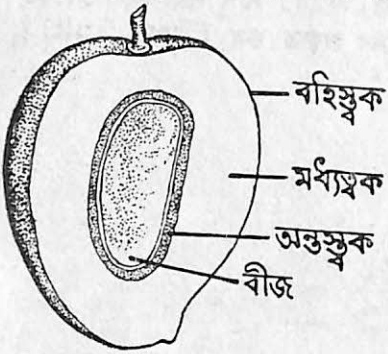
(9) মিঠা জলের বা সামুদ্রিক মাছ।

● **উদাহরণ** ঃ সমস্ত অস্থিযুক্ত মাছ, যেমন—**রুই** (*Labeo rohita*), **কাতলা** (*Catla catla*), **ভেটকী** (*Lates calcarifer*), **মাগুর** (*Clarias batrachus*), **কৈ** (*Anabas testudineus*), **শিঙি** (*Heteropneustes fossilis*), **ইলিশ** (*Hilsa ilisha*), **উড়ুক্কু মাছ** (*Exocoetus*), **সমুদ্র-অশ্ব** (*Hippocampus*), **ল্যাঠা** (*Channa punctatus*) ইত্যাদি।

ডিম্বাশয় ছাড়া ফুলের অন্যান্য অংশও সময় বিশেষে ফল গঠনে অংশ নেয়।

চালতার বৃতি, নেসপাতি ও আপেলের পুষ্পাক্ষ, কাঁঠাল বা আনারসের সমগ্র পুষ্পমঞ্জরী ফল-গঠনে অংশ গ্রহণ করে। এগুলি প্রকৃতপক্ষে **অপ্রকৃত ফল** (False or Spurious fruit)।

● **অপ্রকৃত ফলের সংজ্ঞা** (Definition of false or spurious fruit) : **ডিম্বাশয় ছাড়া ফুলের অন্যান্য অংশ ফল গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করলে সেই ফলকে অপ্রকৃত ফল বলে।**



চিত্র 14·2—ফলত্বক বা পেরিকার্পের বিভিন্ন অংশ।

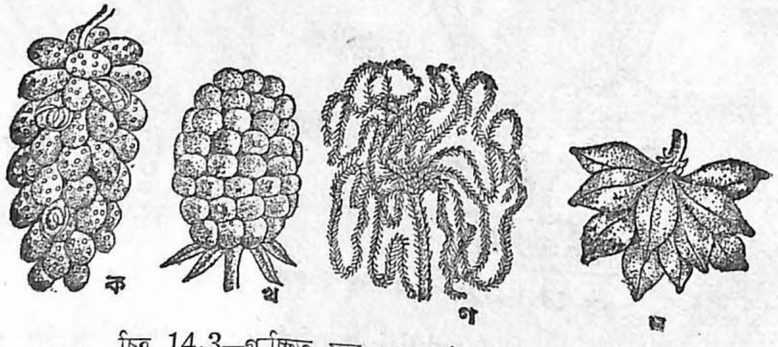
● **ফলের ত্বক** (Pericarp) : প্রকৃত ফলের ত্বককে **ফলত্বক** বা **পেরিকার্প** (Pericarp) বলে। ফলত্বকের তিনটি অংশ : বাহিরের অংশ **বহিস্ত্বক** (Exocarp), মধ্যের অংশ **মধ্যত্বক** (Mesocarp) এবং ভিতরের অংশ **অন্তস্ত্বক** (Endocarp)। অন্তস্ত্বকের মধ্যে **বীজ** (Seed) লুকানো থাকে।

14.2. ফলের শ্রেণীবিভাগ [*Classification of fruits*] :

সামগ্রিকভাবে ফলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—

(A) **সরল ফল** (Simple fruit) : একটিমাত্র ফুলের এক বা একাধিক যুক্ত গর্ভপত্রবিশিষ্ট (Syncarpous) ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন ফল সরল ফল।

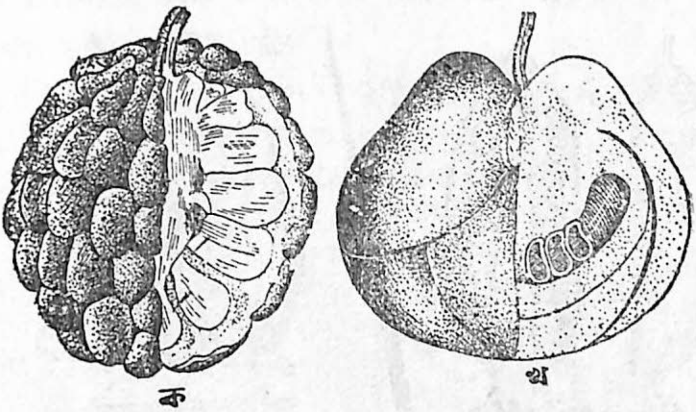
উদাহরণ—**আম, মটর, ঢেঁড়স** ইত্যাদি।



চিত্র 14·3—গুচ্ছিত ফল : ক—চাঁপা ; খ—রোজবেরি ; গ—ছাগলবটি ; ঘ—কাঁঠালি চাঁপা।

(B) **গুচ্ছিত ফল** (Aggregate fruit) : একটি ফুলেরই একাধিক মুক্তগর্ভপত্রবিশিষ্ট (Free or apocarpous) ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন ফল গুচ্ছিত ফল (চিত্র 14.3)।

উদাহরণ—আতা, **নোনা**, **চালতা** ইত্যাদি (চিত্র 14.4)।



চিত্র 14·4—বিভিন্ন ধরনের গুচ্ছিত ফল : ক—আতা ; খ—চালতা।

(C) **যৌগিক ফল** (Multiple fruit) : বহু ফুলের সমন্বয়ে অর্থাৎ, পরিবর্তিত সম্পূর্ণ পুষ্পমঞ্জরী থেকে উৎপন্ন ফল যৌগিক ফল।

উদাহরণ—**কাঁঠাল**, **আনারস** ইত্যাদি।

সরল ফল
(Simple Fruits)

সরল ফল **নিরস** (Dry) বা **রসাল** (Fleshy) হয়। নিরস ফল আবার **বিদারী** (Dehiscent) অথবা **অবিদারী** (Indehiscent)।

14.3. নিরস, বিদারী সরল ফল [*Dry, dehiscent simple fruits*] (চিত্র *14.5*) :

(1) **শিম্ব** বা **লেগুম** বা **পড্** (Legume or Pod) : মটর, সীম, **অপরাজিতা** প্রভৃতির ফল একগর্ভপত্রী। এগুলি এক প্রকোষ্ঠযুক্ত ডিম্বাশয় থেকে জন্মায়। গর্ভপত্রের দুদিকের দুই সন্ধি বরাবর ফলটি ফেটে যায় (চিত্র 14·5)।

III. শ্রেণী (Class) অ্যাম্ফিবিয়া বা উভচর (Amphibia)

● **প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ**

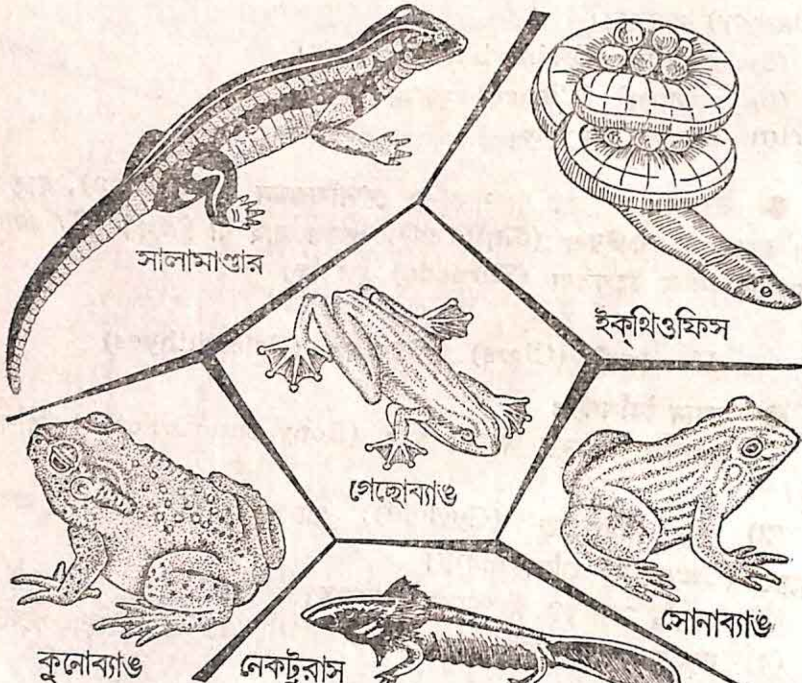
(1) **অনুষ্ণশোণিত প্রাণী।**

(2) জীবনের কোন না কোন সময় **জলে ও স্থলে—উভয় পরিবেশেই** বসবাসকারী প্রাণী।

(3) এরা চতুষ্পদী (tetraped) অর্থাৎ, এদের দু'জোড়া পদ বর্তমান।

(4) করোটি দুটি **কনডাইলযুক্ত।**

(5) করোটিক **নার্ভ 10 জোড়া।**



চিত্র 2.43—অ্যাম্ফিবিয়া বা উভচর শ্রেণীভুক্ত কয়েকটি প্রাণী।

(6) অপরিণত অবস্থায় জলে **ফুলকার সাহায্যে** এবং পরিণত অবস্থায় স্থলে **ফুসফুসের সাহায্যে শ্বসন চালায়।**

(7) জীবনচক্রে ব্যাঙাচি লার্ভা (tadpole larva) দশা বর্তমান।

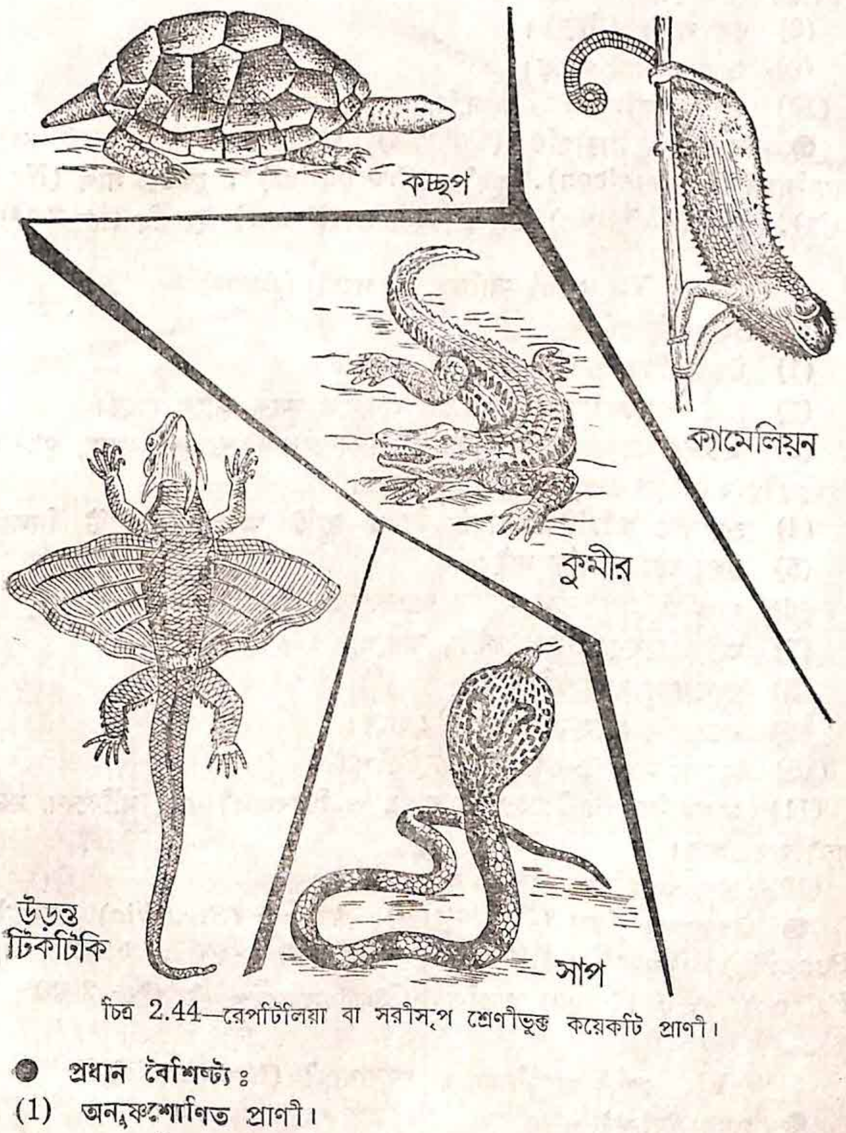
(8) ভ্রূণের পরিস্ফুটন ও লার্ভা দশা জলে অতিবাহিত হয়।

(9) **হৃৎপিণ্ড তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত**—দুইটি অলিন্দ ও একটি নিলয়। এছাড়া সংলগ্ন দুটি কক্ষের নাম সাইনস ভেনোসস ও কোনস আর্টারিওসস।

(10) **চামড়া সিক্ত** (moist) ও অনাবৃত। **বহিঃত্বকীয় আঁশ,** পালক বা রোমবিহীন।

● উদাহরণঃ সালামান্ডার (*Salamander*), ইক্‌থিওফিস (*Ichthyo-*
(*Rana tigrina*), গেছোব্যাঙ (*Hyla*), নখরযুক্তব্যাঙ (*Xenopus*),
phis), কুনোব্যাঙ (*Bufo melanostictus*), পাইপা (*Pipa*), সোনাব্যাঙ
উড়ুক্কুব্যাঙ (*Racophorus*), নেকটুরাস (*Necturus*) ইত্যাদি।

IV. শ্রেণী রেপটিলিয়া বা সরীসৃপ (Reptilia)



চিত্র 2.44—রেপটিলিয়া বা সরীসৃপ শ্রেণীভুক্ত কয়েকটি প্রাণী।

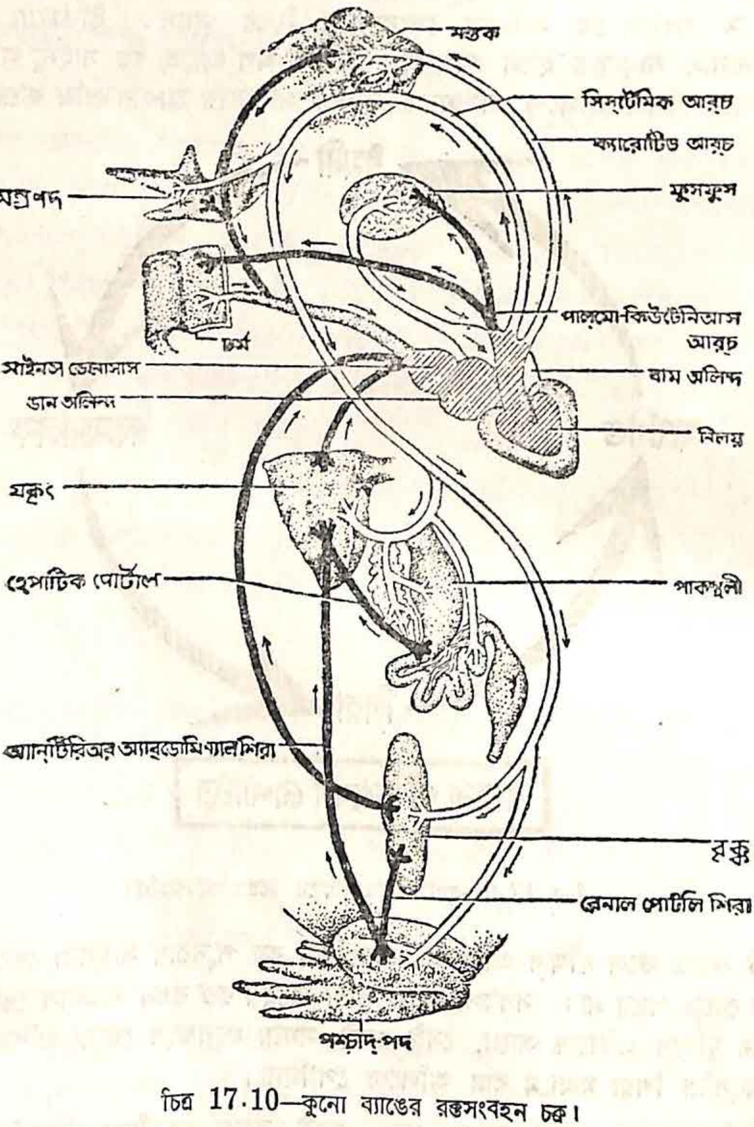
● প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ

(1) অনুষ্ণশোণিত প্রাণী।

(2) দেহ বহিঃস্ত্বকীয় আঁশে (Epidermal scale) ঢাকা।

(3) দু'জোড়া পদ বর্তমান।

আন্তঃঅলিন্দ প্রাকার থাকায় অপরিস্রুত ও পরিস্রুত রক্তের মিশ্রণ ঘটার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু নিলয়ে নেমে এলে উভয় রক্তের মিশ্রণ ঘটে। নিলয় রক্তপূর্ণ হ'লে নিলয়ের সংকোচন বা সিস্টোল শুরু হয়। নিলয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলেও নিলয়



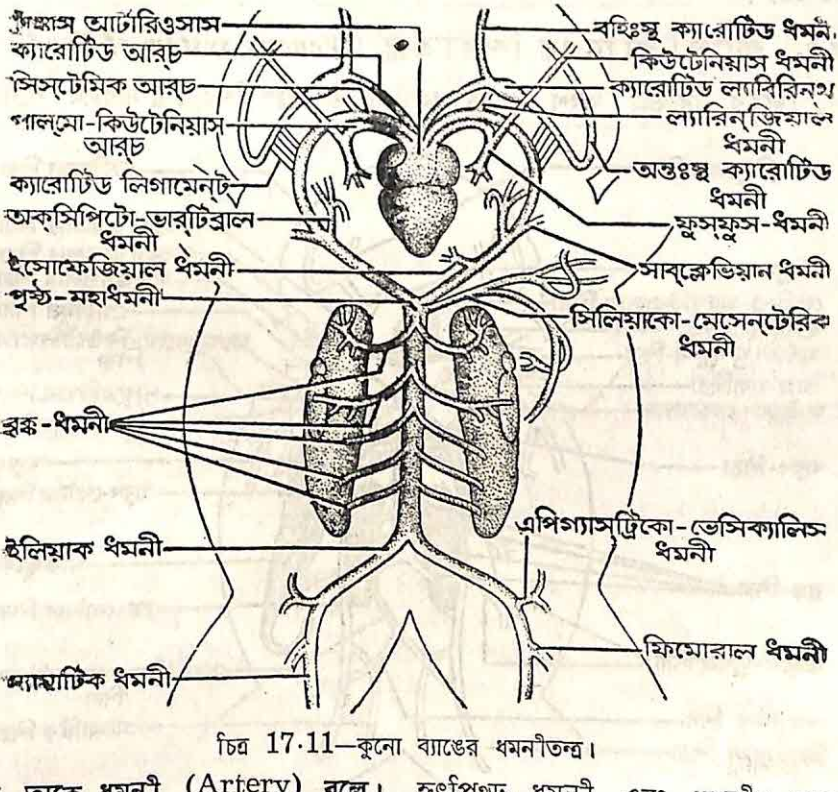
চিত্র 17.10—কুনো ব্যাঙের রক্তসংবহন চক্র।

থেকে রক্ত পুনরায় অলিন্দে ফিরে যেতে পারে না, কারণ ঐসময় অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথ কপাটক দ্বারা বন্ধ হ'য়ে রক্তের উল্টোমুখী গতি প্রতিহত করে। নিলয়ে সংকোচন চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকলে নিলয়ের মিশ্রিত রক্ত **কোনাস আর্টারিওসাস**

(Conus arteriosus)* মাধ্যমে **ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস** (Truncus arteriosus)-এ আসে এবং সেখান থেকে বিভিন্ন ধমনী পথে রক্ত দেহের সর্বত্র এবং ফুসফুস ও ত্বকে সঞ্চালিত হয়। ত্বক ও ফুসফুসে রক্ত পরিস্রুত হয়। সেই পরিস্রুত রক্ত পুনরায় বাম অলিন্দে ফিরে আসে। সেই সঙ্গে দেহের অন্যান্য অংশ থেকে অপরিস্রুত রক্তও তিনটি কেভাল শিরা পথে **সাইনাস** ভেনোসাসে ফিরে আসে। এইভাবে সর্বক্ষণ রক্ত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দিয়ে চক্রাকারে আবর্তিত হ'তে থাকে।

17.6. কুনো ব্যাঙের ধমনীতন্ত্র *[Arterial system of Toad]*

হৃৎপিণ্ড থেকে পরিস্রুত রক্ত† যে নালিকা দ্বারা দেহের সর্বত্র পরিচালিত



চিত্র 17·11—কুনো ব্যাঙের ধমনীতন্ত্র।

হয়, তাকে ধমনী (Artery) **বলে।** হৃৎপিণ্ড, ধমনী এবং ধমনীর **শাখা**-প্রশাখা নিয়ে ধমনীতে গঠিত। কোনাস আর্টারিওসাস থেকে উৎপন্ন এক-

* কোনাস আর্টারিওসাস মধ্যস্থ **সর্পিল কপাটক** (Spiral valve) কোনাসকে যান্ত্রিক শক্তি যোগায়। রক্ত সঞ্চালনে এর কোন ভূমিকা নেই।

† ব্যতিক্রম—ফুসফুস ধমনী (Pulmonary Artery) মাধ্যমে অপরিস্রুত রক্ত ফুসফুসে যায়।

(4) করোটি **একটি কনডাইল যুক্ত।**

(5) করোটিক নার্ভ 12 জোড়া।

(6) **ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য** চালায়।

(7) **হৃৎপিণ্ড তিন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত**—দুটি অলিন্দ ও একটি নিলয়। তবে নিলয় একটি অসম্পূর্ণ পর্দা দ্বারা আংশিকভাবে বিভক্ত। কোনস আর্টারিওসস নাই।

(8) ত্বক শুষ্ক (dry)।

(9) ডাঙ্গায় ডিম পাড়ে।

(10) পদ অঙ্গুলিযুক্ত ও অঙ্গুলির শেষ প্রান্তে **নখ** বিদ্যমান।

● উদাহরণ : **গিরগিটি** (*Calotes*), **টিকটিকি** (*Hemidactylus*), **ক্যামেলিয়ন** (*Chameleon*), **কুমীর** (*Crocodilus*)*, **কেউটে সাপ** (*Naja naja*), **কচ্ছপ** (*Thionyx*), **উড়ন্ত টিকটিকি** (*Draco*) ইত্যাদি (চিত্র 2.44)।

V. শ্রেণী আভিস বা পক্ষী (Aves)

● প্রধান বৈশিষ্ট্য :

(1) **উষ্ণশোণিত** প্রাণী।

(2) দেহ **পালকে ঢাকা**। পায়ের অনাবৃত অংশ **আঁশে ঢাকা।**

(3) **অগ্রপদ ডানায় রূপান্তরিত।** পক্ষান্তরে পশ্চাৎপদ লম্বা, সুঠাম, বহিস্ত্বকীয় আঁশযুক্ত এবং **অঙ্গুলি** নখরযুক্ত।

(4) হৃৎপিণ্ড **চারিটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত**—দুটি অলিন্দ ও দুটি নিলয়।

(5) **চক্ষু আছে, দাঁত নাই।**

(6) দন্তবিহীন চোয়াল দুটির অগ্রভাগ **চঞ্চুতে** পরিণত।

(7) অধিকাংশের **অস্থি ফাঁপা, বায়ুপূর্ণ।**

(8) **ফুসফুস বায়ুস্থলিযুক্ত।**

(9) করোটিক নার্ভের সংখ্যা 12 জোড়া।

(10) ডিমের মধ্যে ভ্রূণের পরিস্ফুটন ঘটে।

(11) মূত্রস্থলি, ডানদিকের ডিম্বাশয় ও ডিম্বনালী এবং বাঁদিকের মহাধমনী অবর্তমান।

(12) ভ্রূণ অ্যামনিয়ন পর্দায় আবদ্ধ থাকে।

● উদাহরণ : **টিয়া** (*Psittacula*), **উটপাখী** (*Struthio*), **পেঙ্গুইন** (*Penguin*), **কিউই** (*Apteryx*), **বীণাপাখী** (*Vina bird*), **বাজ** (*Falcon*), **ময়ূর** (*Pavo*) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের পাখী (চিত্র 2.45)।

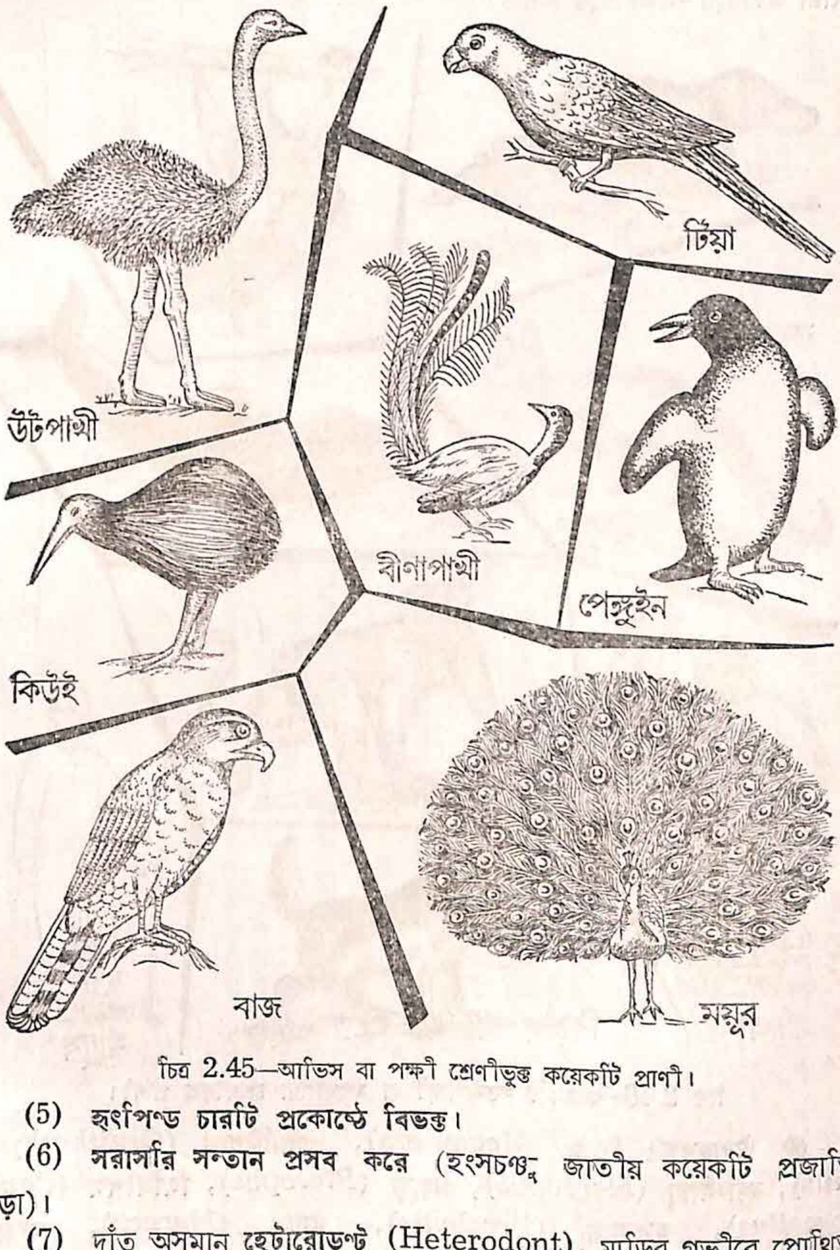
VI. শ্রেণী ম্যামেলিয়া বা স্তন্যপায়ী (Mammalia)

● প্রধান বৈশিষ্ট্য :

(1) উষ্ণশোণিত চতুষ্পদ প্রাণী।

* ব্যতিক্রম—কুমীরের হৃৎপিণ্ড চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত।

(2) দেহ রোমে ঢাকা।
(3) বহিঃকর্ণ (পিনা) বর্তমান।
(4) স্তনদুগ্ধে শিশুরা পালিত হয়।



চিত্র 2.45—আভিস বা পক্ষী শ্রেণীভুক্ত কয়েকটি প্রাণী।

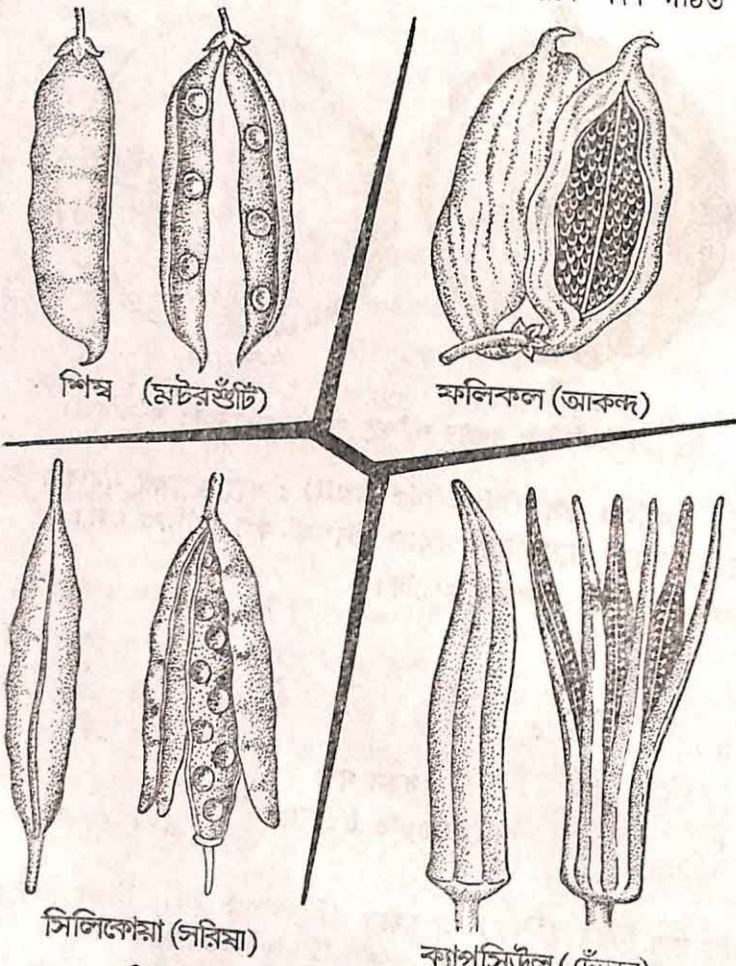
(5) হৃৎপিণ্ড চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত।

(6) সরাসরি সন্তান প্রসব করে (হংসচঞ্চু জাতীয় কয়েকটি প্রজাতি ছাড়া)।

(7) দাঁত অসমান হেটারোডন্ট (Heterodont), মাড়ির গভীরে প্রোথিত থিকোডন্ট (Thecodont) প্রকৃতির। তাছাড়া, দু'বার দন্তোৎগম হয় বলে এদের ডাইফায়োডন্ট (Diphyodont) বলা হয়।

(2) **ফলিকল (Follicle)** ঃ **আকন্দের** ফল শিম্বের মতই, তবে ফল পাকলে গর্ভপত্রের একদিকের সন্ধি (অঙ্কসন্ধি) বরাবর ফেটে যায়। এই জাতীয় ফল ফলিকল।

(3) **সিলিকোয়া (Siliqua)** ঃ **সরিষা, মূলা** প্রভৃতির ডিম্বাশয় প্রথমে এক প্রকোষ্ঠযুক্ত, পরে **রেপলম (Replum)** নামে পর্দা গঠিত হওয়ায়



চিত্র 14.5—বিভিন্ন প্রকার নিরস বিদারী সরল ফল।

দুই প্রকোষ্ঠযুক্ত হয়। বীজগুলি রেপলমের গায়ে যুক্ত থাকে। এই ফলকে সিলিকোয়া বলে।

(4) **ক্যাপসিউল (Capsule)** ঃ একাধিক প্রকোষ্ঠযুক্ত দুই বা ততোধিক যুক্তগর্ভপত্রী ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন যে ফল পরিণত অবস্থায় গর্ভপত্রের সন্ধি বরাবর বা অন্যান্য নানা পন্থায় ফেটে যায়, তাকে ক্যাপসিউল বলে। উদাহরণ—**ঢেঁড়স, কার্পাস, আফিং, মোরগফুল** ইত্যাদি।

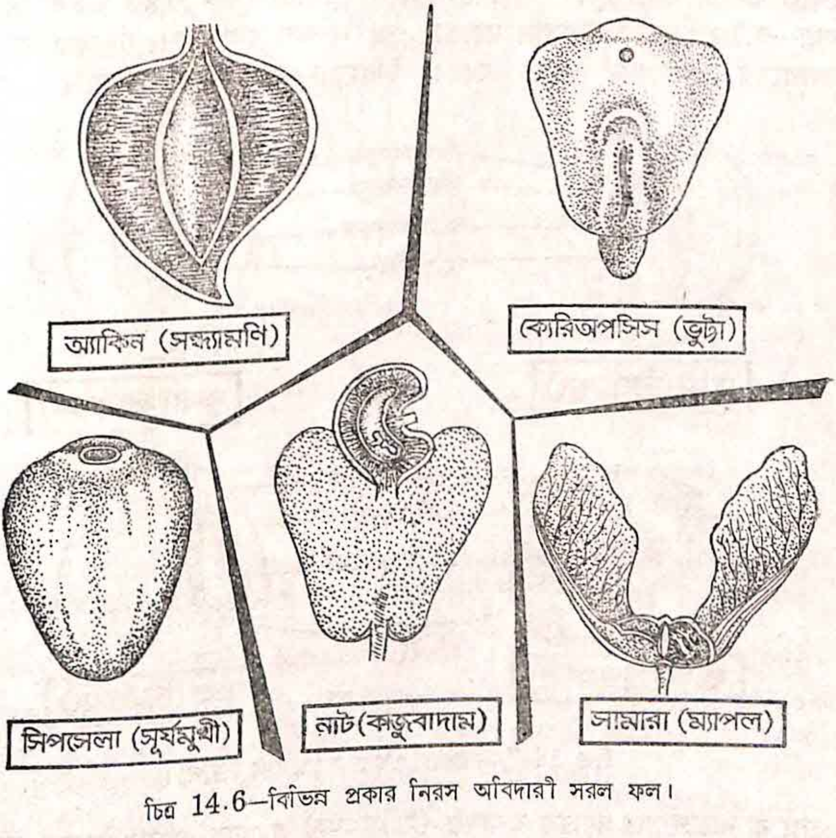
14.4. নিরস, অবিদারী সরল ফল [*Dry, indehiscent simple fruits*] (চিত্র *14.6*) :

(1) **ক্যেরিঅপসিস্** (Caryopsis) ঃ একপ্রকোষ্ঠী একবীজী, এক-গর্ভপত্রী ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন যে ফলের **ফলত্বক ও বীজত্বক অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর যুক্ত** থাকে, তাকে ক্যেরিঅপসিস্ বলে।

উদাহরণ—**ধান, গম, ভুট্টা** ইত্যাদি।

(2) **অ্যাকিন** (Achene) ঃ এটি ক্যেরিঅপসিসের মতো ; তবে এক্ষেত্রে ফলত্বক ও বীজত্বককে সহজে পৃথক করা যায়।

উদাহরণ—**সন্ধ্যামণি, ছাগলবটি, কালজিরা** ইত্যাদি।



চিত্র 14.6—বিভিন্ন প্রকার নিরস অবিদারী সরল ফল।

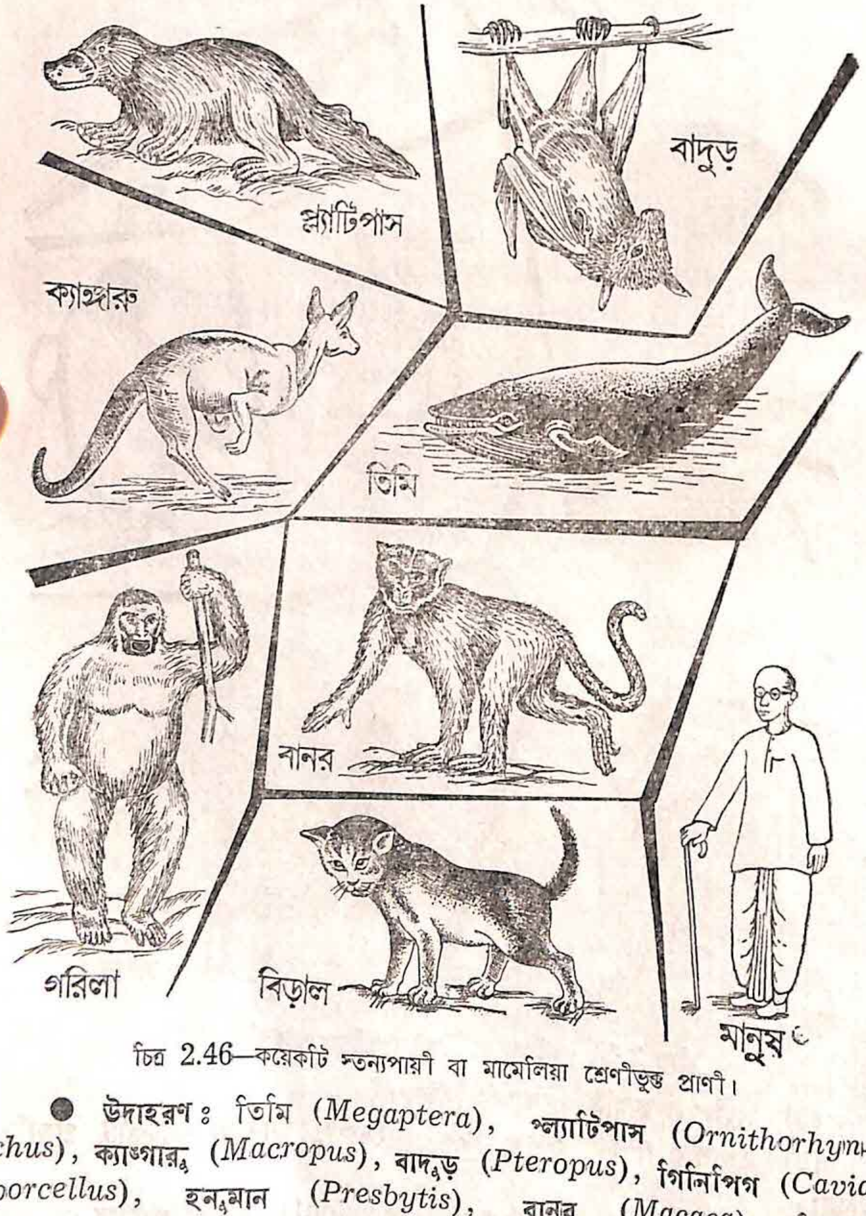
(3) **সিপসেলা** (Cypsela) ঃ দ্বিগর্ভপত্রী, অধোগর্ভ ডিম্বাশয় (Inferior ovary) থেকে উৎপন্ন একপ্রকোষ্ঠী এবং একবীজী ফলকে সিপসেলা বলে।

উদাহরণ—**সূর্যমুখী, গাঁদা** ইত্যাদি।

(8) পরিণত লোহিত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াস বিহীন।

(9) জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের বৃদ্ধি ঘটে।

(10) ভ্রূণ অ্যামনিয়ন পর্দা দ্বারা ঢাকা থাকে এবং অমরা (Placenta) দ্বারা জরায়ুর সঙ্গে যুক্ত থাকে।



চিত্র 2.46—কয়েকটি স্তন্যপায়ী বা মামেলিয়া শ্রেণীভুক্ত প্রাণী।

● উদাহরণ: তিমি (*Megaptera*), প্ল্যাটিপাস (*Ornithorhyn-chus*), ক্যাঙগারু (*Macropus*), বাদুড় (*Pteropus*), গিনিপিগ (*Cavia porcellus*), হনুমান (*Presbytis*), বানর (*Macaca*), জিরাফ (*Giraffe*) গণ্ডার (*Rhinoceros*), সিপাঞ্জী (*Pan*), মানুষ (*Homo sapiens*) ইত্যাদি (চিত্র 2.46)।

2.9. প্রাণিরাজ্য [*Animal kingdom*] :

- উপরাজ্য (Sub-kingdom) প্রোটোজোয়া (Protozoa)
  - পর্ব 1. প্রোটোজোয়া
- উপরাজ্য (Sub-kingdom) মেটাজোয়া (Metazoa)
  - পর্ব 2. পরিফেরা (Porifera) (স্পঞ্জ)
  - পর্ব 3. নিডারিয়া (Cnidaria) (হাইড্রা)
  - পর্ব 4. টিনোফোরা (Ctenophora) (বেরো)
  - পর্ব 5. প্ল্যাটিহেল-মিনথিস (Platyhelminthes) (ফিতা কৃমি)
  - পর্ব 6. অ্যাস্কেল-মিনথিস (Aschelminthes) (হুকওয়ার্ম)
  - পর্ব 7. আনেলিডা (Annelida) (কেঁচো)
  - পর্ব 8. আরথ্রোপডা (Arthropoda) (আরশোলা)
  - পর্ব 9. মলাস্কা (Mollusca) (শামুক)
  - পর্ব 10. একাইনো-ডারমাটা (Echinodermata) (তারামাছ)
  - পর্ব 11. কর্ডাটা (Chordata)
    - প্রোটোকর্ডাটা (Protochordata)
      - উপপর্ব হেমিকর্ডাটা (Hemichordata) (ব্যালানোগ্লসাস)
      - উপপর্ব ইউরোকর্ডাটা (Urochordata) (অ্যাসিডিয়া)
      - উপপর্ব কেফালোকর্ডাটা (Cephalochordata) (অ্যাম্ফিঅক্সাস)
    - ভার্টিব্রাটা (Vertebrata)
      - উপপর্ব ভার্টিব্রাটা (Subphylum Vertebrata)
        - অধিশ্রেণী আনাথা (Agnatha) (হ্যাগফিস)
        - অধিশ্রেণী ন্যাথোস্টোমাটা (Gnathostomata)
          - শ্রেণী কনড্রিকথিস (হাঙর)
          - শ্রেণী অস্টিকথিস (রুই, কাতলা)
          - শ্রেণী আম্ফিবিয়া (Amphibia) (ব্যাঙ)
          - শ্রেণী রেপটিলিয়া (Reptilia) (কুমীর)
          - শ্রেণী আভিস (Aves) (পাখি)
          - শ্রেণী মামেলিয়া (Mammalia) (মানুষ)

(4) **নাট** (Nut) : কঠিন ও কাষ্ঠল ফলত্বকবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক যুক্তগর্ভপত্রী ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন ফলকে নাট বলে।

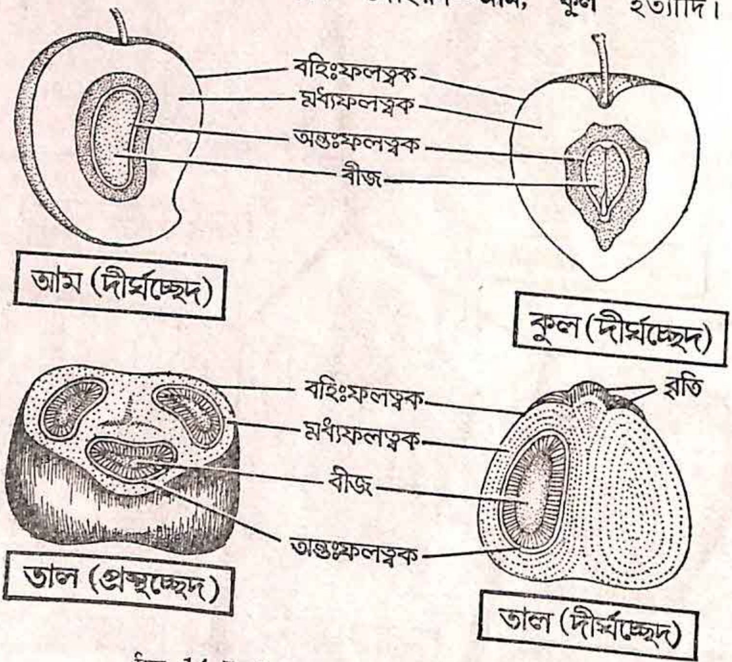
উদাহরণ—**কাজুবাদাম, ওক, লিচু, আঁশফল** ইত্যাদি।

(5) **সামারা** (Samara) : দুই বা ততোধিক প্রকোষ্ঠযুক্ত দুই বা ততোধিক যুক্তগর্ভপত্রী ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন ফলকে সামারা বলে।

উদাহরণ—**মাধবীলতা, ম্যাপল, খামআলু** ইত্যাদি।

14.5. সরস সরল ফল [*Fleshy simple fruits*] :

(1) **ড্রুপ** (Drupe) : এক প্রকোষ্ঠযুক্ত, একগর্ভপত্রী ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন ফল ড্রুপ। ড্রুপের ফলত্বক তিনটি পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত, যথা—কঠিন অন্তস্ত্বক, রসাল মধ্যত্বক এবং পাতলা বহিস্ত্বক। বহিস্ত্বক পাতলা খোলসের আবরণ গঠন করে। উদাহরণ—**আম, কুল** ইত্যাদি। তবে



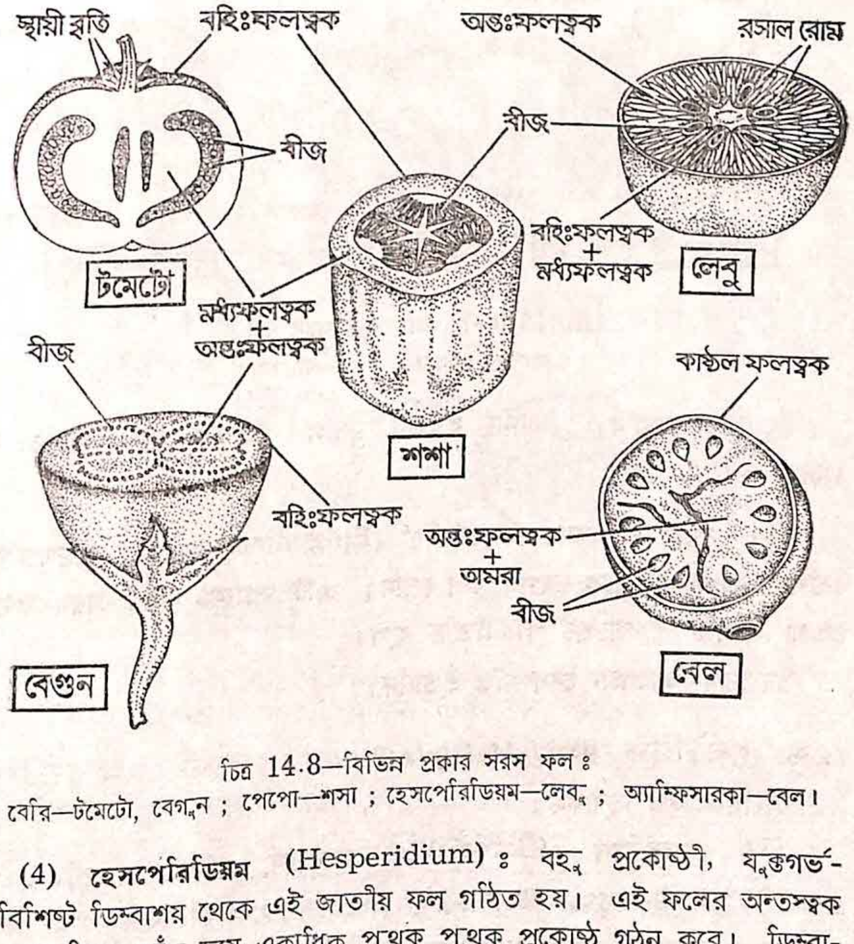
চিত্র 14.7—বিভিন্ন প্রকার সরস ফল (ড্রুপ)।

তাল বা **নারকেলের** মধ্যত্বক **তন্তুময়** (Fibrous) হওয়ায়, এইসব ফলকে **তন্তুময় ড্রুপ** (Fibrous drupe) বলে।

(2) **বেরি** (Berry) : এক বা একাধিক গর্ভপত্রবিশিষ্ট ডিম্বাশয় থেকে বেরি গঠিত হয়। বেরির অন্তস্ত্বক ও মধ্যত্বক রসাল।

উদাহরণ—**টমেটো** (চিত্র 14.8), **বেগুন, পেয়ারা, কলা** ইত্যাদি।

(3) **পেপো** (Pepo) ঃ **লাউ, তরমুজ, কুমড়ো, শসা (চিত্র 14·8)** প্রভৃতির ফল পেপো। তিন গর্ভপত্রী, বহুপ্রান্তীয় অমরাবিন্যাসবিশিষ্ট পেপোর বহিস্ত্বক অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়ে খোলস গঠন করে। অসংখ্য বীজ অমরার সঙ্গে যুক্ত থাকে।



চিত্র 14·8—বিভিন্ন প্রকার সরস ফল ঃ
বেরি—টমেটো, বেগুন ; পেপো—শসা ; হেসপেরিডিয়ম—লেবু ; অ্যাম্ফিসারকা—বেল।

(4) **হেসপেরিডিয়ম** (Hesperidium) ঃ বহু প্রকোষ্ঠী, যুক্তগর্ভপত্রীবিশিষ্ট ডিম্বাশয় থেকে এই জাতীয় ফল গঠিত হয়। এই ফলের অন্তস্ত্বক ভিতরের দিকে ভাঁজ হয়ে একাধিক পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠ গঠন করে। ডিম্বাশয়ের রোমগুলি রসাল। এই রসাল রোমগুলি খাওয়া হয়।

উদাহরণ—**লেবু**।

(5) **অ্যাম্ফিসারকা** (Amphisarca) ঃ কঠিন ও কাষ্ঠল বহিস্ত্বক বিশিষ্ট যে ফলের অন্তস্ত্বক ও অমরার অংশবিশেষ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তাকে অ্যাম্ফিসারকা বলে।

উদাহরণ—**কদবেল, বেল** ইত্যাদি।

2.10. মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য [*Similarities and dissimilarities between Vertebrates and Invertebrates*] :

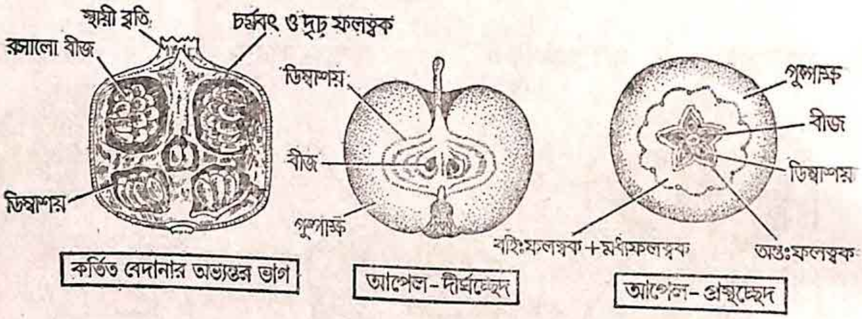
আদ্যপ্রাণী বা প্রোটোজোয়া থেকে সুরু করে কণ্টকত্বক প্রাণী বা একাইনোডারমাটা পর্বভুক্ত কোন প্রাণীরই মেরুদণ্ড নাই। এমনকি কর্ডাটা পর্বের প্রোটোকর্ডাটা (Protochordata)-ভুক্ত কোন প্রাণীরও মেরুদণ্ড নাই। মেরুদণ্ডহীন এইসব প্রাণী **অমেরুদণ্ডী** নামে পরিচিত। এদিকে কর্ডাটা পর্বের **ভার্টিব্রাটা** উপপর্বভুক্ত প্রাণীদেহে মেরুদণ্ড বিদ্যমান ; তাই তারা মেরুদণ্ডী প্রাণী। **মেরুদণ্ডী প্রাণীমাত্রেই কর্ডাটা পর্বভুক্ত ; কিন্তু কর্ডাটা পর্বভুক্ত সব প্রাণীই মেরুদণ্ডী নয়** (All vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates.)।

নীচে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখান হল ঃ

অমেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডী
(1) দেহে নোটোকর্ড নাই। ব্যতিক্রম ঃ প্রোটোকর্ডাটা।	(1) জীবনের প্রথম অবস্থায় নোটোকর্ড থাকে। পরে সেটিই অস্থিময় মেরুদণ্ডে পরিণত হয়।
(2) দেহ এককোষী বা বহুকোষী।	(2) দেহ বহুকোষী।
(3) দেহ দ্বি-ত্বক বা ত্রি-ত্বকবিশিষ্ট।	(3) দেহ দ্বি-ত্বকবিশিষ্ট।
(4) দেহ পরিবর্তনশীল, অরীয় সুষম (radially symmetrical) বা দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম (bilaterally symmetrical)।	(4) সর্বদা দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম।
(5) দেহ অখণ্ডিত বা কতকগুলি খণ্ডক দ্বারা গঠিত।	(5) দেহ মূলতঃ খণ্ডিত।
(6) গমন-অঙ্গ বা **পদের সংখ্যা** দু-জোড়ার বেশী।	(6) গমন-অঙ্গ বা **পদের সংখ্যা** কখনও দু-জোড়ার **বেশী হয় না**।
(7) চোখ থাকলে পুঞ্জাক্ষি।	(7) কখনও পুঞ্জাক্ষি নয়, সর্বদা সরলাক্ষি।
(8) দেহের কাঠামো প্রধানত বহিঃ-কঙ্কাল দ্বারা গঠিত। অন্তঃ-কঙ্কাল থাকলে সেটি কখনই তরুণাস্থি বা অস্থির দ্বারা গঠিত নয়।	(8) অন্তকঙ্কালের কাঠামো তরুণাস্থি ও অস্থি, কিংবা কেবল তরুণাস্থি বা কেবল অস্থি দ্বারা গঠিত।

অমেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডী
(9) লেজ নাই।	(9) জীবনের কোন না কোন দশায় লেজ থাকে, এমনকি ক্ষয়িষ্ণু অঙ্গরূপেও লেজের অস্তিত্ব বিদ্যমান।
(10) মুখছিদ্র ও পায়ু দেহের পশ্চাৎপ্রান্তে বা একই প্রান্তে কাছাকাছি অবস্থিত।	(10) উভয় অঙ্গ কখনই কাছাকাছি অবস্থিত নয়।
(11) পৌষ্টিকনালী থাকলে সেটি সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ।	(11) পৌষ্টিক নালী সর্বদাই সম্পূর্ণ।
(12) নাসারন্ধ্র নাই।	(12) নাসারন্ধ্র আছে।
(13) মস্তিষ্ক থাকলে তা অস্থি-নির্মিত করোটি দ্বারা ঢাকা থাকে না। ব্যতিক্রম : সিপিয়ার মস্তিষ্ক শক্ত আবরণে ঢাকা থাকে। তবে আবরণটি কখনই অস্থি বা তরুণাস্থি নির্মিত নয়।	(13) মস্তিষ্ক সর্বদা বর্তমান এবং মস্তিষ্ক ঢাকা থাকে।
(14) হৃৎপিণ্ড থাকলে সেটি এবং প্রধান রক্তনালীসমূহ পৃষ্ঠ-দেশে অবস্থিত।	(14) হৃৎপিণ্ড সর্বদা বর্তমান এবং তা অঙ্কদেশে অবস্থিত।
(15) রক্তসংবহনতন্ত্র সাধারণতঃ মুক্ত। ব্যতিক্রম : কেঁচো।	(15) রক্ত সংবহনতন্ত্র বন্ধ।
(16) রক্ত লাল নয়। ব্যতিক্রম : কেঁচো ও কাইরোনোমাস জাতীয় পতঙ্গের লার্ভা। এদের রক্তরসে (লোহিত রক্তকণিকায় নয়) হিমোগ্লোবিন থাকায় রক্ত লাল।	(16) লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিন থাকায় রক্ত লাল।
(17) নির্দিষ্ট শ্বাস-অঙ্গ থাকে বা থাকে না।	(17) নির্দিষ্ট শ্বাস-অঙ্গ থাকে।
(18) গলবিলে ফুলকা-ছিদ্র থাকে না। ব্যতিক্রম : প্রোটোকর্ডাটাভুক্ত প্রাণী।	(18) জীবনের কোন-না-কোন দশায় ফুলকা-ছিদ্র থাকে।
(19) একলিঙ্গ বা উভলিঙ্গ।	(19) একলিঙ্গ।
(20) জনন-অঙ্গ স্থায়ী, সংখ্যায় একজোড়া অথবা একজোড়ার বেশী।	(20) জনন-অঙ্গ স্থায়ী এবং সংখ্যায় একজোড়া।

(6) **ব্যালাস্টা** (Balausta) ঃ এটি বহু প্রকোষ্ঠী, বহুবীজী ফল। ফলত্বক খসখসে কঠিন। গর্ভশীর্ষ পুষ্পের বৃতি ফলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। বীজের বহিস্ত্বক রসাল।



চিত্র 14.9—বিভিন্ন প্রকার সরস ফল ঃ
ব্যালাস্টা—বেদানা ; পোম—আপেল।

উদাহরণ—**বেদানা**। বেদানা বীজের রসাল বহিস্ত্বক অংশই খাওয়া হয় (চিত্র 14.9)।

(7) **পোম** (Pome) ঃ গর্ভশীর্ষ (Epigynous) পুষ্পের যুক্তগর্ভপত্র-বিশিষ্ট ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন ফল পোম। এটি অপ্রকৃত ফল। কারণ, ভক্ষণ-যোগ্য অংশটি পুষ্পাক্ষের পরিবর্তিত রূপ।

উদাহরণ—**আপেল, নেসপাতি** ইত্যাদি।

14.6. যৌগিক ফল *[Multiple Fruit] :*

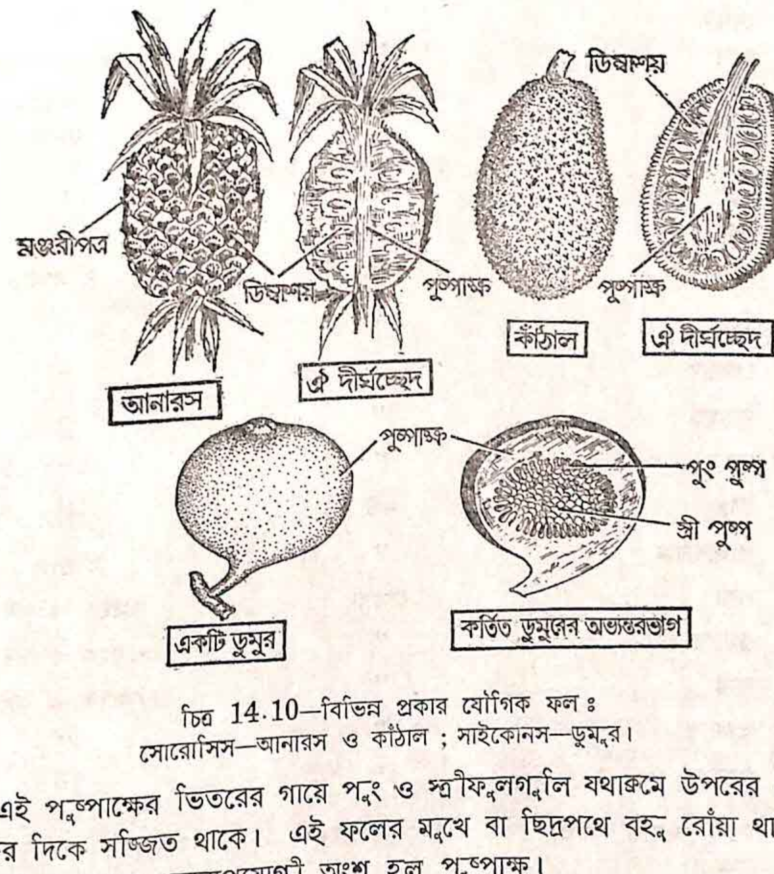
যৌগিক ফল দু'রকম ঃ

(1) **সোরোসিস** (Sorosis) ঃ **আনারস, কাঁঠাল** প্রভৃতি ফল সোরোসিসের উদাহরণ। উভয়ক্ষেত্রেই সমগ্র পুষ্পমঞ্জরী ফল গঠন করে। আনারসের স্থূল ও রসাল পুষ্পাক্ষের উপর অবস্থিত বৃন্তহীন স্ত্রীপুষ্পগুলি পরস্পর জুড়ে যায়। আনারসের চোখ এক একটি পুষ্পের অবস্থান নির্দেশ করে। কাঁঠালের গদাকৃতি পুষ্পাক্ষ স্থূল, কিন্তু রসাল নয়।

পুষ্পাক্ষের উপর বৃন্তহীন স্ত্রীপুষ্প সাজান থাকে। স্ত্রীপুষ্পগুলির গর্ভপত্র বাইরের দিকে জুড়ে গিয়ে কাঁঠালের কণ্টকত্বক গঠিত হয়। কাঁঠালের ডিম্বাশয়কে কোয়া বলে।

(2) **সাইকোনস** (Syconus) ঃ ডুমুর, অশ্বত্থ বা বটের যৌগিক ফলের নাম সাইকোনস। এই ফলের পুষ্পাক্ষ ফাঁপা বলের আকৃতি লাভ করে।

উদাহরণ—ডুমুর।



চিত্র 14.10—বিভিন্ন প্রকার যৌগিক ফল ঃ
সোরোসিস—আনারস ও কাঁঠাল ; সাইকোনস—ডুমুর।

এই পুষ্পাক্ষের ভিতরের গায়ে পুং ও স্ত্রীফুলগুলি যথাক্রমে উপরের এবং নীচের দিকে সজ্জিত থাকে। এই ফলের মুখে বা ছিদ্রপথে বহু রোঁয়া থাকে। সাইকোনস ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ হল পুষ্পাক্ষ।

● **নীচে কতকগুলি ফলের শ্রেণী ও ভক্ষ্যাংশের অঙ্গসংস্থানগত প্রকৃতির (Morphological nature) নির্দেশ দেওয়া হল ঃ**

ফল	শ্রেণী	ভক্ষ্যাংশ
(1) আম	ড্রুপ	মধ্যত্বক
(2) আমড়া	,,	,,
(3) কুল	,,	মধ্যত্বক ও বহিস্ত্বক
(4) আখরোট	,,	বীজপত্র
(5) নারকেল	তন্তুময় ড্রুপ	সস্য
(6) তাল	,,	মধ্যত্বকস্থ শাঁস ও সস্য

অমেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডী
(21) রেচন-অঙ্গ থাকলে দেহের নানান অংশে থাকে এবং এগুলির আকৃতি নানান ধরনের। রেচন অঙ্গের সংখ্যা দুয়ের বেশী।	(21) দেহগহ্বরে পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত একজোড়া বৃক্ক এদের নির্দিষ্ট রেচন-অঙ্গ।
(22) যদি দেহগহ্বর থাকে, তবে তা সিউডোসিল, হিমোসিল বা সিলোম।	(22) দেহগহ্বর বর্তমান এবং তা সিলোম।
(23) জনন প্রক্রিয়া যৌন বা অযৌন।	(23) জনন প্রক্রিয়া যৌন।

2.11. কর্ডাটা ও অকর্ডাটার পার্থক্য [*Differences between Chordata and Achordata*] :

কর্ডাটা	অকর্ডাটা
(1) নোটোকর্ড থাকে।	(1) নোটোকর্ড থাকে না।
(2) অন্তঃকঙ্কাল বর্তমান। সেটি দেহের কাঠামো গঠন করে।	(2) অন্তঃকঙ্কাল নাই।
(3) স্নায়ুরসপূর্ণ ফাঁপা কেন্দ্রীয় নার্ভসূত্র (Dorsal hollow nerve cord) পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত।	(3) ফাঁপা নয় এমন নার্ভসূত্র অঙ্কদেশে অবস্থিত।
(4) মস্তিষ্ক ফাঁপা।	(4) মস্তিষ্ক ফাঁপা নয়।
(5) ভ্রূণ অবস্থায় বা সারাজীবন গলবিলীয় ফুলকা-ছিদ্র (Pharyngeal gill slits) বর্তমান।	(5) জীবনের কোন অবস্থাতেই ফুলকা-ছিদ্র থাকে না।
(6) হৃৎপিণ্ড বর্তমান এবং সেটি পৌষ্টিকনালীর অঙ্কদেশে অবস্থিত।	(6) হৃৎপিণ্ড থাকলে তা অন্ত্রের পৌষ্টিকনালীর পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত।
(7) সরলাক্ষির অধিকারী।	(7) সরলাক্ষি বা পুঞ্জাক্ষির অধিকারী।
(8) অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাসারন্ধ্র বর্তমান।	(8) নাসারন্ধ্র নাই।
(9) নির্দিষ্ট শ্বাসযন্ত্র বর্তমান।	(9) নির্দিষ্ট শ্বাসযন্ত্র থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে।

কর্ডাটা	অকর্ডাটা
(10) পা দু-জোড়ার বেশী নয়।	(10) পা থাকলে দু-জোড়ার বেশী।
(11) জীবনের প্রারম্ভে বা সারা-জীবন লেজ থাকে।	(11) কোন অবস্থাতেই লেজ থাকে না।
(12) নির্দিষ্ট জননাঙ্গ বর্তমান—যৌন জনন-পদ্ধতি অনুসৃত হয়।	(12) নির্দিষ্ট জনন-যন্ত্র থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে —যৌন বা অযৌন উভয় পদ্ধতিই অনুসৃত হয়।

ব্যবহারিক [Practical]

2.12. উদ্ভিদ-অঙ্গ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ *[Collection and preservation of plant parts] :*

উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করার পর উদ্ভিদ সংগ্রহের আগ্রহ জাগা স্বাভাবিক। সেই আগ্রহ শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব পরিবেশে যত্নে বা অযত্নে বেড়ে ওঠা নানাধরনের গাছপালার সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করে।

কোন এলাকার গাছপালার সঙ্গে শুধু পরিচিত হলেই চলে না, সেগুলি সংগ্রহ ক'রে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করা দরকার। কারণ বিভিন্ন স্থানের গাছপালার মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত তারতম্য থাকতে পারে। কোন এলাকায় বিশেষ কোন গাছের প্রাচুর্য থাকলেও অন্যত্র হয়ত তার অস্তিত্বই নাই। তাছাড়া, জীবের উপর পরিবেশের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। তাই বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে একই গাছের চেহারা ভিন্ন হতে পারে।

2.13. সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্য *[Purpose of collection and preservation] :*

সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় গাছের আকৃতি ও প্রকৃতিগত তারতম্য সহজে ধরা পড়ে। সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংরক্ষিত গাছপালা শতবর্ষেরও অধিক অক্ষত থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গাছপালা ধ্বংস হলেও সংরক্ষিত গাছপালা দেখে বিশেষ কোন্ স্থানে কি ধরনের গাছপালা ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। **গবেষক ও বিজ্ঞানীর কাছে উদ্ভিদ-সংগ্রহ ও উদ্ভিদ-সংরক্ষণের মূল্য অপরিসীম।** জীববিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে **সংগ্রহ ও সংরক্ষণ** পদ্ধতির প্রাথমিক পাঠ নেওয়া এখনই প্রয়োজন।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর পূর্বে উদ্ভিদ-অঙ্গের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হত না। 1550 খ্রীষ্টাব্দে **সিসালপিনো** (Caesalpino) (চিত্র 2.3) ও তারপর অন্যান্য বিজ্ঞানী উদ্ভিদ সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। এর পরই উদ্ভিদ সংগ্রহের গুরুত্ব ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশঃ **সংগ্রহশালা** (Herbarium) গড়ে উঠতে থাকে। প্রতিটি দেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায়

হরেক রকমের গাছপালা সংগৃহীত আছে। আমাদের দেশের সর্ববৃহৎ সংগ্রহশালা অর্থাৎ, **কেন্দ্রীয় জাতীয় সংগ্রহশালা** (Central National Herbarium) হাওড়া জেলার শিবপুরে অবস্থিত। দেরাদুন, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, পুণে, শিলং, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে ছোটবড় অনেক সংগ্রহশালা আছে।

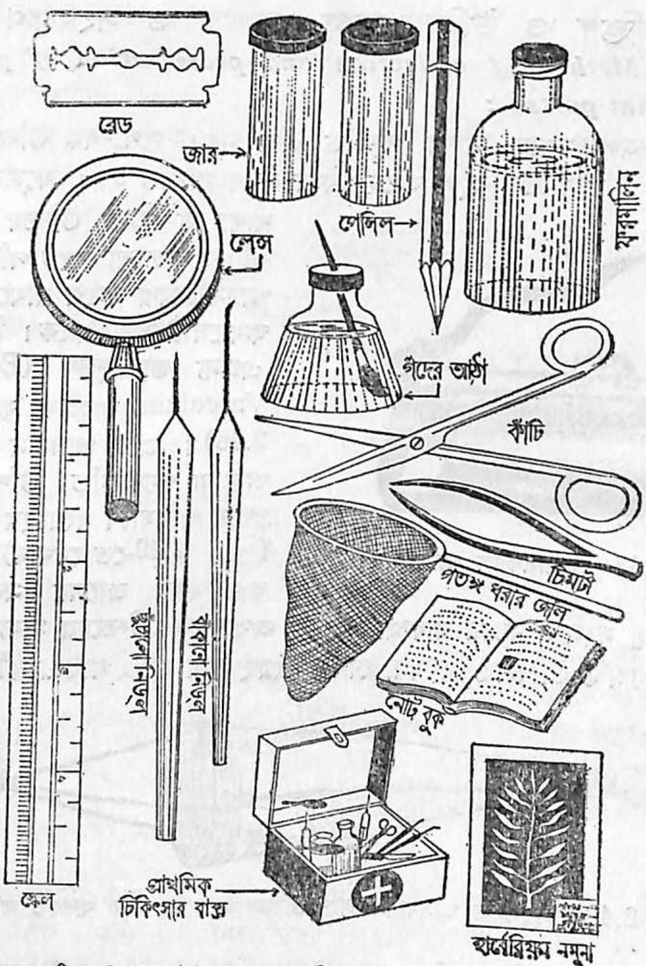
এলোমেলোভাবে বিভিন্ন স্থানের গাছপালা সংগ্রহ করা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক নয়। উদ্ভিদ সংগ্রহের জন্য পৃথক পৃথক এলাকা বেছে নিতে হয়। বিশেষ কোন এলাকার গাছপালা ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে পর্যবেক্ষণ করলে সেই সেই ঋতুতে সেখানকার গাছপালার আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয়। পর্যবেক্ষণ ও সংগ্রহের সুবিধার জন্য **শিক্ষামূলক ভ্রমণ** (Educational excursion)-এর বন্দোবস্ত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। জীববিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশগ্রহণ করার রীতি প্রচলিত আছে। এতে যেমন নতুন নতুন জায়গা দেখা যায়, তেমনি সেই সেই জায়গার বৈচিত্র্যময় গাছপালার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়।

2.14. কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা [*A few important herbaria*] :

নীচে দেশী-বিদেশী কয়েকটি সংগ্রহশালার নাম, প্রতিষ্ঠার বছর, সংগৃহীত প্রজাতির সংখ্যা উল্লেখ করা হল।

সংগ্রহশালার নাম	প্রতিষ্ঠার বছর	সংগৃহীত প্রজাতির আনুমানিক সংখ্যা
1. কেন্দ্রীয় জাতীয় সংগ্রহশালা, কলিকাতা।	1787	35,00,000
2. বন গবেষণা সংস্থার সংগ্রহশালা, দেরাদুন।	1890	3,00,000
3. ব্ল্যাটার সংগ্রহশালা, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ, বোম্বাই।	—	1,00,000
4. জাতীয় উদ্ভিদ সংগ্রহশালা, লক্ষ্ণৌ।	1948	75,000
5. ব্রিটিশ মিউজিয়ম, লন্ডন, গ্রেট-ব্রিটেন।	1753	40,000,000
6. রাজকীয় উদ্ভিদ-উদ্যান, কিউ, রিচমন্ড, সারে, গ্রেটব্রিটেন।	—	60,00,000
7. প্যারিস মিউজিয়ম সংগ্রহশালা, ফ্রান্স।	1635	50,00,000
8. ইউনাইটেড স্টেটস জাতীয় সংগ্রহশালা, আমেরিকা।	1868	27,00,000

2.15. উদ্ভিদ এবং প্রাণী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি সাজসরঞ্জামের তালিকা [***A list of some requisites for collection and preservation of plants and animals***] :



চিত্র 2.47—উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ, সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি সাজসরঞ্জাম ও হার্বেরিয়ম নমুনা।

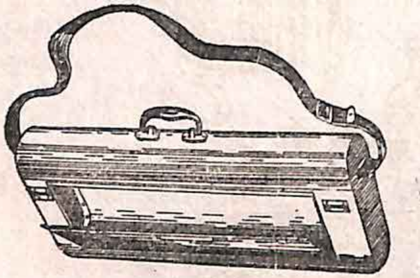
তালিকা (2.47) ঃ

(1) কাঁচি।
(2) ব্লেড।
(3) চিমটা।
(4) ছুঁচালো ও বাঁকানো নিড্‌ল।
(5) পতঙ্গ ধরার জাল।
(6) ফরমালিন।
(7) স্পেসিমেন জার।
(8) হ্যান্ড লেন্স।

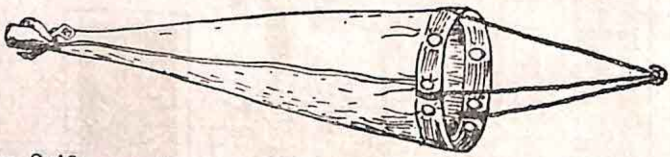
(9) পেন্সিল।
(10) নোট বুক।
(11) স্কেল।
(12) প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স।
(13) গঁদের আঠা।
(14) হার্বেরিয়ম নমুনা আঁটার জন্য বোর্ড।

2.16. উদ্ভিদ ও উদ্ভিদ-অঙ্গ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি *[Method of collection and preservation of plants an plant parts]* :

উদ্ভিদ-অংগ সংগ্রহ করার পদ্ধতি এক নয়। সপুষ্পক উদ্ভিদ সংগ্রহ করার সময় উদ্ভিদটিতে ফুল আছে কিনা লক্ষ্য রাখতে হয়। ফুলসহ একটি শাখা বা সমগ্র উদ্ভিদ ব্লেড বা কাঁচির সাহায্যে কেটে পলিথিন বা প্ল্যাসটিকের ব্যাগে রাখলে অনেকক্ষণ সেটি তাজা থাকে। বিশেষজ্ঞরা এজন্য **ভ্যাসকুলম** (Botanical Vasculum) ব্যবহার করেন (চিত্র 2.48)। জলে ভাসমান শেওলা বা অন্যান্য ক্ষুদ্রাকৃতি উদ্ভিদ একত্রে প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহের জন্য জাল (চিত্র 2.49-তে দেখান) ব্যবহার করা হয়। জালের সরু দিকে সংগ্রাহক-পাত্র সংলগ্ন করার ব্যবস্থা আছে। অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে টেরিডোফাইটার অন্তর্গত উদ্ভিদও (যেমন, ফার্ন) সংগ্রহ করা যায়। পাতার নীচে বাদামী বা পিংগল বর্ণের সারি সারি সাজানো গোলাকার **সোরস** (Sorus) আছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। ব্রায়োফাইটার অন্তর্গত উদ্ভিদও জনন-অংগসহ সংগ্রহ করলে ভাল হয়।



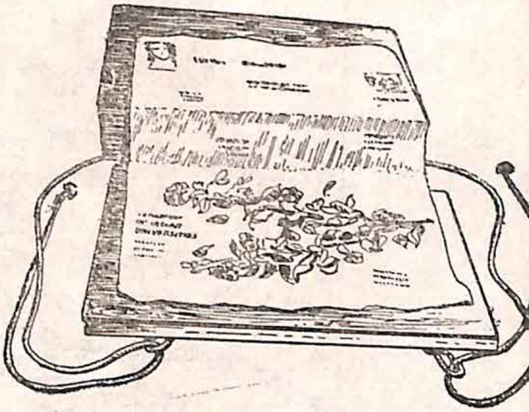
চিত্র 2.48—বোটানিক্যাল ভ্যাসকুলম।



চিত্র 2.49—ক্ষুদ্রাকৃতি ভাসমান জলজ উদ্ভিদ সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত জাল।

শুকনো অবস্থায় টেরিডোফাইটা সংরক্ষণ করা সম্ভব হলেও, ব্রায়োফাইটা বা থ্যালোফাইটা গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদকে জলীয় পদার্থে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হয়। জল (বা 70% অ্যালকোহল), 40% ফরমালিন ও গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক অ্যাসিড যথাক্রমে 90 : 5 : 5 অনুপাতে মেশালে ঐ জলীয় পদার্থ তৈরী হয়।

● **চাপ প্রদান** (Pressing) ঃ পলিথিন ব্যাগ থেকে সপুষ্পক উদ্ভিদের শাখাটি নিয়ে ভাঁজ-করা খবরের কাগজে (চিত্র 2.50) বা ব্লটিং পেপারের মধ্যে এমনভাবে যত্নসহকারে রাখতে হয়, যাতে পাতাগুলিতে বা ফুলে অহেতুক ভাঁজ না পড়ে। কাগজের উপরে অন্ততঃ একটি পাতাকে উল্টে দিতে হয়। এতে পাতাটির শিরা-বিন্যাস-পদ্ধতি সহজে বোঝা যায়। এইভাবে কাগজের ভাঁজে ভাঁজে সংগৃহীত উদ্ভিদ রেখে কাগজগুলি একত্রে ভারী তোরঙ্গ বা বিশেষভাবে নির্মিত চাপদায়ক ব্যবস্থার মধ্যে রাখা দরকার। পরের দিন অন্য খবরের কাগজে বা ব্লটিং পেপারের ভাঁজে ঐগুলিকে স্থানান্তরিত করতে হয়। এই পদ্ধতি পর পর তিন দিন অনুসরণ করলে কাগজের ভাঁজ থেকে ফুলসহ শাখাটিকে সহজে ওঠানো যায় এবং আশ্চর্যের কথা, পাতা বা ফুলগুলি বোঁটা থেকে খসে পড়ে না (চিত্র 2.50 ও 2.51 দ্রষ্টব্য)।



চিত্র 2.50—খবরের কাগজে সংগ্রহ রাখার পদ্ধতি।

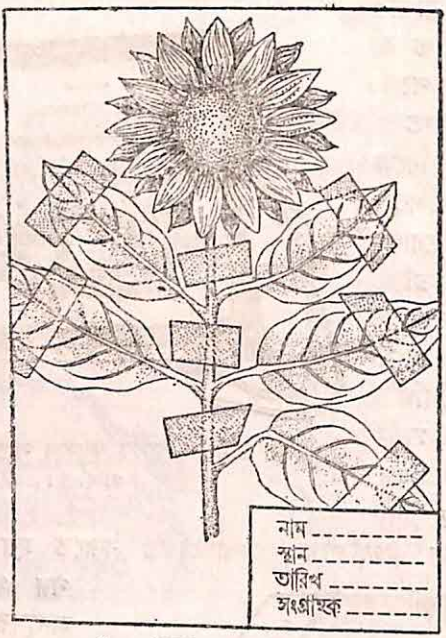


চিত্র 2.51—সংগৃহীত নমুনায় চাপ প্রদান।

এইভাবে কাগজের ভাঁজে রাখার উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমতঃ, এতে গাছটির দেহ থেকে রসের শোষণ ঘটে এবং **দ্বিতীয়তঃ**, গাছটি চ্যাপ্টা হয়।

● **যথাযথ সংস্থাপন** (Mounting) ঃ শুষ্ক ও চ্যাপ্টা গাছটিকে এখন ব্যবহারিক খাতার একটি পাতায় আটকে দিতে হয়। সেলোটেপ লাগিয়ে বা **সুতোর সাহায্যে** অথবা **আঠা লাগিয়েও** ঐ কাজটি করা চলে। গবেষক ও উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা নির্দিষ্ট মাপের (41.5×26.5 cm) পৃথক্ পৃথক্ সেঞ্চুরী বা ডুপ্লেক্স বোর্ডে সংগৃহীত উদ্ভিদ-অঙ্গ আটকে দেন। মাঝে মাঝে ন্যাপথলিনের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিলে সংগৃহীত অঙ্গ বহু দিন কীটমুক্ত থাকে। ইচ্ছা থাকলে, অল্পদিনে **সংগ্রহশালা** (Herbarium)-য় অনেক নমুনা (চিত্র 2.52) জমানো যায়।

খাতার বা বোর্ডের এক কোণায় সংগ্রহ-স্থান, তারিখ, পরিবেশ, উচ্চতা, গাছটির বা গাছের বিশেষ কোন অংগের নাম এবং সংগ্রাহকের নাম লিখে



চিত্র 2.52—হার্বেরিয়ম নমুনা।

রাখতে হয়। নীচে এই ধরনের একটি লেবেল দেখান হল ঃ—

হার্বেরিয়ম নমুনা (Herbarium Specimen)

ফ্লোরা (Flora) . . . . সংখ্যা (No. . . .)
গোত্র (Family) . . . .
নাম (Name) . . . .
স্থান (Locality) . . . .
উচ্চতা (Altitude) . . . .
বাসস্থান (Habitat) . . . .
সংগ্রহের তারিখ (Date of collection) . . . .
সংগ্রাহক (Collection by) . . . .

---

1. **হার্বেরিয়ম নমুনা-পরিচর্যা (Care of Herbarium Specimen) ঃ** যত্ন করে রাখলে নমুনা বহুকাল অবিকৃত থাকে। নমুনার সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে কীটপতঙ্গ ও জীবাণু। সেজন্য রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটে **মারকিউরিক ক্লোরাইড (Mercuric Chloride)**-এর 2% দ্রবণ করে মাঝে মাঝে স্প্রে করলে নমুনা ভাল থাকে। হার্বেরিয়মের খোপে **ন্যাপথালিন** বা **প্যারাডাই-**

ক্লোরোবেনজিন (Paradichlorobenzene) রাখলেও কাজ হয়। বছরে এক-বার অন্তত কার্বন ডাইসালফাইড (Carbon disulphide)-এর ধোঁয়া লাগালে পোকামাকড়ের হাত থেকে এগুলি রক্ষা পায়।

2.17. প্রাণী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ [*Collection and Preservation of Animals*] :

2. ব্যাঙাচি, মশা, প্রজাপতির বিভিন্ন দশা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ [Collection and preservation of life-stages of tadpole, mosquito and butterfly] ঃ

(ক) ব্যাঙাচি (Tadpole) ঃ ব্যাঙের নিষিক্ত ডিম্বাণু পরস্পর যুক্ত হয়ে ফিতার আকারে জলে ভেসে বেড়ায়। পনের দিনের মধ্যেই ডিমের আবরণ



চিত্র 2.53—ব্যাঙাচির বিভিন্ন দশা সংগ্রহ ঃ
1—ব্যাঙের ডিম ; 2-3—বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাঙাচি ; 4—বিভিন্ন দশা সংগ্রহ।

ভেদ করে ভ্রূণ বাইরে আসে। এই অবস্থার নাম ব্যাঙাচি। ব্যাঙাচিকে সহজেই চেনা যায়। ব্যাঙাচির দেহটি লম্বা এবং মস্তক, ধড় ও লেজ এই তিন অংশে বিভক্ত। অংকদেশে চোষক বা সাকার (Sucker) থাকে। কয়েকদিনের মধ্যে ব্যাঙাচির দেহে মুখ এবং মুখের ভিতরে দাঁত গঠিত হয়। মস্তকের দুপাশে

মোট **তিনজোড়া বহিঃফুলকা** (External gill)-র আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে কুণ্ডলীকৃত পৌষ্টিক নালী ও চক্ষু গঠিত হয়। ক্রমে ফুলকা দ্বারা **কানকো** (Operculum) ঢাকা পড়ে এবং কানকোর মধ্যে নতুন ফুলকার আবির্ভাব ঘটে। তখন বহিঃফুলকা শুকিয়ে যায়। প্রথম দিকে ব্যাঙাচি নিমজ্জিত বস্তুর সঙ্গে চোষকের সাহায্যে সংলগ্ন থাকে। পরে ব্যাঙাচি জলে সাঁতার কেটে বেড়ায়।

ব্যাঙাচির বিভিন্ন দশা সংগ্রহ করা খুবই সহজ। পাতলা কাপড়ের টুকরো বা ছাঁকনির সাহায্যে, এমনকি হাত দিয়েও ইচ্ছামতো কতকগুলি ব্যাঙাচি জল থেকে তুলে নেওয়া যায় (চিত্র 2.53)। একটি বোতল বা **স্পেসিমেন টিউব** (specimen tube)-এ ব্যাঙাচির বিভিন্ন দশা পৃথক পৃথক ভাবে রেখে তাতে 9 ভাগ জল ও 1 ভাগ ফরমালিন মিশ্রিত দ্রবণ ঢেলে মুখটি ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। মাঝে মাঝে দ্রবণ পাল্টে দিলে সংগ্রহ বহুদিন অবিকৃত থাকে।

(খ) **মশা** (Mosquito) **:** মশার প্রথম দশা **ডিম** (egg)। খাল-খন্দের পচা জলে স্ত্রী মশার ডিম পাওয়া যায়। **কিউলেক্স মশার ডিম** পরস্পর যুক্ত অবস্থায় এবং **অ্যানোফিলিসের** ডিম পৃথক পৃথক ভাবে ভেসে বেড়ায়। **কিউলেক্স** মশার ডিম লম্বাটে এবং তার নিম্নাংশ স্ফীত। **অ্যানোফিলিসের** ডিম শঙ্কুর মতো এবং তার দুপাশে **ভেলক** (raft) থাকে। সুতরাং কোন্‌টি কোন্‌ মশার ডিম চিনতে অসুবিধা হয় না। কাপড় দিয়ে ছেঁকে তোলবার পর উল্লিখিত মতে দুটি পৃথক স্পেসিমেন টিউবে উভয় প্রকার ডিম সংরক্ষণ করতে হয়। দশার নাম কাগজে লিখে টিউবের গায়ে আটকে দিতে হয় (চিত্র 2.54)।

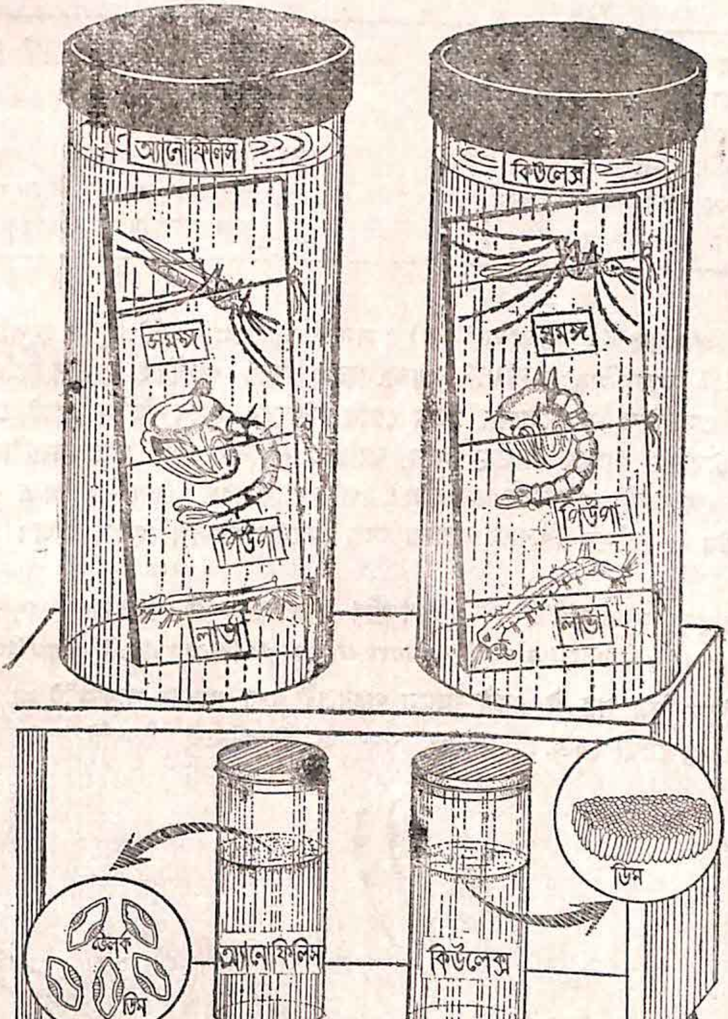
● মশার ডিম সংগ্রহ ও সংরক্ষন পদ্ধতি [*Method of collection and preservation of eggs of mosquitoes*] : ●

● **উপকরণ** (Requisites) **:**

(1) দুটি খোলা পাত্র।
(2) নোংরা জল ও সাধারণ পরিষ্কার জল।
(3) ম্যাগনিফাইং গ্লাস।
(4) ছিপিযুক্ত স্পেসিমেন টিউব।
(5) কয়েকটি স্লাইড।
(6) 4% ফরমালিন বা 70% অ্যালকোহল।
(7) কাগজের টুকরো, আঠা, পেন্সিল।
(8) মোম।

● **পদ্ধতি** (Method) **:** অ্যানোফিলিস মশকী অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জলে এবং কিউলেক্স মশকী নোংরা জলে ডিম পাড়তে ভালবাসে। সুতরাং

সংগ্রহ করা দুটি পাত্রের একটিতে পরিষ্কার জল ও অন্যটিতে নোংরা জল নিয়ে পাত্র দুটিকে বাড়ীর খোলা জায়গায় রেখে দেওয়া হ'ল।



চিত্র 2.54—মশার রূপান্তরের বিভিন্ন দশা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

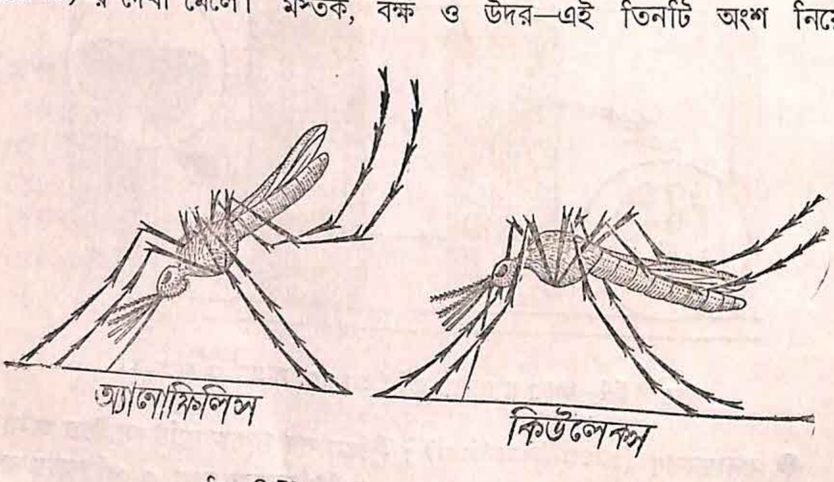
● **সনাক্তকরণ** (Identification) ঃ 7 দিন পর পৃথক দুটি স্লাইডে আলাদা আলাদা ভাবে ঐ পাত্র দুটি থেকে কয়েক ফোঁটা নোংরা জল ও পরিষ্কার জল নিয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে পরীক্ষা করলে কোনটিতে অ্যানোফিলিস ও কোনটিতে কিউলেক্স মশার ডিম আছে তা নীচের পার্থক্য অনুযায়ী চেনা যায়।

অ্যানোফিলিসের ডিম	কিউলেক্সের ডিম
(1) অ্যানোফিলিসের ডিম শঙ্কুর মতো এবং তার দুপাশে ভেলক (raft) বর্তমান।	(1) কিউলেক্সের ডিম লম্বাটে—ভেলক নাই।
(2) অ্যানোফিলিসের ডিম পৃথক পৃথক ভাবে ভেসে বেড়ায়।	(2) কিউলেক্সের ডিম একপ্রকার আঠালো পদার্থ দ্বারা পরস্পর যুক্ত অবস্থায় ভেসে বেড়ায়।

● **সংরক্ষণ** (Preservation) ঃ সনাক্ত করার পর দুটি পৃথক স্পেসিমেন টিউবে 4% ফরমালিন বা 70% অ্যালকোহল নিয়ে একটিতে অ্যানোফিলিসের ডিম ও অন্যটিতে কিউলেক্সের ডিম রেখে টিউবের মুখে ছিপি এ'টে দেওয়া হ'ল। টুকরো কাগজে সংগ্রহ স্থান, তারিখ, নমুনার নাম, সংগ্রহকারীর নাম সম্বলিত লেবেলটি এ'টে দেওয়া হ'ল। পরিশেষে বেশী দিন সংরক্ষিত রাখার জন্য টিউব ও ছিপির কিনারা বরাবর গলা মোমের প্রলেপ দেওয়া হ'ল।

● মশার শূককীট বা লার্ভা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি *[Method of collection and preservation of Larva of Mosquitoes]* ●

দু-তিন দিন পর ঐ একই স্থানে পরবর্তী দশা, অর্থাৎ **শূককীট** বা **লার্ভা** (Larva)-র দেখা মেলে। মস্তক, বক্ষ ও উদর—এই তিনটি অংশ নিয়ে



চিত্র 2.55—বসার ভঙ্গি দেখে মশা চেনা।

লার্ভা গঠিত। চ্যাপ্টা মাথা, একজোড়া চোয়াল ও ভোজনবুরুশ, শুঁড় ও চোখের উপস্থিতি লার্ভার বৈশিষ্ট্য।

নীচে বিভিন্ন মশার লার্ভার পার্থক্য দেখানো হ'লঃ

অ্যানোফিলিসের লার্ভা	কিউলেক্সের লার্ভা
(1) লার্ভার দেহে শাখাযুক্ত রোম থাকে।	(1) লার্ভার দেহে শাখাযুক্ত রোম থাকে না।
(2) শ্বাস-সাইফন নাই।	(2) শ্বাস-সাইফন বর্তমান।
(3) অষ্টম উদর খণ্ডকের শ্বাসছিদ্র দুটি অল্প উঁচু স্থানে পাশাপাশি উন্মুক্ত থাকে।	(3) অষ্টম উদর খণ্ডকের শ্বাসছিদ্র দুটি শ্বাস-সাইফন নামক একটি সরু ও লম্বা নলের শেষে পাশাপাশি উন্মুক্ত থাকে।
(4) স্থির অবস্থায় লার্ভা জলের উপরিতলের সংগে দেহকে সমান্তরালে রেখে চিৎ হ'য়ে ভাসে।	(4) স্থির অবস্থায় লার্ভা জলের উপরিতলের সংগে দেহকে সূক্ষ্মকোণে রেখে উপুড় হ'য়ে ভাসে।

লার্ভা জলে কিলবিল করে। অ্যানোফিলিসের ও কিউলেক্সের লার্ভা যথাক্রমে জলতলের সমান্তরালে ও কোণাকুণি ভাসে। একইভাবে দু'টি পৃথক পৃথক টিউবে লার্ভা সংগ্রহ করতে হয়।

অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্সের লার্ভাকে পৃথক্ পৃথক্ স্লাইডে তাদের স্বাভাবিক অবস্থান অনুযায়ী রেখে সুতোর সাহায্যে বেঁধে দিতে হয়।

স্লাইড দু'টিকে 4% ফরমালিন বা 70% অ্যালকোহল ভর্তি দু'টি পৃথক স্পেসিমেন টিউবে ডুবিয়ে দিতে হয়। এবার টিউব দু'টির মুখ কর্ক দিয়ে বন্ধ ক'রে টিউব ও কর্কের কিনারা বরাবর মোম লাগিয়ে সেটাকে বায়ুনিরোধক করা হয়। এবার যথারীতি টিকিটে প্রয়োজনীয় তথ্য লিখে টিউবের গায়ে লাগিয়ে দিতে হয়।

● মশার মূককীট বা পিউপা দশা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ *[Method of collection and preservation of Imago of different mosquitoes]* ●

মূককীট বা **পিউপা** (Pupa) পরবর্তী দশা। একই স্থানে 8—10 দিন পর পিউপার দেখা মেলে। ',' কমার মতো আকৃতি দেখে পিউপাকে সহজেই চেনা যায়। অ্যানোফিলিসের পিউপার সরু দিক বেশী প্যাঁচানো। একই পদ্ধতিতে এই দশাও পৃথক্ পৃথক্ টিউবে সংরক্ষণ করতে হয়।

নীচে বিভিন্ন মশার পিউপার পার্থক্য দেখানো হ'লঃ—

অ্যানোফিলিসের পিউপা	কিউলেক্সের পিউপা
(1) বায়ুনল ছোট কিন্তু প্রসারিত।	(1) বায়ুনল অপেক্ষাকৃত লম্বা কিন্তু সরু।
(2) উদরের প্রথম কয়েকটি খণ্ড শিরোবক্ষের খুব নিকটে অবস্থিত।	(2) উদরের প্রথম কয়েকটি খণ্ড শিরোবক্ষের থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত।
(3) পিউপার উদরের পাশে কণ্টক থাকে।	(3) পিউপার উদরের পাশে কণ্টক থাকে না।
(4) পুচ্ছপাখনা অপেক্ষাকৃত বড়।	(4) পুচ্ছপাখনা অপেক্ষাকৃত ছোট।

মশার সমঙ্গ বা ইমাগো দশা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ [*Method of collection and preservation of Imago of Mosquitoes*]

প্রকৃতপক্ষে **সমঙ্গ বা ইমাগো** (Imago) দশায় মশার সব অঙ্গই তৈরী হয়ে যায়। পিউপা দশার 2—3 দিন পর সমঙ্গ দশার আবির্ভাব ঘটে। **দেহকে বসার স্থানের সঙ্গে সমান্তরালে রাখলে** এবং পশ্চাদ্‌পদ পিঠের ওপরে তোলা থাকলে বুঝতে হবে, মশাটি **কিউলেক্স** (চিত্র 2.55)। কিন্তু যে মশা দেহকে সূক্ষ্মকোণে স্থাপন করে এবং পশ্চাদ্‌পদ কখনই পিঠের উপর তোলে না, সেটি **অ্যানোফিলিস মশা** (চিত্র 2.55)। পৃথক দুটি টিউবে উভয় দশা একই পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হয়।

অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশার সমঙ্গ দশার বহিরাকৃতিগত ও স্বভাবগত পার্থক্য ঃ

অ্যানোফিলিসের সমঙ্গ	কিউলেক্সের সমঙ্গ
(1) তুলনামূলকভাবে আকারে ছোট।	(1) তুলনামূলকভাবে আকারে বড়।
(2) শুঙ্গের রোম পাতলা।	(2) শুঙ্গের রোম ঘন।
(3) অ্যানোফিলিস মশার ডানায় সাদা-কালো দাগ থাকে।	(3) কিউলেক্স মশার ডানায় সাদা-কালো দাগ নাই।
(4) অ্যানোফিলিস মশা সাধারণত সন্ধ্যাকালে বেরোয়।	(4) কিউলেক্স মশা সাধারণত বিকালে বেরোয়।
(5) ওড়বার সময় বোঁ বোঁ শব্দ করে।	(5) ওড়বার সময় এরূপ শব্দ হয় না।
(6) অ্যানোফিলিস মশা বসার স্থানের সঙ্গে সূক্ষ্মকোণে বসে।	(6) কিউলেক্স মশা বসার স্থানের সঙ্গে মোটামুটি সমান্তরালে বসে।

● বিভিন্ন মশার বিজ্ঞানসম্মত নাম :

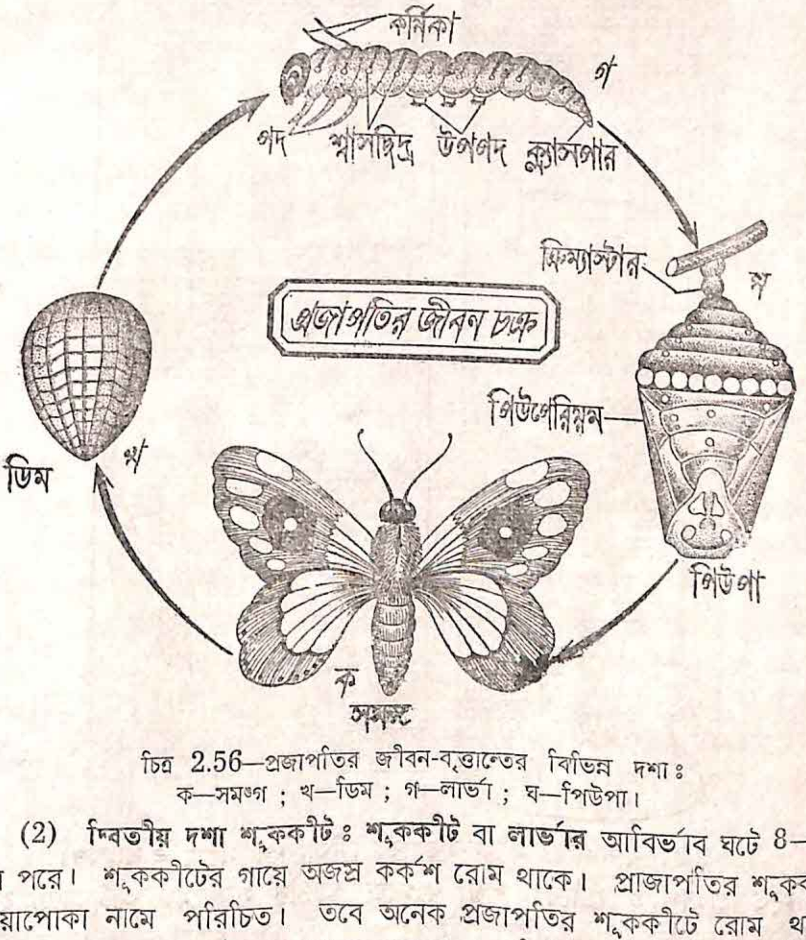
(1) অ্যানোফিলিস—অ্যানোফিলিস কিউলিসিফাসিস (*Anopheles culicifacis*)।

(2) কিউলেক্স—কিউলেক্স ফ্যাটিগ্যানস (*Culex fatigans*)।

(3) এডিস—এডিস ইজিপটিকা (*Aedes aegyptica*)।

(গ) প্রজাপতির বিভিন্ন দশা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ *[Method of collection and preservation of different stages of Butterfly]* :

(1) **প্রথম দশা ডিম :** গাছের ডালে বা পাতায় প্রজাপতি সাদা সাদা ডিম পাড়ে। আঠালো পদার্থে ডিমগুলি আটকানো থাকে। ডাল বা পাতার অংশবিশেষ কেটে সেটিকে একই পদ্ধতিতে ফরমালিন মিশ্রিত জলে সংরক্ষণ করতে হয়।



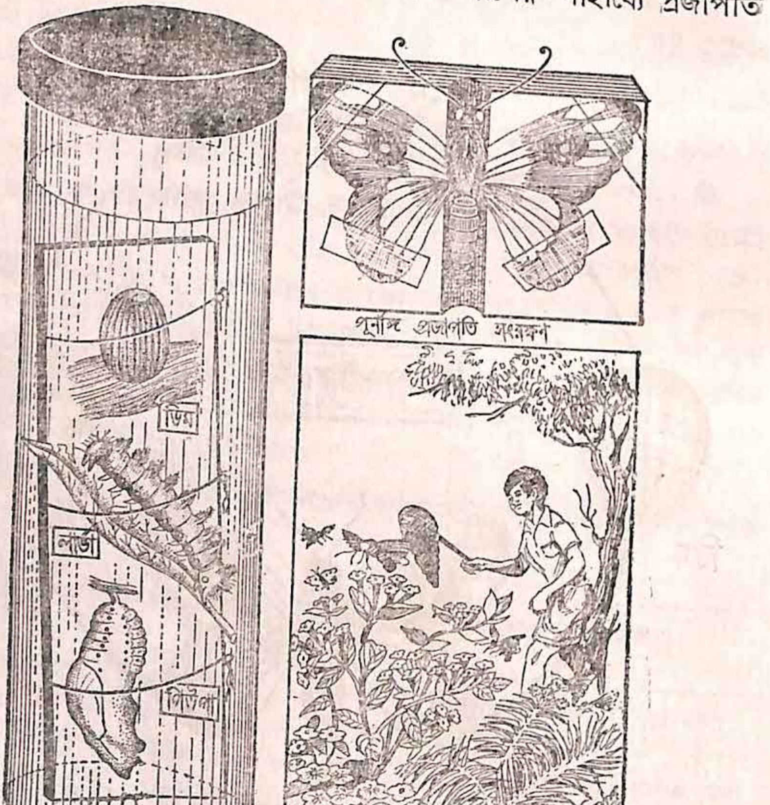
চিত্র 2.56—প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশা :
ক—সমঙ্গ ; খ—ডিম ; গ—লার্ভা ; ঘ—পিউপা।

(2) **দ্বিতীয় দশা শূককীট : শূককীট বা লার্ভার** আবির্ভাব ঘটে 8—10 দিন পরে। শূককীটের গায়ে অজস্র কর্কশ রোম থাকে। প্রাজাপতির শূককীট শুয়োপোকা নামে পরিচিত। তবে অনেক প্রজাপতির শূককীটে রোম থাকে না। এদের বক্ষের পৃষ্ঠদেশে আছে একজোড়া **কর্ষিকা** (Tentacle), উদরে চারজোড়া উপপদ এবং শেষ দেহখণ্ডে একজোড়া ক্ল্যাসপার (Clasper)।

দেহের দুপাশে কয়েকটি শ্বাসছিদ্র বর্তমান। একটি শূককীট চিমটির সাহায্যে সংগ্রহ করে একই পদ্ধতিতে স্পেসিমেন টিউবে সংরক্ষণ করা চলে।

(3) **তৃতীয় দশা মূককীট: মূককীট** বা **পিউপার** আবির্ভাব ঘটে আরও তিন সপ্তাহ পরে। এই দশায় শূককীট আবরণীবদ্ধ হয়ে গুটি গঠন করে। শূকের এই আবরণকে **পিউপেরিয়ম** (Puparium) বলে। দড়ির মতো যে অংশটির সাহায্যে পিউপেরিয়ম ঝুলতে থাকে তাকে **ক্রিম্যাস্টার** (Cremaster) বলে। পাতা বা গাছের ডাল থেকে বোঁটার সাহায্যে গুটি ঝুলতে থাকে। গুটির মধ্যে থাকে শূককীট। গুটি সংগ্রহ করে একই পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হয়।

(4) **চতুর্থ দশা সমঙ্গ**: সমঙ্গ বা ইমাগো দশা, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি 8—10 দিন পর গুটি কেটে বাইরে আসে। জালের সাহায্যে প্রজাপতি



চিত্র 2.57—প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

ধরে মৃত প্রজাপতি চৌকো শক্ত কাগজে আঠার সাহায্যে আটকাতে হয়। কাগজটিকে কাচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিলে পূর্ণাঙ্গ দশা বহুদিন অবিকৃত থাকে (চিত্র 2.57)।

জীব ও জড়ের বৈশিষ্ট্য এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য 3

[Characteristics of living and non-living objects. Differences between plants and animals]

3.1. জীব ও জড়ের বৈশিষ্ট্য :

বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর দিকে দিকে অফুরন্ত প্রাণের উচ্ছ্বাস। যে পাখী ডানা মেলে স্বচ্ছন্দে আকাশে উড়ে বেড়ায়, যে মাছ নির্ভয়ে জলে বিচরণ করে, যে হরিণ-শাবক চকিত নয়নে ও ভীরু পদক্ষেপে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়, যে মানব-শিশু বিস্ময়-বিস্ফারিত ও জিজ্ঞাসু দুটি উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকায়, এমনকি অবহেলায়, অনাদরে মাটির সঙ্গে মিশে থাকা ছোট্ট যে বিরুৎ কচি পাতা দুলিয়ে নিজের অস্তিত্ব প্রচার করে, তারা প্রত্যেকেই জীব। দৃষ্টি-গ্রাহ্য পদার্থই কেবল জীব নয়, দৃষ্টির অগোচরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এমন অনেক জীব আছে যাদের সংখ্যা অগণিত এবং কল্পনাতীত।

জীবের পাশেই আছে জড়। জীব ও জড়ের সম্বন্ধ নিগূঢ়। মৃত্যুর পর জীবও জড় পদার্থে পরিণত হয়। জীবদেহ পুনরায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেই জড় পদার্থ গ্রহণ করে। বিভিন্ন খনিজ লবণ প্রকৃতপক্ষে জড় পদার্থ। ঐ সব পদার্থ জীবদেহে প্রাণপ্রাচুর্য সরবরাহ করে। আবার কোটি কোটি বৎসর পূর্বে একদা জীবিত উদ্ভিদ থেকেই পেট্রোল, কয়লা প্রভৃতি জড় পদার্থ উৎপন্ন হয়। সুতরাং **জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেই জীব ও জড়ের সীমানা টানা। জীবে আছে জীবন বা প্রাণ ; আর প্রাণহীন জীবই জড়।**

জীবন বা প্রাণ জীবের নিজস্ব এবং বৈশিষ্ট্যময় সম্পদ। প্রাণশক্তির প্রভাবেই জড়-জগতের উপর জীব-জগতের একাধিপত্য। অর্থাৎ এই একাধি-পত্যের মূলে আছে প্রাণ। কিন্তু **জীবন বা প্রাণ বলতে কি বোঝায়?** অত্যন্ত কঠিন এই প্রশ্ন। কেননা প্রাণের সংজ্ঞা সঠিকভাবে নির্দেশ করা দুরূহ।

প্রকৃতপক্ষে যাদের কোষে **জীবন্ত পদার্থ** আছে তারাই জীব বলে পরি-চিত। জীবন্ত পদার্থটির নাম **"প্রোটোপ্লাজম"** (*Protoplasm* : *Protos* = প্রথম + *plasma* = জীবন)। অতি ক্ষুদ্র জীব বা মানুষ প্রত্যেকের দেহই এক বা একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত। কোষ প্রোটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে। **নানা-বিধ রাসায়নিক জড় পদার্থ থেকে উৎপন্ন হলেও প্রোটোপ্লাজমে স্বতঃউৎসারিত শক্তির বৈচিত্র্যময় বহিঃপ্রকাশই জীবকে করেছে অনন্য। তাই পরিবর্তনোন্মুখ**

পরিবেশের সঙ্গে জীব নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। জীবদেহে প্রোটোপ্লাজমের মৃত্যুই জীবকে জড়ে পরিণত করে। অর্থাৎ, প্রতিনিয়ত **পরিবর্তনোন্মুখ পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম জটিল এবং সুসংবদ্ধ প্রোটোপ্লাজমের সুনির্দিষ্ট শক্তির বহিঃপ্রকাশই জীবন।**

জীবনের বহিঃপ্রকাশ ও অন্যান্য চরিত্রগত লক্ষণই জীবের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সাহায্যে জীবকে জড় থেকে পৃথক করা যায়।

নীচে জীবের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করা হল :

(1) ● **চলন** (Movement)—জীবের দৃষ্টি-আকর্ষক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে চলাচল-ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ জীব স্বেচ্ছায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। **জড়ের চলন ক্ষমতা নাই** ; না নড়ানো পর্যন্ত তারা একই স্থানে থাকে।

(2) ● **উত্তেজিতা** (Irritability)—**উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া জীবের বৈশিষ্ট্য।** স্বাভাবিক পরিবেশের সামান্যতম তারতম্যে জীব উত্তেজিত হয় এবং দেহের কোন-না-কোন অঙ্গে সেই উত্তেজনার প্রকাশ ঘটে। একেই বলে **উত্তেজনায় সাড়া** (Response) দেওয়া। দেহের ভিতরে বা বাইরে যে-কোন স্থানে উত্তেজনা সৃষ্টি হোক না কেন, জীব সঙ্গে সঙ্গে সেই উত্তেজনায় সাড়া দেয়। স্পর্শ করলে চলমান শামুক খোলকের (shell) মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। কেন্নোকে খোঁচা মারলে উত্তেজিত হয়ে সে নিজ দেহ পাকিয়ে অনড় হয়। লেজে পা দিলে কুকুর দৌড়ে পালায়। তেমনি কেউ আমাদের গায়ে অযথা হাত তুললে আমরা উত্তেজনায় ফেটে পড়ি।

উদ্ভিদ-দেহে সাধারণতঃ এই ধরনের উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ না ঘটলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তা প্রকট। লজ্জাবতী লতা (*Mimosa pudica*) সূর্যালোকে পাতা মেলে রাখলেও হঠাৎ ছোঁয়ায় উত্তেজিত হয়, পত্রকগুলি (leaflets) মুড়ে দেয় এবং ক্রমশঃ সমগ্র পাতাটি ঝুলে পড়ে। জীবের দেহ এইভাবে উত্তেজিত হ'লেও **শত আঘাতে জড়ের কোনও উত্তেজনা আসে না।**

(3) ● **বৃদ্ধি** (Growth)—**বৃদ্ধি জীবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।** আহার করার ফলে জীবদেহ পুষ্ট হয়। দেহের আয়তন, ওজন ও আকারের পরিবর্তন এই পুষ্টিরই পরিণতি। জীবের **আকৃতি, আকার, আয়তন ও ওজনের স্থায়ী পরিবর্তনকেই বৃদ্ধি বলা হয়।** মূলতঃ **জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমের সম্প্রসারণই বৃদ্ধি।** দেহকোষ বিভাজনের মাধ্যমেই প্রোটোপ্লাজমের সম্প্রসারণ ঘটে। জড়ের কোনও বৃদ্ধি ঘটে না। বিজাতীয় কোন পদার্থের স্তর জমে জড়ের স্থূলতা বৃদ্ধি পায়। **জড়ের প্রকৃত বৃদ্ধি নাই** ; অর্থাৎ সেখানে প্রোটোপ্লাজম সংযোজনের প্রশ্ন ওঠে না।

(4) ● **আকার ও আয়তন** (Shape and Size)—**জীবমাত্রেই নির্দিষ্ট আকার** ও আয়তনের অধিকারী। মাছের আকার ও আয়তন কখনই হাতির আকার ও আয়তনের সমান হতে পারে না। তেমনি গরুর আকার ও আয়তন কখনই নেংটি ইঁদুরের অনুরূপ নয়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও তাই। কলা-গাছ কখনই বট বা নারকেল গাছের আকার বা আকৃতি পায় না। সুতরাং জীবের নিজস্ব আকার ও আয়তন আছে।

অন্যদিকে **জড় কখনই নির্দিষ্ট আকার ও আয়তনের অধিকারী নয়** ; ইচ্ছামত জড়ের আকার ও আয়তনের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। একটি বড় পাথরকে ভেঙে ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন আকার ও আয়তনের রূপ দেওয়া যায়। তামা, রূপা, সোনা প্রভৃতি থেকে প্রয়োজনমত ছোট-বড় গহনা তৈরি করা সম্ভব।

(5) ● **অভিযোজন-ক্ষমতা** (Adaptability)—পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতাকেই অভিযোজন বলে। **প্রতিটি জীবই অল্পবিস্তর অভিযোজন ক্ষমতার অধিকারী।** ফলতঃ এজন্যই প্রতিকূল অবস্থাতেও জীব নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। **জড়ের অভিযোজন ক্ষমতা নাই।**

(6) ● **প্রোটোপ্লাজমের উপস্থিতি** (Presence of Protoplasm)—জীবিত অবস্থায় **জীবদেহে সক্রিয় প্রোটোপ্লাজম থাকে। প্রোটোপ্লাজমই 'প্রাণের ভৌত ভিত্তি'** (Physical basis of life)। যেখানে প্রাণ সেখানেই জীবন্ত প্রোটোপ্লাজম। মৃত প্রোটোপ্লাজম জড়েরই নামান্তর। জীবকোষে প্রোটোপ্লাজমের মৃত্যু হলে জীবও জড়ে পরিণত হয়। **জড়ের প্রোটোপ্লাজম নাই।**

(7) ● **বিপাক** (Metabolism)—জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমে প্রতিনিয়ত যে রাসায়নিক পরিবর্তন ও বিক্রিয়া চলে, সামগ্রিকভাবে তাকেই বিপাক বলে। **বিপাক জীবদেহের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।** বিপাক উভমুখী। একদিকে দেহ-গঠন উপযোগী জটিল পদার্থ প্রোটোপ্লাজমে সঞ্চিত হয়, অন্য-দিকে ঐ সঞ্চিত পদার্থগুলি পুনরায় সহজ সরল অংশে ভেঙে গিয়ে শক্তি উৎপন্ন করে। প্রথমটিকে গঠনমূলক প্রক্রিয়া, অর্থাৎ **উপচিতি** বা **অ্যানাবলিজম** (Anabolism) এবং দ্বিতীয়টিকে ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া, অর্থাৎ **অপচিতি** বা **ক্যাটাবলিজম** (Catabolism) বলে। **এই উপচিতি প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে উদ্ভিদ-দেহে সালোকসংশ্লেষ** (Photosynthesis) **অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে অপচিতির দৃষ্টান্ত শ্বসন** (Respiration)।

জীবদেহেই কেবল বিপাক চলে। **জড়দেহে বিপাক চলা সম্ভব নয়।** নীচে কয়েকটি বিপাক-পদ্ধতির উল্লেখ করা হল ঃ

(i) **পুষ্টি** (Nutrition)—নিয়মিত খাদ্যগ্রহণ করে জীব বাঁচে। পাচন-তন্ত্রের মাধ্যমে কঠিন বা তরল খাদ্য দেহে শোষণযোগ্য খাদ্যরসে পরিণত

হয়। শোষিত খাদ্যরসই দেহকে পুষ্ট করে। অর্থাৎ, খাদ্যরস দেহের প্রোটোপ্লাজমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রোটোপ্লাজমের বৃদ্ধি ঘটায়। **জড়দেহে পুষ্টির কোনও প্রয়োজন নাই।**

(ii) **শ্বসন** (Respiration)—পুষ্টির ফলে দেহে সঞ্চিত খাদ্য শ্বসনের উৎসারিত শক্তির আধার। জীবদেহের প্রতিটি জীবন্ত কোষই সর্বদা কোন-না-কোন কাজে নিযুক্ত থাকে। কাজের জন্য শক্তি প্রয়োজন। প্রধানতঃ অক্সিজেনের সংস্পর্শে খাদ্যের দহন ঘটে। **খাদ্যে তালাবন্ধ শক্তিকে মুক্ত করতে অক্সিজেন চাবিকাঠির কাজ করে।** শ্বসনের সময় জটিল জৈব খাদ্য অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে সরলতম অংশে (অর্থাৎ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলে) ভেঙে যায় এবং তাপশক্তি নির্গত করে। **জড়ের দ্বারা খাদ্য গ্রহণ ও শ্বসন সম্ভব নয়।**

(iii) **রেচন** (Excretion)—বিপাক-ক্রিয়ার ফলে দেহে নানাপ্রকার নাইট্রোজেন-ঘটিত বর্জ্য পদার্থ (যেমন, মূত্র) উৎপন্ন হয়। এগুলি সময়মত অপসারিত না হলে দেহের ক্ষতি হয়, এমনকি মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়। যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই ক্ষতিকর পদার্থ দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তাকে রেচন বলে। বহিঃকঙ্কাল **নির্মোচন** (Moulting) চিংড়ির এক প্রকার বিশেষ রেচন পদ্ধতি। ঘাম, কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রভৃতিও রেচন পদার্থ। উদ্ভিদের বাষ্পমোচন পদ্ধতি, **কুইনাইন, নিকোটিন, মরফিন** প্রভৃতি উপক্ষার এবং **সিস্টোলিথ, র‍্যাফাইড, সিলিকা** প্রভৃতি হল রেচনজাত পদার্থ। কেবল জীবেরই রেচন ক্ষমতা আছে, জড়ের নাই।

(iv) **ক্ষরণ** (Secretion)—জীবদেহে বিশেষ কতকগুলি গ্রন্থি থেকে রসক্ষরণ হয়। পিত্ত, হরমোন এমনকি নানারূপ এনজাইমও ক্ষরণজাত পদার্থ। যকৃৎ থেকে পিত্ত নিঃসৃত হয়। এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি থেকে হরমোন উৎপন্ন হয়। **নালীপথে পিত্ত, কিন্তু নালীপথ ছাড়াই হরমোন দেহের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে।** তাল, খেজুর প্রভৃতির রস, এমনকি গরু-ছাগলের দুধও ক্ষরিত পদার্থ। **ক্ষরণ পদার্থ উৎপাদনের ক্ষমতা কেবলমাত্র জীবেরই আছে, জড়ের নাই।**

(8) ● **জনন** (Reproduction)—**জীবের বৈশিষ্ট্য জীবসৃষ্টি।** নিজের অনুরূপ নতুন জীবের সৃষ্টি-ক্ষমতাকেই জনন বলে। **যৌন** (Sexual) বা **অযৌন** (Asexual) যে-কোন পদ্ধতিতেই নতুন জীবের আবির্ভাব ঘটুক না কেন, **জীব-সৃষ্টির ক্ষমতা কেবল জীবেরই আছে—জড়ের নাই।**

(9) ● **জরা ও মৃত্যু** (Senescence and Death)—জন্মগ্রহণ করার পর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অধিকাংশ জীবদেহ বৃদ্ধি পায়। বাল্য, কৈশোর, যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বের পর প্রাকৃতিক নিয়মে জীবদেহে বার্ধক্যের লক্ষণ ফুটে ওঠে, ক্রমশঃ কর্মক্ষমতা কমে যায় এবং দেহে জরার লক্ষণ প্রকাশ পায়। জরাগ্রস্ত জীব ক্রমশঃ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। **মৃত্যু জীবের অবধারিত পরিণতি। জড়ের মৃত্যু নাই।**

(10) ● **সুনির্দিষ্ট জীবন-চক্র** (Definite Life-Cycle)—জীবের জীবনকাল কতকগুলি নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত। জীব ঐ পর্যায়গুলির মাধ্যমে আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করে। অর্থাৎ **জীব সুনির্দিষ্ট জীবন-চক্রের অধিকারী। জড়ে কোন জীবন-চক্র নাই।**

3.2. জীব ও জড়ের পার্থক্য [*Differences between living and nonliving objects*] :

জীবনী শক্তিসম্পন্ন বা প্রাণময় বস্তুই জীব। জীবন বা প্রাণের বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ আছে। জীবদেহেই কেবল এই লক্ষণগুলি পরিস্ফুট, জড়দেহে নয়। নীচে সারিবদ্ধ লক্ষণগুলি দেখে সহজে জীবকে জড় থেকে পৃথক করা যায়।

জীব (Living)	জড় (Nonliving)
(1) জীবের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে।	(1) জড়ের কোন নির্দিষ্ট আকার বা আয়তন নাই।
(2) জীবদেহ প্রোটোপ্লাজম দ্বারা গঠিত—অর্থাৎ দেহে প্রাণ আছে।	(2) জড়দেহে প্রোটোপ্লাজম নাই, সুতরাং প্রাণও নাই।
(3) জীবদেহ সুসংবন্ধ এবং কোষ ও কলা দ্বারা গঠিত।	(3) এরূপ কোন সংহতি জড়দেহে নাই।
(4) কেবল খাদ্যগ্রহণ করার পরই দেহ পুষ্ট হয়।	(4) খাদ্যগ্রহণ দ্বারা দেহপুষ্টি লক্ষ্য করা যায় না।
(5) দেহকোষে বিপাক ও রাসায়নিক বিক্রিয়া (যেমন—পুষ্টি-সাধন, শ্বসন, রসক্ষরণ প্রভৃতি) চলে।	(5) এই জাতীয় জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া চলে না।
(6) জীবদেহের বৃদ্ধি দেহমধ্যস্থ পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়াজাত পদার্থ দ্বারা হয়ে থাকে।	(6) জড়দেহের বৃদ্ধি বাইরে নতুন পদার্থের স্তর পড়ে হয়ে থাকে।
(7) জীবদেহ স্বয়ংক্রিয়—নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজ ক'রে নেয়।	(7) জীবন না থাকায় জড়ের কোন কাজ করার প্রয়োজন হয় না।
(8) উত্তেজনায় বা আঘাত প্রাপ্তিতে জীবদেহ সাড়া দেয়।	(8) জড় উত্তেজনায় সাড়া দিতে পারে না।
(9) জীবের অভিযোজন ক্ষমতা আছে।	(9) জড়ের অভিযোজন ক্ষমতা নাই।
(10) জীবনীশক্তি থাকায় জীব চলাচল করতে পারে। স্থান পরিবর্তনে সক্ষম না হলেও অঙ্গ আন্দোলিত করতে পারে।	(10) জড়ের চলাচল ক্ষমতা নাই।

জীব (Living)	জড় (Nonliving)
(11) ছন্দবদ্ধ এবং নিয়মানুগ চলা জীবের বৈশিষ্ট্য।	(11) জড়ের ছন্দবদ্ধতা নাই।
(12) জীবদেহে পরিবৃত্তি ঘটে।	(12) জড়দেহে পরিবৃত্তি ঘটে না।
(13) জীব জৈব অভিব্যক্তিতে অংশ-গ্রহণ করতে পারে।	(13) জড় জৈব-অভিব্যক্তিতে অংশ নিতে পারে না।
(14) জীবের জনন ক্ষমতা আছে।	(14) জড়ের জনন ক্ষমতা নাই।
(15) জীবনকাল সীমাবদ্ধ—জীবন-চক্রের মাধ্যমে জীবনকাল অতি-ক্রান্ত হয়।	(15) জড়ের জীবন-চক্র নাই।
(16) জীব মরণশীল—অর্থাৎ জন্মালে জীবকে মরতেই হয়।	(16) জড়ের মৃত্যু নাই।

3.3. উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য *[Differences betweeen plants and animals] :*

জীব-জগৎ বলতে উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়কেই বোঝায়। পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হওয়ার কিছুকাল পরেই জীবনের বা প্রাণের দুটি ধারা দুদিকে বেঁকে যায়। তাদের একটি উদ্ভিদ ও অপরটি প্রাণী। ক্লোরোফিল নামে এক আশ্চর্য সবুজ কণিকার উপস্থিতি অধিকাংশ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। ক্লোরো-ফিলের সাহায্যেই উদ্ভিদ নিজদেহে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। এ ব্যাপারে প্রাণী একেবারেই অসহায়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপরেই প্রাণীকে নির্ভর করতে হয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণী সুনিশ্চিতভাবে দুটি পৃথক সত্তা। বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার প্রভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটেছে। বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রগত লক্ষণগুলি দেখে উদ্ভিদকে প্রাণী থেকে পৃথক করা সম্ভব। তবে, উভয়েই জীব-গোষ্ঠী-ভুক্ত হওয়ায় জৈবনিক কার্যকলাপে এদের অনেক সাদৃশ্য আছে। নীচে উদ্ভিদ ও প্রাণীর উল্লেখযোগ্য পার্থক্যগুলি দেখান হল।

বসতিগত পার্থক্য
(Differences in Habitat)

(1) জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ—এই তিন পরিবেশেই প্রাণী বাস করে। উদ্ভিদ সাধারণতঃ স্থলে ও জলেই বাস করে।

স্বভাবগত পার্থক্য
(Differences in Behaviour)

(2) স্পঞ্জ, **কোরাল** প্রভৃতি কয়েকটি **ব্যতিক্রম** ছাড়া প্রায় সব প্রাণীই একস্থান থেকে অন্য স্থানে বিচরণ করতে পারে। কিন্তু, অধিকাংশ উদ্ভিদেরই এইভাবে স্থানান্তরে গমনাগমন করার ক্ষমতা নাই। কেবল **ক্ল্যামাইডোমোনাস, প্রোটোকক্কাস, ভলভক্স, ডায়াটম** প্রভৃতি কয়েকটি উদ্ভিদ স্থানান্তরে যেতে পারে।

বহিরাকৃতিগত পার্থক্য
(Differences in External Features)

(3) অ্যামিবা ছাড়া অধিকাংশ প্রাণীর, এমন কি উদ্ভিদেরও নির্দিষ্ট বহিরাকৃতি আছে। তবে প্রাণী বা উদ্ভিদের অংগ-প্রত্যংগ একে অন্যের অনুরূপ নয়। উন্নত উদ্ভিদে ফুল ফোটে, ফল হয় ; শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে উদ্ভিদ-দেহ বহুদূর বিস্তৃত হয়। শাখা-প্রশাখায় পাতার সমারোহ দেখা যায়। প্রাণীর নিজস্ব অংগ-প্রত্যংগ থাকলেও কখনই তা পাতা, ফুল বা ফল-রূপে প্রকাশিত হয় না। বস্তুতঃ, প্রাণী বা উদ্ভিদ প্রত্যেকে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। প্রাণী ও উদ্ভিদের বহিরাকৃতিগত পার্থক্য সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(4) প্রায় সব প্রাণিদেহকেই দুই বা ততোধিক সমান ভাগে ভাগ করা যায়। অপরপক্ষে, উদ্ভিদদেহ (ব্যতিক্রম—**ডায়াটম** ইত্যাদি)-কে এইভাবে সমান দু-অংশে ভাগ করা কষ্টকর।

(5) কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া (যেমন, **ওবেলিয়া** প্রভৃতি) প্রাণিদেহে শাখা-প্রশাখা থাকে না। কিন্তু অধিকাংশ উদ্ভিদ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ; সাধারণতঃ খেজুর, তাল, নারিকেল প্রভৃতি ব্যতিক্রম।

অভ্যন্তরীণ গঠনে পার্থক্য
(Differences in Internal Structures)

(6) প্রাণিকোষে সুনির্দিষ্ট কোষ-প্রাকার নাই। প্রোটোপ্লাজম একটি পর্দায় আবৃত থাকে। এই পর্দাটিকে বলে **প্লাজমালিমা** (Plasmalemma)। প্লাজমালিমা কোষের জীবিত অংশ। অপরপক্ষে, উদ্ভিদকোষে এই পর্দার বাইরে একটি সুনির্দিষ্ট প্রাকার আছে। প্রাকারটি মৃত এবং সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। এজন্য, কোষ-প্রাকার দৃঢ় হয় এবং সহজে কোষের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে না। ফানজাই গোষ্ঠীর উদ্ভিদকোষে অবশ্য কাইটিন নির্মিত প্রাকার বর্তমান।

(7) প্রাণিকোষের অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশ **সেণ্ট্রোজোম** (Centrosome)। সেণ্ট্রোজোম নিউক্লিয়সের উপরের দিকে অবস্থান করে। কোষ-বিভাজনে সেণ্ট্রোজোম সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

উদ্ভিদকোষে সেণ্ট্রোজোম নাই। এই বৈশিষ্ট্য উদ্ভিদকোষকে প্রাণিকোষ থেকে পৃথক করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

(8) প্রাণিকোষে (**ইউগ্লিনা** ব্যতীত) **প্লাসটিড** (Plastid) থাকে না। ছত্রাক ব্যতীত অন্যান্য উদ্ভিদকোষে কোন-না-কোন প্রকার প্লাসটিড থাকে। প্লাসটিডের উপস্থিতি অধিকাংশ উদ্ভিদকোষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(9) প্রাণিকোষের মধ্যে গহ্বর বা ভ্যাকুওল থাকলে, তা আকারে অত্যন্ত ছোট। উদ্ভিদকোষের গহ্বরগুলি বড়।

(10) শারীরবৃত্তীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রাণিদেহে নানারূপ সংগঠিত অঙ্গ আছে। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ-দেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এরূপ বিভিন্নতা দেখা যায় না।

শারীরবৃত্তীয় কাজের পার্থক্য
(Differences in Physiological activities)

(11) সাধারণতঃ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া দ্বারা অধিকাংশ উদ্ভিদ (ব্যতিক্রম—**ছত্রাক**) নিজ দেহে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে।

প্রাণীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। কারণ, উদ্ভিদের মতো নিজেদেহে খাদ্য প্রস্তুত করতে তারা সম্পূর্ণ অপারগ।

(12) প্রাণিদেহ সামগ্রিকভাবে ও সমভাবে বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধির হার নির্দিষ্ট এবং নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত এই বৃদ্ধি চলে। মৃত্যুর অনেক আগে দেহের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। উদ্ভিদের বৃদ্ধি সারা দেহে সমভাবে হয় না, এমনকি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোন-না-কোন ভাবে উদ্ভিদ-দেহের বৃদ্ধি ঘটে।

(13) প্রধানতঃ ফুলকা, ফুসফুস প্রভৃতি নির্দিষ্ট শ্বাস-অঙ্গ দ্বারা প্রাণীর শ্বসন সম্পন্ন হয়। উদ্ভিদের এরূপ কোন নির্দিষ্ট শ্বাস-অঙ্গ নাই।

(14) শ্বসনের সময় অক্সিজেন গ্রহণ ক'রে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করা প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়েরই ধর্ম। প্রাণী অক্সিজেন উৎপাদন করতে পারে না। কিন্তু উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন উৎপাদন করে এবং সেই সঙ্গে প্রাণীর পক্ষে ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড নিজে দেহে শোষণ করে। অর্থাৎ, উক্ত দুই প্রকার গ্যাসই উদ্ভিদ-দেহে প্রবেশ করে এবং পুনরায় বেরিয়ে যায়।

(15) প্রাণিদেহে কোন-না-কোন প্রকার রেচন-অঙ্গ থাকে। এই অঙ্গগুলির মাধ্যমে দূষিত বর্জ্যনীয় নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হয়।

উদ্ভিদ-দেহে এই জাতীয় নির্দিষ্ট কোন রেচন-অঙ্গ নাই। বিভিন্ন সময়োপযোগী পদ্ধতি অনুসরণে উদ্ভিদ রেচন-কার্য সমাধা করে।

(16) উত্তেজিত হলে জীবদেহে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই লক্ষণগুলি প্রাণীর ক্ষেত্রে দ্রুত ও প্রকট।

অপরপক্ষে, অধিকাংশ, উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই লক্ষণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। তবে, লজ্জাবতী গাছ বা টেলিগ্রাফ গাছে এই উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট।

(17) প্রাণীর সারা দেহে নার্ভজাল ছড়ানো থাকে।
উদ্ভিদের নার্ভজাল নাই।

(18) প্রাণী ডিমের মাধ্যমে বা উন্নত জনন পদ্ধতি দ্বারা সন্তান প্রসব করে। তাছাড়া, বিভাজন বা অঙ্গজ পদ্ধতির মাধ্যমেও জনন সম্ভবপর।

উদ্ভিদ ডিমও পাড়ে না, সন্তানও প্রসব করে না। তবে সুন্দরবনের গরান গাছে বিশেষ একপ্রকার জরায়ুজ **অঙ্কুরোদ্গম** পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। বীজের অঙ্কুরোদ্গম দ্বারা বা অন্যান্য জনন-পন্থা দ্বারা উদ্ভিদের জনন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

নীচে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য সারিবদ্ধ করা হল ঃ

উদ্ভিদ (Plants)	প্রাণী (Animals)
● **বসতিগত পার্থক্য** (Differences in Habitat) ঃ	
(1) উদ্ভিদ সাধারণত জলে ও স্থলে বাস করে।	(1) জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ—এই তিন পরিবেশেই প্রাণী বাস করে।
● **স্বভাবগত পার্থক্য** (Differences in Behaviour) ঃ	
(2) অধিকাংশ উদ্ভিদ স্বেচ্ছায় এক-স্থান থেকে অন্য স্থানে বিচরণ করতে পারে না।	(2) অধিকাংশ প্রাণী স্বেচ্ছায় যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারে।
* **ব্যতিক্রম** ঃ ক্ল্যামাইডোমোনাস, প্রোটোকক্কাস, ভলভক্স, ডায়াটম ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ।	* **ব্যতিক্রম** ঃ স্পঞ্জ, কোরাল ইত্যাদি।
● **বহিঃঅঙ্গসংস্থানগত পার্থক্য** (Differences in External morphological features) ঃ	
(3) উদ্ভিদদেহের আকার, আয়তন নির্দিষ্ট নয়—অনিয়ত।	(3) প্রাণীদেহের আকার ও আয়তন সাধারণত নির্দিষ্ট।
* **ব্যতিক্রম** ঃ ডায়াটম।	* **ব্যতিক্রম** ঃ অ্যামিবা।

উদ্ভিদ (Plants)	প্রাণী (Animals)
(4) দেহ সাধারণত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। * ব্যতিক্রম ঃ তাল, খেজুর, নারিকেল সুপারী ইত্যাদি।	(4) দেহ সাধারণত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত নয়। * ব্যতিক্রম ঃ ওবেলিয়া।
(5) উদ্ভিদদেহ সাধারণত অপ্রতিসম —অর্থাৎ দেহকে লম্বালম্বি সমান দু'ভাগে ভাগ করা যায় না। * ব্যতিক্রম ঃ ডায়াটম।	(5) প্রাণীদেহ সাধারণত প্রতিসম— অর্থাৎ দেহকে লম্বালম্বি সমান দু'ভাগে ভাগ করা যায়। * ব্যতিক্রম ঃ ওবেলিয়া।
(6) উদ্ভিদদেহে কোন নির্দিষ্ট অঙ্গ, তন্ত্র ও জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই।	(6) প্রাণীদেহে প্রধানতঃ কতকগুলি অঙ্গ, তন্ত্র ও জ্ঞানেন্দ্রিয় বর্তমান।

● **কলাস্থানিক পার্থক্য (Differences in Anatomy) ঃ**

(7) উদ্ভিদকোষে সেলুলোজ নির্মিত কঠিন প্রাকার বর্তমান। * ব্যতিক্রম ঃ ছত্রাকের প্রাকার কাইটিন (chitin) দ্বারা গঠিত।	(7) প্রাণিকোষে কোষ-প্রাকার নাই। উদ্ভিদের মতোই কোন স্থিতি-স্থাপক সজীব পর্দা (প্লাজ-মালিমা) দ্বারা কোষ আবৃত থাকে।
(8) উদ্ভিদকোষে প্লাসটিড থাকে। * ব্যতিক্রম ঃ ছত্রাক কোষ।	(8) প্রাণিকোষে প্লাসটিড নাই। * ব্যতিক্রম ঃ ইউগ্লিনা।
(9) উদ্ভিদকোষে সেণ্ট্রোজোম নাই।	(9) প্রাণিকোষে সেণ্ট্রোজোম থাকে।
(10) উদ্ভিদকোষে লাইসোজোম নাই।	(10) প্রাণিকোষে লাইসোজোম বর্তমান।
(11) উদ্ভিদকোষের গহ্বরগুলি বড়।	(11) প্রাণিকোষে গহ্বর থাকলে তা আকারে অত্যন্ত ছোট।

● **শারীরবৃত্তীয় পার্থক্য (Differences in Physiological activities) ঃ**

(12) অধিকাংশ উদ্ভিদ প্রধানত স্বভোজী (Autophyte) —সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া দ্বারা নিজ দেহে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। * ব্যতিক্রম ঃ ছত্রাক।	(12) প্রাণীরা নিজদেহে খাদ্য প্রস্তুত করতে সম্পূর্ণ অপারগ। এরা প্রধানত পরভোজী (Heterophyte)—খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এরা উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। * ব্যতিক্রম ঃ ইউগ্লিনা।
(13) এরা কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন উভয় প্রকার গ্যাস গ্রহণ ও বর্জন করে।	(13) এরা অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্জন করে।

উদ্ভিদ (Plants)	প্রাণী (Animals)
(14) উদ্ভিদের বৃদ্ধি সারাদেহে সমভাবে হয় না। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উদ্ভিদঅঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে।	(14) প্রাণীর বৃদ্ধি সারাদেহে সমভাবে হয়। নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধি ঘটে—মৃত্যুর অনেক পূর্বেই বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।
(15) উদ্ভিদের পৃথক কোন শ্বাসযন্ত্র নাই।	(15) প্রাণীর ফুলকা, ফুসফুস প্রভৃতি নানা প্রকার শ্বাসযন্ত্র আছে।
(16) বর্জ্যপদার্থ নিষ্কাশনের জন্য দেহে নির্দিষ্ট কোন রেচন-অঙ্গ নাই। বর্জ্যপদার্থ প্রধানতঃ দেহের মধ্যে ত্বকে সঞ্চিত হয়।	(16) প্রাণীর নিজস্ব রেচন-অঙ্গ আছে।
(17) উদ্ভিদদেহে উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ প্রকট নয়। * ব্যতিক্রম ঃ লজ্জাবতী লতা ; টেলিগ্রাফ গাছ।	(17) প্রাণিদেহে উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ প্রকট।
(18) উদ্ভিদদেহে রক্ত, রক্তনালী বা হৃৎপিণ্ড নাই।	(18) অধিকাংশ প্রাণিদেহে রক্ত, রক্তনালী বা হৃৎপিণ্ড আছে।
(19) উদ্ভিদদেহে মস্তিষ্ক, নার্ভ ও নার্ভজাল নাই।	(19) উন্নত প্রতিটি প্রাণিদেহে মস্তিষ্ক, নার্ভ ও নার্ভজাল আছে।
(20) উদ্ভিদ সন্তান প্রসব করে না বা ডিম পেড়ে বংশবৃদ্ধি করে না। * ব্যতিক্রম ঃ সুন্দরবন অঞ্চলের গরান উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম দেখা যায়।	(20) প্রাণী সন্তান প্রসব করে বা ডিম পেড়ে বংশবৃদ্ধি করে।
(21) উদ্ভিদের ভ্রূণ কিছুকাল সুপ্ত থাকে।	(21) প্রাণীর ভ্রূণ কোন অবস্থাতেই সুপ্ত থাকে না।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা 4

[Interdependence of plants and animals]

4.1. উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ঃ

জৈব-রাজ্যের প্রধান দুই গোষ্ঠী উদ্ভিদ ও প্রাণী। এরা দুই ভিন্ন পথে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। একের জীবনযাপন-প্রণালী অন্যের উপযোগী নয়। আপাতদৃষ্টিতে এদের স্ব-নির্ভর মনে হলেও, অনেক সময় উদ্ভিদ ও প্রাণী



চিত্র 4.1—উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্য সম্বন্ধীয় নির্ভরশীলতা।

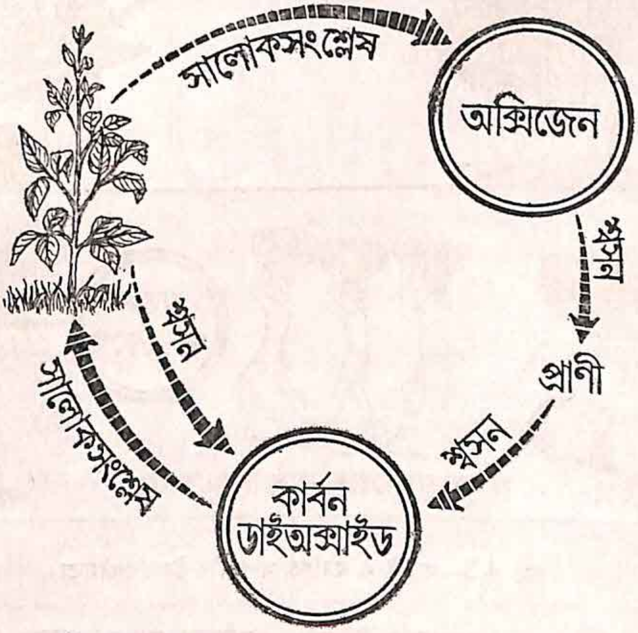
পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনযাপন প্রণালীকে আরও সহজ, সুষ্ঠু ও সাবলীল পথে পরিচালিত করে।

এখানে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

(1) **খাদ্য সম্বন্ধীয় নির্ভরশীলতা** (চিত্র 4.1) ঃ

উদ্ভিদ সাধারণতঃ **স্বভোজী**। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নিজদেহে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। জীবজগতে প্রধানত **সবুজ উদ্ভিদই উৎপাদক** (Producer)। নিজদেহে প্রস্তুত কার্বোহাইড্রেট থেকে প্রয়োজনবোধে উদ্ভিদদেহে প্রোটিন ও ফ্যাট সংশ্লেষিত হয়। উৎপাদক নিজদেহে বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে এই সব খাদ্যবস্তুর অধিকাংশই ব্যবহার করে। উদ্বৃত্ত অংশ উৎপাদকের দেহে কান্ড পাতা, মূল, ফল, বীজ প্রভৃতি অঙ্গে সঞ্চিত থাকে।

তবে **ঘটপত্রী, সূর্যশিশির, পাতাঝাঁঝি** প্রভৃতি পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্যের জন্য কীট-পতঙ্গের উপর নির্ভরশীল। এদিকে প্রাণিদেহে ক্লোরোফিল না থাকায় তারা সালোকসংশ্লেষ চালাতে অক্ষম। সেজন্য তাদের দেহে খাদ্য প্রস্তুতের প্রশ্ন ওঠে না। প্রাণীরা সেই কারণে প্রত্যক্ষ বা



চিত্র 4.2—উদ্ভিদ ও প্রাণীর অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড-সম্বন্ধীয় নির্ভরশীলতা।

পরোক্ষভাবে উৎপাদকের উপরে নির্ভরশীল। গরু, ছাগল, ফড়িং, **তৃণভোজী** (Herbivorous) প্রাণী। ব্যাঙ, বাঘ প্রভৃতি অধিকাংশ **মাংসাশী** (Carnivorous) প্রাণী কোন না কোন তৃণভোজীকে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে।

সুতরাং খাদ্যের জন্য প্রাণী নিঃসন্দেহে উদ্ভিদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

(2) অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড-সম্বন্ধীয় নির্ভরশীলতা (চিত্র 4.2) ঃ

অক্সিজেন ছাড়া উদ্ভিদ বা প্রাণী কেউই বাঁচে না। ক্রমাগত শোষিত হতে থাকলে বায়ুর অক্সিজেনের পরিমাণ ভয়াবহভাবে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাসের অর্থ মৃত্যুর হাতছানি। বিস্ময়ের কথা, উদ্ভিদ-কুলের একক প্রচেষ্টায় মৃত্যুর শীতল হাতের স্পর্শ থেকে জীব-জগৎ রক্ষা পাচ্ছে।



চিত্র 4.3—পুষ্টি ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধীয় নির্ভরশীলতা।

সালোকসংশ্লেষ চলাকালে উদ্ভিদ একদিকে যেমন বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে, অন্যদিকে তেমনি অক্সিজেন উৎপাদন দ্বারা শ্বসনে সাহায্য করে এবং বায়ুকে নির্মল করে। উদ্ভিদের খাদ্যোৎপাদনে কার্বন ডাই-অক্সাইড অপরিহার্য। শ্বসনের মাধ্যমে প্রাণী উদ্ভিদের পক্ষে অপরিহার্য কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে যোগান দেয়। উদ্ভিদ নিজেও শ্বসন প্রক্রিয়ায় বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি করে। পারতপক্ষে, উল্লেখিত দুই প্রকার গ্যাসের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ ও প্রাণী বহুলাংশে একে অপরের উপর নির্ভর-শীল।

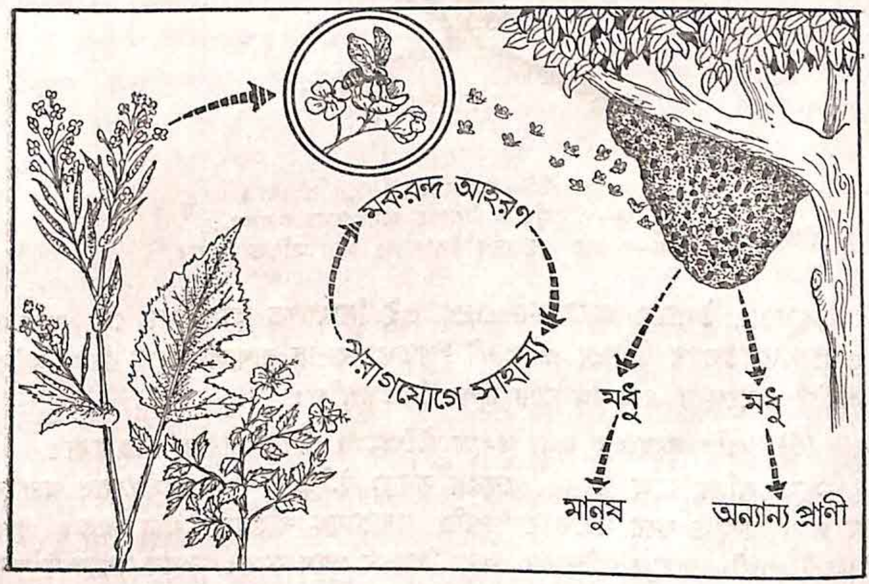
(3) **বংশবিস্তার, পুষ্টি ও ব্যাপ্তি-সম্বন্ধীয় নির্ভরশীলতা** (চিত্র 4.3) ঃ

প্রাণী নানাপ্রকার বীজ বা ফল খায়। সেজন্য উদ্ভিদের বীজ বা ফল একস্থান থেকে অন্যত্র বাহিত হয়। অনুকূল পরিবেশে সেখানে ঐ বীজ বা ফল থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়।

প্রাণীর মতো উদ্ভিদ স্বেচ্ছায় যত্র-তত্র ঘোরাফেরা করতে পারে না। বিস্তারে সাহায্য করার প্রতিদানে উদ্ভিদও নানারূপ লোভনীয় খাদ্যের পসরা সাজিয়ে বা রঙীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রদর্শন দ্বারা প্রাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীলতার প্রতিদানে প্রাণী উদ্ভিদের ব্যাপ্তি বা বিস্তারে সহায়তা করে।

(4) **উদ্ভিদের পরাগযোগ ও প্রাণীর মকরন্দ আহরণ-সম্বন্ধীয় নির্ভরশীলতা** (চিত্র 4.4) ঃ

মকরন্দ ও স্বাদু পরাগের প্রলোভন দেখিয়ে বা মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে উদ্ভিদ প্রাণীকে আকৃষ্ট করে। কীট-পতঙ্গ ফুলে ফুলে বিচরণ কালে পরাগযোগ



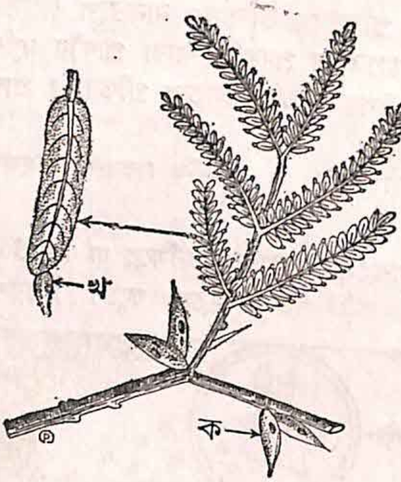
চিত্র 4.4—উদ্ভিদের জনন ও মকরন্দ সম্বন্ধীয় নির্ভরশীলতা।

ঘটায়। প্রয়োজনীয় পরাগযোগ ঘটানোর প্রতিদানে মধু, সুমিষ্ট রস, স্বাদু পরাগ পরিবেশন ক'রে উদ্ভিদ প্রাণিকুলকে আতিথ্য জানায়।

(5) **বাসস্থান ও আত্মরক্ষামূলক নির্ভরশীলতা** (চিত্র 4.5) ঃ

আম, লিচু, জামরুল প্রভৃতি গাছে লাল পিঁপড়া বাসা বাঁধে। আশ্রয়-লাভের পর পিঁপড়ার দল গাছের দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করে এবং ফল সংগ্রহ-কারী প্রাণীকে যথাসাধ্য বাধা দেয়। প্রাণীর সহায়তায় উদ্ভিদের এই বিশেষ

প্রতিরোধী ব্যবস্থার নাম **মিরমিকোফিলি*** (Myrmecophily)। একদিকে বাসস্থানের ব্যবস্থা, অন্যদিকে খাদ্যের সুবন্দোবস্ত ক'রে পাকাপাকিভাবে দেহ-রক্ষীর দলকে ধরে রাখার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অ্যাকাসিয়া স্ফিরোসিফালা (*Acacia sphaerocephala*) নামক এক জাতীয় বাবলা গাছে এই ধরনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা যায় (চিত্র 4.5)।



চিত্র 4.5—অ্যাকাসিয়া স্ফিরোসিফালা ঃ
ক—পরিবর্তিত উপপত্রে বাসস্থানের ব্যবস্থা ;
খ—পাতার অগ্রভাগে পিঁপড়ার জন্য সঞ্চিত খাদ্য।

সুতরাং, উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, আকৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলেও দুই ভিন্ন জীব-গোষ্ঠী বহুক্ষেত্রে একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

(6) **শক্তি সংগ্রহের জন্য সবুজ উদ্ভিদের উপর প্রাণীর নির্ভরতা ঃ**

সূর্য শক্তির মূল উৎস। কেবল সবুজ উদ্ভিদই সালোকসংশ্লেষ মাধ্যমে যে খাদ্য প্রস্তুত করে তাতে সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিরূপে ধরা পড়ে। তৃণ-ভোজী প্রাণীরা সবুজ উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। তখন সবুজ উদ্ভিদ (উৎপাদক)-এর দেহে সঞ্চিত সৌরশক্তি খাদ্যের মাধ্যমে তৃণভোজীর দেহে চলে যায়। আবার তৃণভোজী প্রাণীকে প্রথম শ্রেণীর খাদক (মাংসাশী প্রাণী) খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে প্রথম শ্রেণীর খাদককে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এইভাবে উৎপাদকের দেহ থেকে ক্রমান্বয়ে সর্বোচ্চ সারির খাদকের দেহে সৌরশক্তি প্রবাহিত হয়।

* অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে মিরমিকোফিলিকে সহকৃতি-র সমার্থক দেখানো হয়েছে। প্রকৃত অর্থে সহকৃতি (Mimicry)-র অর্থ হ'ল আত্মরক্ষার তাগিদে প্রয়োজনীয় কোন জীবের আকৃতি নকল করা।

(7) **উদ্ভিদ ও প্রাণী—উভয় ক্ষেত্রেই একের রেচন পদার্থ দ্বারা অন্যের উপকার সাধন ঃ**

উদ্ভিদ ও প্রাণীর রেচন পদার্থ একে অন্যের কাজে লাগে। উদ্ভিদের দেহে সঞ্চিত **উপক্ষার** (alkaloids) মানুষের প্রভূত উপকারে আসে। ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ ঔষধ **কুইনাইন** (quinine) **সিঙ্কোনা** গাছের ছালে সঞ্চিত এক ধরনের রেচন পদার্থ। মানুষের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং উন্মাদ ব্যক্তির চিকিৎসায় ব্যবহৃত **রিসারপিন** (recerpine) **সর্পগন্ধা** নামক গাছের মূলের ছাল থেকে তৈরী হয়। আফিং গাছের **মরফিন** (morphine) উপক্ষারটি মানুষকে অজ্ঞান করতে বা বেদনা উপশমের কাজে ব্যবহৃত হয়। তামাকের **নিকোটিন** (nicotine), চায়ের **থিয়িন** (theine), কফির **ক্যাফিন** (caffine) ইত্যাদি দেহকে অবসাদমুক্ত করতে সাহায্য করে। ধুতরার **ডেটুরিন** (daturine), ঔষধরূপে এবং বেলেডোনা গাছের পাতার নির্যাস **অ্যাট্রোপিন** (atropine) চোখের মণি বা তারারন্ধ্র (pupil) প্রসারণে, যন্ত্রণা উপশমে এবং অত্যধিক ঘাম নিবারণের ঔষধরূপে অত্যন্ত ফলপ্রদ।

এদিকে উদ্ভিদজাত রেচন পদার্থ ট্যানিন চামড়াকে ট্যান করতে এবং ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। গঁদ আঠা, ছাপার কালি প্রস্তুত করতে কাঁচামাল হিসাবে কাজে লাগে। রবার গাছের তরুক্ষীর থেকে **রবার** তৈরী হয়। উদ্ভিদের অন্য এক রেচন পদার্থ **রজন** (Resin) বার্ণিশ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

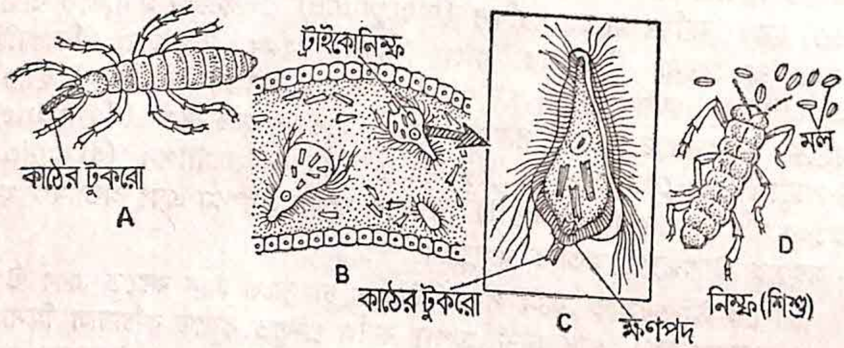
অন্যদিকে প্রাণীর রেচন পদার্থ ইউরিয়া উদ্ভিদের সার হিসাবে গৃহীত হয়। প্রাণীদের রেচন পদার্থ কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুতের কাজে প্রধান কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(8) **মিথোজীবিতা** বা **অন্যোন্যজীবীত্ব** বা **সিমবায়োসিস ঃ**

মিথোজীবিতা প্রক্রিয়াটি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর উদ্ভিদ ও প্রাণী পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতায় বেঁচে থাকে। **অঙ্গাঙ্গী জড়িত ভিন্নতর দু'টি জীব পরস্পর পরস্পরের সাহচর্যে বেঁচে থাকলে তাকে মিথোজীবিতা** বা **অন্যোন্যজীবীত্ব** বা **সিমবায়োসিস** বলে। মিথোজীবিতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত হ'ল—

(a) **ক্লোরোহাইড্রা ও জুওক্লোরেল্লা ঃ** একনালীদেহী ক্লোরোহাইড্রার (*Chlorohydra*) অন্তস্ত্বকে **জুওক্লোরেল্লা** (*Zoochlorella*) নামক এক প্রকার শেওলা বাস করে। হাইড্রার শ্বসনে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং রেচনে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন করে। জুওক্লোরেল্লা সেই কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ ক'রে সালোকসংশ্লেষ মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। এদিকে ক্লোরোহাইড্রা পরিত্যক্ত নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ গ্রহণ ক'রে শেওলাটি নিজদেহে প্রোটিন সংশ্লেষের সুযোগ পায়। এই উপকারের প্রত্যুত্তরে জুওক্লোরেল্লা ক্লোরোহাইড্রাকে সালোকসংশ্লেষজাত কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করে।

(b) **উইপোকা ও ট্রাইকোনিম্ফ ঃ** উইপোকা শক্ত কাঠকেও খেয়ে ফেলে, কিন্তু কাঠের সেলুলোজ হজম করতে পারে না। উইপোকার অন্ত্রে বসবাসকারী **ট্রাইকোনিম্ফ** সেই সেলুলোজ হজম করতে সাহায্য করে। এই উপকারের প্রতিদানে ট্রাইকোনিম্ফ উইপোকার কাছ থেকে আশ্রয় ও খাদ্য লাভ করে। পরিণত উইপোকার মলে ট্রাইকোনিম্ফ থাকে, অপরিণত উইপোকা সেই মল খেয়ে বেঁচে থাকে। ঐ সময়েই তাদের দেহে ট্রাইকোনিম্ফ প্রবেশ করে।



চিত্র 4.6—প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর মিথোজীবীয় পুষ্টি ঃ
A—উইপোকা কর্তৃক কাঠের টুকরো গ্রহণ ; B—উইপোকার অন্ত্রে বসবাসকারী ট্রাইকোনিম্ফ ; C—ক্ষণপদের সাহায্যে ট্রাইকোনিম্ফ কর্তৃক কাঠের টুকরো আত্মসাৎ ; D—শিশু উইপোকা খাদ্য হিসাবে মল গ্রহণ করলে ট্রাইকোনিম্ফ দ্বারা আক্রান্ত হয়।

(c) **লাইকেন ঃ** দুটি উদ্ভিদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লাইকেন। শেওলা ও ছত্রাকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে তৈরী হয় লাইকেন। ছত্রাক নিজে খাদ্য তৈরী করতে পারে না—খাদ্যের অভাব পূরণ করে ক্লোরোফিল-সমৃদ্ধ শেওলা। শেওলা যেমন ছত্রাককে খাদ্য যোগায়, ছত্রাকও তেমনি তাকে আশ্রয় দান করে এবং জল যোগায়। এরা এতই অঙ্গাঙ্গী জড়িত যে একটি ছাড়া অন্যটি বাঁচে না।

(d) **শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদমূল ও রাইজোবিয়ম ব্যাকটিরিয়া ঃ** মটর, মুগ, প্রভৃতি শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদ মূল রাজজোবিয়ম (*Rhizobium*) ব্যাকটিরিয়াকে আশ্রয় দেয়—সেখানে অর্বুদ (nodule) সৃষ্টি ক'রে তারা বাতাসের নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে। শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদ ঐ নাইট্রোজেন সরবরাহ পেয়ে ব্যাকটিরিয়াকে শর্করাজাতীয় খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়।

প্রদর্শন

(Demonstration)

1. **কার্বন-চক্র** (Carbon cycle) (চিত্র 4.7) ঃ

জীবদেহ-গঠনে কার্বন অপরিহার্য উপাদান। সাধারণত বায়ুমণ্ডলের 'কার্বন' কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসরূপে থাকে। বাতাসের আয়তনের হিসাবে ঐ গ্যাসের পরিমাণ শতকরা 0·03 ভাগ। বায়ু ও মাটির মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় কার্বন প্রতিনিয়ত গৃহীত হলেও প্রাকৃতিক নিয়মে সেই কার্বনের মাত্রার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে না ; এমনকি কখনই তা নিঃশেষিত হয় না।

● **কার্বন-চক্রের সংজ্ঞা** (Definition of Carbon cycle) ঃ **যে প্রক্রিয়ায় জীব-জগৎ ও পরিবেশের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের আদান-প্রদান মাধ্যমে কার্বনের পরিমাণের সামঞ্জস্য ঘটে, তাকে কার্বন-চক্র বলে।**

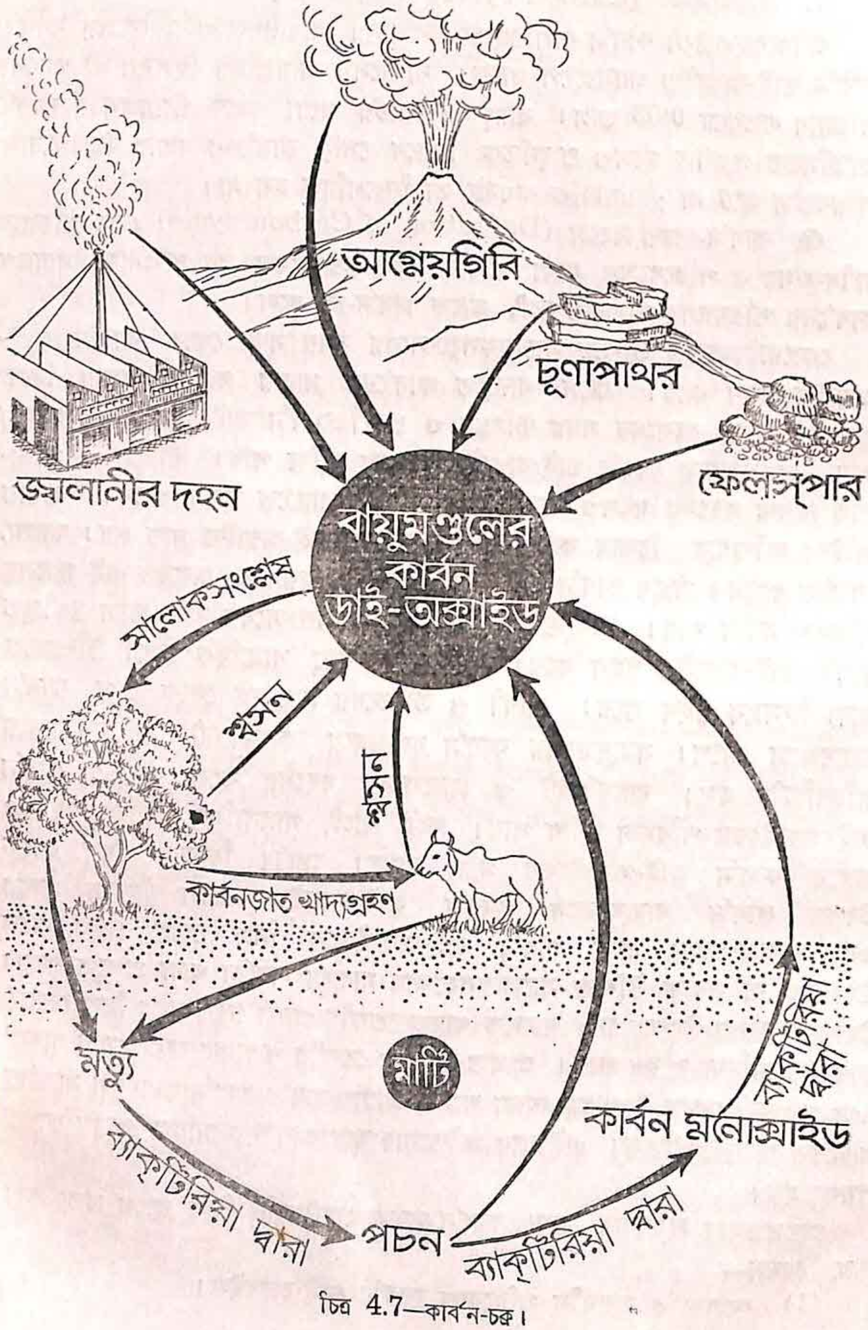
ক্লোরোফিলযুক্ত উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষের সময় বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। ফলে বায়ুতে কার্বনের মাত্রার ঘাট্‌তি দেখা দিতে পারে। কিন্তু **শ্বসনের সময়** উদ্ভিদ ও প্রাণী কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে, এতে **বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়**। উদ্ভিদ ও প্রাণি-জাত দ্রব্যের **দহনের ফলেও** কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুতে ফিরে আসে। আবার **মাটিস্থ জীবাণুর ক্রিয়ার ফলে** বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড মুক্ত হয়। **কয়লা, পেট্রোল দহনেও** প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং বায়ুতে এই গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সামুদ্রিক উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষের সময় জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। অন্যদিকে বহু সামুদ্রিক প্রাণী উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃতদেহ থেকে প্রাপ্ত কার্বন সমুদ্রজলে মেশে। সমুদ্রজলের কার্বন যথাসময়ে কার্বোনেট ও চুনাপাথরে পরিবর্তিত হয়। **কার্বোনেট ও চুনাপাথর দহনের ফলে** বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। **কাঠ, ঘুঁটে, গ্যাসোলিন প্রভৃতির দহনেও** বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বাড়ে। অর্থাৎ **বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন কার্বন বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড রূপে বিরাজ করে** এবং বায়ুমণ্ডলের সেই কার্বন ডাই-অক্সাইডকে নিজ দেহে গ্রহণ ক'রে উৎপাদক বা সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ মাধ্যমে শর্করা খাদ্য প্রস্তুত করে। উৎপাদক দ্বারা উৎপন্ন সেই খাদ্যকে খাদক শ্রেণীর প্রাণী গ্রহণ করে নিজ দেহের কার্বনের চাহিদা পূরণ করে। আবার বিভিন্ন শ্রেণীর খাদকের মধ্যে 'খাদ্য-খাদক' -এর সম্পর্ক থাকায় উৎপাদক দ্বারা শর্করা খাদ্যে আবদ্ধ কার্বন ক্রমান্বয়ে সর্বোচ্চ খাদকের দেহে পৌঁছায়। এইভাবে জীবজগৎ তার কার্বনের চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হয়।

আলোচনার সুবিধার জন্য কার্বন-চক্রকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

(1) **স্থলজ ও বায়বীয় পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইড।**

(2) জলজ পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইড।

(3) স্থলজ ও বায়বীয় পরিবেশে এবং জলজ পরিবেশের কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ।



চিত্র 4.7—কার্বন-চক্র।

(1) স্থলজ ও বায়বীয় পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইডঃ

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় শতকরা 0·03 ভাগ। সবুজ স্থলজ উদ্ভিদ বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডকে গ্রহণ ক'রে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া চালায় এবং তার ফলে সবুজ উদ্ভিদদেহে শর্করাজাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়। সেই শর্করাজাতীয় খাদ্য থেকে উদ্ভিদদেহে প্রয়োজন মতো প্রোটিন ও ফ্যাটজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। প্রাণী খাদক হিসাবে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে। সেইসব খাদ্য প্রোটিন, ফ্যাট যাই হোক না কেন তার মূল উৎস উৎপাদক। সুতরাং একথা বলতে অসুবিধা হবে না যে, প্রাণিকুল উদ্ভিদজাত খাদ্য গ্রহণ ক'রে বা উদ্ভিদজাত পদার্থের উপর নির্ভরশীল অন্য প্রাণীর মাংস ভক্ষণ ক'রে প্রকারান্তরে বায়ুর কার্বনকেই আত্মসাৎ করে।

এইভাবে জীবদেহে ক্রমাগত বায়ুর কার্বন চ'লে আসার ফলে বায়বীয় পরিবেশে যাতে কার্বন ঘাটতি দেখা না দেয় সেজন্য শ্বসন মাধ্যমে সব স্থলজ প্রশ্বাসী জীব বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। এছাড়া বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়মে বিভিন্ন উৎস যেমন, জীবদেহের পচন, বিভিন্ন জ্বালানীর দহন, আগ্নেয়গিরি, উষ্ণ প্রস্রবণ প্রভৃতি থেকেও কার্বন-অক্সাইড উদ্গত হ'য়ে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘাটতি পূরণ করে।

(2) জলজ পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইড ঃ

বায়ুমণ্ডলে অপেক্ষা জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অনেক বেশী। সমুদ্রের জলে শতকরা প্রায় 1·0 ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশে থাকে। সম্পূর্ণ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ পরিচালনার সময় জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। কোন কোন সামুদ্রিক মাছ জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড সংগ্রহ করে তাকে নিজদেহে কার্বনেটে রূপান্তরিত ক'রে নিয়ে দেহ গঠনের কাজে লাগায়। অ্যাসিডের সংস্পর্শে এলে ক্যালসিয়ম কার্বোনেট থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এদিকে জীব হিসাবে জলজ প্রাণী এবং জলজ উদ্ভিদ শ্বসনে যথারীতি কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে।

(3) স্থলজ ও বায়বীয় পরিবেশের এবং জলজ পরিবেশের কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ ঃ

স্থলজ ও বায়বীয় পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ঠিক রাখার জন্য তাদের নিজস্ব ব্যবস্থা থাকলেও উভয় পরিবেশের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের আদান-প্রদান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বস্তুতঃ স্থলজ পরিবেশ থেকে জলজ পরিবেশে এবং জলজ পরিবেশ থেকে স্থলজ পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রভূত আদান-প্রদান ঘটে। এই প্রক্রিয়াটি মূলত ব্যাপক ও বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। উদাহরণ হিসাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের বিক্রিয়ায় কার্বোনিক অ্যাসিড উৎপাদনের উল্লেখ করা যায়।

তাছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ফিরে এসে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘাটতি পূরণ করতে সমর্থ হয়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, পরিবেশ ও জীবজগতের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সুষ্ঠু আদান-প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃতিতে কার্বনের ভারসাম্য বজায় থাকে। তবে ইদানিং কলকারখানা, যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু প্রকৃতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ক্রমবর্ধমান। জীবের স্বাস্থ্যের পক্ষে এই অবস্থা মোটেই অনুকূল নয়। সেজন্য বিশেষত সহরাঞ্চলের অধিবাসীকে অধিক সংখ্যক বৃক্ষ রোপণে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। অন্যথায় কার্বনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য হবে বিঘ্নিত, পরিবেশ হবে দূষিত এবং বসবাসের অযোগ্য।

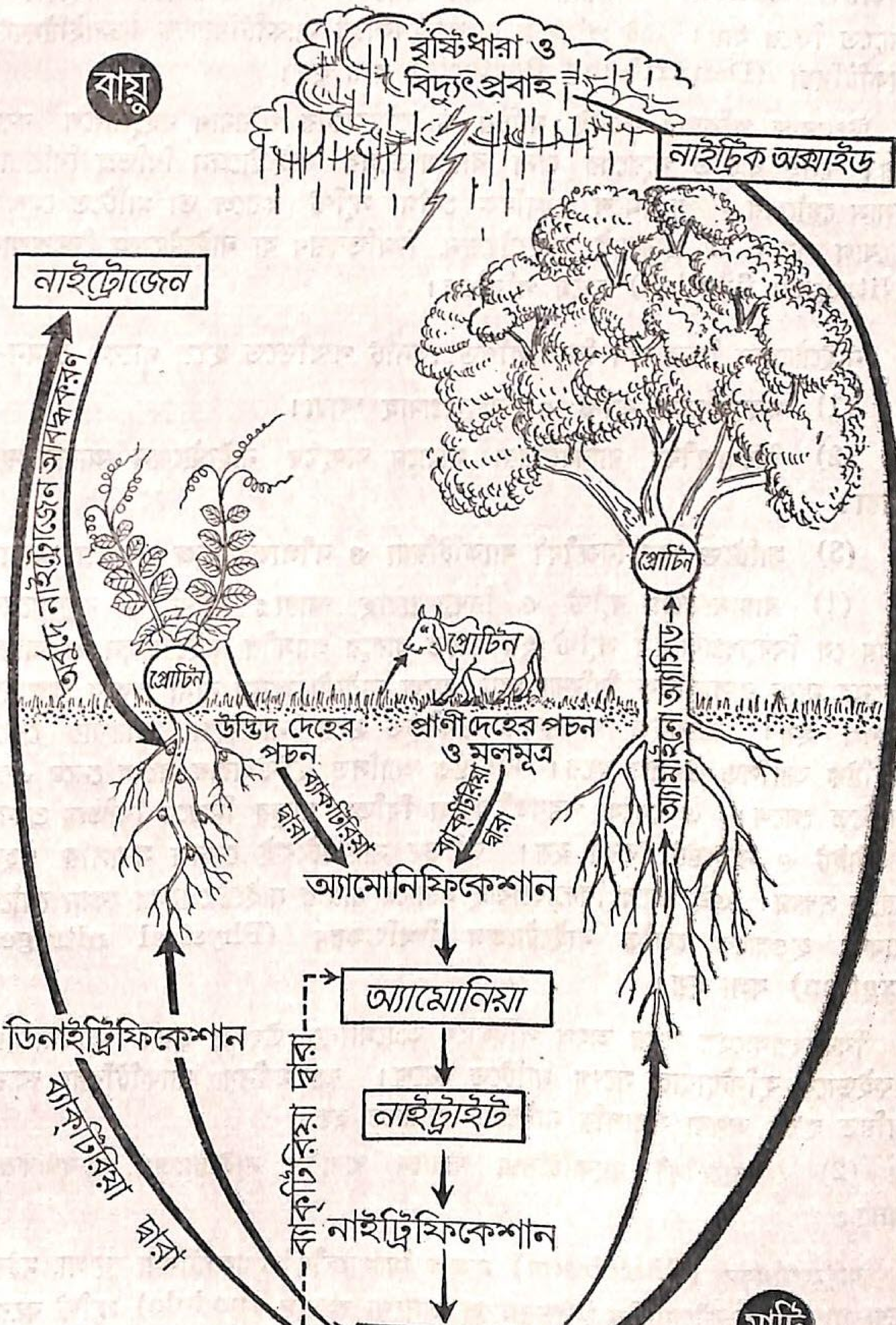
2. **নাইট্রোজেন-চক্র** (Nitrogen cycle) (চিত্র 4.8) ঃ

জীবকোষের প্রোটোপ্লাজম গঠনে নাইট্রোজেন অপরিহার্য। জীবজগতের তাবৎ নাইট্রোজেনের উৎস বায়ুর মৌলিক নাইট্রোজেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীব বায়ুর নাইট্রোজেনই গ্রহণ করে। ক্রমাগত ব্যবহৃত হলেও বায়ুর নাইট্রোজেনে ঘাটতি পড়ে না।

● **নাইট্রোজেন-চক্রের সংজ্ঞা** (Definition of Nitrogen cycle) ঃ **যে পরিস্থিতি ও ঘটনাবহুল প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের পরিমাণের সামঞ্জস্য বিধান ঘটে, তাকেই নাইট্রোজেন-চক্র বলে।**

বায়ুর নাইট্রোজেন বৃষ্টিধারার সঙ্গে বা বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মাটির নাইট্রেটে পরিবর্তিত হয়। মাটি থেকে নাইট্রেট শোষণ ক'রে সবুজ উদ্ভিদ প্রোটিন গঠন করে। উদ্ভিদজাত প্রোটিন গ্রহণ ক'রে প্রাণী নিজের প্রোটিন চাহিদা মেটায়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর গলিত মৃতদেহ মৃতজীবী ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে তা থেকে **অ্যামোনিয়া ও অ্যামোনিয়ার বিভিন্ন যৌগ উৎপন্ন হয়।** এই প্রক্রিয়াকে **অ্যামোনিফিকেশান** (Ammonification) বলে। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ব্যাকটিরিয়াকে **অ্যামোনিফাইং ব্যাকটিরিয়া** (Ammonifying bacteria) বলা হয়।

শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদ-মূলের অর্বুদে আবদ্ধ নাইট্রোজেনকে এবং মুক্তজীবী কোন কোন জীবাণু বায়ুর নাইট্রোজেনকে মাটির অ্যামোনিয়ায় পরিবর্তিত করে। অ্যামোনিয়া পুনরায় নাইট্রিফাইং গোষ্ঠীর **নাইট্রোজোমোনাজ** (*Nitrosomonas*), **নাইট্রোব্যাকটার** (*Nitrobacter*) ইত্যাদি ব্যাকটিরিয়ার প্রভাবে **নাইট্রিফিকেশান** (Nitrification) পদ্ধতিতে বায়ুর **নাইট্রাইট**-এ রূপান্তরিত হয়। পরে নাইট্রাইট **নাইট্রোব্যাক্টার** জীবাণুর দ্বারা **নাইট্রেটে** পরিবর্তিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ব্যাকটিরিয়াকে **নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া** (Nitrifying bacteria) বলে। প্রোটিন-খাদ্য উৎপাদনের জন্য উদ্ভিদ মাটি থেকে সরাসরি নাইট্রেট শোষণ করে। তবে **ডিনাইট্রিফিকেশান**



চিত্র 4.8—নাইট্রোজেন-চক্র।

(Denitrification) প্রক্রিয়ায় নাইট্রেট থেকে কিছু পরিমাণে নাইট্রোজেন বায়ুতে ফিরে যায়। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ব্যাকটিরিয়াকে **ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া** (Denitrifying Bacteria) বলা হয়।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ার ফলেই মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বহুলাংশে কমে যায়। সেই ঘাটতি পূরণের জন্য বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন বিভিন্ন বিক্রিয়ায় নানান মৌলের সঙ্গে মিশে একাধিক যৌগ সৃষ্টি করলে তা মাটিতে মেশার সুযোগ পায়। এ প্রক্রিয়াই নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ বা **নাইট্রোজেন ফিক্সেশান** (Nitrogen fixation) নামে পরিচিত।

নাইট্রোজেন ফিক্সেশান নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতিতে হ'য়ে থাকে। যেমন—

(1) **বায়ুমণ্ডলে বৃষ্টি ও বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা।**

(2) **মিথোজীবী ব্যাকটিরিয়া মাধ্যমে অর্বুদে নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ দ্বারা।**

(3) **মাটিতে স্বাধীনজীবী ব্যাকটিরিয়া ও নীলাভ-সবুজ শেওলা দ্বারা।**

(1) **বায়ুমণ্ডলে বৃষ্টি ও বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা :** বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সময় যে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয় তাতে বায়ুর গ্যাসীয় নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, ফলে নাইট্রোজেনের নানা প্রকার অক্সাইড উৎপন্ন হয়। অক্সাইড জলকণায় দ্রবীভূত হ'য়ে নানারূপ বিক্রিয়ায় শেষে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। নাইট্রিক অ্যাসিড বৃষ্টিধারার সঙ্গে নেমে এসে মাটিতে মেশে। এ থেকে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধাতুর মিশ্রণে বিভিন্ন প্রকার নাইট্রাইট ও নাইট্রেট তৈরী হয়। উদ্ভিদ নাইট্রেটকেই কেবল সরাসরি গ্রহণ করতে সক্ষম। এই ভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহ মাধ্যমে বায়ুর নাইট্রোজেনের কোন যৌগে আবদ্ধ হওয়াকে **ভৌত নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ** (Physical nitrogen fixation) বলা হয়।

বিদ্যুৎপ্রবাহের সময় অল্প পরিমাণে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। অ্যামোনিয়া একইভাবে বৃষ্টিধারার সঙ্গে মাটিতে মেশে। অ্যামোনিয়া ব্যাকটিরিয়া দ্বারা জারিত হ'য়ে অথবা সরাসরি নাইট্রেটে পরিণত হয়।

(2) **মিথোজীবী ব্যাকটিরিয়া মাধ্যমে অর্বুদে নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ দ্বারা :**

রাইজোবিয়াম (*Rhizobium*) নামক মিথোজীবী ব্যাকটিরিয়া ছোলা, মটর, খণ্ডে প্রভৃতি শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদমূলে অসংখ্য অর্বুদ (nodule) সৃষ্টি করে। ঐসব অর্বুদে বাতাসের গ্যাসীয় নাইট্রোজেন নানারূপ নাইট্রোজেন যৌগরূপে বাঁধা পড়ে। ঐসব নাইট্রোজেন যৌগ থেকে সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন পায় এবং তা থেকে দেহে প্রোটিন উৎপন্ন করে ও এই উপকারের

প্রত্যুত্তরে তারা ব্যাকটিরিয়াকে শর্করা খাদ্য সরবরাহ করে। এইভাবে একে অন্যের কোন ক্ষতির কারণ না হ'য়ে অঙ্গাগী যুক্ত হ'য়ে বেঁচে থাকাকে **মিথোজীবীতা** বা **অন্যোন্যজীবিতা** (Symbiosis) বলে। শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদের এই বিশেষ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে চাষের জমিতে নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। বিশেষ এই প্রক্রিয়া **শস্যপর্যায়** (Crop rotation) নামে পরিচিত।

প্রাণীরা উদ্ভিজ্জ প্রোটিন সংগ্রহ ক'রে তাদের দেহে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন অভাব পূরণ করে। তৃণভোজীরা প্রত্যক্ষভাবে এবং মাংসাশীরা পরোক্ষভাবে তাদের দেহে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেনঘটিত যৌগপদার্থের চাহিদা মেটায়।

(3) মাটিতে স্বাধীনজীবী ব্যাকটিরিয়া ও নীলাভ-সবুজ শেওলার দ্বারা :

অ্যাজোটোব্যাকটার (*Azotobacter*) ও **ক্লসট্রিডিয়ম** (*Clostridium*) ইত্যাদি ব্যাকটিরিয়া এবং **নস্টক** (*Nostoc*), **অ্যানাবিনা** (*Anabaena*) ইত্যাদি নীলাভ-সবুজ শেওলা মাটিতে স্বাধীনজীবী হিসাবে বসবাস করে। এরা বায়ুর গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে সরাসরি গ্রহণ ক'রে তাকে নাইট্রোজেন যৌগে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। মৃত্যুর পরে এইসব ব্যাকটিরিয়া ও শেওলার দেহে অবস্থিত নাইট্রোজেন যৌগ মাটিতে নাইট্রোজেন সারের মাত্রা বৃদ্ধি করে।

আদর্শ উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের গঠন এবং তাদের কাজ 5

[Structure of a typical plant cell and an animal cell and their functions]

5.1. ঐতিহাসিক বিবরণ *[Historical background]* :

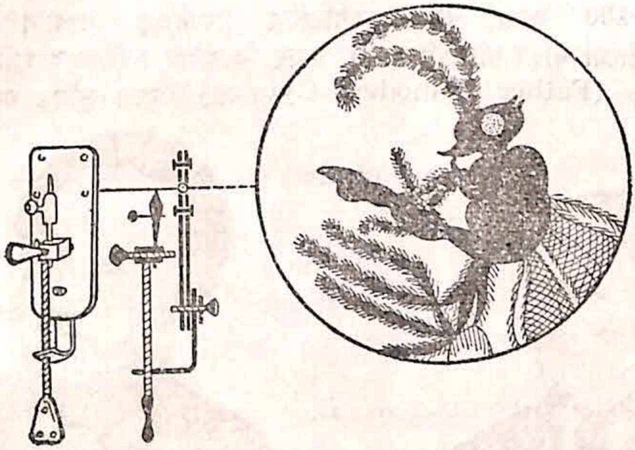
জীবদেহের রহস্য উদ্ঘাটনের ঔৎসুক্য আজকের নয়। গ্রীক দার্শনিক মহামতি **অ্যারিস্টোটলের** (Aristotle) যুগ থেকেই এবিষয়ে চিন্তার সূত্রপাত। যুগে যুগে সেই জ্ঞানের ভান্ডার চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত। জ্ঞানভান্ডারের প্রথম প্রবেশদ্বার উদ্ঘাটন করেন ডাচ বিজ্ঞানী **লিউয়েনহক** (Leeuwenhoek) (1632—1723 A. D.)। তিনিই সর্বপ্রথম সরলতম অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ব্যাক্‌টিরিয়া, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীব তাঁর স্ব-উদ্ভাবিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রেই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু 1654 খ্রীষ্টাব্দে যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর থেকেই কোষ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাতে থাকে। ইংরাজ বিজ্ঞানী **রবার্ট হুক** (Robert Hooke) 1665 খ্রীষ্টাব্দে কর্কের ছিপির সূক্ষ্মছেদ পরীক্ষা করার সময় কেবল মৌচাকের মতো কতকগুলি কুঠরী দেখেন এবং সেই বিশেষ কুঠরীর নাম দেন কোষ। উত্তরকালে তিনি অন্যান্য উদ্ভিদ অঙ্গেও কোষের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন এবং সেই সঙ্গে কোষগুলির গহ্বর যে রসপূর্ণ, তা অনুধাবন করেন।



চিত্র 5.1—বিজ্ঞানী লিউয়েনহক।

1781 খ্রীষ্টাব্দে **ফন্টানা** (Fontana) কোষে নিউক্লিয়সের অস্তিত্ব অনুমান করেন। **রবার্ট ব্রাউন** (Robert Brown)-কেই নিউক্লিয়সের আবিষ্কর্তার সম্মান দেওয়া হয়। প্রতিটি জীবকোষেই নিউক্লিয়স আছে—এই কথাটি তিনি 1833 খ্রীষ্টাব্দে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন। 1835 খ্রীষ্টাব্দে **ডুজারডিন** (Dujardin) কোষের মধ্যে অবস্থিত জেলির মতো অর্ধতরল চট্‌চটে যে পদার্থ আবিষ্কার করেন, পরবর্তীকালে 1840 খ্রীষ্টাব্দে **পারকিন্‌জি** (Purkinje) তার নাম দেন **প্রোটোপ্লাজম** (Protoplasm)। নামকরণের পর বিজ্ঞানীমহলে প্রোটোপ্লাজম কথাটি প্রচলন করতে **হুগো ফন মোল** (Hugo von Mohl)-এর অবদান উল্লেখযোগ্য।

1838 খ্রীষ্টাব্দে **স্লাইডেন** (Schleiden) কোষকে উদ্ভিদ-দেহের একক বলে ঘোষণা করেন। পর বৎসর **স্নোওবান** (Schwann) প্রাণিদেহের এককটিও যে কোষ তা প্রমাণ করেন। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় 1839 খ্রীষ্টাব্দেই **কোষ-**



চিত্র 5.2—লিউয়েনহক কর্তৃক উদ্ভাবিত সরলতম অণুবীক্ষণ যন্ত্র।



চিত্র 5.3—বিজ্ঞানী রবার্ট হুক।

তত্ত্ব (Cell-theory)* প্রকাশিত হয়। জীবনের মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটনের প্রয়াসে কোষতত্ত্বের অবদানকে আধুনিক জীববিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

* কোষ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক জ্ঞানের প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে 'কোষতত্ত্ব'কে পুরোপুরি সমর্থন করা যায় না। কারণ সমস্ত জীবের দেহ-ই কোষযুক্ত নয় (যেমন, কোষবিহীন প্রোটোজোয়া) এবং সকল কোষই সুস্পষ্ট ও পৃথক নিউক্লিয়সযুক্ত নয় (যেমন, ভাইরাস)। তাছাড়া ভাইরাসই শুধু নয়, ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ-সবুজ শেওলার নিউক্লীয় বস্তুর বাইরে নিউক্লীয় পর্দা থাকে না।

প্রায় 100 বছর আগে সোওবান কোষতত্ত্ব সম্বন্ধে আজকের ধারণার কাঠামো দাঁড় করিয়েছিলেন। সেই কারণেই তাঁকে **আধুনিক কোষ-তত্ত্বের জনক** (Father of modern Cytology) বলে ভূষিত করা হয়।



চিত্র 5.4—স্লাইডেন।



চিত্র 5.5—সোওবান।

5.2. কোষতত্ত্বের প্রধান বক্তব্য [*Salient features of cell theory*] :

(i) **প্রায় সমস্ত জীবদেহ অসংখ্য কোষের সমষ্টি মাত্র ; অর্থাৎ জীবদেহে কোষ গঠনগত একক** (Structural unit of a cell)।

(ii) **প্রতিটি কোষ বিপাকক্রিয়ার একক, কারণ জীবদেহের বৈশিষ্ট্য প্রকাশকারী লক্ষণগুলির উৎপত্তিস্থল হ'ল কোষ।**

(iii) **কোষ বংশগতির একক, কারণ কোষের নিউক্লিয়সের মধ্যেই বংশ-ক্রমের ধারাবাহিকতার মূল রহস্য লুকানো থাকে।**

(iv) **কেবল কোষ থেকেই কোষ উৎপন্ন হয়।**

(v) **কোন জীবের কার্যকলাপ তার দেহগঠনকারী কোষের কার্যকলাপের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।**

5.3. কোষতত্ত্বের বিপক্ষে সওয়াল [*Arguments against cell theory*] :

বর্তমান জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে কোষতত্ত্বকে বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন না। কারণ জগতের সমস্ত জীবই কোষযুক্ত (Cellular) নয়, অনেকেই কোষবিহীন (acellular) দেহের অধিকারী, যেমন **প্রোটোজোয়া** বা **আদ্যপ্রাণী** (Protozoa)। আবার সব কোষেই নিউক্লিয়স থাকে না (যেমন, ভাইরাস)। ভাইরাস ছাড়া ব্যাকটিরিয়া, নীলাভ-সবুজ শেওলা প্রভৃতিতে **নিউক্লীয় পদার্থ** নিউক্লীয় পর্দায় ঘেরা থাকে না।

5.4. কোষতত্ত্বের গুরুত্ব *[Importance of cell concept]* :

কোষ হল—(i) **সজীব দেহের গঠনগত একক।**

(ii) **কার্যকরী একক।**

(iii) **বৃদ্ধির একক।**

(iv) **বংশগতির একক।**

5.5. কোষের সংজ্ঞা *[Definition of cell]* :

জগতের প্রতিটি জীব নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে অনন্য। তাই সব রকম কোষের প্রতিনিধিত্ব করার মতো জগতে **আদর্শ কোষ** (Typical cell) বলতে কিছু নাই। কতকগুলি বিশেষ বস্তু সাধারণভাবে সব কোষে থাকলেও কোষের গঠন ও চরিত্রে প্রচুর ভেদাভেদ থাকে। তাই নানাভাবে **কোষের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে**। যেমন—

(i) **জীবের গঠনগত ও কার্যকরী একক** (structural and functional unit)-**কে কোষ বলে।**

(ii) **কোষ পর্দা** (cell membrane) **বা কোষ-প্রাকারে আবদ্ধ নানাবিধ পদার্থ ও নিউক্লিয়সযুক্ত সাইটোপ্লাজমই কোষ।**

(iii) **"জীবনের প্রকাশ ঘটাবার মতো গুণসম্পন্ন একখণ্ড প্রোটোপ্লাজম হল কোষ"**—ম্যাক্স সুতসা (Max Schultze, 1825-1874)।

(iv) **"অন্য কোন জৈববস্তুবিহীন আধারে নিজের অনুরূপ জীব সৃষ্টির ক্ষমতা সম্পন্ন অর্ধভেদ্য পর্দায় আবৃত জৈবনিক কাজে লিপ্ত একককে কোষ বলে।"**—লোয়ে ও সিকেভিৎস (Loewy and Siekevitz, 1963)।

(v) আধুনিক কালের দৃষ্টিতে **নিউক্লিয়স-নিয়ন্ত্রিত একখণ্ড সাইটোপ্লাজমকে কোষ বলা হয়।**

(vi) **জৈব বস্তুর সর্বনিম্ন সাংগঠনিক একক হল কোষ।**

কারণ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, লিপিড প্রভৃতি পদার্থের অণুগুলি আলাদা আলাদাভাবে মোটেই সজীব নয়। এগুলি সুনির্দিষ্টভাবে সংগঠিত হ'লে তবেই সেখানে জীবনের লক্ষণ ফুটে ওঠে।

5.6. কোষের প্রকারভেদ *[Types of cells]* :

নিউক্লিয়স-সংগঠনের দিক থেকে জীবজগতে দু'ধরনের কোষ দেখা যায়। এদের পার্থক্য বোঝাতে বিজ্ঞানী **ডগহার্টি** (Dougherty) সর্বপ্রথম 1957 খ্রীষ্টাব্দে আদি কোষকে প্রোক্যারিওট (Prokaryote, গ্রীক—*pro* = আদি, *karyon* = নিউক্লিয়স) ও আদর্শ নিউক্লিয়সযুক্ত কোষকে ইউক্যারিওট (Eukaryote, গ্রীক—*Eu* = প্রকৃত, *karyon* = নিউক্লিয়স) আখ্যা দেন। আধুনিককালে জীববিজ্ঞানীরাও তাই বিভিন্ন ধরনের কোষকে দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন। যেমন—

(1) **প্রোক্যারিওটিক কোষ** (Procaryotic cell)—ভাইরাস (চিত্র 5.6), ব্যাকটিরিয়া (চিত্র 5.7), নীলাভ-সবুজ শেওলা (চিত্র 5.8) প্রভৃতির কোষ এই ধরনের। কোষগুলিতে নিউক্লীয় পর্দায় ঘেরা নিউক্লিয়স* থাকে না। সাইটো-প্লাজমেই নিউক্লীয় বস্তু ছড়ান থাকে। তাছাড়া এধরনের কোষে প্লাসটিড, মাইটো-কনড্রিয়া, গলগি বস্তু, সেণ্ট্রিওল, এণ্ডোপ্লাজমীয় জালক প্রভৃতি **কোষীয় অঙ্গাণু** (cell organelles) আদৌ থাকে না বা থাকলেও তা অপৃথকিকৃত আদি দশাতেই থাকে। এই কোষগুলি কোষপর্দার সাহায্যেই সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের কাজ চালিয়ে নেয়। সুতরাং **নিম্নস্তরের যে সব কোষে সংগঠিত নিউ-ক্লিয়স ও বিশিষ্ট কোষীয় অঙ্গাণু থাকে না তাদের প্রোক্যারিওটিক কোষ বলে।**

(2) **ইউক্যারিওটিক কোষ** (Eukaryotic cell) : এই ধরনের কোষ আদ্যপ্রাণী, ছত্রাক, অধিকাংশ শেওলাসহ সমস্ত উন্নত উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে দেখা যায়। এখানে নিউক্লীয়পর্দায় ঘেরা সুস্পষ্ট নিউক্লিয়স বর্তমান। এই সমস্ত কোষে সালোকসংশ্লেষ, রেচন, শ্বসন প্রভৃতি নানা শারীরবৃত্তীয় কাজ নির্দিষ্ট কোষীয় অঙ্গাণুর দ্বারা সম্পন্ন হয়।

5.7. প্রোক্যারিওটিক কোষ ও ইউক্যারিওটিক কোষের পার্থক্য *[Differences between Prokaryotic cells and Eukaryotic cells] :*

প্রোক্যারিওটিক কোষ	ইউক্যারিওটিক কোষ
(1) কোষের গঠন সরল।	(1) কোষের গঠন জটিল।
(2) ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া, নীলাভ-সবুজ শেওলা প্রভৃতি নিচু স্তরের জীবের দেহকোষ প্রোক্যারিওটিক।	(2) আদ্যপ্রাণী, ছত্রাক, অধিকাংশ শেওলা ও উন্নত উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষ ইউক্যারিওটিক।
(3) খুব ছোট আকারের, গড় মাপ 1—10*nm*.	(3) তুলনামূলকভাবে বড় আকারের, মাপ 10—100*nm*.
(4) সংগঠিত নিউক্লিয়স থাকে না।	(4) নিউক্লিয়স সংগঠিত।
(5) নিউক্লীয় পর্দা থাকে না।	(5) নিউক্লীয় পর্দা থাকে।
(6) সাধারণত প্লাসটিড, মাইটোকন-ড্রিয়া, গলগি বস্তু, সেণ্ট্রিওল, এণ্ডোপ্লাজমীয় জালক প্রভৃতি অঙ্গাণু থাকে না ; অথবা থাকলেও অপৃথকিকৃত আদি দশাতেই থাকে।	(6) অধিকাংশ কোষে কোষীয় অঙ্গাণু থাকে।

* তবে লেডেনবার্গ (Ledenberg 1948, 1955), ব্যাকটিরিয়ায় নিউক্লিয়সের মতো পদার্থ দেখেছেন।

প্রোক্যারিওটিক কোষ	ইউক্যারিওটিক কোষ
(7) ক্রোমাটিন বডিগুলিতে সাধারণত DNA অথবা RNA থাকে।	(7) ক্রোমোজোমে DNA ও RNA উভয়ই থাকে।
(8) কোষপর্দা ও তার অন্তরভাঁজ দ্বারা শ্বসন, সালোকসংশ্লেষ প্রভৃতি কাজ চলে।	(8) বিভিন্ন কাজের জন্যে পৃথক পৃথক কোষ ও অংগাণু আছে।
(9) মাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজিত হয় না; **দ্বিভাজন** (Binary fission) পদ্ধতি অনুসৃত হয়।	(9) কোষ প্রধানত মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়। তবে নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণি-কোষে দ্বিভাজন পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

5.8. কোষের আকার বা আকৃতি [*Shape of cells*] :

কোষের আকার উল্লেখযোগ্যভাবে বৈচিত্র্যময়। **শ্বেত-রক্তকণিকা** বা **অ্যামিবা** ক্রমাগত নিজেদের আকৃতি পরিবর্তন করে। তবে শুক্রাণু, লোহিত কণিকা, আবরণীকোষ, নার্ভকোষ প্রভৃতি অধিকাংশ কোষেরই নিজস্ব আকৃতি থাকে। জীবকোষ গোলাকার, ডিম্বাকার, বহুভুজাকার, দণ্ডাকার, চ্যাপ্টা, আয়ত-ক্ষেত্রাকার প্রভৃতি নানা আকারের হয়। পরিবেশের প্রভাব, পৃষ্ঠটান, প্রোটো-প্লাজমের সান্দ্রতা, সংলগ্ন কোষের যান্ত্রিক চাপ—এমন কি কোষ-পর্দার কাঠিন্য অধিকাংশ প্রাণিকোষের নির্দিষ্ট আকৃতি দিতে সহায়ক হয়। তবে উদ্ভিদে সেলুলোজ নির্মিত কঠিন কোষ-প্রাকার থাকায় কোষগুলির আকৃতি মোটামুটি নির্দিষ্ট। অধিকাংশ প্রাণীর ডিম, ঈস্ট, মানুষের রক্তের লোহিতকণিকাগুলি গোল বা ডিম্বাকার। ব্যাকটিরিয়া গোল, দণ্ডাকার, 'কমা' বা কর্ক স্ক্রুর মতো। আবরণীকোষ চ্যাপ্টা, পেশীকোষ লম্বা সূচাল। নার্ভকোষ আরো লম্বা এবং শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীর শুক্রাণু লম্বা এবং শুঙ্গযুক্ত। সমুদ্রিক শেওলা **অ্যাসিটেবুলেরিয়া** (*Acetabularia*)-র দেহ এককোষী হলেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রাইজয়েডের মতো বিস্তৃত গোড়া, লম্বা দেহ ও ছত্রাকার টুপি—এই তিনটি অংশে এটি বিভক্ত।

5.9. কোষের আয়তন [*Size of cells*] :

আকারে যেমন আয়তনেও তেমনি কোষের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার মতো। **স্তন্য-পায়ীর কোন কোন নার্ভকোষ সবচেয়ে বড়। মাইকোপ্লাজমা** (*Mycoplasma*) নামে প্রাণীর কোষ ক্ষুদ্রতম। ডিমের আয়তন বেশ বড়—খালি চোখে দেখা যায়। খাদ্য সম্ভারে পরিপূর্ণ ডিমের আকৃতি উল্লেখযোগ্যভাবে দৃষ্টি আকর্ষী হলেও প্রকৃতপক্ষে ডিম হল একটি কোষ। **উটপাখীর ডিম সবচেয়ে বড় কোষ। উদ্ভিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোষের অধিকারী অ্যাসিটেবুলেরিয়া।**

তবে অধিকাংশ ডিমের আয়তন খুবই ছোট, খালি চোখে তো নয়ই—অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখাই যায় না। নীচে কয়েকটি কোষের উল্লেখযোগ্য আয়তনগত পার্থক্য দেখান হল ঃ

কোষ	আয়তন
মাইকোপ্লাজমা	0.15μ
স্ট্যাফাইলোকক্কাস	1μ
লোহিত রক্তকণিকা	7.5μ
ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস	100μ
অ্যামিবা	100μ
মানুষের ডিম্বাণু	100μ
উটপাখীর ডিম	60×45mm
মুরগীর ডিম	170×135mm
অ্যাসিটেবুলেরিয়া	9—10cm

● মাপন একক ●

1μ [মাইক্রন বা মিউ] বা
$1\mu m$ [মাইক্রোমিটার] $\left.\right\} \frac{1}{1000}$ mm

যখন, $1000\mu = 1mm$.

$1m\mu$ [মিলি মাইক্রন] বা
1nm [ন্যানোমিটার] $\left.\right\} = \frac{1}{1,000\mu} = 0.001\mu$ বা nm.

$1Å$ [অ্যাংস্ট্রম] বা $m\mu$ [মিলিমাইক্রন] $= \frac{1}{10,000\mu}$

$1,000\ Å = 0.1\mu$
$10,000\ Å = 1\mu$

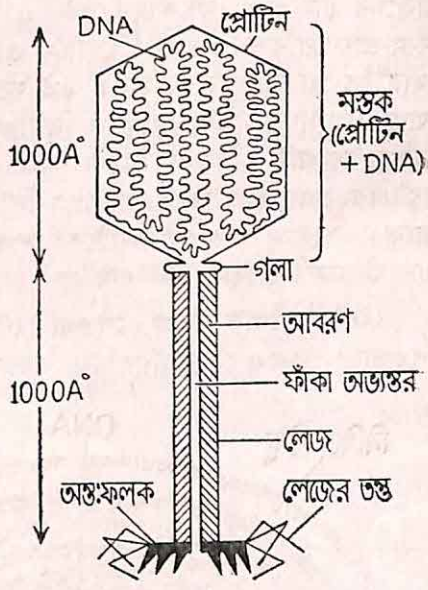
5.10. কোষের সংখ্যা [*Number of cells*] :

আদ্যপ্রাণী, ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া, নিম্নশ্রেণীর শেওলা প্রভৃতির দেহ একটি-মাত্র কোষদ্বারা গঠিত। তবে অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত। **রোটিফার** (Rotifer)-এর দেহে কয়েকশত, হাইড্রায় কয়েক হাজার কোষ থাকে। উন্নত জীবদেহে অবশ্য কোষের সংখ্যা অগণিত। অধিকাংশ জীবের আকৃতি নির্ভর করে কোষের উপর। বিস্ময়ের কথা, মানুষের মস্তিষ্কের কেবল ধূসর বস্তুতেই (gray matter) 1,000,000,000,000 (a million millions) কোষ আছে।

5.11. প্রোক্যারিওটিক কোষের গঠন [*Structure of Prokaryotic cells*] :

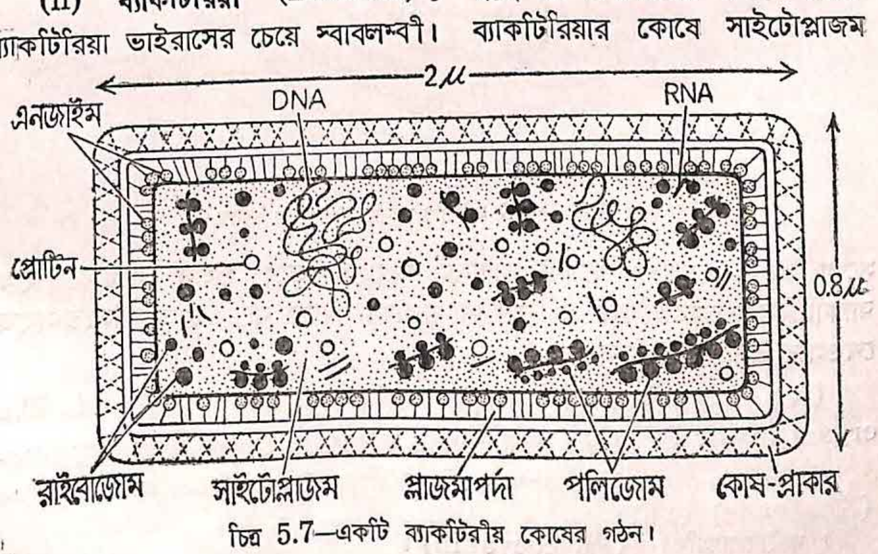
অঙ্গসংস্থানগতভাবে অত্যন্ত সরল ও নিম্নস্তরের কোষ হল **প্রোক্যারিওটিক** (গ্রীক—*Pro* = আদি বা প্রথম, *karyon*—নিউক্লিয়স)। এই ধরনের কোষের নিউক্লিয়স প্রাচীনতম, কেননা নিউক্লিয়সকে ঘিরে কোন নিউক্লীয়পর্দা থাকে না। তাই প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড প্রভৃতি নিউক্লিয়সের ভিতরের বস্তুসমূহ ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ থাকে। তাছাড়া প্রোক্যারিওটিক কোষে মাইটোকনড্রিয়া, গলগি বস্তু প্রভৃতি কোষীয় অংগাণু থাকে না। ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া, নীলাভ-সবুজ শেওলা প্রভৃতির দেহ প্রোক্যারিওটিক কোষ দ্বারা গঠিত।

(i) **ভাইরাস** (Virus) : ভাইরাস জীবজগতের সরলতম প্রতিনিধি। অধিকাংশ ভাইরাস ব্যাকটিরিয়া থেকেও ছোট। কোন একপ্রকার ভাইরাস-কোষে কেবল একধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড—DNA অথবা RNA থাকে। নিউক্লিক অ্যাসিডকে ঘিরে থাকে প্রোটিন আবরণী। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, ভাইরাস-কোষের মধ্যে সাইটোপ্লাজম নাই। ভাইরাস পরজীবী—তাই সজীব কোষের বাইরে এরা জড়বৎ ও নিষ্ক্রিয়। পোষকের কোষ-প্রাকার হজম ক'রে ক্ষতের সৃষ্টি করার জন্য এদের দেহে কেবল একই রকমের এনজাইম থাকে। উদ্ভিদ-ভাইরাসের নিউক্লীয় বস্তু RNA, কিন্তু অধিকাংশ প্রাণী-ভাইরাসের নিউক্লীয় বস্তু DNA। ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণকারী **ফাজ ভাইরাস** বা ব্যাকটিরিওফাজ (bacteriophase)-এর দেহ ব্যাঙাচির মতো মস্তক ও লেজে বিভক্ত। এর মস্তকটিতে থাকে প্রোটিন স্তরে ঘেরা DNA (চিত্র 5.6)। মস্তক ও লেজ প্রতিটির দৈর্ঘ্য প্রায় 1000A°।



চিত্র 5.6—একটি ফাজ ভাইরাসের গঠন।

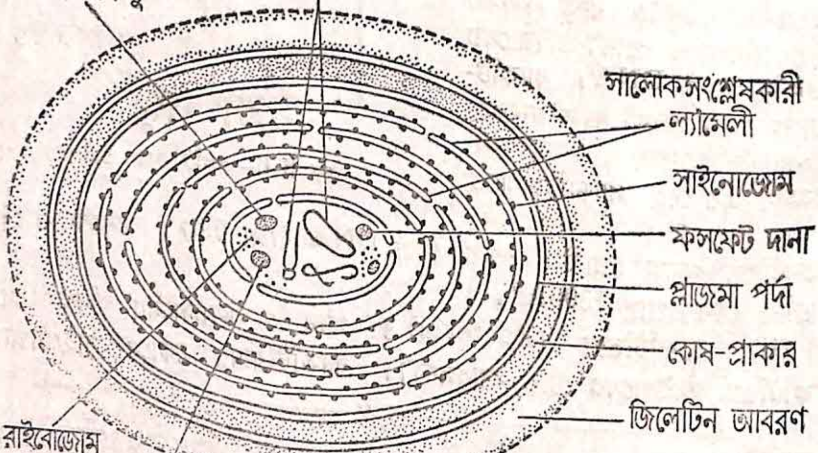
(ii) **ব্যাকটিরিয়া** (Bacteria) : গঠন ও উপাদানের দিক থেকে ব্যাকটিরিয়া ভাইরাসের চেয়ে স্বাবলম্বী। ব্যাকটিরিয়ার কোষে সাইটোপ্লাজম



চিত্র 5.7—একটি ব্যাকটিরীয় কোষের গঠন।

থাকে। সাইটোপ্লাজমে মাইটোকনড্রিয়া, গলগি বস্তু, এণ্ডোপ্লাজমীয় জালক না থাকলেও রাইবোজোম, RNA ও কোন না কোন প্রোটিন বর্তমান। সাইটোপ্লাজমের চারদিকে কার্বোহাইড্রেট ও পলিপেপটাইডের কোষ-প্রাকার থাকে। কোষ-প্রাকারে কখনও কখনও প্রোটিন ও লিপিড থাকে। কোষ-প্রাকারের ভিতরে যথারীতি প্লাজমাপর্দা বর্তমান। এই স্তরেই এনজাইম থাকে। নিউক্লিওপ্রোটিন দ্বারা আচ্ছাদিত RNA অণুকে **নিউক্লিয়য়েড** (Nucleoid) বলে। **ইশ্চেয়ারিচিয়া কোলাই** (*Escherichia coli*) নামে যে ব্যাকটিরিয়মটির গঠন সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য জানা গেছে, সেখানে নিউক্লিয়য়েড (DNA) প্লাজমাপর্দায় লেগে থাকে। সংলগ্ন থাকার স্থানটিতেই সম্ভবত DNA অণুর বিভাজন শুরু হয়। ব্যাকটিরিয়মটির দৈর্ঘ্য 2μ এবং প্রস্থ 0.8μ (চিত্র 5.7)।

(iii) **নীলাভ-সবুজ শেওলা** (Blue-green algae) ঃ নীলাভ-সবুজ শেওলার* কোষও প্রোক্যারিওটিক ধরনের (চিত্র 5.8)। ব্যাকটিরিয়া কোষের



চিত্র 5.8—একটি নীলাভ-সবুজ শেওলার কোষ।

সঙ্গে এদের কোষের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তবে প্রধান পার্থক্য হল, ব্যাকটিরিয়ায় ক্লোরোফিল ও অন্যান্য রঙ্গক† থাকে না, কিন্তু নীলাভ-সবুজ শেওলায় এগুলি বর্তমান।

(iv) **প্লুরোনিউমোনিয়া সদৃশ জীব** (Pleuropneumonia-like organisms or PPLO) ঃ ব্যাকটিরিয়ার মতো জীব হলেও এদের দেহে কোষ-

* উদাহরণ—নস্টক (*Nostoc*), অসিলেটোরিয়া (*Oscillatoria*), অ্যানাবিনা (*Anabaena*) ইত্যাদি।

† ফাইকোসায়ানিন (Phycocyanin)।

প্রকার ও মেসোজোম থাকে না। এদের 75 Å পুরু প্লাজমাপর্দা সহজে বিকৃত হয়ে যায়। এদের নিউক্লিয়স থাকে না তবে অনেক DNA অণু থাকে। উদাহরণঃ **মাইকোপ্লাজমা** (*Mycoplasma*)।

5.12. ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়ার পার্থক্য *[Differences between Virus and Bacteria] :*

ভাইরাস (Virus)	ব্যাকটিরিয়া (Bacteria)
(1) জীবজগতের সরলতম প্রতিনিধি।	(1) ভাইরাস থেকে উন্নত প্রতিনিধি।
(2) অকোষীয় সত্ত্বা।	(2) কোষীয় সত্ত্বা।
(3) পূর্ণপরজীবী।	(3) স্বভোজী বা পরজীবী।
(4) কোষ-প্রাকার নাই।	(4) কোষ-প্রাকার আছে।
(5) সাইটোপ্লাজম নাই।	(5) সাইটোপ্লাজম আছে।
(6) DNA বা RNA থাকে।	(6) DNA ও RNA—উভয়ই থাকে।
(7) ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম প্রভৃতির কারণ।	(7) যক্ষ্মা, আমাশয় প্রভৃতির কারণ।

5.13. ব্যাকটিরিয়া ও নীলাভ-সবুজ শেওলার পার্থক্য *[Differences between Bacteria and Blue-green Algae] :*

ব্যাকটিরিয়া (Bacteria)	নীলাভ-সবুজ শেওলা (Blue-green Algae)
(1) পরজীবী বা স্বভোজী।	(1) স্বভোজী।
(2) কাইটিন দ্বারা কোষ-প্রাকার গঠিত।	(2) সেলুলোজ দ্বারা কোষ-প্রাকার গঠিত।
(3) রঞ্জক পদার্থ সচরাচর থাকে না।	(3) বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ বর্তমান।
(4) দ্বিভাজন পদ্ধতিতে অযৌন জনন হয়।	(4) কোষ-বিভাজন, খণ্ডভবন এবং রেণু উৎপাদন দ্বারা অযৌন জনন হয়।
(5) যৌন জনন সংঘটিত হয়।	(5) যৌন জনন সংঘটিত হয় না।
(6) অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়াই অপকারী। যক্ষ্মা, টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদির কারণ। রাইজোবিয়ম ব্যাকটিরিয়া নাইট্রোজেন বন্ধনে সহায়তা করে।	(6) এরা উপকারী। মাটিতে নাইট্রোজেন স্থিতিকরণে নস্টক, অ্যানাবিনা প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করে।

5.14. প্রোটোপ্লাজম [*Protoplasm*] :

যে রাসায়নিক যৌগে জীবনের সূত্রপাত তাকেই প্রোটোপ্লাজম বলে। প্রোটোপ্লাজম অর্ধ-তরল অর্ধ-স্বচ্ছ, জেলির মতো হড়হড়ে পদার্থ, যাতে নানা জৈব ও অজৈব পদার্থ মিশে থাকে। **প্রোটোপ্লাজম মানেই জীবন**। অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজম নামে চিহ্নিত পদার্থেই প্রাণের লক্ষণ পরিস্ফুট। তাই বিজ্ঞানী **সুত্সা** (Schultze) ও **হাক্সলে** (Huxley) প্রোটোপ্লাজমকে **'প্রাণের ভৌত ভিত্তি'** (physical basis of life) আখ্যা দিয়েছেন।

(i) **ভৌত গুণ** (Physical properties)—উত্তপ্ত হলে প্রোটোপ্লাজম ডিমের সাদা অংশের মতো জমে যায়। অ্যালকোহল প্রয়োগেও প্রোটোপ্লাজমে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। **প্রোটোপ্লাজমের গঠন** সম্বন্ধে নানা মতবাদ (theory) প্রচলিত আছে। কারও মতে প্রোটোপ্লাজম সূক্ষ্ম **সুতোর মতো** ; কেউবা বলেছেন এটি **জালিকাকার** ; আবার অন্যদের মতে প্রোটোপ্লাজম **দানাদার** বা **সাবানের ফেনার মতো**।

(ii) **রাসায়নিক গুণ** (Chemical properties)—প্রোটোপ্লাজম অত্যন্ত জটিল যৌগ। প্রোটোপ্লাজমের শতকরা প্রায় 75 ভাগ জল। পরীক্ষাকালে বা রাসায়নিক বিশ্লেষণের সময় প্রোটোপ্লাজমের মৃত্যু হয়। সেজন্য এর প্রকৃত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গঠন নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়।

প্রোটোপ্লাজম প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পদার্থগুলির দ্বারা গঠিত ঃ

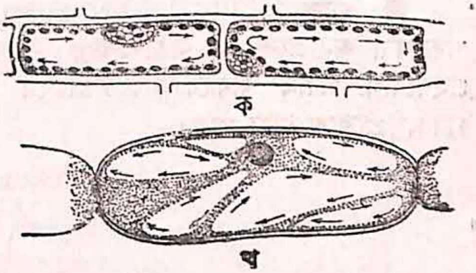
জল	...	...	75.90%
প্রোটিন	...	...	7.10%
লিপিড	...	...	1.02%
কার্বোহাইড্রেট	...	...	1.05%
অন্যান্য অজৈব যৌগ	...	...	2.30%
			87.37%

রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রকাশ, প্রোটোপ্লাজম প্রধানত **কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন** প্রভৃতি মৌলিক উপাদান দ্বারা গঠিত। অন্যান্য মৌলিক উপাদানগুলির মধ্যে **ক্যালসিয়ম, সালফার, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়ম, পটাসিয়ম, লৌহ, সোডিয়ম, ক্লোরিন, জিঙ্ক, মলিবডিনম, অ্যালুমিনিয়ম, বোরন, কোবাল্ট** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, প্রোটোপ্লাজমে নানাপ্রকার **ভাইটামিন** ও **এনজাইম** বর্তমান।

পোড়ালে প্রোটোপ্লাজম অ্যামোনিয়ার গন্ধ ছড়ায়। প্রোটোপ্লাজম ক্ষারধর্মী।

(iii) **প্রোটোপ্লাজমের চলন** (Movement of Protoplasm)—জীবন্ত প্রোটোপ্লাজম কখনই স্থির নয়, সচল। কোষে আবদ্ধ প্রোটোপ্লাজমের চলনকে **আবর্তন** বা **সাইক্লোসিস** (Cyclosis) বলে। প্রোটোপ্লাজমের গতি

একমুখী বা **বহুমুখী**। পাতাশেওলা, এলোডিয়া প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদে প্রধানতঃ একমুখী আবর্তন দেখা যায়। এই পদ্ধতিকে **প্রবাহগতি** বা **রোটেশান** (Rotation) বলে। রিও ডিসকালার (Rheo discolor) গাছের পুংকেশরদণ্ড বা কুমড়ো গাছের রোমের কোষে প্রোটোপ্লাজম বিভিন্ন চক্রে, ভিন্ন ভিন্ন গতিতে আবর্তিত হয়। প্রোটোপ্লাজমের এই গতিকে **আবর্তগতি** বা **সারকুলেশান** (Circulation) বলে। নগ্ন অর্থাৎ প্রাকারাবদ্ধ নয় এমন প্রোটোপ্লাজম অ্যামিবার মতো ক্ষণপদ উৎপাদন দ্বারা চলাফেরা করে। এই চলনকে **অ্যামিবয়েড গতি** (Amoeboid movement) বলে। শুঙ্গের বা সিলিয়ার সাহায্যে নগ্ন প্রোটোপ্লাজমের চলনকে **শুঙ্গগতি** বা **সিলিয়ারী গতি** (Ciliary movement) বলে। ফার্ন, মস প্রভৃতির পুং-জননকোষে শুঙ্গগতি দেখা যায়।



চিত্র 5.9—প্রোটোপ্লাজমের চলন: ক—একমুখী অর্থাৎ প্রবাহগতি ; খ—বহুমুখী বা আবর্তগতি।

5.15. একটি আদর্শ* উদ্ভিদ কোষের গঠন *[Structure of a Typical Plant cell] :*

শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে পরীক্ষা করলে আদর্শ উদ্ভিদকোষে দুটি অংশ দেখা যায়ঃ (1) **কোষ-প্রাকার** ও (2) **প্রোটোপ্লাজম**।

(1) **কোষ-প্রাকার** (Cell wall) ঃ আদর্শ উদ্ভিদকোষের প্রাচীরকে কোষ-প্রাকার বলে। কোষ-প্রাকার সেলুলোজ-নির্মিত নির্জীব একটি বেষ্টনী। প্রোটোপ্লাজমের ক্ষরণজাত পদার্থ থেকেই কোষ-প্রাকার গঠিত হয়।

● **কাজ** (Function) ঃ কঠিন কোষ-প্রাকার† প্রোটোপ্লাজমকে রক্ষা করে এবং কোষের নির্দিষ্ট আকার দান করে।

কোষ-পর্দা বা কোষ-মেমব্রেন বা প্লাজমা মেমব্রেন (Cell membrane or Plasma membrane) ঃ কোষ-প্রাকারের ভিতরে সাইটোপ্লাজমের বাইরের পাতলা পর্দাকে **কোষ-পর্দা** (Cell membrane) বা **প্লাজমা মেমব্রেন** (Plasma

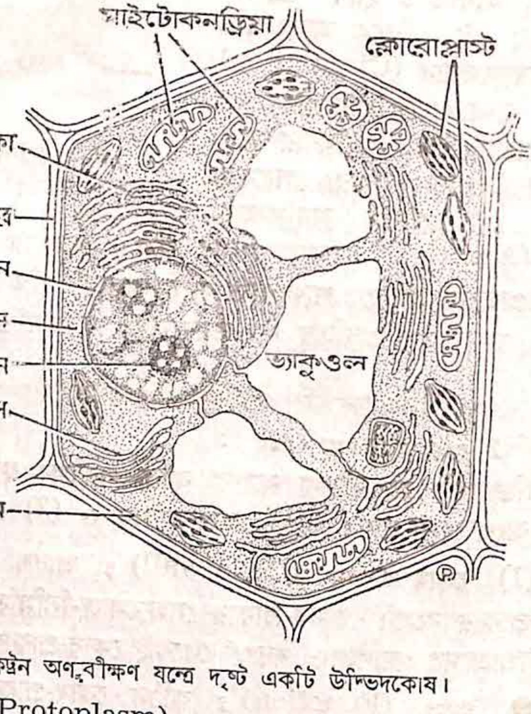
---

* আকার, আয়তন, গঠন এবং কাজের দিক থেকে সব কোষ সমান নয়। কোষ অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। বৈচিত্র্যময় অসংখ্য কোষ একত্রে জটিল জীবদেহ গঠন করলেও সেখানে শ্রমবিভাগ বর্তমান। তবে গঠনগত ও কার্যগত বৈশিষ্ট্যের বিচারে অধিকাংশ কোষ সমধর্মী। কোষের যাবতীয় গঠনগত বৈশিষ্ট্য একটি কোষে নিহিত থাকলে তাকে **আদর্শ কোষ** (Typical cell) বলে। তবে জগতে **আদর্শ কোষ দুর্লভ**।

† কোষ-প্রাকার কঠিন হলেও তাতে প্লাজমোডেসমাটা (Plasmodesmata) নামে (চিত্র 5.13) এমন কতকগুলি বিশেষ ছিদ্র থাকে যেগুলির মাধ্যমে সন্নিহিত দুটি কোষের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা হয়। অতি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদকোষে বা জননকোষে কোষ-প্রাকার থাকে না।

membrane) বলে। প্লাজমা মেমব্রেন-সংলগ্ন সাইটোপ্লাজমের নাম **এক্টোপ্লাজম** (Ectoplasm)। এক্টোপ্লাজমের ভিতরে বাকি দানাময় অংশ **এন্ডোপ্লাজম** (Endoplasm)।

● কাজ (Function) : **প্লাজমা মেমব্রেন কোষের মধ্যে বহিরাগত পদার্থের অনুপ্রবেশ ও অভ্যন্তরস্থ পদার্থের নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে।** এতে গ্রহণযোগ্য পদার্থ অবাধে সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু ক্ষতিকর পদার্থ প্রবেশে বাধা পায়।



চিত্র 5.10—ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট একটি উদ্ভিদকোষ।

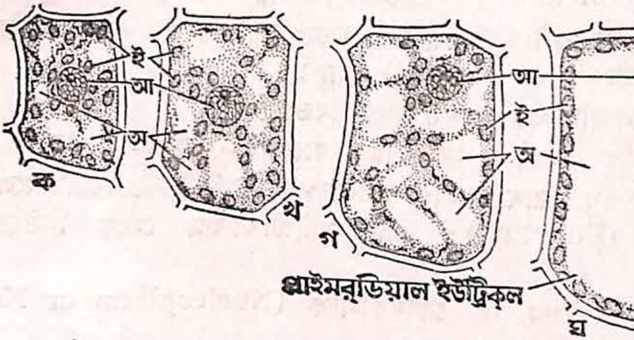
(2) **প্রোটোপ্লাজম** (Protoplasm) : কোষ-প্রাকারে আবদ্ধ বর্ণহীন, অর্ধস্বচ্ছ এবং জেলির মতো থকথকে জীবন্ত অংশকে প্রোটোপ্লাজম বলে। প্রোটোপ্লাজমের মৃত্যু ঘটলে কোষের মৃত্যু ঘটে। **কোষের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠিত প্রোটোপ্লাজমকেই প্রোটোপ্লাস্ট** (Protoplast) বলা হয়।

প্রোটোপ্লাজম নিম্নলিখিত অংশগুলিতে বিভক্ত।

(ক) **সাইটোপ্লাজম** (Cytoplasm)—নিউক্লিয়স ও প্লাসটিড ব্যতীত প্রোটোপ্লাজমের অবশিষ্ট অংশকে সাইটোপ্লাজম বলে।

তরুণ কোষ সর্বদাই সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে। কোষ যতই বড় হয় ততই তাতে প্রচুর **কোষ-গহ্বর বা ভ্যাকুওল** (Vacuole) সৃষ্টি হয়। গহ্বরগুলি ক্রমশঃ একে অন্যের সঙ্গে মিশে বড় আকারের একটি কেন্দ্রীয় গহ্বর (Central vacuole) সৃষ্টি করে। ফলে সাইটোপ্লাজম কোষ-প্রাকারের দিকে

সরে যায় এবং পাতলা স্তরে বিন্যস্ত হয়। প্রাকার-সংলগ্ন সাইটোপ্লাজমের এই পাতলা স্তরকে **প্রাইমর্‌ডিয়াল ইউট্রিকল** (Primordial utricle) বলে



চিত্র 5.11ঃ ক-ঘ—প্রাইমর্‌ডিয়াল ইউট্রিকল গঠনের ক্রমপর্যায়ঃ অ—ক্ষুদ্র কোষ-গহ্বর (ক, খ, গ), কেন্দ্রীয় গহ্বর (ঘ) ; আ—নিউক্লিয়স ; ই—প্লাসটিড।

(চিত্র 5.11)। কোষ-গহ্বর শূন্য থাকে না, সর্বদা **কোষরসে** (Cell sap) পূর্ণ থাকে।

● সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত সজীব ও নির্জীব বস্তুসমূহ ●

(Living and Non-living inclusions of Cytoplasm)

সজীব বস্তুসমূহ (Living objects)—**নিউক্লিয়স, মাইটোকনড্রিয়া, প্লাসটিড, গলগি বস্তু** ইত্যাদি সজীব বস্তু।

1. **নিউক্লিয়স** (Nucleus)—1831 খ্রীষ্টাব্দে **রবার্ট ব্রাউন** (Robert Brown) সজীব কোষে নিউক্লিয়সের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। সাইটোপ্লাজমে



চিত্র 5.12—একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষ।



চিত্র 5.13—প্লাজ্‌মোডেস্‌মাটা।

থাকলেও নিউক্লিয়স একটি পৃথক সত্তা। প্রোটোপ্লাজমের সর্বাপেক্ষা ঘন উপবৃত্তাকার বা গোলাকার অংশটি নিউক্লিয়স। নিউক্লিয়স থেকেই কেবল নতুন

নিউক্লিয়স উৎপন্ন হয়। প্রতি কোষে সাধারণত একটি, সময় বিশেষে দুটি, তিনটি বা ততোধিক নিউক্লিয়স থাকে।

● **কাজ** (Function) ঃ নিউক্লিয়স কোষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কোষের যাবতীয় কার্যকলাপ নিউক্লিয়স দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে নিউক্লিয়সকে **কোষের মগজ** (Brain of the cell) বলা হয়।

নিউক্লিয়স নিম্নলিখিত অংশগুলিতে বিভক্ত ঃ

(i) **নিউক্লীয় ঝিল্লী বা নিউক্লীয় মেমব্রেন** (Nuclear membrane) ঃ নিউক্লিয়সকে ঘিরে রাখা সজীব পাতলা পর্দাকে নিউক্লীয় ঝিল্লী বলে।

● **কাজ** (Function) ঃ এটি সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়সকে পৃথক রাখে।

(ii) **নিউক্লীয়প্লাজম** বা **কেরিওলিম্ফ** (Nucleoplasm or Karyolymph) ঃ

নিউক্লীয় ঝিল্লী-পরিবৃত ঘন জেলির মতো পদার্থটি নিউক্লীয়প্লাজম। **এটি সাইটোপ্লাজম থেকে গাঢ়তর পদার্থ।**

(iii) **নিউক্লীয় জালিকা বা নিউক্লিয়ার রেটিকুলম** (Nuclear reticulum) ঃ নিউক্লীয়প্লাজমের মধ্যে সুতোর মতো জালিকাকারে বিন্যস্ত অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদার্থকে নিউক্লীয় জালিকা বলে।

(iv) **নিউক্লীওলস** (Nucleolus) ঃ

নিউক্লিয়স-মধ্যস্থ এক বা একাধিক উজ্জ্বল গোলাকার **প্রতিসরণক্ষম** (refractive) বস্তুকে নিউক্লীওলস বলে। কোষ-বিভাজনের প্রথম দিকে অবলুপ্ত হলেও শেষের দিকে (টেলোফেজে) এর পুনরাবির্ভাব ঘটে।

● **কাজ** (Function) ঃ অনেকের ধারণা প্রোটিন গঠনে নিউক্লীওলসের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। আবার অন্যদের মতে, কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লীওলস নিজে বিলুপ্ত হয়ে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে।

2. **মাইটোকনড্রিয়া*** (Mitochondria) বা **কনড্রিওজোম** (Chondriosomes)—সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটি হল মাইটোকনড্রিয়া।



চিত্র 5.14—মাইটোকনড্রিয়ার অভ্যন্তরীণ গঠন।

মাইটোকনড্রিয়া দণ্ডাকার বা সূত্রাকার পদার্থ। কোষ বিশেষে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যার ও আকৃতির তারতম্য ঘটে। সাধারণ কোষে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা শতাধিক। শারীরবৃত্তীয় কাজের তারতম্যে মাইটোকনড্রিয়ার আকার সাময়িকভাবে পরিবর্তিত হয়। **মাইটোকনড্রিয়া থেকেই কেবল মাইটোকনড্রিয়া সৃষ্টি হয়।**

* মাইটোকনড্রিয়া—বহুবচন ; মাইটোকনড্রিয়ন—একবচন।

● **কাজ** (Function) ঃ 1957 খ্রীষ্টাব্দে **সিকেভিৎস্** (Siekevits) মাইটোকনড্রিয়াকে **কোষের শক্তিঘর** (Power house of the cell) বলে অভিহিত করেন। মাইটোকনড্রিয়াই কোষের প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করে।

3. **প্লাসটিড*** (Plastid) ঃ সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গোলাকার বা উপবৃত্তাকার বিশিষ্ট জীবন্ত পদার্থগুলি প্লাসটিড।

প্লাসটিড থেকেই কেবল প্লাসটিড উৎপন্ন হয়। বর্ণহীন প্লাসটিডকে **লিউকোপ্লাস্ট** (Leucoplast, চিত্র 5.22) এবং যে সব লিউকোপ্লাস্ট ফ্যাট তৈরী ও সঞ্চয়ের কাজ করে তাদের **এলাইয়োপ্লাস্ট** (Elaioplast, চিত্র 5.23) বলে। সবুজ বর্ণের প্লাসটিডকে **ক্লোরোপ্লাস্ট** (Chloroplast, চিত্র 5.24) এবং সবুজ ভিন্ন অন্য বর্ণের প্লাসটিডকে **ক্রোমোপ্লাস্ট** (Chromoplast, চিত্র 5.21) বলে।

● **কাজ** (Function) ঃ ক্লোরোপ্লাস্ট সালোকসংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে। পাতা, ফুল (এবং সময় বিশেষে মূল) প্রভৃতি উজ্জ্বল বর্ণের অংগে ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে। মাটির মধ্যে অবস্থানকালে উদ্ভিদ-অংগে প্রধানত লিউকোপ্লাস্ট থাকে।

4. **গলগি বস্তু** (Golgi bodies) ঃ 1898 খ্রীষ্টাব্দে একধরনের পেঁচার নার্ভকোষে **ক্যামিলো গলগি** (Camillo Golgi) সর্বপ্রথম এটি আবিষ্কার করেন। আবিষ্কর্তার নামানুসারে বস্তুটির নামকরণ হয়েছে গলগি বস্তু। এটি বিভিন্ন আকার ও আকৃতিবিশিষ্ট ঝিল্লীবিশেষ (চিত্র 5.19)। নিউক্লিয়সের অতি নিকটে গলগি বস্তু অবস্থান করে। উদ্ভিদকোষের গলগি বস্তুকে **ডিকটিওজোম** (Dictyosome) বলে।

● **কাজ** (Function) ঃ গলগি বস্তুর প্রকৃত কাজের নিশানা এখনও রহস্যময়। তবে ক্ষরণজাতীয় পদার্থ উৎপাদনে গলগি বস্তুর অবদান আছে বলে মনে করা হয়।

5. **এণ্ডোপ্লাজমীয় জালক** (Endoplasmic reticulum) ঃ এটি নিউক্লীয় পর্দা থেকে উদগত হয়ে সাইটোপ্লাজমের ধাত্রে থলি (**সিস্টারনী**), গহ্বর (**ভেসিকল**) বা নালিকা (**টিউবিউল**) রূপে জালিকাকারে বিন্যস্ত থাকে (চিত্র 5.25)।

● **কাজ** (Function) ঃ প্রোটিন সংশ্লেষে ও বিভিন্ন পদার্থ পরিবহণে এণ্ডোপ্লাজমীয় জালক অংশ গ্রহণ করে।

6. **রাইবোজোম** (Ribosomes) ঃ রাইবোজোমকে এণ্ডোপ্লাজমীয় জালকের গায়ে লেগে থাকতে অথবা সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়। এগুলি প্রকৃতপক্ষে **রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিন** (RNA+প্রোটিন) দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম দানাময় পদার্থ (চিত্র 5.26)।

---

* প্লাসটিড কেবল উদ্ভিদকোষেই থাকে। তবে সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটিরিয়া, নীলাভ-সবুজ শেওলা এবং ইউগ্লিনা (*Euglena*) নামে প্রাণীর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।

● **কাজ** (Function) ঃ রাইবোজোম প্রোটিন সংশ্লেষ বা ফ্যাট বিপাকে অংশ নেয়।

7. **লাইসোজোম** (Lysosomes) ঃ লাইসোজোম একটি মাত্র লাইপো-প্রোটিন পর্দায় ঘেরা পরিপাক এনজাইমে পূর্ণ, গোল বা বর্তুলাকার বস্তু বিশেষ (চিত্র 5.27)।

● **কাজ** (Function) ঃ কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন পরিপাকে লাই-সোজোম সহায়তা করা।

নির্জীব বস্তুসমূহ (Non-living objects)—উল্লিখিত সজীব বস্তুগুলি ছাড়াও কোষের সাইটোপ্লাজমে নানাপ্রকার বিপাকজাত বা বিপাকে সাহায্যকারী পদার্থ থাকে। বিপাকজাত পদার্থের মধ্যে শ্বেতসার-কণা, ফ্যাট প্রভৃতি সঞ্চিত খাদ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নীচে উদ্ভিদ-কোষের গঠন ছকের মাধ্যমে দেখানো হল ঃ

আদর্শ উদ্ভিদকোষ

(Typical plant cell)

- কোষ-প্রাকার (Cell-wall)
- প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm)
  - সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)
    - এক্টোপ্লাজম (Ectoplasm)
    - এণ্ডোপ্লাজম (Endoplasm)
      - (নিউক্লিয়স ছাড়া এণ্ডোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত বস্তুসমূহ)
        - মাইটোকনড্রিয়া (Mitochondria)
        - প্লাসটিড (Plastid)
          - লিউকোপ্লাসটিড (Leucoplastid)
          - ক্রোমোপ্লাসটিড (Chromoplastid)
          - ক্লোরোপ্লাসটিড (Chloroplastid)
        - গলগি বস্তু (Golgi bodies)
        - এণ্ডোপ্লাজমীয় জালক (Endoplasmic reticulum)
        - রাইবোজোম (Ribosome)
        - লাইসোজোম (Lysosome)
  - নিউক্লিয়স (Nucleus)

নিউক্লিয়স

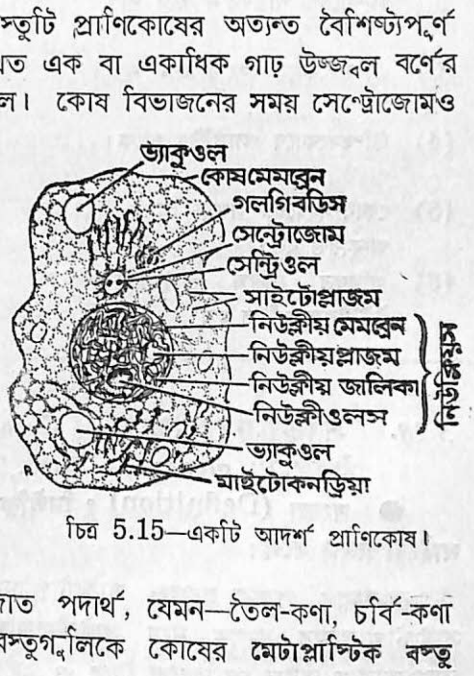
- নিউক্লীয় ঝিল্লী (Nuclear membrane)
- নিউক্লীয়প্লাজম (Nucleoplasm)
- নিউক্লীয় জালিকা (Nuclear reticulum)
- নিউক্লীওলস (Nucleolus)

5.16. আদর্শ প্রাণিকোষের গঠন [*Structure of a Typical Animal cell*] :

আদর্শ প্রাণিকোষে নিম্নলিখিত অংশগুলি দেখা যায়ঃ

(1) **কোষ পর্দা বা প্লাজমা মেমব্রেন বা প্লাজমালিমা** (Cell membrane or Plasma membrane or Plasmalemma)—অর্ধ-স্বচ্ছ, অর্ধ-ভেদ্য সজীব পর্দার দ্বারা প্রাণিকোষের সাইটোপ্লাজম আবৃত থাকে। এই আবরণকে প্লাজমা মেমব্রেন বলে। প্লাজমা মেমব্রেন কোষের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে এবং অভিস্রবণ পদ্ধতি চলাকালে এটি কোষের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের অনুপ্রবেশ বা নিষ্ক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(2) **সাইটোপ্লাজম** (Cytoplasm)—নিউক্লিয়স ছাড়া প্লাজমা মেমব্রেনে আবদ্ধ অর্ধতরল জেলীর মতো পদার্থকে সাইটোপ্লাজম বলে। সাইটোপ্লাজম প্রধানতঃ দুটি অংশে বিভক্ত—**এক্টোপ্লাজম** (Ectoplasm) ও **এন্ডোপ্লাজম** (Endoplasm)। বাইরের দিকের দানাবিহীন, অপেক্ষাকৃত ঘন কঠিন স্তরটি এক্টোপ্লাজম। এক্টোপ্লাজমের ভিতরে দানাময় অপেক্ষাকৃত তরল অংশটি এন্ডোপ্লাজম। কোষের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত থাকে। এদের মধ্যে নিউক্লিয়সের নিকটে অবস্থিত **সেন্ট্রোজোম** (Centrosome) নামে গোলাকার বস্তুটি প্রাণিকোষের অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঙ্গ। সেন্ট্রোজোমের ভিতরে অবস্থিত এক বা একাধিক গাঢ় উজ্জ্বল বর্ণের বিন্দুকে **সেন্ট্রিওল** (Centriole) বলে। কোষ বিভাজনের সময় সেন্ট্রোজোমও বিভক্ত হয় এবং এর দুটি খণ্ড দুটি অপত্য কোষে চলে যায়। সাইটোপ্লাজমে একাধিক ক্ষুদ্রাকার **ভ্যাকুওল** বা **কোষগহ্বর** বর্তমান। কোষগহ্বর যথারীতি **কোষরসে** (Cell sap) পূর্ণ থাকে। কোষরসে ক্ষরণজাত বা রেচন পদার্থ মিশে থাকে। সাইটোপ্লাজমে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় **গলগি বস্তু** ও **মাইটোকনড্রিয়া** দেখা যায়। এদের কাজ উদ্ভিদকোষে অবস্থিত ঐ বস্তুগুলির কাজের অনুরূপ। এছাড়া, নানাবিধ বিপাকজাত পদার্থ, যেমন—তৈল-কণা, চর্বি-কণা বর্তমান। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই বস্তুগুলিকে কোষের **মেটাপ্লাস্টিক বস্তু** (Metaplastic bodies) বলে।



চিত্র 5.15—একটি আদর্শ প্রাণিকোষ।

(3) **নিউক্লিয়স** (Nucleus)—কোষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গোলাকার অংশটি হল নিউক্লিয়স। উদ্ভিদকোষের মতো প্রাণি-

কোষের নিউক্লিয়সও **নিউক্লীয় মেমব্রেন, নিউক্লীয়প্লাজম, নিউক্লীয় জালিকা** ও **নিউক্লীওলস** প্রভৃতি অংশগুলিতে বিভক্ত। এগুলির কাজ উদ্ভিদকোষে অবস্থিত ঐ অঙ্গগুলির কাজের অনুরূপ।

5.17. আদর্শ উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের প্রভেদ *[Differences between a typical Plant cell and an Animal cell]* :

উদ্ভিদকোষ (Plant cell)	প্রাণিকোষ (Animal cell)
(1) অধিকাংশ উদ্ভিদকোষে সুনির্দিষ্ট প্রাকার আছে। প্রাকারটি কঠিন, নির্জীব ও সেলুলোজ দ্বারা গঠিত।	(1) প্রাণিকোষে নির্জীব সেলুলোজ নির্মিত কঠিন প্রাকার নাই। প্লাজমালিমা নামে কোষের বাইরের সজীব পর্দা কোষটির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে।
(2) কোষ-প্রাকার কঠিন, তাই মৃত অবস্থাতেও কোষের নির্দিষ্ট আকারের পরিবর্তন ঘটে না।	(2) কঠিন কোষ-প্রাকার না থাকায় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্লাজমালিমা নষ্ট হয় এবং কোষের নির্দিষ্ট আকারের পরিবর্তন ঘটে।
(3) উদ্ভিদকোষে সেন্ট্রোজোম নাই।	(3) প্রাণিকোষে সেন্ট্রোজোম থাকে। এটি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঙ্গ।
(4) উদ্ভিদকোষে প্লাসটিড থাকে।	(4) প্রাণিকোষে সাধারণতঃ প্লাসটিড থাকে না।
(5) কোষ-গহ্বরের সংখ্যা বেশী এবং আকারও বড়।	(5) কোষ-গহ্বরের সংখ্যা অল্প এবং আকার তুলনামূলকভাবে ছোট।
(6) পরিণত কোষে প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকল গঠিত হয়।	(6) কোন অবস্থাতেই প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকল গঠিত হয় না।

5.18. সাইটোপ্লাজম *[Cytoplasm,* গ্রীক — *kitos* = **hollow**; ফাঁপা ; *plasma* = **form**, আকৃতি *]* :

● **সংজ্ঞা** (Definition) ঃ **নিউক্লিয়স বাদে কোষের বাকি প্রোটোপ্লাজমকে সাইটোপ্লাজম বলে।**

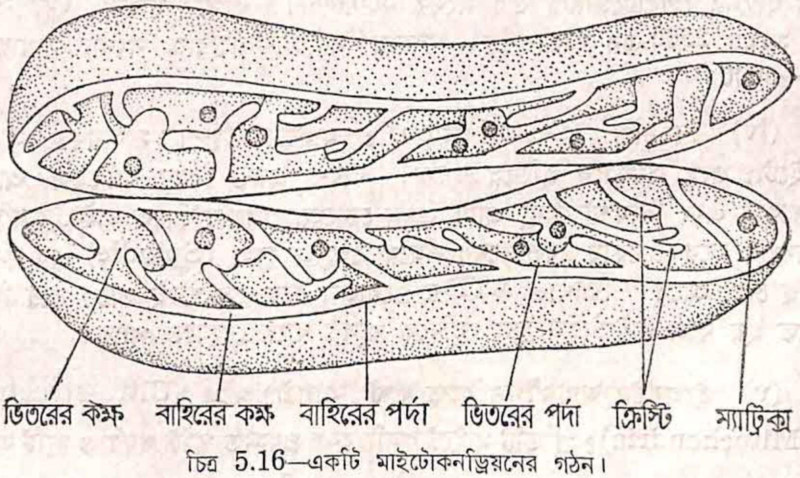
নামকরণ পৃথক হলেও সাইটোপ্লাজমের চরিত্র প্রোটোপ্লাজমের অনুরূপ। সাইটোপ্লাজমের অপর নাম **সাইটোজোম** (Cytosome)। সাইটোপ্লাজমের অপেক্ষাকৃত তরল যে অংশে জৈব ও অজৈব পদার্থ ভেসে থাকে তাকে **সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্র** (Cytoplasmic matrix) বা **কিনোপ্লাজম** (Kinoplasm) বলে। সাইটোপ্লাজমের স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক, পাতলা বাইরের স্তরটিকে **এক্টোপ্লাজম** (Ectoplasm) বা **এক্টোপ্লাস্ট** (Ectoplast) এবং ভিতরের যে

স্তরটি গহ্বর বা ভ্যাকুওলকে ঘিরে থাকে তাকে **টোনোপ্লাজম** (Tonoplasm) বা **টোনোপ্লাস্ট** (Tonoplast) বলে। এক্টোপ্লাজম ও টোনোপ্লাজমের মধ্যবর্তী সাইটোপ্লাজম স্তরকে **এন্ডোপ্লাজম** (Endoplasm) বা **এন্ডোপ্লাস্ট** (Endoplast) বলে। অনেকে মনে করেন এই অংশটি দানাময় (granular)। কোষপর্দা ও সাইটোপ্লাজমে ভাসমান বস্তুগুলির মধ্যে যেগুলির প্রাণ আছে, তারা **অঙ্গাণু** (Organelle) এবং যেগুলির প্রাণ নাই তারা জড় বা **অজীবীয় বস্তু** বা **আরগাস্টিক পদার্থ** (Ergastic substance) নামে পরিচিত। সাইটোপ্লাজমে ভাসমান উল্লেখযোগ্য অঙ্গাণুগুলি হল—(1) মাইটোকনড্রিয়া, (2) গলগি বস্তু, (3) সেন্ট্রোজোম, (4) প্লাসটিড ইত্যাদি।

5.19. মাইটোকনড্রিয়া [Mitochondria, গ্রীক—*mito*=thread; সূত্র, *chondrion*=granule, দানা ; বা Chondriosomes] :

● সংজ্ঞা (Definition) ঃ **শ্বসনে অংশগ্রহণকারী দ্বিপর্দাযুক্ত কোষীয় অঙ্গাণুকে মাইটোকনড্রিয়া বলে।**

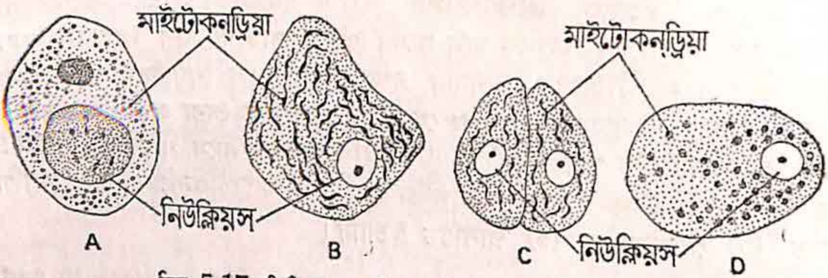
মাইটোকনড্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু। দেহের সমস্ত জৈবনিক কাজকর্ম চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির একমাত্র উৎস হল মাইটোকনড্রিয়া। সেখানে ATP-রূপে শক্তি উৎপন্ন হয়। সেই অর্থে **মাইটোকনড্রিয়াই কোষের শক্তিঘর** (Power house of a cell)।



চিত্র 5.16—একটি মাইটোকনড্রিয়নের গঠন।

অল্টম্যান (Altman, 1894)-এর **বায়োপ্লাস্ট** (bioplast)-কেই পরবর্তীকালে **বেন্ডা** (Benda, 1898) মাইটোকনড্রিয়া নামে অভিহিত করেন। 1900 খ্রীষ্টাব্দে **মাইকেলিস** (Michaelis) প্রথম জেনাস গ্রীন দিয়ে মাইটোকনড্রিয়াকে রং করতে সমর্থ হন। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণুটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা সম্ভব হয়েছে।

(i) **আকৃতি** (Shape) : আকারে পরিবর্তন ঘটলেও মাইটোকনড্রিয়া সাধারণতঃ সূত্রাকার, গোলাকার বা দণ্ডাকার। পরিবেশ ও কাজের তারতম্যে



চিত্র 5.17—বিভিন্ন আকৃতির মাইটোকনড্রিয়া (A-D)।

এর আকৃতির তারতম্য ঘটতে পারে। অনেক সময় এটি এক প্রান্তে ফুলে টেনিস র‍্যাকেটের মত দেখতে হয়।

(ii) **আয়তন** (Size) : সাধারণত মাইটোকনড্রিয়ার আয়তন 0.5μ—7μ, উভচর প্রাণীর ডিম্বকোষে এর দৈর্ঘ্য 20μ—40μ হতে দেখা গেছে।

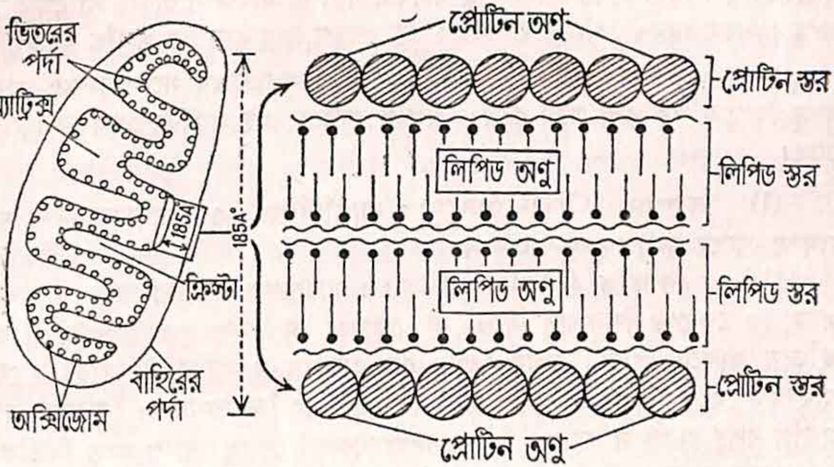
(iii) **সংখ্যা** (Number) : কোষের চরিত্র ও কার্যকলাপের উপরেই মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা নির্ভর করে। **ক্যায়স ক্যায়স** (*Chaos chaos*) নামে এক ধরনের প্রোটোজোয়ায় এর সংখ্যা 500,000। আবার সাধারণ যকৃৎকোষে এর সংখ্যা 2500-এর কাছাকাছি। কোষে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা সাধারণত 50—5000।

(iv) **বিস্তৃতি** (Distribution) : মাইটোকনড্রিয়া সাধারণত সমস্ত সাইটোপ্লাজমে সমভাবে ছড়িয়ে থাকে। অবশ্য এরও কিছু ব্যতিক্রম আছে। বৃক্ককোষ এবং নির্দিষ্ট মেরু আছে এমন কোষের গোড়ার দিকে মাইটোকনড্রিয়া অবস্থান করে। কোষ বিভাজনের সময়ে এগুলি বেম (Spindle)-এর কাছাকাছি চলে আসে। কোথাও ATP-র প্রয়োজন হলে সেখানেই তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হয় বলে মাইটোকনড্রিয়া যেদিকে খুসী ঘুরে বেড়াতে পারে।

(v) **ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট (আলট্রা) গঠন** (Ultra-structure of Mitochondria): প্রতিটি মাইটোকনড্রিয়ন* প্রধানত **দুটি পর্দা ও দুটি কক্ষে** বিভক্ত। বাইরের পর্দাটি প্রস্থে প্রায় 60 Å; এর ভিতরের 60Å—100Å পুরু কক্ষের ব্যবধানে ভিতরের পর্দাটি অবস্থিত। ভিতরের পর্দা 50Å—70Å পুরু। অর্থাৎ দুটি পর্দাসহ কক্ষ গড়ে 185Å পুরু। এটি ভিতরের দিকে অনিয়মিতভাবে ভাঁজ হয়ে গিয়ে আঙুলের মতো প্রবর্ধক (projection) সৃষ্টি করে।

* মাইটোকনড্রিয়ন (Mitochondrion)—Singular।

প্রবর্ধকগুলিকে **ক্রিস্টি*** (Cristae) বলে। প্রকৃতপক্ষে ক্রিস্টিই প্রতিটি মাইটোকনড্রিয়নকে দুটি কক্ষে ভাগ করে—দুটি পর্দার মাঝখানে **বাইরের কক্ষ**



চিত্র 5.18—মাইটোকনড্রিয়ার সাধারণ গঠন (বাঁদিকে) এবং আলট্রা গঠন (ডানদিকে)।

(Outer Chamber) এবং ভিতরের পর্দায় ঘেরা **ভিতরের কক্ষ** (Inner Chamber)। সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে যে, ভিতরের পর্দা ও ক্রিস্টি 80Å—100Å ব্যাসের **অক্সিজোম** (Oxysome) নামে দানায় ঢাকা থাকে। দানাগুলির পারস্পরিক ব্যবধান 100Å । ওজনের দিক থেকে মাইটোকনড্রিয়ায় প্রায় 70% প্রোটিন, 30% লিপিড এবং 0.5% R. N. A. থাকে।

(vi) **উৎপত্তি** (Origin) ঃ মাইটোকনড্রিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে মতপার্থক্য আছে। অনেকে বলেন মাইটোকনড্রিয়া থেকেই কেবল মাইটোকনড্রিয়ার উৎপত্তি সম্ভব। অন্যরা বলেন কোষের মধ্যেই আপনা-আপনি এগুলি সৃষ্টি হয়। আবার আধুনিক বিজ্ঞানীর দল মনে করেন মাইটোকনড্রিয়া-পর্দা বা প্লাজমা পর্দা (কোষপর্দা) থেকে এদের সৃষ্টি হয়।

(vii) **কাজ** (Functions) ঃ (1) মাইটোকনড্রিয়া কোষকে ATP-রূপে শক্তি সরবরাহ করে। **লেনিনজার** (Lehninger, 1959)-এর মতে সজীব কোষে প্রায় 90% ATP উৎপাদন ও সমস্ত অক্সিজেন বহনের কাজ মাইটোকনড্রিয়াকেই করতে হয়। (2) **বেনস্‌লে ও হোয়ের** (Bensley and Hoerr, 1934)-এর মতে ফ্যাট বিপাকের সঙ্গে মাইটোকনড্রিয়ার সম্পর্ক আছে। (3) মাইটোকনড্রিয়া কোষের বিপাকলব্ধ পদার্থ সঞ্চয় করে বলে মনে করা হয়।

5.20. গলগি বস্তু বা গলগি কমপ্লেক্স [*Golgi bodies, Golgi ;* ইতালীবাসী কলাতত্ত্ববীদ] :

● **সংজ্ঞা (Definition) ঃ কোষের নিউক্লিয়সের সন্নিকটে একত্রে সমান্তরালে বিন্যস্ত মসৃণগাত্রযুক্ত নালিকা দ্বারা গঠিত বিশিষ্ট কোষীয় অঙ্গাণুকে গলগি বস্তু বলে।**

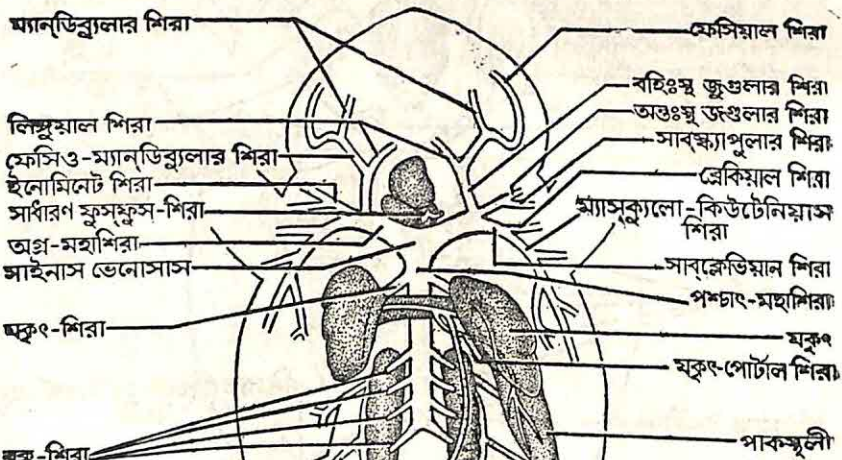
* ক্রিস্টা (Crista)—Singular।

জোড়া **ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস** (Truncus arteriosus) হল প্রধান ধমনী। এটি প্রতিপাশে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে তিনটি **অ্যাওর্টিক আর্চ** (Aortic arch) গঠন করে। এদের মধ্যে উপরেরটি **ক্যারোটিড** (Carotid), মধ্যেরটি **সিস্টেমিক** (Systemic) এবং নীচেরটি **পাল্মো-কিউটেনিয়াস** (Pulmo-cutaneous)।

সিস্টেমিক আর্চ নীচের দিকে মিলিত হয়ে **পৃষ্ঠ-মহাধমনী** বা **ডরসাল অ্যাওর্টা** (Dorsal aorta) গঠন করে। এটি উপরের দিক থেকে কয়েকটি **রেনাল ধমনী** বা **বৃক্ক ধমনী** গঠন করার পর নীচের দিকে দুভাগে ভাগ হয়ে **ইলিয়াক ধমনী** গঠন করে। ইলিয়াক ধমনী থেকে আরও নীচে **স্যায়াটিক ধমনী** (Sciatic artery), **ফিমোরাল ধমনী** প্রভৃতি উৎপন্ন হয় (চিত্র 17.11)।

17.7. কুনো ব্যাঙের শিরাতন্ত্র [*Venous system of Toad*] :

দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে অপরিস্রুত রক্ত* শিরাতন্ত্র-মাধ্যমে পুনরায়



চিত্র 17.12—কুনো ব্যাঙের শিরাতন্ত্র।

হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। প্রধান শিরাগুলি দুভাগে বিভক্ত ঃ যথা—

* ব্যতিক্রম—ফুসফুস শিরা মাধ্যমে পরিস্রুত রক্ত ফুসফুস থেকে বাম অলিন্দে ফিরে আসে।

(ক) **পালমোনারি ভাগ।**

(খ) **সিস্‌টেমিক ভাগ।**

প্রতিটি ফুসফুস থেকে একটি করে **ফুসফুস শিরা** (Pulmonary vein) বাম অলিন্দে পরিস্রুত রক্ত বহন করে নিয়ে যায়। সিস্‌টেমিক ভাগ প্রধানতঃ সাইনাস ভেনোসাসের সম্মুখে অবস্থিত দক্ষিণ ও বাম **প্রি-কেভাল শিরা** (Pre-caval vein) এবং **পোস্ট-কেভাল শিরা** (Post-caval vein) দ্বারা গঠিত। এই প্রধান শিরাগুলি বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

17.8. ধমনী, শিরা ও জালকের পার্থক্য *[Differences among Artery, Vein and Capillary] :*

ধমনী বা আর্টারি (Artery)	শিরা বা ভেন (Vein)	জালক বা ক্যাপিলারি (Capillary)
(1) বাহিরের স্তর অর্থাৎ টিউনিকা অ্যাড্‌ভানটিশিয়া শিরার তুলনায় পাতলা।	(1) এটি ধমনীর তুলনায় পুরু।	(1) নাই।
(2) মধ্যের স্তর, অর্থাৎ টিউনিকা মিডিয়া শিরার তুলনায় বেশী পুরু।	(2) এটি ধমনীর তুলনায় বেশী পাতলা।	(2) নাই।
(3) ভিতরের স্তর অর্থাৎ টিউনিকা ইন্‌টারনা একস্তরবিশিষ্ট, তবে এতে স্থিতিস্থাপক তন্তু থাকে।	(3) এটিও একস্তর যুক্ত তবে স্থিতিস্থাপক তন্তু থাকে না।	(3) একস্তর যুক্ত তবে স্থিতিস্থাপক তন্তু নাই।
(4) প্রাকার শক্ত ও স্থিতিস্থাপক।	(4) প্রাকার নরম, স্থিতিস্থাপক নয়।	(4) স্থিতিস্থাপক নয়।
(5) গহ্বর ছোট, রক্তশূন্য হলে বুজে যায় না।	(5) গহ্বর বড়, রক্ত শূন্য হলে বুজে যায়।	(5) গহ্বর খুবই সূক্ষ্ম।
(6) ধমনী ক্রমান্বয়ে আর্টারিওল, পরে আর্টারিয়াল ক্যাপিল্যারি এবং পরিশেষে ক্যাপিলারি বা জালকে শেষ হয়।	(6) শিরা ক্যাপিলারি বা জালক থেকে উৎপন্ন হয়ে ক্রমান্বয়ে ভেনাস ক্যাপিলারি, পরে ভেনিউল এবং পরিশেষে শিরা গঠন করে।	(6) আর্টারিয়াল ক্যাপিলারি এবং ভেনাস ক্যাপিলারির অন্তর্বর্তী অংশে অবস্থিত সূক্ষ্ম রক্তনালীগুলিই হল ক্যাপিলারি বা জালক।
(7) প্রধানত অক্সিজেনপূর্ণ উজ্জ্বল লাল বর্ণের রক্ত বহন করে।	(7) প্রধানত কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত কাল্‌চে লাল বর্ণের রক্ত বহন করে।	(7) দু' ধরনের রক্তই প্রবাহিত হয়।

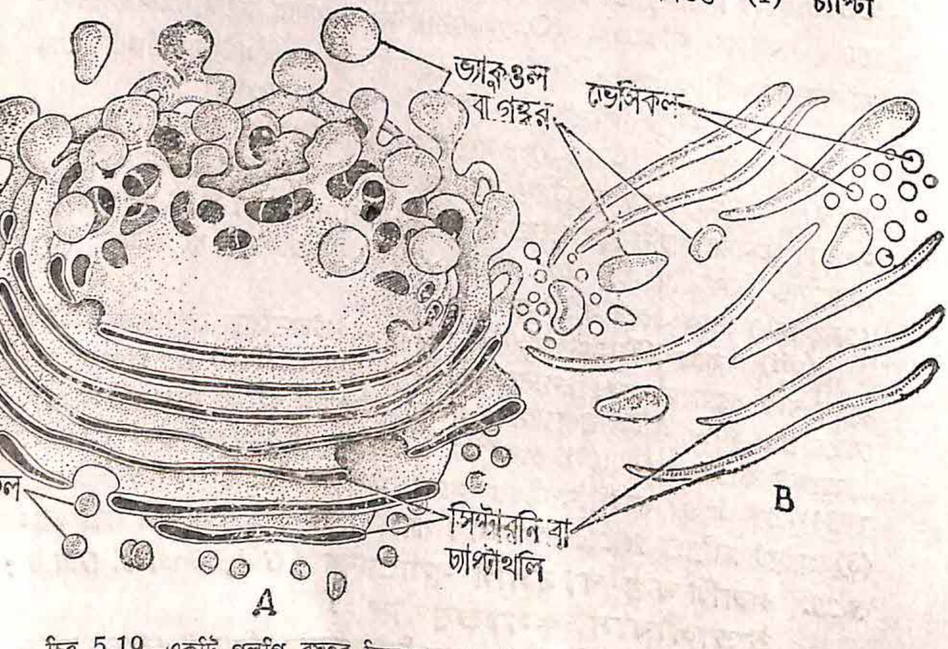
1898 খ্রীষ্টাব্দে **ক্যামিলো গলগি** (Camillo Golgi) এক ধরনের প্যাঁচার নার্ভকোষে নিউক্লিয়সের কাছাকাছি দলবন্ধভাবে একাধিক সূত্রাকার বা গোলাকার বস্তু দেখতে পান। তাঁর নামানুসারে এই বস্তুগুলির নাম হয় গলগি বস্তু।

কোষে এণ্ডোপ্লাজমীয় জালক এবং লাইসোজোমের সঙ্গে মিলে গলগি বস্তু বিস্তৃত পর্দাতন্ত্র গঠন করে। গলগি বস্তুকে এই পর্দাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রক বলা চলে।

(i) **অবস্থান** (Occurrence) : ব্যাকটিরিয়া ও মাইকোপ্লাজমা বাদে সমস্ত কোষে গলগি বস্তু বর্তমান।

(ii) **বিস্তৃতি** (Distribution) : সাধারণত নিউক্লিয়সের কাছাকাছি থাকলেও কোষের কিনারার দিকে বা কোষের যে কোন জায়গায় গলগি বস্তু ছড়িয়ে থাকতে পারে। কোষ ভেদে এর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। যেমন বহিস্ত্বক থেকে উৎপন্ন কোষের মেরু অঞ্চলে এবং নিউক্লিয়স ও কিনারার মাঝে গলগি বস্তু অবস্থান করে ; কিন্তু রসক্ষরণকারী কোষে গলগি বস্তু নিউক্লিয়স ও অগ্রমেরুর মাঝে থাকে। তখন গলগি বস্তু খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

(iii) **ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট আলট্রা গঠন** (Ultra structure of Golgi bodies) : গলগি বস্তু প্রধান তিনটি অংশে বিভক্ত—(1) **চ্যাপ্টা থলি বা সিস্টারনী** (Flattened sac or Cisternae), (2) **বড় গহবর বা ভ্যাকুওল** (Vacuole) এবং (3) **ছোট গহবর বা ভেসিকল** (Vesicles)।



চিত্র 5.19—একটি গলগি বস্তুর চিত্ররূপ : A—ত্রিমাত্রিক দৃশ্যে এবং B—ছেদ দৃশ্যে।

প্রতিটি অংশ দুটি ক'রে পর্দায় ঘেরা। সিস্টারনীর ক্ষেত্রে পর্দা দুটি মাঝে মাঝে ভেতরের দিকে বেশী ঢুকে যায়। প্রতিটি পর্দা 60 Å—70Å পুরু, দুটি পর্দার মাঝখানের দূরত্ব 50Å—700Å। ভ্যাকুওল বা ভেসিকল সিস্টারনী থেকে তৈরী হয়। ভ্যাকুওলগুলি দুটি সিস্টারনীর মাঝখানে থাকে। ভেসিকল-গুলি গলগি বস্তুর পরিধির দিকে বিন্যস্ত থাকে এবং সেগুলিকে বিন্দুর মতো দেখায়। গলগি বস্তু লিপিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত। এতে নানারকমের প্রচুর এনজাইম থাকে।

(iv) **উৎপত্তি** (Origin) : কেউ কেউ মনে করেন এণ্ডোপ্লাজমীয় জালক থেকে গলগি বস্তুর উৎপত্তি হয়। অন্যদের মতে এণ্ডোপ্লাজমীয় জালকের মতো একইভাবে নিউক্লীয় পর্দা থেকে এগুলির সৃষ্টি হয়।

(v) **কাজ** (Functions) : গলগি বস্তু (1) প্লাজমা পর্দার ভিতর দিয়ে এক কোষ থেকে অন্য কোষে পরিবহণের জন্য কোষমধ্যস্থ বিবিধ পদার্থকে একত্রিত করে, (2) রসক্ষরণে সাহায্য করে, (3) কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষে অংশ নেয়, (4) এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি থেকে হরমোন নিঃসরণে সাহায্য করে, (5) লিপিড ও প্রোটিন সঞ্চয় করে, (6) কোষ-প্রাকার গঠন উপযোগী উপাদান তৈরী করতে তৎপর হয়, (7) মাইটোকনড্রিয়াকে ATP উৎপাদন করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং (8) শুক্রাণুর মাথায় ক্যাপের মতো আচ্ছাদন গঠন করতে সাহায্য করে।

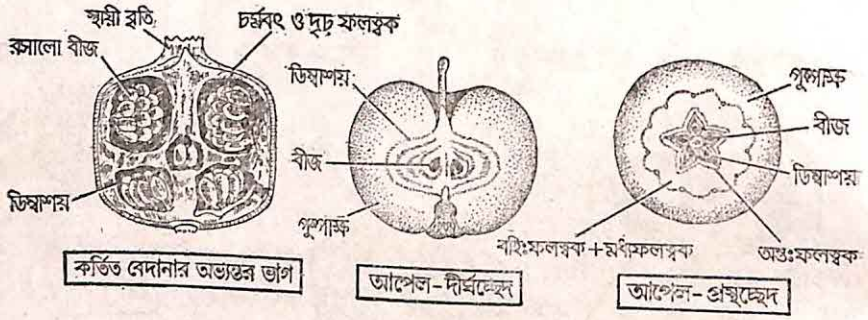
5.21. সেণ্ট্রোজোম [**Centrosome,** গ্রীক=***kentron***=কেন্দ্র ; ***Soma***=বস্তু] :

● সংজ্ঞা (Definition) : **সেণ্ট্রিওল ও সেণ্ট্রোস্ফিয়ারযুক্ত যে কোষীয় অঙ্গাণু প্রাণিকোষ বিভাজনের সময় বেমতন্তু গঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তাকে সেণ্ট্রোজোম বলে।**

স্থিতিশীল নিউক্লিয়সের নিকটে বিশেষ একপ্রকার সাইটোপ্লাজমীয় বস্তু দেখে 1888 খ্রীষ্টাব্দে **টি. বোভেরী** (T. Boveri) এর নামকরণ করেন সেণ্ট্রোজোম। বিজ্ঞানী **ফান বেনডেন** (Van Bendon) একবৎসর আগেই এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। প্রাণিকোষ বিভাজনের সময় সেণ্ট্রোজোম থেকেই **বেমতন্তু** (Spindle fibre) গঠিত হয়। প্রাণিকোষে এর যতই গুরুত্ব থাক না কেন উদ্ভিদকোষে সেণ্ট্রোজোম থাকে না।

(i) **ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট (আলট্রা) গঠন** (Ultra-structure of Centrosome) : সেণ্ট্রোজোমের প্রধান অংশ **সেণ্ট্রিওল** (Centriole) বা **ডিপ্লোজোম** (diplosome)। দণ্ডাকার সেণ্ট্রিওল প্রস্থচ্ছেদে ক্ষুদ্র কণিকার মতো দেখায়। প্রতি সেণ্ট্রোজোমে সেণ্ট্রিওলের সংখ্যা এক বা দুই। দুটি সেণ্ট্রিওল পরস্পর প্রায় **সমকোণে** বিন্যস্ত থাকে। এদের দৈর্ঘ্য 3000Å—5000 Å এবং প্রস্থ 1500 Å —1800 Å। প্রতি সেণ্ট্রিওলে একটি কেন্দ্রীয় অক্ষকে ঘিরে নয়টি

(6) **ব্যালাস্টা** (Balausta) ঃ এটি বহু প্রকোষ্ঠী, বহুবীজী ফল। ফলত্বক খসখসে কঠিন। গর্ভশীর্ষ পুষ্পের বৃতি ফলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। বীজের বহিস্ত্বক রসাল্।



চিত্র 14.9—বিভিন্ন প্রকার সরস ফল ঃ
ব্যালাস্টা—বেদানা ; পোম—আপেল।

উদাহরণ—**বেদানা**। বেদানা বীজের রসাল বহিস্ত্বক অংশই খাওয়া হয় (চিত্র 14.9)।

(7) **পোম** (Pome) ঃ গর্ভশীর্ষ (Epigynous) পুষ্পের যুক্তগর্ভপত্র-বিশিষ্ট ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন ফল পোম। এটি অপ্রকৃত ফল। কারণ, ভক্ষণ-যোগ্য অংশটি পুষ্পাক্ষের পরিবর্তিত রূপ।

উদাহরণ—**আপেল, নেসপাতি** ইত্যাদি।

14.6. যৌগিক ফল [*Multiple Fruit*] :

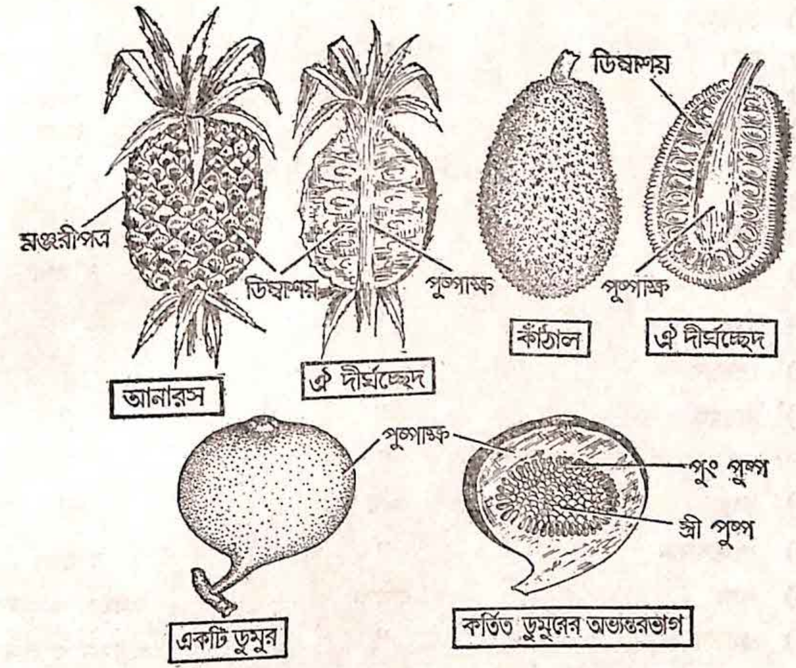
যৌগিক ফল দু'রকম ঃ

(1) **সোরোসিস** (Sorosis) ঃ **আনারস, কাঁঠাল** প্রভৃতি ফল সোরোসিসের উদাহরণ। উভয়ক্ষেত্রেই সমগ্র পুষ্পমঞ্জরী ফল গঠন করে। আনারসের স্থূল ও রসাল পুষ্পাক্ষের উপর অবস্থিত বৃন্তহীন স্ত্রীপুষ্পগুলি পরস্পর জুড়ে যায়। আনারসের চোখ এক একটি পুষ্পের অবস্থান নির্দেশ করে। কাঁঠালের গদাকৃতি পুষ্পাক্ষ স্থূল, কিন্তু রসাল নয়।

পুষ্পাক্ষের উপর বৃন্তহীন স্ত্রীপুষ্প সাজান থাকে। স্ত্রীপুষ্পগুলির গর্ভপত্র বাইরের দিকে জুড়ে গিয়ে কাঁঠালের কণ্টকত্বক গঠিত হয়। কাঁঠালের ডিম্বাশয়কে কোয়া বলে।

(2) **সাইকোনস** (Syconus) ঃ ডুমুর, অশ্বত্থ বা বটের যৌগিক ফলের নাম সাইকোনস। এই ফলের পুষ্পাক্ষ ফাঁপা বলের আকৃতি লাভ করে।

উদাহরণ—**ডুমুর।**



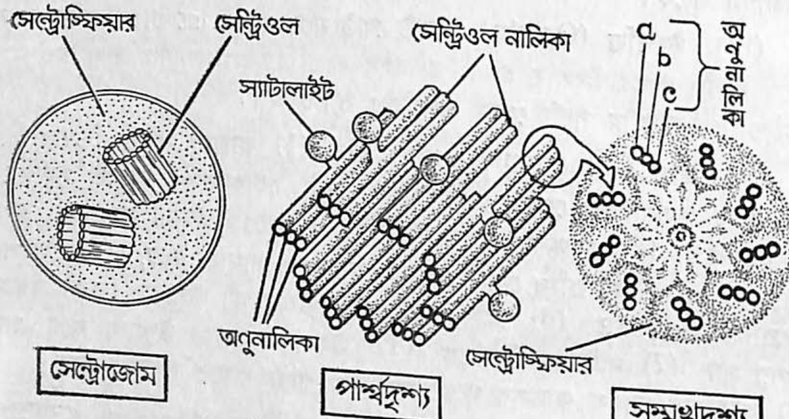
চিত্র 14.10—বিভিন্ন প্রকার যৌগিক ফল ঃ
সোরোসিস—আনারস ও কাঁঠাল ; সাইকোনস—ডুমুর।

এই পুষ্পাক্ষের ভিতরের গায়ে পুং ও স্ত্রীফুলগুলি যথাক্রমে উপরের এবং নীচের দিকে সজ্জিত থাকে। এই ফলের মুখে বা ছিদ্রপথে বহু রোঁয়া থাকে। সাইকোনস ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ হল পুষ্পাক্ষ।

● **নীচে কতকগুলি ফলের শ্রেণী ও ভক্ষ্যাংশের অঙ্গসংস্থানগত প্রকৃতির (Morphological nature) নির্দেশ দেওয়া হল ঃ**

ফল	শ্রেণী	ভক্ষ্যাংশ
(1) আম	ড্রুপ	মধ্যত্বক
(2) আমড়া	”	”
(3) কুল	”	মধ্যত্বক ও বহিস্ত্বক
(4) আখরোট	”	বীজপত্র
(5) নারকেল	তন্তুময় ড্রুপ	সস্য
(6) তাল	”	মধ্যত্বকস্থ শাঁস ও সস্য

তন্তুগুচ্ছ থাকে। তিনটি করে অণুনালিকা* তন্তু দ্বারা এক একটি গুচ্ছ গঠিত। এই গুচ্ছগুলি একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত এবং একটি সাধারণ পর্দায় আবৃত থাকে। প্রতিটি তন্তুগুচ্ছ থেকে উদগত গোলাকার স্ফীতিটি হল **স্যাটালাইট** (Satellite)। সেণ্ট্রিওলকে ঘিরে থাকা গাঢ় প্রোটোপ্লাজমকে **সেণ্ট্রোস্ফিয়ার** (Centrosphere) বলে। অর্থাৎ **সেণ্ট্রিওল ও সেণ্ট্রোস্ফিয়ার মিলে সেণ্ট্রোজোম গঠিত।** সেণ্ট্রিওলে DNA এবং RNA-এর উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে।



চিত্র 5.20—সেণ্ট্রোজোমের গঠন।

(ii) **উৎপত্তি** (Origin) : দুটি সেণ্ট্রিওল পৃথক হয়ে গিয়ে বা একটি সেণ্ট্রিওল ভেঙ্গে সেণ্ট্রোজোম সৃষ্টি হতে পারে।

(iii) **কাজ** (Functions) : সেণ্ট্রোজোম (1) বেমতন্তু গঠন দ্বারা কোষ বিভাজনের সূত্রপাত করে, (2) সিলিয়া গঠন করে (বিশেষ করে শুক্রাণু উৎপাদনের সময়)।

5.22. প্লাসটিড [**Plastid,** গ্রীক—***Plastikas***=ছাঁচে তৈরী] :

● **সংজ্ঞা** (Definition) : **উদ্ভিদকোষের দ্বিপর্দা বেষ্টিত বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ায় লিপ্ত রঙ্গকযুক্ত বা রঙ্গকহীন অঙ্গাণুকে প্লাসটিড বলে।**

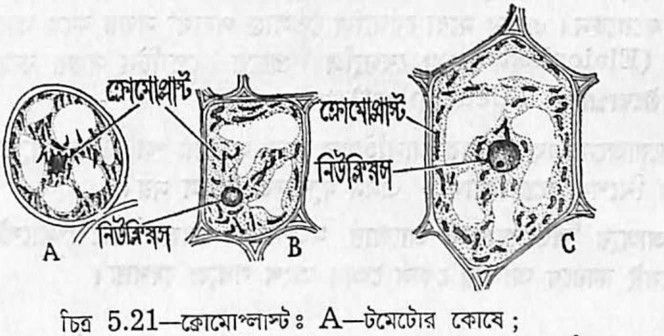
ই. হেকেল (E. Haeckel) 1866 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্লাসটিড কথাটি ব্যবহার করেন। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ অর্থাৎ ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাক ছাড়া সমস্ত উদ্ভিদকোষে প্লাসটিড বর্তমান। প্লাসটিডের উপস্থিতি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে জীবদেহে প্লাসটিড থাকলে তারা উদ্ভিদ এবং না থাকলে প্রাণী†। প্লাসটিডের আকার, আয়তন ও সংখ্যা প্রজাতি বিশেষে ভিন্ন। প্রতি কোষে প্লাসটিডের সংখ্যা এক বা একাধিক।

* থ্রেসগোল্ড (Thresgold, 1968) অণুনালিকাগুলির নাম দেন a, b ও c।
† ব্যতিক্রম—ইউগ্লিনা (*Euglena*)।

(i) **শ্রেণীবিভাগ** (Classification) : প্লাসটিড প্রধানত তিন প্রকার :—

1. **ক্লোরোপ্লাসটিড*** (Chloroplastid ; *Chloros* = সবুজ)—এগুলির রং সবুজ।

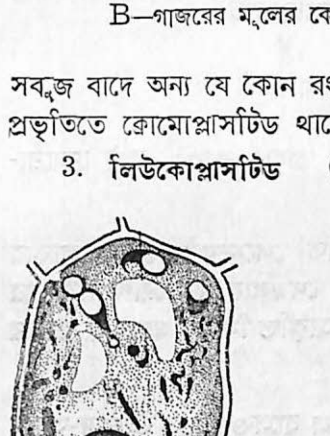
2. **ক্রোমোপ্লাসটিড** (Chromoplastid ; *Chroma* = রঙ্গীন)—এগুলি



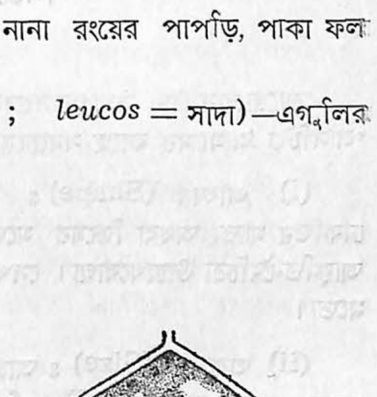
চিত্র 5.21—ক্রোমোপ্লাস্ট : A—টমেটোর কোষে ;
B—গাজরের মূলের কোষে ; C—সর্বজয়া বা ক্যানা ফুলের পাপড়িতে।

সবুজ বাদে অন্য যে কোন রং-এর। ফুলের নানা রংয়ের পাপড়ি, পাকা ফল প্রভৃতিতে ক্রোমোপ্লাসটিড থাকে।

3. **লিউকোপ্লাসটিড** (Leucoplastid ; *leucos* = সাদা)—এগুলির



চিত্র 5.22—রাইয়ের মূলের কোষে লিউকোপ্লাস্ট।



চিত্র 5.23—রজনীগন্ধার পুষ্পপত্রে এলাইয়োপ্লাস্ট।

* ক্লোরোপ্লাসটিড কথাটি সিম্পার (Schimper) 1883 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।

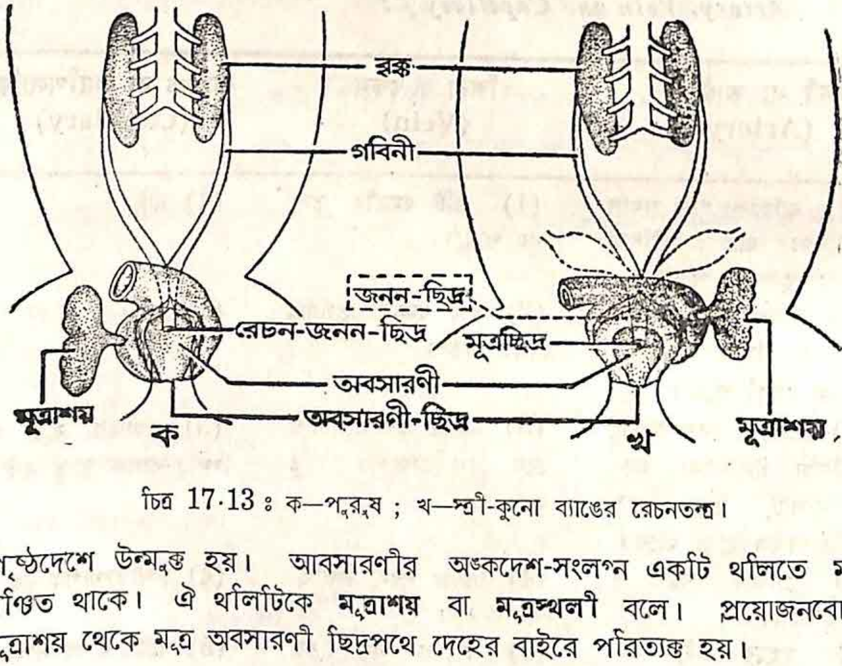
17.9. কুনো ব্যাঙের রেচনতন্ত্র [*Urinary system of Toad*] :

ব্যাঙের রেচন ও জননতন্ত্র অংগাংগী জড়িত।

● **রেচনতন্ত্র** (Urinary system) ঃ

একজোড়া **বৃক্ক** (Kidney), একজোড়া **গবিনী** (Ureter) ও একটি **মূত্রাশয়** বা **মূত্রস্থলী** (Urinary bladder) নিয়ে ব্যাঙের রেচনতন্ত্র গঠিত। গাঢ় বাদামী রঙের দুটি লম্বাকৃতি বৃক্ক মেরুদণ্ডের দুপাশে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত।

প্রতিটি বৃক্ক থেকে সরু নলাকার দুটি **গবিনী** বা **ইউরেটার** (Ureter) উৎপন্ন হয়ে পিছনে কিছুদূর নেমে আসার পর একত্রে মেশে এবং অবসারণীর



চিত্র 17·13 ঃ ক—পুরুষ ; খ—স্ত্রী-কুনো ব্যাঙের রেচনতন্ত্র।

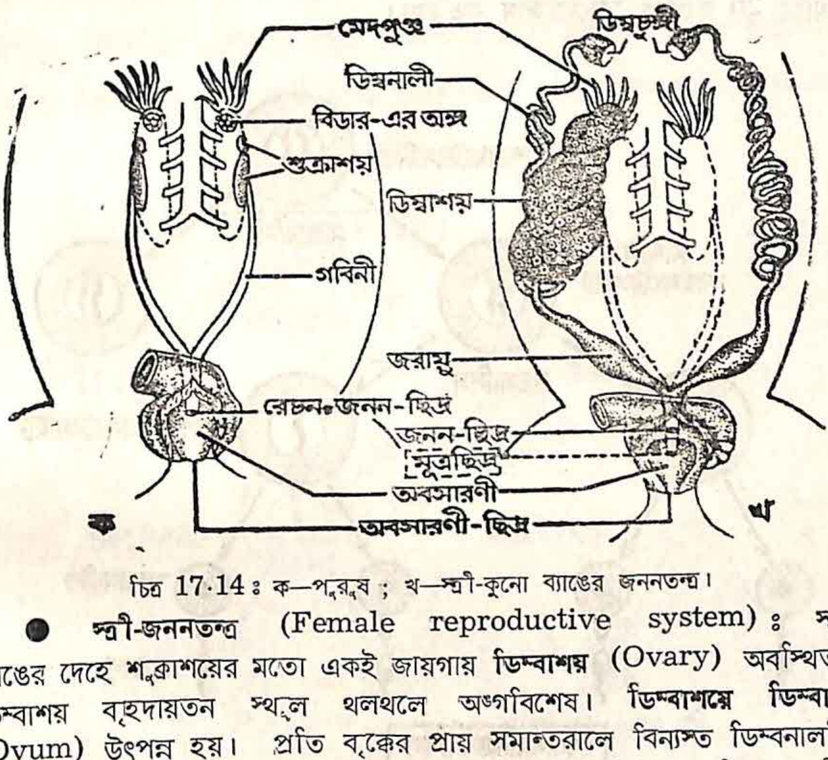
পৃষ্ঠদেশে উন্মুক্ত হয়। আবসারণীর অংকদেশ-সংলগ্ন একটি থলিতে মূত্র সঞ্চিত থাকে। ঐ থলিটিকে **মূত্রাশয়** বা **মূত্রস্থলী** বলে। প্রয়োজনবোধে মূত্রাশয় থেকে মূত্র অবসারণী ছিদ্রপথে দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হয়।

17.10. কুনো ব্যাঙের জননতন্ত্র [*Reproductive system of Toad*] :

ব্যাঙ একলিংগ প্রাণী, অর্থাৎ ব্যাঙের স্ত্রী-পুরুষে ভেদ আছে। তাই তাদের জননতন্ত্রের গঠনেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

● **পুং-জননতন্ত্র** (Male reproductive system) ঃ প্রতিটি বৃক্কের অংকদেশে একটি করে পীতাভ-সাদা রং-এর **শুক্রাশয়** বা **টেস্টিস** (Testis) বিদ্যমান। শুক্রাশয় পুংজননকোষ বা পুংগ্যামেট অর্থাৎ **শুক্রাণু** বা **স্পার্ম** (Sperm) উৎপাদন করে। শুক্রাণু গবিনী পথে নেমে এসে অবসারণী ছিদ্রপথে (Cloacal aperture) বাইরে পরিত্যক্ত হয়।

প্রতিটি শুক্রাশয়ের উপরের দিকে এবং বৃক্কের অগ্রভাগে একটি করে **বিডার অঙ্গ** বা **বিডার-এর অঙ্গ** (Bidder's organ) যুক্ত থাকে। একে অপরিণত ডিম্বাশয় মনে করা হয়। বৃক্কের উপর দিক থেকে উৎপন্ন আঙুলের মতো হলুদ বর্ণের অঙ্গগুলিকে **মেদপুঞ্জ** বা **চর্বি অঙ্গ** বা **ফ্যাট বডি** (Fat body) বলে।



চিত্র 17·14 : ক—পুরুষ ; খ—স্ত্রী-কুনো ব্যাঙের জননতন্ত্র।

● **স্ত্রী-জননতন্ত্র** (Female reproductive system) : স্ত্রী ব্যাঙের দেহে শুক্রাশয়ের মতো একই জায়গায় **ডিম্বাশয়** (Ovary) অবস্থিত। ডিম্বাশয় বৃহদায়তন স্থূল থলথলে অঙ্গাবিশেষ। **ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু** (Ovum) উৎপন্ন হয়। প্রতি বৃক্কের প্রায় সমান্তরালে বিন্যস্ত ডিম্বনালীর আগাটি ফানেলাকৃতি কিন্তু মধ্যভাগটি কুন্ডলীকৃত—যা পিছনের দিকে স্ফীত হয়ে জরায়ু বা **ইউটেরাস** (Uterus) গঠন করে। দুপাশের জরায়ু মিলিত হয়ে অবসারণী ছিদ্রপথে উন্মুক্ত হয়। এখানেও **মেদপুঞ্জ** বা **চর্বি অঙ্গ** বিদ্যমান। পরিণত ডিম্বাণু ফানেলের ভিতর দিয়ে পরিবাহিত হয়ে অবসারণী-ছিদ্রপথে বাইরে পরিত্যক্ত হয়।

● **গ্যামেটোজেনেসিস** (Gametogenesis) : যৌন জননে গ্যামেট বা জননকোষ উৎপাদনের গুরুত্ব সর্বাধিক। যে পদ্ধতিতে জননমাতৃকোষ (Reproductive mother cell) মায়োসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হ'য়ে জনন-কোষ বা গ্যামেট উৎপাদন করে তাকে **গ্যামেটোজেনেসিস** বলে। জননকোষ দু'-প্রকার—পুং ও স্ত্রী। পুং জননকোষ বা পুং গ্যামেট উৎপাদন পদ্ধতিকে **স্পার্মাটোজেনেসিস** (Spermatogenesis) এবং স্ত্রী জননকোষ বা স্ত্রী গ্যামেট উৎপাদন পদ্ধতিকে **উজেনেসিস** (Oogenesis) বলে।

রং সাদা, অর্থাৎ বর্ণহীন। লিউকোপ্লাসটিড সঞ্চয়ের কাজে সাহায্য করে। স্টার্চ-সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাসটিডকে **অ্যামাইলোপ্লাস্ট** (Amyloplast) বলে।

এছাড়া উদ্ভিদতত্ত্ববীদগণ আরও দু'ধরনের পরিবর্তিত লিউকোপ্লাস্ট আবিষ্কার করেছেন। এদের মধ্যে যেগুলি তৈলাক্ত পদার্থ সঞ্চয় করে তাদের **এলাইয়োপ্লাস্ট** (Elaioplast) এবং যেগুলি প্রচুর প্রোটিন সঞ্চয় করে সেগুলিকে **অ্যালিউরোপ্লাস্ট** (Aleuroplast) বলা হয়।

প্রয়োজনে এক ধরনের প্লাসটিডের অন্য ধরনের প্লাসটিডে রূপান্তরিত হবার ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

আলুর লিউকোপ্লাস্ট আলোর সংস্পর্শে এলে ক্লোরোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয়, সেই কারণে আলুর কোন কোন অংশ সবুজ দেখায়।

লিউকোপ্লাস্ট ⇄ ক্লোরোপ্লাস্ট

লিউকোপ্লাস্ট ⇄ ক্রোমোপ্লাস্ট

ক্লোরোপ্লাস্ট ⇅ ক্রোমোপ্লাস্ট

ক্লোরোপ্লাসটিড সালোকসংশ্লেষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। তাই ক্লোরোপ্লাসটিড আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশী পরিচিত।

(i) **আকার** (Shape) : প্লাসটিড সাধারণত লেন্সের মতো, গোলাকার চাকতির মতো অথবা ডিমের মতো দেখতে হয়। শেওলায় ক্লোরোপ্লাসটিডের আকৃতি-বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। সেখানে প্লাসটিডের আকৃতি ফিতার মতো বা তারার মতো।

(ii) **আয়তন** (Size) : আয়তন পরিবর্তনশীল হলেও উন্নত উদ্ভিদ-অংগে লেন্সের মতো ক্লোরোপ্লাসটিডগুলি গড়ে 1—3μ এবং 3—8μ ব্যাসবিশিষ্ট।

(iii) **সংখ্যা** (Number) : কোষে ক্লোরোপ্লাসটিডের সংখ্যা প্রতি প্রজাতির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট থাকে। কোনো কারণে সংখ্যা কমে গেলে সেই সংখ্যা দ্রুত পূরণ হয়ে যায়। কোন কোন শেওলার কোষে একটি মাত্র ক্লোরোপ্লাসটিড থাকলেও অধিকাংশ উন্নত উদ্ভিদকোষে ক্লোরোপ্লাসটিডের সংখ্যা অগণিত। রেড়ি পাতায় প্রতি বর্গ মিলিমিটারে 400,000 ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

(iv) **ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট ক্লোরোপ্লাসটিডের (আলট্রা) গঠন** (Ultra-structure of Chloroplastids) : প্রতিটি প্লাসটিড দুটি ক'রে পর্দায় ঘেরা থাকে। প্লাসটিডের ভিতরের প্রোটিন-সমৃদ্ধ ভূমি বস্তুটি ম্যাট্রিক্স (Matrix) বা **স্ট্রোমা** (Stroma)। স্ট্রোমায় ছড়ানো থাকে প্রচুর **গ্রাণা*** (Grana)। ছোট ছোট থলির চাকতি অর্থাৎ **থাইলাকয়েড** (Thylacoid)

* গ্রানাম (Granum)—Singular।

থাকে থাকে সজ্জিত হয়ে তৈরী করে এক একটি গ্রাণাম। একটি গ্রাণামে থাইলাকয়েডের সংখ্যার তারতম্য হতে পারে। গ্রাণামের সঙ্গে পাশের গ্রাণামের যোগাযোগ



চিত্র 5.24—একটি ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন।

রক্ষাকারী বড় ও লম্বা থাইলাকয়েডের সিঁড়িকে **স্ট্রোমা ল্যামেলি** (Stroma lamellae) বলে।

(v) **উৎপত্তি** (Origin) : ছোট ছোট অ্যামিবাকৃতি **প্রোপ্লাসটিড** (Proplastid) থেকে প্লাসটিড উৎপন্ন হয়। প্রস্থে 1mμ পুরু হলে প্রোপ্লাসটিডের ভিতরের পর্দা ভাঁজ হয়ে আরও ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং প্রথমে ভেসিকল ও পরে **গ্রাণা ল্যামেলি** গঠন করে। আলো পেলে এই ল্যামেলাগুলি বাড়তে থাকে এবং শেষে পরিণত হয়। অন্ধকার থেকে আলোতে এলে অপরিণত প্লাসটিড একইভাবে পরিণত হয়।

(vi) **কাজ** (Functions) : (1) সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করা ক্লোরোপ্লাসটিডের প্রধান ও প্রাথমিক কাজ। ক্লোরোপ্লাস্ট-মধ্যস্থ সবুজ ক্লোরোফিল রঙ্গক (Pigment) সূর্যালোককে ফোটনরূপে শোষণ ক'রে সৌরশক্তিকে কার্বোহাইড্রেটে বেঁধে ফেলে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ক্লোরোপ্লাস্ট না থাকলে জীবজগতের অস্তিত্ব লোপ পাবে। (2) আলোক শক্তির সহায়তায় ক্লোরোপ্লাস্ট পরোক্ষভাবে ADP-কে ATP-শক্তিতে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করে। (3) ক্লোরোপ্লাসটিডে এমন সব এনজাইম আছে যেগুলি ক্রেবস চক্রে এবং ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

5.23. এণ্ডোপ্লাজমীয় জালক [*Endoplasmic reticulum*] :

● **সংজ্ঞা** (Definition) : **উন্নত কোষের সাইটোপ্লাজমে কোষপর্দা বেষ্টিত যে সূক্ষ্ম মসৃণ গাত্রযুক্ত গহ্বরময় নালিকাজালক বিন্যস্ত থাকে সেই কোষীয় অঙ্গাণুকে এণ্ডোপ্লাজমীয় জালক বলে।**

ফল	শ্রেণী	ভক্ষ্যাংশ
(7) পেয়ারা	বেরি	ফলত্বক ও অমরা
(8) টমেটো	”	”
(9) বেগুন	”	”
(10) কলা	”	মধ্যত্বক ও অন্তস্ত্বক
(11) আতা	বেরির গুচ্ছ	ফলত্বক
(12) চালতা	”	রসালবৃতি
(13) ধান	ক্যেরিঅপসিস্	সস্য
(14) গম	”	”
(15) ভুট্টা	”	”
(16) ছোলা	শিম্ব	বীজপত্র
(17) মটর	”	”
(18) খেসারি	”	”
(19) অড়হড়	”	”
(20) মসুর	”	”
(21) লিচু	নাট	এরিল
(22) কাজুবাদাম	”	বীজপত্র
(23) শশা	পেপো	ফলত্বক ও অমরা
(24) কুমড়ো	”	ফলত্বক ও অমরা
(25) লাউ	”	ফলত্বক ও অমরা
(26) তরমুজ	”	”
(27) খরমুজ	”	”
(28) লেবু (কাগজি, পাতি, কমলা)	হেসপেরিডিয়ম	ডিম্বাশয়-সংলগ্ন রসাল রোম
(29) আপেল	পোম	পুষ্পাক্ষ
(30) নেসপাতি	”	”
(31) বেল	অ্যাম্ফিসারকা	মধ্যত্বক, অন্তস্ত্বক ও অমরা
(32) বেদানা	ব্যালাস্টা	রসাল বীজবহিস্ত্বক
(33) ডালিম	”	”
(34) ঢেঁড়স	ক্যাপসিউল	সমগ্র ফল
(35) সরিষা	সিলিকোয়া	বীজ
(36) কাঁঠাল	সোরোসিস	রসাল ডিম্বাশয়
(37) ডুমুর	সাইকোনস	পুষ্পাক্ষ

14.7. ফলের শ্রেণীবিভাগের ছক:

ফল (Fruit)

- সরল (Simple)
  - নীরস (Dry)
    - বিদারী (Dehiscent)
      - শিম্ব (Legume) — উদাঃ মটর, সীম
      - ফলিকল (Follicle) — উদাঃ আকন্দ
      - সিলিকোয়া (Siliqua) — উদাঃ সরিষা, মূলা
    - অবিদারী (Indehiscent)
      - অ্যাকিন (Achene) — উদাঃ সন্ধ্যামণি
      - ক্যোরিঅপসিস্ (Caryopsis) — উদাঃ ধান, গম
      - নাট (Nut) — উদাঃ লিচু, কাজুবাদাম
      - সামারা (Samara) — উদাঃ মাধবীলতা
  - সরস (Fleshy)
    - ড্রুপ (Drupe) — উদাঃ আম
    - বেরি (Berry) — উদাঃ টমেটো, বেগুন
    - পেপো (Pepo) — উদাঃ শসা, কুমড়ো
    - হেসপেরিডিয়ম (Hesperidium) — উদাঃ লেবু
    - অ্যাম্ফিসারকা (Amphisarca) — উদাঃ বেল
    - পোম (Pome) — উদাঃ আপেল, নেসপাতি
    - ব্যালাস্টা (Balausta) — উদাঃ বেদানা
- গুচ্ছিত (Aggregate) — উদাঃ আতা, নোনা
- যৌগিক (Multiple)
  - সাইকোনস (Syconus) — উদাঃ ডুমুর
  - সোরোসিস (Sorosis) — উদাঃ আনারস, কাঁঠাল

1945 খ্রীষ্টাব্দের আগে সাইটোপ্লাজমে এণ্ডোপ্লাজমীয় জালকের অস্থিত্ব টের পাওয়া যায়নি। ঐ বৎসর **পোর্টার** (Porter), **ক্লডে** (Claude) ও **ফুলম** (Fullum) এই অঙ্গাণুর অস্তিত্ব প্রথম লক্ষ্য করেন। 1948 খ্রীষ্টাব্দে **পোর্টার** এই অঙ্গাণুর নাম দেন এণ্ডোপ্লাজমীয় জালক।



চিত্র 5.25—এণ্ডোপ্লাজমীয় জালক (রেটিকুলম) এর গঠন।

জালকগুলি নিউক্লিয়স থেকে কোষপর্দা পর্যন্ত ছোট-বড় আকারে সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে থাকে।

(i) **গঠন** (Shape) ঃ এগুলিও থলির মতো অর্থাৎ **সিস্টারনী**, ছোট গহ্বরের মতো বা **ভেসিকল** (Vesicle), এমনকি নালিকার মতো অর্থাৎ **টিউবিউল** হয়। নালিকার গায়ে লেগে থাকা অসংখ্য বিন্দুগুলিকে **রাইবোজোম** বলে।

(ii) **উৎপত্তি** (Origin) ঃ উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা না গেলেও প্লাজমা পর্দা থেকেই এর উৎপত্তি হয় বলে অনেকের ধারণা।

(iii) **কাজ** (Function) ঃ বিভিন্ন পদার্থ পরিবহণে এবং প্রোটিন সংশ্লেষে এণ্ডোপ্লাজমীয় জালক অংশ নেয় বলে মনে করা হয়।

5.24. রাইবোজোম [*Ribosome*] :

● **সংজ্ঞা** (Definition) ঃ **জীবকোষের সাইটোপ্লাজমে বা এণ্ডোপ্লাজমীয় জালক সংলগ্ন যে পর্দাহীন অঙ্গাণুগুলি প্রোটিন সংশ্লেষে অংশ নেয় তাদের রাইবোজোম বলে।**

(i) **ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট (আলট্রা) গঠন** (Ultra structure of Ribosome) ঃ এণ্ডোপ্লাজমীয় জালকের সিস্টারনীর সঙ্গে রাইবোজোম যুক্ত থাকে। রাইবোজোম প্রধানত দুটি অধঃএকক বা সাবইউনিট (S) দ্বারা গঠিত। আদি নিউক্লিয়সযুক্ত কোষ অর্থাৎ প্রোক্যারিওটিক কোষে রাইবোজোম সাবইউনিট দুটি 50S ও 30S। তবে আদর্শ নিউক্লিয়সযুক্ত কোষ অর্থাৎ ইউক্যারিওটিক কোষের সাবইউনিট দুটি হ'ল 60S ও 40S।

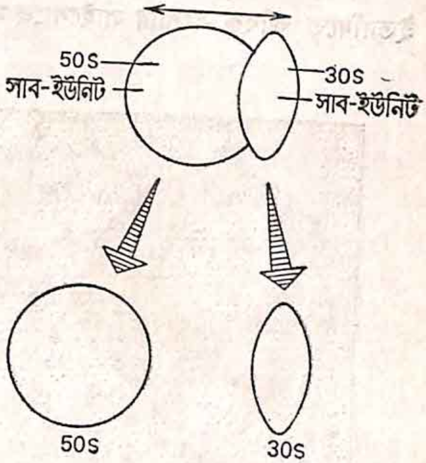
(ii) আকৃতি (Shape) : বড়গুলি (60S ও 50S) গোলাকার কিন্তু ছোটগুলি (40S ও 30S) উপবৃত্তাকার।

(iii) উৎপত্তি (Origin) : প্রধানত নিউক্লিওলস থেকে রাইবোজোম উৎপন্ন হয়।

(iv) সংখ্যা (Number) : কোষে রাইবোজোমের সংখ্যা অগণিত। প্রোটিন সংশ্লেষে লিপ্ত কোষে তুলনামূলকভাবে রাইবোজোম সংখ্যা অনেক বেশী।

(v) বিস্তৃতি (Distribution) : প্রোক্যারিওটিক কোষের সাইটোপ্লাজমে এবং ইউক্যারিওটিক কোষের সাইটোপ্লাজম ও এন্ডোপ্লাজমীয় জালকের বহির্গাত্রে রাইবোজোম সংলগ্ন থাকে।

(vi) কাজ (Functions) : (1) রাইবোজোম প্রোটিন সংশ্লেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



চিত্র 5.26—দু'টি সাব-ইউনিটসহ একটি রাইবোজোম।

(2) রাইবোজোম ফ্যাট বিপাকেও সহায়তা করে।

5.25. লাইসোজোম [*Lysosome*, গ্রীক *Lytic* = এনজাইম প্রকৃতিসম্পন্ন বস্তু, *Soma*=দেহ] :

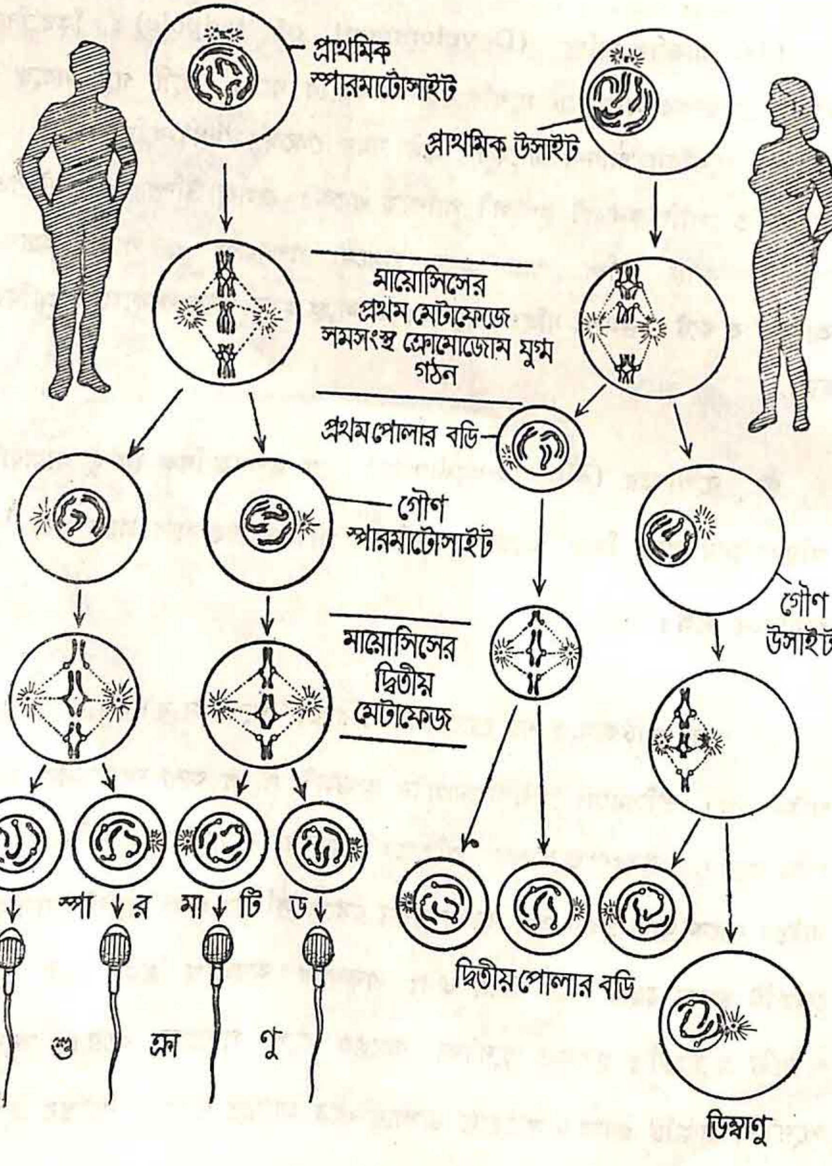
● সংজ্ঞা (Definition) : **এককপর্দাবেষ্টিত বিভিন্ন প্রকার পাচক উৎসেচকপূর্ণ থলির মতো যে সব অঙ্গাণু সাইটোপ্লাজমে ভেসে বেড়ায় তাদের লাইসোজোম বলে।**

বিজ্ঞানী দ্য দুভে (de Duve) 1955 খ্রীষ্টাব্দে ইঁদুরের যকৃৎ কোষে লাইসোজোম আবিষ্কার করেন।

(i) **ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট (আলট্রা) গঠন** (Ultra-structure of Lysosome) : এককপর্দার মতো লাইসোজোমের পর্দাও ত্রিস্তরযুক্ত এবং প্রোটিন ও লিপিড (লাইপোপ্রোটিন) দ্বারা গঠিত। লাইসোজোমের অভ্যন্তরীণ গঠন পরিবর্তনশীল। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে এর মধ্যস্থল ঘন, অথবা বহির্ভাগ বেশী ঘন। মধ্যস্থলে কখনও কখনও দানাদার পদার্থ, অপাচিত বস্তু এবং গহ্বর দেখা যায়।

(ii) আকৃতি (Shape) : ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে লাইসোজোমকে ঘন, সূক্ষ্ম কণিকার মতো দেখায়। এগুলি প্রকৃতপক্ষে পাচক উৎসেচকপূর্ণ গোলাকার থলি।

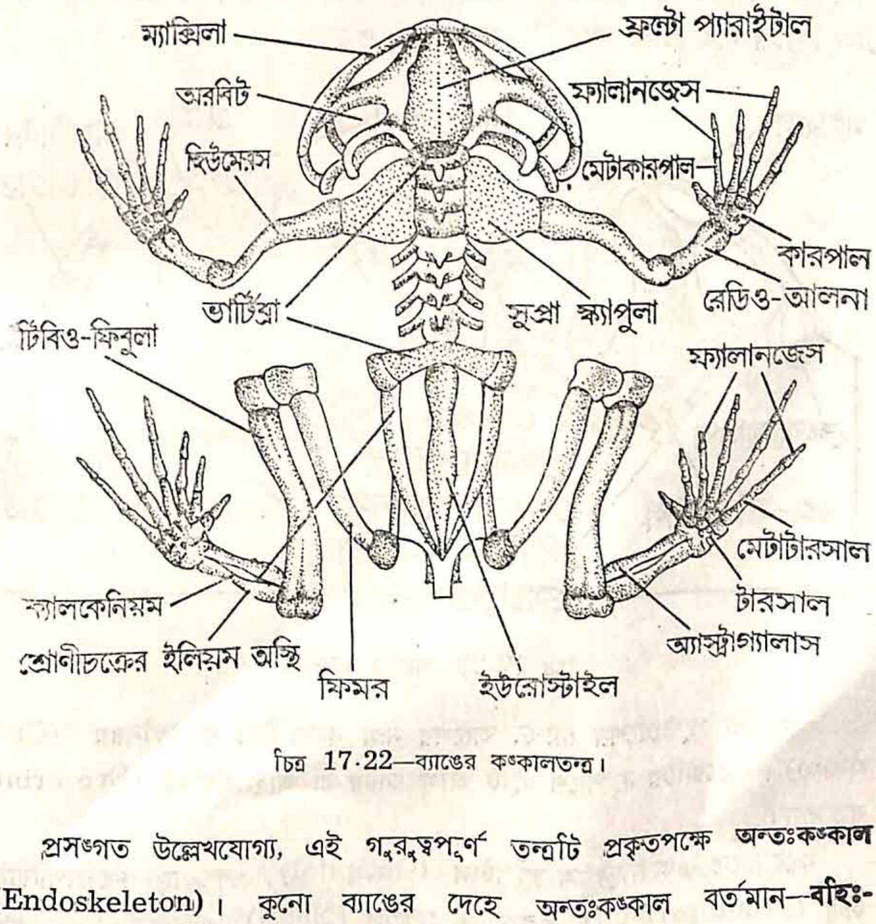
17.11. মানুষের দেহে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপাদনের চিত্ররূপ *[Diagrammatic representation of the process of Sperm and Ovum production in human being]* **:**



চিত্র 17·21—মানুষের ক্ষেত্রে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গঠনের চিত্ররূপ।

17.12. কুনো ব্যাঙের কঙ্কালতন্ত্র *[Skeletal system of Toad]* :

মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে কাঠামো গঠনকারী, নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদানে সাহায্যকারী এবং দেহভার বহনে সহায়তাকারী তন্ত্রকে কঙ্কালতন্ত্র বলে।



চিত্র 17·22—ব্যাঙের কঙ্কালতন্ত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্রটি প্রকৃতপক্ষে **অন্তঃকঙ্কাল** (Endoskeleton)। কুনো ব্যাঙের দেহে অন্তঃকঙ্কাল বর্তমান—**বহিঃকঙ্কাল** (Exoskeleton) নাই।

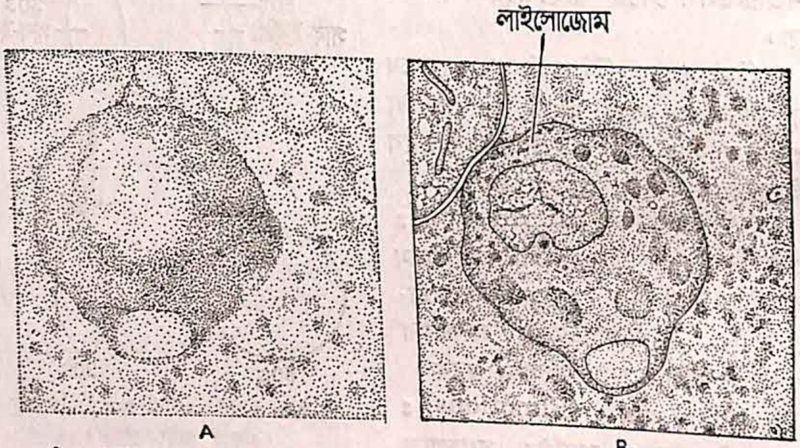
কুনো ব্যাঙের অন্তঃকঙ্কালতন্ত্রটি প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত, যথা—

(A) অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্র (Axial skeletal system)।

(B) উপাঙ্গিক কঙ্কালতন্ত্র (Appendicular skeletal system)।

(iii) **সংখ্যা** (Number) ঃ লাইসোজোমের সংখ্যা কোষ ভেদে বিভিন্ন।

(iv) **বিস্তৃতি** (Distribution) ঃ মানুষের যকৃৎ, বৃক্ক, শ্বেতরক্তকণিকা ইত্যাদিতে অধিক সংখ্যায় লাইসোজোম বিস্তৃত। ব্যাঙের লেজের কোষে অসংখ্য



চিত্র 5.27—লাইসোজোম ঃ A—ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট গঠন এবং B—ঐ রেখাচিত্রে পরিস্ফুট।

লাইসোজোম বর্তমান। উদ্ভিদকোষে সাধারণত লাইসোজোম নাই। তবে তামাক, ভুট্টা গাছের অপরিণত কোষে এবং পেঁয়াজের বীজকোষে লাইসোজোম বর্তমান।

(v) **কাজ** (Functions) ঃ (1) খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে।
(2) ব্যাকটিরিয়া ও ক্ষতিকর পদার্থ ধ্বংস করে।
(3) লোহিতরক্তকণিকা ধ্বংস করে।
(4) কোষের জীর্ণ ও অক্ষম অংশ ধ্বংস করে।
(5) ক্যারোটিন তৈরী করতে সাহায্য করে।
(6) ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় খাদ্য সরবরাহ করে।

5.26. নিউক্লিয়স [**Nucleus** ; ল্যাটিন—*Nucleus*=শাঁস] :

● **সংজ্ঞা** (Definition) ঃ **সজীব পর্দাবৃত ও ক্রোমোজোম সমন্বিত প্রোটোপ্লাজমের সর্বাপেক্ষা ঘন, প্রায় গোলাকার যে কোষীয় অঙ্গাণু কোষের যাবতীয় কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে নিউক্লিয়স বলে।**

1833 খ্রীষ্টাব্দে **রবার্ট ব্রাউন** (Robert Brown) ট্রাডেসকানসিয়া (Tradescantia) নামক উদ্ভিদকোষের সাইটোপ্লাজমে একটি সুস্পষ্ট বস্তু দেখে তাকে নিউক্লিয়স আখ্যা দেন। এটিকে **'কোষের মগজ'** (Brain of the cell) বলা হয়। কারণ নিউক্লিয়সই কোষের যাবতীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

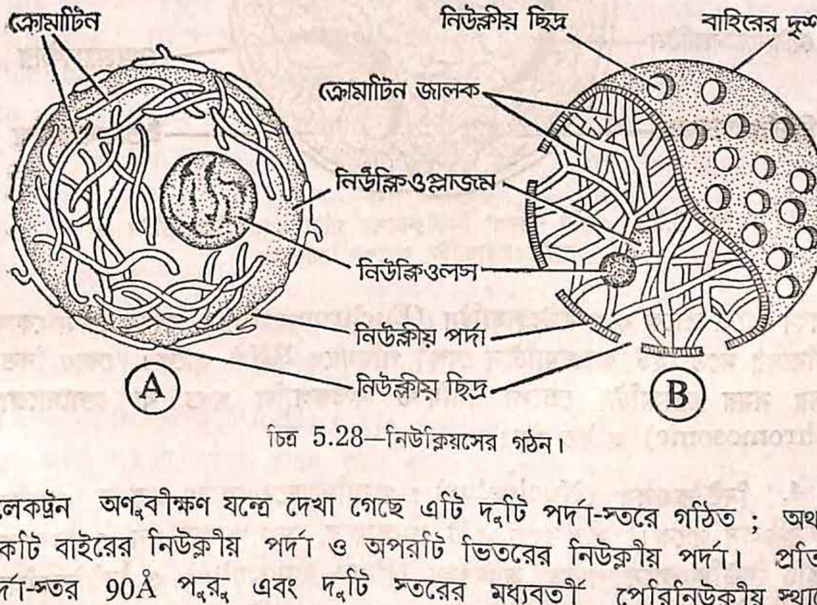
(i) **সংখ্যা** (Number) ঃ প্রতি কোষে সাধারণত একটি, কখনও কখনও একাধিক নিউক্লিয়স থাকে। একটি কোষের সঙ্গে আর একটি কোষ জুড়ে গিয়ে তৈরী হয় **সিনসিটিয়ম** (Syncytium)। এই ধরনের উদ্ভিদকোষকে বলে **সিনোসাইট** (Coenocyte)। এগুলির মধ্যে স্বভাবতই অনেক নিউক্লিয়স থাকে। সাইটোকাইনেসিস ছাড়াই পর পর কোষ বিভাজন ঘটলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(ii) **আকৃতি** (Shape) ঃ আকৃতিগতভাবে নিউক্লিয়স বৈচিত্র্যে ভরপুর। এর আকৃতি গোলাকার, ডিম্বাকার, চ্যাপ্টা বা অনিয়মিত হতে পারে।

(iii) **আয়তন** (Size) ঃ কেবল কোষের প্রকৃতির উপরেই যে নিউক্লিয়সের আয়তনের তারতম্য ঘটে তা নয়—কোষের কার্যকারিতার উপরেও কোষের আয়তন নির্ভরশীল। সক্রিয় কোষে নিউক্লিয়সের আয়তন বড়। নিষ্ক্রিয় কোষে নিউ-ক্লিয়সের আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট। সাধারণত এর ব্যাস 5μ—7μ। নিউ-ক্লিয়সের আয়তন তার DNA পরিমাণের উপর নির্ভরশীল।

(iv) **ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট (আলট্রা) গঠন** (Ultra-structure of Nucleus) ঃ একটি **স্থিতিশীল নিউক্লিয়স** (Resting or Interphase Nucleus) নিম্নলিখিত অংশ দ্বারা গঠিত ঃ

1. **নিউক্লীয় পর্দা** বা **নিউক্লিয়ার মেমব্রেন** বা **কেরিওথিকা** (Nuclear membrane or Karyotheca) ঃ নিউক্লিয়সকে ঘিরে রাখা অর্ধভেদ্য পর্দাটি নিউক্লীয় পর্দা। এই পর্দাটি নিউক্লিয়সকে সাইটোপ্লাজম থেকে পৃথক রাখে।



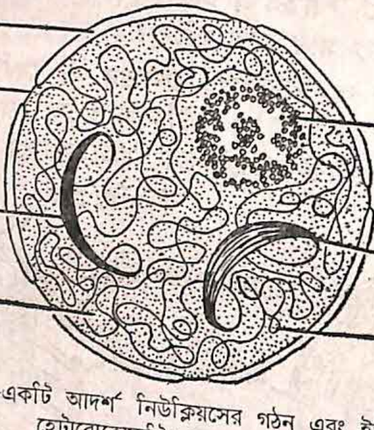
চিত্র 5.28—নিউক্লিয়সের গঠন।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা গেছে এটি দুটি পর্দা-স্তরে গঠিত ; অর্থাৎ একটি বাইরের নিউক্লীয় পর্দা ও অপরটি ভিতরের নিউক্লীয় পর্দা। প্রতিটি পর্দা-স্তর 90Å পুরু এবং দুটি স্তরের মধ্যবর্তী পেরিনিউক্লীয় স্থানের (Perinuclear space) ব্যাস 100—300Å । নিউক্লীয় পর্দা স্থানে স্থানে

ছিদ্রযুক্ত। এই ছিদ্রকে নিউক্লীয় ছিদ্র (Nuclear pore) বলে। প্রতিটি ছিদ্রের ব্যাস 400 Å ।

2. **নিউক্লিওপ্লাজম** বা **কেরিওলিম্ফ** (Nucleoplasm or Karyolymph) ঃ এটি নিউক্লিয়সের মধ্যে অবস্থিত প্রোটোপ্লাজমের বিশেষ অংশ। নিউক্লীয় বস্তু ছাড়া নিউক্লিয়সের ভিতরের সমস্ত স্থান নিউক্লিওপ্লাজম দ্বারা পূর্ণ থাকে। নিউক্লিওপ্লাজমের রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল। এতে নিউক্লিও-প্রোটিন (RNA ও DNA), নানাবিধ এনজাইম, লিপিড ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

3. **নিউক্লীয় জালক** বা **ক্রোমাটিন জালক** (Nuclear reticulum or chromatin reticulum) ঃ নিউক্লিওপ্লাজমে ভাসমান এক ধরনের প্যাঁচানো জালের মতো বিশেষ বস্তু দেখা যায়। এদের একত্রে নিউক্লীয় জালক বলে। নিউক্লীয় জালকের প্রধান উপাদান **ক্রোমাটিন** (Chromatin, গ্রীক—*Chroma* = রং)। পূর্বেই বলা হয়েছে ক্রোমাটিনের কোন কোন অংশ গাঢ় রং নেয়—এই অংশগুলিকে **হেটারোক্রোমাটিন** (Heterochromatin) বলে ; আবার যে অংশের রং



চিত্র 5.29—একটি আদর্শ নিউক্লিয়সের গঠন এবং ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন অংশের চিত্ররূপ।

হালকা থাকে তাকে বলে **ইউক্রোমাটিন** (Euchromatin)। কোন কোন কোষতত্ত্ববিদের মতে হেটারোক্রোমাটিনে বেশী পরিমাণে RNA থাকে। কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমাটিন ভেঙে নির্দিষ্ট কতকগুলি খণ্ড বা **ক্রোমোজোম** (Chromosome) গঠিত হয়।

4. **নিউক্লিওলস** (Nucleolus) ঃ প্রজাতিভেদে কোষে এক বা একাধিক নিউক্লিওলস থাকে। সাধারণত এটি গোলাকার, অপেক্ষাকৃত ঘন ও উজ্জ্বল। প্রতিটি নিউক্লিওলসে **পারস্ অ্যামরফা** (Pars amorpha) ও **নিউক্লিওলিমা** (Nucleolemma) নামে দুটি অংশ আছে। প্রথমটি প্রোফেজে অবলুপ্ত হয়

এবং টেলোফেজে পুনরায় আবির্ভূত হয়, শেষোক্তটি স্থায়ী অংশ—সারাক্ষণ কোষে থাকে। নিউক্লিওলস DNA, RNA, প্রোটিন ও লিপিড দ্বারা গঠিত। **থোরায়েল** (Thoraell, 1944) ও **ক্যাসপারসন** (Casperson, 1950)-এর মতে স্থিতিশীল অবস্থায় নিউক্লিয়সের ক্রোমোসেণ্টার থেকে এদের উৎপত্তি হয় এবং কোষ বিভাজনের সময় লুপ্ত হয়। এরা রাইবোজোম উৎপাদন করতে পারে বলে মনে হয়। তবে সঠিক কাজের হদিশ এখনও পাওয়া যায়নি।

(v) কাজ (Functions) : (1) কোষের যাবতীয় বিপাকক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক নিউক্লিয়স। (2) সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়স পরস্পর নির্ভরশীল—নিউক্লিয়স-বিহীন অবস্থায় যেমন কোষকে বাঁচিয়ে রাখা সাইটোপ্লাজমের পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি শক্তির চাহিদা মেটাতে নিউক্লিয়সকে সাইটোপ্লাজমের উপরেই নির্ভর করতে হয়। (3) সন্তান-সন্ততির দেহে বংশগত ধারা পরিবহণের কাজে নিউ-ক্লিয়স প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

5.27. কোষগহ্বর বা ভ্যাকুওল [*Vacuole*] :

● **সংজ্ঞা** (Definition) : **সাইটোপ্লাজম একক পর্দাবেষ্টিত তরল বা গ্যাসপূর্ণ গহ্বরকে কোষগহ্বর বলে।**

অপরিণত কোষ সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে। কোষের আয়তন বাড়তে থাকলে সাইটোপ্লাজমের আয়তন কিন্তু সমানুপাতে বাড়ে না। তখন গহ্বর সৃষ্টি হয়। গহ্বর যে পদার্থে পূর্ণ থাকে তাকে **রস** বা **স্যাপ** (Sap) বলে। **প্রকৃতপক্ষে গহ্বর** বা **ভ্যাকুওল** হল **সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত রসপূর্ণ থলি**। টোনোপ্লাজমের (tonoplasm) পাতলা পর্দা দ্বারা ভ্যাকুওল* সাইটোপ্লাজম থেকে পৃথক থাকে। প্রাণিকোষে ভ্যাকুওল থাকলে তা সংখ্যায় যেমন কম, আকারেও ছোট। **মেয়েন** (Meyen, 1835), **স্লাইডেন** (Schleiden, 1842) প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ সাইটোপ্লাজম থেকে ভ্যাকুওলের পার্থক্য জন-সমক্ষে তুলে ধরেন। কিন্তু ভ্যাকুওল আবিষ্কারের কৃতিত্ব **স্প্যালানজানি**-র (Spallanzani)।

(i) **উৎপত্তি** (Origin) : অন্যান্য অঙ্গাণুর মতো ভ্যাকুওল থেকে ভ্যাকুওলের সৃষ্টি হয় না, কোষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগুলির উদ্ভব হয়। কোষের সব ভ্যাকুওলকে একত্রে **ভ্যাকুওম** (Vacuome) বলে।

(ii) **কাজ** (Functions) : (1) ভ্যাকুওল **সঞ্চয়ী** অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এতে শর্করা, খনিজ লবণ, জৈব অ্যাসিড, নানাবিধ গ্যাস প্রভৃতি সঞ্চিত থাকে। (2) ভ্যাকুওল কোষের **স্ফীতিজনিত চাপ** (Turgour pressure) অর্থাৎ

* উদ্ভিদকোষ বড় হতে থাকলে গহ্বরগুলি একসাথে মিলে একটি বৃহৎ গহ্বর সৃষ্টি করে। ফলে সাইটোপ্লাজম কোষ-প্রাকারের গায়ে পাতলা স্তরে লেগে থাকে। এই স্তরকে বলে **প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকল** (Primordial utricle)।

বীজ
[Seed]

15.1. সূচনা *[Introduction] :*

নিষেকের পর প্রতিটি ডিম্বক পরিবর্তিত হয়ে বীজে পরিণত হয়। ডিম্বকত্বক বীজত্বক-এ, ভ্রূণাণু (Zygote) ভ্রূণ (Embryo)-এ এবং সেকেণ্ডারী নিউক্লিয়স সস্যে (Endosperm) রূপান্তরিত হয়। ভ্রূণের দুটি অংশ—**ভ্রূণাক্ষ** (Embryonal axis) অর্থাৎ **টাইগেলম** (Tigellum) এবং **বীজপত্র** (Cotyledon)। ভ্রূণাক্ষ একটি দণ্ড বিশেষ। এই দণ্ডের সঙ্গে যেখানে বীজপত্র যুক্ত থাকে তার উপরের অংশটি **বীজপত্রাধিকাণ্ড** বা **এপিকোটিল** (Epicotyl) এবং নীচের অংশটি **বীজপত্রাবকাণ্ড** বা **হাইপোকোটিল** (Hypocotyl)। বীজপত্রাধিকাণ্ডের বর্ধনশীল আগাটিকে **ভ্রূণমুকুল** বা **প্লুমিউল** (Plumule) এবং বীজপত্রাবকাণ্ডের বর্ধনশীল আগাটিকে **ভ্রূণমূল** বা **র‍্যাডিকল** (Radicle) বলে। ভ্রূণমূল থেকে প্রাথমিক মূল এবং ভ্রূণমুকুল থেকে প্রাথমিক কাণ্ড গঠিত হয়।

● **বীজের সংজ্ঞা** (Definition of seed) : **এক বা একাধিক বীজত্বক দ্বারা আবৃত পরিণত ভ্রূণকে বীজ বলে।**

15.1(a). বীজপত্রের সংখ্যাভিত্তিক বীজের শ্রেণীবিভাগ *[Classification of seeds on the basis of the number of cotyledons] :*

বীজে বীজপত্রের সংখ্যা এক, দুই বা তারও বেশী। বীজপত্রের সংখ্যানুযায়ী বীজ তিন প্রকার। যেমন—

(1) একটিমাত্র বীজপত্র থাকলে বীজ **একবীজপত্রী** (Monocotyledonous seed)।

উদাহরণ—**ধান, যব, গম, ভুট্টা, নারকেল, অর্কিড** প্রভৃতি।

(2) দুটি বীজপত্র থাকলে বীজ **দ্বিবীজপত্রী** (Dicotyledonous seed)।

উদাহরণ—**আম, জাম, মটর, ছোলা, সূর্যমুখী, রেড়ি** ইত্যাদি।

(3) দুটির বেশী বীজপত্র থাকলে বীজ **বহুবীজপত্রী** (Polycotyledonous seed)।

উদাহরণ—**পাইন**।

15.1(b). বীজে খাদ্যের সঞ্চয়-পদ্ধতি ভিত্তিক বীজের শ্রেণীবিভাগ *[Classification of seeds on the basis of the nature of food storage] :*

ভ্রূণের বীজপত্রে বা তার বাইরে সস্য সঞ্চিত থাকে। সস্যের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি অনুসারে বীজ দুপ্রকার :—

(1) ভ্রূণের বাইরে পৃথক একটি অংশে সস্য জমা থাকলে বীজ **সস্যল** (Endospermic or Albuminous)।

উদাহরণ—**ভুট্টা, ধান, গম** প্রভৃতি (একবীজপত্রী সস্যল বীজ) এবং রেড়ি (দ্বিবীজপত্রী সস্যল)।

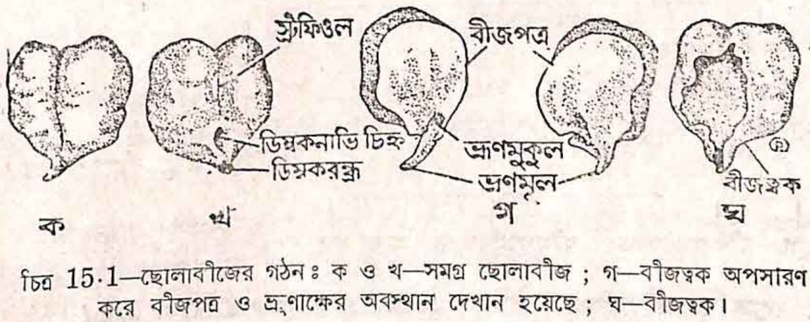
(2) **ছোলা, মটর, আম, তেঁতুল** প্রভৃতি বীজে এরকম পৃথক কোন অংশ থাকে না, বীজের খাদ্য অর্থাৎ সস্য বীজপত্রেই সঞ্চিত থাকে। খাদ্য বীজপত্রে সঞ্চিত থাকে বলে বীজপত্র স্থূল হয়। এই ধরনের বীজ **অসস্যল** (Non-endospermic or exalbuminous)।

15.2. ছোলাবীজের গঠন *[Structure of a Gram seed] :*

ছোলা দ্বিবীজপত্রী অসস্যল বীজ (Dicotyledonous exalbuminous seed)। ছোলা বীজের এক প্রান্ত স্থূল ও অন্য প্রান্ত সূচাল। ছোলাবীজ নিম্নলিখিত অংশগুলি নিয়ে গঠিত।

(a) **বীজত্বক** (Seed coat) ঃ বীজত্বক দুটি অংশে বিভক্ত। বীজের বাইরের পিঙ্গল বর্ণের ত্বককে **বীজবহিস্ত্বক** বা **টেস্টা** (Testa) এবং ভিতরের পাতলা পর্দাকে **বীজঅন্তস্ত্বক** (Tegmen) বা **টেগমেন** বলে। বীজত্বক অন্তর্বীজকে রক্ষা করে।

(i) **ডিম্বকনাভিচিহ্ন** বা **হাইলাম** (Hilum) ঃ বীজত্বকের সূচাল অংশে অবস্থিত অবনমিত ক্ষতচিহ্নকে **ডিম্বকনাভিচিহ্ন** (Hilum) বলে। এই অংশ বৃন্ত দ্বারা বীজটি ফলপ্রকারের সঙ্গে যুক্ত থাকে।



চিত্র 15·1—ছোলাবীজের গঠন ঃ ক ও খ—সমগ্র ছোলাবীজ ; গ—বীজত্বক অপসারণ করে বীজপত্র ও ভ্রূণাক্ষের অবস্থান দেখান হয়েছে ; ঘ—বীজত্বক।

(ii) **ডিম্বকরন্ধ্র** বা **মাইক্রোপাইল** (Micropyle) ঃ জলসিক্ত বীজে সামান্য চাপ দিলে ডিম্বকনাভিচিহ্নের নিকটবর্তী যে ছিদ্রপথে জল বেরিয়ে আসে, **সেই** ছিদ্রটিকে **ডিম্বকরন্ধ্র** (Micropyle) বলে। অঙ্কুরোদ্গমের পূর্বে ডিম্বকরন্ধ্র পথে বীজ জল শোষণ করে।

রসস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে। (3) ভ্যাকুওলের রসে মিশে থাকা নানা রকমের রঙক পদার্থের উপর ফুলের পাপড়ির বৈচিত্র্যপূর্ণ রং নির্ভর করে। (4) সাইটোপ্লাজমের তল বৃদ্ধি করে। (5) প্রোটোজোয়াভুক্ত প্রাণিকোষে কনট্রাকটাইল ভ্যাকুওল রেচনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

5.28. জড়বস্তু বা আরগাস্টিক পদার্থ [*Ergastic substances* ; গ্রীক—*Ergon*=কাজ] :

মাইটোকনড্রিয়া, গলগি বস্তু, প্লাসটিড প্রভৃতি জীবিত অংশ ছাড়া কোষের সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অন্যান্য জড় বস্তুকে **আরগাস্টিক পদার্থ** বলে। সঞ্চয়ী বা বর্জ্য পদার্থ হিসাবে এগুলি অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও এদের অনেকেরই অর্থনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। এই পদার্থগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—(1) **সঞ্চিত খাদ্য**, (2) **ক্ষরিত পদার্থ** ও (3) **বর্জ্য পদার্থ**।

(1) **সঞ্চিত খাদ্য** (Reserve food) : উদ্ভিদকোষ প্রধানত সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া মাধ্যমে প্রথমে কার্বোহাইড্রেট এবং পরে বিভিন্ন উপচিতি প্রক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেট থেকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপন্ন করে এবং সেগুলিকে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যে সঞ্চিত রাখে। উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য তিন প্রকার—**কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন** এবং **ফ্যাট ও তৈল**।

(A) **কার্বোহাইড্রেট** (Carbohydrates) : কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বিভিন্ন আনুপাতিক মিশ্রণের ফলে কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন হয়। কার্বোহাইড্রেট **জলে** আংশিকভাবে **দ্রবণীয়**। দ্রবণীয় অংশ কোষরসে দ্রবীভূত থাকলেও অদ্রবণীয় অংশ কঠিন দানার আকারে কোষে থেকে যায়। দ্রবণীয় পদার্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল **শর্করা ইনউলিন** ও **গ্লাইকোজেন**। অদ্রবণীয় পদার্থের মধ্যে **শ্বেতসার** ও **সেলুলোজ** উল্লেখযোগ্য।

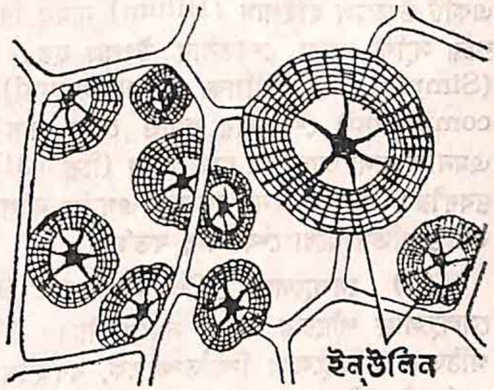
● **দ্রবণীয় পদার্থ** (Soluble substances) :

(i) **শর্করা** (Sugar) : কোষরস সাধারণত **ইক্ষুশর্করা** (Cane sugar—$C_{12}H_{22}O_{11}$) ; **দ্রাক্ষাশর্করা** (Grape sugar—$C_6H_{12}O_6$) প্রভৃতি বিভিন্ন শর্করা দ্রবীভূত অবস্থায় উদ্ভিদ অঙ্গে সঞ্চিত খাদ্যরূপে থেকে যায়।

(ii) **ইনউলিন** (Inulin, $C_5H_{10}O_5$) : এটিও একধরনের দ্রবণীয় কার্বোহাইড্রেট। সাধারণত কম্পোজিটি* (Compositae) গোত্রের গাছে,

* এই গোত্রটির নতুন নাম **অ্যাসটারেসি** (Asteraceae)।

বিশেষত ডালিয়ার মূলে প্রচুর ইনউলিন থাকে। একখণ্ড ডালিয়ার মূল অ্যালকোহল বা গ্লিসারিনে ডুবিয়ে রাখলে, ইনউলিন তারার মতো দেখতে সুন্দর কেলাস (crystal) তৈরী করে (চিত্র 5.30)।

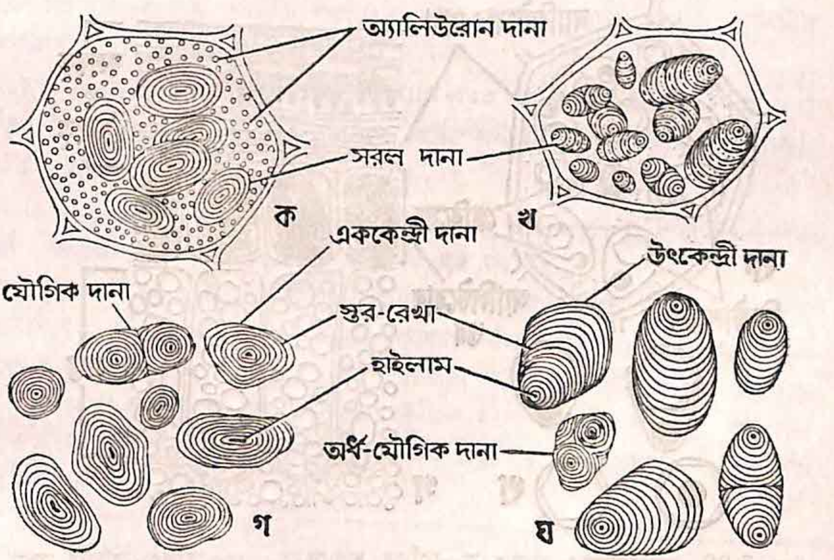


চিত্র 5.30—ইনউলিন।

(iii) **গ্লাইকোজেন** (Glycogen, $C_6H_{10}O_5$) : ব্যাকটিরিয়া, নীলাভ-সবুজ শেওলা, ছত্রাক প্রভৃতি নিম্ন-শ্রেণীর উদ্ভিদেরই কেবল গ্লাইকোজেন থাকে। আয়োডিন দ্রবণ ছোঁয়ালে গ্লাইকোজেনসমৃদ্ধ সাইটোপ্লাজমে লালচে-বাদামী রং ধরে। গরম করলে ঐ রং অন্তর্হিত হয়, ঠাণ্ডা হলে আগের রং আবার ফিরে আসে।

● **অদ্রবণীয় পদার্থ** (Insoluble substances) :

(i) **শ্বেতসার** [Starch, $(C_6H_{10}O_5)_n$] : এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ



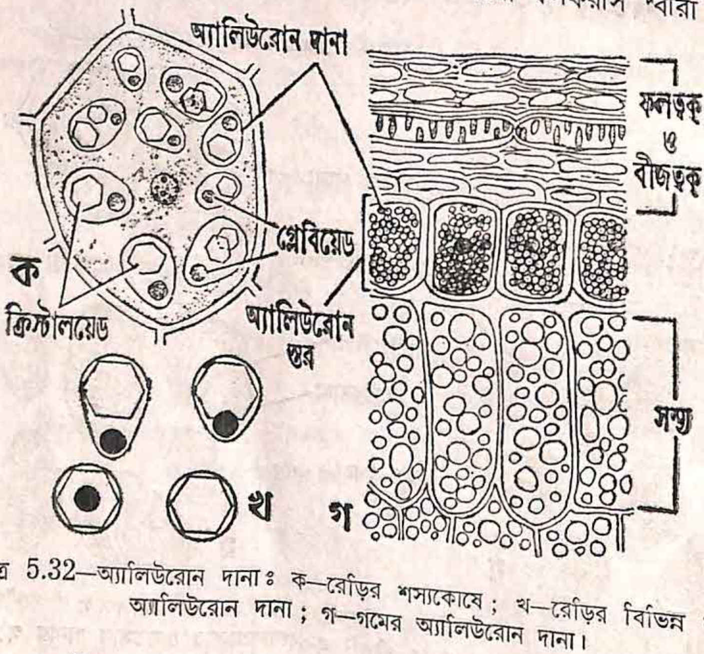
চিত্র 5.31—শ্বেতসার দানা : ক—মটরের বীজপত্রের কোষে ; খ—গোলআলুর স্ফীতকন্দের কোষে ; গ—মটরের শ্বেতসার দানার গঠন ; ঘ—গোলআলুর শ্বেতসার দানার গঠন।

জটিল কার্বোহাইড্রেট। শ্বেতসার ক্ষুদ্র কঠিন দানারূপে সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে

থাকে। প্রয়োজনমতো উদ্ভিদ এটিকে শরীরের গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করে। একটি উজ্জ্বল **হাইলাম** (Hilum) নামক বিন্দুকে কেন্দ্র ক'রে পর পর কয়েকটি স্তর সৃষ্টি দ্বারা শ্বেতসার উৎপন্ন হয়। শ্বেতসার প্রধানত দু'প্রকার—**সরল** (Simple) ও **যৌগিক** (Compound)। তবে **অর্ধ-যৌগিক** (Semi-compound) শ্বেতসার কণাও দেখা যায়। শ্বেতসার গোলাকার, ডিম্বাকার, এমনকি নানা আকৃতির হতে পারে (চিত্র 5.31)। জলে বা অ্যালকোহলে শ্বেতসার দ্রবণীয়। আয়োডিনের **ছোঁয়ায় এগুলি নীলবর্ণ ধারণ করে**। আলু, গম, ধান, ওট প্রভৃতির মধ্যে শ্বেতসার বর্তমান।

(ii) **সেলুলোজ** [Cellulose $(C_6H_{10}O_5)_n$] ঃ রাসায়নিক দিক থেকে সেলুলোজ স্টার্চের প্রায় সমগোত্রীয়। উদ্ভিদের কোষ-প্রাকার সেলুলোজে গঠিত। সেলুলোজ স্থিতিস্থাপক, বর্ণহীন ও স্বচ্ছ। খেজুর বীজের প্রায় সর্বাংশই সঞ্চিত সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। **আয়োডিনের ছোঁয়ায় সেলুলোজ শ্বেতসারের মতো নীল হয় না, হয় হলুদ। তবে সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে আয়োডিন মিশিয়ে রং করলে দ্রবণের রং হয় নীল।**

(B) **প্রোটিন** (Protein) ঃ প্রোটোপ্লাজম তথা জীবদেহ গঠনে প্রোটিন অপরিহার্য। প্রোটিন অণু আকারে বড় এবং জটিল। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার এবং কখনো কখনো ফসফরাস দ্বারা প্রোটিন



চিত্র 5.32—অ্যালিউরোন দানা ঃ ক—রেড়ির শস্যকোষে ; খ—রেড়ির বিভিন্ন রকম অ্যালিউরোন দানা ; গ—গমের অ্যালিউরোন দানা।

গঠিত। প্রোটিন তরল বা কঠিন অবস্থায় থাকে। শুষ্ক উদ্ভিদঅঙ্গে (যেমন, বীজে) প্রোটিন কঠিন **অ্যালিউরোন দানা** বা **প্রোটিড দানা** (Aleurone grain

or Proteid grain) কেলাস (crystal) রূপে অবস্থান করে (চিত্র 5.32)। সস্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যালিউরোন দানা থাকে। এগুলি ছোট ও বড়—দুটি অংশে বিভক্ত। বড় দানাগুলিকে **ক্রিস্টালয়েড** (crystalloid) বলে। এই অংশটি (Crystallised) প্রোটিন দ্বারা গঠিত। কিন্তু স্বচ্ছ ও ধাতব পদার্থ দ্বারা গঠিত ছোট **কেলাসিত** গোলাকার অংশটি **গ্লোবয়েড** (globoid)। **আয়োডিনের ছোঁয়ায় প্রোটিন বাদামী রং নেয়।**

(C) **ফ্যাট ও তৈল** (Fats and oil—$C_nH_{2n}O_2$) ঃ এগুলি ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলের বিভিন্ন যৌগ এবং অপরিহার্য সঞ্চয়ী খাদ্য। সাধারণ উষ্ণতায় তৈল তরল, কিন্তু ফ্যাট জমাট বাঁধা অবস্থায় থাকে। সস্য ও বীজপত্রে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট ও তৈল থাকে। কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশ দ্বারা নাড়াচাড়া করলে এগুলিকে সাবানের ফেনার মতো দেখায়। গঠনের দিক থেকে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন থাকলেও কার্বোহাইড্রেটের অনুপাত থেকে এদের অনুপাত ভিন্ন। ফ্যাট ও তৈল প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বেশী শক্তি-সমৃদ্ধ সঞ্চয়ী খাদ্য। **অসমিক অ্যাসিডের** (Osmic acid) **ছোঁয়ায় তৈলের রং কাল হয়।**

(2) **ক্ষরিত পদার্থ** (Secretory products) ঃ জীবের পুষ্টির জন্যে সরাসরি ব্যবহৃত না হলেও প্রোটোপ্লাজম থেকে ক্ষরিত পদার্থগুলি পরোক্ষভাবে বিপাকে সহায়তা করে। ক্ষরিত পদার্থের মধ্যে নানা রকমের **রঙ্গক, নেকটার** (বা **মকরন্দ**) এবং **এনজাইম** বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(i) **রঙ্গক পদার্থ** (Colouring matters or pigments) ঃ ফুলের পাপড়ির বৈচিত্র্যপূর্ণ বর্ণসম্ভার প্রধানত **অ্যান্থোসায়ানিন** (Anthocyanin) রঙ্গকের উপর নির্ভরশীল।

● **ফুলের পাপড়ির রং নানা রকমের হয় কেন?**

অ্যান্থোসায়ানিন হল কতকগুলি জটিল যৌগের সমষ্টিগত নাম। এটি **গ্লাইকোসাইড** (Glycoside) হিসাবে কোষরসে মিশে থাকে। কোষরসে pH (অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়ন গাঢ়ত্ব)-এর তারতম্য ঘটলে তবেই রং-এর তারতম্য ঘটে। যেমন, কোষরস দুর্বল ক্ষারীয় প্রকৃতির হলে **রং হয় নীল** ; অ্যাসিড প্রকৃতির হলে **রং হয় লাল** ; আবার নিউট্রাল প্রকৃতির হলে কোষরসের রং হয় **বেগুনী** বা **কালচে নীল।**

(ii) **নেকটার** বা **মকরন্দ** (Nectar) ঃ অধিকাংশ পতঙ্গপরাগী ফুলে মকরন্দ থাকে। পুষ্পস্তবকের ভিতরের বিশেষ কতকগুলি কোষ থেকে অথবা ফুলের বাইরে কোষ থেকে মকরন্দ নিঃসৃত হয়। সীম এবং লালপাতা ও ভেরেন্ডা জাতীয় গাছের বিশেষ অংগ থেকে মকরন্দ নিঃসৃত হয়।

(iii) **এনজাইম** (Enzymes) ঃ কোষের ক্ষরিত পদার্থগুলির মধ্যে এনজাইম অন্যতম। নাইট্রোজেনঘটিত এই বিশেষ পদার্থগুলি নিজে অপরিবর্তিত থেকে নানাবিধ বিপাকক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

(3) **বর্জ্যপদার্থ** (Excretory products or excretory substances) ঃ বিপাকজাত আপাত অপ্রয়োজনীয় পদার্থকে বর্জ্য পদার্থ বলে। উন্নত প্রাণীর মতো বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের জন্যে উদ্ভিদের নির্দিষ্ট কোন রেচন অঙ্গ নাই। তাই পুরাতন পাতায়, ছালে, হার্টউড (heartwood)-এ বর্জ্য পদার্থ সঞ্চিত থাকে। পাতা ঝরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বা গাছের ছাল উঠে যাবার সময় বর্জ্য পদার্থ আংশিকভাবে অপসৃত হয়। গ্যাসীয় বর্জ্য পদার্থ অবশ্য সরাসরি বায়ুমণ্ডলে পরিত্যক্ত হতে পারে। উদ্ভিদেহে পুঞ্জীভূত বর্জ্য পদার্থগুলির মধ্যে **উপক্ষার, ট্যানিন, রজন, জৈব অ্যাসিড, গঁদ, তরুক্ষীর, ধাতব কেলাস** উল্লেখযোগ্য।

(i) **উপক্ষার** (Alkaloids) ঃ উপক্ষার কার্বন, হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেনের দ্বারা গঠিত এমন সব জটিল যৌগ যেগুলির স্বাদ তিক্ত। উদ্ভিদ-অঙ্গে উপক্ষার থাকলে সেগুলি প্রতিরোধী অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উপক্ষার গন্ধহীন। প্রাণিদেহে এগুলি নানান উপসর্গের সৃষ্টি করে। স্বভাবত নামী-দামী ওষুধ উৎপাদনে এগুলির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতি পরিচিত উপক্ষারের মধ্যে সিনকোনা গাছের **কুইনিন** (Quinine), আফিং গাছের **মরফিন** (Morphine), কোকো গাছের **কোকেন** (Cocaine), কফি গাছের **ক্যাফেইন** (Caffeine), চা গাছের **থিয়িন** (Theine), তামাক গাছের **নিকোটিন** (Nicotine) প্রভৃতি উপক্ষার উল্লেখের দাবী রাখে।

(ii) **ট্যানিন** (Tannin) ঃ ট্যানিন বিভিন্ন আকারের মোটা বা সূক্ষ্ম দানার মতো উপক্ষার। তিক্ত স্বাদযুক্ত ট্যানিন বহু গাছের পাতায়, ছালে, ফ্লোয়েম ও জাইলেম কলায় দেখা যায়। কাঁচা ফলে—এমনকি বীজত্বকেও ট্যানিন পাওয়া যায়। ট্যানিন কোষগহ্বরে থাকে। সাইটোপ্লাজমের মধ্যেও **ট্যানিন গহ্বর** (Tannin vacuole) রূপে ফোঁটা ফোঁটা ট্যানিন দেখা যায়। অনেকের মতে ট্যানিন প্রোটোপ্লাজমের শুষ্কতা, ক্ষয় বা প্রাণীর আক্রমণ প্রতিহত করে। ট্যানারীতে চামড়া ট্যান করতে এবং রং ও কালি তৈরী করতে ট্যানিন ব্যবহৃত হয়। ওষুধ হিসাবেও ট্যানিনের প্রয়োজন হয়।

(iii) **রজন** (Resin) ঃ তারপিন তেলে বিভিন্ন অ্যাসিডের দ্রবণকে রজন বলা হয়। রজন জলে দ্রবণীয় নয়, সেজন্যে রজনের প্রলেপ বস্তুকে জলরোধক করে। গাছের ক্ষেত্রে রজন ক্ষয় রোধ করে। অ্যালকোহল বা ক্ষারে রজন দ্রবণীয়।

(iv) **জৈব অ্যাসিড** (Organic acid) ঃ কোন কোন উদ্ভিদের কোষরসে জৈব অ্যাসিড পাওয়া যায়। আপেলে **ম্যালিক অ্যাসিড** (malic acid),

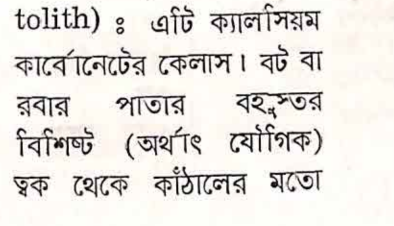
তেঁতুলে **টারটারিক অ্যাসিড** (tartaric acid), লেবুতে **সাইট্রিক অ্যাসিড** (citric acid), আমরুলে **অক্সালিক অ্যাসিড** (oxalic acid) আছে।

(v) **গঁদ** (Gums) ঃ সেলুলোজনির্মিত কোষ-প্রাকার বিশ্লিষ্ট হয়ে গঁদ উৎপন্ন হয়। ধুনা, কর্পূর, গুগগুল প্রভৃতি গঁদের উদাহরণ। ক্ষতস্থান নিরাময়ে গঁদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

(vi) **তরুক্ষীর** (Latex) ঃ আকন্দ, করবী প্রভৃতি গাছগুলিতে বিশেষ নালীপথে প্রবাহিত একপ্রকার দুধের* মতো তরল পদার্থ দেখা যায়। এই পদার্থকে তরুক্ষীর বলে। শাখাহীন ও শাখাযুক্ত নালীপথকে যথাক্রমে **ক্ষীর কোষ** (latex cell) ও **ক্ষীর নালী** (latex vessel) বলে (চিত্র—ষষ্ঠ অধ্যায় অন্তর্গত উদ্ভিদকলা দেখ)। বর্ণহীন এই পদার্থটি নানাবিধ জৈব পদার্থের যৌগ। এতে ট্যানিন, উপক্ষার, শ্বেতসার, এনজাইম, প্রোটিন, ফ্যাট, তৈল প্রভৃতি মিশে থাকে। সেজন্যেই তরুক্ষীরকে বর্জ্য পদার্থ বলা হয়। শত্রুকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বা এর ক্ষত নিরাময় ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(vii) **ধাতব কেলাস** (Mineral crystals) ঃ ধাতব কেলাস প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদের বর্জ্য পদার্থ। এগুলি কেলাসিত অবস্থায় কোষে সঞ্চিত থাকে। ধাতব কেলাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল **সিস্টোলিথ ও র‍্যাফাইড**।

1. **সিস্টোলিথ** (Cystolith) ঃ এটি ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের কেলাস। বট বা রবার পাতার বহুস্তর বিশিষ্ট (অর্থাৎ যৌগিক) ত্বক থেকে কাঁঠালের মতো



চিত্র 5.33—সিস্টোলিথ।



চিত্র 5.34—ক্যালসিয়াম অক্সালেট কেলাস ঃ ক—পেঁয়াজের শল্কপত্রে ; খ—বড় পানার পত্রকোষে ; গ—পেঁপের পত্রবৃন্তে ; ঘ—কচুরীপানার পত্রবৃন্তে।

* অনেক ক্ষেত্রে তরুক্ষীর জলের মতো সাদা।

দেখতে এই অংগটি ঝুলন্ত থাকে। 30% অ্যাসেটিক অ্যাসিডে সিস্টোলিথ দ্রবীভূত হয়। উচ্ছে পাতায় জোড়া সিস্টোলিথ থাকে (চিত্র 5.33)।

2. **র‍্যাফাইড** (Raphide) ঃ র‍্যাফাইড ক্যালসিয়ম অক্সালেট কেলাস। বিশেষ কতকগুলি গাছের কোষ-গহবরে র‍্যাফাইড থাকে। র‍্যাফাইড দু' প্রকার— **অ্যাসিকিউলার র‍্যাফাইড** (Acicular raphide) এবং **স্ফিয়র‍্যাফাইড** (Sphaeraphide)। কচু, টোপাপানা প্রভৃতি পাতার বৃন্তে নৌকাকৃতি **ইডিওব্লাস্ট** নামে বিশেষ ধরনের কোষে অ্যাসিকিউলার র‍্যাফাইড দেখা যায় (চিত্র 5.34)।

অ্যাসিকিউলার র‍্যাফাইড দেখতে একগুচ্ছ সুচের মতো। কিন্তু স্ফিয়র‍্যাফাইড দেখতে তারার মতো। একেও কচুর পর্ণবৃন্তে পাওয়া যায়। 30% অ্যাসেটিক অ্যাসিডে র‍্যাফাইড দ্রবণীয় নয়। নীচে আরগাস্টিক পদার্থের শ্রেণীবিন্যাস দেখান হল।

● আরগাস্টিক পদার্থ ●

- সঞ্চিত
  - কার্বোহাইড্রেট
    - দ্রবণীয়
      - শর্করা
      - ইনউলিন
      - গ্লাইকোজেন
    - অদ্রবণীয়
      - সেলুলোজ
      - শ্বেতসার
  - প্রোটিন
  - ফ্যাট ও তৈল
- ক্ষরিত
  - রঞ্জক
  - মকরন্দ
  - এনজাইম
- বর্জ্য
  - উপক্ষার
  - ট্যানিন
  - রজন
  - জৈব অ্যাসিড
  - গঁদ
  - ধাতব কেলাস

5.29. কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর কাজের সারাংশ [*A summary of functions of cellular organelle*] :

কোষীয় অংগাণু	কাজ
1. কোষপর্দা	1. কোষের আকৃতি দান করে। যান্ত্রিক চাপ বহন ক্ষমতা দান ক'রে কোষকে রক্ষা করে। অর্ধভেদ্য পর্দা হিসাবে কোষে রস-শোষণ ও কোষ থেকে উৎপন্ন পদার্থ পরিবহণে সক্রিয় অংশ নেয়।
2. কোষ-প্রাকার (উদ্ভিদে)	2. সেলুলোজ দ্বারা গঠিত স্থূল কোষ-প্রাকার কোষের আকার ঠিক রাখে এবং তাকে দৃঢ় করে।

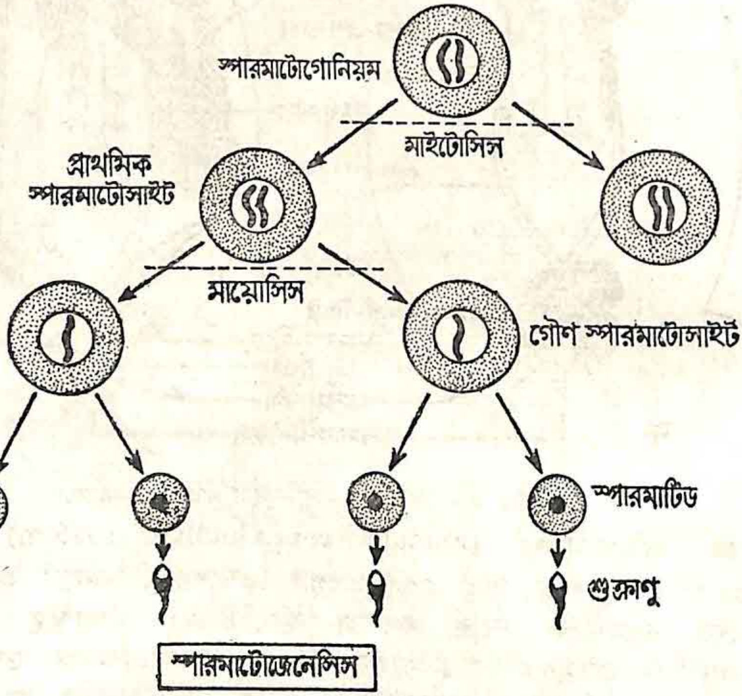
কোষীয় অঙ্গাণু	কাজ
3. মাইটোকনড্রিয়া	3. খাদ্যকে জারিত করার পর তা থেকে উৎপন্ন ATP শক্তি সংশ্লিষ্ট কোষকে সরবরাহ করে। অর্থাৎ, মাইটোকনড্রিয়া **'কোষের শক্তিঘর'**। ফ্যাট বিপাক অংশ গ্রহণ করে এবং বিপাকলব্ধ পদার্থ সঞ্চিত রাখে।
4. গলগি বস্তু	4. পরিবহণের জন্যে কোষমধ্যস্থ বিবিধ পদার্থ একত্র ক'রে রসক্ষরণে সাহায্য করে। গলগি বস্তু লিপিড ও প্রোটিন সঞ্চয় করে। মাইটোকনড্রিয়া-কে ATP উৎপাদন করতে উদ্বুদ্ধ করে। শুক্রাণুর উপর আচ্ছাদন গঠন করতে সাহায্য করে।
5. সেন্ট্রোজোম (প্রাণীতে)	5. বেমতন্তু ও সিলিয়া গঠন করে।
6. প্লাসটিড (উদ্ভিদে)	6. ক্লোরোপ্লাস্ট সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার আধার। ক্রোমোপ্লাস্ট সবুজ রং ছাড়া অন্য রং প্রদান করে। স্টার্চ, রঙ্গক ও অন্যান্য কোষীয় পদার্থকে সঞ্চয় করে।
7. এণ্ডোপ্লাজমীয় জালক	7. বিভিন্ন পদার্থ পরিবহণ ও প্রোটিন সংশ্লেষে অংশ গ্রহণ করে।
8. রাইবোজোম	8. প্রোটিন সংশ্লেষ ও ফ্যাট বিপাকে সাহায্য করে।
9. লাইসোজোম	9. প্রোটিন, ফ্যাট প্রভৃতি পরিপাকে পরিপাক-এনজাইম হিসাবে সহায়তা করে।
10. নিউক্লিয়স	10.
(i) নিউক্লীয় পর্দা	(i) নিউক্লিয়স ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে স্বাতন্ত্র বজায় রাখে এবং এদের মধ্যে পদার্থ আদান-প্রদানে সাহায্য করে।
(ii) নিউক্লিওপ্লাজম	(ii) DNA এবং সংবাদ সরবরাহক অণু ধারণ করে।
(iii) নিউক্লীয় জালক	(iii) ক্রোমোজোম গঠন করে।
(iv) নিউক্লিওলস	(iv) সঠিক কাজের হদিস পাওয়া যায়নি। তবে অনেকে মনে করেন এটি রাইবোজোম উৎপাদন করতে পারে।

5.30. কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য [*Some important differences*] :

(1) কোষ-পর্দা ও কোষ-প্রাকারের পার্থক্য ঃ

কোষ-পর্দা (Cell membrane)	কোষ-প্রাকার (Cell wall)
(1) কোষ-পর্দা সজীব কোষের প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে রাখে।	(1) কেবল উন্নত উদ্ভিদ কোষের কোষ-পর্দার বাইরে কোষ-প্রাকার থাকে।

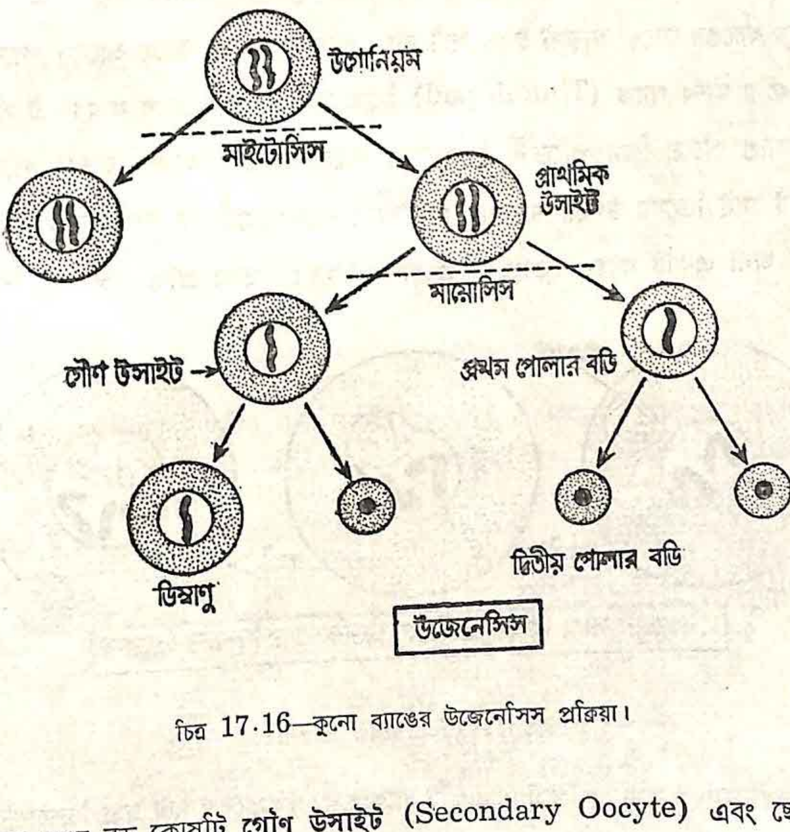
(a) **স্পার্মাটোজেনেসিস** (Spermatogenesis) ঃ এই প্রক্রিয়ায় শুক্রাশয়ে (Testis) অবস্থিত **স্পার্মাটোগোনিয়া** (Spermatogonia) বা **প্রাথমিক জার্ম** কোষ থেকে শুক্রাণু গঠিত হয়। প্রথমে স্পার্মাটোগোনিয়ায় মাইটোসিস বিভাজন ঘটে যার ফলে **মুখ্য বা প্রাথমিক স্পার্মাটোসাইট** (Primary spermatocyte) গঠিত হয়। মুখ্য স্পার্মাটোসাইটের প্রতিটি কোষ ডিপ্লয়েড (2n) ; অর্থাৎ সেখানে 2n সংখ্যক ক্রোমোজোম বর্তমান।



চিত্র 17·15—ব্যাঙের স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়া।

পরিণত প্রতিটি মুখ্য স্পার্মাটোসাইট পরপর দু'বার দ্রুত বিভাজিত হয়। **প্রথম বিভাজনটি মায়োসিস** (Meiosis) বা **হ্রাসকরণ বিভাজন**। এর ফলে প্রথমে দু'টি **গৌণ স্পার্মাটোসাইট** (Secondary Spermatocyte) উৎপন্ন হয় এবং মায়োসিস বিভাজনের ফল স্বরূপ প্রতিটি অপত্য কোষে n-সংখ্যক ক্রোমোজোম আসে, অর্থাৎ প্রতিটি কোষ হ্যাপ্লয়েড (n)। এরপর প্রতিটি গৌণ স্পার্মাটোসাইটে মাইটোসিস (মায়োসিসের দ্বিতীয় বিভাজন) ঘটে, যার ফলে দুটি গৌণ স্পার্মাটোসাইট থেকে মোট চারটি **স্পার্মাটিড** (Spermatid) উৎপন্ন হয়। স্পার্মাটিডগুলি ক্রমশঃ রূপান্তরিত হ'য়ে **শুক্রাণু** (Sperm) গঠন করে।

(b) **উজেনেসিস** (Oogenesis) ঃ এই প্রক্রিয়ায় ডিম্বাশয়স্থ (Ovary) উগোনিয়া (Oogonia) নামক প্রাথমিক জার্ম কোষ থেকে ডিম্বাণু গঠিত হয়। মাইটোসিস বিভাজনের ফলে উগোনিয়া থেকে **প্রাথমিক উসাইট** (Primary Oocyte) সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক স্পার্মাটোসাইটের মতো প্রাথমিক উসাইটও ডিপ্লয়েড (2n) এবং এখানেও প্রথম বিভাজনটি মায়োসিস বা হ্রাসকরণ বিভাজন। হ্রাসকরণ বিভাজনের ফলে দুটি অসম আকৃতির হ্যাপ্লয়েড (n) কোষ গঠিত হয়,



চিত্র 17·16—কুনো ব্যাঙের উজেনেসিস প্রক্রিয়া।

এদের মধ্যে বড় কোষটি **গৌণ উসাইট** (Secondary Oocyte) এবং ছোটটি **প্রথম পোলার বডি** (First polar body)। পরবর্তী বিভাজন (অর্থাৎ মায়োসিসের দ্বিতীয় বিভাজন)-এর ফলে এবারও একটি বড় এবং একটি ছোট কোষ গঠিত হয়। বড়টি **ডিম্বাণু** বা **ওভাম** (Ovum) এবং ছোটটি **গৌণ বা দ্বিতীয় পোলার বডি** (Secondary polar body)।

কোষ-পর্দা (Cell membrane)	কোষ-প্রাকার (Cell wall)
(2) এটি কোষের সজীব অংশ।	(2) এটি কোষের নির্জীব অংশ।
(3) প্রোটোপ্লাজমের অংশ।	(3) প্রোটোপ্লাজমের ক্ষরণজাত পদার্থ।
(4) সূক্ষ্ম ও নমনীয়।	(4) স্থূল ও দৃঢ়।
(5) অর্ধভেদ্য।	(5) ভেদ্য।
(6) বিভিন্ন পদার্থ আত্মসাৎ করতে সক্ষম।	(6) এই কাজে অপারগ।
(7) অলংকরণ মুক্ত।	(7) অলংকরণ যুক্ত।

(2) মাইটোকনড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টের পার্থক্য ঃ

মাইটোকনড্রিয়া (Mitochondria)	ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast)
(1) প্রতিটি ইউক্যারিওটিক কোষে বর্তমান।	(1) উদ্ভিদের কেবল সবুজ কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট বর্তমান।
(2) এর অন্তঃপর্দা বহু ভাঁজযুক্ত।	(2) অন্তঃপর্দায় কোন ভাঁজ নাই।
(3) অন্তঃপর্দায় অক্সিজোম (Oxysome) নামক দানা বর্তমান।	(3) এই দানা অবর্তমান।
(4) এর ধাত্র ক্রিস্টি নামক পর্দা দ্বারা অসম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত।	(4) এর ধাত্র কোন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত নয়।
(5) ধাত্রে চাকতি বা থলির মতো বস্তু নাই।	(5) ধাত্রে চাকতি বা থলির মতো বস্তু (থাইলাকয়েড) বর্তমান।
(6) শ্বসনের সংগে সক্রিয়ভাবে যুক্ত।	(6) শ্বসনের সংগে সক্রিয়ভাবে যুক্ত নয়।
(7) সালোকসংশ্লেষের সংগে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়।	(7) সালোকসংশ্লেষের সংগে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।
(8) স্থৈতিক শক্তিকে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে।	(8) আলোকশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে।

(3) ক্লোরোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট ও লিউকোপ্লাস্টের পার্থক্য ঃ

ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast)	ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast)	লিউক্লোপ্লাস্ট (Leucoplast)
(1) এটি সবুজ রং-এর প্লাসটিড।	(1) এটি সবুজ ভিন্ন অন্য রং-এর প্লাসটিড।	(1) এটি বর্ণহীন প্লাসটিড।

ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast)	ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast)	লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast)
(2) সালোকসংশ্লেষে অংশ নেয়।	(2) পরাগযোগে এবং বীজ ও ফল বিস্তারে সাহায্য করে।	(2) খাদ্য সঞ্চয়ে সহায়তা করে।
(3) এর প্রধান রঙ্গক ক্লোরোফিল। অল্প মাত্রায় ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল থাকে।	(3) প্রধান রঙ্গক ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল। ক্লোরোফিল নাই।	(3) এতে কোন রঙ্গকই নাই।
(4) থাইলাকয়েড বর্তমান।	(4) থাইলাকয়েড নাই।	(4) থাইলাকয়েড নাই।

(4) **গলগি বস্তু ও এন্ডোপ্লাজমীয় জালকের পার্থক্য ঃ**

গলগি বস্তু (Golgi bodies)	এন্ডোপ্লাজমীয় জালক (Endoplasmic reticulum)
(1) নিউক্লিয়সের সন্নিকটে অবস্থিত।	(1) কোষপর্দা থেকে নিউক্লীয় পর্দা পর্যন্ত বিস্তৃত।
(2) এরা ঘনসন্নিবিষ্ট এবং স্থরীভূত থাকে।	(2) এরা পরস্পর যুক্ত জালকাকারে থাকে।
(3) এতে রাইবোজোম দানা থাকে না।	(3) এর গায়ে রাইবোজোম দানা থাকে।
(4) গহ্বর বর্তমান।	(4) গহ্বর নাই।
(5) গহ্বরে খাদ্য সঞ্চিত থাকে।	(5) ঐভাবে খাদ্য সঞ্চিত থাকে না।
(6) সাইটোপ্লাজম কাঠামো তৈরী করতে অংশ নেয় না।	(6) সাইটোপ্লাজম কাঠামো তৈরী করতে অংশ নেয়।

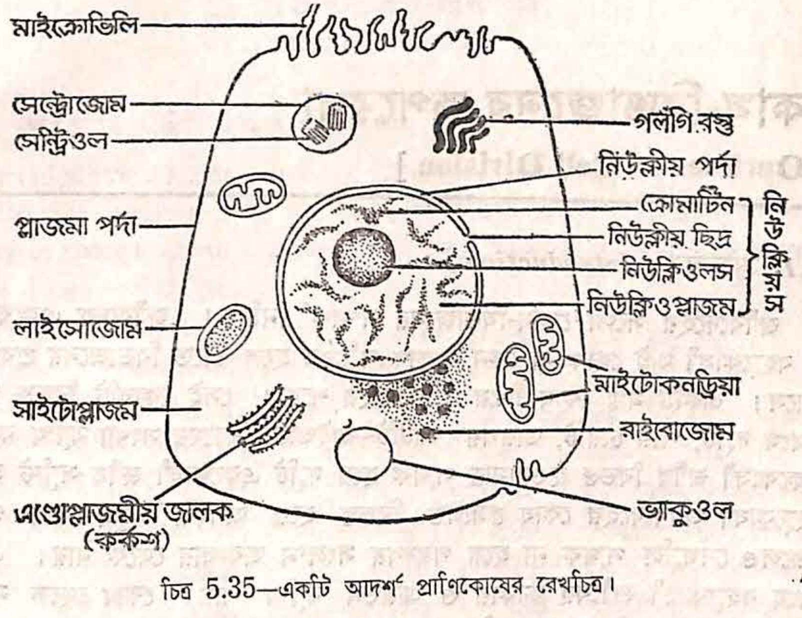
(5) **রাইবোজোম ও লাইসোজোমের পার্থক্য ঃ**

রাইবোজোম (Ribosome)	লাইসোজোম (Lysosome)
(1) সমস্ত জীবকোষে বর্তমান।	(1) কেবল প্রাণিকোষে বর্তমান।
(2) নিরেট দানার মতো অঙ্গাণু।	(2) তরল পদার্থপূর্ণ থলির মতো অঙ্গাণু।
(3) এরা পর্দায় ঘেরা থাকে।	(3) এরা পর্দায় ঘেরা থাকে না।
(4) গহ্বর বা তরল পদার্থপূর্ণ নয়।	(4) গহ্বর বা তরল পদার্থপূর্ণ।

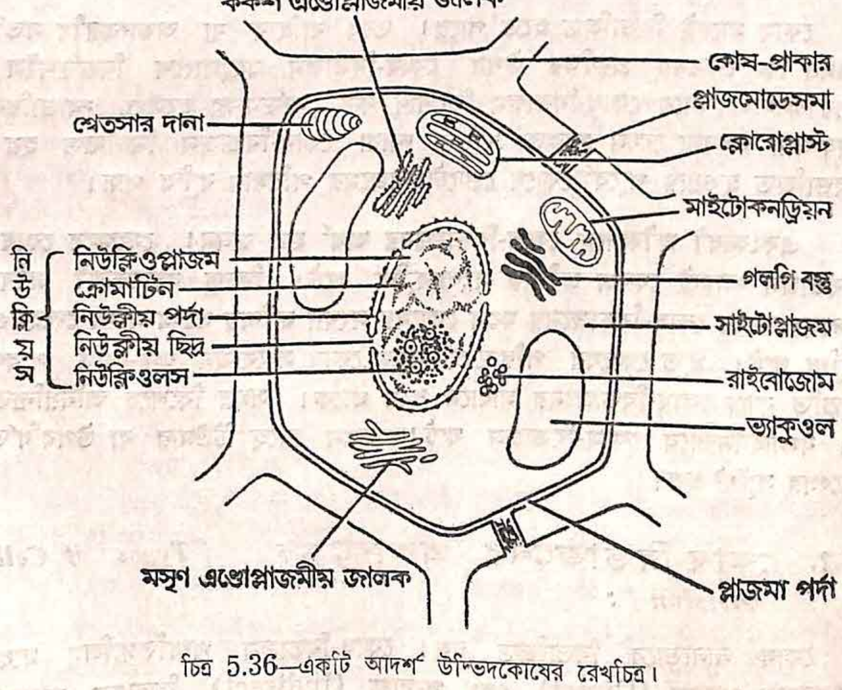
রাইবোজোম (Ribosome)	লাইসোজোম (Lysosome)
(5) কোন কোন সময় একত্রে পলিরাই-বোজোম গঠন করে।	(5) সর্বদা পৃথক থাকে।
(6) এতে RNA থাকে।	(6) এতে RNA থাকে না।
(7) প্রোটিন সংশ্লেষে অংশ নেয়।	(7) অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় পরিপাকে অংশ নেয়।

(6) **সেন্ট্রোজোম ও সেন্ট্রোমিয়ারের পার্থক্য ঃ**

সেন্ট্রোজোম (Centrosome)	সেন্ট্রোমিয়ার (Centromere)
(1) প্রাণিকোষে বর্তমান।	(1) উদ্ভিদ ও প্রাণী—উভয় কোষেই বর্তমান।
(2) এটি সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু।	(2) এটি নিউক্লীয় বস্তু।
(3) এটি নিউক্লিয়াসের নিকটে অবস্থিত।	(3) নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ ক্রোমোজোমে অবস্থিত।
(4) সেন্ট্রোস্ফিয়ার ও সেন্ট্রিওল দ্বারা গঠিত।	(4) ক্রোমোমিয়ার ও ক্রোমাটিন তন্তু দ্বারা গঠিত।
(5) বেম গঠনে অংশ গ্রহণ করে।	(5) বেম গঠনে অংশ গ্রহণ করে না, তবে বেমের সঙ্গে যুক্ত থাকে।
(6) এটি RNA ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত।	(6) DNA ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত।



চিত্র 5.35—একটি আদর্শ প্রাণিকোষের রেখচিত্র।



চিত্র 5.36—একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষের রেখচিত্র।

কোষ-বিভাজনের রূপরেখা 6
[Outlines of Cell Division]

6.1. সূচনা *[Introduction] :*

জীবদেহের সঙ্গে কোষ-বিভাজনের সম্পর্ক নিবিড়। জীবদেহ এককোষী বা বহুকোষী যাই হোক না কেন, কোষ পরিণত হলে তাতে বিভাজনের প্রবণতা আসে। একটি মাত্র কোষ দিয়ে জীবদেহের শুরু। সেই কোষটি বিভক্ত হয়ে প্রথমে দুটি, পরে চারটি, তারপর আটটি—এইভাবে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এককোষী জীব বিভক্ত হওয়ামাত্র পৃথক হয়ে দুটি এককোষী জীব সৃষ্টি হয়। বহুকোষী জীবদেহের কোষ ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে অসংখ্য নতুন কোষ গঠন করলেও সেগুলি পৃথক না হয়ে পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় থেকে যায়। এই-ভাবে বহুকোষী জীবের আকার ও আয়তন বৃদ্ধি পায়। **কোষ থেকে নতুন কোষ-সৃষ্টির পদ্ধতিকে কোষ-বিভাজন বলে।**

কোষ মাত্রেই বিভাজিত হতে পারে। তবে বাহ্যিক বা **অভ্যন্তরীণ সর্ত, এমন কি কোষের প্রকৃতির উপর কোষ-বিভাজন বহুলাংশে নির্ভরশীল।** পরীক্ষামূলকভাবে কোষ-বিভাজন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হলেও, স্বাভাবিক অবস্থায় অজানা কোন প্রাকৃত শক্তির দ্বারা কোষ-বিভাজন নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভাজিত হওয়ার পূর্বে কোষে প্রোটোপ্লাজমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

এককোষী জীবদেহে কোষ-বিভাজনের অর্থ হল জনন। সেক্ষেত্রে কোষ-বিভাজন দ্বারাই কেবল জীবের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু বহুকোষী জীব-দেহের ক্ষেত্রে কোষ-বিভাজনের ফলে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও বৃদ্ধি ঘটে। মৃত কোষের পরিবর্তে নতুন কোষ সংযোজন, ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ প্রভৃতি কাজ কোষ-বিভাজনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সময় বিশেষে অনিয়ন্ত্রিত ও বল্গাহীনভাবে কোষ-বিভাজন ঘটে। তখন দেহে টিউমার বা উপবর্ধিত অঙ্গের সৃষ্টি হয়।

6.2. কোষ-বিভাজনের প্রকারভেদ *[Types of Cell Division] :*

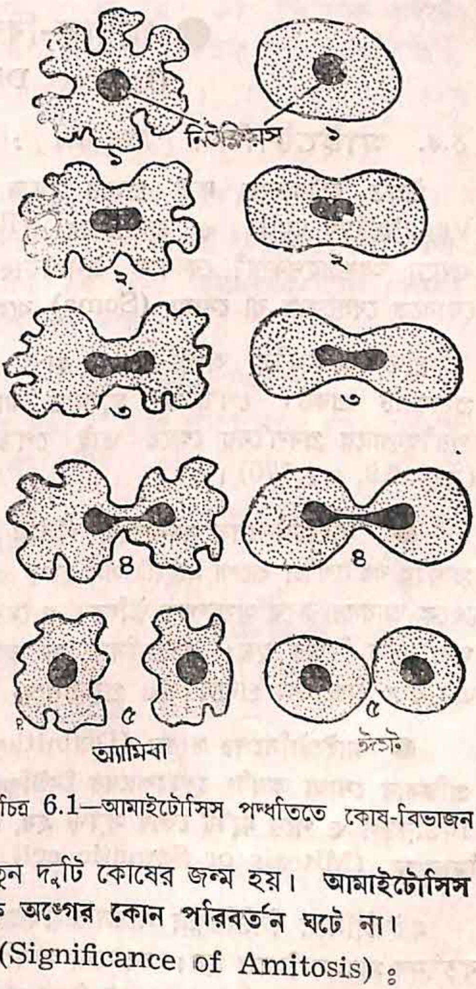
কোষ নানাভাবে বিভাজিত হয়। কোষ-বিভাজন পদ্ধতিগুলির মধ্যে কেবলমাত্র **প্রত্যক্ষ** (Direct) এবং **পরোক্ষ** (Indirect) বিভাজন সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হল।

● প্রত্যক্ষ-বিভাজন ●
(Direct Division)

6.3. আমাইটোসিস [*Amitosis*] :

আমাইটোসিস প্রত্যক্ষ বিভাজন প্রক্রিয়া। একে **খণ্ডকরণ** (Fragmentation) বিভাজনও বলা হয়। এই পদ্ধতিতে কোষের নিউক্লিয়স ক্রমশঃ ডাম্বেল বা ডম্বরুর আকার ধারণ করে এবং শেষে সমান বা অসমান দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়। নিউক্লিয়স বিভাজনকে অনুসরণ ক'রে কোষের সাইটোপ্লাজমে খাদের সৃষ্টি হয়। খাদ ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীর-তর হয় এবং শেষে সাইটো-প্লাজমকে দুটি খণ্ডে বিভক্ত করে।

অ্যামিবা, ঈস্ট (চিত্র 6.1) প্রভৃতির কোষ সচরাচর এই পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়। তবে **র‍্যাঁভিয়ে** (Ranvier), **আরনল্ড** (Arnold) প্রভৃতি বিজ্ঞানী-গণ অনেক আগেই রক্তের **শ্বেতকণিকায়** (Leucocytes) আমাইটোসিস প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করেন। প্রতি ক্ষেত্রেই নিউক্লিয়স লম্বা ডাম্বেলাকৃতি লাভ করে এবং দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কোষের বাকী অংশও অনুরূপভাবে দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়। এইভাবে নতুন দুটি কোষের জন্ম হয়। **আমাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ক্রোমোজোম বা আনুষঙ্গিক অঙ্গের কোন পরিবর্তন ঘটে না।**



চিত্র 6.1—আমাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষ-বিভাজন।

● **আমাইটোসিসের তাৎপর্য** (Significance of Amitosis) :

আমাইটোসিস পদ্ধতিকে এক সময় আদিম কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়া বলে মনে করা হ'ত। বিজ্ঞানী **স্ট্র্যাসবারগার** (Strasburger—1892 খ্রীষ্টাব্দ)-এর মতে আমাইটোসিস প্রক্রিয়া থেকেই উন্নত পর্যায়ের কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়া

(iii) **স্ট্রোফিওল** (Strophiole) ঃ বীজের মাঝ বরাবর লম্বা দাগটিকে **স্ট্রোফিওল** (Strophiole) বলে। এটি ডিম্বকনাভির উপবৃদ্ধি।

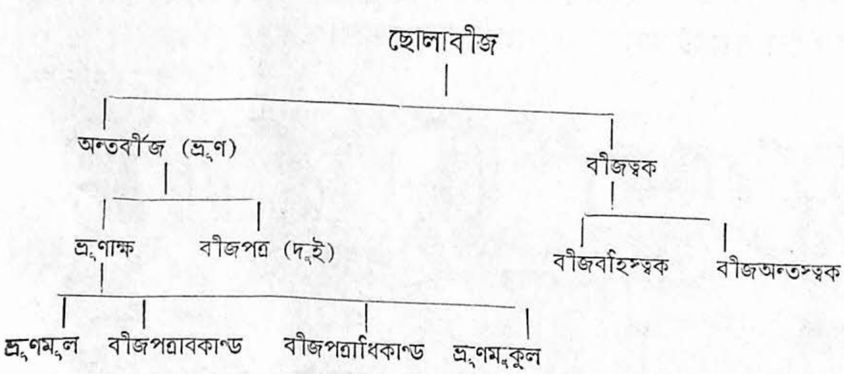
(b) **অন্তর্বীজ** বা **কারনেল** (Kernel) ঃ বীজত্বক অপসারণ করলে **অন্তর্বীজ** (Kernel) দেখা যায়। বীজত্বকের ভিতরে অবস্থিত বীজের বাকি অংশকে সামগ্রিকভাবে অন্তর্বীজ বলে। দ্বিবীজপত্রী বীজে অন্তর্বীজটিই **ভ্রূণ** (Embryo)।

(i) **ভ্রূণ** (Embryo) ঃ ভ্রূণ দুটি **বীজপত্র** (Cotyledons) ও একটি দণ্ডাকার **ভ্রূণাক্ষ** (Axis) নিয়ে গঠিত।

(ii) **ভ্রূণাক্ষ** (Embryonal axis) বা **টাইগেলম** (Tigellum) ঃ ভ্রূণাক্ষের শীর্ষদেশটি **ভ্রূণমুকুল** (Plumule) এবং বিপরীত প্রান্তটি **ভ্রূণমূল** (Radicle)। বীজপত্র ভ্রূণাক্ষের সঙ্গে যেখানে সংলগ্ন থাকে, তার উপরের ও নীচের অংশ দুটি যথাক্রমে **বীজপত্রাধিকাণ্ড** বা **এপিকোটিল** (Epicotyl) ও **বীজপত্রাবকাণ্ড** বা **হাইপোকোটিল** (Hypocotyl)।

(iii) **বীজপত্র** বা **কটিলেডন** (Cotyledons) ঃ ছোলার বীজপত্র দুটিতে খাদ্য সঞ্চিত থাকে বলে বীজপত্রকে স্থূল দেখায়। বীজপত্র অর্ধবৃত্তাকার, হাল্কা পীতাভ। অঙ্কুরোদ্গমের সময় বীজপত্রই শিশু উদ্ভিদকে খাদ্য সরবরাহ করে।

নীচের ছকে ছোলাবীজের গঠন দেখান হল ঃ



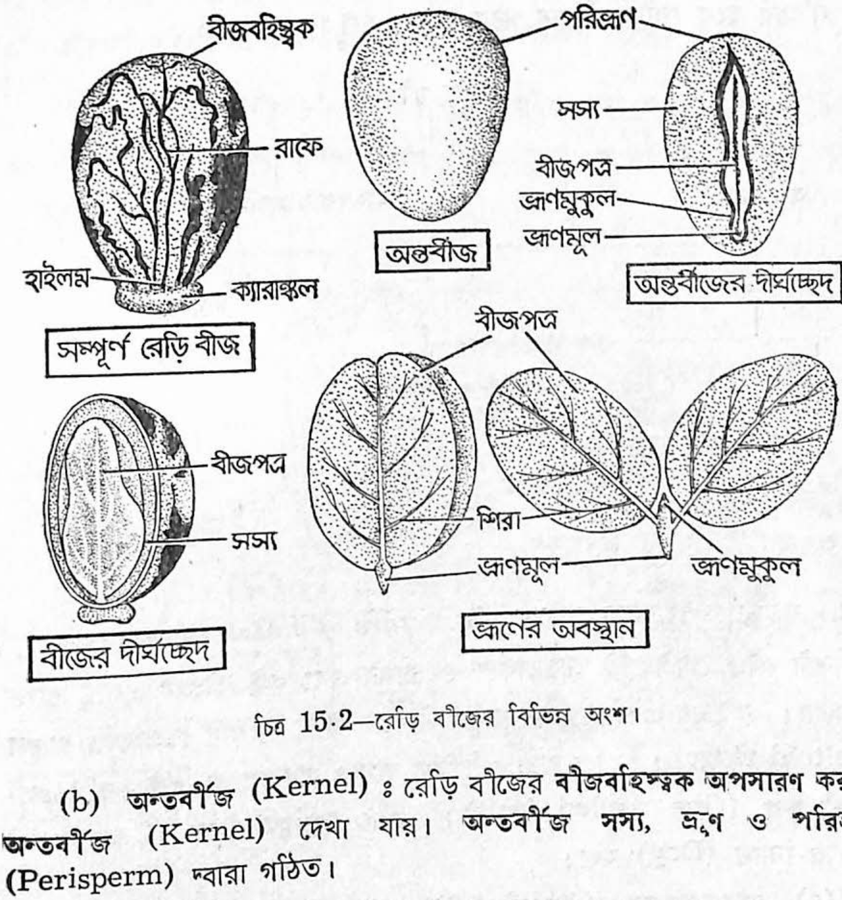
15.3. রেড়ি বীজের গঠন [*Structure of a Castor seed*] :

রেড়ি একটি দ্বিবীজপত্রী সস্যল বীজ (Dicotyledonous albuminous seed) ঃ বীজটি ডিম্বাকার এবং চ্যাপ্টা।

(a) **বীজত্বক** (Seed coat) ঃ এই বীজে অন্তস্ত্বক নাই, কেবল বহিস্ত্বক আছে। বীজ বহিস্ত্বক কঠিন, ভঙ্গুর ও খোলকাকার। বহিস্ত্বকের উপরে আছে

কাল বা বাদামী এবং সাদা রং-এর কারুকার্য। **ডিম্বকনাভিচিহ্ন** (Hilum) ও **ডিম্বকরন্ধ্র** (Micropyle) বীজের সরু অংশে কাছাকাছি অবস্থিত।

ডিম্বকনাভিচিহ্ন থেকে উৎপন্ন স্পঞ্জের মতো বিশেষ অংশটিকে **ক্যারাঙ্কল** (Caruncle) বলে। ক্যারাঙ্কলে ঢাকা থাকার জন্য ডিম্বকরন্ধ্রকে বাইরে থেকে দেখা যায় না। বহিস্ত্বকের লম্বা দাগটিকে **রাফে** (Raphe) বলে।



চিত্র 15·2—রেড়ি বীজের বিভিন্ন অংশ।

(b) **অন্তর্বীজ** (Kernel) ঃ রেড়ি বীজের **বীজবহিস্ত্বক অপসারণ করলে অন্তর্বীজ** (Kernel) দেখা যায়। **অন্তর্বীজ সস্য, ভ্রূণ ও পরিভ্রূণ** (**Perisperm**) দ্বারা গঠিত।

(i) **সস্য** (Endosperm) ঃ পরিভ্রূণ দ্বারা আবৃত সাদা পুরু অংশকে সস্য বলে। সস্য ভ্রূণকে পুরোপুরি আবৃত রাখে।

(ii) **ভ্রূণ** (Embryo) ঃ **দুটি বীজপত্র ও একটি ভ্রূণাক্ষ** দ্বারা ভ্রূণ গঠিত।

বীজপত্র (Cotyledon) ঃ বীজপত্রের রঙ ফিকে হলুদ বর্ণের। বীজপত্রে পাতলা এবং তাতে সুস্পষ্ট শিরা-উপশিরা বর্তমান।

ভ্রূণাক্ষ (Tigellum) ঃ ভ্রূণাক্ষের ঊর্ধ্বগামী অগ্রভাগটি **ভ্রূণমুকুল** এবং নীচের অগ্রভাগটি **ভ্রূণমূল**। ভ্রূণাক্ষ ও বীজপত্রের সংযোগস্থল থেকে উপরের ও নীচের

(যেমন—মাইটোসিস)-র সূত্রপাত হয়েছে। আমাইটোসিস প্রক্রিয়াটি উন্নত জটিলদেহী জীবের ক্ষেত্রে বিরল হলেও, উপযুক্ত সময়ে বিশেষ প্রক্রিয়া হিসাবে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকর।

ক্ষয়িষ্ণু জীবনীশক্তি-সম্পন্ন কোষে প্রায়ই আমাইটোসিস হয়। সময়মতো আমাইটোসিস-পদ্ধতি অনুসৃত না হলে, ঐ কোষগুলি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় না। কোন কোন এককোষী প্রাণীর সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যাপারে আমাইটোসিস প্রক্রিয়া খুবই ফলপ্রসূ।

● পরোক্ষ-বিভাজন ●
(Indirect Division)

6.4. মাইটোসিস [*Mitosis*] :

উন্নত জীবদেহে দুই প্রকার কোষ আছে—**দেহকোষ** (Somatic or Vegetative cell) ও **জননকোষ** (Reproductive or Germ cell)। জননে অংশগ্রহণকারী কোষকে জননকোষ এবং দেহ-গঠনে অংশগ্রহণকারী কোষকে দেহকোষ বা **সোমা** (Soma) বলে।

দ্রুত বর্ধনশীল অঙ্গ—যেমন কাণ্ড বা মূলের অগ্রভাগে মাইটোসিস-প্রক্রিয়াটি প্রকট। পেঁয়াজের মূলাগ্রে মাইটোসিস-প্রক্রিয়া সহজে দেখা যায়। পরীক্ষাগারে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাই পেঁয়াজের মূলকে বেছে নেওয়া হয় (চিত্র—6.9, পৃঃ 170)।

● **মাইটোসিসের ঘটনাস্থল** (Site of Mitosis) ঃ সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্ধনশীল অঙ্গে মাইটোসিস হয়। এককোষী শেওলা অথবা প্রোটোজোয়া থেকে আরম্ভ ক'রে সপুষ্পক উদ্ভিদ ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহকোষ মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়। মায়োসিস বা হ্রাসকরণ বিভাজনের দ্বিতীয় দফায় অনুসৃত বিভাজন প্রণালীটিও প্রকৃতপক্ষে মাইটোসিস।

● **মাইটোসিসের সংজ্ঞা** (Definition of Mitosis) ঃ **যে বিশেষ জটিল প্রক্রিয়ায় সোমা অর্থাৎ দেহকোষের নিউক্লিয়াস বিভক্ত হয়ে প্রথমে দু'টি নতুন নিউক্লিয়াস ও পরে দু'টি কোষ সৃষ্টি হয়, তাকে মাইটোসিস বা সোমাটিক কোষ বিভাজন** (Mitosis or Somatic cell division) **বলে।**

মাইটোসিসে নিউক্লিয়াস সরাসরি বিভক্ত না হ'য়ে ধারাবাহিক জটিল পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভক্ত হয়। সেজন্যে পদ্ধতিটিকে **পরোক্ষ বিভাজন** (Indirect division) বলা হয়। আবার এই বিভাজনের ফলে সম আকৃতির ও সম সংখ্যক ক্রোমোজোমসহ দু'টি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয় বলে মাইটোসিস **সমবিভাজন** (Equational division) নামেও পরিচিত।

6.5. উদ্ভিদ কোষে মাইটোসিস পদ্ধতি * [*Mitotic Process in Plant Cells*] :

মাইটোসিস পদ্ধতিটি অত্যন্ত জটিল। বোঝার সুবিধার জন্যে প্রক্রিয়াটিকে দুটি **পৃথক** ও **স্বয়ংসম্পূর্ণ** পর্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে কেবল কোষের নিউক্লিয়সটিই বিভক্ত হয়। কোষের নিউক্লিয়স বিভাজনকে **ক্যারিওকাইনেসিস**† বলে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে, কেবল **এই পর্যায়টিই হ'ল মাইটোসিস।** দ্বিতীয় পর্যায়ে কোষের সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয়। এই পর্যায়কে **সাইটোকাইনেসিস** বলে। নীচে উদ্ভিদ কোষে মাইটোসিস প্রক্রিয়ার বর্ণনা করা হ'ল :

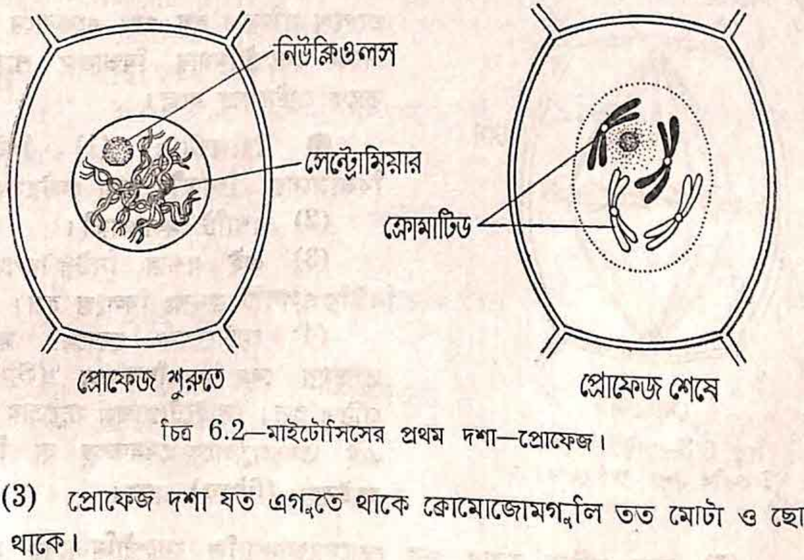
(A) ক্যারিওকাইনেসিস (Karyokinesis) : কোষের নিউক্লিয়স নিম্নলিখিত **চারটি দশায়** বিভক্ত হয়।

1. প্রোফেজ (Prophase, *Pro = before,* পূর্বে) :

● **সংজ্ঞা : বিভাজনের যে দশায় নিউক্লিওলস ও নিউক্লীয় পর্দার অবলুপ্তি শুরু হয়, ক্রোমাটিড কুণ্ডলিত হয় এবং ক্রোমোজোমগুলি কোষের সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে থাকে তাকে প্রোফেজ বলে।**

● **বৈশিষ্ট্য** : (1) এটি নিউক্লিয়স বিভাজনের প্রথম দশা।

(2) এই সময় ক্রোমোজোমগুলি সরু সুতোর মতো লম্বা হয়, সেজন্য নিউক্লিয়সটিকে সুতোর গোলা বলে মনে হয়।



চিত্র 6.2—মাইটোসিসের প্রথম দশা—প্রোফেজ।

(3) প্রোফেজ দশা যত এগুতে থাকে ক্রোমোজোমগুলি তত মোটা ও ছোট হ'তে থাকে।

* 1878 খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী ওয়ালটার ফ্লেমিং (W. Flemming) মাইটোসিস পদ্ধতির বর্ণনা দেন।

† স্লাইচার (Scleicher) কোষের নিউক্লিয়স বিভাজনকে ক্যারিওকাইনেসিস আখ্যা দেন।

(4) তারপর **প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বি ভাগ হ'য়ে দু'টি করে ক্রোমোটিড গঠন করে।**

(5) ক্রোমাটিডগুলি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন না হ'য়ে গিয়ে সেন্ট্রোমিয়ার অংশে পরস্পর যুক্ত থাকে।

(6) ক্রোমাটিডগুলি ক্রমশঃ স্প্রিং-এর মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে যায়। ফলে ক্রোমোজোমগুলি আকারে ছোট ও স্থূল হয়।

(7) ইতিমধ্যে নিউক্লিওলসটিও ক্রমশঃ ছোট হ'তে থাকে এবং পরবর্তী দশার শুরুতেই অবলুপ্ত হয়।

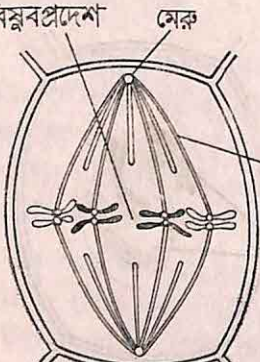
(8) এদিকে নিউক্লীয় পর্দার বিলুপ্তি শুরু হয় এবং ক্রোমোজোমগুলি কোষের কেন্দ্রে অবস্থান করে।

মেটাফেজের পূর্বে ছড়ানো ক্রোমোজোমগুলির সাইটোপ্লাজমীয় কেন্দ্রে একত্রিত হওয়ার পদ্ধতিকে **মেটাকাইনেসিস** (Metakinesis) বলে।

● **স্থায়িত্ব ঃ** প্রোফেজ সর্বাপেক্ষা **দীর্ঘস্থায়ী দশা,** মাইটোসিস সম্পূর্ণ হতে মোট যে সময় লাগে তার প্রায় অর্ধেক এই দশায় ব্যয়িত হয়।

2. **মেটাফেজ** (Metaphase, *Meta* = between, মধ্যবর্তী) ঃ

● **সংজ্ঞা ঃ বিভাজনের যে দশায় ক্রোমোজোমগুলি সেন্ট্রোমিয়ারের সাহায্যে বেমতন্তুর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে কোষের বিষুব প্রদেশে সজ্জিত হয় এবং একেবারে শেষের দিকে সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজন শুরু হয় তাকে মেটাফেজ বলে।**



মেটাফেজ
চিত্র 6.3—মাইটোসিসের দ্বিতীয় দশা—মেটাফেজ।

● **বৈশিষ্ট্য ঃ** (1) **নিউক্লিয়স বিভাজনের দ্বিতীয় দশা মেটাফেজ।**

(2) দশাটি ক্ষণস্থায়ী।

(3) এই দশায় নিউক্লীয়পর্দা ও নিউক্লিওলসটি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়।

(4) মেটাফেজে কোষের মধ্যভাগে তন্তুময় **বেম** বা **স্পিণ্ডল** (Spindle) গঠিত হয়। সাইটোপ্লাজম সুতোয় গঠিত এই তন্তুগুলিকে **বেমতন্তু** বা **স্পিণ্ডল ফাইবার** (fibre) বলে।

(5) বেম গঠিত হবার পর ক্রোমোজোমগুলি সেন্ট্রোমিয়ারের সাহায্যে **বেমতন্তুর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে বিষুব প্রদেশে** (Equatorial region) সজ্জিত হয়। ঐ স্থানটিকে **মেটাফেজ প্লেট** (Metaphase plate) বলে। ঐ সময়

ক্রোমোজোমে সেণ্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের বিভিন্নতার জন্য ক্রোমোজোমগুলিকে 'V' 'L' 'I' ও T অক্ষরের মতো দেখায়।

(6) মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোমগুলিকে খুব স্পষ্ট দেখা যায়। সেজন্য **মেটাফেজ দশাতেই ক্রোমোজোমের সংখ্যা গণনা করা সহজ।**

(7) মেটাফেজের শেষ পর্যায়ে সেণ্ট্রোমিয়ার বিভাজনের সূত্রপাত হয়।

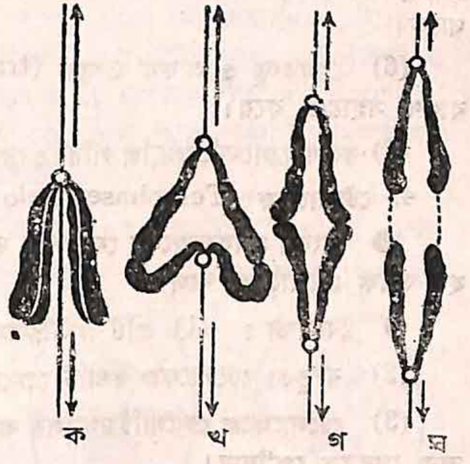
● **স্থায়িত্ব :** মেটাফেজ দশার স্থায়িত্ব সর্বাপেক্ষা কম।

3. **অ্যানাফেজ** (Anaphase, $Ana = back$, পশ্চাৎ) :

● **সংজ্ঞা : বিভাজনের যে দশায় সেণ্ট্রোমিয়ারের বিকর্ষণের ফলে বিষুব প্রান্ত থেকে ক্রোমাটিড-গুলির অর্ধেক এক মেরুর দিকে এবং অপর অর্ধেক অন্য মেরুর দিকে যাত্রা শুরু করে তাকে অ্যানাফেজ বলে।**

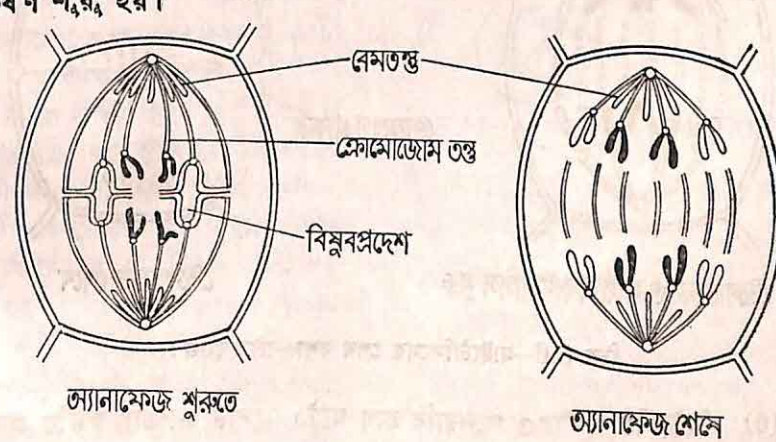
● **বৈশিষ্ট্য :** (1) এটি নিউ-ক্লিয়স বিভাজনের তৃতীয় দশা।

(2) এই দশায় **সেণ্ট্রোমিয়ার দু'ভাগে ভাগ হ'য়ে যায়।**



চিত্র 6.4—মেটাফেজ (ক) থেকে অ্যানাফেজে ক্রোমাটিডের চলন—প্রতিটি চিত্রের মধ্যেকার গোল চক্র সেণ্ট্রোমিয়ায় উপর-নীচে তীর-চিহ্নিত অংশ আকর্ষ তন্তু এবং কাল রং-এর অংশ অপত্য ক্রোমোজোম ; খ-ঘ—সেণ্ট্রোমিয়ারের অর্ধাংশ-সহ অপত্য ক্রোমোজোমগুলি দুই মেরুর দিকে যাত্রা শুরু করে।

(3) বিভক্ত অথচ পরস্পর সংলগ্ন **দু'টি সেণ্ট্রোমিয়ারের অর্ধাংশের মধ্যে বিকর্ষণ শুরু হয়।**



চিত্র 6.5—মাইটোসিসের তৃতীয় দশা—অ্যানাফেজ।

(4) ফলে ক্রোমাটিড দু'টি পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে দূরে দূই বিপরীত মেরুর দিকে যাত্রা শুরু করে।

(5) এইভাবে প্রতিটি ক্রোমোজোমের একটি ক্রোমোটিড (অপত্য ক্রোমোজোম) এক মেরুর দিকে এবং অন্য ক্রোমাটিড বিপরীত মেরুর দিকে সরে যেতে থাকে।

(6) বেমতন্তু ও আকর্ষ তন্তুর (tractile fibre) সংকোচনও এই কাজে যথেষ্ট সহায়তা করে।

(7) ক্রমশঃ ক্রোমোটিডগুলি পরিণত ক্রোমোজোমের আকার লাভ করতে থাকে।

4. **টেলোফেজ** (Telophase, *Telo* = *end*, শেষ) ঃ

● **সংজ্ঞা ঃ বিভাজনের যে দশায় দুটি নতুন অপত্য নিউক্লিয়স সংগঠিত হয় তাকে টেলোফেজ বলে।**

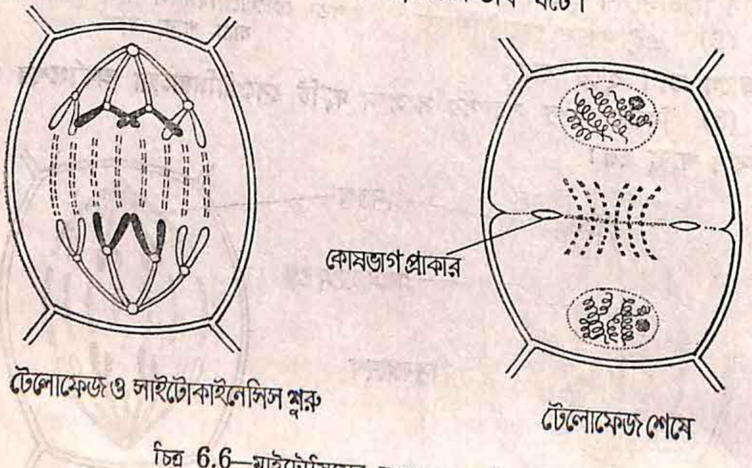
● **বৈশিষ্ট্য ঃ** (1) এটি নিউক্লিয়স বিভাজনের শেষ দশা।

(2) বস্তুতঃ টেলোফেজ দশাটি প্রোফেজ দশার প্রায় বিপরীত।

(3) **টেলোফেজে ক্রোমোটিডগুলির অর্ধেক এক মেরুতে এবং অপর অর্ধেক অন্য মেরুতে পেঁাছায়।**

(4) ইতিমধ্যে ক্রোমাটিডগুলি পূর্ণাঙ্গ ক্রোমোজোমের আকৃতি লাভ ক'রে ক্রমশঃ লম্বা হয় এবং শেষে পাকিয়ে যায়।

(5) এই দশাতেই নিউক্লিওলসের পুনরাবির্ভাব ঘটে।



চিত্র 6.6—মাইটোসিসের শেষ দশা—টেলোফেজ।

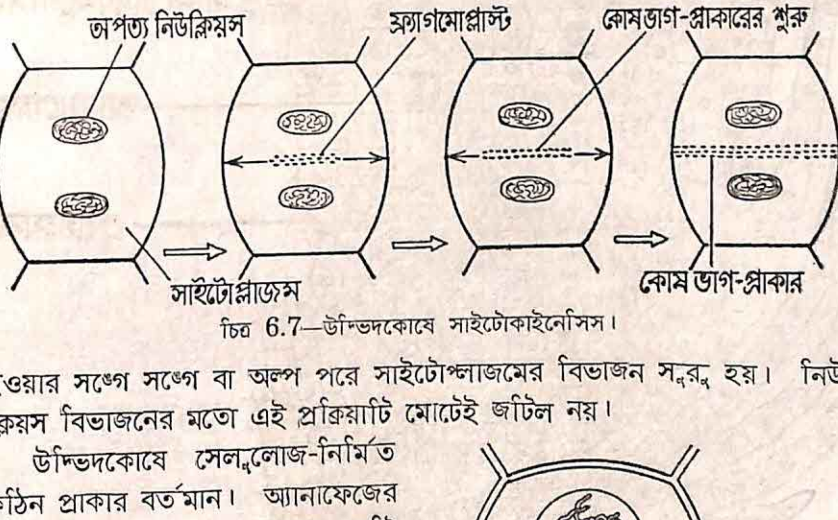
(6) নিউক্লীয় পর্দারও পুনরাবির্ভাব ঘটে। সেটি এণ্ডোপ্লাজমীয় জালক থেকে গঠিত হয়।

(7) ইতিমধ্যে বেমতন্তুর অবলুপ্তি ঘটে।
(8) টেলোফেজ দশার শেষে এইভাবে নতুন দুটি নিউক্লিয়স গঠিত হয়।

উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষ, এই উভয় ক্ষেত্রেই মাইটোসিস পদ্ধতি মূলতঃ এক। তবে প্রাণিকোষে অতিরিক্ত বিশিষ্ট অঙ্গ, **সেণ্ট্রোজোম** (Centrosome) থাকায় সেখানে নিউক্লিয়স বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে সেণ্ট্রোজোমেরও বিভাজন সুরু হয়। সেণ্ট্রোজোম সমান দুখণ্ডে বিভক্ত হয়ে নিউক্লিয়সের দুই বিপরীত প্রান্তে চলে যায়, সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম তন্তুর মতো **অ্যাস্টার রশ্মি** গঠিত হয়।

এই অ্যাস্টার রশ্মিগুলিই কেন্দ্রীয় বেম গঠন দ্বারা ক্রোমোজোমগুলিকে বিষুব প্রদেশে বিন্যস্ত থাকতে সাহায্য করে।

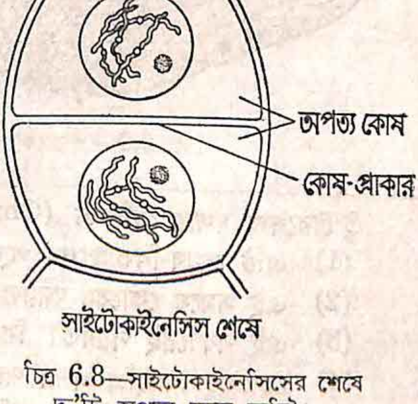
(B) **সাইটোকাইনেসিস** (Cytokinesis) ঃ ক্যারিওকাইনেসিস শেষ



চিত্র 6.7—উদ্ভিদকোষে সাইটোকাইনেসিস।

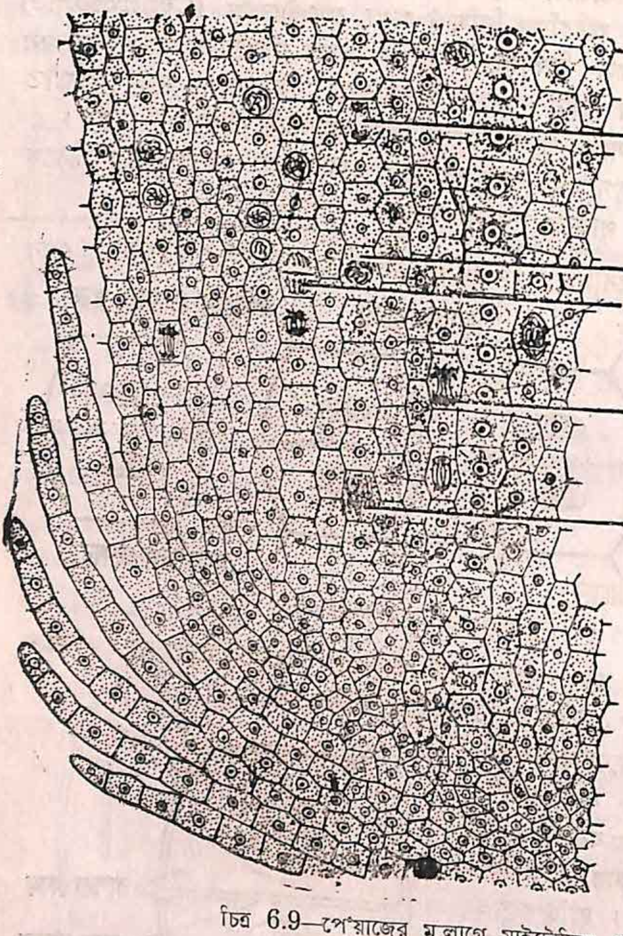
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা অল্প পরে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন সুরু হয়। নিউক্লিয়স বিভাজনের মতো এই প্রক্রিয়াটি মোটেই জটিল নয়।

উদ্ভিদকোষে সেলুলোজ-নির্মিত কঠিন প্রাকার বর্তমান। অ্যানাফেজের শেষ পর্যায়ে কোষের মাঝ-বরাবর একটি সরল **কোষভাগ-প্রাকার** (Cell plate)-এর উদ্ভব হয়। দুটি অপত্য নিউক্লিয়সকে দু'পাশে রেখে কোষের মাঝ-বরাবর ফ্র্যাগমোপ্লাস্ট (Phragmoplast) সেলুলোজ-কণা জমে এবং কোষভাগ-প্রাকার (Cell plate) গঠিত হয়। ইতিমধ্যে অপত্য নিউক্লিয়স দুটি পরিণত হয়। ক্রমশঃ কোষভাগ-প্রাকারের উভয় দিকে নতুন কোষ-প্রাকার গঠিত হয় এবং সাইটোপ্লাজমকে সম্পূর্ণভাবে দুটি পৃথক অংশে ভাগ করে দেয়। এইভাবে কোষ-



চিত্র 6.8—সাইটোকাইনেসিসের শেষে দু'টি অপত্য কোষ সৃষ্টি।

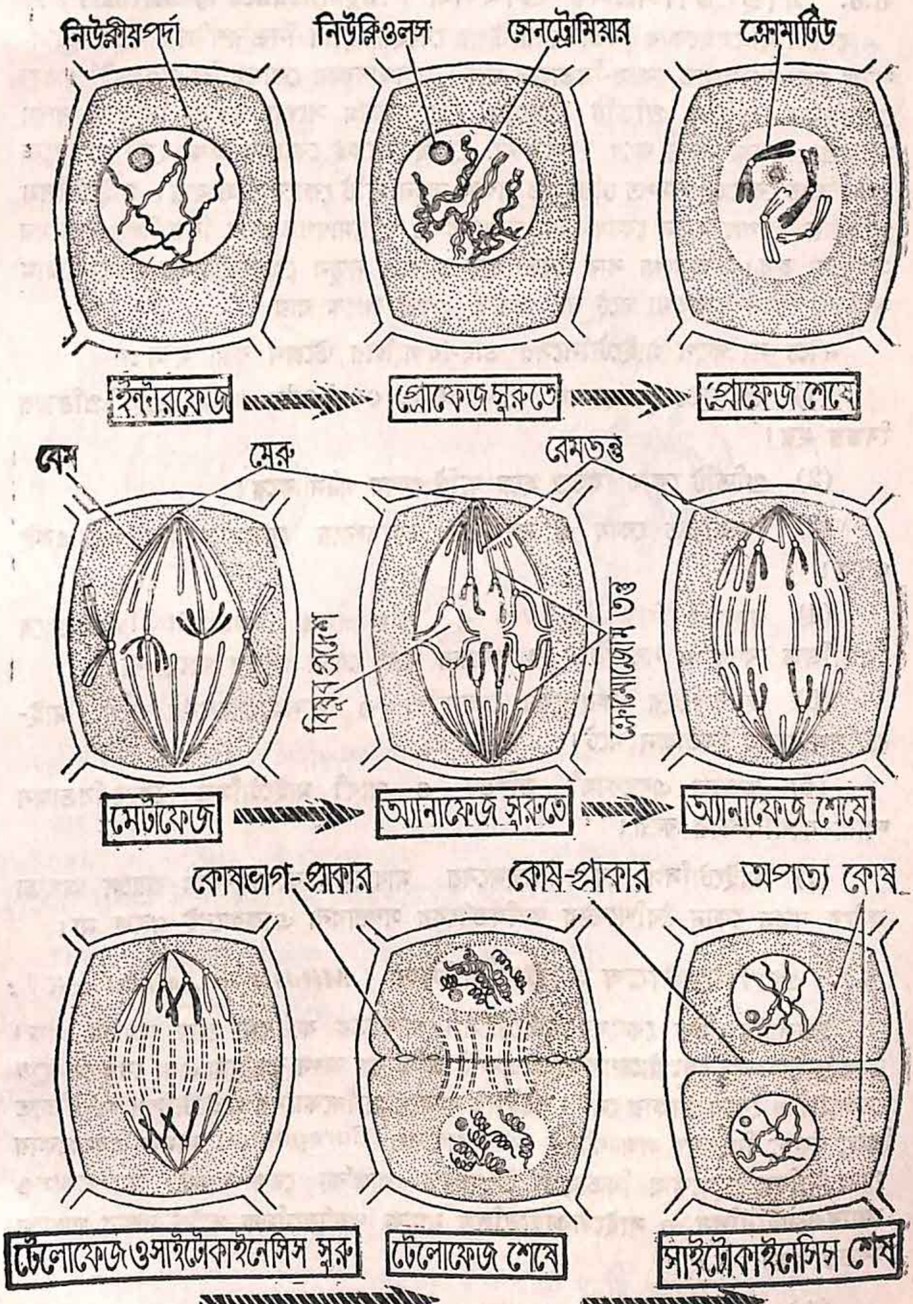
বিভাজন সমাপ্ত হয়। নতুন কোষ দুটি পরিণত হলে তাদের মধ্যেও বিভাজন প্রবণতা দেখা দেয়। বিভাজনোন্মুখ কোষকে **ইণ্টারফেজ কোষ** (Interphase cell) বলা হয়। এই দশায় কোষ বিভাজনের প্রস্তুতি পর্ব চলে।



চিত্র 6.9—পেঁয়াজের মূলাগ্রে মাইটোসিস প্রক্রিয়া।

ইণ্টারফেজ দশার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of interphase) :

(1) এটি কোষ-বিভাজনের পূর্বে কোষের প্রস্তুতিপর্ব।
(2) এই সময়ে কোষের আয়তন সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়।
(3) এই পর্যায়েই পরবর্তী বিভাজনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চিত হয়।
(4) ক্রোমোজোমগুলি লম্বা পাকানো ক্রোমাটিন তন্তুরূপে অবস্থান করে।
(5) এই সময় DNA সংশ্লেষিত হয়।
(6) এই পর্যায়ে ক্রোমোসেণ্টার সুস্পষ্ট হয়।



চিত্র 6.10—উদ্ভিদকোষে মাইটোসিস প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক চিত্ররূপ।

6.6. মাইটোসিসের তাৎপর্য [*Significance of Mitosis*] :

সোমা বা দেহকোষ বিভাজনের উপর দেহের বৃদ্ধি নির্ভরশীল। দ্রুত বর্ধনশীল অঙ্গে ক্রমাগত কোষ-বিভাজন ঘটে। সেখানকার কোষগুলি সহধর্মী হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রতিটি কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা সর্বদা নির্দিষ্ট থাকা দরকার। কোষ নতুন করে জন্মায় না, কোষ থেকেই কোষের জন্ম হয়। সেজন্যে বিভাজিত কোষের সমস্ত চরিত্রগত লক্ষণ নতুন দুটি কোষে চলে যায়। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন নতুন কোষগুলি **গুণগত ও পরিমাণগতভাবে** বিভাজিত কোষের সমতুল্য হয়। অসংখ্য বার বিভাজিত হলেও নতুন কোষগুলিতে ক্রোমোজোম সংখ্যার কোন তারতম্য ঘটে না, সর্বদা একই থেকে যায়।

নীচে সংক্ষেপে মাইটোসিসের তাৎপর্যগুলির উল্লেখ করা হ'ল :—

(1) প্রধানতঃ **দেহকোষ** (Somatic or body cell) এই প্রক্রিয়ায় **বিভক্ত হয়।**

(2) প্রতিটি কোষ বিভক্ত হয়ে **দুটি কোষ গঠন করে।**

(3) বিভাজিত কোষ ও নবগঠিত কোষদ্বয়ে **ক্রোমোজোম সংখ্যা একই** থাকে।

(4) গুণগত (qualitative) ও পরিমাণগত (quantitative)-ভাবে বিভাজিত কোষ ও নবগঠিত কোষদ্বয়ের মধ্যে কোন **প্রভেদ থাকে না।**

(5) জীবদেহের ক্ষয়পূরণ, দেহবৃদ্ধি ও পুনরুৎপাদনের জন্যে মাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটে।

(6) অনেক এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণী মাইটোসিস কোষ-বিভাজন দ্বারা বংশবিস্তার করে।

(7) মাইটোসিস কোষ-বিভাজনের মাধ্যমে বংশবিস্তার করলে অপত্য জীবে নতুন কোন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাবের সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না।

6.7. প্রাণিকোষে মাইটোসিস [*Mitosis in Animal cell*] :

ইউক্যারিওটিক কোষের মাইটোসিস পদ্ধতির কাঠামো প্রায় সর্বত্রই এক। তবে প্রাণিকোষে **সেণ্ট্রোজোম নামে একটি অতিরিক্ত অঙ্গ** বর্তমান এবং সেখানে মৃত সেলুলোজ কোষ-প্রাকার নেই। এইসব কারণে প্রাণিকোষের মাইটোসিস পদ্ধতিতে কিছু কিছু বিশেষত্ব লক্ষ্যণীয়। কোরিগোনস (*Coregonus*) নামক এক প্রকার সাদা মাছির ভ্রূণকোষ বিভাজনে উল্লিখিত পার্থক্য বেশ স্পষ্ট। প্রাণিকোষও **ক্যারিওকাইনেসিস** ও **সাইটোকাইনেসিস** নামক পর্যায়ক্রমিক দুটি দশার মাধ্যমে বিভক্ত হয়।

(A) **ক্যারিওকাইনেসিস** (Karyokinesis) :

(a) **সেণ্ট্রোজোম বিভাজন** (Centrosome division) :

(i) প্রোফেজ দশার শুরুতে বা কিছু আগে সেণ্ট্রোজোম ভাগ হ'য়ে দু'টি অপত্য সেণ্ট্রোজোম (daughter centrosomes) গঠন করে।

(ii) অপত্য সেণ্ট্রোজোম দু'টি নিউক্লীয় পর্দা বেয়ে নিউক্লিয়সের ঠিক দু' পাশে, অর্থাৎ একে অপরের বিপরীত প্রান্তে চলে যায়।

(iii) নিউক্লীয় পর্দার অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এরা **বেম** (Spindle)-এ কোষমধ্যস্থ প্রোটিনকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে যাতে বেম দু'প্রান্তে অবস্থিত দু'টি অপত্য সেণ্ট্রোজোমের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলতে পারে।



চিত্র 6.11—প্রাণিকোষের বিভাজনোন্মুখ ইণ্টারফেজ দশা ও প্রোফেজ শুরুর চিত্ররূপ।

আজও সেণ্ট্রোজোমের এই আচরণের উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ, টেলোফেজ-এর অন্যান্য পরিবর্তনগুলি সামগ্রিকভাবে ঐসময় উদ্ভিদকোষে **সংঘটিত** পরিবর্তনের অনুরূপ।

(b) **নিউক্লিয়স বিভাজন** (Nuclear division) ঃ

1. **প্রোফেজ** (Prophase) ঃ

(1) প্রোফেজ মাইটোসিস বিভাজনের প্রথম ও সবচেয়ে দীর্ঘ দশা, ঘাস-ফড়িং (grasshopper)-এর নিউরোব্লাস্ট কোষে প্রোফেজ দশা প্রায় 102 মিনিট চলে।

(2) এই দশায় কোষ গোলাকার ও স্ফীত হয়।

(3) নিউক্লিয়স আকারে বড় হয়।

(4) প্রতিটি ক্রোমোজোম **লম্বালম্বি ভাগ হ'য়ে দু'টি করে ক্রোমাটিড গঠন করে।**

(5) প্রতিটি ক্রোমাটিড নিজস্ব পদ্ধতিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে।

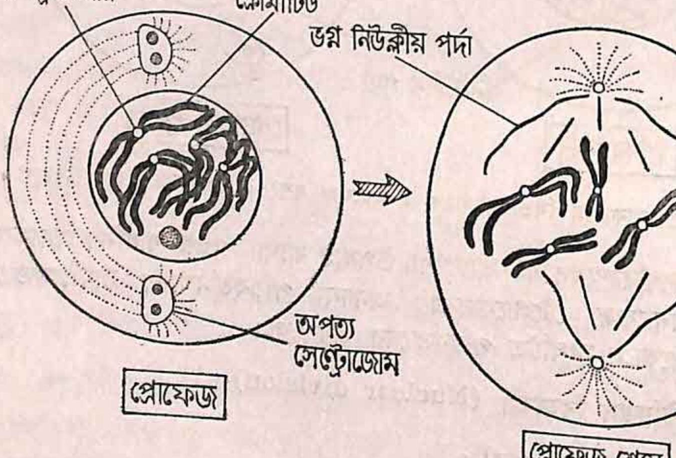
(6) এরপর সেগুলি নিউক্লিয়সের কেন্দ্র থেকে সরে নিউক্লীয় পর্দার দিকে চলে আসতে থাকে।

(7) তখনই নিউক্লীয় পর্দা অবলুপ্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

(8) এবার **বেম** বা **স্পিণ্ডল** গঠন শুরু হয়। এটি দু'ভাবে সম্ভব। একটি পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় বেম (central spindle) গঠনের সময় নিউক্লীয় পর্দা-সংলগ্ন সেণ্ট্রোজোমের সেণ্ট্রিওল (centriole) বিভাজিত হ'য়ে **দু'টি সেণ্ট্রিওল** গঠন করে এবং ক্রমশঃ সে দুটি পৃথক হ'য়ে যায়।

(9) প্রতিটি সেণ্ট্রিওল থেকে **অ্যাস্টার রশ্মি** (astral rays) এবং দু'টি অ্যাস্টার রশ্মির মধ্যবর্তী অংশে সূক্ষ্ম বেম গঠিত হয়।

(10) অ্যাস্টার রশ্মির সঙ্গে সঙ্গে দুটি সেণ্ট্রিওল স্থান পরিবর্তন শুরু করে এবং পরপর উল্টোদিকে চ'লে যায়।



চিত্র 6.12—প্রাণিকোষে প্রোফেজের বিভিন্ন পর্যায় চিত্ররূপ।

অন্য পদ্ধতি কেন্দ্রীয় বেমের পরিবর্তে **মেটাফেজ বেম** (metaphase spindle) গঠিত হয়। এই পদ্ধতিতে নিউক্লীয় বিভাজনের শুরুতেই দু'টি সেণ্ট্রিওল দুই বিপরীত মেরুতে চলে যায়। যাই হোক প্রোফেজের শেষ পর্যায়ে নিউক্লীয় পর্দা ভেঙ্গে যায় এবং ক্রমশঃ তার অবলুপ্তি ঘটে। উন্নত জীবে নিউক্লীয় পর্দা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে যায় কিনা সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়নি।

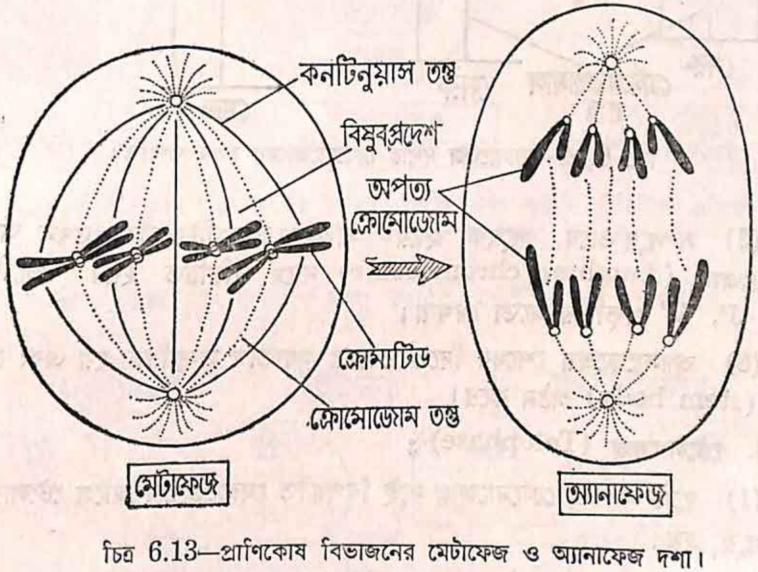
2. **মেটাফেজ** (Metaphase) ঃ

(1) নিউক্লীয় পর্দার অবলুপ্তি প্রোফেজ দশায় শেষ এবং মেটাফেজ দশার সূত্রপাতকে নির্দেশ করে।

(2) **মেটাফেজ দশাটি 6—13 মিনিটকাল স্থায়ী হয়।**

(3) মেটাফেজ দশার সূচনায় ক্রোমোজোমগুলি **বিষুব প্রদেশে** (equator) এমনভাবে সজ্জিত হয় যাতে তাদের সেণ্ট্রোমিয়ার বিষুব রেখায় বিন্যস্ত থাকে এবং বাহুগুলি উল্টোদিকে ছড়িয়ে যায়।

(4) ইতিমধ্যে প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেণ্ট্রোমিয়ার দু'ভাগে ভাগ হ'য়ে যায়—যাতে প্রতিটি ক্রোমাটিড তার নিজস্ব সেণ্ট্রোমিয়ায় অংশ লাভ করে।



চিত্র 6.13—প্রাণিকোষ বিভাজনের মেটাফেজ ও অ্যানাফেজ দশা।

(5) এইভাবে প্রতিটি ক্রোমোজোম সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়, যদিও ঐ অবস্থায় তারা পরস্পর সংলগ্ন থাকে।

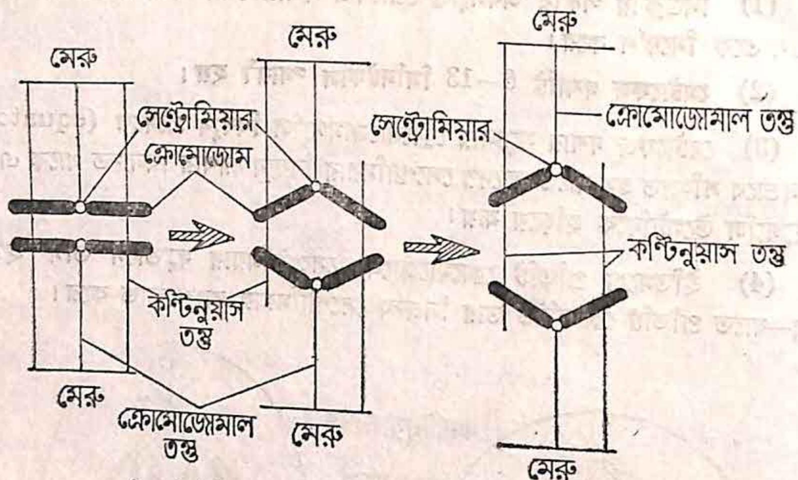
3. অ্যানাফেজ (Anaphase) ঃ

(1) সেণ্ট্রোমিয়ায় দু'ভাগে ভাগ হ'য়ে যাবার পরে ক্রোমোটিডগুলির মধ্যে যখন পরস্পর বিকর্ষণ শুরু হয় তখনই অ্যানাফেজের সূত্রপাত।

(2) **বিকর্ষণের ফলে অপত্য সেণ্ট্রোমিয়ারগুলি পরস্পর দূরে সরে যেতে থাকে।**

(3) **তার পর ক্রোমোটিডগুলি পরস্পর পৃথক হ'য়ে যায়।**

(4) ক্রমশঃ অর্ধসংখ্যক ক্রোমাটিড এক মেরুর দিকে এবং অপর অর্ধসংখ্যক ক্রোমাটিড অন্য মেরুর দিকে সরে যেতে থাকে।



চিত্র 6.14—অ্যানাফেজ দশায় ক্রোমোজোমের চলন পদ্ধতি।

(5) সম্পূর্ণভাবে পৃথক হ'য়ে যাওয়া ক্রোমাটিডগুলি তখন অপত্য ক্রোমোজোম (daughter chromosome) নামে পরিচিত হয়। এগুলিকে তখন 'J', 'V' প্রভৃতির মতো দেখায়।

(6) অ্যানাফেজের শেষের দিকে বেমের মধ্যভাগ সংকুচিত হয় এবং স্টেম বডি (stem body) গঠন করে।

4. **টেলোফেজ (Telophase) ঃ**

(1) দুটি অপত্য ক্রোমোজোম দুই বিপরীত মেরুতে পৌঁছালে টেলোফেজ দশা শুরু হয়।

(2) কিছু পরে নিউক্লিয়স পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ হয়।

(3) সেই সময়ে দু'টি অপত্য ক্রোমোজোম গোষ্ঠীকে ঘিরে দু'টি পৃথক নিউক্লীয় পর্দার আবির্ভাব ঘটে। সম্ভবত এণ্ডোপ্লাজমীয় জালক থেকে নিউক্লীয় পর্দার সৃষ্টি হয়।

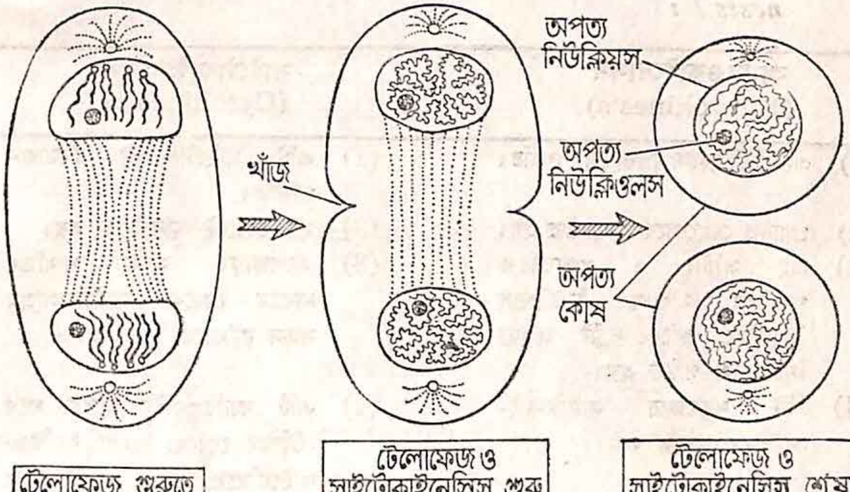
(4) এরপর সেণ্ট্রিওলের কাজ শেষ হয় এবং অ্যাস্টার রশ্মি অপাংক্তেয় হ'য়ে পড়ে।

(5) অপত্য ক্রোমোজোমগুলি ক্রমশঃ পরিণত পূর্ণাংগ ক্রোমোজোমে রূপান্তরিত হয়।

(6) এরপর ক্রোমোজোমে এমন সব পরিবর্তন আসে যাকে প্রোফেজ দশায় সংঘটিত পরিবর্তনের ঠিক বিপরীত ঘটনা বলা চলে।

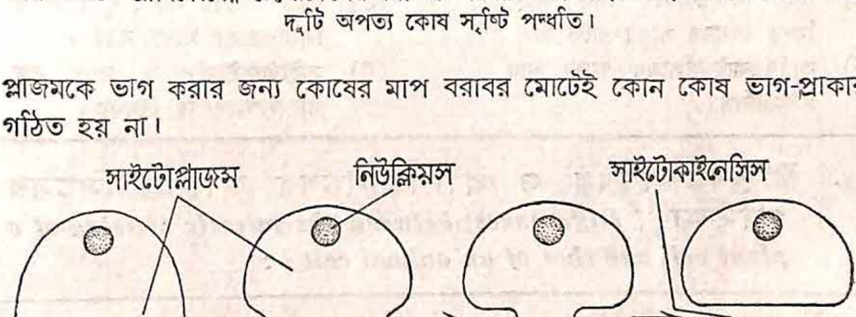
(B) **সাইটোকাইনেসিস** (Cytokinesis) ঃ

(1) প্রাণিকোষে মৃত স্থূল কোষ-প্রাকার থাকে না। সেজন্য সাইটো-



চিত্র 6.15—প্রাণিকোষের টেলোফেজের বিভিন্ন পর্যায় এবং সাইটোকাইনেসিস প্রক্রিয়া দ্বারা দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি পদ্ধতি।

প্লাজমকে ভাগ করার জন্য কোষের মাপ বরাবর মোটেই কোন কোষ ভাগ-প্রাকার গঠিত হয় না।



চিত্র 6.16—প্রাণিকোষে সাইটোকাইনেসিস পদ্ধতি।

(2) বস্তুতঃ অ্যানাফেজের সংগে সংগেই সাইটোপ্লাজমের বিভাজন শুরু হয়।

(3) কোষের মধ্যরেখা বরাবর একটি **ভাঁজ** বা **খাঁজ** (furrow) দেখা দিলেই সাইটোপ্লাজম বিভাজনের সূত্রপাত হয়।

(4) খাঁজটি বিষুবপ্রদেশ বরাবর ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর হয়।

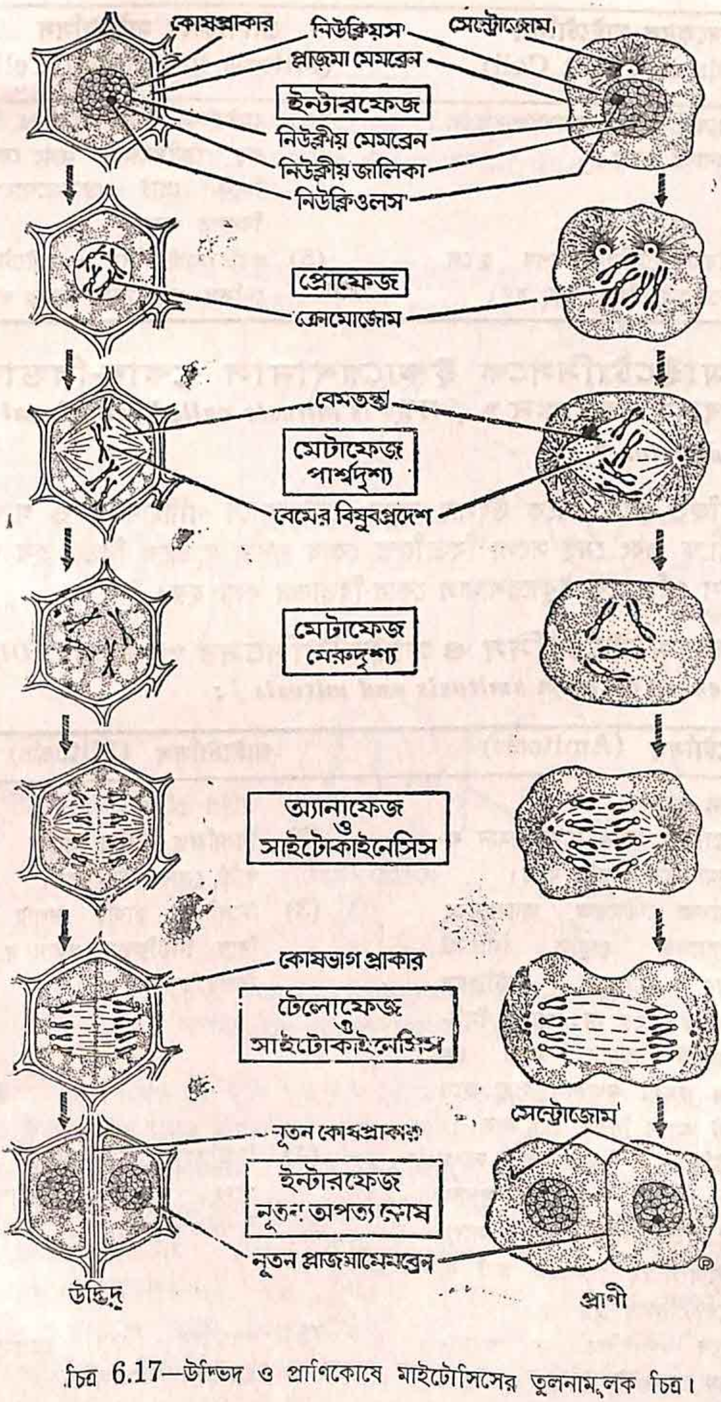
(5) অবশেষে প্রাণিকোষের সাইটোপ্লাজম দুটি পৃথক কোষে বিভক্ত হয় ; অর্থাৎ দুটি কোষের সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়।

6.8. ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিসের পার্থক্য [*Differences between Karyokinesis and Cytokinesis*] :

ক্যারিওকাইনেসিস (Karyokinesis)	সাইটোকাইনেসিস (Cytokinesis)
(1) এটি নিউক্লিয়স বিভাজন পদ্ধতি।	(1) এটি সাইটোপ্লাজম বিভাজন পদ্ধতি।
(2) প্রধানত দেহকোষে অনুষ্ঠিত হয়।	(2) সব কোষেই অনুষ্ঠিত হয়।
(3) এই জটিল ও ধারাবাহিক পদ্ধতির মাধ্যমে নিউক্লিয়স বিভাজিত হ'য়ে দুটি অপত্য নিউক্লিয়স গঠিত হয়।	(3) অপেক্ষাকৃত সরল পদ্ধতির মাধ্যমে কোষের সাইটোপ্লাজম সমান দু'ভাগে বিভক্ত হয়।
(4) এটি সর্বক্ষেত্রে সাইটোকাইনেসিসের আগে ঘটে।	(4) এটি ক্যারিওকাইনেসিসের পরে (উদ্ভিদ কোষে) অথবা ক্যারিওকাইনেসিসের মতো একই সঙ্গে চলতে থাকে (প্রাণিকোষে)।
(5) এতে নিউক্লিয়সের সংখ্যা বাড়ে, কিন্তু কোষের সংখ্যা বাড়ে না।	(5) এতে কোষের সংখ্যা বাড়ে কিন্তু নিউক্লিয়সের সংখ্যা বাড়ে না।
(6) ক্যারিওকাইনেসিসের অপর নাম মাইটোসিস।	(6) সাইটোকাইনেসিসের অপর নাম সাইটোপ্লাজমীয় ক্লিভেজ।

6.9. উদ্ভিদকোষের ও প্রাণিকোষের মাইটোসিসের পার্থক্য [*Differences between the mitotic division of a plant cell and that of an animal cell*] :

উদ্ভিদকোষে মাইটোসিস (Mitosis in Plant Cell)	প্রাণিকোষে মাইটোসিস (Mitosis in Animal Cell)
(1) এখানে বেম (Spindle) সম্পূর্ণভাবে নিউক্লিওপ্লাজম থেকে গঠিত হয়।	(1) এখানে বেম আংশিকভাবে নিউক্লিওপ্লাজম থেকে গঠিত হয়।
(2) সেন্ট্রোজোম না থাকায় সেন্ট্রোজোমের অ্যাস্ট্রাল রশ্মি থেকে বেম গঠনের সুযোগ নাই।	(2) সেন্ট্রোজোম থাকায় সেন্ট্রোজোমের অ্যাস্ট্রাল রশ্মি থেকে বেম গঠিত হয়।
(3) সেণ্ট্রিওল না থাকায় তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চলনের প্রশ্ন অবান্তর।	(3) সেণ্ট্রিওল বিভাজিত হ'য়ে যে দুটি অপত্য সেণ্ট্রিওল গঠিত হয় তারা পরস্পরের বিপরীত দিকে চলতে থাকে এবং 180° পার্থক্যে অবস্থান করে।



চিত্র 6.17—উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষে মাইটোসিসের তুলনামূলক চিত্র।

উদ্ভিদকোষে মাইটোসিস (Mitosis in Plant Cell)	প্রাণিকোষে মাইটোসিস (Mitosis in Animal Cell)
(4) মেটাফেজ প্লেটে ক্রোমোজোমগুলি অবিন্যস্ত থাকে।	(4) মেটাফেজ প্লেটে পরিধির দিকে বড় ক্রোমোজোম এবং কেন্দ্রের দিকে ছোট ক্রোমোজোমগুলি বিন্যস্ত থাকে।
(5) ক্যারিওকাইনেসিস শেষ হ'লে সাইটোকাইনেসিস শুরু হয়।	(5) ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিস একই সঙ্গে চলতে থাকে।

6.10. মাইটোসিসকে ইক্যুয়েশানাল কোষ-বিভাজন বলা হয় কেন? [*Why is mitosis called equational cell division ?*] :

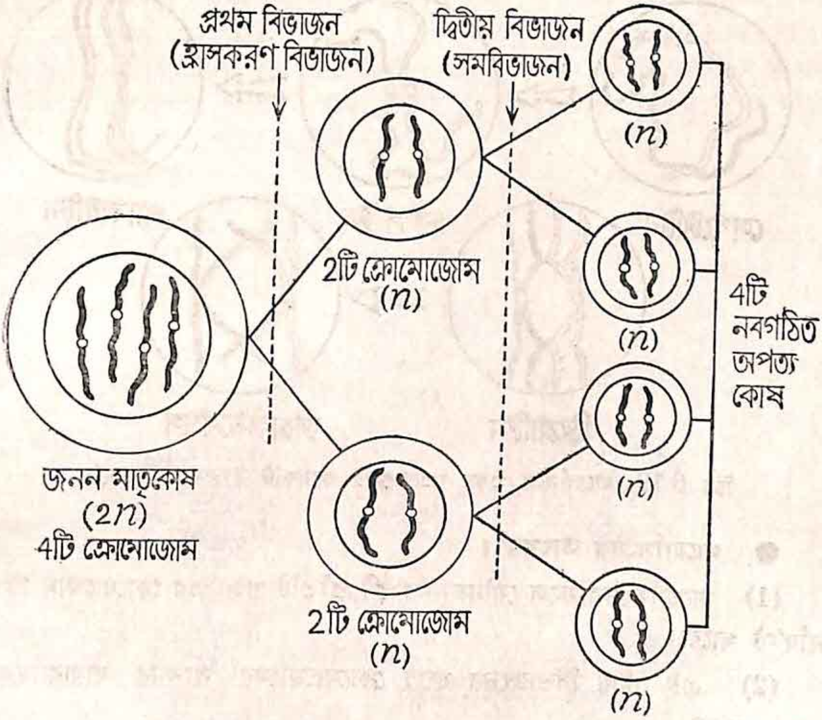
বিভাজিত কোষ থেকে উৎপন্ন নতুন দুটি কোষে পরিমাণগত ও গুণগত সাদৃশ্য থাকে এবং সেই সঙ্গে বিভাজিত কোষ সমান দুভাগে বিভক্ত হয় বলে মাইটোসিস প্রক্রিয়াকে ইক্যুয়েশানাল কোষ-বিভাজন বলা হয়।

6.11. আমাইটোসিস ও মাইটোসিসের পার্থক্য [*Differences between amitosis and mitosis*] :

আমাইটোসিস (Amitosis)	মাইটোসিস (Mitosis)
(1) সরল প্রক্রিয়া।	(1) জটিল প্রক্রিয়া।
(2) বিভাজিত কোষ দুটি সমান বা অসমান কোষ গঠন করে।	(2) বিভাজিত কোষ সর্বদা সমান দুটি কোষ গঠন করে।
(3) প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ, টেলোফেজ প্রভৃতি নির্দিষ্ট দশার মাধ্যমে নিউক্লিয়স বিভাজিত হয় না। পরন্তু নিউক্লিয়সটি সামান্য লম্বা হয় এবং ক্রমশঃ মধ্যভাগ সরু হয়ে দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়।	(3) উল্লেখিত চারটি দশার মধ্য দিয়ে নিউক্লিয়স সমান দুভাগে বিভক্ত হয়।
(4) নিউক্লিয়স বিভাজনের সঙ্গে অন্য অংশের বিভাজনের সম্বন্ধ নাই। কিছু পরে বা সঙ্গে সঙ্গে সাইটোপ্লাজম বিভাজন ঘটে বা আদৌ বিভক্ত হয় না।	(4) নিউক্লিয়স বিভাজনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয়।
(5) কোষে স্পাইরিম বা ক্রোমোজোম কোনটাই উৎপন্ন হয় না।	(5) স্পাইরিম এবং ক্রোমোজোম উৎপাদন স্বতঃসিদ্ধ।

6.12. মায়োসিস [*Meiosis*] :

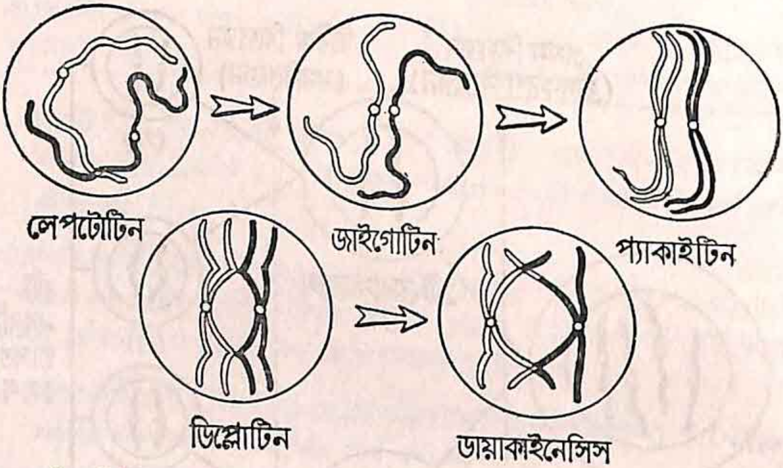
● **মায়োসিসের সংজ্ঞা** (Definition of Meiosis) ঃ যে জটিল প্রক্রিয়ায় ডিপ্লয়েড (2n) জনন মাতৃকোষ (Reproductive mother cell) বিভক্ত **হ'য়ে চারটি বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হ্যাপ্লয়েড** (n) **জননকোষ** গঠন করে তাকে মায়োসিস বলে।



চিত্র 6.18—মায়োসিস পদ্ধতিতে কোষবিভাজন প্রক্রিয়ায় ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেকে হ্রাস পাওয়ার সরলতম চিত্ররূপ।

● **মায়োসিসের বৈশিষ্ট্য** ঃ (1) কেবল জনন মাতৃকোষে জননকোষ বা **গ্যামেট উৎপাদনের সময় মায়োসিস** হয়। (2) মায়োসিস বিভাজন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা বিভাজিত কোষের **ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক দাঁড়ায়**। (3) মাইটোসিসে মাত্র দুইটি কোষ উৎপন্ন হলেও **মায়োসিসে চারটি কোষ উৎপন্ন** হয়। (4) মায়োসিসের **প্রথম পর্যায়টি হ্রাসকরণ বিভাজন** (Reduction division) এবং দ্বিতীয় পর্যায়টি **সাধারণ মাইটোসিসের অনুরূপ**। অর্থাৎ প্রথম বিভাজনটিতে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক দাঁড়ায় কিন্তু দ্বিতীয় মাইটোসিস বিভাজনে দুটি থেকে চারটি কোষ উৎপন্ন হয় এবং এদের মধ্যে ক্রোমোজোমগত সমতা বজায় থাকে। (5) প্রকৃতি ও গুণবিচারে

চারটি কোষের প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। (6) পিতা ও মাতার দিক থেকে আসা দুটি ভিন্ন গ্যামেটের মিলনের ফলে নতুন প্রজাতির উদ্ভবের সম্ভাবনা থাকে। (7) মায়োসিসের প্রথম বিভাজনের ক্ষেত্রে প্রোফেজ দশাটি দীর্ঘস্থায়ী, এটি পাঁচটি উপদশায় বিভক্ত। নীচে উপ-দশাগুলির চিত্ররূপ দেওয়া হল ঃ



চিত্র 6.19—মায়োসিসে প্রথম প্রোফেজের কয়েকটি উপদশার চিত্ররূপ।

● **মায়োসিসের তাৎপর্য ঃ**

(1) মায়োসিসের ফলে যৌনজননকারী প্রতিটি প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে।

(2) এই কোষ বিভাজনের ফলে ক্রোমোজোমের সংখ্যার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

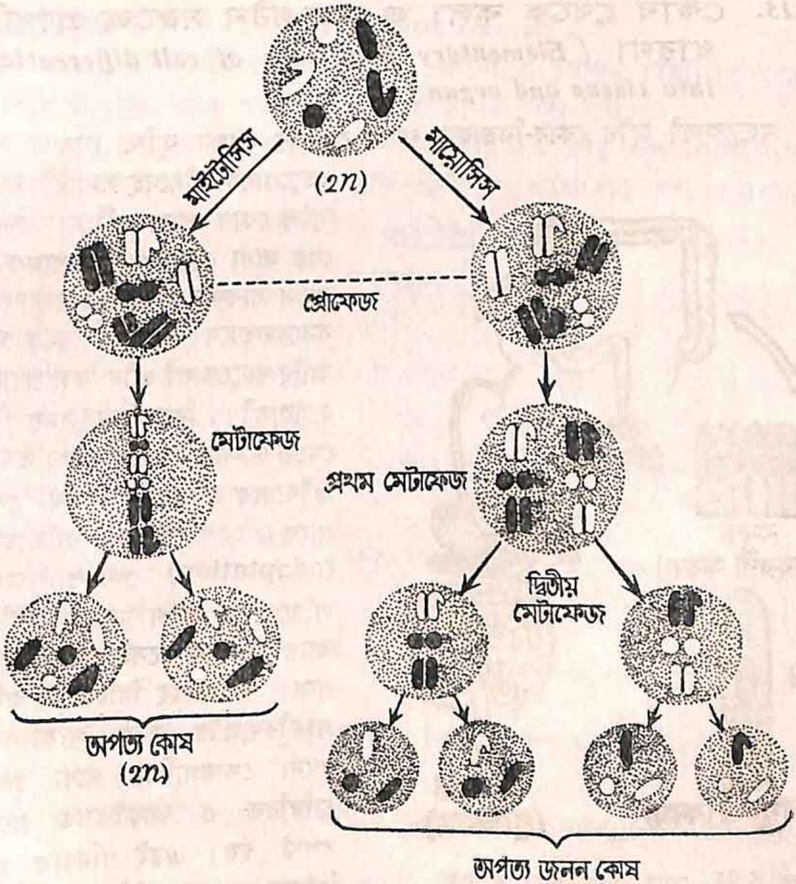
(3) পরবর্তী জনু (generation)-তে যাতে ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ না হ'য়ে যায় সেজন্য পুংজননকোষে শুক্রাণু ও স্ত্রী জননকোষে ডিম্বাণু উৎপাদনের পূর্বে মায়োসিস ঘটে—যার ফলে অপত্য কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসে।

(4) মায়োসিসের ফলে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনে উৎপন্ন জাইগোট থেকে আবির্ভূত অপত্য জীবে **প্রকারণ** (variation) আসে, অর্থাৎ নতুন বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন জীবের আবির্ভাবের পথ সুগম হয়।

● **মাইটোসিস ও মায়োসিসের পার্থক্য** (Differences between Mitosis and Meiosis) ঃ

* পাঠ্যক্রমে মায়োসিসের আলোচনা চাওয়া হয়নি। সেজন্য এখানে কেবল কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্যের উল্লেখ করা হল।

মাইটোসিস (Mitosis)	মায়োসিস (Meiosis)
(1) জীবের দেহকোষ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। মায়োসিসের দ্বিতীয় বিভাজনটিও মাইটোসিস।	(1) জননকোষ (gamete) উৎপাদনের পূর্বে জননমাতৃকোষে মায়োসিস হয়।
(2) এক্ষেত্রে মাতৃকোষ একবার বিভাজিত হ'য়ে দু'টি অপত্য কোষ গঠন করে।	(2) এক্ষেত্রে জননমাতৃকোষ পরপর দু'বার বিভাজিত হ'য়ে চারটি অপত্য কোষ গঠন করে।
(3) এই বিভাজনের ফলে অপত্যকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। পূর্বে যা ছিল পরেও তাই থাকে।	(3) এই বিভাজনের ফলে অপত্যকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসে।

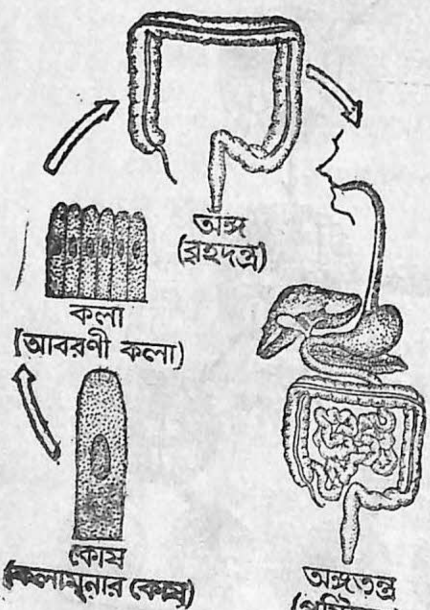


চিত্র 6.20—মাইটোসিস ও মায়োসিসের পার্থক্যের সরলতম চিত্ররূপ।

মাইটোসিস (Mitosis)	মায়োসিস (Meiosis)
(4) বিভাজিত কোষের গুণাবলী যথাযথভাবে অপত্য কোষে বর্তায়।	(4) বিভাজিত কোষের গুণাবলী যথাযথভাবে অপত্যকোষে বর্তায় না। প্রতিটি কোষের চরিত্র হয় ভিন্ন।
(5) এই বিভাজনের ফলে জীবদেহে প্রকারণ আসা সম্ভব নয়।	(5) এই বিভাজনের ফলে জীবদেহে প্রকারণ আসে।
(6) মাইটোসিসকে অভিব্যক্তির হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করা যায় না।	(6) মায়োসিসকে অভিব্যক্তির হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করা হয়।
(7) মাইটোসিসের প্রোফেজ দশা দীর্ঘস্থায়ী নয়।	(7) মায়োসিসের প্রোফেজ দশা দীর্ঘস্থায়ী।

6.13. কোষ থেকে কলা ও অঙ্গ গঠন সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা [*Elementary knowledge of cell differentiation into tissue and organ*] :

বহুকোষী জীব কোষ-বিভাজন দ্বারা কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। সরল বহুকোষী জীবদেহ সমধর্মী কতকগুলি কোষ দ্বারা গঠিত। নিজেদের মধ্যে কোন পৃথক পৃথক শ্রম বণ্টন ব্যবস্থা না থাকায় কোষগুলি সমবেতভাবে কাজকর্ম করে চলে। আদি বহুকোষী জীব ছিল প্রধানতঃ জলবাসী। বিবর্তনের সময় জল ছেড়ে ডাঙগায় বসবাস করার তাগিদে জীবদেহে জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দৈহিক অভিযোজন (adaptation) প্রবণতা অর্থাৎ পরিবেশের সঙেগ নিজেকে মানিয়ে চলার ক্ষমতাও সেই সঙেগ বৃদ্ধি পায়। জীবদেহে বিচিত্র ও জটিল শারীরবৃত্তীয় কাজ পরিচালনার জন্যে কোষগুলির মধ্যে ক্রমশঃ চারিত্রিক ও আকৃতিগত প্রভেদ স্পষ্ট হয়। এরই পরিণতি হ'ল বিভিন্ন কোষগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রম বিভাগ। এক বা একাধিক কোষ



চিত্র 6.21—কোষ থেকে কলা ও কলা থেকে অঙ্গ গঠনের ধারাবাহিক চিত্ররূপ।

গোষ্ঠীর দ্বারা কলা (Tissue) গঠিত হয়। কলায় সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত কোষগুলি সমবেতভাবে নির্দিষ্ট কাজ করে চলে। কাজের প্রকৃতির উপর কলার গঠন ও আকৃতি নির্ভর করে।

কলা গঠনকারী কোষগুলি সম-আকৃতিবিশিষ্ট বা ভিন্ন-আকৃতিবিশিষ্ট।

● **কলার সংজ্ঞা** (Definition of Tissue) : **উৎপত্তির দিক থেকে এক হয়েও সম বা ভিন্ন আকৃতির কোষগুচ্ছ সমবেতভাবে যদি সুনির্দিষ্ট কাজ করে চলে তবে সেই কোষগুচ্ছকে কলা বা টিসু বলে।**

6.14. উদ্ভিদ কলার প্রকারভেদ [*Types of Tissue in plants*]:

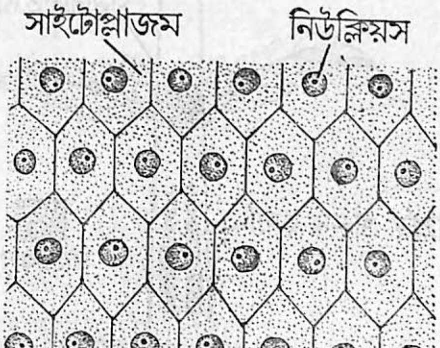
কলা নানাপ্রকার। প্রত্যেক কলার নিজস্ব চারিত্রগত বৈশিষ্ট্য আছে। একই ধরনের বা বিভিন্ন ধরনের কলা একত্রিত হয়ে জটিল জীবদেহ গঠন করে।

কলা প্রধানতঃ দু' প্রকার : **ভাজক কলা** এবং **স্থায়ী কলা।**

6.15. ভাজক কলা [*Meristematic tissue*]:

● **সংজ্ঞা** (Definition) : **যে কলার কোষগুলি ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে নতুন কোষ উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে তাকে ভাজক কলা বলে।**

ভাজক কলার অপর নাম **মেরিস্টেম** (Meristem : গ্রীক শব্দ meristos কথার অর্থ বিভাজন-ক্ষমতা সম্পন্ন)। এটি প্রকৃতপক্ষে গঠনমূলক কলা যা সর্বদা নতুন কোষ সংযোজনে ব্যস্ত থাকে এবং দেহের বৃদ্ধি ঘটায়। মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে অবস্থিত ভাজক কলাকে **মূল ভাজক কলা** বা **আদি ভাজক কলা** বা **প্রোমেরিস্টেম** (Promeristem) বলা হয় (চিত্র 6.26)।



চিত্র 6.22—ভাজক কলার গঠন।

অবস্থান (Occurrence) : উদ্ভিদদেহের বর্ধনশীল অংগসমূহে ভাজক কলা বর্তমান। বর্ধনশীল অংগ বলতে মূলতঃ কান্ডাগ্র এবং মূলাগ্রকে বোঝায়।

গঠন (Structure) :

(i) ভাজক কলার কোষগুলি গোলাকার, ডিম্বাকার বা সময় বিশেষে বহুভুজাকার।

(ii) ঘন সন্নিবিষ্ট এই কোষগুলি অন্তর্বর্তী স্থানে কোষান্তর রন্ধ্র থাকে না।

(iii) পাতলা প্রাকারাবদ্ধ কোষগুলি সর্বদা সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে।

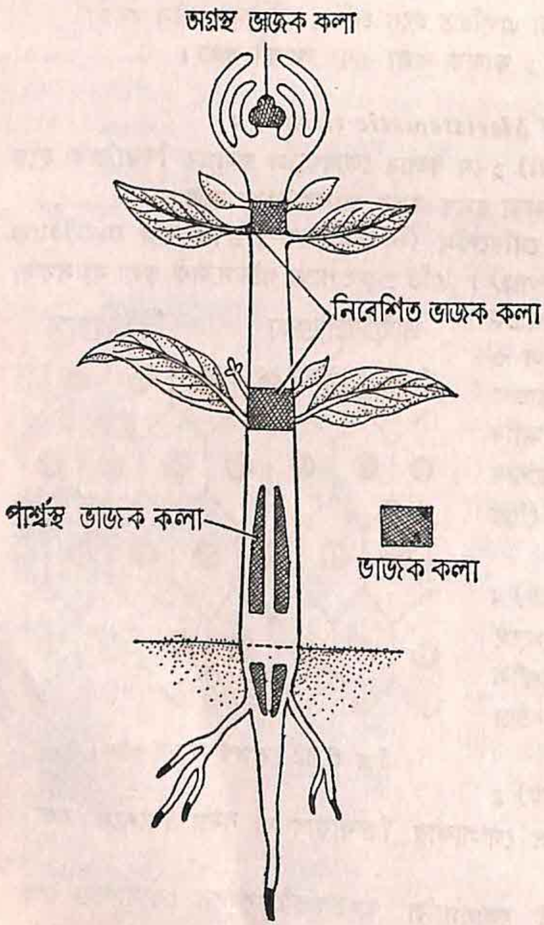
(iv) এদের নিউক্লিয়স বেশ বড় ও সুস্পষ্ট।

6.16. ভাজক কলার শ্রেণীবিভাগ [*Classification of meristematic tissue*] :

উৎপত্তি (Origin), **অবস্থান** (Position), **কাজ** (Function) ও **কোষবিভাজনের তল** (Plane of cell division) অনুযায়ী বিভিন্নভাবে ভাজক কলার শ্রেণীবিন্যাস করা হয়।

(A) **উৎপত্তি অনুসারে** (According to origin) ঃ উৎপত্তি অনুসারে ভাজক কলা প্রধানতঃ দু'প্রকার ঃ

(1) **প্রাথমিক ভাজক কলা।**
(2) **গৌণ ভাজক কলা।**



চিত্র 6.23—অবস্থান অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ভাজক কলা।

● **প্রাথমিক ভাজক কলা** (Primary meristematic tissue) ঃ

● **প্রাথমিক ভাজক কলার সংজ্ঞা** (Definition of Primary meristematic tissue) ঃ

আদি ভাজক কলা থেকে উৎপন্ন আমৃত্যু বিভাজন ক্ষমতার অধিকারী কোষসমষ্টিকে প্রাথমিক ভাজক কলা বলে।

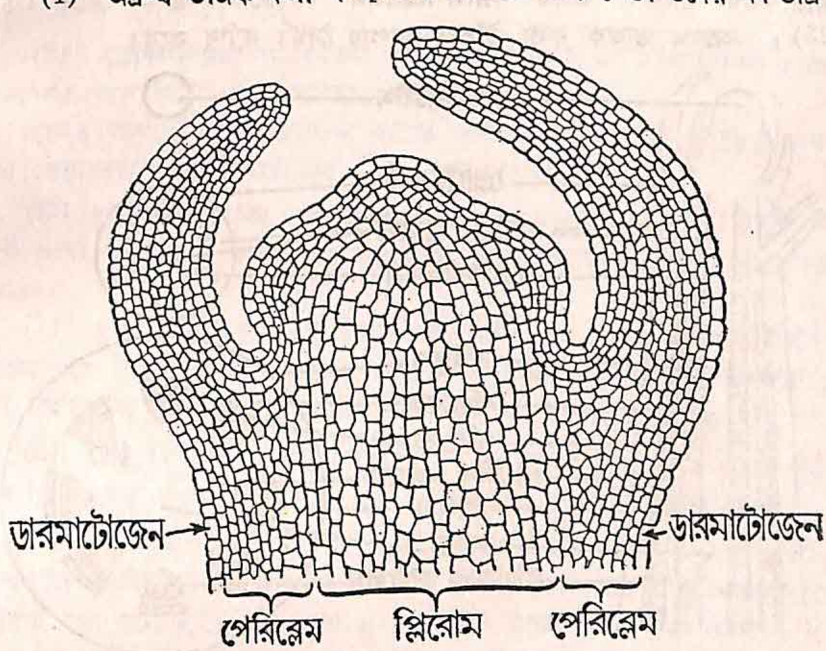
প্রাথমিক ভাজক কলা ভ্রূণাবস্থা থেকে উদ্ভিদ দেহে আমৃত্যু বিভাজনক্ষম থাকে। উদ্ভিদের বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক ভাজক কলা বর্তমান।

(B) **অবস্থান অনুসারে** (According to Position) ঃ অবস্থান অনুসারে প্রাথমিক ভাজক কলা তিন প্রকার ঃ

(1) **অগ্রস্থ** (Apical),
(2) **নিবেশিত** (Intercalary) এবং

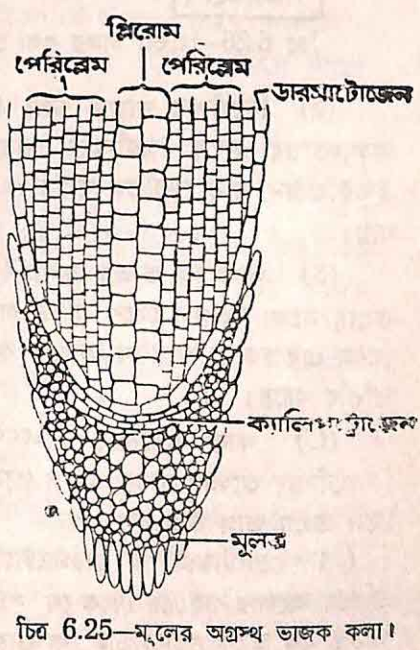
(3) **পার্শ্বস্থ** (Lateral)।

(1) **অগ্রস্থ ভাজক কলা** (Apical meristem) ঃ উদ্ভিদের কাণ্ডাগ্র ও



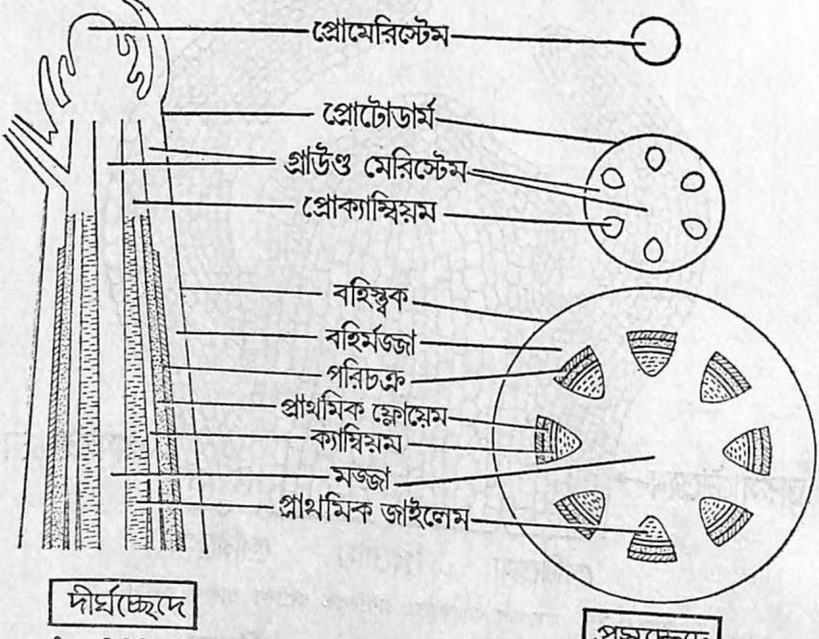
চিত্র 6.24—কাণ্ডের অগ্রভাগে অবস্থিত অগ্রস্থ ভাজক কলা।

মূলাগ্রে এই কলা অবস্থিত। অগ্রস্থ ভাজক কলা ক্রমশঃ পৃথক তিনটি স্তরে বিভক্ত হয়। বর্ধনশীল অঙ্গের একেবারে বাইরে ভাজক কলার স্তরটিকে **ডারমাটোজেন** (Dermatogen) বলে। একটি মাত্র স্তরে বিন্যস্ত থেকে ডারমাটোজেন উদ্ভিদ-অঙ্গের ত্বক গঠন করে। ডারমাটোজেন সংলগ্ন এক বা একাধিক ভাজক কলার স্তরকে **পেরিব্লেম** (Periblem) বলে; পেরিব্লেম থেকে **অধস্ত্বক** (Hypodermis), **অন্তস্ত্বক** (Endodermis) এবং **সাধারণ মজ্জা** (General cortex) গঠিত হয়। ভাজককলার কেন্দ্রীয় স্তরটিকে **প্লিরোম** (Plerome) বলে। প্লিরোম থেকে **স্টীলি** (Stele) অর্থাৎ ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল ও



চিত্র 6.25—মূলের অগ্রস্থ ভাজক কলা।

ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কলা গঠিত হয়। মূলাগ্রে একটি অতিরিক্ত ভাজক কলার স্তর থাকে। তাকে **ক্যালিপট্রোজেন** (Calyptrogen) বলে (চিত্র 6.25)। অগ্রস্থ ভাজক কলা উদ্ভিদ-অঙ্গের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে।



চিত্র 6.26—বিভিন্ন ভাজক কলা থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ অঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল।

(2) **নির্বেশিত ভাজক কলা** (Intercalary meristem)—দুটি স্থায়ী কলাস্তরের মাঝে অবস্থিত ভাজক কলাকে নির্বেশিত ভাজক কলা বলে। ইকুইজিটাম, ঘাস প্রভৃতির পর্বমধ্যে এবং পাইন গাছের পত্রমূলে এই কলা দেখা যায়।

(3) **পার্শ্বস্থ ভাজক কলা** (Lateral meristem)—এই কলা স্থায়ী কলার সঙ্গে সংলগ্ন থেকে কাণ্ড বা মূলের পার্শ্বদেশে অবস্থান করে। ক্যাম-বিয়ম একপ্রকার পার্শ্বস্থ ভাজক কলা। এর বিভাজনের ফলে উদ্ভিদ-অঙ্গের পরিধি বাড়ে।

(C) **কার্য অনুসারে** (According to function) ঃ

উদ্ভিদ অঙ্গের কোন্ অঞ্চল গঠন করে তার ওপর ভিত্তি ক'রে ভাজক কলাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—

(1) **প্রোটোডার্ম বা ডারমাটোজেন** (Protoderm or Dermatogen) ঃ উদ্ভিদ অঙ্গের বাইরের দিকে যে স্তর থেকে প্রধানতঃ বহিস্ত্বক (epidermis) গঠিত হয় তাকে প্রোটোডার্ম বা ডারমাটোজেন বলে।

(2) **আদি কলা বা পেরিব্লেম** (Ground meristem or Periblem) ঃ মধ্যের যে কোষস্তর থেকে বহির্মজ্জা বা কর্টেক্স (cortex) গঠিত হয় তাকে আদিকলা বা পেরিব্লেম বলে।

(3) **প্রোক্যাম্বিয়ম বা প্লিরোম** (Procambium or Plerome) ঃ এই কোষস্তর থেকে স্টিলি বা কেন্দ্রস্তম্ভ গঠিত হয়।

মূলের আগায় ডারমাটোজেনের বাইরে একটি অতিরিক্ত কোষস্তর থাকে। সেই কোষস্তরকে **ক্যালিপট্রোজেন** (Calyptrogen) বলে।

(D) **কোষ-বিভাজনের প্রকৃতি অনুসারে** (According to plane of cell division) ঃ কোষ-বিভাজনের প্রকৃতি অনুসারে ভাজক কলা তিন প্রকার যথা ঃ—

(1) **মাস** (Mass) ঃ এই কলার কোষগুলি যে কোন দিকে ; অর্থাৎ বিভিন্ন তলে বিভাজিত হয়। এদের সজ্জার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই, **উদাহরণ** ঃ সস্য, বর্ধনশীল ভ্রূণ, মজ্জা, রেণুস্থলী, বহির্মজ্জা ইত্যাদির ভাজক কলা।

(2) **প্লেট** (Plate) ঃ এই কলার কোষগুলি কেবল দু'টি তলে বিভক্ত হয়, ফলে কোষগুলি একস্তরে সজ্জিত থাকে। **উদাহরণ** ঃ বর্ধনশীল বহিস্ত্বক।

(3) **রিব** (Rib) ঃ এই কলার কোষগুলি একটি মাত্র তলে বিভক্ত হয়। ফলে কোষগুলি একটি সারিতে সজ্জিত হয় এবং তখন এদের বুকের পাঁজরের ন্যায় বিন্যস্ত বলে মনে হয়। **উদাহরণ** ঃ ক্রমবর্ধমান মজ্জা এবং বহির্মজ্জা।

● **গৌণ ভাজক কলা** (Secondary meristematic tissue) ঃ

● **গৌণ ভাজক কলার সংজ্ঞা** (Definition of Secondary meristematic tissue) ঃ **যে স্থায়ী কলায় বিভাজন ক্ষমতা পুনরায় ফিরে আসে, তাকে গৌণ ভাজক কলা বলে।**

ভাজক কলারই কেবল বিভাজন ক্ষমতা আছে। পরিণত হয়ে স্থায়ী কলায় রূপান্তরিত হওয়ামাত্র ভাজক কলা বিভাজন ক্ষমতা হারায়।

তবে স্থায়ী কলাও প্রয়োজনবোধে ভাজক কলার মতো পুনরায় বিভাজিত হতে পারে। অর্থাৎ বিভাজন ক্ষমতার অধিকারী স্থায়ী কলাই **গৌণ ভাজক কলা**। উদাহরণ ঃ **ইণ্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়ম** (Interfascicular Cambium) ও **ফেলোজেন** (Phellogen) বা **কর্ক ক্যাম্বিয়ম** (Cork Cambium)।

6.17. স্থায়ী কলা *[Permanent tissue]* :

ভাজক কলা থেকে উৎপন্ন কোষগুলি নির্দিষ্ট আকৃতি লাভের পর বিভাজন-ক্ষমতা হারিয়ে স্থায়ী কলায় রূপান্তরিত হয়। স্থায়ী কলা প্রধানতঃ তিন প্রকার—**সরল** (Simple), **জটিল** (Complex) ও **বিশেষ** (Special)।

6.18. ভাজক কলা ও স্থায়ী কলার পার্থক্য [*Differences between meristematic and Permanent tissue*] :

ভাজক কলা (Meristematic tissue)	স্থায়ী কলা (Permanent tissue)
(1) প্রাক্‌ভাজক কলা (Promeristem) থেকে উৎপন্ন।	(1) ভাজক কলা থেকে উৎপন্ন।
(2) কোষগুলি অপরিণত।	(2) কোষগুলি পরিণত।
(3) ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে নতুন নতুন কোষ উৎপাদন করে।	(3) কোষগুলির বিভাজন ক্ষমতা নাই।
(4) উদ্ভিদের বর্ধনশীল অংগে ভাজক কলা বর্তমান।	(4) উদ্ভিদের বর্ধনশীল অংগে থাকে না।
(5) উদ্ভিদাংগের বৃদ্ধি ঘটায়।	(5) উদ্ভিদাংগের বৃদ্ধি ঘটায় না।
(6) খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য সঞ্চয় ও খাদ্য পরিবহণে ব্যবহৃত হয় না।	(6) কোন কোন স্থায়ী কলা এইসব কাজে লিপ্ত থাকে।
(7) উদ্ভিদকে বলদানে সক্ষম নয়।	(7) উদ্ভিদকে বলদানে সক্ষম।

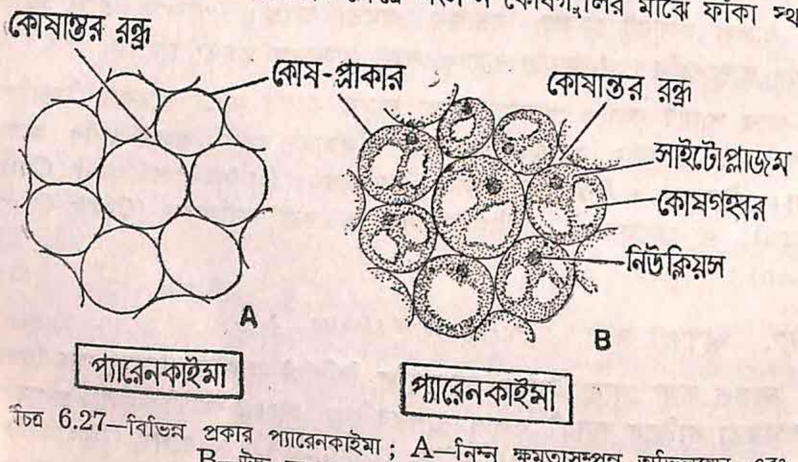
6.19. সরল স্থায়ী কলা [*Simple permanent tissue*] :

● **সরল স্থায়ী কলার সংজ্ঞা** (Definition of Simple Permanent tissue) ঃ **একই আকৃতিবিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট সময়ে একই কাজে লিপ্ত কোষগুচ্ছকে সরল স্থায়ী কলা বলে।**

সরল কলা তিন প্রকার—

(1) **প্যারেনকাইমা** (Parenchyma ; গ্রীক—*para* = ভিতরে, *enchyma* = অনুপ্রবেশ)।

(i) **গঠন** (Structure) ঃ প্যারেনকাইমার কোষগুলি ডিম্বাকার, গোলাকার বা বহুভুজাকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংলগ্ন কোষগুলির মাঝে ফাঁকা স্থান

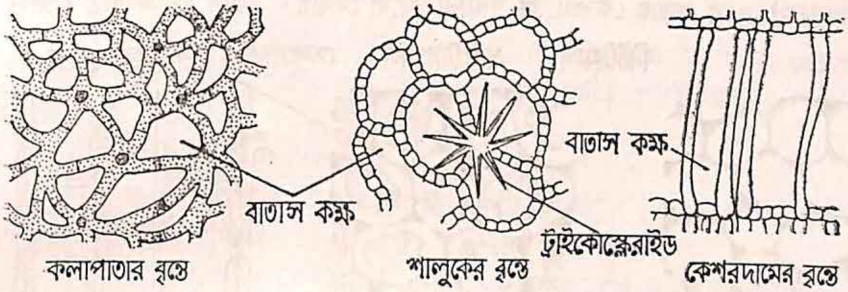


চিত্র 6.27—বিভিন্ন প্রকার প্যারেনকাইমা ; A—নিম্ন ক্ষমতাসম্পন্ন অভিলক্ষ্যে এবং B—উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অভিলক্ষ্যে দৃশ্যমান।

থাকে। ঐ ফাঁকা স্থানকে **কোষান্তর রন্ধ্র** (Intercellular space) বলে। প্যারেনকাইমার কোষ-প্রাকার সাধারণত পাতলা। প্যারেনকাইমার কোষ-প্রাকার সেলুলোজ দ্বারা গঠিত।

প্যারেনকাইমার কোষগুলি সাধারণত সজীব। কোষগুলির মধ্যে পর্যাপ্ত সাইটোপ্লাজম থাকে। প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়স বেশ বড় ও স্পষ্ট।

প্যারেনকাইমা কোষে ক্লোরোপ্লাসটিড থাকলে তাকে **ক্লোরেনকাইমা**

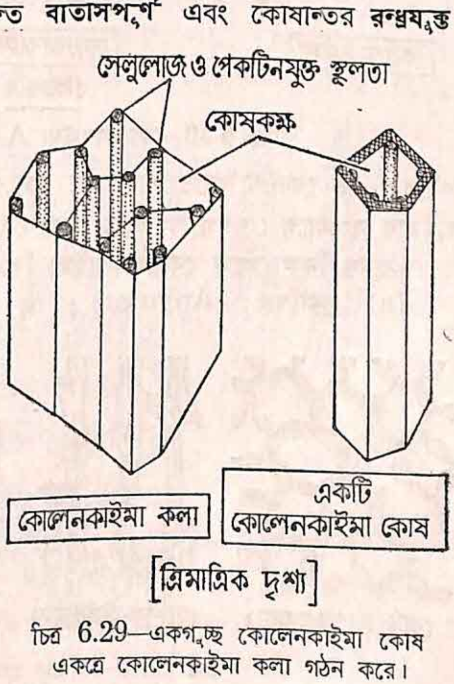


চিত্র 6.28—বিভিন্ন প্রকার এরেনকাইমা।

(Chlorenchyma ; গ্রীক—*Chloros* = সবুজ) বলে। এদিকে শালুক, গম, কচুরিপানা প্রভৃতি উদ্ভিদের পর্ণবৃন্তে **বাতাসপূর্ণ** এবং কোষান্তর **রন্ধ্রযুক্ত** প্যারেনকাইমা থাকে। বাতাসপূর্ণ প্যারেনকাইমাকে **এরেনকাইমা** (Aerenchyma ; গ্রীক—*air* = বায়ু) বলে। এরেনকাইমার আকৃতি নানারকম। কলা পাতায়, শালুকের বৃন্তে*, এবং কেশরদামের বৃন্তে বিভিন্ন প্রকার এরেনকাইমা দেখা যায় (চিত্র 6.28)।

(ii) **বিস্তৃতি** (Distribution) : উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঞ্চলে অর্থাৎ কান্ড, মূল ও পাতার রসাল ও নরম অংশে প্যারেনকাইমা থাকে।

(iii) **কাজ** (Functions) : (1) **খাদ্য সঞ্চয়** (food storage) ; (2) **খাদ্য পরিবহণ** (food conduction) ; (3) **সালোকসংশ্লেষ** মাধ্যমে ক্লোরেনকাইমা দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত (food synthesis) ; (4) **জল সঞ্চয়**



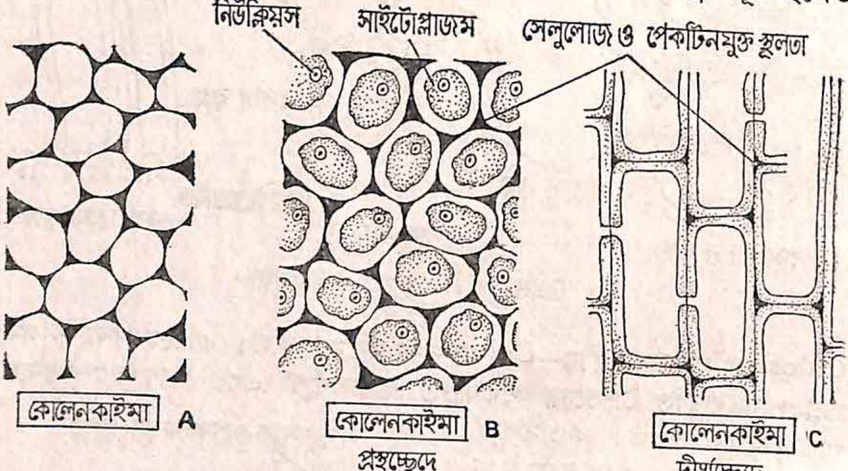
চিত্র 6.29—একগুচ্ছ কোলেনকাইমা কোষ একত্রে কোলেনকাইমা কলা গঠন করে।

* শালুকের বৃন্তকোষে বাতাস কক্ষে তারকাকার স্ক্লেরাইড (বা ট্রাইকোস্ক্লেরাইড) থাকে।

(water storage) ; (5) **এরেনকাইমা উদ্ভিদ অংগকে জলে ভেসে থাকতে সাহায্য করে** (help in floating) এবং (6) **শ্বসনে সাহায্য করে।**

(2) **কোলেনকাইমা** (Collenchyma ; গ্রীক—*kolla* = আঠা)

(i) **গঠন** (Structure) ঃ বহুভুজাকার অপেক্ষাকৃত স্থূলপ্রাকারাবন্ধ লম্বা ও বেলুনাকার সজীব কোলেনকাইমা কোষগুলি একত্রে কোলেনকাইমা কলা গঠন করে। কোষ-প্রাকারের কোণে কোণে অধিক পরিমাণে সেলুলোজ ও পেকটিন (pectin) স্তর পড়ায় কোণগুলি সামান্য স্থূল দেখায়। স্বল্প স্থূলীভূত হলেও

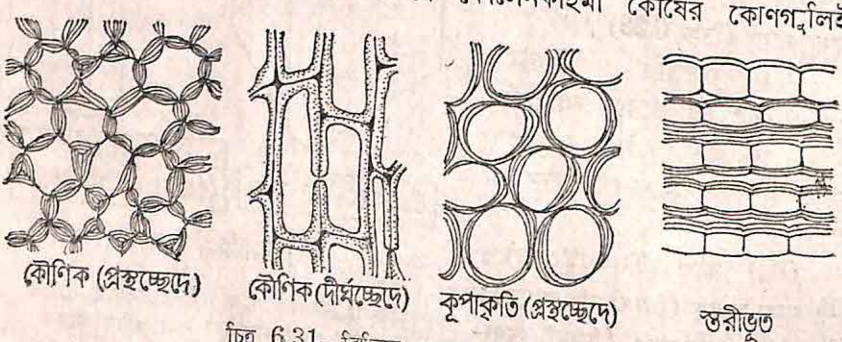


চিত্র 6.30—কোলেনকাইমা A, B, C বিভিন্ন দৃশ্যে।

জীবিত এই কোষগুলিতে সাধারণত ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। প্রকৃতপক্ষে প্যারেন-কাইমার সংযোগে কোণগুলি স্থূল হয়ে কোলেনকাইমার সৃষ্টি হয়।

গঠনের দিক থেকে কোলেনকাইমা তিন প্রকার ঃ—

(a) **কৌণিক** (Angular) ঃ যে কোলেনকাইমা কোষের কোণগুলিই



চিত্র 6.31—বিভিন্ন প্রকার কোলেনকাইমা।

কেবল স্থূল তাকে কৌণিক কোলেনকাইমা বলে। যেমন—লাউ, কুমড়ো, ধুতরো, ডুমুর, ডালিয়া প্রভৃতি কাণ্ডে।

(b) **কূপাকৃতি (Lacunate)** ঃ যে কোলেনকাইমার কোষান্তর রন্ধ্র বেশ বড় এবং সংলগ্ন অংশ স্থূল তাকে কূপাকৃতি কোলেনকাইমা বলে। যেমন—আকন্দের পর্ণবৃন্তে।

(c) **স্তরীভূত (Lamellar)** ঃ (i) যে কোলেনকাইমায় কোষগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট, কোষান্তর রন্ধ্রহীন এবং যাদের স্থূলীভবন পত্রপৃষ্ঠের সমান্তরালে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠে হয়ে থাকে তাকে স্তরীভূত কোলেনকাইমা বলে। যেমন—র‍্যামনাস কাণ্ডে।

(ii) **বিস্তৃতি (Distribution)** ঃ সাধারণত দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের অধস্ত্বকে ; মধ্যশিরায়, বৃন্তে, পুষ্পদণ্ডে একাধিক স্তরে কোলেনকাইমা বিন্যস্ত থাকে।

(iii) **কাজ (Functions)** ঃ

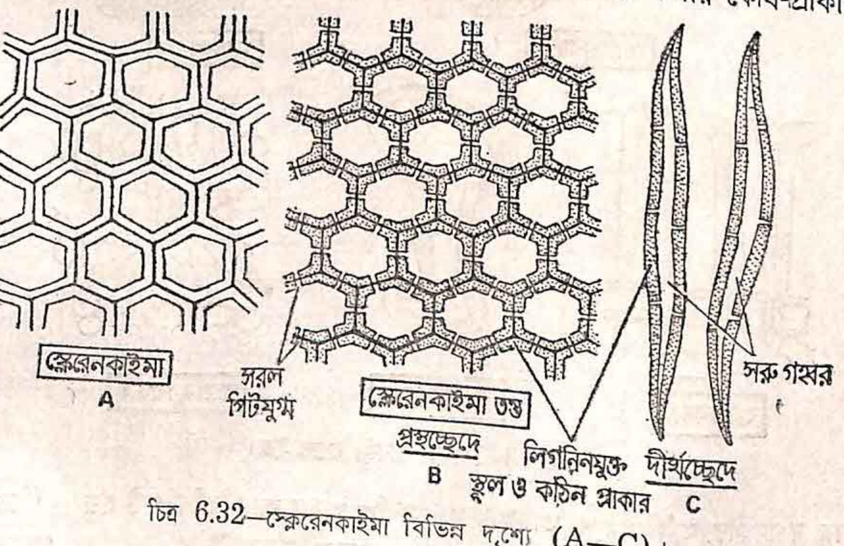
(1) স্থূল হওয়ার জন্য উদ্ভিদঅঙ্গকে বলদান করে (provides mechanical strength) ;

(2) কোষের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায় সময়বিশেষে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে ;

(3) বর্ধনশীল অঙ্গের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে।

(3) **স্ক্লেরেনকাইমা (Sclerenchyma,** গ্রীক—*Skeleros* = কঠিন)

(i) **গঠন (Structure)** ঃ স্থূল প্রাকারবেষ্টিত সরু, দীর্ঘাকৃতি কোষের সমন্বয়ে গঠিত কলাকে **স্ক্লেরেনকাইমা** বলে। এই জাতীয় কলার কোষ-প্রাকার



চিত্র 6.32—স্ক্লেরেনকাইমা বিভিন্ন দৃশ্যে (A—C)।

সমভাবে স্থূল হয়। প্রধানত লিগনিন (lignin) স্তর পড়ার ফলেই কোষ-প্রাকার স্থূল ও কঠিন হয় এবং কোষ-মধ্যবর্তী স্থান ক্রমশঃ সংকুচিত হতে থাকে। পরি-

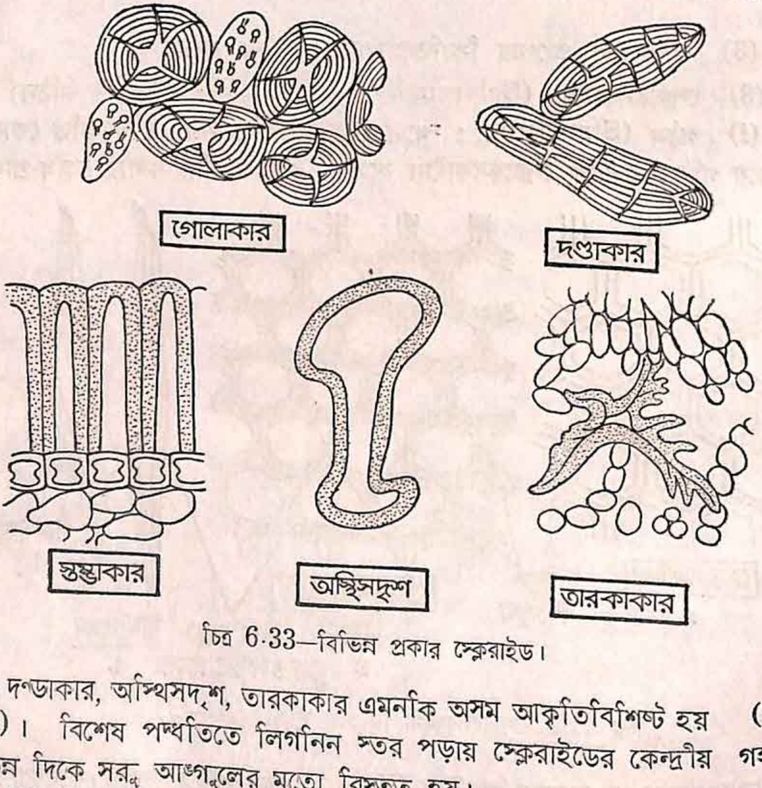
শেষে কোষস্থ প্রোটোপ্লাজমের মৃত্যু ঘটে। তাই স্ক্লেরেনকাইমাকে মৃত কলা বলা হয়। স্ক্লেরেনকাইমা দু'ধরনের কোষ দ্বারা গঠিত :—

(a) **স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু** (Sclerenchyma fibre) : দুমুখ সূচালো লম্বাটে সরল কূপযুক্ত কোষকে স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু বলে (চিত্র 6.32C)। স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু সময় বিশেষে **উড ফাইবার** (wood fibre) বা **বাস্ট ফাইবার** (bast fibre) নামেও পরিচিত। এদের কোষ-প্রাকার সমভাবে স্থূল ও কোষ-গহ্বর সূক্ষ্ম। প্রস্থচ্ছেদে এগুলিকে ষড়ভুজাকার দেখায় (চিত্র 6.32A ও B)।

(ii) **বিস্তৃতি** (Distribution) : কাণ্ডের বহিস্ত্বক, পরিচক্র, ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল প্রভৃতিতে এদের দেখা যায়। পাট, শন প্রভৃতি কাণ্ডের আঁশ প্রকৃতপক্ষে **বাস্ট ফাইবার।**

(iii) **কাজ** (Function) : উদ্ভিদঅঙ্গের দৃঢ়তা যোগায়।

(b) **স্ক্লেরাইড** (Sclereid) : (i) বিশেষ বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট অত্যন্ত কঠিন স্ক্লেরেনকাইমাকে স্ক্লেরাইড বলে। পাথরের মতো কঠিন বলে এরা **প্রস্তর কোষ** বা **স্টোন সেল** (Stone cell) নামেও পরিচিত। এগুলি গোলা-



চিত্র 6.33—বিভিন্ন প্রকার স্ক্লেরাইড।

কার, দণ্ডাকার, অস্থিসদৃশ, তারকাকার এমনকি অসম আকৃতিবিশিষ্ট হয় (চিত্র 6.33)। বিশেষ পদ্ধতিতে লিগনিন স্তর পড়ায় স্ক্লেরাইডের কেন্দ্রীয় গহ্বর বিভিন্ন দিকে সরু আঙুলের মতো বিস্তৃত হয়।

(ii) **বিস্তৃতি** (Distribution) : পেয়ারা, নেসপাতি, আপেল প্রভৃতির ফলে এবং চা পাতায় এদের দেখা যায়।

(iii) **কাজ** (Function) ঃ যান্ত্রিক কলা হিসাবে স্ক্লেরাইড উদ্ভিদ-অঙ্গে দৃঢ়তা দান করে।

6.20. স্ক্লেরেনকাইমা ও ক্লোরেনকাইমার পার্থক্য *[Differences between Sclerenchyma and Chlorenchyma] :*

স্ক্লেরেনকাইমা (Sclerenchyma)	ক্লোরেনকাইমা (Chlorenchyma)
(1) মৃত কোষ দ্বারা গঠিত।	(1) সজীব কোষ দ্বারা গঠিত।
(2) লিগনিন স্তর ক্ষেপনের ফলে কোষ-প্রাকার স্থূল, নমনীয় ও কঠিন।	(2) সেলুলোজ ও পেকটিন দ্বারা গঠিত হওয়ায় নমনীয় ও নরম।
(3) লিগনিন স্তর ক্ষেপন সর্বত্র সমান —তাই কোষ-প্রাকার সর্বত্র সমান স্থূল।	(3) কোষ-প্রাকারের কোণগুলিতেই কেবল সেলুলোজ ও পেকটিন স্তর পড়ে বলে কোষ-প্রাকার সর্বত্র সমান স্থূল নয়।
(4) প্রস্থচ্ছেদে বহুভুজাকার এবং দীর্ঘচ্ছেদে লম্বা ও সূচালো।	(4) প্রস্থচ্ছেদে গোলাকার এবং দীর্ঘ-চ্ছেদে লম্বা ও বেলনাকার।
(5) ক্লোরোপ্লাস্ট একেবারে নাই।	(5) মাঝে মাঝে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।
(6) ক্লোরোপ্লাস্ট না থাকায় খাদ্য উৎপাদনে অক্ষম।	(6) ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায় দরকার মতো খাদ্য উৎপাদন করতে পারে।
(7) একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের অধঃস্ত্বকে, ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের চারদিকে এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পরিচক্রে আংশিক-ভাবে বর্তমান।	(7) দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের অধঃস্ত্বকে বর্তমান।
(8) উদ্ভিদকে বলদান করে।	(8) অল্প পরিমাণে বলদান করে।

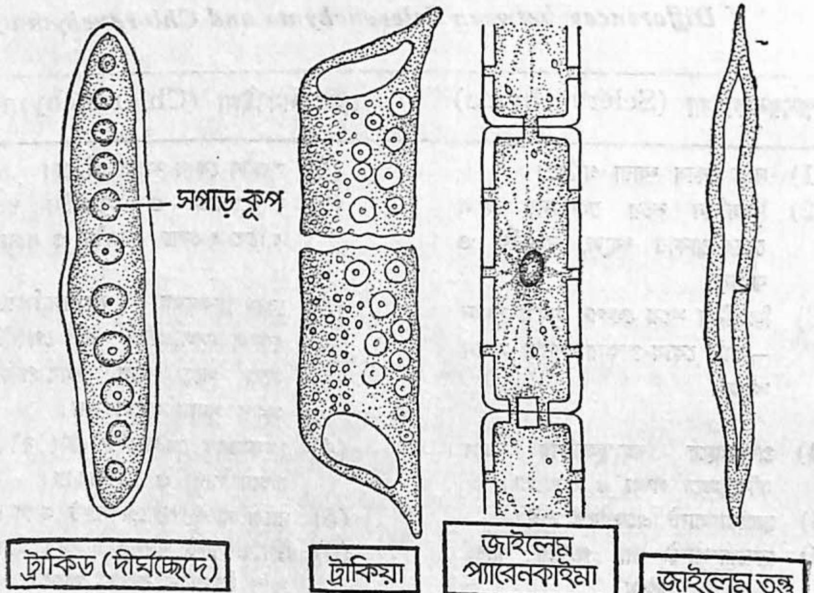
6.21. জটিল কলা *[Complex tissue] :*

● **গঠন ও আকৃতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও একই কাজে লিপ্ত এবং জন্মসূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত কোষসমষ্টিকে জটিল কলা বলে।**

জটিল কলার কোষগুলি বিভিন্ন ধরনের। প্রধান দুটি জটিল কলা হল—জাইলেম ও ফ্লোয়েম। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই একাধিক ভিন্ন চরিত্রের কোষের সমন্বয় ঘটে। জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাধ্যমে উদ্ভিদ-খাদ্য বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চলাচল করে। তাই এদের **সংবহন কলা** (conducting tissue) বলা হয়। প্রধানত জাইলেম ও ফ্লোয়েম একত্রে **ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল** (Vascular bundle) গঠন করে। মাটির জল ও জলে দ্রব অজৈব ও জৈব লবণ জাইলেমের মাধ্যমে উপরে

ওঠে। আর পাতায় প্রস্তুত খাদ্য ফ্লোয়েমের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র সংবাহিত হয়। প্রয়োজনবোধে সঞ্চয়ী অঙ্গ থেকেও একই পথে খাদ্য স্থানান্তরিত হয়।

(1) **জাইলেম** (Xylem ; গ্রীক—*xylos* = কাষ্ঠ) : জাইলেম হ'ল



চিত্র 6.34—জাইলেম কলা।

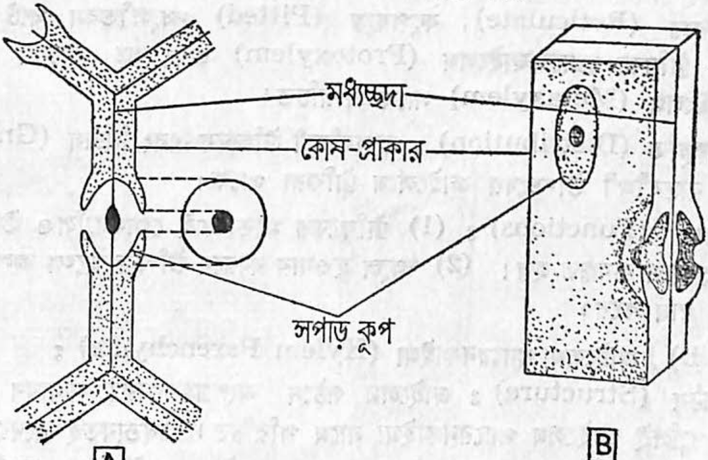
অন্যতম স্থায়ী জটিলকলা। জাইলেম ও ফ্লোয়েম একত্রে ভ্যাস্কুলার বান্ডিল গঠন করে। প্রধানত মৃত এই কলা চারটি বিভিন্ন প্রকার কোষ দ্বারা গঠিত।

(i) **ট্রাকিড** (Tracheid ; ল্যাটিন—*trachea* = শ্বাসনালী) :

গঠন (Structure) : লিগনিনযুক্ত স্থূল কোষ-প্রাকার বেষ্টিত দুই প্রান্ত সরু মৃত লম্বাটে কোষ দ্বারা ট্রাকিড গঠিত। ট্রাকিডে সপাড় কূপ বা বরডার্ড পিট (bordered pit) থাকে (চিত্র 6.35)। এছাড়া ট্রাকিডে **বলয়াকার** (annular), **সর্পিলাকার** (spiral), **সোপানাকার** (scalariform), **জালিকাকার** (reticulate) প্রভৃতি নানারকমের স্থূলীভবন ঘটে।

বিস্তৃতি (Distribution) : গুপ্তবীজী ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের কাণ্ডে, মূলে এবং ফার্ণ গোত্রীয় উদ্ভিদের কাণ্ডে ও মূলের জাইলেমে ট্রাকিড দেখা যায়।

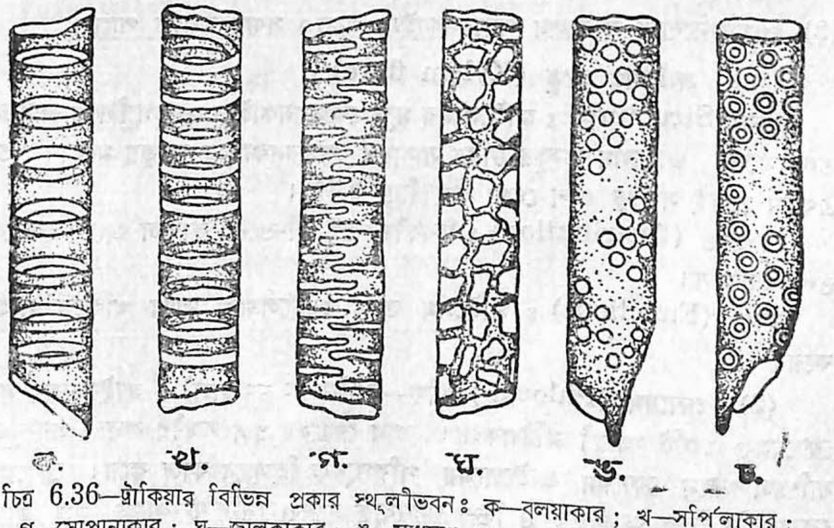
কাজ (Functions) : (1) পাতায় এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বাংশে মূল দ্বারা শোষিত লবণ ও জল পরিবহণ করা ট্রাকিডের প্রধান কাজ। (2) তাছাড়া অত্যধিক স্থূল হওয়ার জন্যে ট্রাকিড উদ্ভিদকে বলদান করে।



চিত্র 6.35—সপাড় কূপ : A—আংশিক প্রস্থদৃশ্যে ; B—ঐ ত্রিমাত্রিক দৃশ্যে

(ii) **ট্রাকিয়া বা ভেসেল** (Trachea or Vessel) :

গঠন (Structure) : অপরিণত দশায় উপরি-উপরি সজ্জিত বেলনাকার



চিত্র 6.36—ট্রাকিয়ার বিভিন্ন প্রকার স্থূলীভবন : ক—বলয়াকার ; খ—সর্পিলাকার ; গ—সোপানাকার ; ঘ—জালকাকার ; ঙ—সাধারণ কূপযুক্ত ; চ—সপাড় কূপযুক্ত।

প্যারেনকাইমা কোষ থেকে ট্রাকিয়া সৃষ্টি হয়। পরিণত হবার সময়ে কোষগুলির সাধারণ প্রস্থপ্রাকার ক্রমশঃ দ্রবীভূত হয়। এইভাবে সৃষ্ট টানা নলকে ট্রাকিয়া

বলে। ট্রাকিয়া মৃত কারণ তাতে প্রোটোপ্লাজম থাকে না। ট্রাকিয়ার পার্শ্ব-প্রাকার লিগনিনযুক্ত, তাই স্থূল। ট্রাকিডের মতো ট্রাকিয়াতেও **বলয়াকার** (Annular), **সর্পিলাকার** (Spiral), **সোপানাকার** (Scalariform), **জালকাকার** (Reticulate), **কূপযুক্ত** (Pitted) স্থূলীভবন ঘটে। ছোট ব্যাসের ট্রাকিয়া **প্রোটোজাইলেম** (Protoxylem) এবং বড় ব্যাসের ট্রাকিয়া **মেটাজাইলেম** (Metaxylem) নামে পরিচিত।

বিস্তৃতি (Distribution) ঃ গুপ্তবীজী উদ্ভিদে এবং নিটাম (Gnetum) নামক ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের জাইলেমে ট্রাকিয়া থাকে।

কাজ (Functions) ঃ (1) ট্রাকিডের মতো এই কোষগুলিও ঊর্ধ্বমুখী রস সংবহনে ব্যবহৃত হয়। (2) স্থূল হওয়ার কারণে উদ্ভিদ-অঙ্গে অল্পবিস্তর দৃঢ়তা দান করে।

(iii) **জাইলেম প্যারেনকাইমা** (Xylem Parenchyma) ঃ

গঠন (Structure) ঃ জাইলেম গঠনে অংশগ্রহণকারী সাধারণ প্যারেন-কাইমাগুলিই জাইলেম প্যারেনকাইমা নামে পরিচিত। স্বভাবতই এদের কোষ-প্রাকার পাতলা। একমাত্র জাইলেম প্যারেনকাইমা জাইলেমের সজীব অংশ (চিত্র 6.34)।

বিস্তৃতি (Distribution) ঃ মজ্জাংশুতে এবং প্রাথমিক ও গৌণ কাষ্ঠে জাইলেম প্যারেনকাইমা বর্তমান।

কাজ (Functions) ঃ (1) জল ও বিভিন্ন অজৈব লবণ পরিবহণ করে। (2) প্রয়োজনবোধে জাইলেম প্যারেনকাইমা খাদ্যও সঞ্চয় করতে পারে।

(iv) **জাইলেম তন্তু** (Xylem fibre) ঃ

গঠন (Structure) ঃ জাইলেমের মৃত স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুগুলিকে জাইলেম তন্তু বলে। জাইলেম তন্তুর চরিত্র সাধারণ স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুর মতো। তবে এখানে প্রায়ই সপাড় কূপ দেখা যায় (চিত্র 6.34)।

বিস্তৃতি (Distribution) ঃ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাষ্ঠল অংশে জাইলেম তন্তু বর্তমান।

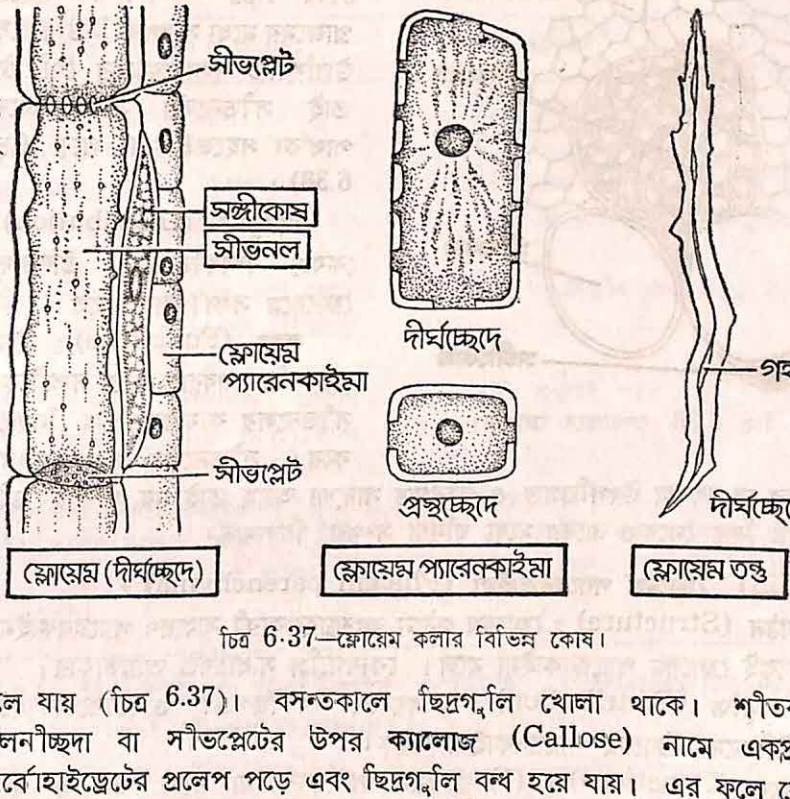
কাজ (Functions) ঃ জাইলেম তন্তু জাইলেমকে খাড়া থাকতে সাহায্য করে।

(2) **ফ্লোয়েম** (Phloem ; গ্রীক—*phloem* = ছাল) ঃ জাইলেমের মতো ফ্লোয়েমও একটি স্থায়ী জটিলকলা। তবে ফ্লোয়েম হল সজীব কলা। ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল গঠনে ফ্লোয়েম জাইলেমের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। ফ্লোয়েমের কোষগুলি ভিন্ন আকৃতির ও ভিন্ন গঠনযুক্ত হয়েও নির্দিষ্ট কাজে লিপ্ত থাকে। চার প্রকার কোষ দ্বারা ফ্লোয়েম গঠিত—

(i) **সীভনল** বা **সীভ টিউব** (Sieve tube) ঃ

গঠন (Structure) ঃ ফ্লোয়েমের প্রধান অংশ **সীভনল**। উপর-নীচে সাজানো

গোলাকার দীর্ঘ কোষগুলিকে **সীভনল** (Sieve tube) বলে। সীভনলের প্রস্থ-প্রাকার চালনীর মতো ছিদ্রযুক্ত। ছিদ্রযুক্ত ঐ প্রস্থ-প্রাকারকে **চালনীচ্ছদা** বা **সীভপ্লেট** (Sieve plate) বলে। সজীব হলেও সীভনলে নিউক্লিয়স থাকে না। সাইটোপ্লাজমের সুতো সংলগ্ন দুটি সীভনলের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। সুতোগুলি সীভপ্লেটের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে এক কোষ থেকে অন্য কোষে



চিত্র 6·37—ফ্লোয়েম কলার বিভিন্ন কোষ।

চলে যায় (চিত্র 6.37)। বসন্তকালে ছিদ্রগুলি খোলা থাকে। শীতকালে চালনীচ্ছদা বা সীভপ্লেটের উপর **ক্যালোজ** (Callose) নামে একপ্রকার কার্বোহাইড্রেটের প্রলেপ পড়ে এবং ছিদ্রগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে কোষে কোষে সংযোগ ব্যাহত হয়। সংযোগে বাধাসৃষ্টিকারী ক্যালোজ-নির্মিত স্তরটিকে **ক্যালাস প্যাড** (Callus pad) বলে। শীতকালে যাতায়াতের পথ বন্ধ থাকে। কিন্তু পরবর্তী বসন্ত ঋতুতে পথ পুনরায় খুলে যায় এবং যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

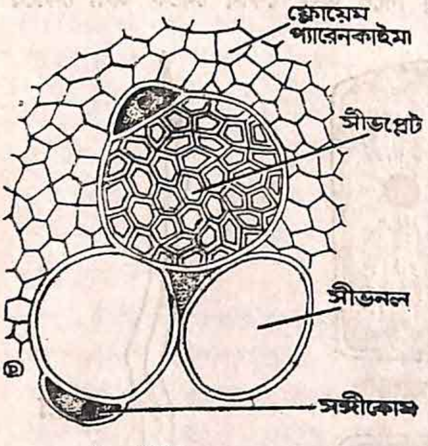
টেরিডোফাইটা ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ফ্লোয়েম কলার সীভনল বিশেষ ধরনের। এদের **সীভকোষ** (Sieve cells) বলে। সীভকোষের গঠন ট্রাকিডের মতো সরু ও লম্বা।

বিস্তৃতি (Distribution) ঃ ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদ ও সমস্ত ফ্যানারোগ্যাম বা সপুষ্পক গোষ্ঠীর গাছের ফ্লোয়েমে সীভনল থাকে।

কাজ (Function) ঃ পাতায় উৎপন্ন খাদ্য সীভনলের ভিতর দিয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে পরিবেশিত হয়।

(ii) **সঙ্গীকোষ** (Companion cells) ঃ

গঠন (Structure) ঃ সীভনল সংলগ্ন পাতলা প্রাকারাবন্ধ বিশেষ ধরনের লম্বাটে সজীব কোষগুলি সঙ্গীকোষ (চিত্র 6.37)। ঘন সাইটোপ্লাজমের মধ্যে সুস্পষ্ট নিউক্লিয়সের উপস্থিতি সঙ্গীকোষের বৈশিষ্ট্য। তাই সীভনলের সঙ্গে এদের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে (চিত্র 6.38)।



চিত্র 6.38—প্রস্থচ্ছেদে ফ্লোয়েম।

বিস্তৃতি (Distribution) ঃ কেবল দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ফ্লোয়েমে সঙ্গীকোষ থাকে।

কাজ (Functions) ঃ সম্ভবত শক্তি সরবরাহ দ্বারা সঙ্গীকোষ সীভনলের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। সীভনলের সঙ্গে সঙ্গীকোষের যে কেবল উৎপত্তিগত ও গঠনগত সাদৃশ্য আছে তাই নয়, শারীরবৃত্তীয় কাজের দিক থেকেও এদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

(iii) **ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা** (Phloem parenchyma) ঃ

গঠন (Structure) ঃ ফ্লোয়েম গঠনে অংশগ্রহণকারী সাধারণ প্যারেনকাইমাগুলিকেই ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা বলে। কোষগুলি সাধারণত আয়তাকার।

বিস্তৃতি (Distribution) ঃ অধিকাংশ দ্বিবীজপত্রী* ও টেরিডোফাইটাভুক্ত উদ্ভিদের ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে।

কাজ (Functions) ঃ (1) ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা **খাদ্য সঞ্চয় ও খাদ্য পরিবহণ** করে। (2) সীভটিউবের কাজ শেষ হলে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা লিগনিন সঞ্চয় ক'রে মোটা হয় এবং ফ্লোয়েম তন্তুতে রূপান্তরিত হয়।

(iv) **ফ্লোয়েম তন্তু** (Phloem fibre) ঃ

গঠন (Structure) ঃ ফ্লোয়েম-সংলগ্ন স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুগুলিকে বা ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থেকে পরিবর্তিত তন্তুগুলিকে ফ্লোয়েম তন্তু বলে। এদের প্রাকারে সরল কূপ বা পিট থাকে। তন্তুগুলিতে জীবন্ত পদার্থ বলতে কিছুই থাকে না। কোষগহ্বরও খুব সরু। প্রথম সৃষ্ট ফ্লোয়েম কোষগুলি চ্যাপ্টা হয়ে গিয়ে ফ্লোয়েম তন্তু গঠন করে বলে মনে করা হয়।

* ব্যতিক্রম—র‍্যানানকিউলেসি গোত্রভুক্ত কিছু গাছ।

বিস্তৃতি (Distribution) : অধিকাংশ দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদে এদের দেখা যায়।

কাজ (Function) : ফ্লোয়েম তন্তু উদ্ভিদ অঙ্গে দৃঢ়তা দান করে।

6.22. সীভনল ও ট্রাকিয়ার পার্থক্য [*Distinction between Sieve tube and Trachea*] :

সীভনল (Sieve tube)	ট্রাকিয়া (Trachea)
(1) ফ্লোয়েম কলার অংশ।	(1) জাইলেম কলার অংশ।
(2) কোষগুলি সজীব।	(2) কোষগুলি মৃত।
(3) একই সারিতে বিন্যস্ত থাকে কিন্তু প্রস্থপ্রাকার বিলুপ্ত হয় না।	(3) একই মাটিতে বিন্যস্ত থাকে কিন্তু প্রস্থপ্রাকার বিলুপ্ত হয়।
(4) প্রস্থপ্রাকার ছিদ্রযুক্ত হয়ে চালুনীচ্ছদা বা **সীভপ্লেট** (Sieve plate) গঠন করে।	(4) এ জাতীয় অঙ্গ গঠিত হয় না।
(5) শীতকালে সীভপ্লেট **ক্যালাস** প্যাডে (Callus pad) ঢাকা থাকে।	(5) ক্যালাস প্যাড সৃষ্টি হয় না।
(6) কোষ-প্রাকার পাতলা।	(6) কোষ-প্রাকার স্থূল।
(7) পাতায় উৎপন্ন খাদ্য সীভনল দ্বারা বিভিন্ন অঙ্গে পরিবেশিত হয়।	(7) মাটি থেকে শোষিত জল ট্রাকিয়া দ্বারা ওপরে ওঠে।

6.23. ট্রাকিড ও ট্রাকিয়ার পার্থক্য [*Distinction between Tracheid and Trachea*] :

ট্রাকিড (Tracheid)	ট্রাকিয়া (Trachea)
(1) ট্রাকিড উভয় প্রান্ত সরু কোষ দ্বারা গঠিত।	(1) সমব্যাসবিশিষ্ট একটানা নলের মতো কোষ দ্বারা গঠিত।
(2) টেরিডোফাইট, ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদদেহে **বর্তমান**।	(2) কেবল গুপ্তবীজী উদ্ভিদে বর্তমান—অর্থাৎ গুপ্তবীজী উদ্ভিদের এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
(3) রসসংবহন, জলসঞ্চয় এবং বলদান করা প্রধান কাজ।	(3) রসসংবহন ও বলদান করে।

6.24. জাইলেম তন্তু ও ফ্লোয়েম তন্তুর পার্থক্য [*Distinction between xylem fibre and phloem fibre*] :

জাইলেম তন্তু (Xylem fibre)	ফ্লোয়েম তন্তু (Phloem fibre)
(1) এটি জাইলেমের অন্যতম উপাদান।	(1) এটি ফ্লোয়েমের অন্যতম উপাদান।
(2) জাইলেম তন্তু জাইলেমের একমাত্র মৃত কলা নয়।	(2) ফ্লোয়েম তন্তু ফ্লোয়েমের একমাত্র মৃত কলা।

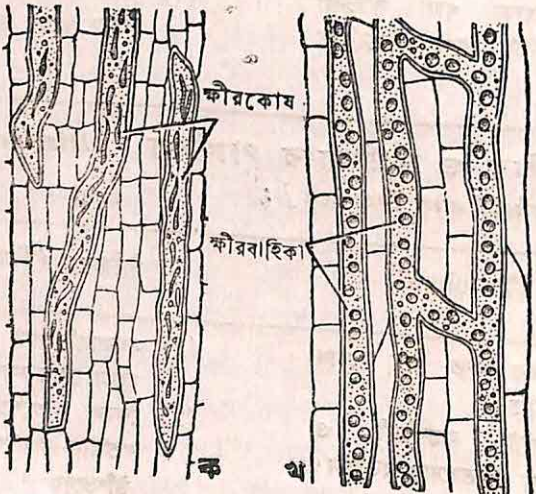
6.25. বিশেষ কলা [*Special tissue*] :

অনেক উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ কলা থাকে। প্রধানত ক্ষরণের কাজে ব্যবহৃত এই কলাগুলি দুভাগে বিভক্ত ঃ—ল্যাটিসিফেরাস কলা এবং গ্রন্থি কলা।

1. **ল্যাটিসিফেরাস কলা** (Laticiferous tissue) ঃ আকন্দ, ভেরাণ্ডা, করবী প্রভৃতি গাছে দুধের মতো একপ্রকার তরল পদার্থ থাকে। একে **তরুক্ষীর বা ল্যাটেক্স** (Latex) বলে। কোষের সাইটোপ্লাজম থেকে ল্যাটেক্স ক্ষরিত হয়। বাতাসের সংস্পর্শে এলে ল্যাটেক্স অতি দ্রুত জমে যায়। ল্যাটেক্স উৎপাদনকারী কলা দুধরনের—

(a) **ল্যাটেক্স কোষ** বা **ক্ষীরকোষ** (Latex cell) ঃ

গঠন (Structure) ঃ শাখা-প্রশাখাযুক্ত সত্ত্বেও এই কোষগুলি কখনই



চিত্র 6.39—ক—ক্ষীরকোষ ও খ—ক্ষীরনালী (ক্ষীরবাহিকা)।

পরস্পর মিলিত হয় না, এককভাবে বিন্যস্ত থাকে (চিত্র 6.39ক)। কোষ ক্রমশঃ দীর্ঘ হওয়ায় ক্ষীর কোষের উৎপত্তি হয়।

বিস্তৃতি (Distribution) ঃ আকন্দ, বট, ইউফরবিয়া, করবী প্রভৃতি গাছের কান্ডে ক্ষীরকোষ আছে।

(b) **ল্যাটেক্স ভেসেল বা ক্ষীরনালী বা ক্ষীরবাহিকা** (Latex vessel) ঃ

গঠন (Structure) ঃ সরু অথচ দীর্ঘ কতকগুলি কোষের অন্তর্বর্তী প্রাকার লুপ্ত হয়ে গিয়ে ল্যাটেক্স ভেসেল বা ক্ষীরনালী গঠিত হয়। শাখা-প্রশাখা-যুক্ত এই নালীগুলি পরস্পর যুক্ত থাকে (চিত্র 6.39খ)।

বিস্তৃতি (Distribution) ঃ শেয়ালকাঁটা, কচু, রবার প্রভৃতি গাছের কান্ডে ক্ষীরনালী আছে।

কাজ (Functions) ঃ উদ্ভিদ ভেদে ল্যাটিসিফেরাস কলার কাজ বিভিন্ন

(1) সাধারণত বিপাকজাত বর্জ্যপদার্থ ল্যাটিসিফেরাস কলায় সঞ্চিত হয়। যেমন, ইউফরবিয়া গাছের ল্যাটেক্সে শ্বেতসার বা স্টার্চ সঞ্চিত থাকে।

(2) করবী, আকন্দ প্রভৃতি গাছের ল্যাটেক্স সংশ্লিষ্ট কোষ থেকে সংগৃহীত জল সঞ্চয় করে রাখে।

(3) শিয়ালকাঁটার বিষাক্ত ল্যাটেক্স উদ্ভিদকে পরোক্ষভাবে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

(4) রবার গাছের ল্যাটেক্স থেকে রবার তৈরী হয়। এই ল্যাটেক্সের বাণিজ্যিক মূল্য অপরিসীম।

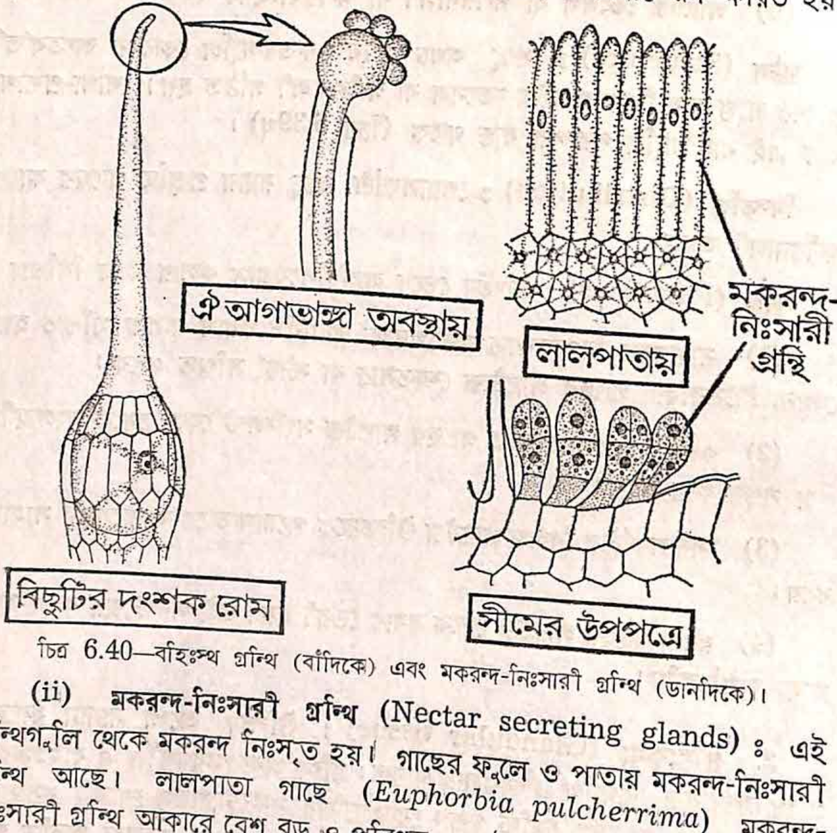
2. **গ্রন্থিকলা** (Glandular tissue) ঃ উদ্ভিদ অঙ্গে নানান ধরনের গ্রন্থি দেখা যায়। এগুলি গ্রন্থিকলায় গঠিত। গ্রন্থি অন্তঃক্ষরণশীল ও বহিঃক্ষরণ-শীল একগুচ্ছ কোষের সমষ্টি মাত্র। কোষগুলির সাইটোপ্লাজম থেকেই রসক্ষরণ হয়। ক্ষরিত পদার্থ ভ্যাকুওলে সঞ্চিত থাকে। গঁদ, রজন, মকরন্দ প্রভৃতি হল নানা রকমের ক্ষরণজাত পদার্থ। গ্রন্থিকলা গঠনকারী কোষগুলি সজীব। এদের সেলুলোজ নির্মিত কোষ-প্রাকার অত্যন্ত পাতলা। গ্রন্থিকলা দুরকমের—বহিঃস্থ গ্রন্থি ও অন্তঃস্থ গ্রন্থি।

(a) **বহিঃস্থ গ্রন্থি** (External glands) ঃ

কান্ড বা পাতার উপবর্ধিত অঙ্গরূপে বহিঃস্থ গ্রন্থি বিদ্যমান। বহিঃস্থ গ্রন্থি নানাপ্রকার—যেমন, গ্রন্থিরোম, মকরন্দ নিঃসারী গ্রন্থি, এনজাইম নিঃসারী গ্রন্থি ইত্যাদি।

(i) **গ্রন্থিরোম** (Glandular hairs) ঃ গ্রন্থিরোম এককোষী বা বহু-কোষী। গ্রন্থিরোমের কোষ সজীব এবং তাতে সুস্পষ্ট নিউক্লিয়স থাকে।

তবে কোষ-প্রাকার অত্যন্ত পাতলা বা অত্যধিক পুরু। গ্রন্থিরোম থেকে নানান ধরনের পদার্থ ক্ষরিত হয়। বিছুটির এককোষী দংশক রোম বিষাক্ত রসপূর্ণ (চিত্র 6.40)। রোমের গোড়ায় অবস্থিত গ্রন্থি থেকে বিষাক্ত রস ক্ষরিত হয়।



চিত্র 6.40—বহিঃস্থ গ্রন্থি (বাঁদিকে) এবং মকরন্দ-নিঃসারী গ্রন্থি (ডানদিকে)।

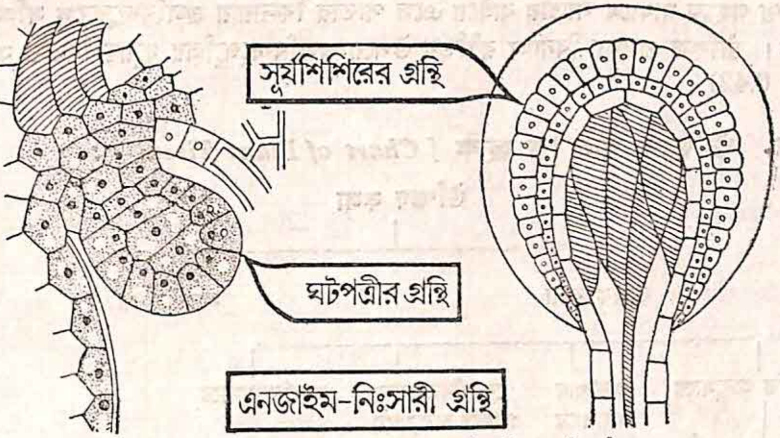
(ii) **মকরন্দ-নিঃসারী গ্রন্থি** (Nectar secreting glands) ঃ এই গ্রন্থিগুলি থেকে মকরন্দ নিঃসৃত হয়। গাছের ফুলে ও পাতায় মকরন্দ-নিঃসারী গ্রন্থি আছে। লালপাতা গাছে (*Euphorbia pulcherrima*) মকরন্দ-নিঃসারী গ্রন্থি আকারে বেশ বড় ও পরিণত। তাই একে খুব ভালভাবে পরীক্ষা করা যায়। এছাড়া সীমের উপপত্রে মকরন্দ-নিঃসারী গ্রন্থি আছে (চিত্র 6.40)।

(iii) **এনজাইম-নিঃসারী গ্রন্থি** (Enzyme secreting glands) ঃ পতঙ্গভুক উদ্ভিদগুলিতেই প্রধানত এনজাইম-নিঃসারী গ্রন্থি থাকে। ঘটপত্রী, সূর্যশিশির বা পাতাঝাঁঝি প্রভৃতি গাছে এনজাইম-নিঃসারী গ্রন্থি আছে (চিত্র 6.41)। দেহে আবদ্ধ কীট-পতঙ্গকে পরিপাক করার জন্য গ্রন্থিগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিওলাইটিক এনজাইম (Proteolytic enzyme) নিঃসৃত হয়।

(b) **অন্তঃস্থ গ্রন্থি** (Internal glands) ঃ এমন অনেক গাছ আছে যাদের কাণ্ডে, মূলে, পাতায়, ফলে এমন কি ফুলের মধ্যেও গ্রন্থি থাকে। এই গ্রন্থিগুলিকে অন্তঃস্থ গ্রন্থি বলে। অন্তঃস্থ গ্রন্থি নানা প্রকার, যেমন—

(i) **রজন নালী** (Resin ducts) ঃ পাইন মূলের প্রোটোজাইলেম গুচ্ছের মধ্যে রজন নালী থাকে।

(ii) **তৈল গ্রন্থি** (Oil glands) ঃ সূর্যমুখী, লেবু, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি গাছের পাতায় তৈল গ্রন্থি আছে।

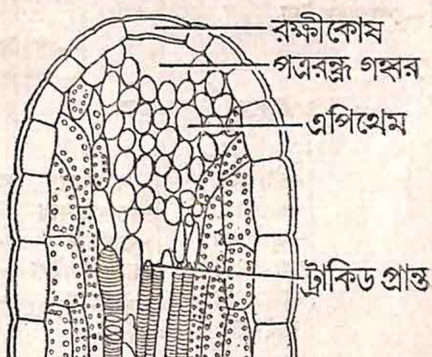


চিত্র 6·41—বিভিন্ন উদ্ভিদের এনজাইম-নিঃসারী গ্রন্থি।

(iii) **মিউসিলেজ নালী** (Mucilage ducts) ঃ সাইকাস গাছে হড়হড়ে পিচ্ছিল মিউসিলেজবাহী মিউসিলেজ নালী বর্তমান। এই মিউসিলেজ থেকে সাগু জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়।

6.26. হাইডাথোড [*Hydathode*] :

হাইডাথোড বিশেষ ধরনের জল নির্মোচক অংগ। বিশেষ আকৃতির এই অংগের মধ্যে দিয়ে বিন্দু বিন্দু জল বাইরে বেরিয়ে যায়। গুমোট গরমের দিনে টমেটো, কচু, ভাইটিস, ট্রোপিওলম প্রভৃতি গাছের পাতার কিনারায় জলের ফোঁটা সাজান থাকে। এই-সব জলবিন্দুর উপস্থিতি হাইডাথোডের অবস্থান নির্দেশ করে। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে উদ্ভিদদেহ থেকে জল পরিত্যক্ত হয় বলে হাইডাথোডকে **ওয়াটার স্টোমাটা** বা **জল-পত্ররন্ধ্র** (water stomata) বলা হয়। হাইডাথোডের আগায় রক্ষীকোষে আবদ্ধ একটি ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্রের



চিত্র 6.42—হাইডাথোডের গঠন (দীর্ঘচ্ছেদে)।

নীচে থাকে পত্ররন্ধ্র গহ্বর বা বাতাবকাশ (air cavities)। বাতাবকাশের নীচে অবস্থিত অসংলগ্ন কতকগুলি প্যারেনকাইমা কোষকে একত্রে **এপিথেম** (Epithem) বলে। এপিথেমের নীচে ট্রাকিডের আগা শেষ হয়। ট্রাকিড থেকে জল বেরিয়ে এসে এপিথেম কলার কোষান্তর রন্ধ্রে জমা হয়। সেখান থেকে জল পত্ররন্ধ্র গহ্বর মাধ্যমে পাতার বাইরে এসে পাতার কিনারায় জলবিন্দুরূপে সজ্জিত থাকে। ট্রাকিড প্রান্তে বিন্যাস রীতির উপরে জলবিন্দুগুলির দূরত্ব নির্ভর করে (চিত্র 6.42)।

6.27. উদ্ভিদ কলার ছক [*Chart of Plant Tissue*] :

উদ্ভিদ কলা

- ভাজক কলা
  - উৎপত্তি অনুসারে
    - প্রাথমিক
    - গৌণ
  - অবস্থান অনুসারে
    - অগ্রস্থ
    - নিবেশিত
    - পার্শ্বস্থ
  - কোষবিভাজনের প্রকৃতি অনুসারে
    - মাস
    - প্লেট
    - রিব
  - কার্য অনুসারে
    - প্রোটোডার্ম
    - প্রোক্যাম্বিয়ম স্ট্র্যান্ড
    - গ্রাউন্ড মেরিস্টেম
    - (আদি কলা)
- স্থায়ী কলা
  - সরল
    - প্যারেনকাইমা
    - কোলেনকাইমা
    - স্ক্লেরেনকাইমা
  - জটিল
    - জাইলেম
      - ট্রাকিড
      - ট্রাকিয়া
      - জাইলেম প্যারেনকাইমা
      - জাইলেম ফাইবার
    - ফ্লোয়েম
      - সীভনল
      - সঙ্গীকোষ
      - ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা
      - ফ্লোয়েম ফাইবার
  - বিশেষ
    - ল্যাটিসিফেরাস কলা
      - ল্যাটেক্স (ক্ষীর) কোষ
      - ল্যাটেক্স (ক্ষীর) নালী
    - গ্রন্থিকোষ
      - অন্তঃস্থ গ্রন্থি
        - রজননালী
        - তৈল গ্রন্থি
        - মিউসিলেজ নালী
      - বহিঃস্থ গ্রন্থি
        - গ্রন্থিরোম
        - মকরন্দ-নিঃসারী
        - এনজাইম-নিঃসারী
    - হাইডাথোড

প্রাণিকলা
(Animal Tissues)

6.28. প্রাণিকলা [*Animal tissue*] :

গঠন ও কাজের ভিত্তিতে প্রাণিকলা চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত : (i) আবরণী কলা, (ii) যোগ কলা, (iii) পেশী কলা ও (iv) নার্ভ কলা।

6.29. আবরণী কলা [*Epithelial tissue*] :

● **সংজ্ঞা** (Definition) : **যে কলা দেহত্বকের আবরণ বা দেহাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অঙ্গের উপরে পাতলা আচ্ছাদন সৃষ্টি করে তাকে আচ্ছাদক বা আবরণী কলা বলে।**

আবরণী কলার কোষগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট। এক স্তরে বিন্যস্ত আবরণী কলাকে **সরল** (Simple) এবং বহুস্তরে বিন্যস্ত আবরণী কলাকে **যৌগিক** বা **স্তরীভূত** (Stratified) আবরণী কলা বলে।

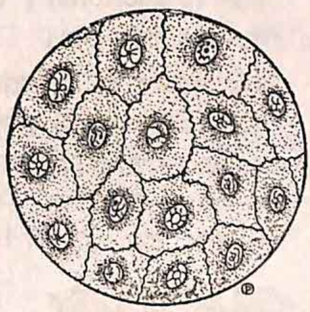
(A) **সরল আবরণী কলা** (Simple epithelial tissue) : এটি নানা প্রকার :

(1) **আঁইশাকার** বা **স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ম** (Squamous epithelium) :

গঠন (Structure) : স্কোয়ামাস কলার অর্থ আঁশের মতো (scale-like)। এই ধরনের আবরণী কলার কোষগুলি চ্যাপ্টা, পাতলা ও অসম আকৃতি-বিশিষ্ট। কোষগুলি পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থেকে দেহরক্ষাকারী পর্দা গঠন করে। প্রতিটি কোষে প্রচুর সাইটোপ্লাজম ও স্ফীতকায় নিউক্লিয়স বর্তমান (চিত্র 6.43A)।

বিস্তৃতি (Occurrence or Distribution) : হৃৎপিণ্ড, রক্তনালী, মুখগহ্বর, ফুসফুস প্রভৃতি অঙ্গের ভিতরের আবরণে এই কলা দেখা যায়।

কাজ (Functions) : (i) সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে রক্ষা করে, (ii) তরল ও বায়ব পদার্থ চলাচলে সহায়তা করে।



চিত্র 6.43 (A)—আঁইশাকার বা স্কোয়ামাস আবরণী কলা।

(2) **ঘনকাকার** বা **কিউবইডাল** বা **কিউবিক্যাল এপিথেলিয়ম** (Cuboidal or Cubical epithelium) :

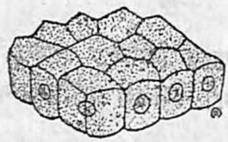
গঠন (Structure) : বহুভুজ-বিশিষ্ট ঘনক (cube) আকারের এপিথেলিয়মকে কিউবইডাল এপিথেলিয়ম বলে।

বিস্তৃতি (Distribution) : এই কলা মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৃক্ক, নাসিকা, লালাগ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি প্রভৃতির আবরণ সৃষ্টি করে।

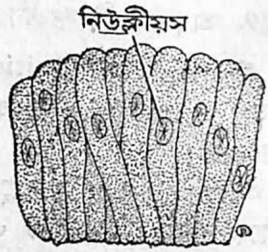
কাজ (Functions) ঃ (i) সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে রক্ষা করে এবং (ii) রস নিঃসরণ করে।

(3) **স্তম্ভাকার** বা **কলামনার এপিথেলিয়ম** (Columnar epithelium) ঃ

গঠন (Structure) ঃ কলামনার কথার অর্থ স্তম্ভাকার। অর্থাৎ এই ধরনের আবরণী কলার কোষগুলি স্তম্ভাকারে সজ্জিত থাকে। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অপেক্ষা এদের উচ্চতা বেশী। কোষগুলির নিউক্লিয়সও আকারে বড় (চিত্র 6.43C)।



চিত্র 6.43(B)—ঘনকাকার বা কিউবইডাল আবরণী কলা।



চিত্র 6.43 (C)—স্তম্ভাকার বা কলামনার আবরণী কলা।

বিস্তৃতি (Distribution) ঃ এই কলা পাকস্থলী ও অন্ত্রের ভিতরে থাকে।

কাজ (Functions) ঃ (i) সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে রক্ষা করে, (ii) রস নিঃসরণ ও রসশোষণে অংশ নেয়।

(4) **রোমশ বা সিলিয়েটেড এপিথেলিয়ম** (Ciliated epithelium) ঃ

গঠন (Structure) ঃ সিলিয়া কথার অর্থ রোম। এটি প্রকৃতপক্ষে কলামনার এপিথেলিয়মের পরিবর্তিত রূপ। কলামনার এপিথেলিয়মের কোষগুলির মুক্ত-প্রান্তে অসংখ্য **রোম** বা **সিলিয়া** (Cilia) থাকলে সেগুলিকে সিলিয়েটেড এপিথেলিয়ম বলে (চিত্র 6.44)।



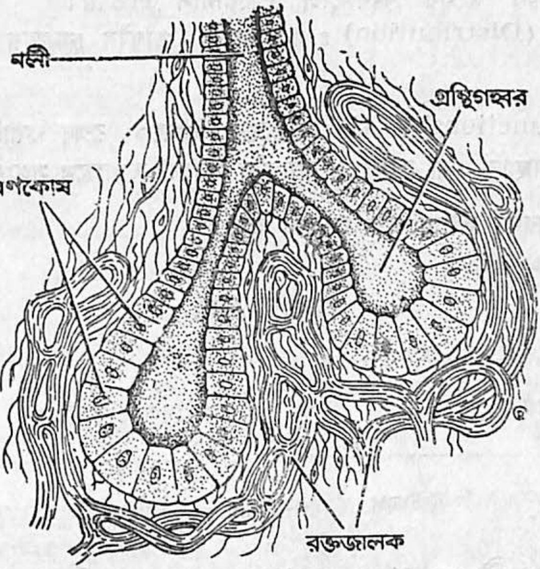
চিত্র 6.44—সিলিয়েটেড এপিথেলিয়ম।

বিস্তৃতি (Distribution) ঃ শ্বাসনালী, ইউরেটার, ফ্যালোপিয়ান টিউব এমন কি স্পাইনাল কর্ডের নালীতেও এই কলা দেখা যায়।

কাজ (Functions) ঃ (i) নাসাপথে হঠাৎ খাদ্য প্রবেশ করলে এই কলা সিলিয়া বিক্ষেপ দ্বারা তাকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। (ii) বিশেষ একপ্রকার পিচ্ছিল রস নিঃসরণ করে।

(5) গ্রন্থিময় বা গ্ল্যান্ডুলার এপিথেলিয়ম (Glandular epithelium) ঃ

গঠন (Structure) ঃ গ্ল্যান্ড কথার অর্থ গ্রন্থি। কিউবইডাল বা কলামনার এপিথেলিয়ম থেকে প্রয়োজন মতো গ্ল্যান্ডুলার এপিথেলিয়ম উৎপন্ন হয়। গ্ল্যান্ড



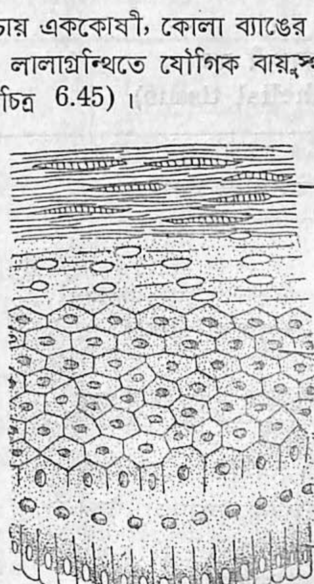
চিত্র 6.45—গ্ল্যান্ডুলার এপিথেলিয়ম।

বা গ্রন্থি এককোষী বা বহুকোষী। কেঁচোয় এককোষী, কোলা ব্যাঙের ত্বকে থলি-সদৃশ, মানুষের অন্ত্রে নালিকাকার এবং লালাগ্রন্থিতে যৌগিক বায়ুস্থলী সদৃশ গ্ল্যান্ডুলার এপিথেলিয়ম দেখা যায় (চিত্র 6.45)।

বিস্তৃতি (Distribution) ঃ ঘর্মগ্রন্থি, লালাগ্রন্থি, বৃক্ক প্রভৃতিতে এই ধরনের এপিথেলিয়ম দেখা যায়।

কাজ (Functions) ঃ (i) দেহের বিশেষ বিশেষ আবরণ গঠন করে, (ii) প্রয়োজনীয় নানা প্রকার রস নিঃসরণ করে।

(B) যৌগিক বা স্তরীভূত আবরণী কলা বা স্ট্র্যাটিফাইড আচ্ছাদক কলা (Stratified epithelial tissue) ঃ



চিত্র 6.46—যৌগিক বা স্তরীভূত কলা।

গঠন (Structure) ঃ যৌগিক এপিথেলিয়মের কোষগুলি একাধিক স্তরে সজ্জিত থাকে (চিত্র 6.46)। বেসমেণ্ট মেমব্রেন বা ভিত্তিপর্দা সংলগ্ন প্রথম স্তরের কোষগুলি কলামনার প্রকৃতির। মধ্যের কোষগুলি কিউবইডাল এবং একেবারে বাইরের স্তরের কোষগুলি স্কোয়ামাস জাতীয়।

বিস্তৃতি (Distribution) ঃ মেরুদণ্ডী প্রাণীর চামড়ায় ও মুখবিবরে অবস্থিত।

কাজ (Functions) ঃ (i) ভিতরের অঙ্গকে রক্ষা করাই এদের প্রধান কাজ, (ii) তাছাড়া এরা তরল ও বায়বীয় পদার্থ সঞ্চালনে সহায়তা করে।

নীচে আবরণী কলার ছক দেওয়া হল ঃ—

আবরণী কলা

- সরল
  - স্কোয়ামাস
  - কিউবইডাল
  - কলামনার
  - সিলিয়েটেড
  - গ্ল্যাণ্ডুলার
- যৌগিক বা স্তরীভূত

6.30. আবরণী কলা ও যোগকলার পার্থক্য *[Differences between Epithelial tissue and Connective tissue]* :

আবরণী কলা (Epithelial tissue)	**যোগকলা** (Connective tissue)
(1) ভ্রূণের এণ্ডোডার্ম বা এক্টোডার্ম স্তর থেকে গঠিত হয়।	(1) ভ্রূণের মেসোডার্ম স্তর থেকে গঠিত হয়।
(2) অঙ্গের আবরণ গঠন করে।	(2) দেহাঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে।
(3) ঘনসন্নিবিষ্ট কোষগুলিতে আন্তঃকোষীয় পদার্থের পরিমাণ কম থাকে।	(3) আলগাভাবে বিন্যস্ত থাকায় কোষগুলিতে আন্তঃকোষীয় পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকে।
(4) আন্তঃকোষীয় পদার্থের কোন তন্তু নাই।	(4) আন্তঃকোষীয় পদার্থে বিভিন্ন প্রকার তন্তু বর্তমান।
(5) কোষগুলি ভিত্তিঝিল্লির (basement membrane) উপর অবস্থিত।	(5) কোষগুলি ভিত্তিঝিল্লির উপর অবস্থিত নয়।
(6) রক্তনালী অনুপস্থিত।	(6) রক্তনালী বর্তমান।

6.31. যোগকলা বা কানেকটিভ টিস্যু *[Connective Tissue]*:

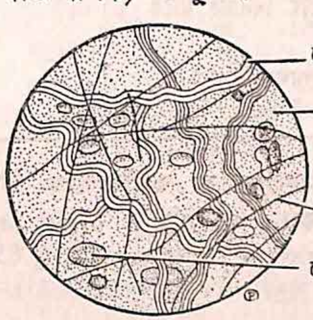
যে কলা দেহের অন্যান্য কলা ও অঙ্গসমূহের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে তাকে যোগকলা বলে। ভ্রূণস্থ মেসেনকাইম কোষ থেকে যোগকলার উৎপত্তি হয়। মেসেনকাইম কোষগুলিতে দীর্ঘ প্রোটোপ্লাজমীয় সূত্র বর্তমান।

গঠন (Structure) ঃ যোগকলা মূলত ম্যাট্রিক্স বা ধাত্র, গ্রাউণ্ড সাবস্টেন্স বা ভূমিবস্তু ও তন্তু দ্বারা গঠিত। যোগকলার তন্তু ও ধাত্র প্রকৃতপক্ষে কোষ থেকেই তৈরী হয়।

প্রাণিদেহের অধিকাংশ অঙ্গ গঠনে যোগকলা ব্যবহৃত হয়। যোগকলা নানা রকমের ঃ—যেমন **এরিওলার, অ্যাডিপোজ, স্কেলিটাল** ও **ভ্যাসকুলার**।

(1) **এরিওলার কলা** বা **তন্তুকলা** (Areolar tissue or Fibrous tissue) ঃ

এই কলা কোষ ও তন্তু দ্বারা গঠিত। তন্তুগুলি দু'ধরনের—**পীততন্তু** (Yellow fibre) বা **ইলাসটিক** (স্থিতিস্থাপক) **তন্তু** (Elastic fibre) এবং **শ্বেততন্তু** (White fibre) (চিত্র 6.47)। জেলির মতো যে পদার্থে তন্তু ও কোষগুলি ভেসে বেড়ায় তাকে **ম্যাট্রিক্স** (matrix) বলে। বিবর্ণ ও ঢেউ খেলানো তন্তুগুলি শ্বেততন্তু। এগুলি সাধারণ গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত থাকে এবং কখনই শাখা-প্রাশাখায় বিভক্ত হয় না। সূক্ষ্ম পীত বা ইলাসটিক তন্তুগুলি এককভাবে ছড়িয়ে থাকে। এগুলি শাখা-প্রশাখায় ভাগ হয়ে যায়। তন্তুগুলি অত্যন্ত স্থিতি-স্থাপক।



চিত্র 6.47—এরিওলার কলা।

এরিওলার কলায় নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকার কোষ দেখা যায় ঃ

(a) **ফাইব্রোব্লাস্ট** বা **ফাইব্রোসাইট** (Fibroblast or Fibrocyte) ঃ এরা শ্বেততন্তু গঠন করে।

(b) **হিসটিওসাইট** বা **ক্ল্যাসমাটোসাইট** (Histiocyte or Clasmatocyte) ঃ এরা ব্যাকটিরিয়া বা বহিরাগত পদার্থকে আত্মসাৎ করার পর নিজ কোষ থেকে প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ক্ষরণ করে তাদের ধ্বংস করে।

(c) **বেসোফিল বা বেসিফিল কোষ** (Basophil or Basiphil cell) ঃ এই কোষগুলি হেপারিন, হিস্টামিন, সেরোটোনিন প্রভৃতি উৎপাদন করে।

(d) **প্লাজমা কোষ** (Plasma cell) ঃ এরা গামা গ্লোবিউলিন উৎপাদন করে।

(e) **পিগমেণ্ট কোষ** (Pigment cell) ঃ এইসব কোষ মেলাটোনিন ও মেলানিন পিগমেণ্ট তৈরী করে।

(f) **মাস্ট কোষ** (Mast cell) ঃ এদের কাজ বেসোফিল কোষের অনুরূপ।

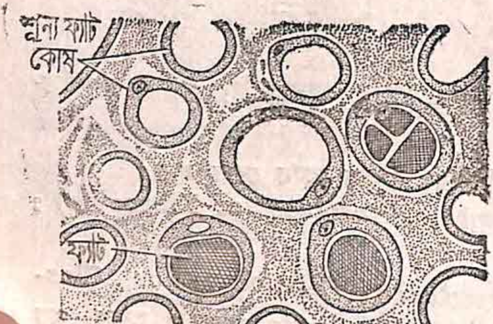
বিস্তৃতি (Distribution) ঃ দেহের প্রায় সর্বত্র এই কলা বিস্তৃত।

কাজ (Functions) ঃ **যোগকলার কোষান্তর রন্ধ্রে** অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এরা দৃঢ়তা দান করে এবং প্যাকিং-এর কাজ করে।

● **পীততন্তু ও শ্বেততন্তুর পার্থক্য** (Distinction between yellow fibre and white fibre) ঃ

পীততন্তু (Yellow fibre)	শ্বেততন্তু (White fibre)
(1) হলুদ বর্ণের।	(1) শ্বেত বর্ণের।
(2) ইলাস্টিন নামক প্রোটিনে গঠিত।	(2) কোলাজেন নামক প্রোটিনে গঠিত।
(3) গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত থাকে না।	(3) গুচ্ছাকারে তরঙ্গায়িত অবস্থায় থাকে।
(4) শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট।	(4) শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট নয়।
(5) অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক।	(5) মোটেই স্থিতিস্থাপক নয়.

(2) **মেদকলা বা অ্যাডিপোজ টিস্যু** (Adipose tissue) ঃ এই কলা এরিওলার কলার পরিবর্তিত রূপ। এদের কোষগুলির কোষগহ্বর তৈল ও ফ্যাট জাতীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে (চিত্র 6.48)। ফ্যাটের আধিক্যের ফলে কোষের নিউক্লিয়স পরিধির দিকে সরে যায়। এরিওলার কলার হালকা কাঠামোয় অ্যাডিপোজ কলার কোষগুলি দাঁড়িয়ে থাকে। কোষগুলি বড়, গোলাকার বা ডিম্বাকার।



চিত্র 6.48—মেদকলা।

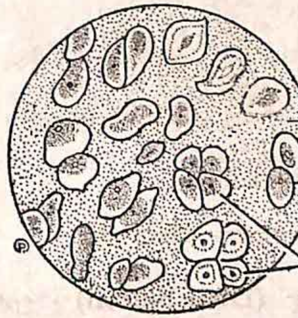
বিস্তৃতি (Distribution) ঃ মেদকলা বিস্তীর্ণ দেহাঞ্চল জুড়ে বিন্যস্ত থাকে। বৃক্ক, চক্ষুগোলক প্রভৃতির ক্ষেত্রে মেদকলা প্রাকৃতিক গদির (natural cushion) কাজ করে।

কাজ (Functions) ঃ (i) ভবিষ্যতে প্রয়োজনমতো ব্যবহারের জন্য মেদ-কলা অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত রাখে। (ii) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক

আকার প্রদান করে। (iii) দেহযন্ত্রকে সঠিক জায়গায় রেখে তাকে আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করে।

(3) **কঙ্কাল কলা বা স্কেলিটাল টিস্যু** (Skeletal tissue) ঃ এই কলা মেরুদণ্ডী প্রাণীর অন্তঃকঙ্কাল গঠন করে। কঙ্কাল দুপ্রকার—তরুণাস্থি ও অস্থি।

(a) **তরুণাস্থি (কোমলাস্থি) বা কার্টিলেজ** (Cartilage) ঃ তরুণাস্থি একপ্রকার পরিবর্তিত যোগকলা। অপেক্ষাকৃত কঠিন হলেও এই কলা নমনীয় এবং স্থিতিস্থাপক। তরুণাস্থির কোষগুলি পনির জাতীয় **কনড্রিন** (Chondrin) নামে একপ্রকার অর্ধস্বচ্ছ, দৃঢ় ম্যাট্রিক্স বা ধাত্রে ছড়ানো থাকে। কোষগুলিকে **কনড্রিওব্লাস্ট** (Condrioblast) বলে। পরিষ্কার ধাত্রে দু-ধরনের তন্তু-কলাই ছড়ান থাকতে পারে। **হায়ালিন বা কাচিক কার্টিলেজ** (Hyaline cartilage), **ফাইব্রো কার্টিলেজ** (Fibro cartilage), **ইলাসস্টিক বা স্থিতিস্থাপক কার্টিলেজ** (Elastic cartilage) প্রভৃতি হল নানা ধরনের তরুণাস্থি। তরুণাস্থিকে ঘিরে যে তন্তুময় যোগকলার আবরণ সৃষ্টি হয় তাকে **পেরিকনড্রিয়ম** (Perichondrium) বলে।



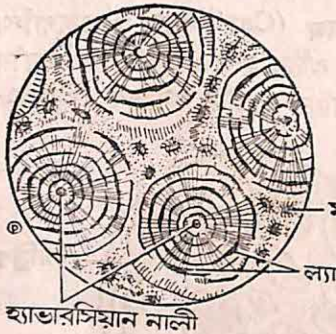
চিত্র 6.49—তরুণাস্থির গঠন (প্রস্থচ্ছেদে)।

বিস্তৃতি (Distribution) ঃ স্তন্যপায়ীর বহিঃকর্ণে, নাসিকায়, শ্বাস-নালীতে, অনেক অস্থির প্রান্তসমূহে এবং হাঙর, শঙ্করমাছ প্রভৃতির দেহে তরুণাস্থি আছে।

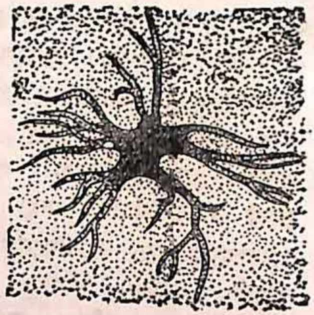
কাজ (Functions) ঃ স্থিতিস্থাপকতা ও দৃঢ়তার দিক থেকে এটির স্থান তন্তুকলা ও অস্থির মাঝামাঝি। এদের প্রধান কাজ যান্ত্রিক। তরুণাস্থি অঙ্গের আকার ও ঋজুতা দান করে।

(b) **অস্থি** (Bone) (চিত্র 6.50) ঃ অধিকাংশ মেরুদণ্ডী প্রাণীর কঙ্কাল অস্থি দ্বারা গঠিত। অন্যান্য কলা অপেক্ষা অস্থি অধিকতর দৃঢ়। অস্থির ফাঁপা মধ্যভাগ মজ্জায় (marrow) পূর্ণ থাকে। ক্যালসিয়ম ফসফেট এবং কোলাজেন দ্বারা অস্থির ম্যাট্রিক্স বা ধাত্র গঠিত। ধাত্র বিভিন্ন স্তরে সাজানো থাকে। প্রতিটি স্তরকে **ল্যামেলা** (lamella) বলে। ল্যামেলাগুলি **হ্যাভারসিয়ান নালী** (Haversian canal) নামে একটি নালীকে ঘিরে সমকেন্দ্রিকভাবে সাজানো থাকে। ল্যামেলার ভিতরের ছোট গহ্বরগুলির প্রত্যেকটিকে বলে **ল্যাকুনা** (Lacuna)। ল্যাকুনাগুলি কতকগুলি শাখায়িত **ক্যানালিকিউলি** (Canaliculi) নালী দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। ল্যাকুনায় মাকড়সার মতো **অস্থি-**

কোষ বা **অস্টিওব্লাস্ট** (Ostioblast) বিক্ষিপ্ত থাকে। অস্থির বাইরে যোগকলার আবরণকে **পেরিঅস্টিয়ম** (Periosteum) বলে। ঘনত্ব ও দৃঢ়তার উপর ভিত্তি ক'রে অস্থি দু-রকম—**আইভরি** বা **কমপ্যাক্ট** বা **ডেন্স বোন** (Ivory or compact or dense bone) এবং **ক্যানসেলেটেড** বা **স্পঞ্জ বোন** (Cancellated or spongy bone)।



চিত্র 6.50—প্রস্থচ্ছেদে অস্থির গঠন।



চিত্র 6.51—একটি অস্থিকোষ।

বিস্তৃতি (Distribution) ঃ প্রথমটি সমস্ত অস্থির বাইরের স্তরে এবং দীর্ঘ অস্থির **ডায়াফাইসিস** (diaphysis)-এ বিস্তৃত। দ্বিতীয়টি চ্যাপ্টা অস্থির ভিতরের অংশে এবং লম্বা অস্থির গোলাকার প্রান্তে বিস্তৃত।

কাজ (Functions) ঃ (i) শৈশবে ও বাল্যে অস্থির বৈশিষ্ট্য তরুণাস্থির বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। স্থিতিস্থাপকতার জন্য অস্থি ঐ সময় ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং দেহের বৃদ্ধি ঘটায়। (ii) দেহের কঙ্কালতন্ত্র গঠন দ্বারা দেহকে ঋজু রাখে। (iii) বক্ষের অঙ্গসমূহ, মস্তিষ্ক, নার্ভ প্রভৃতিকে আঘাত থেকে রক্ষা করে। (iv) ক্যালসিয়ম, ফসফরাস প্রভৃতি খনিজ পদার্থ সঞ্চয় করে। (v) পেশীকে নানাভাবে বিন্যস্ত থাকতে সাহায্য করে।

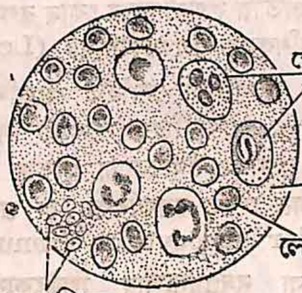
● **অস্থি ও তরুণাস্থির পার্থক্য** (Distinction between a Bone and a Cartilage) ঃ

অস্থি (Bone)	তরুণাস্থি (Cartilage)
(1) এটি কঠিনতম যোগকলা।	(1) এটি অর্ধকঠিন যোগকলা।
(2) স্থিতিস্থাপক নয়।	(2) স্থিতিস্থাপক।
(3) অস্থি থেকে তরুণাস্থি গঠিত হয় না।	(3) তরুণাস্থি থেকে অস্থি গঠিত হয়।

অস্থি (Bone)	তরুণাস্থি (Cartilage)
(4) দেহের কাঠামো গঠন, চলন, দেহযন্ত্র সুরক্ষা, রক্তকণিকা উৎপাদন প্রভৃতি কাজের সঙ্গে যুক্ত।	(4) অস্থি গঠন ছাড়াও তরুণাস্থির প্রধান কাজ অস্থির সংযোজক অংশকে দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক করা।
(5) পেরিঅস্টিয়ম নামে তন্তুময় আবরণে অস্থি আবদ্ধ থাকে।	(5) পেরিকর্নড্রিয়ম নামে তন্তুময় আবরণে তরুণাস্থি ঢাকা থাকে।
(6) হ্যাভারসিয়ান নালী থাকে।	(6) হ্যাভারসিয়ান নালী থাকে না।
(7) ল্যাকুনা বর্তমান—এতে অস্থি-কোষ (অস্টিওসাইট) থাকে।	(7) ল্যাকুনার মধ্যে তরুণাস্থি কোষ (কনড্রিওব্লাস্ট) থাকে।
(8) ধাত্র তন্তুবিহীন।	(8) ধাত্র তন্তুময়।

(4) **শোণিত কলা বা ভ্যাস্কুলার টিস্যু বা রক্ত বা হিমোপোয়িটিক টিস্যু (Vascular tissue or Blood or Haemopoietic tissue) :**

গঠন (Structure) : **রক্ত এক বিশেষ ধরনের তন্তুবিহীন তরল যোগ কলা।** এই কলা কখনই স্থির থাকে না—সর্বদা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করে। এটি (a) **রক্তকণিকা** (Blood corpuscles), (b) **অণুচক্রিকা বা প্লেটলেট** (Platelets) এবং (c) **রক্তরস বা প্লাজমা** (Plasma) দ্বারা গঠিত। রক্ত বা শোণিত কলার কোষগুলি (রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকা) রক্তরস বা প্লাজমায় ভেসে বেড়ায়।



চিত্র 6.52—মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত।

(a) **রক্তকণিকা** (Blood Corpuscles) :

রক্তে প্রধানত দু' প্রকার রক্তকণিকা বর্তমান—(i) **লোহিত রক্তকণিকা** (Red blood corpuscles) বা R.B.C. এবং (ii) **শ্বেত রক্তকণিকা** (White blood corpuscles)।

(1) **লোহিত রক্তকণিকা** (Red blood corpuscles) : রক্তে লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইটের (Erythrocytes) সংখ্যা বেশী। এদের আকারও তুলনামূলকভাবে ছোট। **অধিকাংশ মেরুদণ্ডী প্রাণীর লোহিত রক্তকণিকায় বড় একটি নিউক্লিয়স থাকে।** মানুষসহ সমস্ত স্তন্যপায়ীর (mammal) অপরিণত লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়স থাকলেও পরিণত অবস্থায় নিউক্লিয়স থাকে না

(ব্যতিক্রম উট)। অধিকাংশ প্রাণীর লোহিত রক্তকণিকায় **হিমোগ্লোবিন** (haemoglobin) নামে লৌহঘটিত শ্বাসরঞ্জক থাকায় অক্সিজেনের সংস্পর্শে রক্তকে লাল দেখায়।

উৎপত্তি স্থল (Site of origin) : অস্থি ও মজ্জা থেকে লোহিত কণিকাগুলি উৎপন্ন হয়।

● **মানুষের রক্তে লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ** (Number of R.B.C. in human blood) :

সুস্থ পুরুষ মানুষের প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে প্রায় 50 লক্ষ লোহিতকণিকা থাকে।

আয়ু (Life) : মানুষের লোহিত রক্ত কণিকার গড় আয়ু প্রায় 120 দিন। নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল উত্তীর্ণ হবার পর লোহিত রক্তকণিকা যকৃৎ (liver) ও প্লীহায় (spleen) বিনষ্ট হয়।

কাজ (Functions) : (i) দেহের সর্বত্র অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহণ করে।

(ii) দেহে অম্ল বা অ্যাসিড এবং ক্ষার বা অ্যালকালির ভারসাম্য রক্ষা করে।

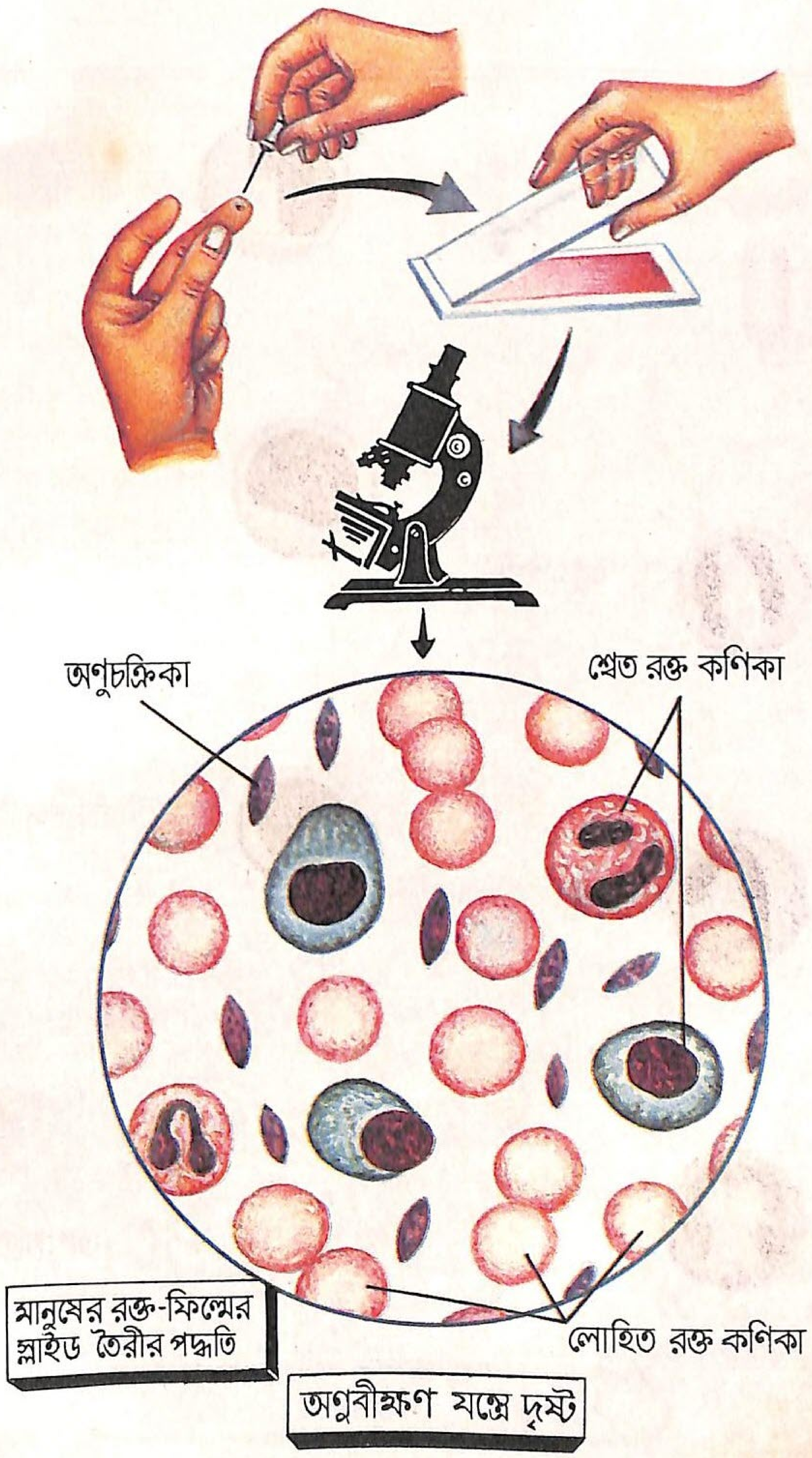
(2) **শ্বেত রক্তকণিকা** (White Blood Corpuscles) :

এই জাতীয় রক্তকণিকায় কোন রঞ্জক পদার্থ না থাকায় এরা বর্ণহীন। সেজন্য শ্বেতরক্তকণিকাকে **লিউকোসাইট** (Leucocytes, leucos = সাদা) বলা হয়।

শ্বেত রক্তকণিকা লোহিত রক্তকণিকার তুলনায় আকারে বড় ও সংখ্যায় কম। এদের প্রত্যেকটিতে সুস্পষ্ট নিউক্লিয়স বর্তমান। নিউক্লিয়স ও সাইটোপ্লাজমের প্রকৃতির বিভিন্নতা থাকায় শ্বেত রক্তকণিকা প্রধান দুভাগে বিভক্ত— (i) দানাময় **শ্বেত রক্তকণিকা** বা **গ্র্যানুলার লিউকোসাইট** বা **গ্র্যানুলোসাইট** (Granular leucocyte or Granulocyte) এবং (ii) **দানাবিহীন শ্বেত রক্তকণিকা** বা **ননগ্র্যানুলার লিউকোসাইট** (Non-granular Leucocyte or Agranulocyte)।

(i) **দানাময় শ্বেত রক্তকণিকা** : ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই এই জাতীয় শ্বেত রক্তকণিকা অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন হয়। সাইটোপ্লাজমের ধারণ ক্ষমতা ও নিউক্লিয়সের খণ্ড-সংখ্যা অনুসারে এদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

(1) **নিউট্রোফিল** (Neutrophil) : এই জাতীয় শ্বেত রক্তকণিকার নিউক্লিয়স 2-7 খণ্ডে বিভক্ত। নিউট্রোফিলের সাইটোপ্লাজম কোন রং নেয় না, অর্থাৎ এরা রং নিরপেক্ষ। রক্তে এদের সংখ্যাই সর্বাধিক (60—70%) অর্থাৎ, 3,000—6,000 প্রতি ঘন মিলিমিটারে। এদের ফ্যাগোসাইটোসিস মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। নিউট্রোফিলের গড় ব্যাস 10—12μ।


অণুচক্রিকা
শ্বেত রক্ত কণিকা
মানুষের রক্ত-ফিল্মের স্লাইড তৈরীর পদ্ধতি
লোহিত রক্ত কণিকা
অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট



মানুষের বিভিন্ন প্রকার রক্তকণিকা

(2) **ইয়োসিনোফিল** (Eosinophil) : যেসব শ্বেত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজম ইয়োসিন (eosin) নামে অম্লধর্মী রঞ্জকে লাল রং ধারণ করে সেগুলিকে ইয়োসিনোফিল বলে। এদের সাইটোপ্লাজমের দানাগুলি অপেক্ষাকৃত বড় এবং নিউক্লিয়স 2—3 খণ্ডে বিভক্ত। ইয়োসিনোফিলের সংখ্যা 1—4%, অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটারে 150—400। এদের ফ্যাগোসাইটোসিস মনোভাব দেখা যায় না। ইয়োসিনোফিলের গড় ব্যাস 10—12μ।

(3) **বেসোফিল** (Basophil) : যে সব শ্বেত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজম ক্ষারধর্মী রঞ্জকে (basic stain) রংগীন হয় তাদের বেসোফিল বলে। বেসোফিলের সাইটোপ্লাজমে অসংখ্য বড় বড় গোলাকার দানা দেখা যায়। এদের নিউক্লিয়স সাধারণত বৃক্কাকার (kidney shaped) অথবা সামান্য খণ্ডিত। এদের সংখ্যা 0—1%, অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটারে 0—100। বেসোফিলের গড় ব্যাস 8—10μ।

(ii) **দানাবিহীন শ্বেত রক্তকণিকা** : এটি প্রধানত দুপ্রকার :—

1. **লিম্ফোসাইট** (Lymphocyte) : **বড়** (গড় ব্যাস 12μ) ও **ছোট** (গড় ব্যাস 7·5μ) দুধরনের লিম্ফোসাইট আছে। এদের নিউক্লিয়স গোলাকার বা বৃক্কাকার এবং সংখ্যা 25—30%, অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটারে 1,500—2700।

2. **মোনোসাইট** (Monocyte) : প্রথমাবস্থায় এদের নিউক্লিয়স গোলাকার থাকে। পরে বৃক্কাকার বা অশ্বক্ষুরাকৃতি হয়ে যায়। নিউক্লিয়স গোলাকার বলে বড় লিম্ফোসাইট থেকে এদের পৃথক করা হয়েছে—তবে সাইটোপ্লাজমের প্রকৃতি দেখে এদের সনাক্ত করা সহজ। কারণ মোনোসাইটের সাইটোপ্লাজম বুদবুদযুক্ত (frosted), কিন্তু লিম্ফোসাইটের সাইটোপ্লাজম কাচের মতো স্বচ্ছ। মোনোসাইটের গড় ব্যাস 16—18μ। এদের সংখ্যা 5—10%। অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটারে 350—800।

● **মানুষের রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার পরিমাণ** (Number of W.B.C. in human blood) :

মানুষের রক্তে লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকার গড় অনুপাত 700 : 1। সুস্থ মানুষের প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে 5—10 হাজার শ্বেতকণিকা থাকে। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের শ্বেত রক্তকণিকায় নিউট্রোফিল 60—70%, ইয়োসিনোফিল 1—4%, বেসোফিল 0—1%, লিম্ফোসাইট 25—30% এবং মোনোসাইট 5—10%।

উৎপত্তি স্থল (Site of origin) : দানাময় শ্বেত রক্তকণিকা লাল অস্থি-মজ্জা থেকে এবং দানাবিহীন শ্বেত রক্তকণিকাগুলি প্লীহা (Spleen), লিম্ফ-গ্রন্থি (Lymph node) ও আংশিকভাবে অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন হয়।

আয়ু (Life) : শ্বেত রক্তকণিকার গড় আয়ু 1—15 দিন।

পরিণতি (Fate) ঃ প্রতিটি শ্বেত রক্তকণিকাই নিয়মিত বিশ্লিষ্ট হয় এবং মরে যায়। নিউট্রোফিল, ইয়োসিনোফিল ও বেসোফিল, অর্থাৎ গ্র্যানুলোসাইট-গুলি রক্তসংবহন তন্ত্রের মধ্যে এবং অধিকাংশ লিম্ফোসাইট প্রধানতঃ অন্ত্র ও মিউকাসপর্দা মাধ্যমে নির্গত ও বিনষ্ট হয়।

কাজ (Functions) ঃ

(1) **ফ্যাগোসাইটোসিস** (Phagocytosis) ঃ নিউট্রোফিল, মোনোসাইট প্রভৃতি শ্বেত রক্তকণিকাগুলি ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে বিজাতীয় পদার্থ ও ব্যাকটিরিয়াকে আত্মসাৎ করে এবং সাধারণত তাদের হজম করে ফেলে।

(2) **অ্যান্টিবডি উৎপাদন** (Production of antibody) ঃ লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি নামে একপ্রকার প্রোটিন উৎপাদন দ্বারা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

(3) **ফাইব্রোব্লাস্ট উৎপাদন** (Production of fibroblast) ঃ দেহের প্রদাহ অঞ্চলে (area of inflamation) ফাইব্রোব্লাস্টে রূপান্তরিত হয়ে লিম্ফোসাইট দেহের মেরামতির কাজ করে।

(4) **হেপারিন ক্ষরণ** (Secretion of heparin) ঃ হেপারিন ক্ষরণ করে বেসোফিল রক্তনালীর ভিতরে রক্তকে জমাট বাঁধতে দেয় না।

(5) **অ্যালার্জী বিরোধী কাজ** (Anti-alergic action) ঃ ইয়োসিনো-ফিল মধ্যস্থ হিস্টামিন দেহকে অ্যালার্জির হাত থেকে রক্ষা করে।

(b) **অণুচক্রিকা** বা **প্লেটলেট** (Platelets) বা **থ্রম্বোসাইট** (Thrombo-cytes) ঃ

সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার নিউক্লিয়সবিহীন রক্তকোষকে **অণুচক্রিকা** বা **প্লেটলেট** বা **থ্রম্বোসাইট** বলে। অস্থিমজ্জার মেগাকেরিওসাইট (megakaryocyte) নামক কোষের ক্ষণপদ থেকে অণুচক্রিকা সৃষ্টি হয়। প্রতি ঘন মিলিমিটার মানব রক্তে প্রায় 2,50,000—5,00,000 অণুচক্রিকা থাকে। এদের গড় আয়ু 3 দিন।

(c) **রক্তরস** বা **প্লাজমা** (Plasma) ঃ

রক্তকণিকা যে ধাত্রে ভেসে বেড়ায় তাকে **রক্তরস** বা **প্লাজমা** বলে। এটি এক-প্রকার পীতাভ সান্দ্র (viscous) তরল পদার্থ। রক্তরসের 91—92% জল এবং বাকি অংশ বিভিন্ন জৈব ও অজৈব উপাদানে গঠিত।

● **রক্তের কাজ** (Functions of blood) ঃ

(i) লোহিতকণিকা হিমোগ্লোবিনের সাহায্যে দেহকোষে অক্সিজেন পরি-বহণ করে এবং দেহের ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড বাইরে পাঠাতে সাহায্য করে।

(ii) শ্বেতকণিকা দেহের অনুগত দেহরক্ষীর কাজ করে, কারণ ব্যাকটিরিয়া বা যে কোন রোগ-জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে সর্বাগ্রে তাদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

(iii) কিছু শ্বেতকণিকা দেহে **অ্যাণ্টিবডি** (Antibody) উৎপাদন দ্বারা দেহকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে।

(iv) তাছাড়া এরা **হিস্টামিন** (Histamine) ক্ষরণ ক'রে দেহকে অ্যালার্জীর হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে।

(v) শ্বেতকণিকাগুলির **হেপারিন** অণুচক্রিকা ভেঙে **থ্রম্বোপ্লাসটিন** (Thromboplastin) নামে একপ্রকার পদার্থ উৎপাদন দ্বারা রক্ততঞ্চনে অর্থাৎ রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

নিচে বিভিন্ন প্রকার যোগকলার ছক দেওয়া হল ঃ—

- যোগকলা
  - এরিওলার
  - অ্যাডিপোজ
  - স্কেলিটাল
    - অস্থি
    - তরুণাস্থি
  - ভ্যাস্কুলার

6.32(A). হিমোগ্লোবিন ও হিমোসায়ানিনের পার্থক্য *[Differences between Haemoglobin and Haemocyanin] :*

হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin)	হিমোসায়ানিন (Haemocyanin)
(1) এটি লৌহঘটিত প্রোটিন।	(1) এটি তাম্রঘটিত প্রোটিন।
(2) হিমোগ্লোবিনের সংস্পর্শে রক্তের রং হয় লাল।	(2) হিমোসায়ানিনের সংস্পর্শে রক্ত কিছুটা নীলাভ, প্রায় বর্ণহীন।
(3) অক্সিজেনের সংস্পর্শে **অক্সিহিমোগ্লোবিন** গঠন করে।	(3) অক্সিজেনের সংস্পর্শে **অক্সিহিমোসায়ানিন** গঠন করে।
(4) রক্তের রং হয় টকটকে লাল।	(4) রক্তের রং দাঁড়ায় নীলাভ।
(5) মেরুদণ্ডী ও কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণীর (যেমন, কেঁচো) রক্তরসে হিমোগ্লোবিন দ্রবীভূত থাকে।	(5) মেরুদণ্ডী নয়—কেবল অমেরুদণ্ডী (যেমন—চিংড়ি জাতীয়) প্রাণীর রক্তরসে হিমোসায়ানিন দ্রবীভূত থাকে।
(6) এটি মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী উভয় প্রকার প্রাণিদেহে বর্তমান।	(6) এটি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণিদেহে বর্তমান।

(B) রক্ত ও লসিকার পার্থক্য [*Differences between Blood and Lymph*] :

রক্ত (Blood)	লসিকা (Lymph)
(1) রক্তের রং লাল।	(1) লসিকার রং হরিদ্রাভ।
(2) এতে লোহিত কণিকা বর্তমান।	(2) এতে লোহিত কণিকা নেই।
(3) রক্তে দানাময় ও দানাহীন শ্বেত রক্তকণিকা থাকে।	(3) লসিকায় প্রধানত দানাহীন লিম্ফোসাইট থাকে।
(4) এতে ফাইব্রিনোজেন নামক প্রোটিন থাকে।	(4) এতে ফাইব্রিনোজেন থাকে না।
(5) রক্তে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী।	(5) লসিকায় প্রোটিনের পরিমাণ কম।
(6) ধমনী, শিরা ও জালকের মাধ্যমে রক্ত পরিবাহিত হয়।	(6) লসিকাবাহর মাধ্যমে লসিকা পরিবাহিত হয়।
(7) হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা রক্ত দেহে পরিবাহিত হয়।	(7) হৃৎপিণ্ডের সংকোচন নয়—লসিকাবাহের সংকোচন দ্বারা লসিকা পরিবাহিত হয়।

(C) লোহিত রক্তকণিকা ও শ্বেত রক্তকণিকার পার্থক্য [*Differences between Red Blood Corpuscles and White Blood Corpuscles*] :

লোহিত রক্তকণিকা (R.B.C.)	শ্বেত রক্তকণিকা (W.B.C.)
(1) কোষগুলি একই প্রকার।	(1) কোষগুলি বিভিন্ন প্রকার।
(2) কোষগুলি নির্দিষ্ট আকারের এবং তুলনামূলকভাবে ছোট।	(2) নির্দিষ্ট আকারের নয়—তুলনামূলকভাবে বড়।
(3) পরিণত লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়স থাকে না।	(3) শ্বেত রক্তকণিকায় সর্বদা নিউক্লিয়স থাকে।
(4) এতে হিমোগ্লোবিন থাকে।	(4) এতে হিমোগ্লোবিন থাকে না।
(5) এদের সংখ্যা অনেক বেশী।	(5) এদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম (700 : 1)।
(6) অস্থি-মজ্জায় উৎপন্ন হয়।	(6) অস্থি-মজ্জা, লসিকাগ্রন্থি, টনসিল প্রভৃতির মধ্যে উৎপন্ন হয়।
(7) এগুলি অক্সিজেন ও খাদ্যরস পরিবহন করে।	(7) এগুলি জীবাণু ধ্বংস করে।
(8) এদের আয়ু বেশী (120 দিন)।	(8) এদের আয়ু কম (12—13 দিন)।

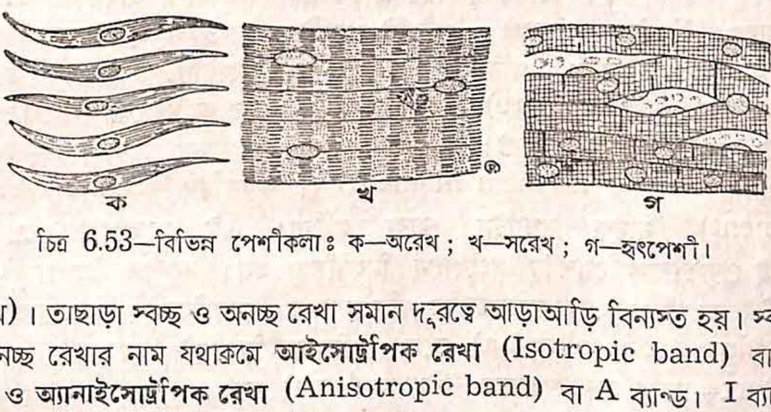
6.33. পেশীকলা বা মাস্কুলার টিস্যু [*Muscular tissue*] :

গঠন (Structure) : পেশীকলা পেশীকোষ দ্বারা গঠিত। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **ফাইব্রিল** (fibril) সম্বলিত কোষগুলিকে পেশীতন্তু (muscle fibre) বলে। কোষে সাধারণত একাধিক নিউক্লিয়স থাকে। সংকোচনশীলতা পেশীকলার প্রধান ধর্ম। খাদ্যের বিপাকজাত শক্তি থেকে পেশী সংকোচনে প্রয়োজনীয় শক্তি আসে।

পেশীর সংকোচন ইচ্ছাধীন বা ইচ্ছাধীন নয়, তার উপর নির্ভর করে পেশীকলাকে দুভাগে ভাগ করা হয়—**ঐচ্ছিক** (Voluntary) ও **অনৈচ্ছিক** (Involuntary)। ঐচ্ছিক পেশীকে ইচ্ছামত নাড়ানো যায়। ঐচ্ছিক পেশী হাত ও পায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে। অনৈচ্ছিক পেশীকে স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অন্ত্র, পাকস্থলী, রক্তনালীর প্রাকার—এমনকি হৃৎপিণ্ডও অনৈচ্ছিক পেশী দ্বারা গঠিত।

গঠনের দিক থেকে পেশী **সরেখ** বা **অরেখ** (বা **মসৃণ**)।

● **সরেখ পেশী** (Striated muscle) : এই কলার পেশীতন্তুগুলি নিরেট, সূক্ষ্ম, দণ্ডাকার এবং দীর্ঘ। পেশীতন্তুগুলি যোগকলার সাহায্যে গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত থাকে। পেশীতন্তুতে বহু মায়োফাইব্রিল সজ্জিত থাকে (চিত্র 6.53খ)। তাছাড়া স্বচ্ছ ও অনচ্ছ রেখা সমান দূরত্বে আড়াআড়ি বিন্যস্ত হয়। স্বচ্ছ ও অনচ্ছ রেখার নাম যথাক্রমে **আইসোট্রপিক রেখা** (Isotropic band) বা I ব্যান্ড ও **অ্যানাইসোট্রপিক রেখা** (Anisotropic band) বা A ব্যান্ড। I ব্যান্ড এলাকার কেন্দ্রস্থলে Z রেখা অবস্থিত। A ব্যান্ডের মাঝবরাবর H ব্যান্ড বর্তমান। দুটি Z রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চল হল **সারকোমিয়ার** (Sarcomere)। প্রাণীর চলন অঙ্গসমূহে পেশীর প্রকৃতি সরেখ। ইচ্ছামতো এই পেশী চালনা করা যায় বলে একে ঐচ্ছিক পেশী বলা হয়।



চিত্র 6.53—বিভিন্ন পেশীকলা : ক—অরেখ ; খ—সরেখ ; গ—হৃৎপেশী।

● **অরেখ বা মসৃণ পেশী** (Non-striated or Smooth muscle) : এই পেশীর তন্তুগুলির প্রান্তদ্বয় সরু হলেও মধ্যস্থল (চিত্র 6.53ক) স্থূল। সেজন্য এদের **মাকুর** (spindle) মতো দেখায়। পেশী-তন্তুতে একটি লম্বা নিউক্লিয়স থাকে। সাইটোপ্লাজমে পেশীতন্তুর দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত অতি সূক্ষ্ম সুতোর মতো বস্তুগুলিকে মায়োফাইব্রিল বলে। এই পেশীকলায় **অনুপ্রস্থ-**

রেখা (Cross striation) না থাকায় এদের নাম অরেখ বা মসৃণ পেশী। গ্লাই-কোজেনের প্রাধান্য, উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া ও সংকুচিত হওয়া, পরিবাহিতা, ছন্দ-ময়তা প্রভৃতি হল অরেখ পেশীর বৈশিষ্ট্য। এই পেশীর সংকোচন প্রাণীর ইচ্ছা-ধীন নয় বলে এটিকে অনৈচ্ছিক পেশী বলা হয়।

পেশীকলা বিভিন্ন প্রকার ঃ অস্থিপেশী, হৃৎপেশী ও দেহযন্ত্রের পেশী।

(1) **অস্থিপেশী বা স্কেলিটাল মাসল** (Skeletal muscle) ঃ

গঠন (Structure) ঃ নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এই পেশী প্রতি ক্ষেত্রেই অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে। পেশী ও অস্থির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষায় সাহায্য করে **টেন্ডন** (tendon)। অ-স্থিতিস্থাপক শ্বেততন্তু নামে যোগকলার দৃঢ় গুচ্ছ দ্বারা টেন্ডন গঠিত। এই যোগকলায় কোষগুলি অনুদৈর্ঘ্যে বিন্যস্ত থাকে। এদের **টেন্ডন কোষ** (Tendon cells) বলে। অন্যান্য পেশীর মতো অস্থি পেশীও বিভিন্ন প্রকার যোগকলায় বাঁধা থাকে। প্রতিটি পেশীর একেবারে বাইরের যোগকলার আবরণটির নাম **এপিমাইসিয়ম** (Epi-mysium)। পেশী কতকগুলি **ফ্যাসিকিউলস*** (Fasciculus) বা বান্ডিলের সমন্বয়ে গঠিত। বান্ডিলগুলির বাইরের আবরণকে **পেরিমাইসিয়ম** (Peri-mysium) বলে। প্রতিটি ফ্যাসিকিউলস আবার বহু পেশীতন্তু (muscle fibre) দ্বারা গঠিত। এদের বাইরের এরিওলার যোগকলার আবরণটি **এন্ডো-মাইসিয়ম** (Endomysium)। প্রতিটি পেশীতন্তু কতকগুলি **মায়োফাইব্রিল†** (Myofibril) দ্বারা গঠিত। প্রতিটি মায়োফাইব্রিল আবার অনেক **সারকোমিয়ার‡** (Sarcomere) দ্বারা গঠিত। সারকোমিয়ারের সংকোচনের ফলেই পেশীর সংকোচন ঘটে। সারকোমিয়ারও দুধরনের ফিলামেন্ট—অর্থাৎ **মায়োসিন ফিলামেন্ট** (Myocin filament) ও **অ্যাকটিন ফিলামেন্ট** (Actin filament) নামক প্রোটিন দ্বারা গঠিত। এই দুধরনের প্রোটিন দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে পেশীর সংকোচন নির্ধারিত হয়। শ্বসনে উৎপন্ন ATP পেশীকে সংকুচিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়। পেশীতন্তুর স্বচ্ছ প্রাকারকে **সারকোলিমা** (Sarcolemma) বলে। মায়োফাইব্রিলগুলি যে সাইটোপ্লাজমে ভেসে থাকে তাকে **সারকোপ্লাজম** (Sarcoplasm) বলে।

বিস্তৃতি (Distribution) ঃ প্রতিটি অস্থির সঙ্গে অস্থিপেশী যুক্ত থাকে।

কাজ (Functions)ঃ অস্থিপেশীর প্রধান কাজ চলাচলে সহায়তা করা। পেশী-তন্তু সংকুচিত হয়ে টেন্ডনকে টেনে ধরে। এই টানের ফলেই অস্থি সঞ্চালিত হয়। এক জোড়া অস্থিপেশী একত্রে কাজ করে। **ফ্লেক্সর** (Flexor) পেশী অস্থির

* ফ্যাসিকিউলি (Fasciculi)—Plural
† গ্রীক—*Mycin* = নিকটতর করা ; ল্যাটিন—*fibra* = তন্তু
‡ গ্রীক—*Sarcos* = মাংসপেশী ; *merus* = খাঁটি

সংযোগস্থলকে বাঁকায় এবং **এক্সটেনসর (Extensor) পেশী** ঐ স্থানকে সোজা করে।

(2) **হৃৎপেশী** বা **কার্ডিয়াক মাসল** (Cardiac muscle) ঃ হৃৎপিণ্ড হৃৎপেশী দ্বারা গঠিত। **হৃৎপেশীর প্রকৃতি সরেখ ও অনৈচ্ছিক।** রেখাগুলি অত্যন্ত ক্ষীণ এমনকি পেশীতন্তুগুলিও আকারে ছোট। শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে এরা পার্শ্ববর্তী পেশীতন্তুর সঙ্গে মিশে প্রোটোপ্লাজমীয় জালক গঠন করে (চিত্র 6.53গ)। প্রত্যেক তন্তুতে একটি মাত্র নিউক্লিয়স থাকে। পেশীতন্তুর মধ্যে একাধিক গাঢ় রেখা বর্তমান। এই গাঢ় রেখাকে **ইণ্টারকেলেটেড ডিস্ক** (Intercalated disc) বলে। ছন্দোবদ্ধভাবে হৃৎপেশী সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। হৃৎপেশীর এই চলনকে ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। সেজন্যই হৃৎ-পেশী **অনৈচ্ছিক সরেখ পেশী** (Striated involuntary muscle) নামে পরিচিত।

বিস্তৃতি (Distribution) ঃ হৃৎপিণ্ডের পেশী প্রকৃতপক্ষে হৃৎপেশী। তবে হৃৎপিণ্ডের থেকে উদ্‌গত বা হৃৎপিণ্ডে মুক্ত বড় রক্তনালীগুলিতেও অল্প পরি-মাণে হৃৎপেশী দেখা যায়।

কাজ (Functions) ঃ হৃৎপিণ্ডকে তালে তালে সংকুচিত ও প্রসারিত করতে হৃৎপেশীর অবদান তুলনাহীন।

(3) **দেহযন্ত্রের পেশী** বা **ভিসিরাল মাসল** (Visceral muscle) ঃ দেহের ভিতরে হৃৎপিণ্ড ছাড়া অন্যান্য অঙ্গগঠনকারী পেশীকে দেহযন্ত্রের পেশী বলে। পেশীগুলি সরল, মসৃণ, অনৈচ্ছিক ও অরেখ। হৃৎপেশীর মতো এই পেশীকেও সংকুচিত বা প্রসারিত করা যায় না। অর্থাৎ **এই পেশী আদৌ ইচ্ছাধীন নয়।**

বিস্তৃতি (Distribution) ঃ এই পেশী প্রধানত ফাঁপা দেহযন্ত্র—যেমন, গ্রন্থিনালী, শ্বাসনালী, লসিকানালী, রক্তনালী প্রভৃতিতে বিস্তৃত।

কাজ (Functions) ঃ উক্ত পেশীর সংকোচন দ্বারা ঐ সব নালী-মধ্যবর্তী পদার্থসমূহ প্রবাহিত হয়। এইসব পেশীর তৎপরতার জন্যই ত্বকের রোম খাড়া হয়।

6.34. হৃৎপেশী ও অস্থিপেশীর পার্থক্য [*Differences between Cardiac muscle and Skeletal muscle*] :

হৃৎপেশী (Cardiac muscle)	অস্থিপেশী (Skeletal muscle)
(1) হৃৎপেশী সরেখ ও অনৈচ্ছিক।	(1) অস্থিপেশী অরেখ ও ঐচ্ছিক।
(2) পেশী-সংকোচন ছন্দোবদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত।	(2) পেশী-সংকোচন ছন্দোবদ্ধ বা স্বতঃস্ফূর্ত নয়।
(3) পেশীতন্তু নলাকার বা সরল নয়।	(3) পেশীতন্তু নলাকার এবং সরল।

হৃৎপেশী (Cardiac muscle)	অস্থিপেশী (Skeletal muscle)
(4) পেশীতন্তু দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে সন্নিহিত তন্তুর শাখার সঙ্গে মিলিত হয়।	(4) পেশীতন্তু এভাবে ভাগ হয় না, তাই সন্নিহিত পেশীতন্তুর সঙ্গে মিলিত হবার প্রশ্ন ওঠে না।
(5) নিউক্লিয়স একটি—সারকোপ্লাজমের গভীরে এবং কোষের মধ্যস্থলে অবস্থান করে।	(5) নিউক্লিয়স অনেক—সারকোপ্লাজমের উপরের দিকে থাকে, কোষের মধ্যস্থলে অবস্থান করে না।

6.35. সরেখ (চিহ্নিত) পেশী, অরেখ (মসৃণ) পেশী ও হৃৎপেশীর পার্থক্য [*Differences among Striated muscle Smooth muscle and Cardiac muscle*] :

সরেখ (চিহ্নিত) পেশী	অরেখ (মসৃণ) পেশী	হৃৎপেশী
1. পেশীতন্তু দন্ডাকার ও দীর্ঘ।	1. পেশীতন্তু মাকুর মতো।	1. পেশীতন্তু ক্ষুদ্রাকৃতি লম্বা।
2. অনুপ্রস্থে সাদা-কালো রেখা বর্তমান।	2. রেখা নেই।	2. রেখা বর্তমান।
3. পেশীতন্তুতে সারকোলিমা বর্তমান।	3. সারকোলিমা অস্পষ্ট।	3. সারকোলিমা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ।
4. সারকোলিমার নীচে বহু নিউক্লিয়স থাকে।	4. পেশীকোষের কেন্দ্রে একটি মাত্র নিউক্লিয়স থাকে।	4. কোষের কেন্দ্রে একটি মাত্র নিউক্লিয়স বর্তমান।
5. পেশীতন্তু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত নয়।	5. শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত নয়।	5. শাখা-প্রশাখা দ্বারা বিভিন্ন পেশীতন্তু যুক্ত।
6. ইন্টারকেলেটেড ডিস্ক নেই।	6. নেই।	6. বর্তমান।
7. পেশীর সংকোচন ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ ঐচ্ছিক।	7. পেশীর সংকোচন ইচ্ছাধীন নয়, অর্থাৎ অনৈচ্ছিক।	7. পেশীর সংকোচন ইচ্ছাধীন নয়, অর্থাৎ অনৈচ্ছিক।
8. অস্থিসংলগ্ন অবস্থায় অবস্থান করে।	8. আন্তরযন্ত্রে থাকে ; অর্থাৎ পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, রক্তবাহ প্রভৃতিতে বর্তমান।	8. কেবল হৃৎপিণ্ডে দেখা যায়।

6.36. নার্ভকলা [*Nervous tissue*] :

বিভিন্ন কলার মধ্যে নার্ভকলা সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই কলার মাধ্যমেই দেহে উদ্দীপনা গৃহীত, পরিবাহিত ও সঞ্চারিত হয়।

গঠন (Structure) ঃ বহু **নিউরন** বা **নার্ভকোষ** দ্বারা নার্ভকলা গঠিত। প্রতিটি নিউরন প্রধান তিনটি অংশে বিভক্ত ঃ (i) **কোষদেহ** (Cell body), (ii) **ডেনড্রন** (Dendron) এবং (iii) **অ্যাক্সন** (Axon)।

(i) **কোষদেহ*** (cell body) ঃ নিউরনের যে অংশে নিউক্লিয়স অবস্থিত তাকে **কোষদেহ** বলে। এটি তারকাকার, শাঙ্কবাকার বা গোলাকার। নিউরনের কোষদেহস্থ সাইটোপ্লাজমকে **নিউরোপ্লাজম** (neuroplasm) বলে। নিউরোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত থাকে একটি বড় **নিউক্লিয়স**, অসংখ্য **নিসল দানা** (Nissle granules), **মাইটোকনড্রিয়া**, **গলগিবস্তু** ও **নিষ্ক্রিয় সেন্ট্রোজোম**।



চিত্র 6.54—একটি আদর্শ নার্ভকোষের গঠন।

(ii) **ডেনড্রন** (Dendron) ঃ কোষদেহ থেকে উদ্গত শাখা-প্রশাখাযুক্ত ছোট ছোট প্রবর্ধকগুলিকে **ডেনড্রন** (dendron) বলে। ডেনড্রনের শাখা-প্রশাখাগুলিকে **ডেনড্রাইট** (dendrite) বলে। এগুলি উদ্দীপনা গ্রহণের কাজ করে অর্থাৎ কোষদেহের দিকে আবেগ (impulse) বয়ে নিয়ে আসে।

(iii) **অ্যাক্সন** (Axon) ঃ কোষদেহ থেকে বাইরে আবেগ পরিবহণকারী সুতোর মতো প্রধানত শাখাবিহীন দীর্ঘ একক প্রবর্ধকটিকে **অ্যাক্সন** (Axon) বলে। অ্যাক্সনে নিসল দানা থাকে না। অ্যাক্সনের অধিকাংশ স্থানই দুরকম আবরণে ঢাকা থাকে। ভিতরের স্থূল আবরণটি **মায়েলিন** বা **মেডালারী আচ্ছাদন** (Myelin or medullary sheath) এবং বাইরের পাতলা নিউক্লিয়সযুক্ত আবরণটি **নিউরিলেমা** (Neurilemma)। নিউরিলেমা পরিবৃত অ্যাক্সনকে **নার্ভতন্তু** (Nerve fibre) বলে। যে নার্ভতন্তুর মেডালারী আচ্ছাদন থাকে তাকে **মেডালেটেড** বা **মায়েলিনেটেড** (medullated or myelinated) নার্ভতন্তু বলে। যাদের এই আচ্ছাদন নেই তাদের **আমায়েলিনেটেড** (Amyelinated) বা **নন মায়েলিনেটেড** (Non myelinated) অথবা **নন মেডালেটেড** (Non medullated) নার্ভতন্তু বলে (চিত্র 6.54)। মেডালারী আচ্ছাদন

* কোষদেহের বিজ্ঞানসম্মত নাম **পেরিকেরিয়ন** (Perikaryon)।

নার্ভতন্তুকে অপরিবাহী ক'রে তোলে। এর ফলে আবেগ সংশ্লিষ্ট অন্য কোন নার্ভতন্তুতে পরিবাহিত হতে পারে না। তাছাড়া নার্ভতন্তুকে রক্ষার ও পরি-পোষণের দায়িত্বও একে পালন করতে হয়। কোন প্রান্তীয় নার্ভ কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে সারিয়ে তুলতেও এর অবদান উল্লেখযোগ্য।

মেডালারী আচ্ছাদন স্থানে স্থানে প্রায় 80μ—200μ দূরত্বে সংকুচিত থাকে। সংকুচিত স্থানগুলি হল **র‍্যাঁভিয়ে পর্ব** (Node of Ranvier)। অ্যাক্সন শেষপ্রান্তে অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে **প্রান্ত-বুরুশ** বা **এণ্ড ব্রাশ** (End brush) গঠন করে। অ্যাক্সন সরাসরি পেশীতন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে অথবা এর প্রান্ত-শাখাসমূহ অন্য নিউরনের ডেনড্রাইটের খুব নিকটে বিন্যস্ত হয়। যে স্থানটিতে এই বিন্যাস ঘটে তাকে **প্রান্ত সন্নিকর্ষ** বা **সাইনাপস** (Synapse) বলে। সাইনাপসের ডেনড্রাইট ও অ্যাক্সনের প্রান্ত-শাখাসমূহের মধ্যে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ যোগসূত্রের কাজ করে। এই রাসায়নিক পদার্থটির নাম **নিউরোহিউমর** (Neurohumor)।

নার্ভকলা কেবলমাত্র একদিকেই আবেগ পরিবহণ করে। জ্ঞানেন্দ্রিয় উদ্ভূত আবেগ যে নার্ভপথে মস্তিষ্কে এবং সুষুম্নাকাণ্ডে পৌঁছায় তাকে **সংবেদ** বা **অন্তর্মুখ** বা **সেনসরী নার্ভ** (Afferent or Sensory nerve) বলা হয়। যে নার্ভ মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড থেকে আবেগকে পেশীতে পরিবহণ করে তাকে **চেষ্টীয়** বা **বহির্মুখ** বা **মোটর নার্ভ** (Efferent or Motor nerve) বলে।

বিস্তৃতি (Distribution): মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট নার্ভ-সমূহ নার্ভকলায় গঠিত।

কাজ (Function): নার্ভকলা তড়িৎ-রাসায়নিক (Electro-chemical) পদ্ধতিতে জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গাদি ও তাদের কাজের মধ্যে সংহতি সাধন করে।

● **নিউরনের প্রকারভেদ** (Types of neurone):

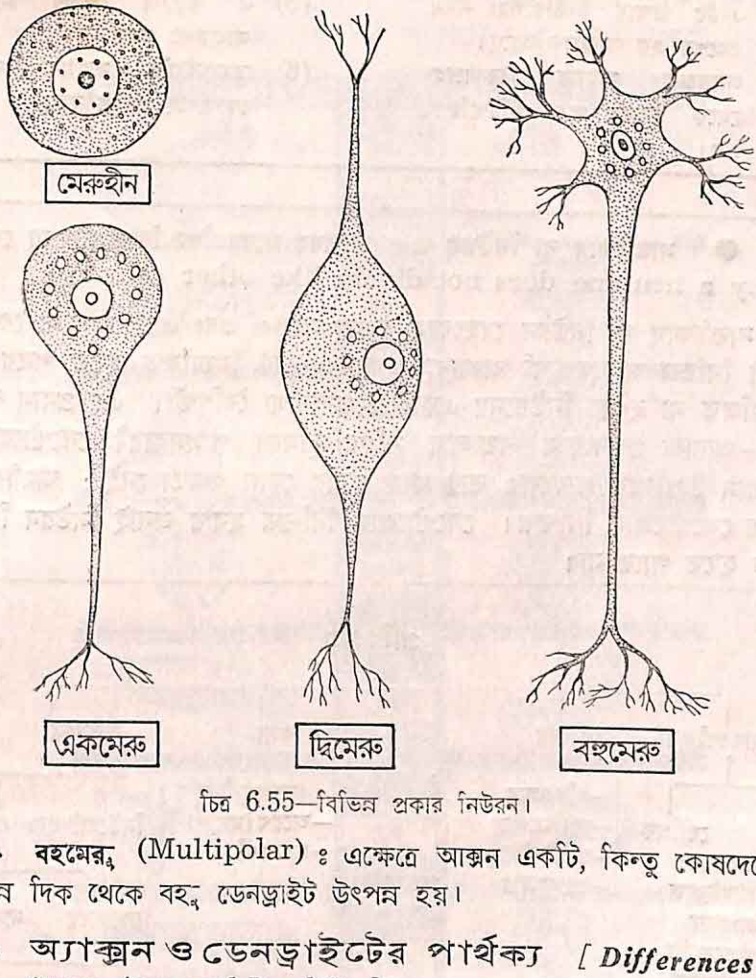
নিউরনের কোষদেহ থেকে উদ্গত প্রবর্ধক, অর্থাৎ অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইটের সংখ্যা অনুসারে নিউরন **পাঁচ** ভাগে বিভক্ত (চিত্র 6.55)।

1. **মেরুহীন** (Apolar): প্রবর্ধকহীন কোষদেহ।

2. **একমেরু** (Unipolar): এখানে একটিমাত্র প্রবর্ধক বা অ্যাক্সন বর্তমান।

3. **দ্বিমেরু** (Bipolar): মাকুর মতো দেখতে কোষদেহের একপ্রান্তে অ্যাক্সন ও তার বিপরীত প্রান্তে ডেনড্রাইট বর্তমান।

4. **ভ্রান্ত একমেরু** (Pseudo-unipolar) ঃ অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইট কোষ-দেহের এক জায়গা থেকে উৎপত্তি হয়ে 'T' আকৃতির দেহ গঠন করে।



চিত্র 6.55—বিভিন্ন প্রকার নিউরন।

5. **বহুমেরু** (Multipolar) ঃ এক্ষেত্রে আক্সন একটি, কিন্তু কোষদেহের বিভিন্ন দিক থেকে বহু ডেনড্রাইট উৎপন্ন হয়।

6.37. অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইটের পার্থক্য *[Differences between Axon and Dendrite] :*

অ্যাক্সন (Axon)	ডেনড্রাইট (Dendrite)
(1) অ্যাক্সন সাধারণত শাখাবিহীন নার্ভকোষ-প্রবর্ধক।	(1) ডেনড্রাইট শাখা-প্রশাখাযুক্ত নার্ভ-কোষ-প্রবর্ধক।
(2) অ্যাক্সন তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ।	(2) ডেনড্রাইট তুলনামূলকভাবে ছোট।
(3) নিসল দানা থাকে না।	(3) নিসল দানা থাকে।
(4) অ্যাক্সন সাধারণত মায়েলিন বা মেডালারী আচ্ছাদনে ঢাকা থাকে।	(4) ডেনড্রাইটে সাধারণত এ ধরনের আচ্ছাদন থাকে না।

অ্যাক্সন (Axon)	ডেনড্রাইট (Dendrite)
(5) এটির উপরে নিউরিলেমা নামে বিশেষ এক আচ্ছাদন আছে।	(5) এ ধরনের বিশেষ আচ্ছাদন সাধারণত থাকে না।
(6) অ্যাক্সনের সাহায্যে কোষদেহ থেকে আবেগ দূরে পরিবাহিত হয়।	(6) ডেনড্রাইটের সাহায্যে আবেগ কোষদেহে প্রবেশ করে।

● **নার্ভকোষ বা নিউরন অন্য কোষের মতো বিভাজিত হয় না কেন?** (Why a neurone does not divide like other cells ?) ঃ

নার্ভকোষ বা নিউরন দেহকোষ হওয়া সত্ত্বেও এবং এতে অন্যান্য কোষের মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংগাণু থাকলেও এটি বিভাজিত হ'তে পারে না। বিভাজিত না হওয়া নিউরনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এর প্রধান কারণ হ'ল—অন্যান্য প্রাণিকোষ বিভাজনে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী সেন্ট্রোজোমটি নিউরনে উপস্থিত থাকলেও তার কাজ করার কোন ক্ষমতা নেই ; অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে সেন্ট্রোজোম নিষ্ক্রিয়। সেন্ট্রোজোম নিষ্ক্রিয় হবার জন্যই নিউরন বিভা-জিত হ'তে পারে না।

প্রাণিকলা

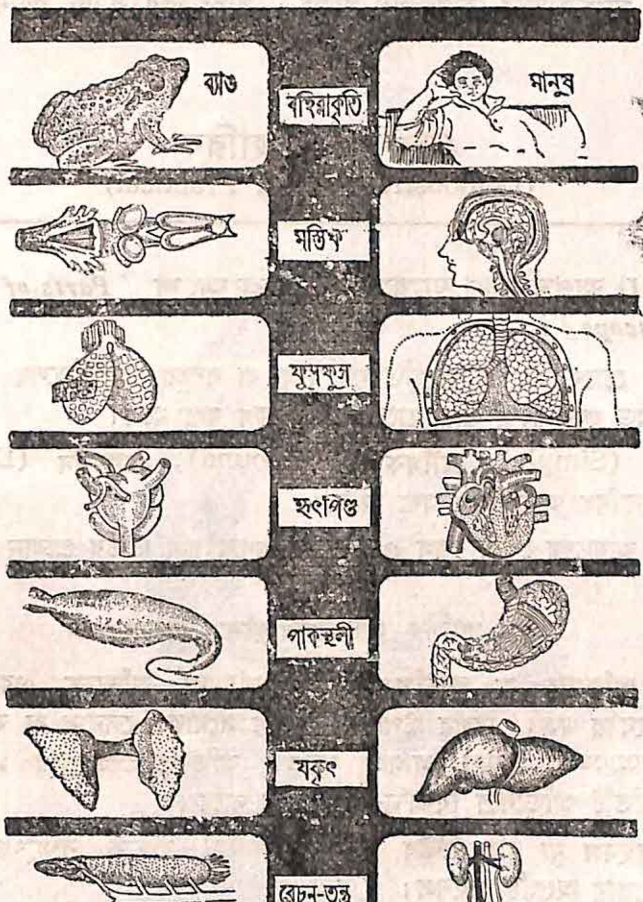
- আবরণীকলা
  - সরল
    - স্কোয়ামাস
    - কিউবইডাল
    - কলামনার
    - সিলিয়েটেড
    - গ্ল্যান্ডুলার
  - যৌগিক
- যোগকলা
  - এরিওলার
  - অ্যাডিপোজ
  - স্কেলিটাল
    - অস্থি
    - তরুণাস্থি
  - ভ্যাস্কুলার
- পেশীকলা
  - সরেখ [চিহ্নিত]
  - অরেখ (মসৃণ)
  - হৃৎপেশী
- নার্ভকলা
  - নিউরোগ্লিয়া
  - নার্ভকোষ
    - কোষদেহ
    - নার্ভতন্তু
      - মায়েলিনেটেড
      - নন-মায়েলিনেটেড

6.38. অঙ্গ [*Organs*] :

অ্যামিবা এককোষী প্রাণী। তার যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কাজ ঐ একটি-মাত্র কোষের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। কিন্তু, বহুকোষী জীবদেহ বিচিত্র কলায় গঠিত। এক্ষেত্রে বিভিন্ন কলার মধ্যে শ্রমবিভাগ বর্তমান।

উন্নত জটিল প্রাণীর দেহে নানাবিধ কলাগুচ্ছ একত্রিত হয়ে অংগ বা যন্ত্র গঠন করে। এই কলাগুচ্ছ নিজস্ব গঠন ও সুনির্দিষ্ট কাজের অধিকারী। সেজন্য বিভিন্ন অংগ ভিন্ন ভিন্ন কাজের ভার গ্রহণ করে।

পা (Leg) একটি অঙ্গ। সুতরাং, এখানেও নানারকম কলার সন্নিবেশ ঘটে। পায়ের ত্বকে আবরণী কলার স্তর আছে। এই কলার নীচে আছে পদ-সঞ্চালনে অংশগ্রহণকারী সক্রিয় পেশী। অস্থি ও কার্টিলেজ পায়ের কাঠামো গঠন করে। তরল কলা (রক্ত) পেশীতে অক্সিজেন ও খাদ্য সরবরাহ করে।



চিত্র 6.56—জীবদেহের বিভিন্ন প্রকার অঙ্গঃ বাঁদিকে ব্যাঙ ও ডানদিকে মানুষ।

এছাড়া পায়ে আছে জালিকাকারে বিন্যস্ত নার্ভকলা। বিভিন্ন ধরনের কলাকে একত্রে ধরে রাখার দায়িত্ব যোগকলার। এভাবে নানারূপ কলা একত্রিত হয়ে গঠিত হয়েছে পা।

মস্তিষ্ক, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, যকৃৎ, বৃক্ক (চিত্র 6.56), প্রভৃতি নানাপ্রকার অঙ্গের উদাহরণ। জীবদেহে এরূপ অঙ্গের সংখ্যা অগণিত।

প্রতিটি অঙ্গেই ঐরূপ বিভিন্ন কলার সমন্বয় ঘটে। তবে অধিকাংশ অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গের সাহায্য পেলে তবেই ঠিক ঠিক কাজ করতে পারে।

অঙ্গ গঠনের জন্য যে সব সময় বিভিন্ন কলার প্রয়োজন হয়, তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একই ধরনের কলা দ্বারাও অঙ্গ গঠিত হয়। তরুণাস্থি ও অস্থি সম্পূর্ণভাবে যোগকলায় গঠিত ; মস্তিষ্কের সৃষ্টি প্রধানত নার্ভ-কলায়।

প্রদর্শন ও ব্যবহারিক
(Demonstration and Practical)

6.39. **(I) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ** *[Parts of a Microscope] :*

খালি চোখে অদৃশ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু বা বস্তুর অংশবিশেষ যে যন্ত্রের সাহায্যে বড় করে দেখা যায় তাকে **অণুবীক্ষণ যন্ত্র** বলে।

সরল (Simple), **যৌগিক** (Compound), **ইলেকট্রন** (Electron) প্রভৃতি নানাবিধ অণুবীক্ষণ যন্ত্র আছে।

তবে, আমাদের দেশে সরল ও যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রচলন সর্বাধিক।

● যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবরণ ●

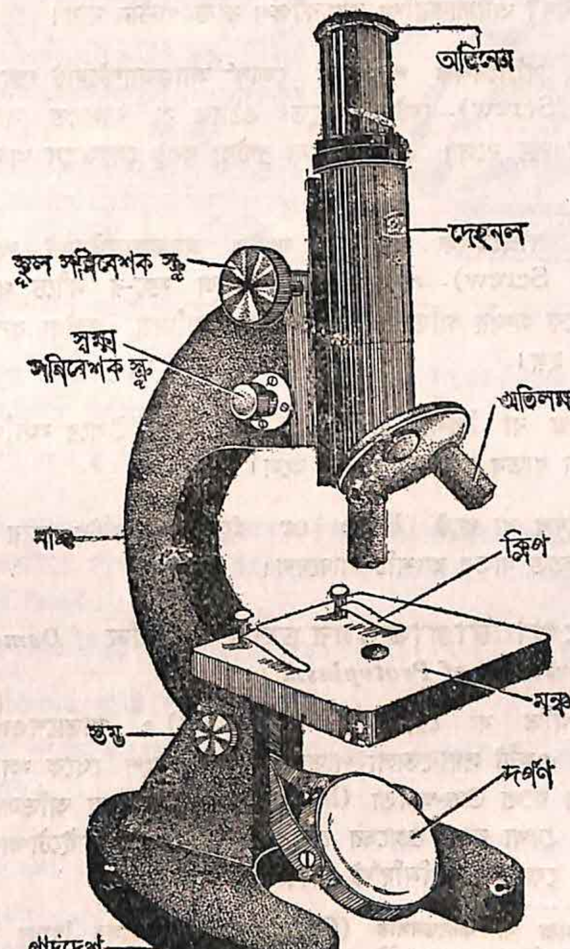
1. **অভিনেত্র** বা **আইপিস** (Eye piece)—অভিনেত্র একটি ফাঁপা স্বল্প দৈর্ঘ্যের নল। নলের উপরে ও নীচে সমোত্তল লেন্স বা **আতস কাচ** (Planoconcave lens) লাগান থাকে। অভিনেত্র দেহনলের মধ্যে বসান থাকে। প্রতিটি অভিনেত্রে বিবর্ধন-শক্তি লেখা থাকে।

2. **দেহনল** বা **বডি টিউব** (Body tube)—বাহুর সম্মুখভাগে অবস্থিত নলাকার অংশটি দেহনল।

দেহনলের নীচে সংলগ্ন গোলাকার অংশটি **নাসিকাখণ্ড** বা **নোজপিস** (Nose piece)। নাসিকাখণ্ডের ছিদ্রগুলিতে বিভিন্ন বিবর্ধন শক্তিসম্পন্ন **অভিলক্ষ্য** (objective) ইচ্ছামতো লাগানো। এই নাসিকাখণ্ডকে ঘুরিয়ে ইচ্ছামতো অভিলক্ষ্য ব্যবহার করা যায়।

3. **অভিলক্ষ্য** বা **অবজেক্টিভ** (Objective)—নাসিকাখণ্ডের সঙ্গে প্যাঁচ দ্বারা লাগান ফাঁপা নলকে অভিলক্ষ্য বলে। অভিলক্ষ্যের উপরে এবং নীচে বিবর্ধন-শক্তিসম্পন্ন আতস কাচ সংলগ্ন থাকে।

4. **বাহু** বা **আর্ম** (Arm)—একটি স্তম্ভের উপর বক্রাকারে অবস্থিত ধাবত অংশ এটি। স্তম্ভের সঙ্গে বাহুটি স্ক্রু দ্বারা এমনভাবে সংযুক্ত থাকে, যাতে বাহুটিকে ইচ্ছামতো সামনে বা পিছনে হেলানো যায়। এই অংশটি প্রকৃত-পক্ষে বহনোপযোগী হাতল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র 6·57—একটি আধুনিক যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

5. **ক্লিপ** (Clip)—মঞ্চের নির্দিষ্ট স্থানে স্লাইডকে যথাস্থানে রাখবার জন্য স্ক্রু দ্বারা আটকানো স্প্রিং-সদৃশ ধাতব পাতকে ক্লিপ বলে।

6. **মঞ্চ** বা **স্টেজ** (Stage)—বাহুর সম্মুখে প্রশস্থ যে অংশে স্লাইড রাখার ব্যবস্থা থাকে, তাকে মঞ্চ বলে। মঞ্চের কেন্দ্রে একটি ছিদ্র থাকে। পাশের দুটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ছিদ্রে ক্লিপ আটকান থাকে।*

7. **দর্পণ** বা **মিরর** (Mirror)—স্টেজের নীচে পাদদেশে যুক্ত বা স্তম্ভ থেকে ঝোলান একটি আয়না থাকে। আয়নাটিকে আলোর দিকে ঘুরিয়ে ইচ্ছা-মতো কম বা বেশী আলোকরশ্মি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পাঠান যায়।

8. **স্থূল সন্নিবেশক স্ক্রু** বা **কোর্স অ্যাডজ্যাস্টমেণ্ট স্ক্রু** (Coarse adjustment Screw)—স্টেজকে দ্রুত ওঠাতে বা নামাতে সক্ষম স্ক্রু-কে স্থূল সন্নিবেশ স্ক্রু বলে। এর সাহায্যে দ্রষ্টব্য বস্তু ফোকাসে আনার সুবিধা হয়।

9. **সূক্ষ্ম সন্নিবেশক স্ক্রু** বা **ফাইন অ্যাডজ্যাস্টমেণ্ট স্ক্রু** (Fine adjustment Screw)—সূক্ষ্ম স্ক্রুটি স্থূল স্ক্রু-র নীচে থাকে। এর সাহায্যে স্টেজকে মন্থর গতিতে উঠিয়ে বা নামিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুকে সঠিক ফোকাসে আনা হয়।

10. **স্তম্ভ** বা **পিলার** (Pillar)—পাদদেশের উপরে স্থাপিত খাড়া-ভাবে দণ্ডায়মান ধাতব অংশকে স্তম্ভ বলে।

11. **পাদদেশ** বা **ফুট** (Base or foot)—যন্ত্রটির ভার বহনকারী ভূমিসংলগ্ন বিস্তৃত ধাতব অংশটি পাদদেশ।

6.40. (II) প্রোটোপ্লাজমের চলন প্রদর্শন *[Demonstration of movement of Protoplasm] :*

A. **প্রবাহগতি** বা **রোটেশান** (Rotation) : **পাতাশেওলা পাতার** দীর্ঘচ্ছেদের বা একটি সদ্য-তোলা পাতার কিছুটা অংশ থেকে স্লাইড তৈরি করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে উচ্চ-ক্ষমতা (high power)-সম্পন্ন অভিলক্ষ্যের নীচে পরীক্ষা করলে দেখা যায় কোষের কোষ-প্রাকার-সংলগ্ন সাইটোপ্লাজম একটি বড় ভ্যাকুওলকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হচ্ছে।

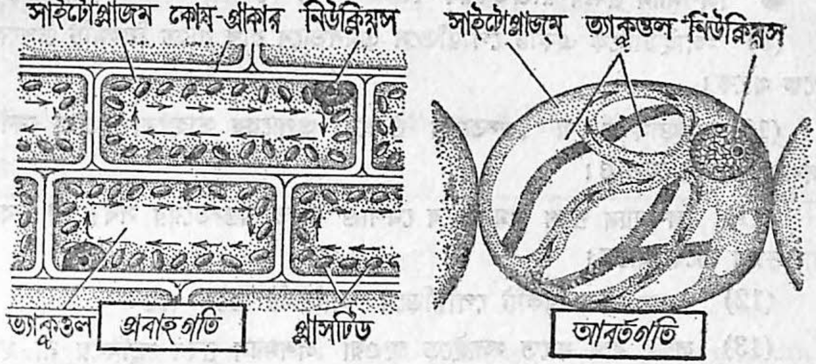
---

* **সমাহরণ যন্ত্র** বা **কনডেনসার** (Condenser)—স্টেজের ছিদ্রের নীচে দর্পণে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি যে লেন্সটির মাধ্যমে অভিসারী হয়, তাকে সমাহরণ যন্ত্র বলে। প্যাঁচের সাহায্যে সমাহরণ যন্ত্রকে ওঠানো বা নামানো যায়।

মধ্যচ্ছদা বা **ডায়াফ্রাম** (Diaphragm)—সমাহরণ যন্ত্রের নীচে গোটানো বা খোলার বন্দোবস্তযুক্ত পর্দাটিকে মধ্যচ্ছদা বলে। এর সাহায্যে আলোকপথের ছিদ্র বড় বা ছোট ক'রে স্লাইডে প্রতিফলিত আলোকরশ্মির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

সাধারণতঃ ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র জটিলতামুক্ত। সেখানে এ দু'টি অংশ থাকে না।

B. **আবর্তগতি** বা **সারকুলেশান** (Circulation) ঃ **কুমড়ো** বা **রিওডিসকালার** গাছের ফুলের পুংকেশর দণ্ডের স্লাইড তৈরি ক'রে একইভাবে



চিত্র 6·58—প্রোটোপ্লাজমের চলনঃ ক—প্রবাহগতি ; খ—আবর্তগতি।

পরীক্ষা করলে দেখা যায়, প্রতিটি কোষের সাইটোপ্লাজম বিভিন্ন চক্রে, বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন গতিতে বিক্ষিপ্তভাবে আবর্তিত হচ্ছে।

ব্যবহারিক খাতায় প্রবাহগতি ও আবর্তগতির ছবি আঁক।

6.41. (III) মাছ এবং কুনো ব্যাঙের রক্ত-ফিল্মের স্লাইড তৈরীর পদ্ধতি *[Method of making blood-film of Fish and Toad] :*

● **রক্ত-ফিল্ম তৈরী পদ্ধতি** (Preparation of blood film) ঃ

(1) পরিষ্কার দুটি স্লাইড নাও।

(2) মাছ বা ব্যাঙের দেহ বা হৃৎপিন্ড থেকে একফোঁটা রক্ত একটি স্লাইডের এক প্রান্তে রাখ।

(3) এবার অপর একটি স্লাইড দিয়ে ঐ রক্ত বিন্দুকে এমনভাবে স্পর্শ কর যাতে রক্ত স্লাইডের মধ্যে 45° কৌণিক দূরত্ব স্থাপিত হয়।

(4) এখন প্রথম স্লাইডটি দু হাতে চেপে ধরে দ্বিতীয় স্লাইডটিকে ধীরে ধীরে ঠেলে প্রথম স্লাইডের শেষ প্রান্তে নিয়ে যাও।

(5) লক্ষ্য কর প্রথম স্লাইডে রক্তের একটি পাতলা স্তর পড়েছে।

(6) স্লাইডটিকে দু প্রান্ত বরাবর ধরে কয়েকবার হাওয়ায় নাড়াচাড়া কর যাতে রক্তস্তর শুকিয়ে যায়।

(7) রক্তস্তর বা ব্লাড-ফিল্ম খুব পাতলা (thin) না হলে স্লাইডটি বাতিল কর এবং একই প্রক্রিয়ায় আর একটি স্লাইড তৈরী কর।

(8) এবার অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল (অর্থাৎ 100% অ্যালকোহল) প্রয়োগে রক্তস্তরকে ফিক্স কর।

● **লিশম্যান দ্রবণে রঞ্জিতকরণ** (Staining by Leisman's Stain) ঃ

(9) স্লাইডটিকে একটি পেট্রিডিসে এমনভাবে রাখ যাতে ফিল্মটি উপরের দিকে থাকে।

(10) ব্লাডফিল্ম বা রক্তস্তরের উপরে ড্রপারের সাহায্যে কয়েক ফোঁটা লিশম্যান দ্রবণ মেশাও।

(11) লিশম্যান দ্রবণ এমনভাবে মেশাও যাতে রক্তস্তরের সর্বত্র ঐ দ্রবণে ভালভাবে ঢেকে থাকে।

(12) এবার অন্য একটি পেট্রিডিসে স্লাইডটি ঢেকে দাও।

(13) লক্ষ্য রাখ যাতে স্লাইডে দেওয়া লিশম্যান দ্রবণ শুকিয়ে না যায়, শুকিয়ে যেতে শুরু করলে প্রয়োজনমতো আর একটু দ্রবণ মেশাও।

(14) এইভাবে অন্তত 2—3 মিনিট লিশম্যান দ্রবণে ঢেকে রাখতে হবে।

(15) তারপর ব্যবহৃত লিশম্যান দ্রবণের দ্বিগুণ পরিমাণ **পাতিত জল** (Distilled water) প্রয়োগ ক'রে স্লাইডটিকে পুনরায় ঢেকে দাও।

(16) 10—15 মিনিট পরে স্লাইডটিকে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নাও।

(17) পুনরায় স্লাইডটিকে বাতাসে শুকিয়ে নাও। প্রয়োজনবোধে স্লাইডের নিম্নতল রুমালের সাহায্যে মুছে নেওয়া যায়।

(18) শুকনো রক্তস্তরের উপরে এবার এক ফোঁটা গ্লিসারিন দিয়ে একটি কভারস্লিপ চাপা দাও।

(19) এইভাবে স্লাইডটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে পরীক্ষার যোগ্য হয়।

● **অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ব্লাডফিল্ম পর্যবেক্ষণ**

(20) প্রথমে নিম্ন ক্ষমতার অভিলক্ষ্যের সাহায্যে এবং পরে উচ্চ ক্ষমতার অভিলক্ষে স্লাইডটিকে পর্যবেক্ষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দৃষ্টিগোচর হয় ঃ—

(i) নিউক্লিয়সযুক্ত ডিম্বাকার, দ্বিউত্তল অসংখ্য **লোহিত রক্তকণিকা** (R.B.C.) অনেকগুলি একসঙ্গে অথবা পৃথক পৃথকভাবে ছড়িয়ে আছে।

(ii) লোহিত রক্তকণিকার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি অনিয়তাকার, অপেক্ষাকৃত বড় এবং খণ্ডিত নিউক্লিয়সযুক্ত **শ্বেতকণিকা** দৃষ্টিগোচর হয়।

(iii) মাকুর আকারের অল্প কয়েকটি নিউক্লিয়সযুক্ত **অণুচক্রিকা** দেখা যায়।

অভিব্যক্তি, অভিযোজন এবং বংশগতি সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা* 7

[General notion about Evolution, Adaptation and Heredity]

* অভিব্যক্তি *

7.1. সূচনাঃ

মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসার বীজ অংকুরিত হওয়া এক শুভ সূচনা। সেই শুভ সূচনা কালক্রমে জীব-জগতের সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করেছে।

প্রায় দুশো পঞ্চাশ কোটি বৎসর পূর্বে জলে আদি প্রাণের সৃষ্টি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সৃষ্টি-রহস্যের মীমাংসা করা সহজ বলে বিবেচিত হয়নি। পৌরাণিক কাহিনীতে এ-সম্বন্ধে নানাজনে নানা আভাস দিয়েছেন।

থেলিস (Thales, 640—546 B. C.)-এর মতে জল থেকেই প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে। অধিকাংশ পৌরাণিক কাহিনীতেই মাটি, জল, বাতাস, আগুন প্রভৃতির সঙ্গে প্রাণ-সৃষ্টির সম্বন্ধ টানা হয়েছে। কয়েকটি মতবাদ প্রকৃতই উদ্ভট। **এ. কিরচার** (A. Kircher, 1601—1680 A. D.) এরূপ একটি উদ্ভট মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা।

তাঁর মতে, অর্কিড নামে একজাতীয় উদ্ভিদ থেকে পাখী, এমনকি ছোট-খাট মানুষের আর্বিভাব ঘটেছে।

এদিকে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা মনে করতেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের হস্তক্ষেপেই প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। বাইবেলে লিখিত ব্যাখ্যা অনুসারে ইহুদীদের বিশ্বাস, ঈশ্বর তাঁর বিশেষ ইচ্ছানুসারে মাত্র ছদিনে প্রথম ও শেষবারের মতো জীব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির পর থেকে জীব-জগতের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থাৎ, প্রতিটি জীবের বর্তমান রূপই আদি যুগের সৃষ্ট রূপ। এই চিন্তাধারাই হল **বিসৃষ্টিবাদ** (Theory of Special Creation)। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত উক্ত ধারণা মানুষের মনে বদ্ধমূল ছিল। **বুফন** (Buffon) সর্বপ্রথম এই বিসৃষ্টিবাদ বাতিল করে।

প্যারিসের প্রত্নজীববিদ্ অধ্যাপক **কুভিয়ে** (Cuvier) **জীবাশ্ম** (Fossil) পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বেশ কয়েকবার জীবকুল সৃষ্টি

* এই অধ্যায় থেকে কোনও প্রশ্ন করার নির্দেশ নাই।

হয়েছে। প্রতিবারই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অবলুপ্ত হয়ে জীব পরবর্তীকালে নতুন জীব সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। এ মতবাদকে **প্রাকৃতিক বিপর্যয়বাদ** (Theory of Catastrophism) বলে। নোয়া (Noha)-র সময়ের বন্যাকেই অতি আধুনিক বিপর্যয় বলে মনে করা হয়।

জটিল জীব সৃষ্টির বর্তমান প্রচলিত ধারণা হল **অভিব্যক্তি**। **অভিব্যক্তির অর্থ ক্রমবিকাশ বা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন**। গ্রীক দার্শনিক **অ্যারিস্টটল** (Aristotle, 432—332 B. C.) সর্বপ্রথম পরিবর্তনের গুরুত্ব অনুধাবন করেন।

সৃষ্টির শুরু থেকেই জীব-জগতে এই পরিবর্তন চলছে। বর্তমান জগৎ অতীতের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের ফলশ্রুতি। জীবাশ্ম প্রমাণ করে, আধুনিক যুগের উন্নত ও জটিল জীবের জীবাশ্মের চেয়ে প্রথম যুগের জীব ছিল অত্যন্ত সরল।

উন্নত ও জটিল জীবের নিদর্শন আদি যুগের কোন জীবাশ্মে পাওয়া যায় না। সুতরাং তখন উন্নতদেহী জীবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, আদি যুগের সরলদেহী জীবের সঙ্গে আধুনিক যুগের জটিলদেহী জীবের যোগসূত্র আছে। **অর্থাৎ সহজ, সরল জীবই কোটি কোটি বৎসর পরিবর্তনের ফলে জটিল জীবে রূপান্তরিত হয়েছে।** পৃথিবীর গঠন ও আবহাওয়ার প্রকৃতি ক্রমশঃ পরবর্তিত হয়েছে, সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী সরল জীবদেহ ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়েছে। এখনও পরিবর্তন চলছে এবং যুগ-যুগান্তর ধরে এই পরিবর্তন চলতে থাকবে বলে বিশ্বাস। নানাবিধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন দ্বারা ভবিষ্যতেও জীবনসৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

● **জৈব অভিব্যক্তির সংজ্ঞা : ধীর অথচ ক্রমাগত পরিবর্তন মাধ্যমে সরল জীব থেকে জটিল জীবের আত্মপ্রকাশকে জৈব অভিব্যক্তি** (Organic evolution) **বলে।**

জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি ও কারণ ব্যাখ্যা করে নানা জনে নানা মত পরিবেশন করেছেন। **জাঁ ব্যাপটিস্ট দ্য লামার্ক** (Jean Baptiste de Lamarck), **চার্লস ডারউইন** (Charles Darwin), **হুগো দ্য ভ্রিস** (Hugo de Vries) প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

7.2. লামার্কের মতবাদ বা লামার্কবাদ [*Theory of Lamarck or Lamarckism*] :

ফরাসী বিজ্ঞানী **জাঁ ব্যাপটিস্ট দ্য লামার্ক** (Jean Baptiste de Lamarck, 1744-1829) সর্বপ্রথম জৈব অভিব্যক্তির আধুনিক ব্যাখ্যা দেন। তিনি 1809 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী পুস্তক "ফিলোজফিক জুও-

লজিক" (Philosophic Zoologique)-তে বলেন **পরিবেশের প্রভাব** (Influence of the Environment)-এ দেহের পরিবর্তন ঘটে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে মাতাপিতার দেহে প্রকাশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তন পুরুষানুক্রমে সন্তানের দেহে সঞ্চারিত হয়। তিনি এর নাম দেন **অর্জিত গুণের উত্তরলব্ধি** (Inheritance of acquired characters)।

লামার্ক বলেন, পরিবেশের দ্বারা সোজাসুজি প্রভাবিত হওয়ার ফলেই উদ্ভিদজগতে পরিবর্তন আসে। কিন্তু প্রাণীর ক্ষেত্রে অঙ্গের পরিবর্তন ক্রমাগত ব্যবহার বা অব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ অত্যধিক ব্যবহৃত অঙ্গ পুষ্ট ও পরিবর্তিত হয়, কিন্তু অব্যবহৃত অঙ্গ ক্রমশঃ কর্মক্ষমতা হারিয়ে অবলুপ্ত হয়। এই **ব্যবহার ও অব্যবহারের আইন** (Law of use and disuse) লামার্কের গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ।



চিত্র 7.1—লামার্ক।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে এবং ক্রমাগত ব্যবহারে অঙ্গের পরিণতি সম্বন্ধে লামার্কের দৃষ্টান্ত চমকপ্রদ। তিনি বলেন, **একপ্রকার ঘোড়ার মতো জন্তু থেকে বর্তমান জিরাফের উদ্ভব হয়েছে।** আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে লম্বা গাছের পাতা খেয়ে ঘোড়ার মতো এই প্রাণীগুলি জীবনধারণ করত। খুব উঁচু গাছ থেকে ক্রমাগত পাতা সংগ্রহের ফলে গলদেশ ও তৎসংলগ্ন অঙ্গে টান পড়তে থাকে। এভাবে বংশপরম্পরায় গলা ও সামনের পা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই বর্তমান জিরাফের আবির্ভাব ঘটেছে। আবার উটপাখী জাতীয় প্রাণীর ডানার বৃদ্ধি অসম্পূর্ণ। এদের পূর্বপুরুষের ডানা ছিল বেশ বড়। ওড়ার কাজে ব্যবহৃত না হওয়ার ফলেই, ডানা ক্রমশঃ দেহের তুলনায় ছোট হয়ে গেছে।

লামার্কের ব্যবহার ও অব্যবহারের আইন সম্বন্ধে বিজ্ঞানীমহলে কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু অর্জিত গুণের উত্তরলব্ধি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ভাইসম্যান (Weismann)-এর মতে অর্জিত গুণ কখনই জনন-কোষের জিন (gene)-কে প্রভাবিত করে না। তাই পরবর্তী জননে সন্তানের দেহে ঐ গুণ সঞ্চারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তিনি পর পর বাইশ জনন ধরে পুরুষ ও স্ত্রী-ইঁদুরের লেজ কেটে দেখান, কোন জননেই সন্তানের উপর এর কোন রকম প্রভাব পড়ে না। বস্তুতঃ, প্রতিবারই লেজবিশিষ্ট ইঁদুরের আবির্ভাব ঘটে।

7.3. ডারউনের মতবাদ বা ডারউইনবাদ [*Theory of Darwin or Darwinism*] :

চার্লস ডারউইন সর্বপ্রথম উপযুক্ত ব্যাখ্যার সাহায্যে অভিব্যক্তিবাদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। 1859 খ্রীষ্টাব্দে জৈব অভিব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ **'প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা নতুন প্রজাতির উদ্ভব'** (Origin of New Species by Natural Selection) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানী **আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস** (Alfred Russel Wallace) এই মতবাদকে প্রামাণিক তথ্যের দ্বারা সমর্থন করেন। তিনটি প্রাকৃত ঘটনা ও পরিণামের উপর নির্ভর ক'রে ডারউইনের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত।

তাঁরা লক্ষ্য করেন, জগতে **জীবের বংশবৃদ্ধির হার অত্যধিক** (Prodigality of production)।



চিত্র 7.2—ডারউইন।

প্রথমতঃ, প্রতিটি জীবের প্রজাতির সংখ্যা এক বা একাধিক। একই প্রজাতির জীবের মধ্যেও আবার বিভিন্ন ধরনের **বৈচিত্র্য** বা **প্রকরণ** (Variation) দেখতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রচুর বংশবৃদ্ধি সত্ত্বেও, কোন একটি প্রজাতির অন্তর্গত জীবের সংখ্যা প্রায় নির্দিষ্ট থাকে। কারণ, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বাসস্থান সমস্ত জীবের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তাই জীবকুলের মধ্যে প্রতিনিয়ত বাঁচার সংগ্রাম চলে। ডারউইন এই সংগ্রামের নাম দেন **জীবন-সংগ্রাম** (Struggle for Existence)।

একই প্রজাতির অথবা বিভিন্ন প্রজাতির অন্তর্গত জীবের মধ্যে জীবন-সংগ্রাম চলতে পারে। তীব্র জীবন-সংগ্রামে সমস্ত প্রতিকূল ও প্রাকৃতিক অবস্থা তুচ্ছ ক'রে কেবলমাত্র বলবান জীবই বেঁচে থাকতে পারে, দুর্বলের মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ, **প্রকৃতি কেবল উপযুক্ত জীবকেই খাদ্য ও বাসস্থান যোগায়।** প্রকৃতির দ্বারা বাঁচার উপযুক্ত জীব-নির্বাচনকে **প্রাকৃতিক নির্বাচন** (Natural selection) বলা হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে **কেবলমাত্র উপযুক্ত জীবই বাঁচার অধিকারী** (Survival of the fittest)। তাদের অনুকূল বৈচিত্র্যগুলি বংশানুক্রমে সন্তান-সন্ততির দেহে সঞ্চারিত হয় এবং সেই বৈচিত্র্যগুলিই বড় আকারে বংশগতির নিয়মে কোন এক সন্তানের দেহে প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে এই পদ্ধতি চলতে থাকলে নিঃসন্দেহে **নতুন প্রজাতির উদ্ভব** (Origin of new species)-এর উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেয়।

অভিব্যক্তির স্বপক্ষে যুক্তি দেখালেও, ডারউইনের মতবাদ প্রশ্নাতীত নয়।

কিভাবে অনুকূল বৈচিত্র্যের আবির্ভাব ঘটে এবং সেগুলির পরিমাণ কি হলে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায়, সে সম্বন্ধে তিনি নিরুত্তর।

7.4. হুগো দ্য ভ্রিসের মতবাদ [*Theory of Hugo de Vries*] :

হল্যাণ্ডের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী হুগো দ্য ভ্রিস 1901 খ্রীষ্টাব্দে **মিউটেশান তত্ত্ব** (Mutation Theory) নামে এক নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। **ইভনিং প্রিমরোজ** (Evening Primrose) নামে এক প্রকার গাছের উপর পরীক্ষা পরিচালনাকালে তিনি দেখেন, নির্দিষ্ট প্রজাতির ফুল থেকে **আকস্মিকভাবে** কতকগুলি অদ্ভুত রকমের ফুল জন্মায়।

এই ফুলের বীজ থেকে বংশ-পরম্পরায় উৎপন্ন গাছ ও ফুলের চরিত্র অভিন্ন। তিনি এই নতুন গাছগুলির নাম দেন **মিউট্যাণ্ট** (Mutant)। যে প্রক্রিয়ায় অতি আকস্মিকভাবে এই বিরাট পরিবর্তন ঘটে, তাকেই তিনি **মিউটেশান** (Mutation) আখ্যা দেন।



চিত্র 7.3—হুগো দ্য ভ্রিস।

মিউটেশানের ফলে উৎপন্ন গাছ নতুন প্রজাতি বলে গণ্য হয়। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হতে পারে।

হুগো দ্য ভ্রিস ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ সমর্থন করেন। তাঁর মতে ক্রমাগত সৃষ্ট পার্থক্য (Continuous variation) পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয় না। সামান্য বৈচিত্র্যগুলি ক্রমে ক্রমে বিরাট পার্থক্যরূপে প্রকাশিত হলে তবেই নতুন প্রজাতির উদ্ভব সম্ভব।

7.5. আধুনিক মতবাদ—নিও-ডারউইনিজম [*Neo-Darwinism*] :

প্রজননবিদ্যা ও বংশগতির উপর আবিষ্কৃত বিভিন্ন তথ্য অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা দিতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। নবলব্ধ জ্ঞানের আলোকে আলোকিত এবং নবরূপায়িত ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদকেই **নয়া ডারউইনবাদ** বলা হয়। এই মতবাদ অনুসারে **কেবলমাত্র জিনের মিলনে অথবা জিনের মিউটেশান দ্বারা** বৈচিত্র্য আসে। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জিনের কার্যকলাপ এমনভাবে পরিবর্তিত হয়, যাতে প্রাকৃতিক নির্বাচনে এদের অস্তিত্ব বজায় থাকে। এইভাবে নতুন জীবের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়।

7.6. অভিব্যক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ [*Evidences in favour of evolution*] :

প্রমাণ ছাড়া কোন বিষয়ই বিজ্ঞানে গৃহীত হয় না। তাই অভিব্যক্তির সপক্ষে বিজ্ঞানীরা নানারূপ প্রমাণ উপস্থিত করে আসছেন। সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ



চিত্র 7.4—অগ্রপদের কাঠামোর সাদৃশ্য।

1. **অঙ্গ-সংস্থান বা শারীরস্থান সম্পর্কিত প্রমাণ** (Evidences from Morphology or Anatomy)—তুলনামূলক শারীরিক অঙ্গ-সংস্থান পদ্ধ-

তির পর্যালোচনা করলে মেরুদণ্ডী প্রাণীর দৈহিক গঠন পরিকল্পনায় একটি নিকট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

মাছ, ব্যাঙ, গিরগিটি প্রভৃতি প্রাণীর হৃৎপিণ্ড তুলনা করলে নিকট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। গঠনের দিক থেকে মাছের দুই-কক্ষবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত সরল। মাছ জলে বাস করে। মাছের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জলে বাস করার উপযোগী করে গঠিত। ব্যাঙ ও গিরগিটির হৃৎপিণ্ড মূলতঃ মাছের মতো হলেও এরা ভিন্ন পরিবেশে বাস করে বলে হৃৎপিণ্ডের গঠন নিজ নিজ পরিবেশের উপযোগী হয়েছে।

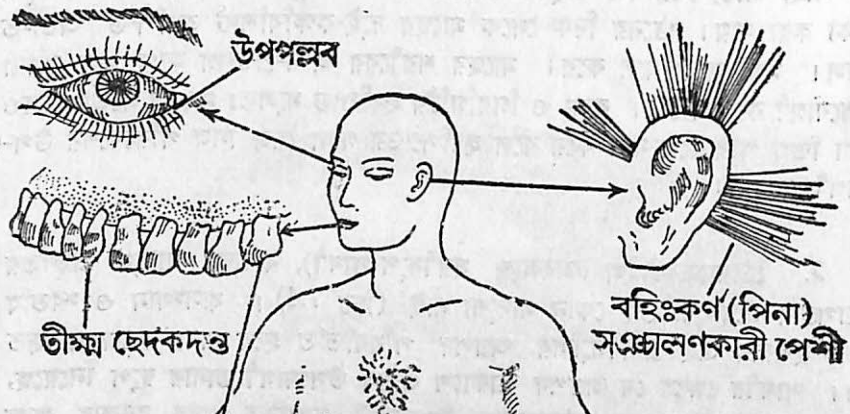
2. **টেরোডেকটাইল (অবলুপ্ত সরীসৃপ-পাখী), বাদুড়, মানুষ** প্রভৃতির অগ্রপদের মধ্যে বাহ্যিক কোন সাদৃশ্য নাই (চিত্র 7.4)। বাসস্থান ও স্বভাব ভিন্ন হওয়ায় এই প্রাণীগুলির অগ্রপদ পরিবর্তিত হয়ে নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। **পাখীর ক্ষেত্রে যে অগ্রপদ আকাশে ওড়ার উপযোগী ডানার রূপ নিয়েছে, মাছের ক্ষেত্রে যে অগ্রপদ দৌড়োনোর উপযোগী সুগঠিত পদের আকার লাভ করেছে, বাদুড়ের ক্ষেত্রে সেটাই ওড়বার অঙ্গরূপে এবং মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজের উপযোগী হস্তরূপে পরিবর্তিত হয়েছে।** তাই প্রাণীগুলির অগ্রপদের কঙ্কালের কাঠামো পরীক্ষা করলে দেখা যায় সেখানে প্রায় একই প্রকৃতির অস্থির সমন্বয় ঘটেছে।

উদ্ভিদ-জগতেও এই প্রকার প্রচুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। **পাতা ও ফুলের পাপড়ির গঠনে এবং শিরাবিন্যাস পদ্ধতিতে সাদৃশ্য আছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা প্রয়োজনের তাগিদেই যে একটি অঙ্গ থেকে অন্যটির উৎপত্তি হয়েছে তা এই সাদৃশ্য দেখে বোঝা যায়।**

3. **লুপ্তপ্রায় অঙ্গ থেকে প্রমাণ** (Evidences from vestigial organs)—জীবদেহের কতকগুলি ক্ষয়িষ্ণু অঙ্গ কোন কাজে আসে না। তাই জীবদেহে এই অঙ্গগুলির অস্তিত্বের কোন সার্থকতা নাই। এই অঙ্গগুলিকে লুপ্তপ্রায় বা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলে। গবেষণায় প্রকাশ, পূর্বপুরুষের দেহে এই অঙ্গগুলিই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জীবদেহে লুপ্তপ্রায় অঙ্গের উপস্থিতি অভিব্যক্তির স্বপক্ষেই রায় দেয়।

মানুষের মেরুদণ্ডের নিম্নাংশে অবস্থিত নিষ্ক্রিয় অস্থি (**অণুত্রিকাস্থি**—Coccyx) তার পূর্বপুরুষের দেহে লেজের অস্তিত্বের স্বপক্ষে রায় দেয়। লেজযুক্ত শিশু জন্মানোর মতো অঘটন আজও ঘটে। এছাড়া মানুষের দেহে

উপপল্লব, কর্ণপেশী, আপেনডিক্স প্রভৃতি অঙ্গসমেত প্রায় নব্বইটি লুপ্তপ্রায় অঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায় (চিত্র 7.5)। এগুলি অভিব্যক্তির সপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।

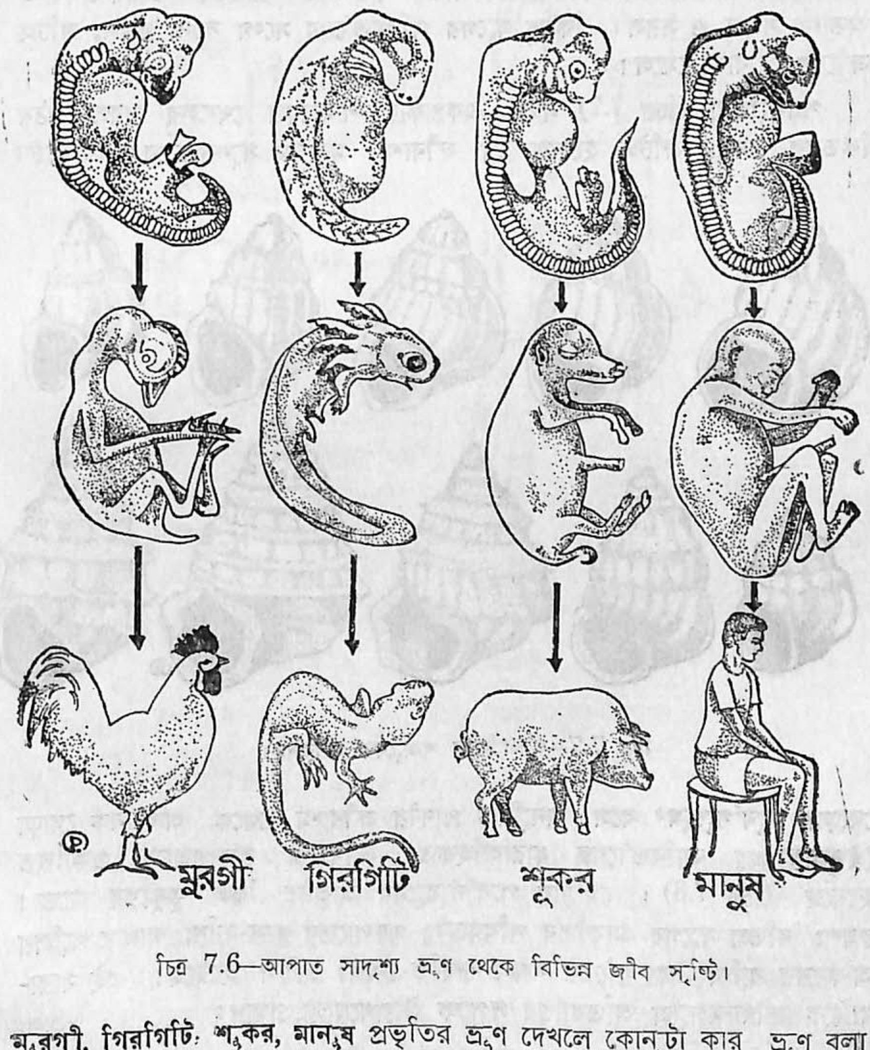


চিত্র 7.5—মানবদেহে কতকগুলি লুপ্তপ্রায় অঙ্গ।

4. **সংযোগকারী প্রাণী থেকে প্রমাণ** (Evidences from connecting links)—পৃথিবীতে এমন কতকগুলি প্রাণী আছে যেগুলিকে আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিচারে নিকটতম দুইটি শ্রেণীর যে কোন একটির অন্তর্গত মনে করা যেতে পারে। এজন্যই এই প্রাণীগুলিকে সংযোগকারী প্রাণী বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ অস্ট্রেলিয়ার সর্বনিম্ন স্তরের স্তন্যপায়ী প্রাণী **হংসচঞ্চু বা প্ল্যাটিপাস**-এর উল্লেখ করা যায় (চিত্র 2.46ক)। এরা বাচ্চাকে স্তন্যদান করলেও সরীসৃপের মতো ডিম পাড়ে। সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ীর উদ্ভবের সত্যতা এইভাবে

প্রমাণিত হয়। কারণ হংসচঞ্চু উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে সংযোগকারী প্রাণী। তেমনি **লাংফিস** (Lung fish) মৎস্য ও আম্ফিবিয়ার মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী প্রাণী।

5. **ভ্রূণতত্ত্ব থেকে প্রমাণ** (Evidences from Embryology)—ভ্রূণ জীবনের প্রথম দশা। বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ বা বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রূণের আকৃতি-প্রকৃতি ও বৃদ্ধির মধ্যে বহু সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। ভ্রূণগুলির বৃদ্ধি ও পরিণতি পরীক্ষা করলে অভিব্যক্তির সমর্থন মেলে ; যেমন, প্রথমাবস্থায়



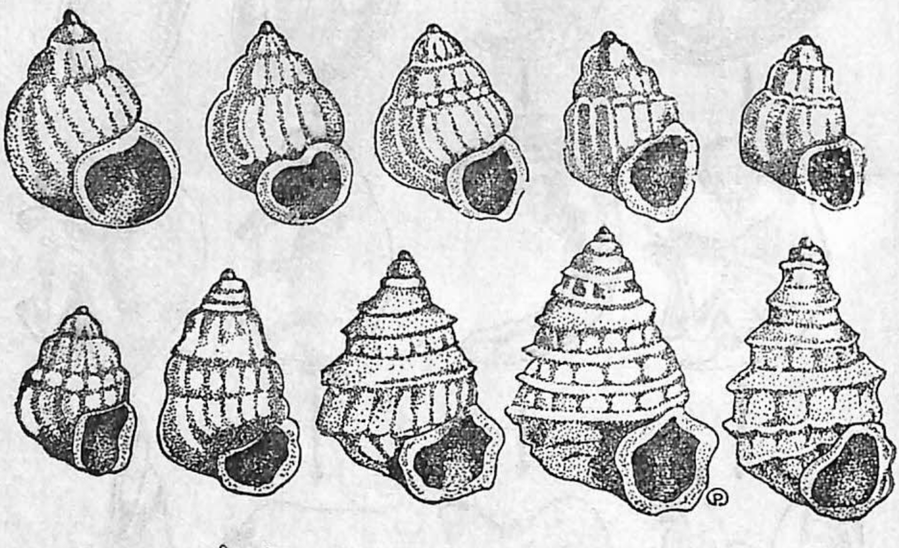
চিত্র 7.6—আপাত সাদৃশ্য ভ্রূণ থেকে বিভিন্ন জীব সৃষ্টি।

মুরগী, গিরগিটি, শূকর, মানুষ প্রভৃতির ভ্রূণ দেখলে কোন্‌টা কার ভ্রূণ বলা কষ্টকর (চিত্র 7.6)। কিন্তু ক্রমশঃ ঐ ভ্রূণ পরিণত হয়ে বিভিন্ন জীবের আকৃতি

লাভ করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিণত বয়সে ভিন্ন আকৃতি সত্ত্বেও সেগুলির মধ্যে নিকট সম্বন্ধ বর্তমান এবং অভিব্যক্তির ফলেই এই আকৃতিগত বৈষম্য দেখা দিয়েছে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

6. **প্রত্নজীববিদ্যা থেকে প্রমাণ** (Evidences from Palaeontology) — পৃথিবীর আদিযুগের শিলাস্তরে নানা আকৃতি ও প্রকৃতির যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ বা **জীবাশ্ম** (Fossil) পাওয়া যায়, সেগুলির তুলনামূলক আলোচনা করলে জৈব অভিব্যক্তির সমর্থন মেলে। প্রাচীনতম স্তরে কোন জীবের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরবর্তী স্তরের জীবাশ্ম অত্যন্ত সহজ ও সরল। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ জটিল জীবের জীবাশ্ম মেলে।

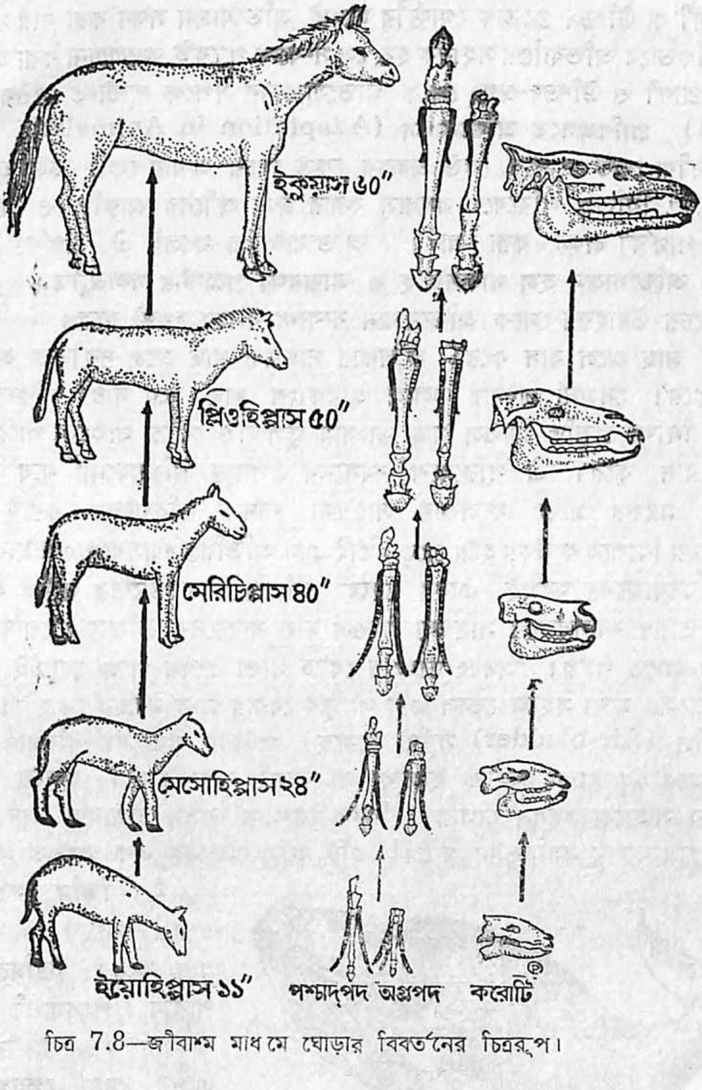
প্যালুডিনা (চিত্র 7.7) নামে একপ্রকার শামুকের খোলের সরল গঠন কিভাবে ক্রমশঃ জটিল হয়েছে, তা জীবাশ্ম মাধ্যমে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট।



চিত্র 7.7—প্যালুডিনা শামুকের জীবাশ্ম।

ঘোড়ার পূর্বপুরুষ* বলে অনুমিত প্রাণীর জীবাশ্ম থেকে আধুনিক ঘোড়া (ইকুয়াস)-এর আবির্ভাবের ধারাবাহিকতা জীবাশ্মে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে (চিত্র 7.8)। ঘোড়ার পূর্বপুরুষের আকৃতি ছিল কুকুরের মতো। ক্রমশঃ বিভিন্ন যুগের আকৃতির পরিবর্তন, পদপাতের হ্রাস-বৃদ্ধি, মাথার খুলির আকারের বৃদ্ধি এবং দাঁতের সজ্জা-পদ্ধতি ক্রমশঃ জটিল হয়েছে। এই ধারাবাহিক জীবাশ্মগুলি অভিব্যক্তির সপক্ষে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

* ইয়োহিপ্পাস, মেসোহিপ্পাস, মেরিচিপ্পাস, প্লিওহিপ্পাস।



চিত্র 7.8—জীবাশ্ম মাধ্যমে ঘোড়ার বিবর্তনের চিত্ররূপ।

7.7. অভিযোজন [*Adaptation*] :

জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে গেলে জীবকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। এই সংগ্রাম বহুমুখী। নিজ প্রজাতিভুক্ত জীব বা অন্য কোন প্রজাতির জীবের মধ্যে সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে জীব নিজ পরিবেশের সঙ্গেও সংগ্রামে লিপ্ত হয়। **প্রয়োজনমত দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন ও পরিবর্জন মাধ্যমে পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াকে অভিযোজন বলে।** অভিযোজন ক্ষমতা জীবের একটি অসাধারণ গুণ। অভিযোজনের ফলে শুধু দেহ-ই নয়, জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত হয়।

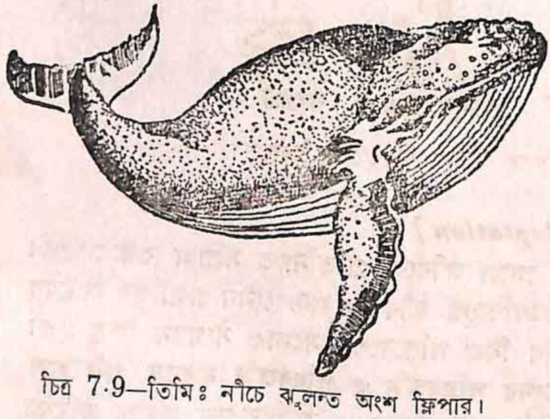
প্রাণী বা উদ্ভিদ প্রত্যেক গোষ্ঠীর মধ্যেই অভিযোজন লক্ষ্য করা যায়। নবলব্ধ বৈচিত্র্য কিভাবে অভিব্যক্তির সহায়ক হয়, সে সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগৎ থেকে অভিযোজনের সপক্ষে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

(A) **প্রাণিজগতে অভিযোজন** (Adaptation in Animals)

প্রাণীরা কেউ স্থলচর, কেউ জলচর, কেউ খেচর আবার কেউ কেউ ভূগর্ভেও বাস করে। বিভিন্ন পরিবেশে বসবাস করার জন্য জীবের আকৃতি ও প্রকৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অভিযোজনের ফলেই ঐ পার্থক্য আসে। তাছাড়া **অভিযোজন হল খাদ্যসংগ্রহ ও আত্মরক্ষা প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি।**

নীচের উদাহরণ থেকে অভিযোজন সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হবে ঃ

1. **মাছ** জলে বাস করে। ফুলকার সাহায্যে মাছ জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে। সেজন্য ডাঙগায় তুললে অধিকাংশ মাছ মরে যায়। কিন্তু **কই, মাগুর, সিঙ্গি** প্রভৃতি জিওল মাছ ডাঙগায় তুললেও বেঁচে থাকতে পারে। এরা পাঁকে বাস করে। ঐ পরিবেশে শ্বসনের উপযুক্ত অক্সিজেনের খুব অভাব। সাধারণ মাছের মতো ফুলকার সাহায্যে শ্বসন পরিচালনা করাই এদের পক্ষে সময় বিশেষে কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই এরা অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের সাহায্য নেয়। **অভিযোজনের ফলেই এদের দেহে অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে।** এই অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে জিওল মাছ বাতাসের অক্সিজেন শোষণ ক'রে শ্বসন চালাতে পারে। অর্থাৎ ডাঙগায় বেঁচে থাকা এদের পক্ষে মোটেই কষ্টকর নয়। জলের মধ্যে সহজে ভেসে ওঠা বা ডুব দেবার জন্য মাছের দেহে **পটকা** বা **বায়ুস্থলি** (Air-bladder) সৃষ্টি হয়েছে। পটকায় বাতাসের পরিমাণ কম বা বেশী করে ইচ্ছামতো দেহকে হাল্‌কা বা ভারী করা চলে। জলচর ব্যাঙাচি ফুলকার সাহায্যে শ্বসন চালায়। কিন্তু ডাঙগায় শ্বসন চালাবার জন্য ব্যাঙের দেহে ফুসফুসের আবির্ভাব ঘটে। এটি অভিযোজনের এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত।


চিত্র 7·9—তিমি ঃ নীচে ঝুলন্ত অংশ ফ্লিপার।

2. **তিমি** স্তন্যপায়ী হয়েও মাছের মতো জলে বাস করে। তিমির পূর্ব-পুরুষ স্থলবাসী ছিল। অন্যান্য স্তন্যপায়ীর মতো এদের দেহ লোমে ঢাকা ছিল। এমনকি হাত-পা-ও ছিল। স্থল ছেড়ে জলে আসার সঙেগ সঙেগ তিমির দেহে পরিবেশ অনুযায়ী নানাবিধ অঙগ-প্রত্যঙেগর আবির্ভাব ঘটেছে। **পশ্চাৎ-পদের অবলুপ্তি** এবং অগ্রপদ রূপান্তরিত হয়ে সাঁতার কাটার উপযোগী পাখনা বা ফ্লিপার [(Flipper) (চিত্র 7.9)] গঠন বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিযোজন।

তাছাড়া চলাচলের সুবিধার জন্য দেহ **মৎস্যাকৃতি হয়েছে,** লেজ হয়েছে **আড়াআড়িভাবে চ্যাপ্টা।** জলে বিরাট শরীরকে সহজে ভাসিয়ে রাখার জন্য **দেহ হয়েছে প্রশস্ত ও বিস্তৃত।**

সর্বাঙ্গে লোম থাকা স্তন্যপায়ী জীবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভ্রূণাবস্থায় তিমির দেহে লোম থাকলেও পরিণত বয়সে লোম ঝরে যায়। দৈহিক উত্তাপ ঠিক রাখার জন্য লোমের পরিবর্তে **চামড়ার নীচে চর্বির পর্দা গঠিত হয়।** আশ্চর্যের কথা, নানাবিধ অভিযোজন সত্ত্বেও তিমি অন্যান্য স্তন্যপায়ীর মতো বাচ্চাদের দুধ দেয়। এইসব লক্ষণ দেখে মনে হয়, তিমির ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে **গৌণ অভিযোজন** (Secondary adaptation) ঘটেছে।

3. **উট** মরুভূমিতে বাস করে। বালির ঝড় থেকে চোখ, কান ও নাক রক্ষা করার জন্য মরুভূমিতে বসবাসকারী প্রাণীর দেহে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটে। উটের চোখ বৃহদাকার। বালির ঝড় ও উত্তাপ থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য গলা হয় লম্বা। এর ফলে চোখ সাধারণতঃ মাটির 278 সে. মি. (9 ফুট) উপরে থাকে। তাতে দূরের বস্তু সহজে দৃষ্টিগোচর হয়। চোখের পাতার মতো উটের নাকও বন্ধ করা যায়। কানের ছিদ্রও রোমে ঢাকা থাকে। মরুভূমিতে বালির উপর দিয়ে সহজে চলাফেরা করার জন্য পায়ের পাতা চ্যাপ্টা প্যাডের মতো। মরুভূমিতে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব প্রকট। অনেকের ধারণা পিঠের কুঁজে সঞ্চিত চর্বি গলিয়ে এরা জলের চাহিদা মেটাতে পারে। উল্লিখিত সমস্ত ব্যবস্থাই অভিযোজনের দৃষ্টান্ত।

মেবুইয়া মরুভূমির একপ্রকার গিরগিটি। এদের চোখের নীচের পাতায় একটি স্বচ্ছ জানালা আছে। এই জানালা দিয়ে চোখ বুজেও মেবুইয়া স্পষ্ট দেখতে পায়। **অ্যাবলেফেরাস** নামে অপর এক সরীসৃপের দেহে এই ব্যবস্থার চরম উন্নতি দেখা গেছে। এদের চোখের নীচের পাতার সঙ্গে উপরের পাতা যুক্ত এবং নীচের পাতাটি সম্পূর্ণভাবে স্বচ্ছ। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিঃসন্দেহে অভিযোজনের সপক্ষে রায় দেয়।

4. **অভিযোজনের তাগিদে প্রাণীর রঙ ও আকৃতির বৈচিত্র্য** উল্লেখের দাবি রাখে। পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে রঙ-বৈচিত্র্য প্রাণীকে বহুলাংশে সাহায্য করে।

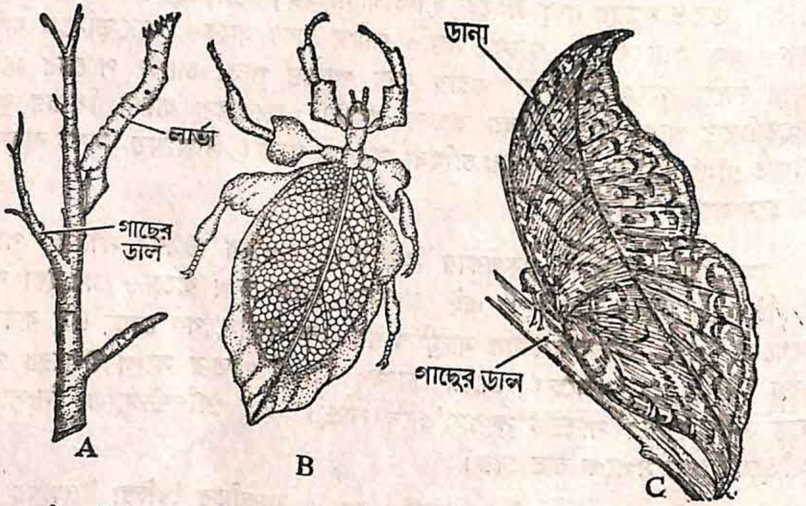
পরিবেশ অনুযায়ী প্রাণীর রঙে স্থায়ী বা অস্থায়ী পরিবর্তন আসে। তাই রঙ দেখে জীবের বাসস্থানের হদিস পাওয়া যায়। **মরুভূমিবাসী প্রাণীদের দেহ সাধারণত হাল্কা ছাই বা বালি রঙের হয়।** দৃষ্টান্তস্বরূপ **উট** বা **সিংহের** নাম করা যায়। রঙের অভিযোজন আত্মরক্ষার প্রয়াস মাত্র।

সুন্দরবনের বাঘের দেহে হলদে-কালো রঙের ডোরা কাটা দাগ থাকে। সেজন্য এরা স্বচ্ছন্দে হোগলা বা অন্য কোন গাছের ছায়ায় লুকিয়ে শত্রুর হাত

থেকে রক্ষা পায় অথবা অলক্ষ্যে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। **জেব্রার** গায়ের ডোরাকাটা দাগও অভিযোজনে সহায়তা করে।

লাউডগা সাপ বা **সবুজ** লম্বা পা-বিশিষ্ট ফড়িং স্বচ্ছন্দে গাছের পাতার সঙ্গে মিশে থাকে। ভালুকের রঙ সাধারণতঃ কালো, কিন্তু মেরু অঞ্চলের ভালুকের গায়ের রঙ সাদা। ফলে এরা বরফের আড়ালে লুকিয়ে থেকে শিকার ধরতে পারে এবং সেই সঙ্গে নিজেরাও শিকারীর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেয়। একই-ভাবে **চলন্ত কাঠি, জিওমেট্রিড লার্ভা** (চিত্র 7.10A) প্রভৃতিও পরিবেশে এমন-ভাবে মিশে থাকে যাতে সহজে নজরে না আসে।

ফাইলিয়ম (*Phyllium*) নামে একপ্রকার পতঙ্গকে (চিত্র 7.10B) গাছের পাতায় বিচরণ করতে দেখা যায়। এই পতঙ্গের আকৃতি অবিকল পাতার মতো ; দেহের রঙ সবুজ, দেহে পাতার মতো শিরাবিন্যাসও দেখা যায়। সেজন্য এই পতঙ্গের নাম হয়েছে **'চলন্ত পাতা'**। **কালিমা প্যারালেকটা** (*Kallima paralecta*) নামে একপ্রকার প্রজাপতি (চিত্র 7.10C) যখন ডানা বন্ধ করে গাছের ডালে বসে, তখন তাদের অবিকল পাতার মতো দেখায়। এদের দেহে



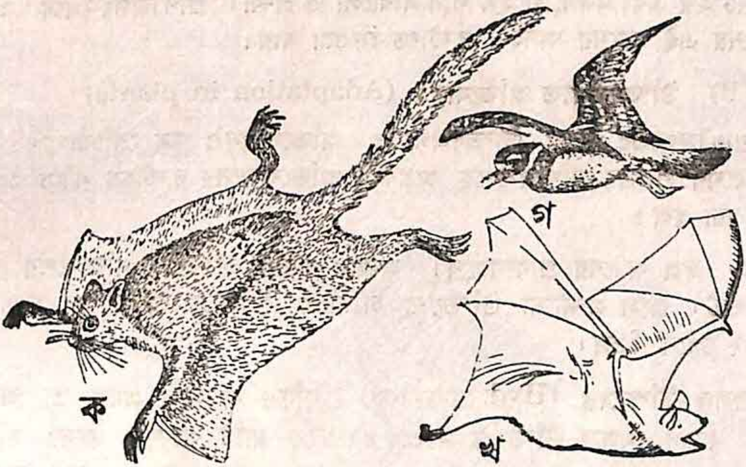
চিত্র 7.10 : A—জিওমেট্রিড লার্ভা ; B—ফাইলিয়ম ; C—কালিমা।

পাতার মতো শিরাবিন্যাসও দেখা যায়। প্রাণিজগত থেকে অভিযোজনের এমন অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

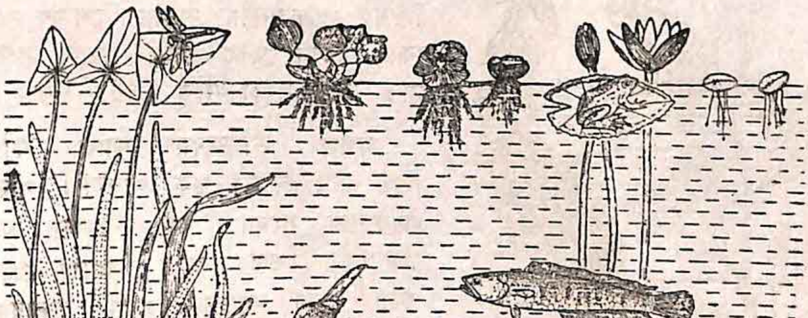
5. পাখীর বাতাসে ওড়ার ক্ষমতা আছে, অন্যান্য শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর সেই ক্ষমতা নাই। তবু প্রয়োজনের তাগিদে **উড্ডয়নশীল মাছের** ডানা গজায়।

উড়ন্ত টিকটিকি বা ড্রাকো সরীসৃপ হয়েও এক গাছ থেকে অন্য গাছে বা গাছ থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়তে পারে। এই কাজের জন্য ছয় জোড়া পাঁজরের

কাঠামোয় বিস্তৃত চামড়া প্রভৃত সহায়তা করে। অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদের মধ্যে সংযোগকারী একটি পর্দার সাহায্যে **উড্ডয়নশীল কাঠবেড়ালী** এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে বেড়ায় (চিত্র 7.11ক)। **উড়ন্ত ব্যাঙের** আঙ্গুলে ছড়ান পর্দা



চিত্র 7·11ঃ ক—উড্ডয়নশীল কাঠবিড়ালী ; খ—বাদুড় ; গ—পাখী।



চিত্র 7·12—পুকুরের স্বাভাবিক পরিবেশে কয়েকটি জলজ উদ্ভিদ।

তাকে কিছুক্ষণ হাওয়ায় ভেসে থাকতে সাহায্য করে। **বাদুড়** স্তন্যপায়ী জীব। অধিকাংশ স্তন্যপায়ীর মতো মাটিতে বিচরণ না করে বাদুড় তার দেহ ও অগ্রপদে বিস্তৃত পাতলা চামড়ার সাহায্যে স্বচ্ছন্দে আকাশে ঘুরে বেড়ায়।

6. ভূগর্ভে বসবাসকারী প্রাণীর দেহে বিশেষ ধরনের অভিযোজন লক্ষ্য করা যায়। **ইঁদুর, ছুঁচো**, দক্ষিণ আফ্রিকার **গোল্ডেন মোল** (Golden mole) প্রভৃতি প্রাণী মাটির গর্তে বাস করে। গর্ত খোঁড়ার সুবিধার জন্য প্রাণীগুলির পা ছোট হয় এবং নখগুলি হয় খুব ধারালো ও লম্বা। প্রাণীজগৎ থেকে অভিযোজনের এই ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

(B) উদ্ভিদজগতে অভিযোজন (Adaptation in plants)

প্রাণীজগতের মতো উদ্ভিদজগতের অভিযোজনও কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। পরিবেশের প্রভাবে উদ্ভিদ-দেহে কয়েকটি অভিযোজনের দৃষ্টান্ত নীচে আলোচনা করা হলঃ

1. জল জীবের প্রাণস্বরূপ। জলের মাত্রার তারতম্যে পরিবেশের তারতম্য ঘটে। জলে জন্মানো উদ্ভিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ স্থলবাসী উদ্ভিদ থেকে ভিন্ন।

জলজ উদ্ভিদের (Hydrophytes) যদিও বা মূল থাকে তা অত্যন্ত কম। কারণ, স্থলজ উদ্ভিদের মতো দৃঢ়ভাবে মাটি আঁকড়ে এদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না বা খাদ্য ও জলে সংগ্রহের জন্য মূলের উপর সর্বাংশে নিভর করতে হয় না। জলে নিমজ্জিত অংগ দিয়েই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের শোষণ ঘটে। কোন কোন ক্ষেত্রে মোটেই মূল জন্মায় না। যথা—**পাতা-ঝাঁঝি** (চিত্র 7.16)।



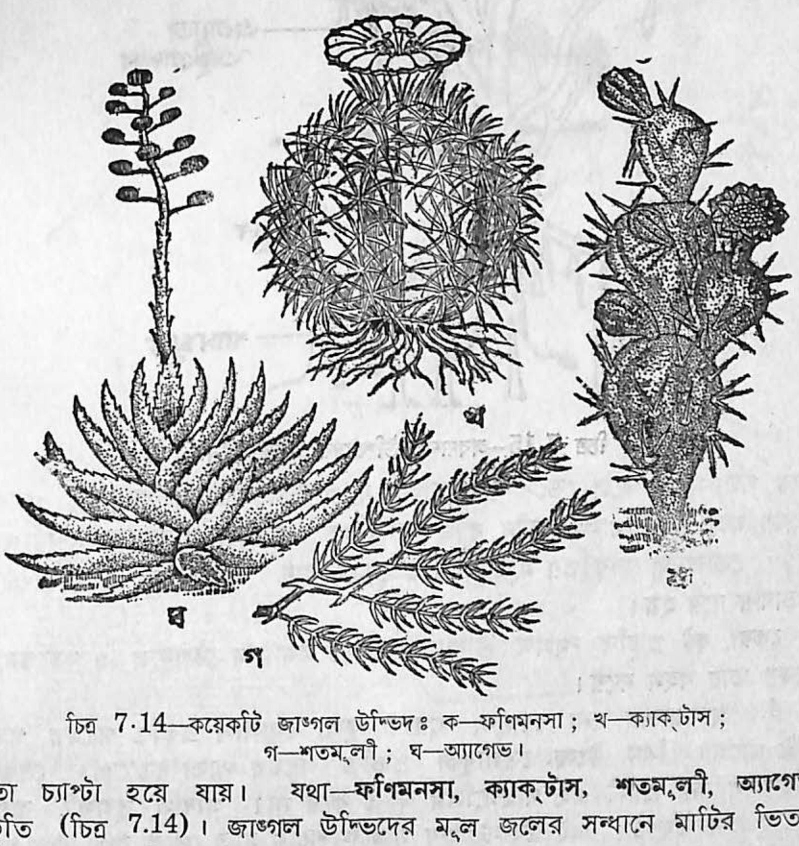
চিত্র 7.13 : ক—তিরকুট ; খ—লিমনোফাইলা।

জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড ফাঁপা, নরম এবং দেহের ত্বক পাতলা। পাতার পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা কম থাকায় বায়ু দেহত্বকের ভিতর দিয়ে সহজে প্রবেশ করে এবং কাণ্ডের মধ্যে **বাতাবকাশ** (Air-space)-এ জমা থাকে। এতে শ্বাসকার্যেও সহায়তা পাওয়া যায়। **কচুরিপানা** জলে ভাসে। ভেসে থাকার সুবিধার জন্য পত্রবৃন্ত বায়ুস্ফীত হয়।

জলজ উদ্ভিদের পাতায় নানারূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সম্পূর্ণ নিমজ্জিত গাছের পাতা চ্যাপ্টা ফিতার মতো, যথা—**পাতা-শেওলা, পানিফল, তিরকুট লিমনোফাইলা** (চিত্র 7.13) প্রভৃতি গাছে দু'ধরনের পাতা আছে।

নিমজ্জিত অংশের পাতা সরু সুতোর মতো, কিন্তু জলের উপরে অবস্থিত পাতাগুলি স্বাভাবিক আকৃতির। **জলপদ্ম, শালুক** প্রভৃতি গাছের পাতার নিম্নত্বক জল-সংলগ্ন থাকে। তাই পাতার ঊর্ধ্ব ত্বকেই কেবল পত্ররন্ধ্র থাকে।

2. উষ্ণ ও মরু অঞ্চলের উদ্ভিদকে **জাঙ্গল উদ্ভিদ** (Xerophytes) বলে। এখানে জীবনধারণের উপযোগী জলের অভাব প্রকট। অতি কষ্টে সংগৃহীত জল যাতে বেশী পরিমাণে বাষ্প হয়ে বেরিয়ে না যায়, সেজন্য জাঙ্গল উদ্ভিদের দেহে নানারূপ অভিযোজন ঘটে। ঘন রোম বা রোমের আবরণে আবৃত হওয়া ছাড়াও পাতাগুলি গুটিয়ে যায় বা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। এতে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য কাণ্ড নিজেই পাতার



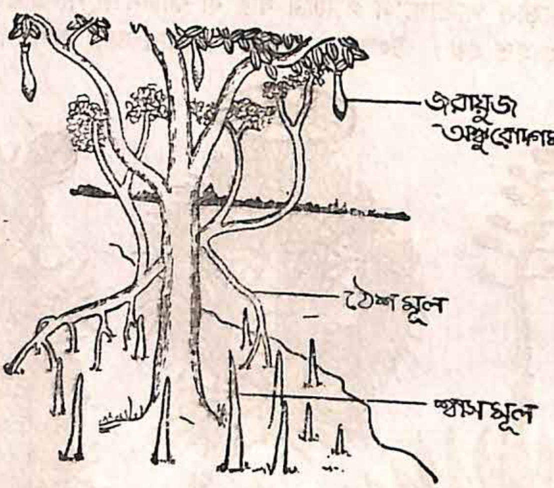
চিত্র 7·14—কয়েকটি জাঙ্গল উদ্ভিদঃ ক—ফণিমনসা ; খ—ক্যাক্‌টাস ; গ—শতমূলী ; ঘ—অ্যাগেভ।

মতো চ্যাপ্টা হয়ে যায়। যথা—**ফণিমনসা, ক্যাক্‌টাস, শতমূলী, অ্যাগেভ** প্রভৃতি (চিত্র 7.14)। জাঙ্গল উদ্ভিদের মূল জলের সন্ধানে মাটির ভিতর বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

3. সমুদ্র-উপকূলবর্তী লবণাক্ত জলাভূমিতে বর্ধিত **লবণাম্বু উদ্ভিদ** (Halophytes) অঙ্গেও নানারূপ অভিযোজন ঘটে। এই গাছগুলি **ঠেশমূল** উৎপন্ন ক'রে জলের ঢেউয়ের আঘাত সহ্য করে। সুন্দরবন অঞ্চলে **সুন্দরী, কেওড়া, গরান** প্রভৃতি গাছের অস্থানিক ঠেশমূল গাছগুলিকে মাটিতে দৃঢ়-

ভাবে আটকে রাখে। সর্বদা জলে ঢাকা থাকায় মাটিতে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। সেক্ষেত্রে **শ্বাসমূল** মাটির উপরে পাঠিয়ে এই গাছগুলি বায়ু থেকে অক্সিজেন শোষণ করে।

শ্বাসমূলের আগায় অসংখ্য **শ্বাসছিদ্র** থাকে। ঐ ছিদ্রপথে বাতাসের আদান-প্রদান ঘটে। **জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম** (Viviparous germination or Vivipary) পদ্ধতিও অপর এক বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিযোজন। মাটিতে বীজ পড়ার পর স্বাভাবিক পরিবেশে অঙ্কুরিত হওয়ার সুযোগ এখানে কম। কারণ



চিত্র 7.15—লবণাম্বু উদ্ভিদের অভিযোজন।

নীচে পড়া-মাত্রই জলে ভেসে বীজগুলির দূরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য ফল গাছে থাকাকালীন বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং সময়মতো নীচে খসে পড়ে। ভোজালি আকৃতির মূল মাটিতে গেঁথে যায়, ফলে জলে ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা দূর হয়।

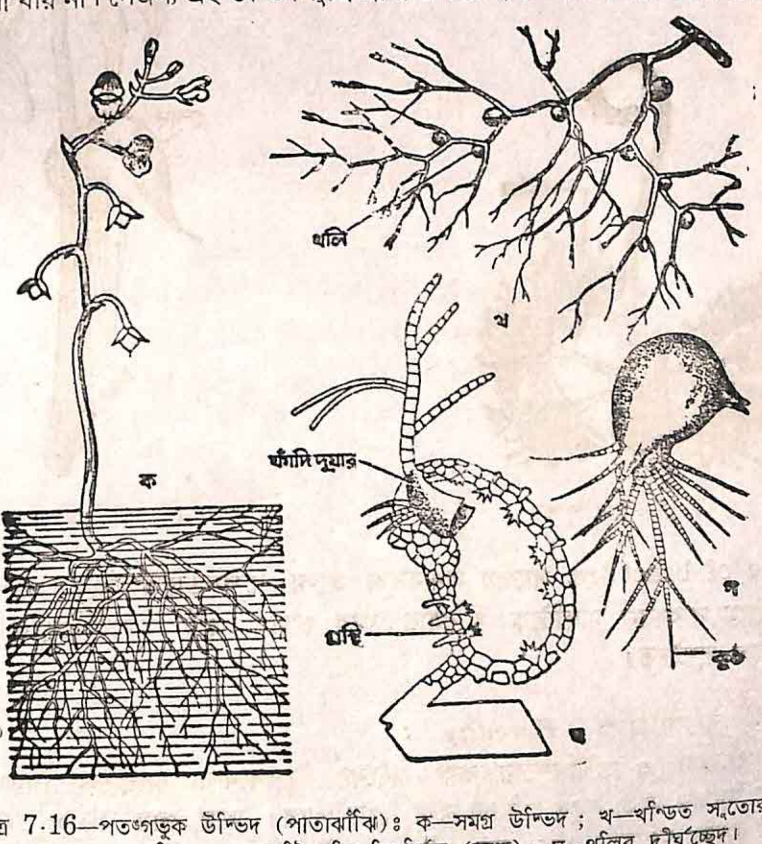
কেয়া, বট প্রভৃতি স্থলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে **ঠেশমূল** ও **স্তম্ভমূল** গাছের ভার বহন করে।

4. আত্মরক্ষার জন্য **বেগুন, দুরন্ত কুল, গোলাপ** প্রভৃতি গাছের গায়ে কাঁটা থাকে। **নিম, উচ্ছে, তেলাকুচা** প্রভৃতি গাছের পাতা তেঁতো। সেজন্য অধিকাংশ বন্য প্রাণী এই গাছগুলির ক্ষতি করে না। **গাঁদাল, তুলসী, বাসক** পাতার গন্ধ উৎকট। এই উৎকট গন্ধ গাছকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে।

5. অর্কিড **পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ** (Epiphyte)। মাটির সঙ্গে পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের সরাসরি যোগাযোগ থাকে না। অর্কিড-জাতীয় পরাশ্রয়ী উদ্ভিদে দু'ধরনের মূল দেখা যায়—**সরু দৃঢ়সংলগ্নী মূল** আশ্রয়দাতার বল্কলকে আঁকড়ে ধরে এবং অপর মূলগুলি—অর্থাৎ বায়ুতে ঝুলে থাকা পরাশ্রয়ী মূল বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করে। মূলের জলীয় বাষ্প শোষণকারী বিশেষ কলাকে **ভেলামেন** (Velamen) বলে।

6. আত্মরক্ষা ও বংশবিস্তারে সুবিধার জন্য **আদা, হলুদ, আলু, ওল** প্রভৃতি কাণ্ডের একাংশ মাটির মধ্যে থাকে। মৃদগত কাণ্ডে প্রচুর খাদ্য সঞ্চিত থাকে এবং পরবর্তী ঋতুতে এগুলি থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়। তাছাড়া মাটির নীচে শত্রুর অগোচরে থেকে মৃদগত অংশ বংশ বিস্তারে সাহায্য করে।

7. **ঘটপত্রী, পাতাঝাঁঝি** (চিত্র 7.16), **সূর্যশিশির** (চিত্র 7.17) প্রভৃতি উদ্ভিদ এমন স্থানে জন্মায়, যেখানে জীবনধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন পাওয়া যায় না। সেজন্য এই উদ্ভিদগুলি নানা উপায়ে কীট-পতঙ্গ ধরে এবং তাদের

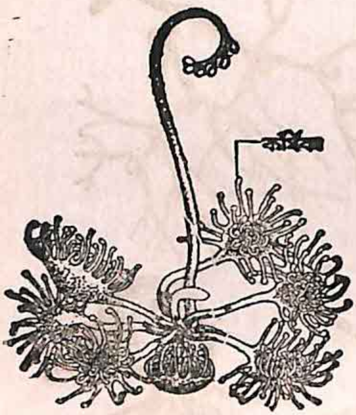


চিত্র 7.16—পতঙ্গভুক উদ্ভিদ (পাতাঝাঁঝি): ক—সমগ্র উদ্ভিদ ; খ—খণ্ডিত সুতোর মতো পাতার থলি ; গ—একটি থলি বিবর্ধিত (দৃশ্য) ; ঘ—থলির দীর্ঘচ্ছেদ।

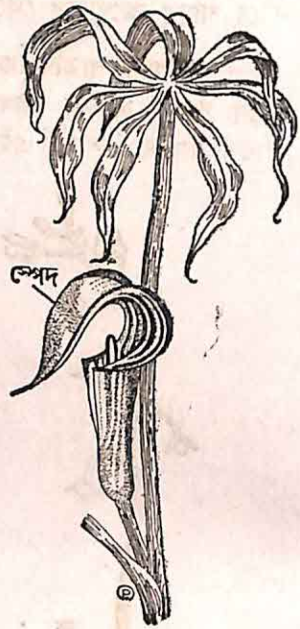
দেহ থেকে নাইট্রোজেনঘটিত প্রোটিন খাদ্য সংগ্রহ করে। ঘটপত্রীর ক্ষেত্রে কলসের জলে নিমজ্জিত হয়ে, পাতাঝাঁঝির ক্ষেত্রে বিশেষ থলিতে আটকা প'ড়ে এবং সূর্যশিশিরের ক্ষেত্রে পাতার চতুর্দিক থেকে উৎপন্ন কর্ষিকার চাপে প্রাণীর মৃত্যু হয়।

এইভাবে পরিবেশে নিজেকে অভিযোজিত করার ক্ষমতা অল্পবিস্তর সকল প্রাণী বা উদ্ভিদেরই আছে। অভিযোজন ক্ষমতা জীবের অন্যতম ধর্ম।

8. **সহকৃতি** (Mimicry)—জীবদেহের আকৃতি অনুকরণের প্রবণতা উদ্ভিদেও দেখা যায়। পাহাড়ী অঞ্চলে কচুজাতীয় উদ্ভিদ—**এরিসিমা স্পিসিওসা** (*Arisaema speciosa*) তার **স্পেদ** বা **চমসা** (Spathe—a



চিত্র 7·17—সূর্যশিশির।



চিত্র 7·18—এরিসিমা স্পিসিওসা।

type of bract)-কে সাপের ফণাসদৃশ অংগে রূপান্তরিত করে। প্রাণীরা সর্পভ্রমে সাবধানে গাছটিকে পরিহার করে চলে। এটি অভিযোজনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

7.8. বংশগতি [*Heredity*] :

বংশরক্ষা ও বংশবিস্তার করা জীবের উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জীব নিজের মতো নতুন জীবের জন্ম দিতে পারে। আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতির বীজ থেকে যথাক্রমে আম, জাম, কাঁঠাল গাছই জন্মায়। গরু বা ছাগল থেকে যথাক্রমে গরু বা ছাগলেরই জন্ম হয়। এভাবে **সব প্রাণী বা উদ্ভিদই নিজের মতো জীবের জন্ম দিয়ে নিজের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি সন্তান-সন্ততির মধ্যে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত করে। একেই বংশগতি বলে।**

● **বংশগতির সংজ্ঞা** (Definition of heredity) **: যে পদ্ধতিতে মাতাপিতার বা জনিতৃর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততি বা অপত্য জীবে বর্তায় তাকে বংশগতি বলে।**

জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বংশগতির আলোচনা করা হয় তাকে **সুপ্রজনবিদ্যা** বা **জেনেটিক্স** (Genetics) বলে। প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী **বেটসন** (Bateson) 1906 খ্রীষ্টাব্দে সর্ব প্রথম জেনেটিক্স কথাটি ব্যবহার করেন।

সন্তান-সন্ততি সর্বাংশে মাতাপিতার মতো হওয়া উচিত। তবে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ জীবের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য সমভাবে বংশধরের দেহে সঞ্চারিত হতে পারে না। আর পারে না বলেই জীব-জগতে এত বৈচিত্র্য।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, কোন প্রজাতির কিছু উদ্ভিদ বা প্রাণীকে পৃথক পরিবেশে রাখলে একই বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও তাদের দেহে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য আসে। এই বৈচিত্র্যের জন্য পরিবেশই দায়ী। পরিবেশের প্রভাব ছাড়াও অন্যভাবে বৈচিত্র্য আসতে পারে।

বংশগত বৈশিষ্ট্য-বহনকারী ক্রোমোজোমের বা জিনের পরিবর্তনের ফলেই সেই বৈচিত্র্য আসা সম্ভব।

7.8(A). গ্রেগর যোহান মেণ্ডেলের সংক্ষিপ্ত জীবনী *[A brief life sketch of Gregor Johan Mendel] :*

জীবের বৈশিষ্ট্যাবলী বংশপরম্পরায় কিভাবে সঞ্চারিত হয় তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দার্শনিক ও বিজ্ঞানী নানান মতবাদ ব্যক্ত করেন। কিন্তু একমাত্র মেণ্ডেলই বংশগতির সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হন। মেণ্ডেল তাই আজ চিরস্মরণীয়।



চিত্র 7·19—মেণ্ডেল।

অস্ট্রিয়ার সাইলিসিয়ার অন্তর্গত হাইনজেনডর্ফ গ্রামে এক চাষী-পরিবারে 1822 খ্রীষ্টাব্দের 22শে জুলাই মেণ্ডেল জন্মগ্রহণ করেন। 1840 খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্নাতক হন। 1843 খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মোরাভিয়ার ব্রুন সহরে অগাস্টিনিয়ার ধর্মীয় মঠে তিনি ধর্মযাজক রূপে যোগ দেন। ঐ সময় মেণ্ডেল প্রকৃতিবিজ্ঞানে আগ্রহী হন। 1846 খ্রীষ্টাব্দে তিনি কৃষিবিদ্যা, আপেল ও দ্রাক্ষা চাষে আগ্রহী হন। 1849 খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইম্পিরিয়াল রয়্যাল জিমনাসিয়মে শিক্ষকতা শুরু করেন। 1851 থেকে 1853 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মেণ্ডেল ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের পাঠ গ্রহণ করেন। পরের বৎসর তিনি ব্রুনের একটি বিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের শিক্ষক নিযুক্ত হন। সুদীর্ঘ 14 বৎসর তিনি ঐ পদ অলঙ্কৃত করে থাকেন। 1868 খ্রীষ্টাব্দে তিনি মঠাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। মঠাধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি মঠের ছোট্ট বাগানে প্রধানত মিষ্টি মটর গাছ (*Pisum sativum*) নিয়ে প্রজন (breeding) সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। ঐ পরীক্ষার ভিত্তিতে তিনি বংশগতি সম্বন্ধে কতকগুলি

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁর ঐ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল ব্রুনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি (Natural History Society) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেণ্ডেলের গবেষণার মূল্যবান তথ্যাদি বহু বৎসর যাবৎ অবহেলিত ও অবজ্ঞাত ছিল। এর ফলে মেণ্ডেলের জীবনে নেমে আসে দারুণ হতাশা। ক্রমশঃ তাঁর স্বাথ্যের অবনতি হতে থাকে। 1884 খ্রীষ্টাব্দের 6ই জানুয়ারী মেণ্ডেল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মেণ্ডেলের মৃত্যুর 16 বৎসর পরে, অর্থাৎ 1900 খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের দ্য ভ্রিস (de Vries), জার্মানীর **কোরেন্স** (Correns) এবং অস্ট্রিয়ার **সেরম্যাক** (Tschermak) একই সময়ে পৃথক পৃথকভাবে মেণ্ডেলের অজ্ঞাত গবেষণাপত্রগুলি পুনরাবিষ্কার করেন। চেকোশ্লাভাকিয়ার ব্রুন শহরে আজও মেণ্ডেলের সমাধি ও গির্জা বর্তমান। সেখানে মেণ্ডেলের গবেষণা সংক্রান্ত তথ্যাদি রক্ষায় একটি সংগ্রহশালা নির্মিত হয়েছে।

7.8(B). কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা [*Some useful terms*] :

(1) ● **প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য** (Dominant and recessive characters) : দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের মধ্যে পরনিষেক (cross fertilization) ঘটালে প্রথম অপত্য বংশে [first filial (F_1) generation] যে বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয় তাকে প্রকট বৈশিষ্ট্য ও যেটি আপাত লুপ্ত বলে মনে হয় তাকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলে।

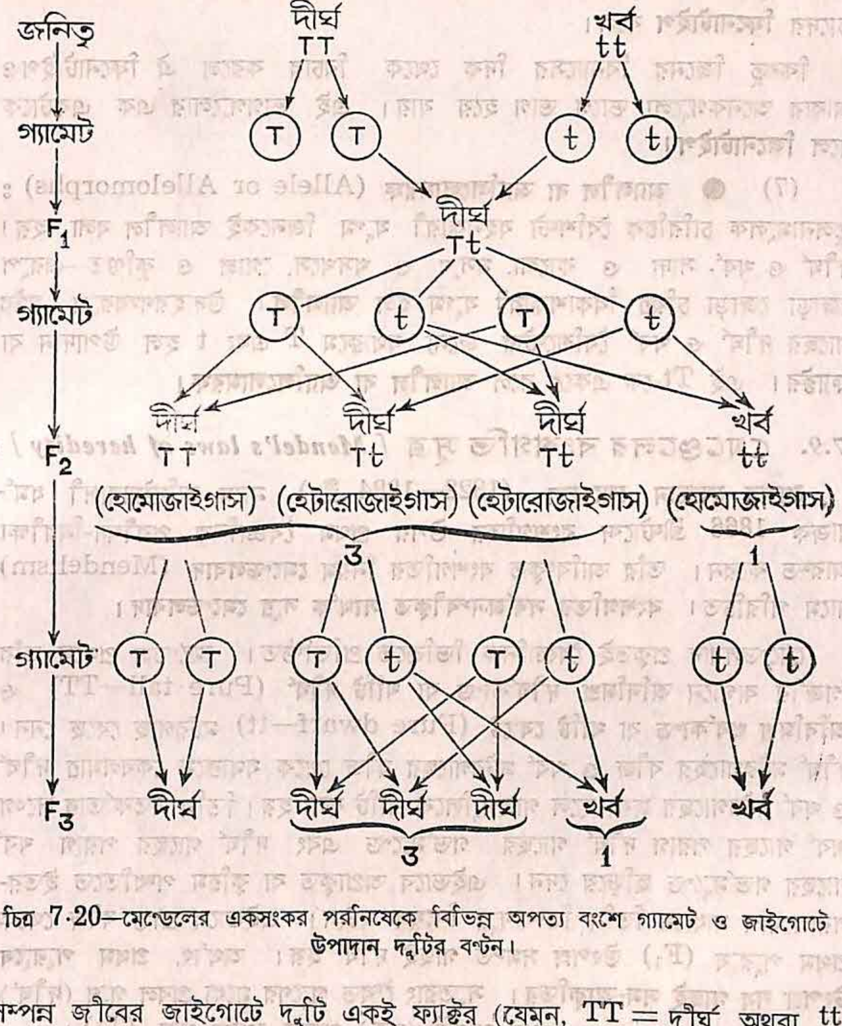
(2) ● **খাঁটি ও সংকর বৈশিষ্ট্য** (Pure and hybrid characters) : যদি কোন জীব বংশানুক্রমে তার বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখে তবে সেই বৈশিষ্ট্য-গুলিকে খাঁটি বৈশিষ্ট্য বলে। আর দুই খাঁটি বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের মিলনে প্রথম অপত্য বংশে উৎপন্ন জীবদেহে উভয় বৈশিষ্ট্য থাকলেও কেবল প্রবল বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পায় এবং প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি চাপা পড়ে, একেই বলে সংকর বৈশিষ্ট্য।

(3) ● **প্রথম ও দ্বিতীয় অপত্য বংশ** (First and Second filial* generation) : সংকরায়ণের ফলে উৎপন্ন প্রথম পুরুষের জীবকে প্রথম অপত্য বংশ (F_1) বলে। প্রথম অপত্য বংশ থেকে সৃষ্ট পরবর্তী জননের জীবকে দ্বিতীয় অপত্য বংশ (F_2) বলে।

(4) ● **একসংকর ও দ্বিসংকর পরনিষেক** (Monohybrid and Dihybrid cross) : একটি বিপরীতধর্মী, বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন (যেমন, খাঁটি দীর্ঘ বা খাঁটি বেঁটে অথবা খাঁটি হলুদ বীজ বা খাঁটি সবুজ বীজ সম্পন্ন উদ্ভিদ) দুটি জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে তাকে একসংকর পরনিষেক বলে। এদিকে দুটি করে বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন (যেমন, সাদা ও কালো রং ; মসৃণ ও অমসৃণ ত্বক) জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে তাকে দ্বিসংকর পরনিষেক বলে।

* ল্যাটিন—*Filium* = সন্তান।

(5) ● **হোমোজাইগাস ও হেটারোজাইগাস** (Homozygous and Heterozygous) ঃ সাধারণতঃ জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ এক একটি উপাদান বা ফ্যাক্টর (factor)-এর উপর নির্ভরশীল। নিষেকের ফলে উৎপন্ন জাইগোটে প্রতিটি উপাদান বা ফ্যাক্টর জোড়ায় জোড়ায় থাকে। খাঁটি বৈশিষ্ট্য-



চিত্র 7·20—মেন্ডেলের একসংকর পরানিষেকে বিভিন্ন অপত্য বংশে গ্যামেট ও জাইগোটে উপাদান দুটির বণ্টন।

সম্পন্ন জীবের জাইগোটে দুটি একই ফ্যাক্টর (যেমন, TT = দীর্ঘ অথবা tt = খর্ব) থাকে। খাঁটি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাইগোট হল **হোমোজাইগোট** (Homozygote) এবং হোমোজাইগোট থেকে উৎপন্ন জীব হল **হোমোজাইগাস**। কিন্তু যে জাইগোটের ফ্যাক্টর দুটি এক নয়, অর্থাৎ পৃথক (যেমন, Tt) তাকে বলে **হেটারোজাইগোট** (Heterozygote) এবং হেটারোজাইগোট থেকে উৎপন্ন জীবকে বলে **হেটারোজাইগাস**।

(6) ● **ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপ** (Phenotype and Genotype) ঃ সংকরের ক্ষেত্রে বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের জন্যে দুপ্রস্থ **জিন** (Gene) থাকে, একটি প্রবল ও অপরটি প্রচ্ছন্ন। প্রবল বৈশিষ্ট্য প্রকট হওয়ায় জীবগুলি দেখতে একই রকম হয়। তাই খাঁটি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের সংগে এর পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। এইভাবে কেবল বহিরাকৃতিগত সাদৃশ্যে থাকলে তাদের **ফিনোটাইপ** বলে।

কিন্তু জিনের বিন্যাসের দিক থেকে বিচার করলে ঐ ফিনোটাইপও আবার অনেকগুলো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই ভাগগুলোর এক একটাকে বলে **জিনোটাইপ।**

(7) ● **অ্যালীল বা অ্যালিলোমরফ** (Allele or Allelomorphs) ঃ তুলনামূলক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহনকারী যুগ্ম জিনকেই অ্যালীল বলা হয়। দীর্ঘ ও খর্ব, সাদা ও কালো, মসৃণ ও খসখসে, গোল ও কুঞ্চিত—এরূপ জোড়া জোড়া চরিত্র বিকাশকারী যুগ্ম হল **অ্যালীল**। উদাহরণস্বরূপ মটর গাছের দীর্ঘ ও খর্ব বৈশিষ্ট্যের জন্যে যথাক্রমে T এবং t হল উপাদান বা ফ্যাক্টর। এই Tt-কে একত্রে বলে **অ্যালীল বা অ্যালিলোমরফ।**

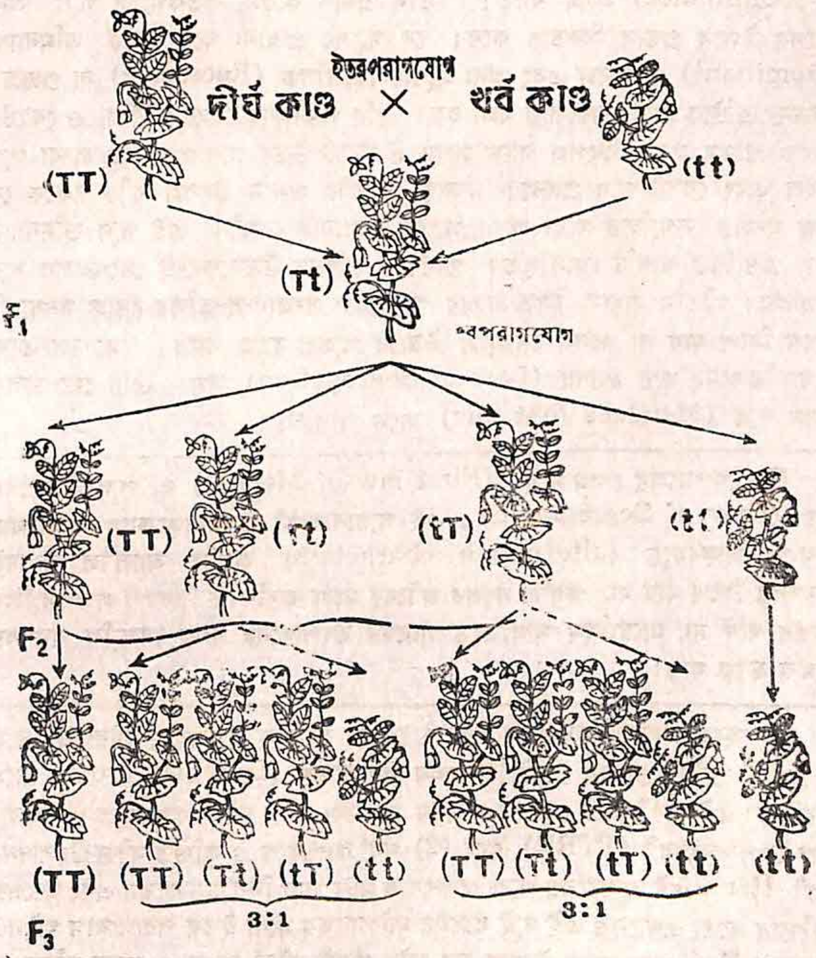
7.9. মেণ্ডেলের বংশগতি সূত্র [*Mendel's laws of heredity*] :

গ্রেগর যোহান মেণ্ডেল (1822—1884 খ্রীঃ) নামে অস্ট্রিয়াবাসী ধর্ম-যাজক 1866 খ্রীষ্টাব্দে বংশগতির উপর প্রথম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁর আবিষ্কৃত বংশগতির নিয়ম **মেণ্ডেলবাদ** (Mendelism) নামে পরিচিত। **বংশগতির সর্বজনস্বীকৃত সার্থক সূত্র মেণ্ডেলবাদ।**

মেণ্ডেলবাদ প্রকৃতই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। মেণ্ডেল প্রথমে তাঁর গির্জার বাগানে **অবিমিশ্র দীর্ঘকাণ্ড** বা **খাঁটি দীর্ঘ** (Pure tall—TT) ও **অবিমিশ্র খর্বকাণ্ড** বা **খাঁটি বেঁটে** (Pure dwarf—tt) মটরগাছ বেছে নেন। দীর্ঘ মটরগাছের বীজ ও খর্ব মটরগাছের বীজ থেকে যথাক্রমে কেবলমাত্র দীর্ঘ ও খর্ব মটরগাছের জন্ম হলে গাছগুলিকে খাঁটি বলা হয়। তিনি সতর্কতার সংগে খর্ব গাছের পরাগ দীর্ঘ গাছের গর্ভমুণ্ডে এবং দীর্ঘ গাছের পরাগ খর্ব গাছের গর্ভমুণ্ডে ছাড়িয়ে দেন। এইভাবে অপ্রাকৃত বা কৃত্রিম পদ্ধতিতে ইতর-পরাগযোগ মাধ্যমে তিনি ডিম্বাণুর **নিষেক** ঘটান। এইভাবে প্রাপ্ত বীজ থেকে প্রথম পুরুষ (F_1) উৎপন্ন সমস্ত গাছই দীর্ঘ হয়। অর্থাৎ, **প্রথম পুরুষে উৎপন্ন সব গাছই সম-আকৃতির**। সুতরাং দ্বৈত গুণের মধ্যে প্রবল গুণ (দীর্ঘ) প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু অপর গুণটি (খর্ব) প্রচ্ছন্ন থেকে যায় (Tt)।

এরপর প্রথম পুরুষের লম্বা গাছগুলি থেকে স্বপরাগযোগের ফলে উৎপন্ন বীজ সংগ্রহ ক'রে পরের বৎসর তিনি নতুন গাছ উৎপাদন করেন। এইভাবে **দ্বিতীয় পুরুষে** (F_2) **উৎপন্ন গাছের এক ভাগ খর্ব** (tt) **ও তিন ভাগ দীর্ঘ** (Tt) **হয়** (3 ঃ 1)। দ্বিতীয় পুরুষের এই গাছগুলি থেকে স্বপরাগ-

যোগের ফলে উৎপন্ন গাছ লক্ষ্য করে তিনি দেখেন, **খর্ব গাছের বীজ** (tt) **থেকে কেবলমাত্র খর্ব গাছের** (tt) **জন্ম হয়।** এগুলি বংশপরম্পরায় কেবল খর্ব গাছের জন্ম দিতে থাকে। সুতরাং এই গাছগুলি **অবিমিশ্র খর্ব** বা **খাঁটি খর্ব**। বাকি তিনভাগ দীর্ঘ গাছের একভাগ থেকে বংশানুক্রমে কেবল



চিত্র 7·21—মেন্ডেলের একসংকর পরনিষেকের পরীক্ষা।

দীর্ঘ গাছই (TT) **উৎপন্ন হতে থাকে।** সুতরাং এই গাছগুলিও **অবিমিশ্র দীর্ঘ** বা **খাঁটি লম্বা**। কিন্তু বাকি দুভাগ **দীর্ঘ গাছ** থেকে পরের জননে **তিন ভাগ দীর্ঘ** (Tt বা tT) **এবং এক ভাগ খর্ব** (tt) **গাছ জন্মাতে থাকে।** সেইজন্য এই দুভাগকে বলা হয় **সংকর** (Hybrid) গাছ।

অংশকে যথাক্রমে **বীজপত্রাধিকান্ড** (Epicotyl) ও **বীজপত্রাবকান্ড** (Hypocotyl) বলে।

(iii) **পরিভ্রূণ বা পেরিস্পার্ম** (Perisperm) ঃ সস্যের বাইরে অবস্থিত পাতলা স্বচ্ছ আবরণকে পরিভ্রূণ বলে।

নীচের ছকে রেড়ি বীজের গঠন দেখান হল ঃ

রেড়ি বীজ
- অন্তর্বীজ
  - ভ্রূণ
    - ভ্রূণাক্ষ
      - বীজপত্রাবকান্ড
        - ভ্রূণমূল
      - বীজপত্রাধিকান্ড
        - ভ্রূণমুকুল
    - বীজপত্র (দুটি)
  - সস্য
  - পরিভ্রূণ
- বীজত্বক-বীজবহিস্ত্বক

15.4. ভুট্টা বীজের গঠন *[Structure of a Maize grain (seed)]* :

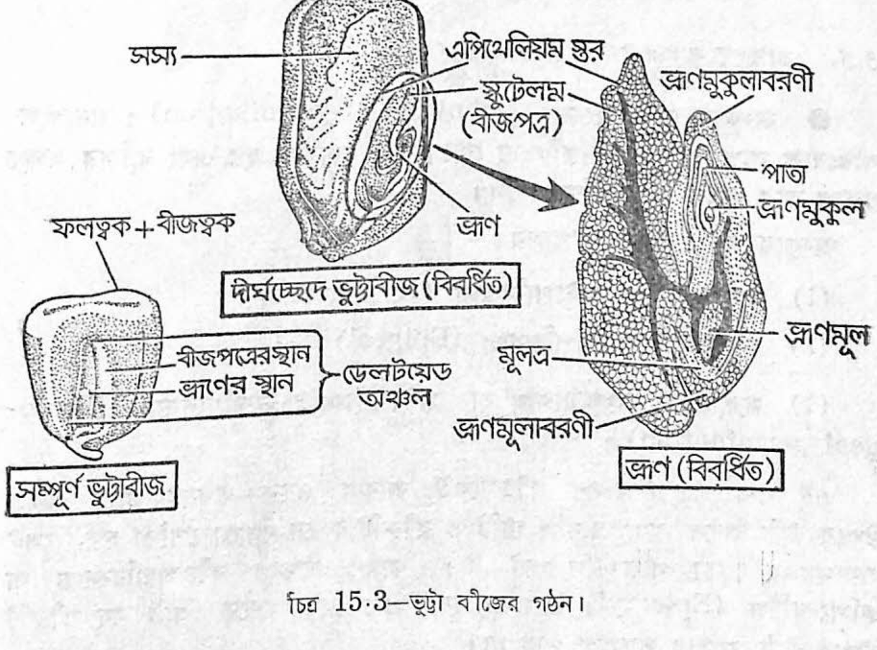
ভুট্টা বীজ মোটামুটি আয়তাকার ও চ্যাপ্টা এবং এই বীজের একটি প্রান্ত সূচালো। বীজের একদিকে লম্বালম্বি বিস্তৃত উঁচু অংশটি **ডেলটয়েড অঞ্চল** (Deltoid ridge)। বীজ বলে পরিচিত হলেও **প্রকৃতপক্ষে এটি একটি এক-বীজী ফল** (One seeded fruit)। এটি **ক্যারিঅপসিস** (Caryopsis) জাতীয় **নিরস** (Dry) ফল।

(a) **ভুট্টাদানার ত্বক** (Grain coat) ঃ ভুট্টার বীজত্বক ও ফলত্বক অবিচ্ছেদ্য-ভাবে মিলে সোনালী ত্বক গঠন করে। এই ত্বককে অন্তর্বীজ থেকে পৃথক করা যায় না।

(b) **অন্তর্বীজ** (Kernel) ঃ ভ্রূণ ও সস্য দ্বারা অন্তর্বীজ গঠিত। ডেলটয়েড অঞ্চল-বরাবর বীজটিকে দুভাগে ভাগ করলে একপাশে ভ্রূণটি দেখা যায়।

(i) **ভ্রূণ** (Embryo) ঃ ভ্রূণাক্ষ ও বীজপত্র নিয়ে ভ্রূণ গঠিত। সস্যের নীচের দিকে এবং এক কোণে ঢালের আকৃতিবিশিষ্ট ভ্রূণ বর্তমান। বীজপত্রের একপাশে ভ্রূণাক্ষ অবস্থিত। ভ্রূণাক্ষের ঊর্ধ্বাংশ **ভ্রূণমুকুল** (Plumule) এবং নিম্নাংশ **ভ্রূণমূল** (Radicle)। ভ্রূণমুকুল ও ভ্রূণমূলের উপরের আচ্ছাদন দুটিকে যথাক্রমে **ভ্রূণমুকুলাবরণী** বা **কলিওপ্টাইল** (Coleoptile) এবং **ভ্রূণমূলাবরণী** বা **কলিওরাইজা** (Coleorhiza) বলে।

(ii) **বীজপত্র** (Cotyledon) ঃ ভুট্টার বীজপত্রের সংখ্যা এক। বিশেষ এই বীজপত্রকে **স্কুটেলম** (Scutellum) বলে। বর্ম-আকৃতির স্কুটেলম সস্যের এপিথেলিয়মের সঙ্গে যুক্ত থাকে।



চিত্র 15·3—ভুট্টা বীজের গঠন।

(iii) **সস্য** (Endosperm) ঃ ভুট্টার অন্তর্বীজের অধিকাংশ স্থানই দখল করে রাখে সস্য। ভ্রূণের সঙ্গে যুক্ত সস্য অংশ অবতল। এই অংশে অবস্থিত পাতলা স্তরটিকে **এপিথেলিয়ম স্তর** (Epithelium) বলে। এই স্তরটি সস্যকে ভ্রূণ থেকে পৃথক রাখে।

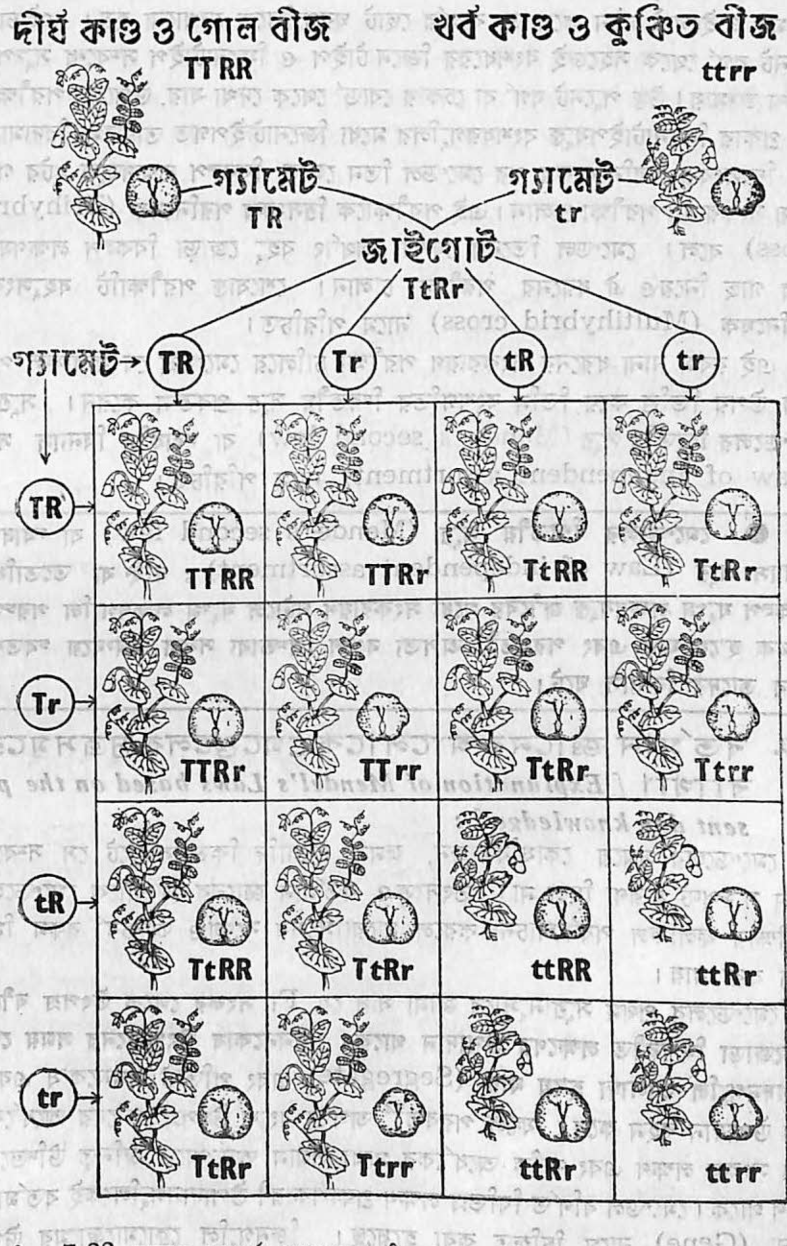
মেণ্ডেল প্রতিবার একজোড়া বিকল্প লক্ষণযুক্ত মটরগাছ নিয়ে অনেকবার উপরে বর্ণিত পরীক্ষাটি করেন। এই রূপ সংকরায়ণ পরীক্ষাকে **একসংকর পরনিষেক** বা **একলক্ষণ সঙ্করায়ণ** (Monohybrid cross) বলা হয়।

উপরের পরীক্ষা থেকে আবিষ্কৃত তথ্য মেণ্ডেলের **প্রাধান্যের সূত্র** (Law of Dominance) নামে খ্যাত। তিনি প্রমাণ করেন, কতকগুলি গুণ অন্য গুণের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। যে গুণের প্রাধান্য ঘটে, সেটি **ডমিন্যান্ট** (Dominant) বা প্রবল এবং অন্য গুণটি **রিসেসিভ** (Recessive) বা প্রচ্ছন্ন। সেজন্য এটিকে প্রাধান্যের সূত্র বলা হয়। তাঁর পরীক্ষার ক্ষেত্রেও লম্বা ও বেঁটের মিলনে প্রথম জননে উৎপন্ন গাছে লম্বা ও বেঁটে উভয় গুণ থাকলেও লম্বা গুণ প্রবল এবং বেঁটে গুণ প্রচ্ছন্ন। কিন্তু দ্বিতীয় জননে উৎপন্ন বীজ থেকে যে গাছ জন্মায় সেগুলির মধ্যে লম্বা গুণের প্রাধান্যই বেশী। এই গুণ ডমিন্যান্ট এবং প্রভাবিত গুণটি রিসেসিভ। প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়ক্ষেত্রেই মেণ্ডেলের সূত্র কার্যকর। তিনি বলেন, পিতামাতার গুণগুলি **সন্তান-সন্ততির দেহে সম্পূর্ণভাবে মিশে যায় না বলেই সেগুলি ঐভাবে পৃথক হতে পারে।** মেণ্ডেল একে **পৃথকীভবনের সূত্র** আখ্যা (Law of Segregation) দেন। এটি **মেণ্ডেলের প্রথম সূত্র** (Mendel's first law) নামে পরিচিত।

● **মেণ্ডেলের প্রথম সূত্র** (First law of Mendel) বা **পৃথকীভবনের সূত্র** (Law of Segregation) : **এই সূত্রানুযায়ী জননমাতৃকোষে অবস্থিত বিকল্প লক্ষণযুক্ত** (alternative characters) **অর্থাৎ অ্যালীল কখনই পরস্পর মিশে যায় না, অর্থাৎ সংকর জীবের মধ্যে অবস্থিত বিকল্প লক্ষণগুলির মিশ্রণ ঘটে না, মায়োসিস পদ্ধতিতে গ্যামেট উৎপাদনের সময় সেগুলি পরস্পর পৃথক হয়ে যায়।**

যাই হোক পরবর্তীকালে মেণ্ডেল দুজোড়া বিকল্প লক্ষণযুক্ত মটরগাছ নিয়ে যে প্রজন পরীক্ষা চালান সেটি **দ্বিসংকর পরনিষেক** (Dihybrid cross) নামে পরিচিত। এই পরীক্ষাটি চালানোর সময় মেণ্ডেল (1) দীর্ঘ কাণ্ডযুক্ত ও গোল-বীজ উৎপাদনকারী (TTRR) এবং (2) খর্ব কাণ্ডযুক্ত ও কুঞ্চিত বীজ উৎপাদনকারী (ttrr)—এই দু'ধরনের শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত মটর গাছ নির্বাচন করেন এবং আগের পরীক্ষার মতো এখানেও এই দুই ধরনের মটরগাছের মধ্যে ইতর পরাগযোগ ঘটান। এর ফলে F_1 অপত্য বংশে উৎপন্ন সব মটর গাছই দীর্ঘ কাণ্ড ও গোল বীজযুক্ত হয়। এরপর তিনি F_1 বংশের মটর গাছগুলির মধ্যে স্বপরাগযোগ ঘটান। এর ফলে F_2 অপত্য বংশে তিনি মোট চার রকম উদ্ভিদ দেখতে পান। যেমন—(1) **দীর্ঘকাণ্ড ও গোল বীজযুক্ত**, (2) **দীর্ঘকাণ্ড ও কুঞ্চিত বীজযুক্ত**, (3) **খর্বকাণ্ড ও গোল বীজযুক্ত** এবং (4) **খর্বকাণ্ড ও কুঞ্চিত বীজযুক্ত**। এই চার প্রকার ফিনোটাইপযুক্ত উদ্ভিদের অনুপাত দাঁড়ায় যথাক্রমে 9 : 3 : 3 : 1। চিত্রে ঐ চার প্রকার ফিনোটাইপযুক্ত বংশধরগুলির প্রকৃত জিনোটাইপ—চেকার বোর্ড

(checker board) বা পানেট বর্গ (Punnett square) মাধ্যমে দেখানো হল।



চিত্র 7·22—চেকার বোর্ডে মেণ্ডেলের দ্বিসংকর পরানিষেকের পরীক্ষার ফলাফল।

একই পদ্ধতিতে প্রতিটি প্রাথমিক উসাইট থেকে একটি করে হ্যাপ্লয়েড (n) ডিম্বাণু গঠিত হয়। পোলার বডিগুলি নিষ্ক্রিয় হওয়ায় সেগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হ'য়ে যায়।

● **জনন প্রক্রিয়া ও রূপান্তর** (Reproduction and metamorphosis) ঃ কুনো ব্যাঙের জনন প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত পর্যায়গুলির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যথা—

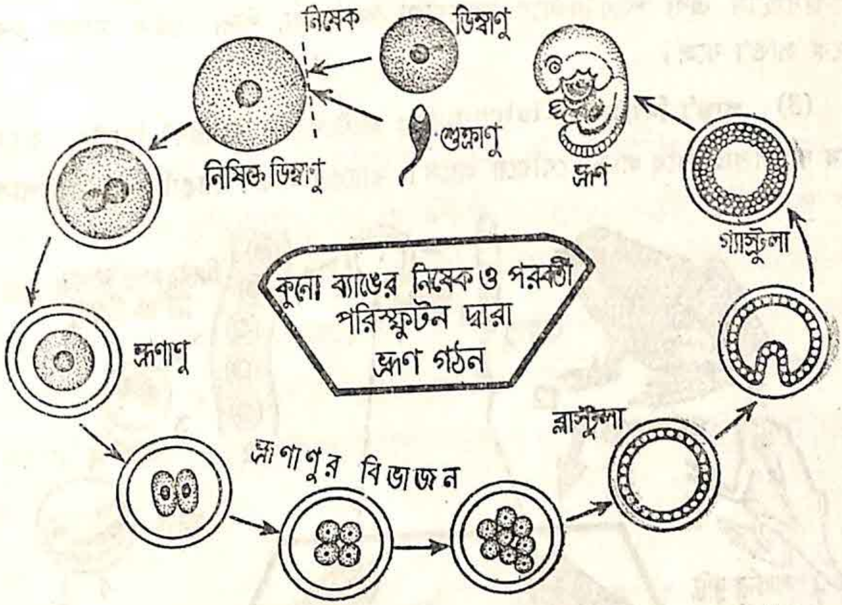
(1) **প্রজনন** (Breeding) ঃ বর্ষাকাল ব্যাঙের প্রজনন ঋতু। ঐ সময় পুরুষ ব্যাঙের ডাকে আকৃষ্ট হ'য়ে স্ত্রী ব্যাঙ পুরুষ ব্যাঙের কাছে আসে। পুরুষ ব্যাঙ তার **থাম্ব প্যাড** (Thumb pad) দিয়ে স্ত্রী ব্যাঙকে চেপে ধরে। ঐ সময় স্ত্রী ব্যাঙ অজস্র ডিম পাড়ে। ডিমগুলি কালো ফিতায় আবদ্ধ হয়। পুরুষ ব্যাঙটি সেই ডিমের উপরে শুক্রাণু পরিত্যাগ করে। প্রতিটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য একটি করে শুক্রাণুর প্রয়োজন হয়। তবে প্রতি ডিম্বাণু পিছু



চিত্র 17·17—নিষেক প্রক্রিয়া।

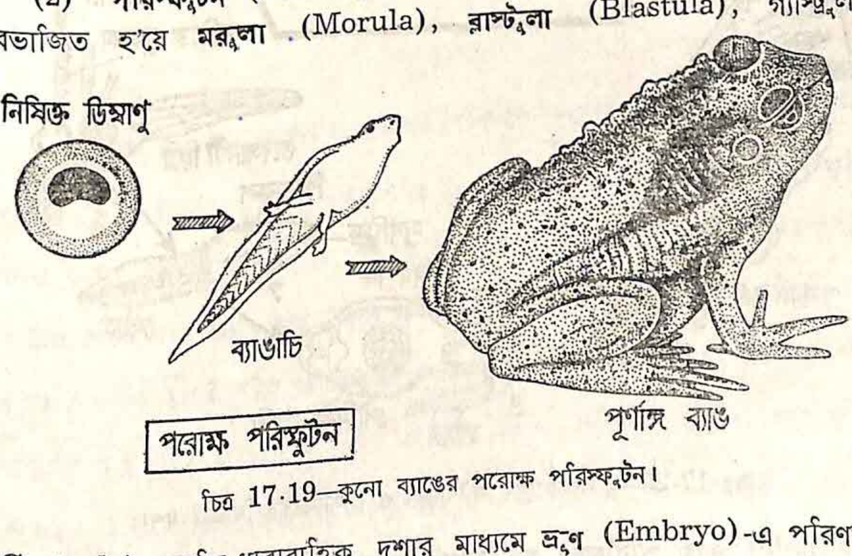
অসংখ্য শুক্রাণুর সমাবেশ ঘটে। একটি শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ ঘটা মাত্র ডিম্বাণুতে এমন এক রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে যার ফলে দ্বিতীয় শুক্রাণু প্রবেশের পথ বন্ধ হয়। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনকেই **নিষেক** বলে। নিষেকের ফলে ডিপ্লয়েড (2n) জাইগোট (Zygote) বা ভ্রূণাণু গঠিত হয়। কুনো ব্যাঙের দেহের বাইরে এই নিষেক ঘটে বলে প্রক্রিয়াটিকে **বহিঃনিষেক** (External

fetilization) বলা হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণুগুলি একটি মিউকাস পর্দায় আবৃত হ'য়ে সারিবদ্ধভাবে ফিতার মতো ভেসে বেড়ায়।



চিত্র 17·18—কুনো ব্যাঙের নিষেক ও পরবর্তী পরিস্ফুটন দ্বারা ভ্রূণ গঠন।

(2) **পরিস্ফুটন** (Development) ঃ এই পদ্ধতিতে জাইগোট ক্রমাগত বিভাজিত হ'য়ে **মরুলা** (Morula), **ব্লাস্টুলা** (Blastula), **গ্যাস্ট্রুলা**



চিত্র 17·19—কুনো ব্যাঙের পরোক্ষ পরিস্ফুটন।

(Gastrula) প্রভৃতি ধারাবাহিক দশার মাধ্যমে ভ্রূণ (Embryo)-এ পরিণত হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণ সৃষ্টি হ'তে প্রায় দু' সপ্তাহ সময় লাগে।

চেকার বোর্ডের উপরের দিকে পাশাপাশি এবং বাঁপাশে লম্বালম্বি F_1 অপত্য বংশে উৎপন্ন পুং ও স্ত্রী গ্যামেটগুলির জিনোটাইপ লেখা হয় এবং F_2 অপত্য বংশে গ্যামেটগুলি যথেচ্ছভাবে (at random) মিলিত হ'য়ে সম্ভাব্য যত রকমের জাইগোট গঠন করে তা বর্গের ছোট ঘরগুলিতে দেখানো হয়। এইভাবে পুনেট বর্গ থেকে সহজেই বংশধরের জিনোটাইপ ও ফিনোটাইপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়। উক্ত পুনেট বর্গ বা চেকার বোর্ড থেকে দেখা যায়, উপরের পরীক্ষায় চার প্রকার ফিনোটাইপযুক্ত বংশধরগুলির মধ্যে জিনোটাইপগত তারতম্য বিদ্যমান।

দ্বিসংকর পরনিষেকের পর মেণ্ডেল তিন জোড়া বিকল্প লক্ষণযুক্ত মটর গাছ নিয়ে সংকরায়ণ পরীক্ষা চালান। এই পরীক্ষাকে **ত্রিসংকর পরনিষেক** (Trihybrid cross) বলে। মেণ্ডেল তিনের বেশী, অর্থাৎ বহু জোড়া বিকল্প লক্ষণযুক্ত মটর গাছ নিয়েও ঐ ধরনের পরীক্ষা চালান। শেষোক্ত পরীক্ষাটি **বহুসংকর পরনিষেক** (Multihybrid cross) নামে পরিচিত।

এই রকম নানা ধরনের সংকরায়ণ পরীক্ষা চালিয়ে মেণ্ডেল যে ফলাফল পান তার উপর ভিত্তি করে তিনি বংশগতির দ্বিতীয় সূত্র প্রবর্তন করেন। সূত্রটি **মেণ্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র** (Mende 's second law) বা **স্বাধীন বিন্যাস সূত্র** (Law of independent assortment) নামে পরিচিত।

● **মেণ্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র** (Mendel's second law) বা **স্বাধীন বিন্যাস সূত্র** (Law of independent assortment) : **দুই বা ততোধিক বিকল্প যুগ্ম লক্ষণযুক্ত জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে যুগ্ম লক্ষণগুলি পরস্পর পৃথক হ'য়ে যায় এবং পরবর্তী অপত্য বংশে সম্ভাব্য সকল সমন্বয়ে স্বতন্ত্র-ভাবে তাদের বিন্যাস ঘটে।**

7.10. বর্তমান জ্ঞানের আলোকে মেণ্ডেলের সূত্রসমূহের ব্যাখ্যা [*Explanation of Mendel's Laws based on the present day knowledge*] :

মেণ্ডেলের সময়ে কোষবিভাজন, জনন ইত্যাদি কিভাবে ঘটে সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তৎসত্ত্বেও, বর্তমান জ্ঞানের আলোকে মেণ্ডেলের পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করলে মায়োসিসের সঙ্গেও আশ্চর্য রকম মিল লক্ষ্য করা যায়।

মেণ্ডেলের প্রথম সূত্রানুসারে জানা যায় যে, F_1 **সংকর থেকে উৎপন্ন বীজে একজোড়া বিপরীত লক্ষণের উপাদান থাকে। জননকোষ উৎপাদনের সময় সেই উপাদানগুলি আলাদা হ'য়ে যায়** (Segregate) এবং প্রতিটি জননকোষ একটি করে উপাদান বহন করে। ফলে পরবর্তী অপত্য বংশে উৎপন্ন জীবের অর্ধেকের মধ্যে সংকর লক্ষণ এবং বাকি অর্ধেকের মধ্যে সমান অনুপাতে জনিতৃ উদ্ভিদের লক্ষণ থাকে। মেণ্ডেল বর্ণিত বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশকারী উপাদানগুলিকেই বর্তমানে 'জিন' (Gene) নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। জিনগুলি ক্রোমোজোমের উপর

সারিবন্ধভাবে সজ্জিত থাকে। সাধারণত একটি লক্ষণের জন্য দায়ী থাকে একটি জিন, যেমন দীর্ঘ লক্ষণের জন্য T এবং খর্ব লক্ষণের জন্য t-জিন। এইভাবে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত জীবের এক একটি লক্ষণের জন্য দায়ী থাকে এক একটি জিন। ক্রোমোজোমগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে। কাজেই, একজোড়া বিকল্প লক্ষণের জন্য দায়ী জিন দুটিও জোড় বেঁধে থাকে। মায়োসিসের মাধ্যমে গ্যামেট সৃষ্টির সময় ক্রোমোজোম দু'টি আলাদা হ'য়ে যায়। ফলে গ্যামেটে জিন দুটিও আলাদা হ'য়ে যায় (হয় T অথবা t)। এইভাবে গ্যামেটে প্রতিটি লক্ষণের জন্য পৃথক পৃথক জিন দায়ী থাকে।

মেণ্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র প্রসঙ্গে দ্বিসংকর পরনিষেক পরীক্ষা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সংকরের মধ্যে দীর্ঘ বনাম খর্ব এবং গোল বনাম কুঞ্চিত —এই দুই বিকল্প লক্ষণের জিন নিয়ে দু'জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোম রয়েছে। মায়োসিসের প্রথম অ্যানাফেজে যখন সমসংস্থ ক্রোমোজোম দু'টি পৃথক হ'য়ে যায় তখন লম্বা ও গোল বীজ লক্ষণ এবং খর্ব ও কুঞ্চিত বীজ লক্ষণ যথাক্রমে দু'টি মেরুতে আলাদা হ'য়ে যেতে পারে ; কিংবা লম্বা ও কুঞ্চিত বীজ লক্ষণ এবং খর্ব ও গোল বীজ লক্ষণ দু'টি যে কোন মেরুতে পৃথক হ'য়ে যেতে পারে। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা না থাকায় অ্যানাফেজে যে কোন দু'-ভাবে ক্রোমোজোম চারটি বিন্যস্ত হয়। ফলে যথেচ্ছ বণ্টনের জন্য চার রকমের গ্যামেট উৎপন্ন হয়।

অধুনা বিশেষ বিশেষ সংকরায়ণ পরীক্ষার ক্ষেত্রে মেণ্ডেলের সূত্রানুযায়ী ফলাফল পাওয়া না গেলেও মোটামুটি যৌন জননক্ষম সব জীবের ক্ষেত্রে মেণ্ডেলের সূত্রগুলি সুপ্রযোজ্য। বস্তুত মেণ্ডেলের সূত্রগুলির উপর ভিত্তি করেই **সুপ্রজনবিদ্যা** (Genetics)-র সূত্রপাত। এই কারণেই মেণ্ডেলকে সুপ্রজনবিদ্যার জনক হিসাবে সম্মানিত করা হয়।

7.11. মেণ্ডেলের সূত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ [*Practical application of Mendel's Law*] :

মেণ্ডেলের সূত্রানুসারে ইচ্ছামতো গুণের প্রাধান্য আরোপ ক'রে উন্নত প্রাণী ও উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। গম, জোয়ার, ভুট্টা, ইক্ষু প্রভৃতি চাষে এই পদ্ধতি প্রয়োগ অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিভিন্ন ভুট্টা গাছে **শ্রেণীগত ও গুণগত** পার্থক্য থাকে। কতকগুলি গাছের ফলন বেশী হওয়া সত্ত্বেও, মূল অত্যন্ত শিথিল এবং রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত কম। অন্য জাতের ভুট্টা গাছের ফলন কম কিন্তু মূল বেশ দৃঢ় এবং গাছটি রোগ প্রতিরোধে সক্ষম। এই দুই জাতের মিলনে উৎপন্ন সংকর-জাতীয় ভুট্টা গাছে প্রচুর ফলন হয়। পরন্তু এই গাছগুলির মূল খুব দৃঢ় এবং রোগ প্রতিরোধক্ষম।

এই পদ্ধতি অনুসারে অন্যান্য উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও বিপ্লব আনা সম্ভব হয়েছে। প্রাণিজগতেও এই দৃষ্টান্ত বিরল না। গরু-মহিষ, হাঁস-মুরগী প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে মেণ্ডেলের নিয়ম প্রয়োগ ক'রে উন্নত সংকর জাতের পশু-পাখী উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। মেণ্ডেলের পরবর্তী যুগে বংশগতি বিজ্ঞানের সাফল্য বিস্ময়কর। 1968 খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এবং জন্মসূত্রে ভারতীয় **হরগোবিন্দ খোরানা** (Har Gobind Khorana) DNA-অণু গঠন সংক্রান্ত **জেনেটিক কোড** (Genetic code) আবিষ্কার করেন। তাঁর গবেষণার আলোক-সূত্র অনুকরণ ক'রে তাঁরই জাপানী ছাত্রী **ওতসুকা** (Otsuka) 1970 খ্রীষ্টাব্দে কৃত্রিম জিন-খণ্ড গঠনে সাফল্য অর্জন করেন। ঐ জিন-খণ্ড জীবকোষে স্বাভাবিকভাবেই কাজ চালাতে পারে। খোরানার আর এক ছাত্র **কে. এল. আগরওয়াল** (K. L. Agarwal) একইভাবে কৃত্রিম জিন উদ্ভাবনে সাফল্য লাভ করেন। এই-সব আবিষ্কার থেকে এ-কথাটাই স্পষ্ট হয়েছে যে, বংশগতি বিজ্ঞানে এসেছে অভাবনীয় সাফল্য। সেদিন খুব দূরে নয়—যেদিন রোগোৎপাদক জিনের পরিবর্তে নতুন সুস্থ জিন সন্নিবেশিত ক'রে জীবের বংশগতির ধারাকে ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত করা যাবে।



চিত্র 7·23—হরগোবিন্দ খোরানা।

7.12. মানবকল্যাণে সুপ্রজনবিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ
[Practical application of genetics for human welfare] :

বংশগতির ধারার বা উত্তরাধিকার সূত্রের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাকে বংশগতিবিজ্ঞান বা সুপ্রজনবিদ্যা (Genetics) বলে। বংশগতিবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে সুনিপুণভাবে মানবকল্যাণে ব্যবহার করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংকরায়ণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

● **উদ্ভিদ সংকরায়ণ** (Plant breeding) : উন্নত ধরনের উদ্ভিদ সৃষ্টি করাই সংকরায়ণের প্রধান উদ্দেশ্য। এর দ্বারা একদিকে যেমন রোগ-প্রতিরোধক্ষম উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়, অন্যদিকে তেমনি ফলনও বাড়ান সম্ভব। সেজন্য বংশগতির সূত্রগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হয়। এই কাজে দক্ষ বিজ্ঞানী ও কর্মীরা সহজেই বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল নয় এমন আবহাওয়াতেও অধিক উৎপাদনশীল উদ্ভিদ সৃষ্টি করে উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। এইভাবে উৎকৃষ্ট ধরনের **ধান, গম, ভুট্টা, মটর,** প্রভৃতি গাছ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এইসব উদ্ভিদ রোগ-প্রতিরোধক্ষম তো বটেই, এদের ফলনও প্রচুর।

উন্নত মানের এইসব উদ্ভিদ সৃষ্টির জন্য সংকরায়ণে দক্ষ কর্মীরা পছন্দ-মত বৈশিষ্ট্য আছে এমন সব উদ্ভিদ বেছে নিয়ে কেবল সেগুলির মধ্যেই

সংকরায়ণ ঘটান। বিভিন্ন উদ্ভিদে এই জ্ঞান প্রয়োগ করে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব আনা সম্ভবপর হয়েছে।

● **প্রাণীর সংকরায়ণ : মুরগী, গরু, ভেড়া, শূকর, ছাগল** প্রভৃতি নানা রকমের গৃহপালিত পশুপাখী মানুষের প্রাণিজ খাদ্যের প্রধান উৎস। যে সব মুরগীকে কেবল মাংসের জন্য পালন করা হয় সেগুলির আকার যেমন বড় হওয়া চাই, তেমনি তাদের বৃদ্ধিও দ্রুততর হওয়া দরকার। তাছাড়া, শরীর যাতে নীরোগ থাকে সেদিকেও যথেষ্ট সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সেজন্য নানা জাতের মুরগীর মধ্যে সংকরায়ণ ঘটিয়ে বর্তমানে লেগহর্ণ (Leg Horn), রোড আইল্যাণ্ড (Rhode Island) ইত্যাদি যে সব সংকর জাতের মুরগী সৃষ্টি করা হয়েছে তারা অধিক ডিম উৎপাদন করে, তাদের দেহে মাংসের পরিমাণও বেশী এবং রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদিও বেশী। গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি পশু মাংস ছাড়াও দুধ দেয়। তাই এই সব পশুকে সুস্থ, সবল রেখে প্রতিপালন করতে হয়। সেজন্য নির্দিষ্ট এবং বাছাই করা প্রাণীদের মধ্যেই সংকরায়ণ ঘটান হয়। এতে দুধের পরিমাণ ও মাংস উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। **সাহিওয়াল** (Sahiwal) ও **জার্সি** (Jersey) গরুর মধ্যে যৌন মিলন ঘটিয়ে যে নতুন জাতের সংকর গরু সৃষ্টি হয়েছে তাদের দুধ উৎপাদনের ক্ষমতা অনেক বেশী। উল্লেখ করার বিষয় এই যে, সংকরায়ণ পদ্ধতি প্রয়োগে পশুর মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

7.13. লিঙ্গ ক্রোমোজোম ও লিঙ্গ নির্ধারণ [*Sex chromosome and Sex determination*] :

জীবকোষে ক্রোমোজোম দু'প্রকার :

(i) **অযৌন ক্রোমোজোম** বা **অটোজোম** (Autosome) : যে সব ক্রোমোজোম দৈহিক বৈশিষ্ট্যই নির্ধারণ করে কিন্তু লিঙ্গ নির্ধারণে অংশগ্রহণ করে না তাদের **অযৌন ক্রোমোজোম** বা **অটোজোম** বলে।

(ii) **লিঙ্গ ক্রোমোজোম** বা **সেক্স ক্রোমোজোম** (Sex chromosome) : যেসব ক্রোমোজোম জীবের কেবল লিঙ্গ নির্ধারণে সক্ষম তাদের **লিঙ্গ ক্রোমোজোম বলে।**

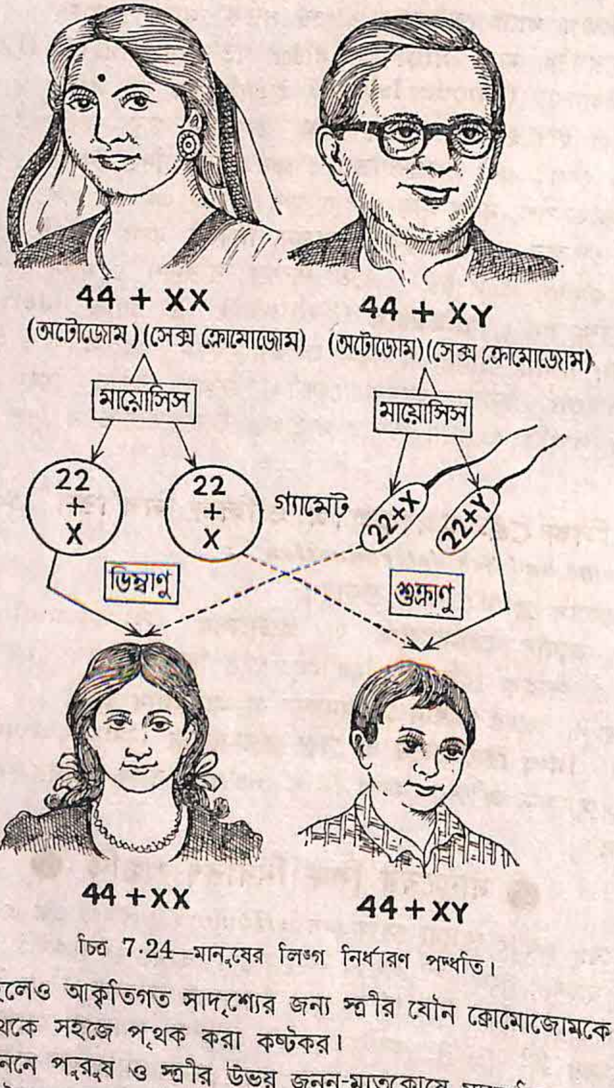
● মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি ●

মানুষের অর্থাৎ হোমো সেপিএন্স (*Homo sapiens*)-এর একটি কোষের মোট ক্রোমোজোম সংখ্যা 46 অর্থাৎ 23 জোড়া। এদের মধ্যে 44টি (22 জোড়া) অটোজোম এবং বাকি 2টি (1 জোড়া) লিঙ্গ ক্রোমোজোম (চিত্র 7.24)।

মানুষের 22 জোড়া অটোজোমের প্রত্যেক জোড়ায় ক্রোমোজোম দু'টি দেখতে একই রকম। কিন্তু পুরুষের যৌন ক্রোমোজোম-এ এর ব্যতিক্রম উল্লেখ করার মতো। কারণ লিঙ্গ ক্রোমোজোম দু'টির একটি আকারে বড়, অন্যটি

আকারে অনেক ছোট। **বড়টি X-ক্রোমোজোম** এবং **ছোটটি Y-ক্রোমোজোম** নামে পরিচিত। তবে স্ত্রীর সেক্স ক্রোমোজোম দুটি একই রকম এবং দুটি ক্রোমোজোমই পুরুষের X-ক্রোমোজোমের মতো দেখতে।

মানুষসহ সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে এটি অবধারিত সত্য। যাইহোক আকৃতিগত বৈসাদৃশ্যের জন্য পুরুষের লিঙ্গ ক্রোমোজোমগুলিকে সনাক্ত



চিত্র 7·24—মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি।

করা সহজ হলেও আকৃতিগত সাদৃশ্যের জন্য স্ত্রীর যৌন ক্রোমোজোমকে অন্যান্য অটোজোম থেকে সহজে পৃথক করা কষ্টকর।

যৌন জননে পুরুষ ও স্ত্রীর উভয় জনন-মাতৃকোষে মায়োসিস বা হ্রাসকরণ বিভাজন ঘটে। পুরুষের লিঙ্গ ক্রোমোজোম দু'রকমের (XY) হওয়ার ফলে

পুরুষের ক্ষেত্রে দু'রকমের শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। এক ধরনের শুক্রাণু X-**ক্রোমোজোম** ও অন্য ধরনের শুক্রাণু **Y-ক্রোমোজোম** বহন করে। স্ত্রীর লিঙ্গ ক্রোমোজোম একই রকম (XX) হওয়ায় সমস্ত ডিম্বাণুই **X-ক্রোমোজোম** বহন করে। সুতরাং লিঙ্গ নির্ধারণে স্ত্রীর কোন ভূমিকা নেই। কারণ তার লিঙ্গ ক্রোমোজোমের চরিত্র একই রকম অর্থাৎ X-প্রকৃতির। অপরদিকে **লিঙ্গ নির্ধারণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা** পুরুষের। কারণ সেখানে দু'ধরনের যৌন ক্রোমোজোম (X ও Y) বিদ্যমান।

লিঙ্গ নির্ধারণ বিষয়টিকে একটু বিস্তারিত আলোচনা করলে দেখা যাবে, লিঙ্গ তখনই নির্ধারিত হ'য়ে যায় যে মুহূর্তে স্ত্রীর ডিম্বাণু পুরুষের শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সব ডিম্বাণুর প্রকৃতি X হলেও সব শুক্রাণুর প্রকৃতি এক নয়। শুক্রাণুর অর্ধেক X এবং বাকি অর্ধেক Y। যে মুহূর্তে Y-ক্রোমোজোম বহনকারী শুক্রাণু ডিম্বাণু (X)-কে নিষিক্ত করে, সন্তানদের লিঙ্গ হয় XY—অর্থাৎ সন্তান পুরুষ। আর X ক্রোমোজোম বহনকারী শুক্রাণু ডিম্বাণু (X)-কে নিষিক্ত করলে সন্তানের লিঙ্গ হয় XX—অর্থাৎ সন্তান স্ত্রী।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হ'ল যে, লিঙ্গ নির্ধারণে Y-ক্রোমোজোমের ভূমিকার গুরুত্ব সর্বাধিক, লিঙ্গ ক্রোমোজোমে Y না থাকলে সন্তান স্ত্রী এবং Y থাকলে সন্তান পুরুষ।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও জীবনধারা 8
[General features and mode of living]

8.1. সরিষা [*Mustard*] :

(i) **বিজ্ঞানসম্মত নাম—ব্রাসিকা নাইগ্রা** (*Brassica nigra*) ঃ সরিষা বিরুৎ-জাতীয় **একবর্ষজীবী** (herbaceous annual) উদ্ভিদ।

(ii) **উদ্ভিদজগতে স্থান** (Systematic position) ঃ সরিষা **সপুষ্পক** (Phanerogam), **গুপ্তবীজী** (Angiosperm), **দ্বিবীজপত্রী** (Dicotyledonous) এবং **ব্রাসিকাসী*** (Brassicaceae) গোত্রের উদ্ভিদ।

(iii) **বসতি** (Habitat) ঃ সরিষা শীতকালীন ফসল (**রবিশস্য**)। উষ্ণ বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দোআঁশ মাটিতে সরিষার চাষ ভাল হয়। পাঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে সরিষার চাষ হয়। চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেও সরিষার চাষ হয়।

(iv) **সাধারণ বৈশিষ্ট্য** (General features) ঃ সরিষা গাছের **প্রধান মূল-তন্ত্র** মাটির ভিতরে গঠিত হয় এবং **প্রধান মূল** থেকে একান্তরভাবে বিন্যস্ত বহু শাখা-প্রশাখা জন্মায়। গোলাকার, নরম, রোমবিহীন, রসাল এবং উগ্রগন্ধযুক্ত সরিষার কান্ড মাটির উপরে খাড়াভাবে বাড়তে থাকে। কান্ড শাখা-প্রশাখাযুক্ত এবং **পর্ব** ও **পর্বমধ্যে** বিভক্ত।

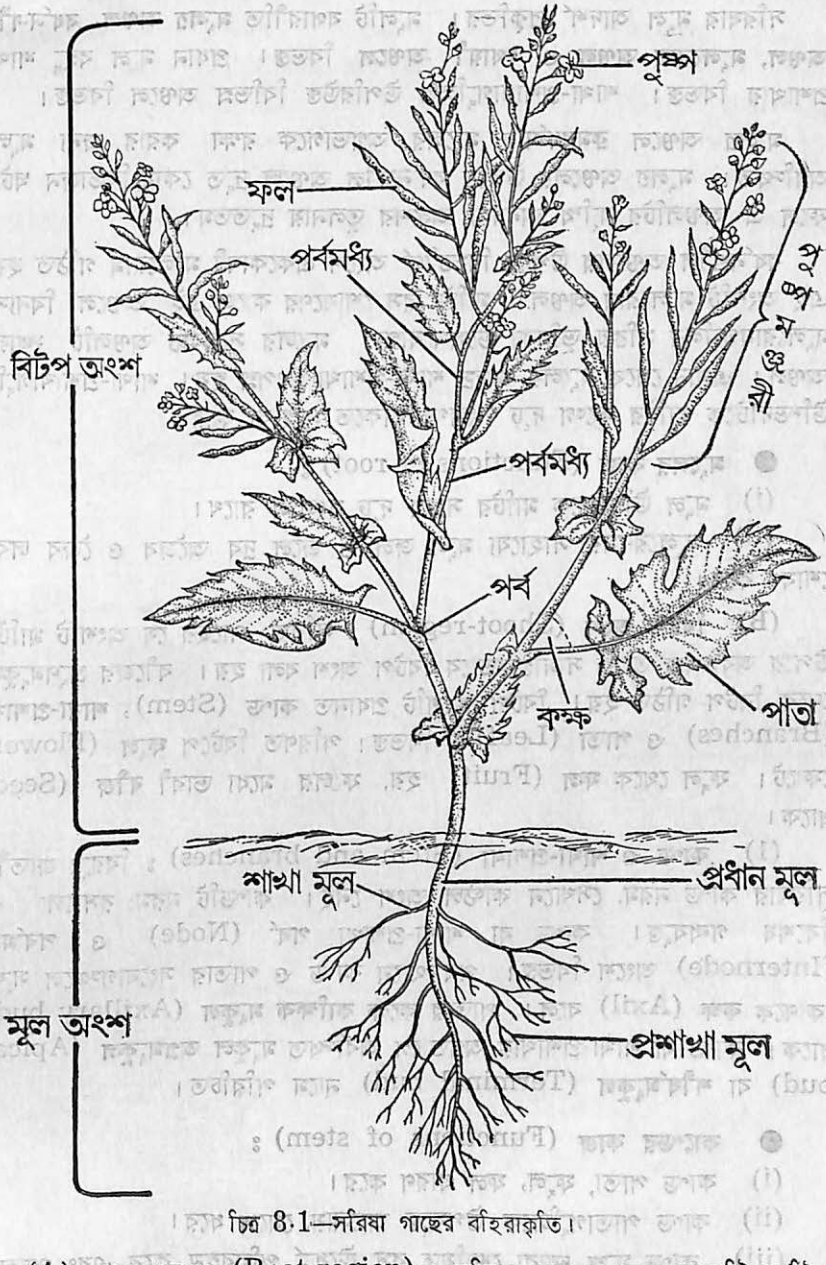
সরিষা গাছের পাতা সরল, **মূলকপত্রাকার** (Lyrate) এবং কমবেশী খন্ডিত। পত্রমূলে কোন **উপপত্র থাকে না**। পাতার আগা সূক্ষ্মকোণে শেষ হয়। পাতা **কান্ডজ** (Cauline), **একান্তরভাবে বিন্যস্ত** এবং তার শিরা-বিন্যাস **একশিরাল জালিকাকার**। সরিষা গাছের **পুষ্পবিন্যাস রেসীম** (Raceme)। পাতার কক্ষ থেকে অথবা সরাসরি কান্ডের অগ্রভাগ থেকে পুষ্পদন্ডের উৎপত্তি ঘটে। পুষ্পগুলি পুষ্পদন্ডের উপর একান্তরভাবে জন্মায়।

পরিণত ও প্রস্ফুটিত ফুলগুলি পুষ্পদন্ডের নীচের দিকে এবং অপরিণত বা ক্রমশঃ ক্ষুদ্র পুষ্প-মুকুলগুলি উপরের দিকে অবস্থিত। সরিষা ফুল **সবৃন্তক** ; অর্থাৎ প্রতিটি ফুলে বৃন্ত থাকে।

(v) **সরিষা গাছের বিভিন্ন অংশ বা বহিরাকৃতি** (Different parts or external features of Mustard plant) ঃ একটি পরিণত সপুষ্পক সরিষা গাছ প্রধানত দু'টি অংশে বিভক্ত ঃ—

* পূর্ব নাম **ক্রুসিফেরী** (Cruciferae)।

(A) মূল অংশ (Root-region) ও
(B) বিটপ অংশ (Shoot-region)।



চিত্র 8·1—সরিষা গাছের বহিরাকৃতি।

(A) মূল অংশ (Root-region) ঃ সরিষা গাছের মূল অংশটি মাটির মধ্যে অবস্থিত। বীজের ভ্রূণমূল থেকে মূল অংশের সৃষ্টি হয়, সেজন্য সরিষার

মূলকে **স্থানিক মূল** (normal root) বা **প্রধান মূল** (Primary root or tap root) বলা হয়।

সরিষার মূল আদর্শ প্রকৃতির। মূলটি যথারীতি **মূলত্র অঞ্চল, বর্ধনশীল অঞ্চল, মূলরোম অঞ্চল** ও **স্থায়ী অঞ্চলে** বিভক্ত। প্রধান মূল বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। শাখা-প্রশাখাগুলিও উপরিউক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত।

মূলত্র অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান মূলের অগ্রভাগকে রক্ষা করার জন্য মূলত্র অবস্থিত। মূলত্র অঞ্চলের উপরে বর্ধনশীল অঞ্চলে দ্রুত কোষ-বিভাজন ঘটার ফলে ঐ অঞ্চলটির বৃদ্ধি অন্যান্য অংশের তুলনায় দ্রুততম।

বর্ধনশীল অঞ্চলের উপরে বিস্তীর্ণ অংশে এককোষী মূলরোম গঠিত হয়। এই অংশটি মূলরোম অঞ্চল। মাটির রস শোষণের কাজে এই অঞ্চলে বিন্যস্ত মূলরোমগুলির সক্রিয় ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মূলের সর্বোচ্চ অঞ্চলটি স্থায়ী অঞ্চল। এখান থেকে মূলের অজস্র শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন হয়। শাখা-প্রশাখাগুলি উদ্ভিদটিকে মাটির সঙ্গে দৃঢ় সংলগ্ন থাকতে সাহায্য করে।

● **মূলের কাজ** (Functions of root) ঃ

(i) মূল উদ্ভিদকে মাটির সঙ্গে দৃঢ় সংলগ্ন রাখে।

(ii) মূলরোমের সাহায্যে মূল জল ও জলে দ্রব অজৈব ও জৈব লবণ শোষণ করে।

(B) **বিটপ অংশ** (Shoot-region) ঃ সরিষা গাছের যে অংশটি মাটির উপরে অবস্থিত তাকে সামগ্রিকভাবে বিটপ অংশ বলা হয়। বীজের ভ্রূণমুকুল থেকে বিটপ গঠিত হয়। বিটপ অংশটি প্রধানত **কাণ্ড** (Stem), **শাখা-প্রশাখা** (Branches) ও **পাতা** (Leaf)-য় বিভক্ত। পরিণত বিটপে **ফুল** (Flower) ফোটে। ফুল থেকে **ফল** (Fruit) হয়, ফলের মধ্যে ভাবী **বীজ** (Seed) থাকে।

(1) **কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা** (Stem and branches) ঃ বিরুৎ জাতীয় সরিষার কাণ্ড নরম, সেখানে কাষ্ঠল অংশ নেই। কাণ্ডটি নরম, রসালো ও বিশেষ গন্ধযুক্ত। কাণ্ড বা শাখা-প্রশাখা **পর্ব** (Node) ও **পর্বমধ্য** (Internode) অংশে বিভক্ত। পর্বস্থানে কাণ্ড ও পাতার সংযোগস্থলে সৃষ্ট কোণকে **কক্ষ** (Axil) বলে। পাতার কক্ষে **কাক্ষিক মুকুল** (Axillary bud) থাকে। কাণ্ড বা শাখা-প্রশাখায় অগ্রভাগে অবস্থিত মুকুল **অগ্রমুকুল** (Apical bud) বা **শীর্ষমুকুল** (Terminal bud) নামে পরিচিত।

● **কাণ্ডের কাজ** (Functions of stem) ঃ

(i) কাণ্ড পাতা, ফুল, ফল ধারণ করে।

(ii) কাণ্ড পাতাগুলিকে উপযুক্ত আলোয় মেলে ধরে।

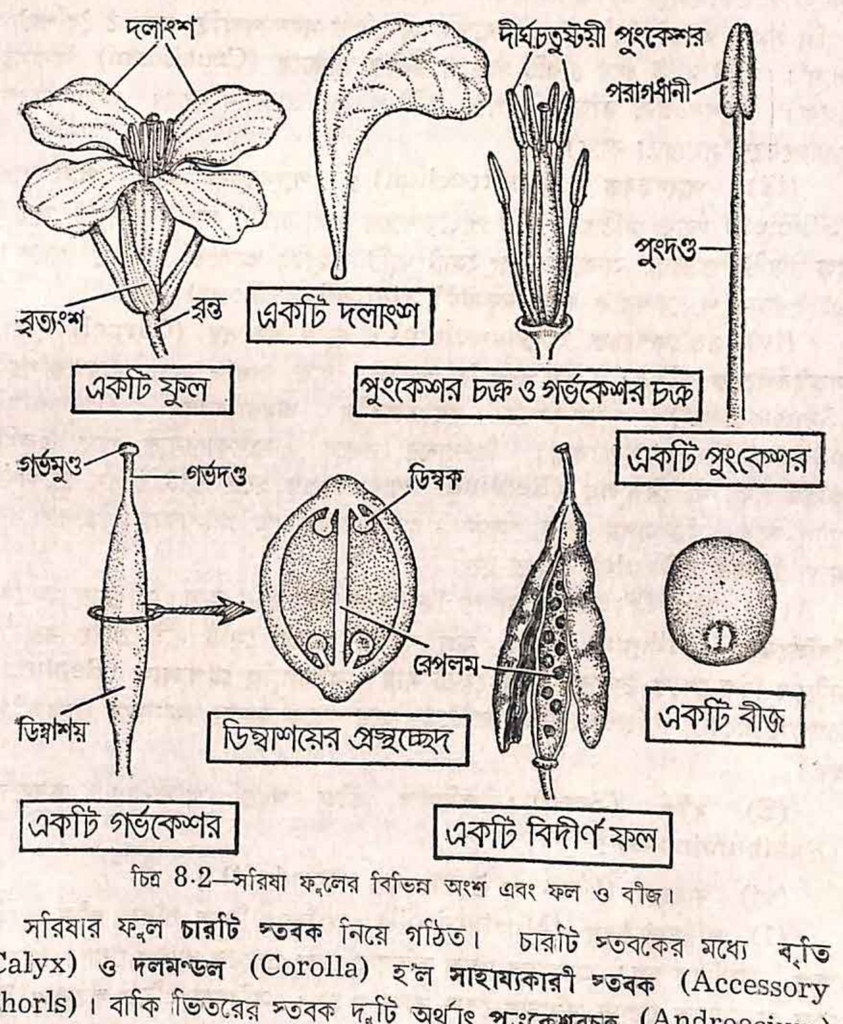
(iii) কাণ্ড মূল দ্বারা শোষিত রস ঊর্ধ্বে পরিবহন করে এবং পাতায় উৎপন্ন খাদ্য বা সঞ্চিত অঙ্গস্থ খাদ্য দেহের সর্বত্র পরিবহন করে।

(2) **পাতা** (Leaf) ঃ সরিষার পাতাগুলি **সরল** (Simple), **সবৃন্তক** (Petiolate), **অনুপত্রীক** (Exstipulate), **খণ্ডযুক্ত** (lobed), **নমনীয়** এবং **একান্তরভাবে** (Alternately) সজ্জিত। পাতায় একশিরাল জালিকাকার **শিরাবিন্যাস** (Unicostate reticulate venation) লক্ষ্য করা যায়।

পাতার কাজ (Functions of the leaf) ঃ

পাতার প্রধান কাজ তিনটি—(i) **সালোকসংশ্লেষ** (Photosynthesis), (ii) **শ্বসন** (Respiration) এবং (iii) **বাষ্পমোচন** (Transpiration)।

(C) **ফুল** (Flower) ঃ সরিষার পুষ্পবিন্যাস **রেসীম** (Raceme) প্রকৃতির। ফুল **সবৃন্তক** (Complete), **সমাঙ্গ** (Regular), **উভলিঙ্গ** (Bisexual)।



চিত্র 8·2—সরিষা ফুলের বিভিন্ন অংশ এবং ফল ও বীজ।

সরিষার ফুল **চারটি স্তবক** নিয়ে গঠিত। চারটি স্তবকের মধ্যে বৃতি (Calyx) ও **দলমণ্ডল** (Corolla) হ'ল **সাহায্যকারী স্তবক** (Accessory whorls)। বাকি ভিতরের স্তবক দুটি অর্থাৎ **পুংকেশরচক্র** (Androecium)

এবং **গর্ভকেশরচক্র** (Gynoecium) **অত্যাবশ্যকীয় স্তবক** (Essential whorls)। অত্যাবশ্যকীয় স্তবককে **জনন স্তবক** (Reproductive whorl) বলা হয়।

(i) **বৃতি** (Calyx) : বৃতি পুষ্পের একেবারে বাইরের স্তবক। চারটি সরল **বৃত্যংশ** (Sepal) নিয়ে বৃতি গঠিত। দুটি আবর্তে বৃত্যংশগুলি সজ্জিত থাকে। বৃত্যংশগুলি বিযুক্ত (free), অর্থাৎ কেউ কারও সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন থাকে না।

(ii) **দলমণ্ডল** (Corolla) : বৃতির ভিতরে থাকে দলমণ্ডল। দলমণ্ডলও চারটি পৃথক **হলুদ বর্ণের দলাংশ** বা **পাপড়ি** (Petal) নিয়ে গঠিত। পাপড়ি-গুলি সমান আকৃতিবিশিষ্ট ও বিযুক্ত। এগুলির সজ্জাপদ্ধতি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। দুটি দুটি করে চারটি দলাংশ **ক্রসের আকারে** (Cruciform) বিন্যস্ত থাকে। বিশেষ গন্ধ ছড়িয়ে পাপড়ি কীট-পতঙ্গ আকর্ষণ করে। কীট-পতঙ্গ পরাগযোগে সহায়তা করে।

(iii) **পুংস্তবক** (Androecium) : পুংস্তবক ছটি **পুংকেশর** (Stamen) দ্বারা গঠিত। ছটি পুংকেশরের মধ্যে চারটি বড় এবং দুটি ছোট। বড় চারটি ভিতরের আবর্তে এবং ছোট দুটি বাইরের আবর্তে বিন্যস্ত থাকে। এই ধরনের পুংকেশরকে **দীর্ঘ চতুষ্টয়ী** (tetradynamous) বলে।

(iv) **গর্ভকেশরচক্র** (Gynoecium) : দুটি **গর্ভপত্র** (Carpel) নিয়ে **গর্ভকেশরচক্র** গঠিত। গর্ভপত্রগুলি পরস্পর যুক্ত, অর্থাৎ তারা **যুক্তগর্ভপত্রী** (Syncarpous)। ডিম্বাশয়ে **বহুপ্রান্তীয় অমরাবিন্যাস** (Parietal placentation) দেখা যায়। ডিম্বাশয় প্রথমে একপ্রকোষ্ঠযুক্ত, পরে একটি কৃত্রিম পর্দা বা **রেপ্লম** (Replum) দ্বারা বিভক্ত হয়ে দুটি কৃত্রিম প্রকোষ্ঠ গঠন করে। ডিম্বাশয় লম্বা, গর্ভদণ্ড হ্রস্ব, গর্ভমুণ্ড গোলাকার। ডিম্বাশয়ের মধ্যে **ডিম্বক** (Ovule) গঠিত হয়।

(D) **ফল** (Fruit) : নিষিক্ত ডিম্বাশয় **ফল** গঠন করে। সরিষার ফলকে **সিলিকোয়া** (Siliqua) বলে। ফল শুকিয়ে গেলে সেটি দুই প্রান্ত বরাবর নীচের দিক থেকে উপরের দিকে ফেটে যায়। বীজগুলি **রেপ্লমে** (Replum) সংলগ্ন থাকে। পরিণত বীজ মাটিতে ঝরে পড়ে অথবা যথাসময়ে সংগৃহীত হয়।

(E) **বীজ** (Seed) : সরিষার বীজ ক্ষুদ্র গোলাকার, **অসস্যল** (Exalbuminous) :

(vi) **ব্যবহার** (Use) বা **উৎপন্ন পণ্য** (Product) :

(1) **সরিষার তেল** (Mustard oil) : ঘানিতে পিষে সরিষা বীজ থেকে তেল নিষ্কাশিত হয়। আমাদের দেশে সরিষার তেল প্রধানত রান্নার তেল। নানা-রকম মুখরোচক রান্নায় সরিষার তেল ব্যবহৃত হয়। সরিষার বীজে শতকরা 30 থেকে 48 ভাগ তেল থাকে।

(2) **খইল** (Oil cakes) ঃ সরিষার খইল পশুখাদ্য ও উৎকৃষ্ট সার।

(3) **সব্‌জি** (Vegetable) ঃ কচি সরিষার পাতা সবুজ সব্‌জি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(vii) **চাষের উপযোগী আবহাওয়া ও মাটি** (Favourable climate and soil for cultivation) ঃ রবিশস্য হিসাবে সরিষার চাষ হয়। প্রধানতঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী-মার্চ পর্যন্ত সরিষা চাষের উপযুক্ত সময়। উঁচু ও জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্তযুক্ত জমিতে সরিষার চাষ ভাল হয়। **টোরি** সরিষা হাল্‌কা মাটিতে এবং **রাই** সরিষা এঁটেল-দোআঁশ মাটিতে ভাল জন্মায়। সময়মতো ফস্‌ফেট সার প্রয়োগ করলে ও সেচ দিলে ফলন বেশী হয়। আর্দ্র ও মেঘলা আবহাওয়া বা রসাল মাটি সরিষা চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত।

(viii) **জমি প্রস্তুতকরণ** (Preparation of the soil) ঃ পূর্ববর্তী ফসল তোলার পর জমিতে তিন-চার বার ভাল করে লাঙগল দিয়ে জমি প্রস্তুত করতে হয়।

(ix) **বীজবপন** (Sowing of seeds) ঃ উপযুক্তভাবে চাষ দেবার পর জমিতে বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে সারিতে বীজ বুনলে ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রতি একর জমিতে 2.5 কে. জি. থেকে 3.5 কে. জি. বীজ লাগে।

(x) **পরিচর্যা** (Aftercare) ঃ সরিষা চাষে বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। আগাছা থাকলে সময়মতো সেগুলিকে উঠিয়ে নষ্ট করে ফেললেই চলে। মাটি শুকিয়ে গেলে অল্পস্বল্প সেচ দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(xi) **ফসল তোলা** (Harvest) ঃ শুকুতে আরম্ভ করলেই সরিষা গাছগুলিকে তুলে ফেলা প্রয়োজন। পরে পিটিয়ে শুঁটি থেকে বীজ বার করতে হয়।

(xii) **ফলন** (Yield) ঃ প্রজাতি হিসাবে টোরির ফলন একর প্রতি 3 থেকে 5 কুইন্‌টল এবং রাই-এর ফলন একর প্রতি 6 থেকে 9 কুইন্‌টল পর্যন্ত হয়।

8.2. ধান *[Paddy] :*

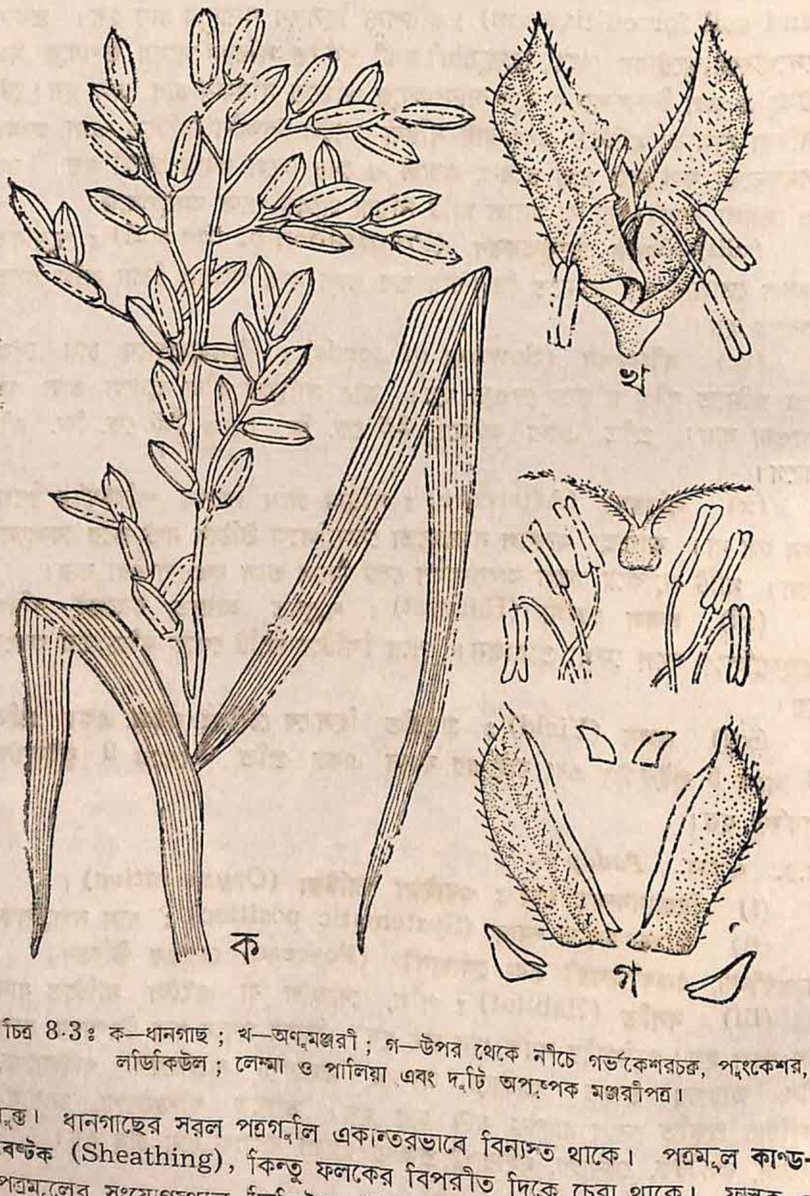
(i) **বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ ওরাইজা স্যাটিভা** (*Oryza sativa*)।

(ii) **উদ্ভিদজগতে স্থান** (Systematic position) ঃ ধান সপুষ্পক, **গুপ্তবীজী, একবীজপত্রী** এবং **পোয়াসী*** (Poaceae) গোত্রের উদ্ভিদ।

(iii) **বসতি** (Habitat) ঃ পলি, দোআঁশ বা এঁটেল মাটিতে ধান চাষ ভাল হয়। পৃথিবীর সর্বত্র ধান চাষ হয়। বিশ্বে প্রধান ধান উৎপাদক দেশ চীন, তারপর ভারত। তাছাড়া জাপান, ব্রহ্মদেশ, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে ব্যাপক ধান চাষ হয়। ভারতে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ওড়িষা, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে ব্যাপক ধান চাষ হয়।

* পূর্বনাম—গ্রামিণী (Graminae)।

(iv) **সাধারণ বৈশিষ্ট্য** (General features) ঃ ধান বিরূৎ-জাতীয় একবর্ষজীবী উদ্ভিদ। ধানগাছে গুচ্ছমূল জন্মায়। কাণ্ড খাড়াভাবে মাটির উপরে বৃদ্ধি পায়। ফাঁপা গোলাকার কাণ্ড পর্বমধ্য ও সুস্পষ্ট পর্বসন্ধি-



চিত্র 8.3 ঃ ক—ধানগাছ ; খ—অণুমঞ্জরী ; গ—উপর থেকে নীচে গর্ভকেশরচক্র, পুংকেশর, লডিকিউল ; লেম্মা ও পালিয়া এবং দুটি অপুষ্পক মঞ্জরীপত্র।

যুক্ত। ধানগাছের সরল পত্রগুলি একান্তরভাবে বিন্যস্ত থাকে। পত্রমূল **কাণ্ড-বেষ্টক** (Sheathing), কিন্তু ফলকের বিপরীত দিকে চেরা থাকে। ফলক ও পত্রমূলের সংযোগস্থলে **লিগিউল** (Ligule) নামে এক বিশেষ অঙ্গ দেখা

যায়। পাতাগুলি বৃন্তহীন লম্বা **রেখাকার** (Linear) বা **ভল্লাকার** (Lanceolate)। পাতার আগা সূক্ষ্মকোণ এবং শিরাবিন্যাস সমান্তরাল।

(v) **ধানগাছের বিভিন্ন অংশ বা বহিরাকৃতি** (Different parts or external features of a paddy plant) ঃ একটি পরিণত সপুষ্পক ধান গাছ প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত ঃ—

(A) **মূল অংশ** (Root-region) ও

(B) **বিটপ অংশ** (Shoot-region)।

(A) **মূল অংশ** (Root-region) ঃ ধান গাছের মূল অংশটি মাটির মধ্যে অবস্থিত। পরিণত ধান গাছে প্রধান মূল থাকে না। কারণ, ধান গাছের ভ্রূণ মূল ও সেমিনাল মূল ক্ষণস্থায়ী। তৎপরিবর্তে কান্ডের নিম্নাংশ থেকে সরু সুতোর মতো গুচ্ছাকারে যে মূলগুলি উৎপন্ন হয় সেগুলি **গুচ্ছমূল** বা **শিফামূল** (Fibrous root) নামে পরিচিত। শিফামূলের গুচ্ছ প্রকৃতপক্ষে **অস্থানিক মূল** (Adventitious root)।

মূলের কাজ (Functions of root) ঃ

(i) মূল ধান গাছকে মাটির সঙ্গে আটকে রাখে।

(ii) মূল মাটির রস শোষণ করে।

(B) **বিটপ অংশ** (Shoot-region) ঃ মাটির উপরে অবস্থিত ধান গাছের অংশবিশেষকে বিটপ বলে। বীজের ভ্রূণমুকুল থেকে বিটপ গঠিত হয়। বিটপ অংশটি প্রধানত **কান্ড** ও **পাতায়** বিভক্ত। পরিণত বিটপে **ফুল** ফোটে। ফুল থেকে ফল এবং ফলের মধ্যে বীজ উৎপন্ন হয়।

(1) **কান্ড** (Stem) ঃ বিরুৎজাতীয় ধান গাছের কান্ড নরম, গোলাকার। সেখানে কাষ্ঠল অংশ নাই। কান্ডটি খাড়া মাটির উপরে দাঁড়িয়ে থাকে। এটি **পর্ব** ও **পর্বমধ্যে** বিভক্ত। পর্ব নিরেট (Solid), কিন্তু পর্বমধ্য **ফাঁপা** (Hollow)। নিরেট পর্ব ও ফাঁপা পর্বমধ্যযুক্ত কান্ড **তৃণকান্ড** (Culm) নামে পরিচিত।

কান্ডের কাজ (Functions of stem) ঃ কান্ড পাতা, ফুল, ফল ধারণ করে।

(2) **পাতা** (Leaf) ঃ ধান গাছের পাতা **সরল, অবৃন্তক** (Sessile) ও **লিগিউলযুক্ত** (Ligulate)। পত্রমূল **কান্ডবেষ্টক** (Sheathing)। পত্রবিন্যাস **একান্তর**, এবং শিরাবিন্যাস **পক্ষল একশিরাল সমান্তরাল** (Pinnate unicostate parallel)। ফলক চ্যাপ্টা **রেখাকার** (Linear)।

পাতার কাজ (Functions of leaf) ঃ পাতা **সালোকসংশ্লেষ, শ্বসন** ও **বাষ্পমোচনে** অংশগ্রহণ করে।

(3) **ফুল** (Flower) ঃ ধানের ফুল নির্দিষ্ট পুষ্পবিন্যাস রীতিতে বিন্যস্ত থাকে।

ধানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পুষ্পবিন্যাসকে **অণুমঞ্জরী** (Spikelet) বলে। মঞ্জরীদণ্ডের সর্বনিম্নে অবস্থিত প্রথম **মঞ্জরীপত্র** (Glume) **অপুষ্পক** (Non-flowering)। দ্বিতীয় মঞ্জরীপত্রটিও **অপুষ্পক** ; কিন্তু, তৃতীয়টি

সপুষ্পক (flowering)। এটিকে **লেম্মা** (Lemma) বা **সপুষ্পক মঞ্জরীপত্র** (Flowering glume) বলে। সপুষ্পক মঞ্জরীপত্রের কক্ষে **অবৃন্তক, উভলিংগ** পুষ্প উৎপন্ন হয়। লেম্মার উপরে ক্ষুদ্র মঞ্জরীপত্রকটি **পালিয়া** (Palea)। পালিয়ার উপরে **লডিকিউল** (Lodicule) নামে এক জোড়া ছোট পাতার মতো মসৃণ **শল্কপত্র** থাকে। ধানের পুষ্পে বৃতি বা দলমণ্ডল নাই। **ছটি পুংকেশর** (Stamens) নিয়ে পুংকেশরচক্র গঠিত। পুংদণ্ড অত্যধিক লম্বা হওয়ার জন্য প্রস্ফুটিত অবস্থায় পরাগধানী পুষ্পের বাইরে ঝুলতে থাকে। বাতাসে দ্রুত আন্দোলিত পরাগধানী থেকে অসংখ্য পরাগ বাইরে এসে বাতাসে ভেসে বহুদূরে চলে যায়। গর্ভকেশরচক্র **একগর্ভপত্রী**। একপ্রকোষ্ঠযুক্ত ডিম্বাশয়ে একটিমাত্র ডিম্বক থাকে। সেজন্য প্রতি ফলে একটিমাত্র বীজ গঠিত হয়, অর্থাৎ, **ধান একবীজী** ফল। গর্ভদণ্ড দুটি সংক্ষিপ্ত, গর্ভমুণ্ড **পক্ষল** বা পালকের মতো। পালকের মতো হওয়ায় উড়ন্ত পরাগ সহজে গর্ভমুণ্ডে ধরা পড়ে।

(4) **ফল** (Fruit) : ধানের ফলকে বলে ক্যেরিঅপসিস্ (Caryopsis)। **এক্ষেত্রে ফলত্বক ও বীজত্বক এমনভাবে মিশে যায় যে, উভয়কে সহজে পৃথক করা যায় না। এটিই ক্যেরিঅপসিস্ ফলের প্রধান বৈশিষ্ট্য।** ধানের এক প্রান্তে অবস্থিত সাদা ক্ষুদ্রাকার অংশ দুটি অপুষ্পক মঞ্জরীপত্র। ধানের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আবরণটি **লেম্মা** (Lemma)। লেম্মার ভিতরে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ছোট মঞ্জরীপত্রকটি পালিয়া (Palea)।

(5) **বীজ** (Seed) : ধানের বীজ লম্বাটে, একবীজপত্রী, **সস্যল** (Albuminous)। বীজত্বক ও ফলত্বক অঙ্গাঙ্গী অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। সেজন্য ধানবীজকে **দানা** (Grain) বলা হয়।

(vi) **ব্যবহার** (Use) বা **উৎপন্ন পণ্য** (Products)।

(1) **চাল** (Rice) : **ধান** থেকে চাল উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃহৎ অংশের প্রধান খাদ্য চাল। চাল থেকে ভাত, চিড়া, মুড়ি, খই তৈরী হয়।

(2) **খড়** (Straw) : খড় গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য। খড় থেকে কাগজ, বোর্ড, মাদুর তৈরী হয়। খড় দিয়ে ঘর ছাওয়া হয়।

(3) **তেল** (Oil) : চালের তুঁষ থেকে ভোজ্য তেল তৈরী হয়। এই তেল সাবান ও অন্যান্য প্রসাধন বস্তু উৎপাদনে এবং প্রদীপ জ্বালানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

(4) ধান কাটার পরে মূল ও কাণ্ডের নিম্নাংশ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(vii) **চাষের উপযোগী আবহাওয়া ও মাটি** (Favourable climate and soil for cultivation) : বিভিন্ন ঋতুতে ধান চাষ হলেও সাধারণতঃ **জুন-জুলাই মাসে বীজতলায় আমন** ধানের বীজ বপন করা হয়। **জুলাই-**

আগস্ট মাসে চারা রোপণ করলে **ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে ধান কাটা** চলে। **আউশ** ধান মে-জুন মাসে বোনা হয় এবং জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কাটা চলে। নভেম্বর মাস **বোরো** ধান বপনের সময়। ডিসেম্বর মাসেই রোপণ কার্য সমাপ্ত হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে ধান কাটা চলে।

বর্ষায় জল জমে এমন নীচু জমি আমন ধান চাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। জল বহুদিন দাঁড়াতে পারে এমন এঁটেল বা কাদামাটি ধান চাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত। অপেক্ষাকৃত ডাঙা জমিতে আউশ ধান চাষ করা চলে। বেলে-দোআঁশ মাটিতেও আউশ ধানের চাষ হয়। বোরো-ধানের জন্য জলে ডোবা জমিই একমাত্র উপযোগী।

(viii) **জমি প্রস্তুতকরণ** (Preparation of the soil) ঃ জমি থেকে রবিশস্য ওঠাবার পর চার-পাঁচ বার উত্তমরূপে লাঙল ও সঙ্গে সঙ্গে মই দিয়ে জমিকে ধান চাষের উপযোগী করতে হয়। জমিতে একর প্রতি 20-24 কুইন্টল পরিমাণে **গোবর সার** দেওয়া প্রয়োজন। ভাল ফলনের জন্য **সুপার ফসফেট** সার প্রয়োগ করা চলে ; তবে সেইসঙ্গে **সবুজ সার** ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। জমিতে জল দাঁড়াবার পূর্বে **অ্যামোনিয়ম সালফেট** প্রয়োগ করলে ফলন বাড়ে।

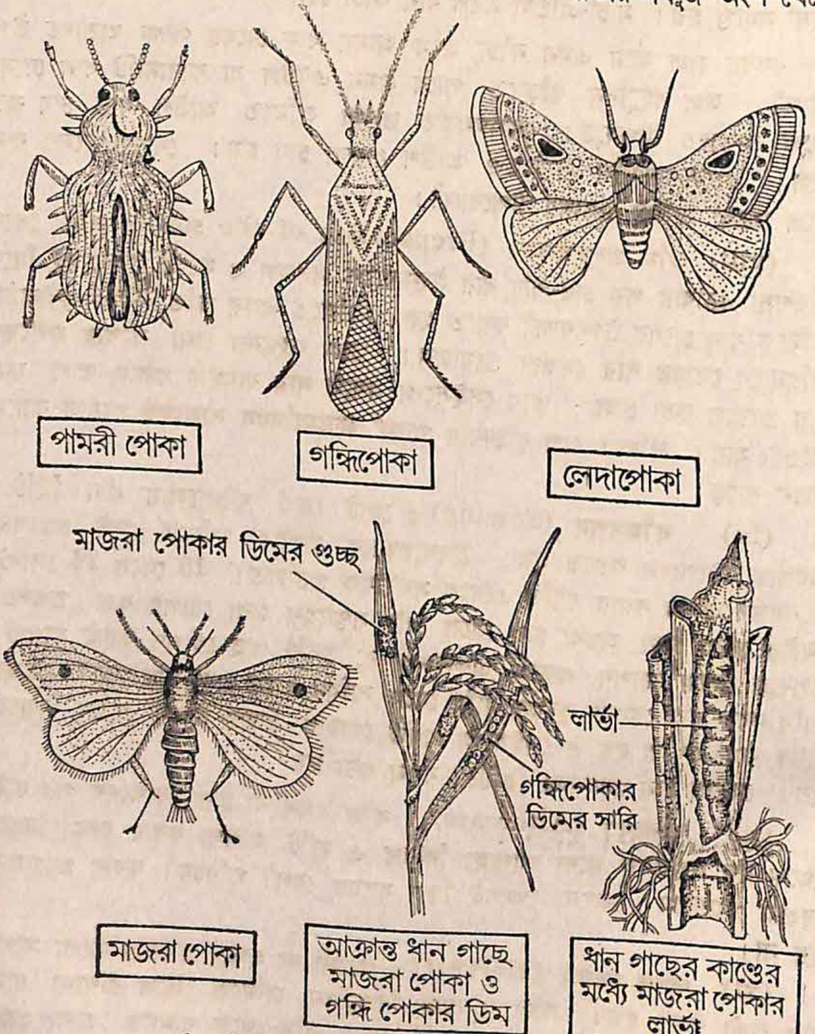
(ix) **বীজবপন** (Sowing) ঃ ছোট ছোট বীজতলায় ধান ছিটিয়ে চারাগাছ উৎপাদন করতে হয়। উপযুক্তভাবে প্রস্তুত জমিতে সেই চারাগাছ পুনরায় রোপণ করার রীতি এদেশে সর্বাধিক প্রচলিত। 15 থেকে 24 সেন্টিমিটার লম্বা চারা অথবা চার থেকে পাঁচ সপ্তাহের চারা রোপণ করা প্রশস্ত। উপযুক্ত সময়ে রোপণ করলে একসঙ্গে দু'তিনটি গাছ রোপণ করাই যথেষ্ট। নাবি করে চারা রোপণ করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব কম রাখতে হয় ও সেইসঙ্গে প্রতি গোছায় চারার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হয়। বোরো ধান প্রধানতঃ ছিটিয়ে বপন করা হয়।

(x) **পরিচর্যা** (Aftercare) ঃ বীজ বপন বা চারা রোপণের পর দুই থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে আগাছা বিনাশ ও মাটি আলগা করার জন্য নিড়ান দেওয়া প্রয়োজন। কোনো ক্ষেত্রেই তিন বারের বেশী পরিচর্যা করার প্রয়োজন হয় না।

(xi) **ফসল তোলা** (Harvest) ঃ গাছের রং হলুদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধান কাটা শুরু হয়। কাটা ধানগাছ কিছুদিন জমিতে ফেলে রাখলে গাছ সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যায়, পরে আটি বেঁধে জমি থেকে খামারে তোলা হয়। সেখানে সময়মতো ঝাড়াই-মাড়াই-এর কাজ চলে।

(xii) **ধানের ক্ষতিকর পোকা ও পোকা দমন** (Paddy paste and their control) ঃ ধানের ক্ষতিকর পোকাগুলির মধ্যে **মাজরা পোকা, পামরি পোকা, গন্ধি পোকা, লেদা পোকা, ভেঁপু পোকা, চুঙী পোকা** প্রভৃতি অন্যতম।

এদের মধ্যে মাজরা পোকা (Paddy stem borer), পামরি পোকা (Rice hispa) ও গন্ধি পোকা (Rice bug) ধানের মারাত্মক ক্ষতি করে। মাজরা পোকা গাছের কাণ্ড ফুটো ক'রে মজ্জা নষ্ট করে দেয়। পামরি পোকা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে

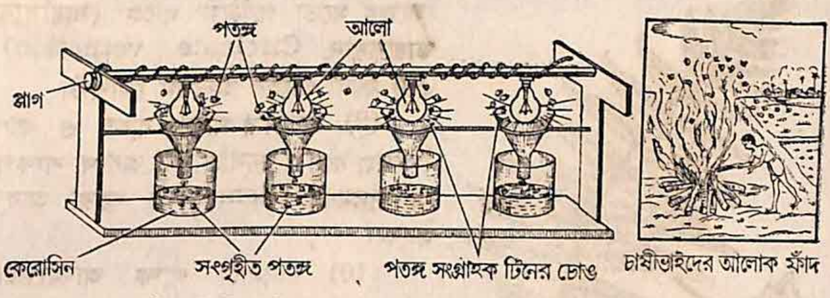


চিত্র 8·4—ধানের বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর পোকা।

ফেলে। ছারপোকা যেমন রক্ত চুষে নেয়—গন্ধি পোকাও তেমনি ধানের 'দুধ' চুষে নেয়। এদের আক্রমণে প্রতি বছর ধান গাছের ফলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

পোকা দমন ঃ (i) **'আলোক ফাঁদ'**-এর ব্যবস্থা ক'রে মাজরা পোকার পূর্ণাঙ্গ দশা, অর্থাৎ মথকে নষ্ট করা যায়।

(ii) 5% BHC (Benzene hexachloride) দ্রবণ, 0.1% DDT দ্রবণ, 0.025% **প্যারাথিয়ন** বা 0.08% এনড্রিন বা ফলিডল 605 ধানক্ষেতে স্প্রে



চিত্র 8·5—ক্ষতিকর পোকা দমনে ব্যবহৃত আলোক ফাঁদ।

ক'রে মাজরা পোকা, পামরি পোকা, গন্ধি পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

8.3. ফার্ন *[Fern]* :

(i) **বিজ্ঞানসম্মত নাম** (Scientific name) ঃ **ড্রাঅপটেরিস** (*Dryopteris*)। ফার্ন **টেরিডোফাইটাভুক্ত** বহুবর্ষজীবী **অপুষ্পক রেণুধর উদ্ভিদ** (Sporophyte)।

(ii) **বসতি** (Habitat) ঃ এই গাছ ছায়াশীতল স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। পুরাতন জরাজীর্ণ ইমারতের ইটের ফাঁকে ফাঁকে ফার্ন গাছ চোখে পড়ে।

পাহাড়ী অঞ্চলের লম্বা গুঁড়িবিশিষ্ট ফার্ন গাছকে **"ট্রি ফার্ন"** (Tree Fern) বলা হয়।

(iii) **ফার্নের বহির্গঠন** (External structure of Fern) ঃ

(1) অপুষ্পক উদ্ভিদ হলেও ফার্নের রেণুধর উদ্ভিদটি (Sporophyte) **কান্ড, মূল** ও **পাতায়** বিভেদিত।

(2) মাটির মধ্যে শায়িত কান্ডকে **গ্রন্থিকান্ড** বা **রাইজোম** (Rhizome) বলে।

(3) রাইজোম স্থায়ী পত্রবৃন্তে আচ্ছাদিত থাকে।

(4) রাইজোম থেকে কোন শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন হয় না।

(5) রাইজোম থেকে সূক্ষ্ম **অস্থানিক মূল** উৎপন্ন হয়। এই মূলগুলি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত।

(6) ফার্নের পাতা বৃহদাকার, **পক্ষল যৌগিকপত্র** (Pinnately compound)। যৌগিকপত্রের **পত্রকগুলি** (leaflets) প্রধান পত্রাক্ষের দুপাশে পাখির পালকের মতো সাজানো থাকে।

(7) পত্রক কমবেশী খণ্ডিত।



চিত্র 8·6—ফার্নের বহিরাকৃতি।

(3) অপরিণত যৌগিকপত্র কুকুরের লেজের মতো গুটিয়ে থাকে (**সারসিনেট ভারনেসান**, Circinate vernation)। এটি ফার্ন গাছের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

(9) ফার্নের পাতার বৃন্ত ও কাণ্ড পিংগল বর্ণের ঘনসন্নিবিষ্ট অসংখ্য শল্কপত্র বা **র‍্যামেণ্টা** (Ramenta) দ্বারা আবৃত থাকে।

(10) র‍্যামেণ্টা শুষ্ক আবহাওয়ায় জল সংরক্ষণের কাজে সাহায্য করে।

(11) পরিণত যৌগিকপত্রের পত্রকগুলি নিম্নাংশে দুসারি **সোরস** (Sorus) বহন করে।

(12) প্রতিটি সোরস বহু রেণুস্থলী (Sporangia)-র সমষ্টি মাত্র।

(13) রেণুস্থলীতে রেণু (Spore) উৎপন্ন হয়।

(14) রেণুস্থলী বহনকারী পত্রকে **রেণুপত্র** বা **স্পোরোফিল** (Sporophyll) বলে।

● **জনন** (Reproduction) :

ফার্নের জনন **অংগজ** (Vegetative), **অযৌন** (Asexual) ও **যৌন** (Sexual) পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়।

(1) **অংগজ জনন** (Vegetative reproduction) : পরিণত রাইজোমের কোন অংশ শুকিয়ে গেলে সেখান থেকে অপরিণত শাখাগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন হবার পরে নতুন মূল ও পাতা সৃষ্টি দ্বারা শাখাগুলি স্বাবলম্বী ফার্ন উদ্ভিদ রূপে জীবন শুরু করে।

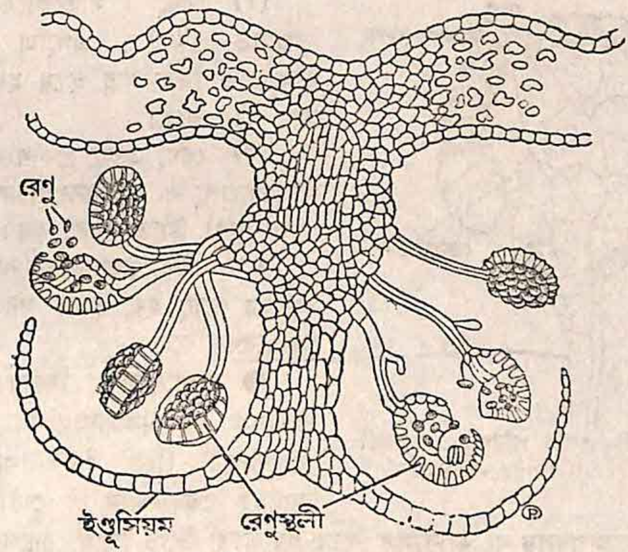
(2) **অযৌন জনন** (Asexual reproduction) : রেণুর মাধ্যমে অযৌন জনন সম্পন্ন হয়।

● **অযৌন জনন অংগ** (Asexual reproductive organs) : গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পাতার নীচে প্রথমে সবুজ, পরে বাদামী রঙের গোল উত্তোলিত অংগের আবির্ভাব ঘটে। অংগগুলি মধ্যশিরার দুপাশে নির্দিষ্ট রীতিতে সজ্জিত থাকে। এদের প্রত্যেকটিকে **সোরস** (Sorus) (চিত্র 8.6) বলে। ফার্নগাছে অসংখ্য সোরস গঠিত হয়।

● **সোরসের গঠন** (Structure of sorus) : (1) সোরস **বৃক্কাকৃতি** (Reniform or kidney-shaped)।

(2) একটি সোরস বহু **রেণুস্থলী** বা **স্পোর্যানজিয়ম** (Sporangium) দ্বারা গঠিত।

(3) স্পোর্যানজিয়মগুলি **ইন্ডুসিয়ম** (Indusium) নামক ঢালের মতো আবরণ দ্বারা ঢাকা থাকে (চিত্র 8.7)।



চিত্র 8·7—সোরসের প্রস্থচ্ছেদ।

(4) পাতা থেকে উদ্গত যে কলা থেকে স্পোর্যানজিয়ম ও ইন্ডুসিয়ম উৎপন্ন হয় তাকে **অমরা বা প্ল্যাসেন্টা** (Placenta) বলে।

(5) স্পোর্যানজিয়ম কেবলমাত্র এক ধরনের স্পোর বা রেণু (Spore) উৎপন্ন করে। রেণু উৎপাদনের পূর্বেই মায়োসিস বা হ্রাসকরণ বিভাজন ঘটে, ফলে রেণুতে অর্ধসংখ্যক ক্রোমোজোম আসে।

● **রেণুস্থলীর গঠন** (Structure of Sporangium) :

(1) প্রতিটি পরিণত **রেণুস্থলী** বা **স্পোর্যানজিয়ম** একটি বহুকোষী বৃন্ত বা দণ্ড ও দণ্ডের উপরে অর্ধগোলাকার **ক্যাপসিউল** (Capsule) দ্বারা গঠিত।

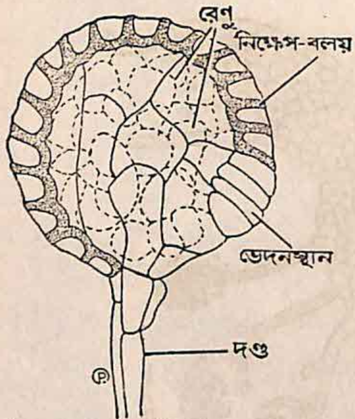
(2) ক্যাপসিউলের প্রাকার **নিক্ষেপ-বলয়** বা **অ্যানুলস** (Annulus) নামক স্থূল কিউটিনযুক্ত অসম্পূর্ণ কোষান্তর দ্বারা গঠিত।

(3) অ্যানুলসের বিপরীত দিকে কতকগুলি নরম, পাতলা কোষ বর্তমান। ভিতরের চাপ বৃদ্ধি পেলে ঐ অংশটি ফেটে যায়। সেজন্য ঐ অংশটিকে **ভেদন স্থান** বা **স্টোমিয়ম** (Stomium) বলে।

(4) পরিণত ক্যাপসিউলের মধ্যে **ডিপ্লয়েড** (2n) **রেণুধর কলা** বা **স্পোরোজিনাস টিস্যু** (Sporogenous tissue) বর্তমান।

(5) রেণুধর কলার বাইরে দ্বিস্তরী **পোষক কলা বা টেপেটম** (Tapetum) বর্তমান।

(6) রেণুধর কলা বিভাজিত হ'য়ে অসংখ্য **রেণু মাতৃকোষ** (Spore mother cell) গঠন করে।



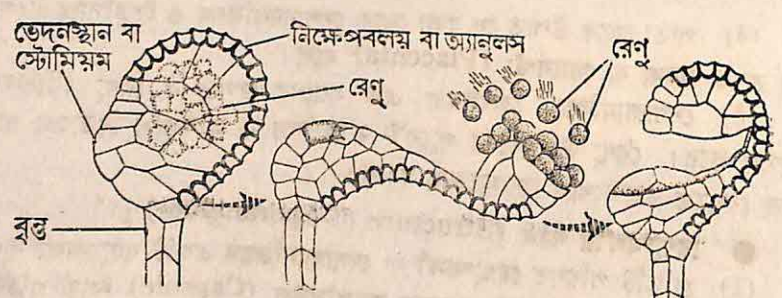
চিত্র 8·8—একটি পরিণত রেণুস্থলী বা স্পোরানজিয়ম।

(7) রেণু মাতৃকোষের প্রকৃতি ডিপ্লয়েড (2n) ; এগুলি মায়োসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হ'য়ে হ্যাপ্লয়েড (n) রেণু গঠন করে।

(8) রেণু একই প্রকার বলে ফার্নকে **সমরেণুপ্রসূ** বা **হোমোস্পোরাস** (Homosporous) উদ্ভিদ বলা হয়।

(9) রেণু উৎপাদনের সংগে সংগে যে বংশক্রম শুরু হয়, তাকে **গ্যামেটোফাইটিক জেনারেশন** বলে।

● **রেণুস্থলী বিদারণ** (Dehiscence of sporangium) : পরিণত রেণুস্থলী (চিত্র 8.8) বা স্পোর্যানজিয়মের **ভেদনস্থান** বা **স্টোমিয়ম** ফেটে গেলে **নিক্ষেপবলয়** বা **অ্যানুলস** স্প্রিং-এর মতো উল্টে গিয়ে রেণুগুলিকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয় (চিত্র 8.9)।



চিত্র 8·9—রেণুস্থলীর বিদারণ পদ্ধতি।

● **লিংগধর উদ্ভিদ বা গ্যামেটোফাইটের গঠন** (Formation of Gametophyte) :

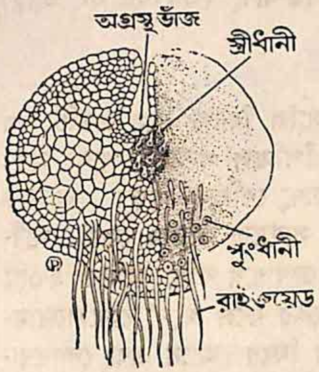
(1) উপযুক্ত সময়ে অংকুরিত হয়ে রেণু প্রথমে সূত্রাকার **প্রোটোনিমা** (Protonema) এবং পরে হৃৎপিণ্ড আকারের চ্যাপ্টা, সবুজ বর্ণের তাম্বুলাকার যে অংগ গঠন করে তাকে **প্রোথ্যালস** (Prothallus) (চিত্র 8.10) বলে।

(2) প্রোথ্যালসের সরু অংশের নিম্নতল থেকে প্রচুর রোম উৎপন্ন হয়। এই রোমগুলিকে **রাইজয়েড** (Rhizoid) বলে।

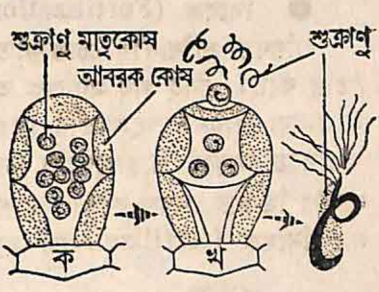
(3) রাইজয়েডের সাহায্যে প্রোথ্যালস মাটির সঙ্গে সংলগ্ন থাকে এবং সেখান থেকে খাদ্যও সংগ্রহ করে।

(4) রাইজয়েডের সাহায্যে মাটির রস শোষণ এবং নিজ দেহস্থ ক্লোরোফিলের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ চালাতে পারে বলে ফার্নের প্রোথ্যালস **স্বাধীন ও স্বাবলম্বী**।

● **যৌন জনন** (Sexual reproduction) : **জনন অঙ্গ** (Sex organs) :



চিত্র 8·10—ফার্নের প্রোথ্যালস।



চিত্র 8·11—পুংধানীর ও শুক্রাণুর গঠন।



চিত্র 8·12 : A—স্ত্রীধানীর গঠন ; B—নিষিক্ত ডিম্বাণু বা জাইগোট।

প্রোথ্যালসের নিম্নতলের নির্দিষ্ট স্থান থেকে জনন অঙ্গ উৎপন্ন হয়। জনন অঙ্গ দুপ্রকার। পুংজনন অঙ্গকে **পুংধানী** (Antheridium) এবং স্ত্রীজনন অঙ্গকে **স্ত্রীধানী** (Archegonium) বলে (চিত্র 8.11 ও 8.12)।

(a) **পুংধানী** (Antheridium) : রাইজয়েডগুলির মধ্যে প্রোথ্যালসের সরু অংশ ডিম্বাকার পুংধানী উৎপন্ন হয় (চিত্র 8.10)।

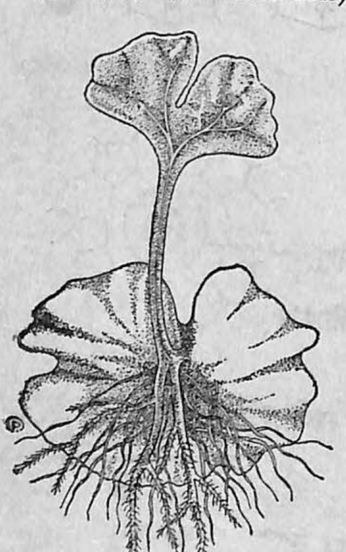
(b) **স্ত্রীধানী** (Archegonium) ঃ প্রোথ্যালসের অগ্রস্থ ভাঁজের সন্নিকটে স্ত্রীজনন অংগ, অর্থাৎ **স্ত্রীধানী** (Archegonium) উৎপন্ন হয় (চিত্র 8.10 ও 8.12)।

পুংধানীস্থ (চিত্র 8.11) **শুক্রাণু মাতৃকোষ** (Spermatozoid mother cell) থেকে ফ্ল্যাজেলাযুক্ত **শুক্রাণু** (Antherozoid or Spermatozoid) গঠিত হয়।

স্ত্রীধানীর অংক অংশ স্থূল গোলাকার এবং গ্রীবা অংশ লম্বা চোঙাকার (চিত্র 8.12)। গোলাকার নিম্নাংশের ভিতরে **ডিম্বাণু** (Ovum or Egg) উৎপন্ন হয়।

● **নিষেক** (Fertilization) ঃ

পরিণত স্ত্রীধানীর চোঙাকৃতি অংশের কোষগুলি বিনষ্ট হয়ে একটি পথ তৈরি করে। সেই পথ ম্যালিক অ্যাসিড জাতীয় পিচ্ছিল পদার্থে পূর্ণ হয়। ইতিমধ্যে পরিণত পুংধানীর দেওয়াল ফেটে শুক্রাণু বেরিয়ে পড়ে। ম্যালিক অ্যাসিডে আকৃষ্ট শুক্রাণুগুলি তাদের ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে সাঁতার কেটে স্ত্রী-ধানীর ভিতরে প্রবেশ করে। এদের মধ্যে একটি ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হওয়া মাত্র **নিষেক** (fertilization) ঘটে যায়। নিষেকের ফলে পূর্ণ ক্রোমোজোম-সংখ্যা আবার ফিরে আসে এবং স্পোরো-ফাইটিক জেনারেশন আবার শুরু হয়।



চিত্র 8·13—ফার্নের শিশু স্পোরোফাইট।

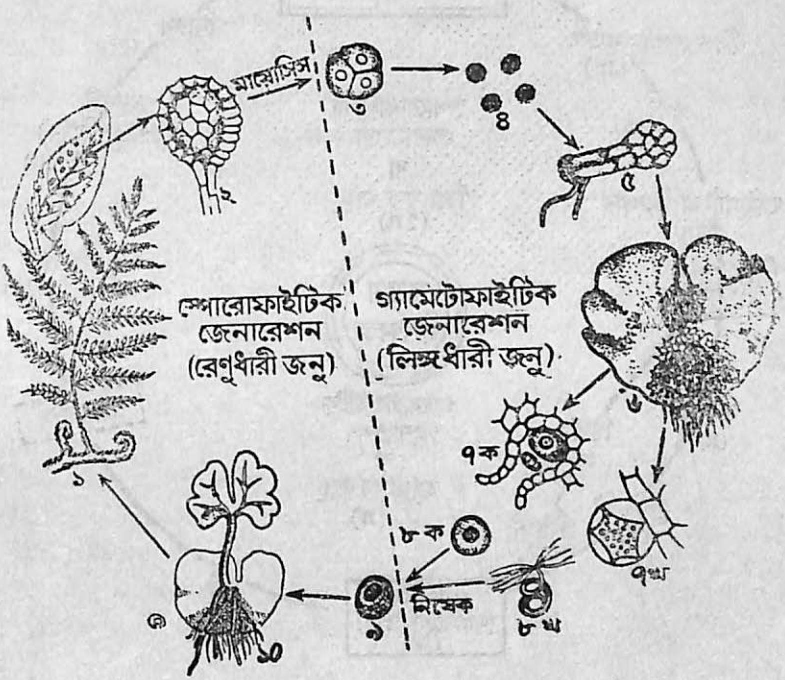
● **নতুন রেণুধর উদ্ভিদ বা স্পোরো-ফাইটের উৎপত্তি** (Formation of new sporophyte) ঃ

নিষিক্ত ডিম্বাণু প্রাকারবদ্ধ হয়ে **জাই-গোট** বা **উস্পোর** (Zygote or Oospore) গঠন করে। বারবার বিভাজিত হয়ে জাইগোট থেকে বহুকোষী **ভ্রূণ** (Embryo) এবং ভ্রূণ থেকে ক্রমশঃ **শিশু স্পোরোফাইট** (চিত্র 8.13) জন্মায়। **শিশু** স্পোরোফাইট ক্রমশঃ পরিণত পূর্ণাঙ্গ ফার্নে রূপান্তরিত হয়। পরিণত গাছ পুনরায় একই পদ্ধতিতে জীবনযাপন শুরু করে।

(iv) **জনুক্রম** (Alternation of generation) ঃ ফার্ন গাছের জীবনচক্র (চিত্র 8.14) দুটি বিভিন্ন **বংশক্রমের** (generation) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এক বংশক্রমের কাজ শেষ হলেই, অপর বংশক্রম শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে দুই

বংশক্রমের আবির্ভাবকে বলে জনুক্রম (Alternation of generation)। **ফার্ন গাছের জীবনচক্রেও তাই সুস্পষ্ট জনুক্রম বর্তমান।**

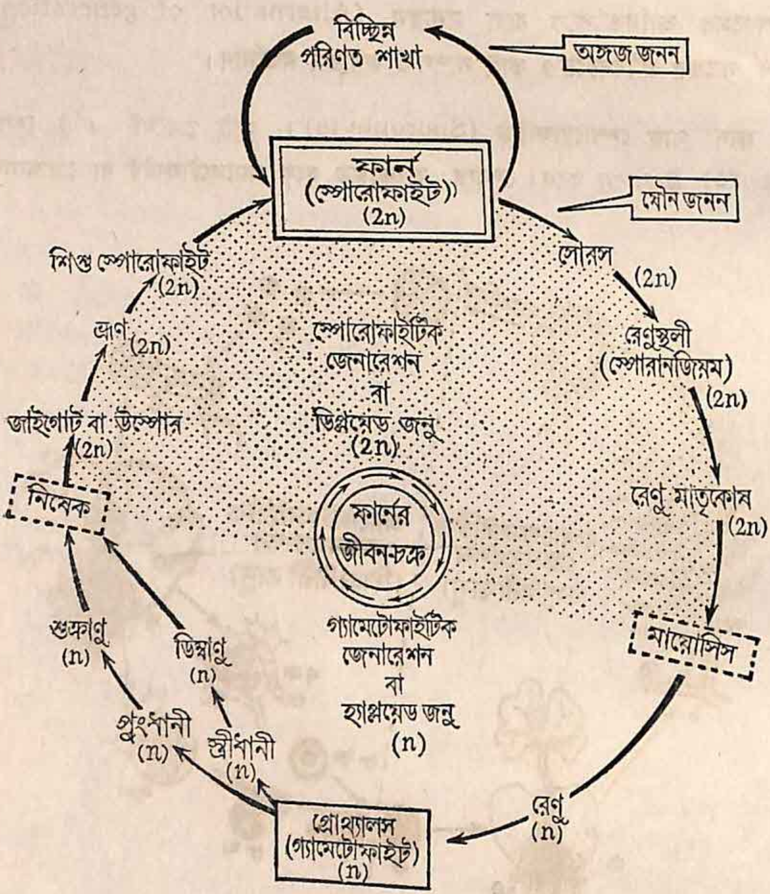
ফার্ন গাছ স্পোরোফাইট (Sporophyte)। তাই প্রথমেই এটি স্পোর (Spore) উৎপাদন করে। **স্পোর অঙ্কুরিত হয়ে গ্যামেটোফাইট বা প্রোথ্যালস**



চিত্র 8·14—ফার্নের জীবনচক্র ও জনুক্রম ঃ ১—ফার্ন গাছ ; ২—বিবর্ধিত স্পোর‍্যানজিয়ম ; ৩—স্পোর টেট্রাড ; ৪—স্পোর বা রেণু ; ৫—অঙ্কুরিত স্পোর ; ৬—প্রোথ্যালস ; ৭ক—স্ত্রীধানী ; ৭খ—পুংধানী ; ৮ক—ডিম্বাণু ; ৮খ—শুক্রাণু ; ৯—জাইগোট ; ১০—শিশু স্পোরোফাইট।

গঠন করে। গ্যামেটোফাইট স্পোরোফাইটের অর্ধসংখ্যক (n) ক্রোমোজোম বহন করে।

প্রোথ্যালসে সৃষ্ট পুংধানী ও স্ত্রীধানী থেকে যথাক্রমে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গঠিত হয়। উভয়ের মিলনে ($n+n$) উৎপন্ন জাইগোটে পূর্ণসংখ্যক ক্রোমোজোম ($2n$) ফিরে আসে। জাইগোট থেকে নতুন স্পোরোফাইট গঠিত হয়। অর্থাৎ ফার্নের জীবনে সুস্পষ্ট জনুক্রম বিদ্যমান।



চিত্র 8.15—ফার্নের জীবনচক্র ও জনুক্রম।

8.4. মস [*Moss*] :

(i) **বিজ্ঞানসম্মত নাম** (Scientific name) ঃ **পোগোনেটম** (*Pogonatum*)।

(ii) **উদ্ভিদজগতে স্থান** (Systematic position) ঃ মস **ব্রায়োফাইটার** অন্তর্ভুক্ত **অপুষ্পক উদ্ভিদ।**

(iii) **বসতি** (Habitat) ঃ বর্ষাকালে আর্দ্র স্থানে, স্যাঁতস্যাঁতে ভাঙা-চোরা প্রাচীরে, ছাদের কার্নিশে, এমনকি জলসিক্ত কাঠের গুঁড়ির ফাটলে ফাটলে প্রচুর পরিমাণে মস জন্মায়।

(iv) **মসের বহির্গঠন** (External structure of moss) ঃ

(a) মসের দেহটি **লিঙ্গধর উদ্ভিদ** বা **গ্যামেটোফাইট** (Gametophyte) নামে পরিচিত।

● **লিঙ্গধর উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য :**

(1) মসের লিঙ্গধর উদ্ভিদ বা গ্যামেটোফাইট প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত—**প্রোটোনিমা** (Protonema) ও **গ্যামেটোফোর** (Gametophore)।

(2) প্রোটোনিমা শায়িত, শাখায়িত ও সূত্রাকার অংশ।

(3) **গ্যামেটোফোর** প্রোটোনিমার পার্শ্বমুকুল থেকে উৎপন্ন ঋজু, উল্লম্ব পত্রবিশিষ্ট অংশবিশেষ। পরিণত গ্যামোটোফোর প্রোটোনিমা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পূর্ণাঙ্গ লিঙ্গধর উদ্ভিদ গঠন করে।

(4) গ্যামেটোফোরের নিম্নাংশ থেকে অসংখ্য সুতোর মতো বহুকোষী **রাইজয়েড** (Rhizoid) জন্মায়। রাইজয়েডগুলি গ্যামেটোফোরকে মাটির সঙ্গে সংলগ্ন থাকতে এবং মাটি থেকে রস শোষণ করতে সাহায্য করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য **মসের দেহে প্রকৃত মূল থাকে না**, রাইজয়েডগুলিই মূলের বিকল্প হিসাবে কাজ করে।

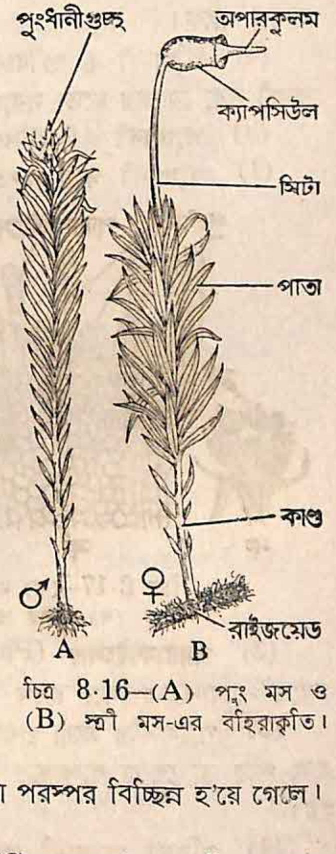
(5) খাড়া সরু গ্যামেটোফোর থেকে একাধিক শাখা উৎপন্ন হতে পারে।

(6) গ্যামোটোফোরে সর্পিলভাবে (spirally) বিন্যস্ত প্রচুর পাতা জন্মায়।

(7) সরল অবৃন্তক পাতাগুলি **ভল্লাকার** বা **রেখাকার**।

(8) পাতার **মধ্যশিরা অত্যন্ত দৃঢ়** ও **প্রশস্ত**।

(9) মধ্যশিরা ফলকের সীমানা ছাড়িয়ে সামনের দিকে প্রসারিত। কাণ্ডের নিম্নাংশ থেকে অসংখ্য সুতোর মতো বহুকোষী **রাইজয়েড** জন্মায়।



চিত্র 8.16—(A) পুং মস ও (B) স্ত্রী মস-এর বহিরাকৃতি।

● **মসের জনন** (Reproduction of moss) : মস **সহবাসী*** (Monoecious) (যথা—ফিউনারিয়া) বা **ভিন্নবাসী** (Dioecious) **উদ্ভিদ** (যথা—পলিট্রিকম) (চিত্র 8.16)।

মস অঙ্গজ (Vegetative) এবং **যৌন** (Sexual) পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন করে।

(A) **মসের অঙ্গজ জনন** (Vegetative reproduction of moss) :

(1) প্রোটোনিমা থেকে উৎপন্ন একাধিক শাখা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলে। সেগুলি থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়।

(2) প্রোটোনিমার আগায় কোষগুলি গেমি (Gemmae)-তে পরিণত হ'লে

* অর্থাৎ একই দেহে পুংধানী ও স্ত্রীধানী উৎপন্ন হয়।

নীচের ছকে ভুট্টাবীজের গঠন দেখান হল :

ভুট্টা বীজ
- অন্তর্বীজ
  - ভ্রূণ
    - বীজপত্র (স্কুটেলম)
    - ভ্রূণাক্ষ
      - ভ্রূণমুকুল (কলিওপটাইলে ঢাকা)
      - ভ্রূণমূল (কলিওরাইজায় ঢাকা)
  - সস্য
- সংযুক্ত বীজত্বক ও ফলত্বক

15.5. অঙ্কুরোদ্গম [*Germination*] :

● **অংকুরোদ্গমের সংজ্ঞা** (Definition of germination) : **অনুকূল পরিবেশে সুপ্ত ভ্রূণ যে প্রক্রিয়ায় জেগে উঠে কর্মক্ষম হয় এবং বৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ করে তাকে অংকুরোদ্গম বলে।**

অংকুরোদ্গম প্রধানত দু'প্রকার :—

(1) **মৃদ্‌বর্তী** বা **হাইপোজিয়াল** (Hypogeal)।

(2) **মৃদ্‌ভেদী** বা **এপিজিয়াল** (Epigeal)।

(1) **মৃদ্‌বর্তী অংকুরোদ্গম** বা **হাইপোজিয়াল জারমিনেসান** (Hypogeal germination) :

এই পদ্ধতিতে বীজপত্র বীজত্বকেই আবদ্ধ থাকে—কখনই মাটি ছেড়ে উপরে উঠে আসে না। অর্থাৎ মাটিতে বীজটিকে যে স্থানে পোঁতা হয়, সেই অবস্থানের কোন পরিবর্তন ঘটে না। কারণ এক্ষেত্রে **বীজপত্রাধিকাণ্ড** বা **এপিকোটিল** (Epicotyl) ভ্রূণমুকুলসহ এত দ্রুত বেড়ে ওঠে যে বীজটি উপরে উঠে আসার সুযোগ পায় না।

উদাহরণ—**মটর, ছোলা, আম, গম, ধান, ভুট্টা** ইত্যাদি।

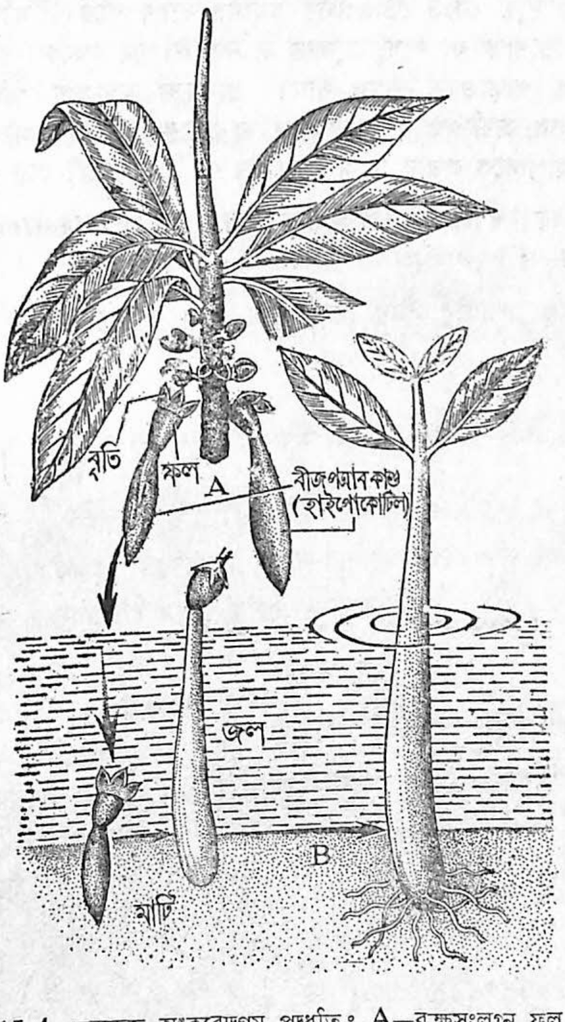
(2) **মৃদ্‌ভেদী অংকুরোদ্গম** বা **এপিজিয়াল জারমিনেসান** (Epigeal germination) :

এই পদ্ধতিতে বীজপত্র বীজত্বককে ফাটিয়ে মাটি ছেড়ে উপরে উঠে আসে। অর্থাৎ বীজটিকে মাটিতে যে অবস্থাতে পোঁতা হয়, বীজের সেই অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। কারণ এক্ষেত্রে **বীজপত্রাবকাণ্ড** বা **হাইপোকোটিল**

(Hypocotyl) এপিকোটিলের চেয়ে অধিক দ্রুততায় এমনভাবে বেড়ে ওঠে যাতে বীজপত্রকে ঠেলে উপরে উঠিয়ে দেয়।

উদাহরণ—তেঁতুল, কুমড়ো, রেড়ি, পেঁয়াজ ইত্যাদি।

● **বিশেষ ধরনের অংকুরোদ্গম** (Special type of germination) অর্থাৎ **জরায়ুজ অংকুরোদ্গম** বা **ভিভিপেরী** (Vivipary or Viviparous



চিত্র 15·4—জরায়ুজ অংকুরোদ্গম পদ্ধতিঃ A—বৃক্ষসংলগ্ন ফল ; B—অংকুরোদ্গম বিভিন্ন পর্যায়।

germination) (চিত্র 15.4A) ঃ প্রধানত লবণাম্বু বা **হ্যালোফাইট** (Halophyte) উদ্ভিদে এই জাতীয় অংকুরোদ্গম দেখা যায়। সুন্দরবন অঞ্চলে নদী মোহনায় মাটিতে লবণের পরিমাণ স্বভাবতই বেশী। তাছাড়া, জোয়ারের জলে

উপযুক্ত সময়ে তা থেকে নতুন প্রোটোনিমা সৃষ্টি হয়। সেই প্রোটোনিমা নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়।

(3) কখনও কখনও **স্পোরোগোনিয়ম** (Sporogonium) সরাসরি প্রোটোনিমা উৎপাদন দ্বারা অঙ্গজ জননে সাহায্য করে।

(B) **মসের যৌন জনন** (Sexual reproduction of moss) ঃ

(1) **সহবাসী পরিণত মসের ক্ষেত্রে** একই লিঙ্গধর উদ্ভিদের গ্যামেটোফোরের আগায় **পুংধানী** (Antheridium) ও **স্ত্রীধানী** (Archegonium) গঠিত হয়। তবে **ভিন্নবাসী** পরিণত মসের ক্ষেত্রে পুংধানী ও স্ত্রীধানী পৃথক পৃথক লিঙ্গধর উদ্ভিদের গ্যামেটোফোরের আগায় জন্মায়।

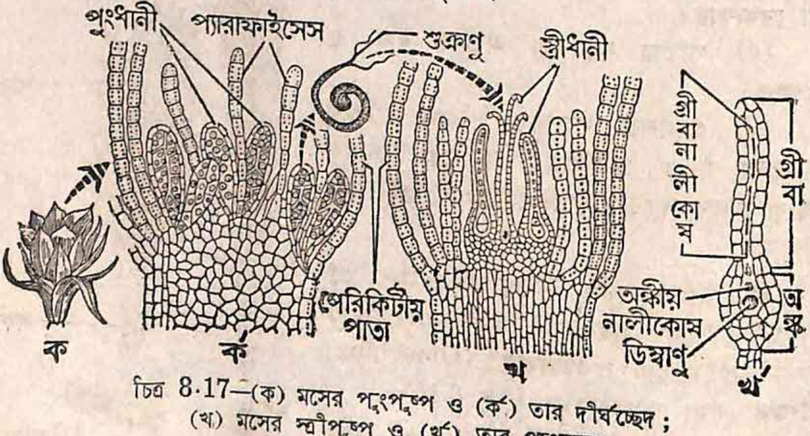
(2) পুংধানীগুলি একত্রে **পুংধানীগুচ্ছ** এবং স্ত্রীধানীগুলি একত্রে **স্ত্রীধানীগুচ্ছ** গঠন করে।

(3) গ্যামেটোফোরের ঈষৎ প্রসারিত আগায় গুচ্ছাকারে অবস্থিত পুংধানী ও স্ত্রীধানীগুলি পিঙ্গল বর্ণের **পেরিকিটীয়** পাতায় (Perichaetial leaves) আবৃত থাকে।

(4) পুংধানী ও স্ত্রীধানীগুলি বিশেষ এক ধরনের গদাকৃতি এবং বহুকোষী সরু রোমের মতো সবুজ বন্ধ্যা অঙ্গ দ্বারা পরিবৃত থাকে।

(a) **পুংধানী** (Antheridium) ঃ

(1) পুংধানী ক্ষুদ্র বৃন্তযুক্ত ও গদাকৃতি।



চিত্র 8.17—(ক) মসের পুংপুষ্প ও (ক') তার দীর্ঘচ্ছেদ ;
(খ) মসের স্ত্রীপুষ্প ও (খ') তার প্রস্থচ্ছেদ।

(2) **প্যারাফাইসেস** (Paraphyses) ও পেরিকিটীয় পাতাগুলি একযোগে পুংধানীকে ঘিরে রাখে (চিত্র 8.17ক)।

(3) পুংধানীর মধ্যে প্রথমে **শুক্রাণু-মাতৃকোষ** (Sperm mother cell) এবং পরে তা থেকে শুঙ্গযুক্ত (Flagellate) **শুক্রাণু** (চিত্র 8.17ক') উৎপন্ন হয়।

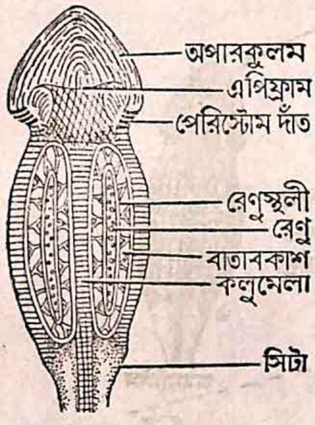
(4) পরিণত পুংধানী ফেটে গেলে দ্বিফ্ল্যাজেলাযুক্ত শুক্রাণু বাইরে আসে এবং সন্নিহিত আবদ্ধ জলে সাঁতার কাটতে থাকে।

(b) **স্ত্রীধানী** (Archegonium) ঃ

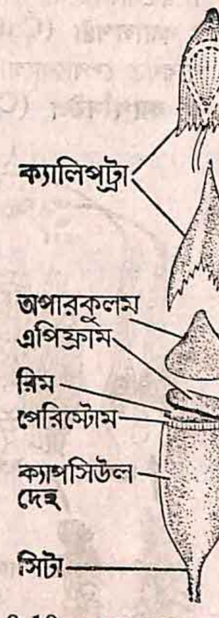
(1) অন্য শাখার আগায় একইভাবে স্ত্রীধানী পরিণত হতে থাকে (চিত্র 8.17খ)।

(2) ক্ষুদ্র বৃন্তযুক্ত স্ত্রীধানী দেখতে **ফ্লাস্কের মতো** (চিত্র 8.17খ´)।

(3) বৃন্তের উপরে স্ফীত অংশের নাম **অঙ্ক** (Venter) এবং নলাকার অংশের নাম **গ্রীবা** (Neck)।



চিত্র 8·18—স্পোরোগোনিয়ম বা স্পোরোফাইটের দীর্ঘচ্ছেদ।



চিত্র 8·19—মসের স্পোরোগোনিয়ম বা স্পোরোফাইটের বহির্গঠন।

(4) অঙ্কের ভিতরে নালীকোষ ছাড়াও নীচের দিকে একটি **ডিম্বাণু** থাকে।

(c) **নিষেক** (Fertilization) ঃ

(1) স্ত্রীধানী পরিণত হলে গ্রীবা নালীকোষ ও অঙ্কের অতিরিক্ত কোষগুলি দ্রবীভূত হয়ে একটি নালীপথ গঠন করে।

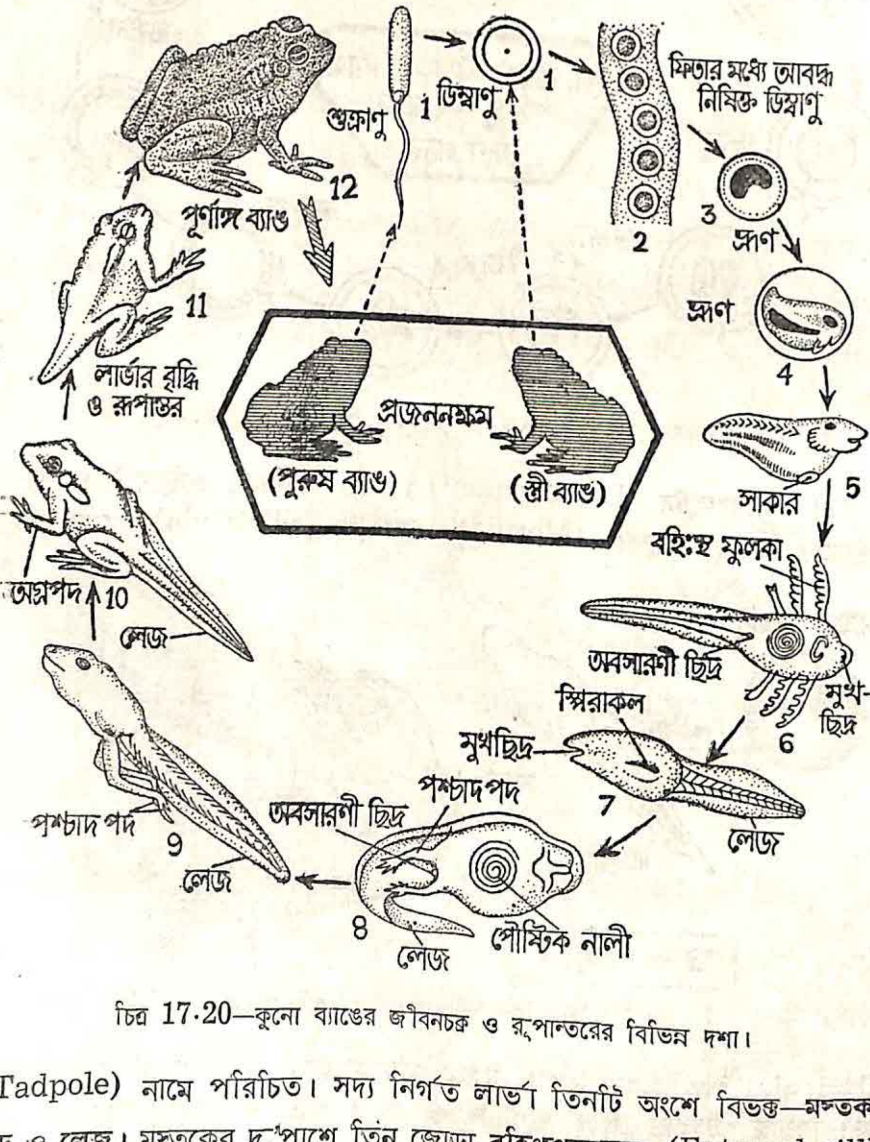
(2) দ্রাক্ষাশর্করা ও মিউসিলেজপূর্ণ ঐ পথে আকৃষ্ট হয়ে শুক্রাণু সাঁতার কেটে প্রথমে গ্রীবা ও পরে অঙ্কে প্রবেশ করে এবং যথাসময়ে শুক্রাণু ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে।

(3) নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে **জাইগোট** গঠিত হয়।

(4) জাইগোটে ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিপ্লয়েড (2n) বা **স্পোরোফাইটিক জেনারেশন** শুরু হয়।

ভ্রূণ ক্রমশঃ লার্ভা গঠন করে। ভ্রূণের পরবর্তী যে দশায় অপত্যগুলি আকার, গঠন, স্বভাব, শ্বসন, খাদ্য গ্রহণ, গমন ইত্যাদি ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা, আত্মরক্ষা, খাদ্য গ্রহণ সম্ভব হয় তাকে লার্ভা বলে।

(3) **লার্ভা নির্গমন** (Hatching) ঃ জাইগোটের আবরণী বিদীর্ণ ক'রে প্রায় দু' সপ্তাহ পরে লার্ভা বেরিয়ে আসে। ব্যাঙের লার্ভা **ব্যাঙাচি বা ট্যাডপোল**



চিত্র 17·20—কুনো ব্যাঙের জীবনচক্র ও রূপান্তরের বিভিন্ন দশা।

(Tadpole) নামে পরিচিত। সদ্য নির্গত লার্ভা তিনটি অংশে বিভক্ত—**মস্তক, ধড় ও লেজ**। মস্তকের দু'পাশে তিন জোড়া **বহিঃস্থফুলকা** (External gill)

বর্তমান। ব্যাঙাচি তার **চোষক** (Sucker)-এর সাহায্যে এই সময় জলজ উদ্ভিদের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। বহিঃস্থফুলকা শ্বাসকার্যে সহায়তা করে। **ব্যাঙাচি-দশায় মুখ বা চোখ থাকে না।**

(4) **লার্ভার বৃদ্ধি** (Development of tadpole) ঃ কিছুদিনের মধ্যেই চোষকের সন্নিকটে মুখছিদ্রের আবির্ভাব ঘটে। দুটি গুটিকাযুক্ত শক্ত চোয়ালে মুখছিদ্র আবদ্ধ থাকে। এই সময় লেজের দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধি ঘটে। নব আবির্ভূত পৌষ্টিকনালী কুন্ডলী পাকিয়ে থাকে। জলজ উদ্ভিদ ও কীট-পতঙ্গ খেয়ে ব্যাঙাচি বৃদ্ধি পায় এবং প্রথমে পশ্চাৎপদ ও পরে অগ্রপদের আবির্ভাব ঘটে। ক্রমশঃ বহিঃস্থফুলকা অবলুপ্ত হ'য়ে অন্তঃস্থফুলকা আবির্ভূত হয়।

● রূপান্তর (Metamorphosis) ঃ **যে অস্বাভাবিক কিন্তু ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে লার্ভা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর দেহাবয়ব লাভ করে তাকে রূপান্তর বলে।**

এই সময় গুটিকাযুক্ত শক্ত চোয়ালের পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের মতো চোয়াল গঠিত হয়। ইতিমধ্যে পৌষ্টিকনালীর কুন্ডলী খুলে অন্ত্র স্বাভাবিক আকৃতি লাভ করে। অন্তঃস্থফুলকার পরিবর্তে ক্রমশঃ ফুসফুসের আবির্ভাব ঘটে। **বাইরে থেকে খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করার ফলে লেজে সঞ্চিত খাদ্য পুষ্টি যোগায় এবং লেজটি ক্রমশঃ ছোট হ'য়ে আসে এবং একসময় অবলুপ্ত হয়।** এই অবস্থায় জীবটি ক্ষুদ্রাকৃতি হ'লেও পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের রূপ পরিগ্রহ করে। ক্ষুদ্রাকৃতি পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙটি এবার জল ছেড়ে ডাঙ্গায় ওঠে আসতে থাকে। ব্যাঙের রূপান্তর ঘটতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে।

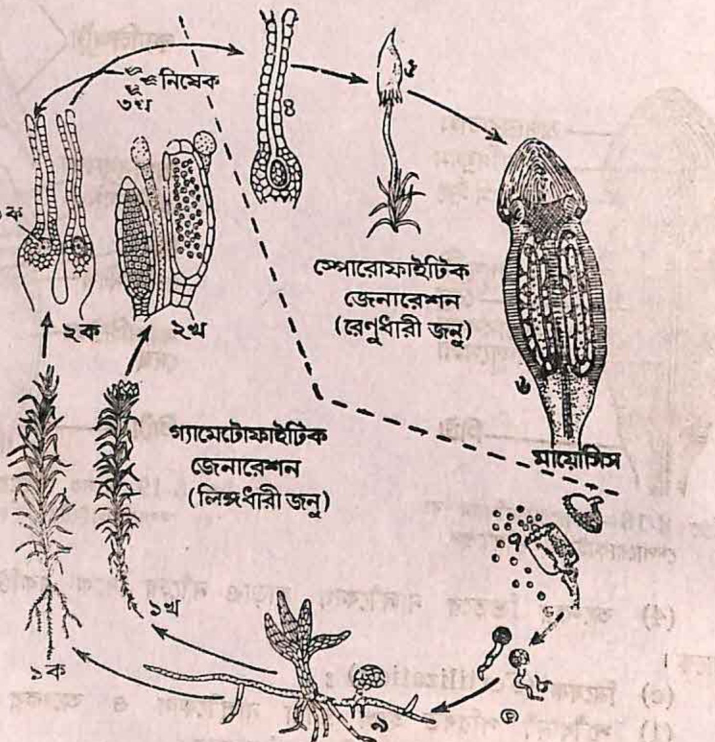
(d) **মসের রেণুধর উদ্ভিদ বা স্পোরোফাইট গঠন** (Formation of Sporophyte of Moss) ঃ

(1) জাইগোট ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে একটি বিশেষ দণ্ডাকার অঙ্গ গঠিত হয়। এই অঙ্গটিকে **স্পোরোগোনিয়ম বা স্পোরোফাইট** (চিত্র 8.20৫) বলে।

(2) স্পোরোগোনিয়ম দ্রুত বাড়তে থাকে।

(3) এক সময়ে স্ত্রীধানীর আগাটি ছিঁড়ে উপরে উঠে যায়। ছেঁড়া অংশটি পরিণত স্পোরোগোনিয়মের (চিত্র 8.19) আগাকে আংশিকভাবে ঢেকে রাখে। ঐ আচ্ছাদনকেই **ক্যালিপট্রা** (Calyptra) বলে।

(4) পরিণত স্পোরোগোনিয়মের তিনটি অংশ, যথা—**পদ** (Foot), **সিটা** (Seta) এবং **ক্যাপসিউল** (Capsule)।



চিত্র 8·20—মস ও তার জনক্রম ঃ ১ক—পূর্ণাঙ্গ পুং মস ; ১খ—পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী মস ; ২ক—স্ত্রীধানী ; ২খ—পুংধানী ; ৩ক—ডিম্বাণু ; ৩খ—শুক্রাণু ; ৪—জাইগোটসহ স্ত্রীধানী ; ৫—অগ্রভাগে ক্যালিপট্রাসহ স্পোরোগোনিয়ম ; ৬—পরিণত স্পোরোগোনিয়ম ; ৭—ক্যাপসিউল থেকে রেণু ছড়িয়ে পড়ছে ; ৮—অঙ্কুরিত রেণু ; ৯—মুকুলসহ প্রোটোনিমা।

(5) থলির মতো অংশটি **ক্যাপসিউল** (Capsule), থলির নীচের বৃন্তটি **সিটা** (Seta) এবং গ্যামেটোফাইট ও স্পোরোগোনিয়মের সংযোগ স্থলটি **পদ** (Foot)।

(6) ক্যাপসিউলের ঢাকনাটি **অপারকুলম** (Operculum)।

(7) ক্যাপসিউলে **কলুমেলা** (Columella) নামে একটি বন্ধ্যা কলাকে ঘিরে বাতাবকাশ আছে।

(8) বাতাবকাশ ঘেরা মধ্যস্থলে **রেণুস্থলী** (চিত্র 8.18) গঠিত হয়।

(9) **রেণুস্থলীতে** প্রথমে **রেণুধারণ কলা** (Sporogenous tissue) ও পরে তা থেকে **রেণুমাতৃকোষ** (2n) গঠিত হয়।

(10) **হ্রাসকরণ বিভাজন** বা মায়োসিসের ফলে **প্রতিটি রেণুমাতৃকোষ থেকে চারটি করে রেণু** (n) (চিত্র 8.18) **উৎপন্ন হয়** এবং প্রত্যেক রেণুতে অর্ধসংখ্যক ক্রোমোজোম আসে।

(11) সেই কারণে রেণু থেকেই **গ্যামেটোফাইটিক জেনারেশন** শুরু হয়।

(12) ক্যাপসিউলে অসংখ্য রেণুমাতৃকোষ থাকায় অগণিত রেণু উৎপন্ন হয়।

(e) **রেণুর বিস্তার** (Dispersal of Spores) ঃ

(1) পরিণত রেণুগুলি ক্যাপসিউলের মাথায় অবস্থিত **পেরিস্টোম দাঁত** (Peristome teeth)-এর বিশেষ চলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্যাপসিউল থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

(f) **নতুন লিঙ্গধর উদ্ভিদ সৃষ্টি** (Formation of new gametophyte) ঃ

(1) মসের রেণুগুলি লিঙ্গধর উদ্ভিদ সৃষ্টিকারী প্রথম কোষ।

(2) অনুকূল পরিবেশে রেণু (n) অঙ্কুরিত হ'য়ে বহু শাখা-প্রশাখা-যুক্ত সুতোর মতো বিশেষ অঙ্গ অর্থাৎ **প্রোটোনিমা** (Protonema) গঠন করে (চিত্র 8.20৯)।

(3) প্রোটোনিমার উপরে উৎপন্ন মুকুল ক্রমশঃ পূর্ণাঙ্গ মসে রূপান্তরিত হয়।

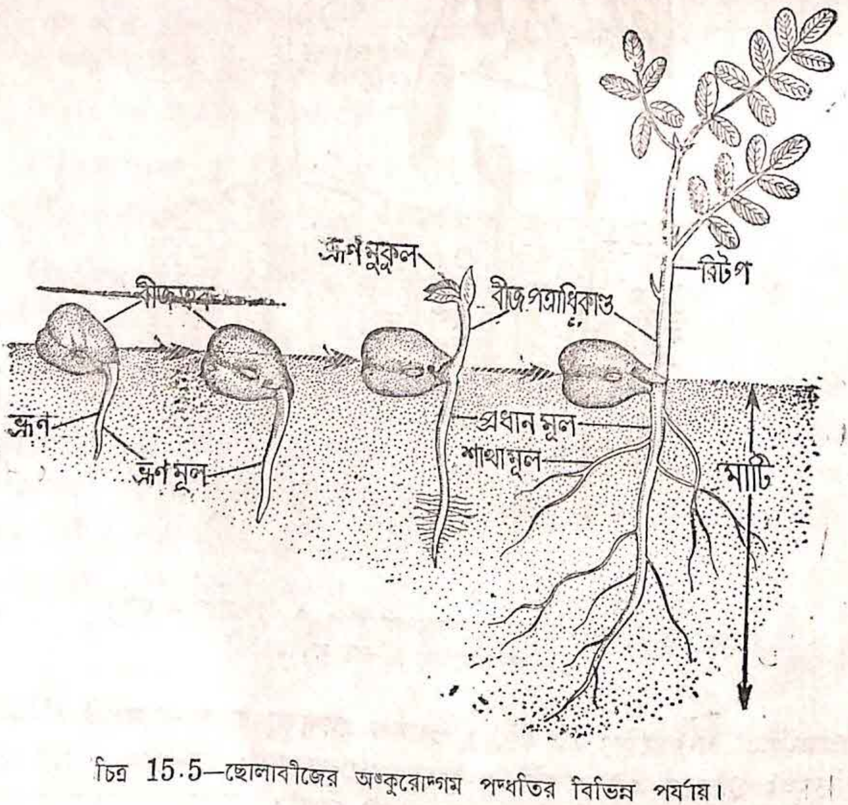
(4) এইভাবে জীবনচক্রের একটিমাত্র আবর্তনেই অসংখ্য মস জন্মায়।

(v) **মসের জীবনচক্র** (Life cycle of moss) এবং **জনুক্রম** (Alternation of Generation) ঃ মসের জীবনচক্রে **স্পষ্টতঃ জনুক্রম বিদ্যমান।** মসের গ্যামেটোফাইট স্বাবলম্বী এবং দীর্ঘস্থায়ী। এটি **হ্যাপ্লয়েড** (n) বা **লিঙ্গধর**

ঐ জমি বার বার ডুবে যায় এবং জোয়ার ভাটার টানে বীজ ভেসে যেতে পারে। এই অবস্থায় মাটিতে স্বাভাবিক অংকুরোদ্গম সম্ভব নয়। তাই এই সব অসুবিধার মোকাবিলা করার জন্য **গরান, কেওড়া** প্রভৃতি গাছের বীজ গাছে সংলগ্ন থাকাকালীন ফলের মধ্যেই অঙ্কুরিত হতে সুরু করে। ভ্রূণমূল দ্রুত বাড়তে বাড়তে ফলত্বক ভেদ ক'রে খাড়াভাবে নীচের দিকে নেমে আসতে থাকে। ইতিমধ্যে বীজপত্রাবকাণ্ড দ্রুত বেড়ে ভোজালির আকার ধারণ করে। বীজপত্রাবকাণ্ডের ভারে ফলসহ ভ্রূণাক্ষ বা শুধু ভ্রূণাক্ষ জনিতৃ উদ্ভিদ থেকে খসে পড়ে এবং নীচের কাদায় খাড়াভাবে গেঁথে যায়। ভ্রূণমূল মূলতন্ত্র গঠন করে এবং জলতলের উপরে অবস্থিত ভ্রূণমুকুল বৃদ্ধি পেয়ে বিটপতন্ত্র গঠন করে। এই ধরনের অংকুরোদ্গমকে জরায়ুজ অংকুরোদ্গম বা ভিভিপেরী বলা হয়।

15.6. ছোলা বীজের অঙ্কুরোদ্গম [*Germination of a Gram seed*] :

(1) অংকুরোদ্গমের সময় ডিম্বকরন্ধ্র পথে জল শোষণ ক'রে ছোলাবীজ ফুলে ওঠে।



চিত্র 15·5—ছোলাবীজের অংকুরোদ্গম পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়।

(2) এতে ডিম্বকরন্ধ্রের নিকটে বীজত্বক ফেটে যায় এবং সাদা ভ্রূণমূল বেরিয়ে আসে।

(3) ভ্রূণমূল ক্রমশঃ মাটির মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রধানমূল গঠন করে।

(4) প্রধানমূল ক্রমশ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে মূলতন্ত্রে পরিণত হয়।

(5) ইতিমধ্যে ভ্রূণাক্ষের বীজপত্রাধিকান্ড হুকের আকারে বেরিয়ে আসে এবং ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

(6) ভ্রূণাক্ষের অগ্রভাগটি ভ্রূণমুকুল। ভ্রূণমুকুল বিটপ গঠন করে।

(7) বীজপত্রাধিকান্ড দ্রুত বাড়তে থাকে এবং কান্ডকে মাটির উপরে উঠিয়ে দেয়।

(8) বীজপত্র থেকে সঞ্চিত খাদ্য সংগ্রহ করে চারাগাছ ক্রমশঃ পরিণত হয় (চিত্র 15.5)।

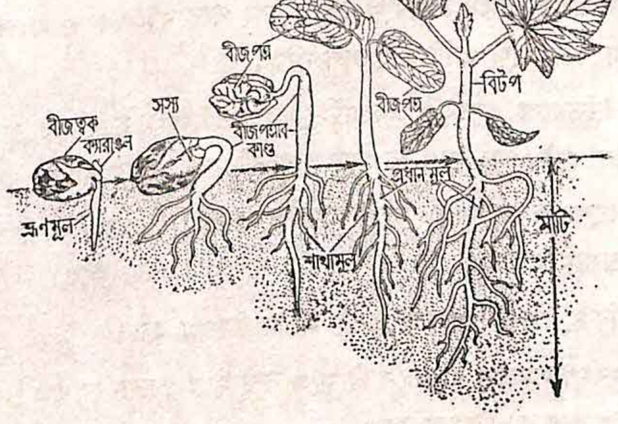
(9) এই অংকুরোদ্গম পদ্ধতিতে বীজপত্র বীজত্বকের মধ্যেই থেকে যায়। বীজপত্র বা বীজ কোন অবস্থাতেই মাটির উপরে উঠে আসে না। অর্থাৎ বীজ বপনের পরেও বীজের অবস্থানের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না। এই জাতীয় অংকুরোদ্গম পদ্ধতিকে **মৃদ্বর্তী** (Hypogeal) অংকুরোদ্গম বলে (চিত্র 15.5)।

15.7. রেড়ি বীজের অঙ্কুরোদ্গম [*Germination of a Castor seed*] :

(1) অংকুরোদ্গমের সময় রেড়ি বীজ যথারীতি জল শোষণ করে।

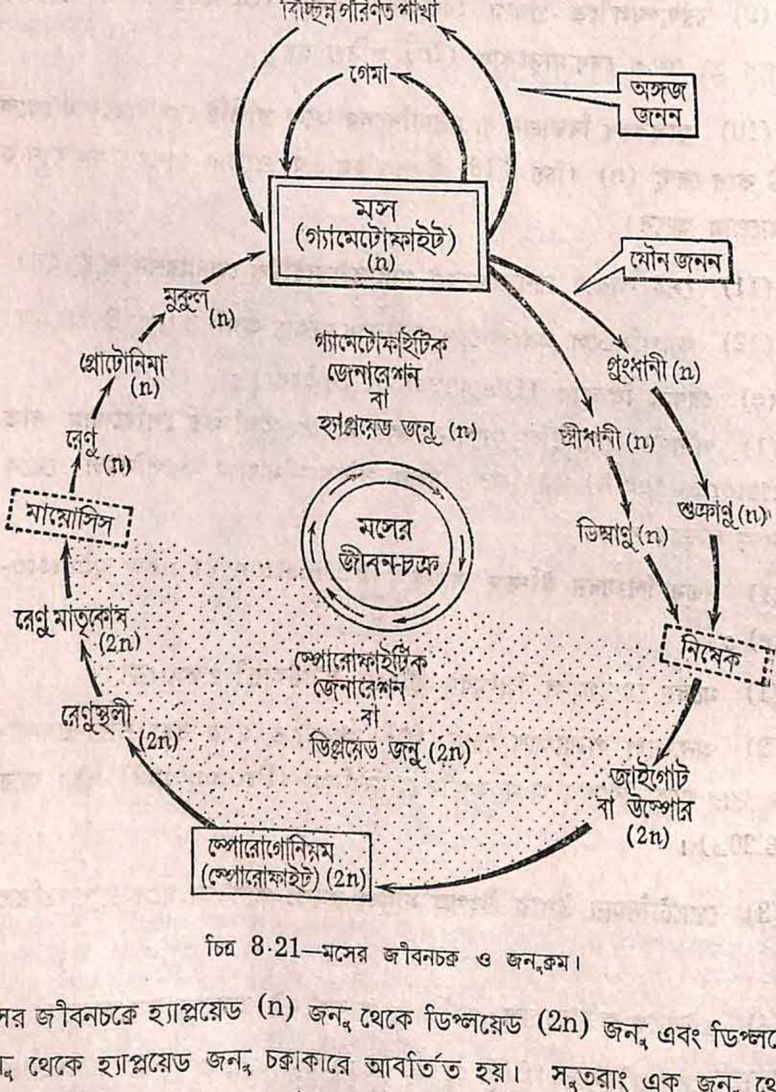
(2) অংকুরোদ্গমের প্রারম্ভেই ক্যারাংকলের নিকট বীজত্বক ফেটে যায়।

(3) তখন ভ্রূণমূলটি সবার আগে বেরিয়ে আসে।



চিত্র 15·6—রেড়ি বীজের অংকুরোদ্গমের পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়।

জনু। যৌন জননের ফলে **ডিপ্লয়েড** (2n) বা স্পোরোফাইটিক বা রেণুধর জনুর সূত্রপাত হয়। এক্ষেত্রে জাইগোট থেকে স্পোরোফাইটিক জেনারেশন শুরু হয়। আবার স্পোর বা রেণু (n) উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার পরি-সমাপ্তি ঘটে এবং পুনরায় গ্যামেটোফাইটিক জেনারেশন ফিরে আসে। অর্থাৎ



চিত্র 8·21—মসের জীবনচক্র ও জনুক্রম।

মসের জীবনচক্রে হ্যাপ্লয়েড (n) জনু থেকে ডিপ্লয়েড (2n) জনু এবং ডিপ্লয়েড জনু থেকে হ্যাপ্লয়েড জনু চক্রাকারে আবর্তিত হয়। সুতরাং এক জনু থেকে অন্য জনুতে পর্যায়ক্রমে আবর্তন মসের জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

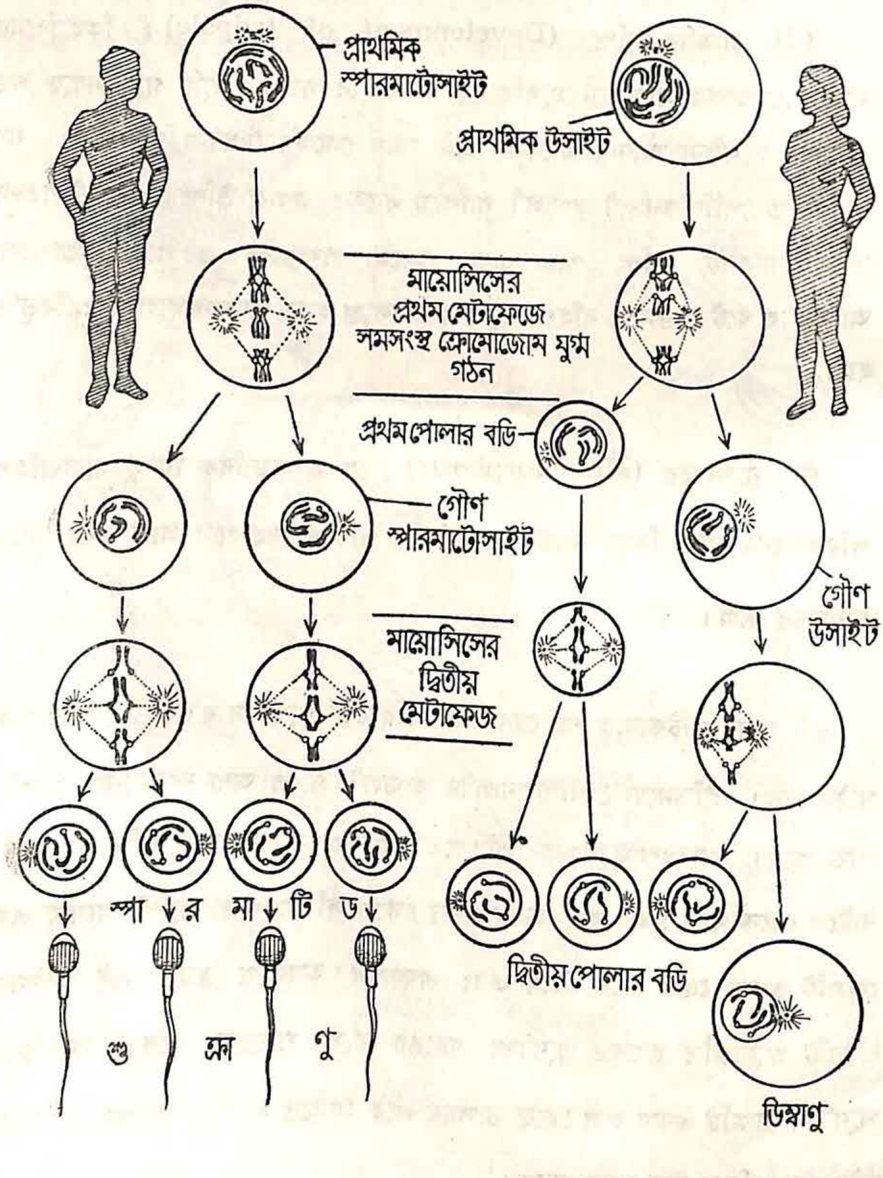
8.5. ফার্ন ও মসের জীবনচক্রের পার্থক্য [*Differences in life cycles of Fern and Moss*] :

মস (Moss)	ফার্ন (Fern)
রেণু বা স্পোর (n)	রেণু বা স্পোর (n)
↓	↓
প্রোটোনিমা (n)	প্রোথ্যালস (n) (গ্যামেটোফাইট)
↓	↓ ↓
স্বাবলম্বী মস উদ্ভিদ (n) (গ্যামেটোফাইট)	পুংধানী (n) — স্ত্রীধানী (n)
↓	↓ ↓
পুংধানী (n) — স্ত্রীধানী (n)	শুক্রাণু (n) — ডিম্বাণু (n)
↓ ↓	নিষেক
শুক্রাণু (n) — ডিম্বাণু (n)	জাইগোট (2n)
নিষেক	↓
জাইগোট (2n)	স্বাবলম্বী ফার্ন উদ্ভিদ (2n) (স্পোরোফাইট)
↓	↓
স্পোরোগোনিয়ম (2n) (স্পোরোফাইট)	রেণুপত্র (2n)
↓	↓
রেণু মাতৃকোষ (2n)	রেণুস্থলী (2n)
↓ মায়োসিস	↓
রেণু (n)	রেণু মাতৃকোষ (2n)
	↓ মায়োসিস
	রেণু (n)

8.6. মস ও ফার্নের সাদৃশ্য [*Similarities between Moss and Fern*] :

(1) উভয়েই স্থলজ উদ্ভিদ।
(2) উভয় ক্ষেত্রেই গ্যামেটোফাইট ও স্পোরোফাইট অংশ পৃথক।
(3) উভয়ের যৌনাঙ্গ একই ধরনের।
(4) উভয় ক্ষেত্রেই ফ্ল্যাজেলাযুক্ত শুক্রাণু উৎপন্ন হয়।
(5) নিষেক ক্রিয়ায় জল অপরিহার্য।
(6) স্ত্রীধানী মধ্যেই নিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

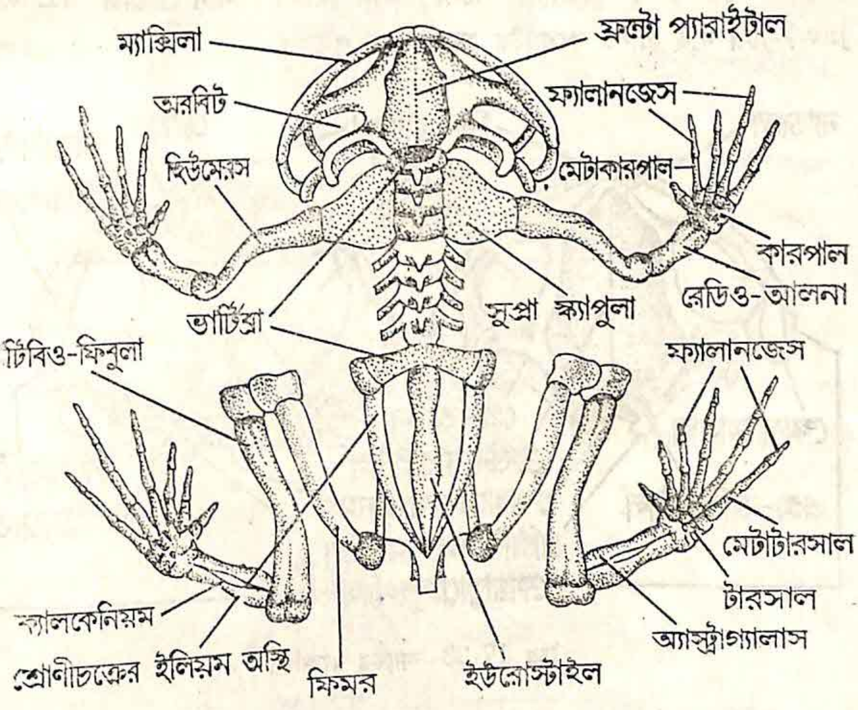
17.11. মানুষের দেহে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপাদনের চিত্ররূপ *[Diagrammatic representation of the process of Sperm and Ovum production in human being]* :



চিত্র 17.21—মানুষের ক্ষেত্রে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গঠনের চিত্ররূপ।

17.12. কুনো ব্যাঙের কঙ্কালতন্ত্র [Skeletal system of Toad] :

মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে কাঠামো গঠনকারী, নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদানে সাহায্যকারী এবং দেহভার বহনে সহায়তাকারী তন্ত্রকে কঙ্কালতন্ত্র বলে।



চিত্র 17·22—ব্যাঙের কঙ্কালতন্ত্র।

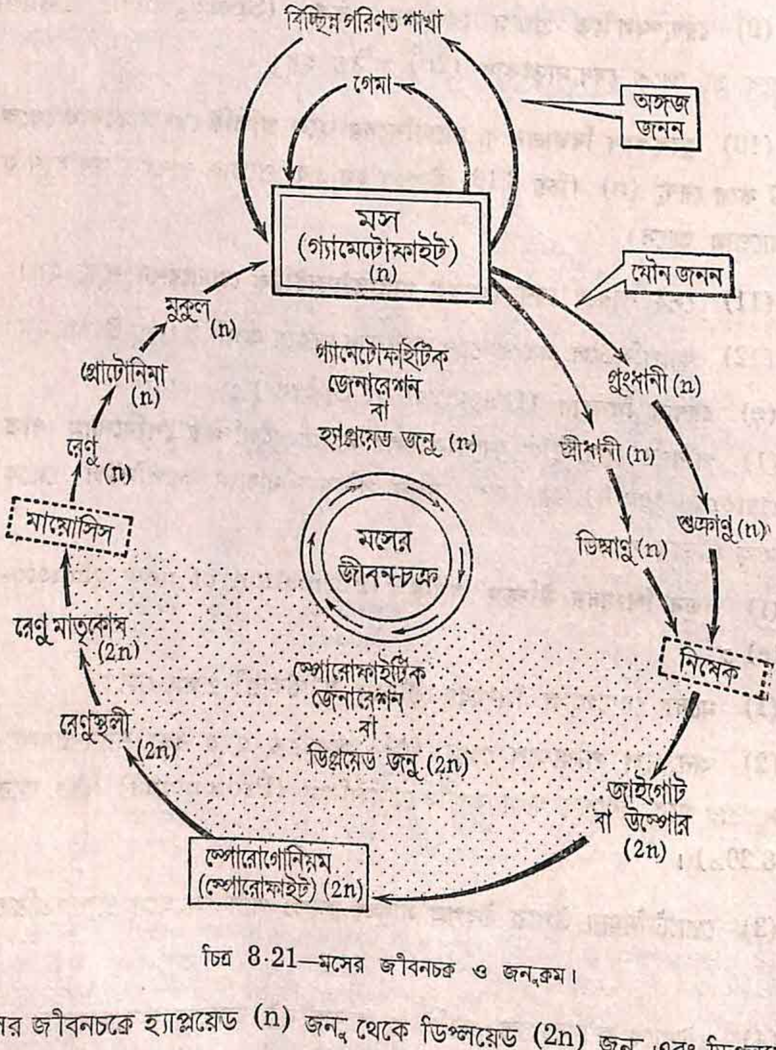
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্রটি প্রকৃতপক্ষে **অন্তঃকঙ্কাল** (Endoskeleton)। কুনো ব্যাঙের দেহে অন্তঃকঙ্কাল বর্তমান—**বহিঃকঙ্কাল** (Exoskeleton) নাই।

কুনো ব্যাঙের অন্তঃকঙ্কালতন্ত্রটি প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত, যথা—

(A) অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্র (Axial skeletal system)।

(B) উপাঙ্গিক কঙ্কালতন্ত্র (Appendicular skeletal system)।

জনু। যৌন জননের ফলে **ডিপ্লয়েড** (2n) বা স্পোরোফাইটিক বা রেণুধর জনুর সূত্রপাত হয়। এক্ষেত্রে জাইগোট থেকে স্পোরোফাইটিক জেনারেশন শুরু হয়। আবার স্পোর বা রেণু (n) উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং পুনরায় গ্যামেটোফাইটিক জেনারেশন ফিরে আসে। অর্থাৎ



চিত্র 8·21—মসের জীবনচক্র ও জনুক্রম।

মসের জীবনচক্রে হ্যাপ্লয়েড (n) জনু থেকে ডিপ্লয়েড (2n) জনু এবং ডিপ্লয়েড জনু থেকে হ্যাপ্লয়েড জনু চক্রাকারে আবর্তিত হয়। সুতরাং এক জনু থেকে অন্য জনুতে পর্যায়ক্রমে আবর্তন মসের জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

8.5. ফার্ন ও মসের জীবনচক্রের পার্থক্য *[Differences in life cycles of Fern and Moss] :*

মস (Moss)	ফার্ন (Fern)
রেণু বা স্পোর (n)	রেণু বা স্পোর (n)
↓	↓
প্রোটোনিমা (n)	প্রোথ্যালস (n) (গ্যামেটোফাইট)
↓	↓ ↓
স্বাবলম্বী মস উদ্ভিদ (n) (গ্যামেটোফাইট)	পুংধানী (n) — স্ত্রীধানী (n)
↓	↓ ↓
পুংধানী (n) — স্ত্রীধানী (n)	শুক্রাণু (n) — ডিম্বাণু (n)
↓ ↓	নিষেক
শুক্রাণু (n) — ডিম্বাণু (n)	জাইগোট (2n)
নিষেক	↓
জাইগোট (2n)	স্বাবলম্বী ফার্ণ উদ্ভিদ (2n) (স্পোরোফাইট)
↓	↓
স্পোরোগোনিয়ম (2n) (স্পোরোফাইট)	রেণুপত্র (2n)
↓	↓
রেণু মাতৃকোষ (2n)	রেণুস্থলী (2n)
↓ মায়োসিস	↓
রেণু (n)	রেণু মাতৃকোষ (2n)
	↓ মায়োসিস
	রেণু (n)

8.6. মস ও ফার্নের সাদৃশ্য *[Similarities between Moss and Fern] :*

(1) উভয়েই স্থলজ উদ্ভিদ।
(2) উভয় ক্ষেত্রেই গ্যামেটোফাইট ও স্পোরোফাইট অংশ পৃথক।
(3) উভয়ের যৌনাঙ্গ একই ধরনের।
(4) উভয় ক্ষেত্রেই ফ্ল্যাজেলাযুক্ত শুক্রাণু উৎপন্ন হয়।
(5) নিষেক ক্রিয়ায় জল অপরিহার্য।
(6) স্ত্রীধানী মধ্যেই নিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

(4) তারপর ভ্রূণমূলটি ক্রমশঃ প্রধানমূল গঠন করে এবং শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হতে থাকে। এইভাবে প্রধান মূলতন্ত্র গঠিত হয়।

(5) ইতিমধ্যে বীজপত্রাবকাণ্ড দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(6) বীজপত্রাবকাণ্ড যথারীতি প্রথমে বক্রভাবে ও পরে সোজা হয়।

(7) ফলে সস্য, বীজপত্র ও ভ্রূণমুকুলকে মাটির মধ্যে থেকে উপরে উঠিয়ে আনে।

(8) সস্যে সঞ্চিত খাদ্য শোষণ দ্বারা বীজপত্র নিজে পুষ্ট হয় এবং ক্রমশঃ সবুজ বর্ণ ধারণ ক'রে ও সালোকসংশ্লেষ চালিয়ে খাদ্য-উৎপাদন সুরু করে দেয়।

(9) প্রয়োজনীয় খাদ্য লাভ ক'রে ভ্রূণমুকুল অতি দ্রুত বর্ধিত হয় এবং বিটপতন্ত্র গঠন করে।

(10) এই জাতীয় অঙ্কুরোদ্গমের সময় বীজপত্র বীজত্বকসহ মাটির উপরে উঠে আসে। সেজন্য এই পদ্ধতিকে **মৃদ্ভেদী অঙ্কুরোদ্গম** (Epigeal germination) বলে (চিত্র 15.6)।

15.8. ভুট্টাবীজের অঙ্কুরোদ্গম *[Germination of a Maize grain]* :

(1) অঙ্কুরোদ্গমকালে ভুট্টা বীজ মাটির সঙ্গে উল্লম্বভাবে অবস্থান করে।

(2) তারপর প্রথমে ভ্রূণমূলাবরণী এবং পরে বীজত্বক ও ফলত্বকের সংযুক্ত আবরণ ভেদ করে মূল মাটিতে প্রবেশ করে।

(3) ইতিমধ্যে ভ্রূণমুকুলাবরণী (**কলিওপটাইল**) সমেত ভ্রূণমুকুল মাটির উপরে জেগে ওঠে এবং ক্রমে ভ্রূণমুকুলাবরণী ভেদ ক'রে বাইরে আসে।

(4) ভ্রূণমূল ভ্রূণমূলাবরণী (**কোলিওরাইজা**) ভেদ করার পর পরিণত হয়ে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয় এবং প্রধান মূলতন্ত্র গঠন করে।

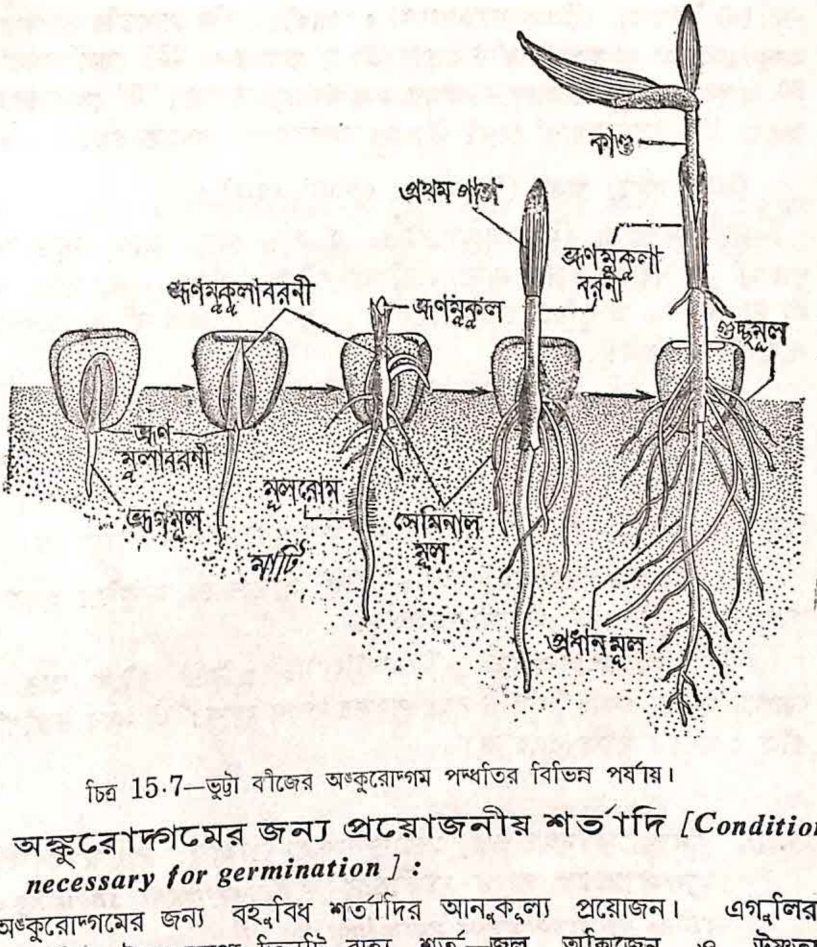
(5) কিছু সেমিনাল মূল সেই সঙ্গে উৎপন্ন হয়।

(6) স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ঐ মূল নষ্ট হয়ে গেলে, সেখান থেকে একগুচ্ছ শফামূল (গুচ্ছমূল) উৎপন্ন হয়।

(7) এদিকে ভ্রূণমূল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে বিটপতন্ত্র গঠন করে।

(8) অংকুরোদ্গমের সময় বীজটির অবস্থানের কোন পরিবর্তন ঘটে **না** ; অর্থাৎ বীজটি মাটির মধ্যেই থেকে যায়।

(9) সুতরাং ভুট্টাবীজের এই অংকুরোদ্গম পদ্ধতিকে **মৃদ্‌বর্তী অংকুরোদ্গম** বলে (চিত্র 15.7)।



চিত্র 15·7—ভুট্টা বীজের অংকুরোদ্গম পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়।

15.9. অঙ্কুরোদ্গমের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি [*Condition necessary for germination*] :

অংকুরোদ্গমের জন্য বহুবিধ শর্তাদির আনুকূল্য প্রয়োজন। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তিনটি বাহ্য শর্ত—**জল**, **অক্সিজেন** ও **উষ্ণতা** এবং কয়েকটি অত্যন্তরীণ শর্ত, যেমন—**সুপ্তদশা**, **খাদ্য**, **হরমোন** এবং **অংকুরোদ্গম-ক্ষমতা**।

(A) **বাহ্যশর্ত** (External conditions) :

(1) **জল** (Water) : সুপ্ত প্রোটোপ্লাজমকে কর্মক্ষম ও জাগ্রত করার জন্য উপযুক্ত মাত্রায় জল প্রয়োজন। প্রোটোপ্লাজম সক্রিয় হয়ে উঠলে নানারূপ বিপাকক্রিয়া শুরু হয়। জল বীজের সঞ্চিত কঠিন খাদ্যকে তরল ক'রে ভ্রূণমুকুলে পরিবেশন করে। তাছাড়া, বীজত্বককে নরম ক'রে ফাটিয়ে দিতেও জলের প্রয়োজন। ফাটা অংশ দিয়ে ভ্রূণমূল স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে আসতে পারে।

(7) উভয়ের ভ্রূণই স্ত্রীধানীর প্রাকার দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

(8) অপরিণত স্পোরোফাইট উভয় ক্ষেত্রেই গ্যামেটোফাইটের উপর নির্ভরশীল।

(9) স্পোরোফাইট স্পোর বা রেণু উৎপাদন মাধ্যমে অযৌন জনন সম্পন্ন করে।

(10) উভয় ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট জনুক্রম বিদ্যমান।

8.7. মস ও ফার্নের পার্থক্য [*Differences between Moss and Fern*] :

মস (Moss)	ফার্ন (Fern)
● উদ্ভিদজগতে স্থানগত পার্থক্য ●	
(1) মস অপুষ্পক (Cryptogam) এবং ব্রায়োফাইটা (Bryophyta) গোষ্ঠীভুক্ত অপেক্ষাকৃত উন্নত উদ্ভিদ।	(1) ফার্ন অপুষ্পক (Cryptogam) এবং টেরিডোফাইটা (Pteridophyta) গোষ্ঠীভুক্ত অপেক্ষাকৃত উন্নত উদ্ভিদ।
● বসতিগত পার্থক্য ●	
(2) স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটি বা ছায়াশীতল পরিবেশে পাথরের গায়ে দলবদ্ধভাবে ভেলভেটের মতো আস্তরণ রচনা করে।	(2) ছায়াশীতল শুষ্ক পরিবেশে পাহাড়-পর্বতের গায়ে, ভাঙা প্রাচীরে — এমনকি সমতল ভূমিতে গাছের ছায়ায় খানা-খন্দের কিনারায় দলবদ্ধভাবে জন্মায়।
● প্রকৃতিগত পার্থক্য ●	
(3) মস লিঙ্গধর উদ্ভিদ (Gametophyte)।	(3) ফার্ন রেণুধর উদ্ভিদ (Sporophyte)।
(4) দেহ তথাকথিত কাণ্ড ও পাতা অংশে বিভক্ত—কিন্তু মূল নেই।	(4) দেহ তথাকথিত কাণ্ড, পাতা ও মূলে বিভক্ত।
(5) মূলের পরিবর্ত অঙ্গ—রাইজয়েড মূলের কাজ করে।	(5) রাইজয়েড নেই।
(6) দেহের শায়িত, শাখান্বিত, সূত্রবৎ অংশ প্রোটোনিমা (Protonema)।	(6) দেহের শায়িত কাণ্ডাংশ রাইজোম (Rhizome)।

মস (Moss)	ফার্ন (Fern)
(7) প্রোটোনিমা থেকে ঊর্ধ্বমুখী বিটপ অংশ গ্যামেটোফোর (Gametophore)।	(7) ফার্নে গ্যামেটোফোর নেই।
(8) কাণ্ড পত্র দ্বারা আবৃত।	(8) কাণ্ড বাদামী শল্কপত্র দ্বারা আবৃত।
(9) পাতা সরল, ক্ষুদ্রকায়।	(9) পাতা পক্ষল যৌগিক, বৃহদাকার।
(10) পাতা বৃন্তহীন (Sessile), রেখাকার বা ভল্লাকার।	(10) পাতা সবৃন্তক (Petiolate), পত্রকগুলি মাকুর আকৃতির।
(11) পাতায় রেণুস্থলী গঠিত হয় না—তাই পাতাকে স্পোরোফিল (Sporophyll) বলে না।	(11) পাতার নিম্নতলে রেণুস্থলী গঠিত হয়—তাই পাতাকে স্পোরোফিল বলে।
(12) কচি পাতায় বিশেষ কুণ্ডলী বা সারসিনেট ভারনেশান দেখা যায় না।	(12) কচি পাতা কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে—অর্থাৎ এখানে সারসিনেট ভারনেশান দেখা যায়।
(13) রেণুস্থলী নেই, তাই সোরস (Sorus) গঠনের প্রশ্ন ওঠে না।	(13) রেণুস্থলীগুলি একত্রিত হয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঙ্গ—সোরস গঠন করে।
(14) রেণুধর অংশ (Sporophyte) লিঙ্গধর (Gametophyte) অংশের সঙ্গে যুক্ত।	(14) পরিণত লিঙ্গধর উদ্ভিদ রেণুধর উদ্ভিদ থেকে পৃথক।
(15) রেণুধর অংশ বা স্পোরোফাইট ফুট (Foot), সিটা (Seta) ও ক্যাপসিউল (Capsule)-এ বিভক্ত।	(15) রেণুধর অংশ বা স্পোরোফাইট এইসব অঙ্গের পরিবর্তে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত।
(16) রেণু অঙ্কুরিত হয়ে প্রোটোনিমা (Protonema) গঠন করে।	(16) রেণু অঙ্কুরিত হ'য়ে প্রোটোনিমার পরিবর্তে প্রোথ্যালস (Prothallus) গঠন করে।
(17) গ্যামেটোফোরের অগ্রভাগে পুংধানীগুলি (Antheridia) গুচ্ছাকারে অবস্থান করে।	(17) প্রোথ্যালসের নিম্নাংশে একাধিক গোলাকার পুংধানী জন্মায়।
(18) একইভাবে গ্যামেটোফোরের অগ্রভাগে স্ত্রীধানীগুলি (Archegonia) গুচ্ছাকারে অবস্থান করে।	(18) প্রোথ্যালসের অগ্রখাঁজের নিকটে একাধিক স্ত্রীধানী অবস্থান করে।

(2) **অক্সিজেন** (Oxygen) ঃ অংকুরোদ্গমের সময় বৃদ্ধির হার বাড়ে। সেজন্য প্রচুর শক্তিক্ষয় হয়। দ্রুত শ্বসন চালিয়ে সেই শক্তি সরবরাহ করতে প্রচুর অক্সিজেন প্রয়োজন।

(3) **উষ্ণতা** (Temperature) ঃ শারীরবৃত্তীয় যাবতীয় কাজের মতো অঙ্কুরোদ্গমের সময়ও নির্দিষ্ট মাত্রায় উষ্ণতা প্রয়োজন। 25° সেলসিয়াস থেকে 30° সেলসিয়াস হল অংকুরোদ্গমের জন্য উপযুক্ত উষ্ণতা। 5° সেলসিয়াস কম অথবা 48° সেলসিয়াস বেশী উষ্ণতায় অংকুরোদ্গম ব্যাহত হয়।

(B) **অন্তঃ শর্ত** (Internal conditions) ঃ

(1) **সুপ্তদশা** (Dormancy) ঃ বীজের মধ্যে ভ্রূণ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সুপ্তদশার সময়-সীমা বিভিন্ন বীজে বিভিন্ন। সুপ্তদশা কাটিয়ে না উঠলে বীজ অঙ্কুরিত হ'তে পারে না। অর্থাৎ, প্রতিটি বীজে অল্প-বিস্তর সুপ্তদশা বর্তমান।

(2) **খাদ্য** (Food) ঃ অংকুরোদ্গমের সময় পর্যাপ্ত শক্তিক্ষয় হয়। এই শক্তি যোগায় শ্বসন। শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান খাদ্য। সুতরাং অংকুরোদ্গমের সময় প্রয়োজনীয় শক্তির ঠিক ঠিক যোগান দেবার জন্য বীজে পর্যাপ্ত খাদ্য সঞ্চিত থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় অংকুরোদ্গম ব্যাহত হয়।

(3) **হরমোন** (Hormone) ঃ বীজ সুষ্ঠুভাবে অংকুরিত হ'তে গেলে হরমোনের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

(4) **অংকুরোদ্গম-ক্ষমতা** (Viability) ঃ প্রতিটি বীজে তার অংকুরোদ্গম ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বজায় থাকে। ঐ সময় উত্তীর্ণ হ'লে বীজ অংকুরিত হ'তে পারে না।

15.10. অঙ্কুরোদ্গমের সময় শর্তগুলির প্রয়োজনীয়তা দেখাবার জন্য পরীক্ষা [*Experiment showing conditions necessary for germination*] :

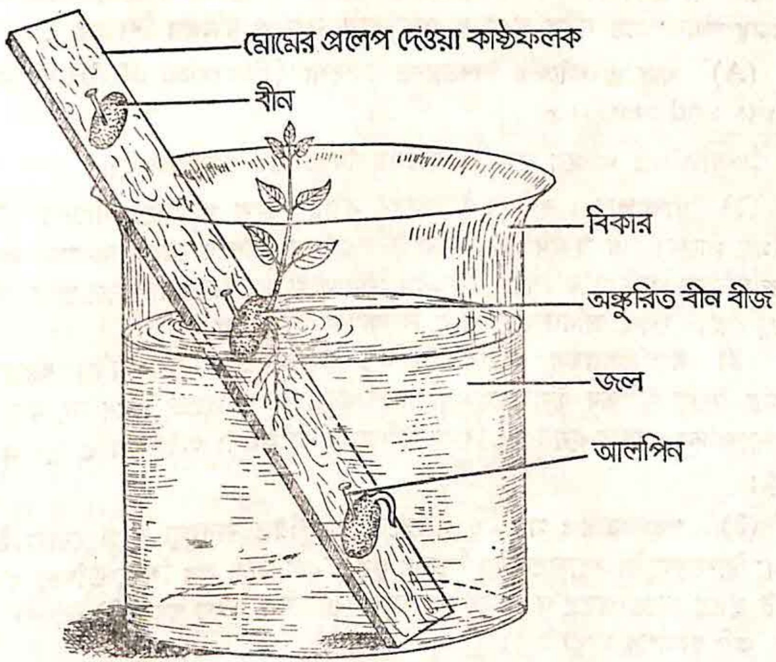
তিন বীনের পরীক্ষা [*Three Bean Experiment*] ঃ

প্রয়োজনীয় সামগ্রী (Requisites) ঃ

(i) একটি বিকার,
(ii) একটি লম্বা কাষ্ঠ ফলক,
(iii) তিনটি পুষ্ট বীনের বীজ,
(iv) আলপিন,
(v) গলিত মোম ও
(vi) জল।

● **পদ্ধতি** (Procedure) ঃ গলা মোমের প্রলেপ লাগিয়ে একটি কাঠের ফলককে জল ও বায়ু-নিরোধক করা হল। ফলকের দুপ্রান্তে দুটি বীজ এবং মাঝখানে আর একটি বীজকে আলপিনের সাহায্যে আটকানো হল। এখন কাষ্ঠলফলকটিকে হেলানভাবে বিকারের মধ্যে দাঁড় করান হল। আগেই ফুটিয়ে নিয়ে পরে ঠান্ডা করা অক্সিজেনমুক্ত জল বিকারে এমনভাবে ঢালা হল, যাতে মধ্যের বীজটির অর্ধাংশ জলে ডুবে থাকে। এখন বিকারটিকে ঘরের স্বাভাবিক উষ্ণতায় রাখা হল।

● **নিরীক্ষা** (Observation) ঃ কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল, মাঝের বীজটি সকল শর্তের আনুকূল্য লাভ ক'রে স্বাভাবিকভাবে অঙ্কুরিত হয়েছে। নীচের বীজটি অংকুরোদ্গম শুরু করলেও অক্সিজেন অভাবে তা শেষ করতে



চিত্র 15.8—তিন বীনের পরীক্ষা।

পারেনি। উপরের বীজটি অক্সিজেন এবং উষ্ণতা পেয়েও শুধু জলের অভাবে অঙ্কুরিত হতে পারল না।

● **সিদ্ধান্ত** (Inference) ঃ অংকুরোদ্গমের সময় প্রধান শর্ত তিনটি—অর্থাৎ জল, অক্সিজেন ও স্বাভাবিক উষ্ণতা অপরিহার্য।

মস (Moss)	ফার্ন (Fern)
(19) পুংধানী ও স্ত্রীধানী পেরিকিটীয় পাতা (Perichaetial leaves) ও বন্ধ্যা রোম প্যারাফাইসিস (Paraphysis) দ্বারা আবৃত থাকে।	(19) এই ধরনের বিশেষ আবরণ নেই।
(20) শুক্রাণু দ্বিফ্ল্যাজেলাযুক্ত (Biflagellate)।	(20) শুক্রাণু বহুফ্ল্যাজেলাযুক্ত (Multiflagellate)।
(21) স্ত্রীধানীর গ্রীবা নালীকোষের সংখ্যা 4—6।	(21) স্ত্রীধানীর গ্রীবা নালীকোষের সংখ্যা 1।
(22) জনুক্রমে লিঙ্গধর ও রেণুধর উদ্ভিদ স্বাধীন নয়।	(22) জনুক্রমে লিঙ্গধর ও রেণুধর উদ্ভিদ স্বাধীন।

8.8. মস ও ফার্নের লিঙ্গধর উদ্ভিদ বা গ্যামেটোফাইটের পার্থক্য [*Differences in gametophytes of Moss and Fern*]:

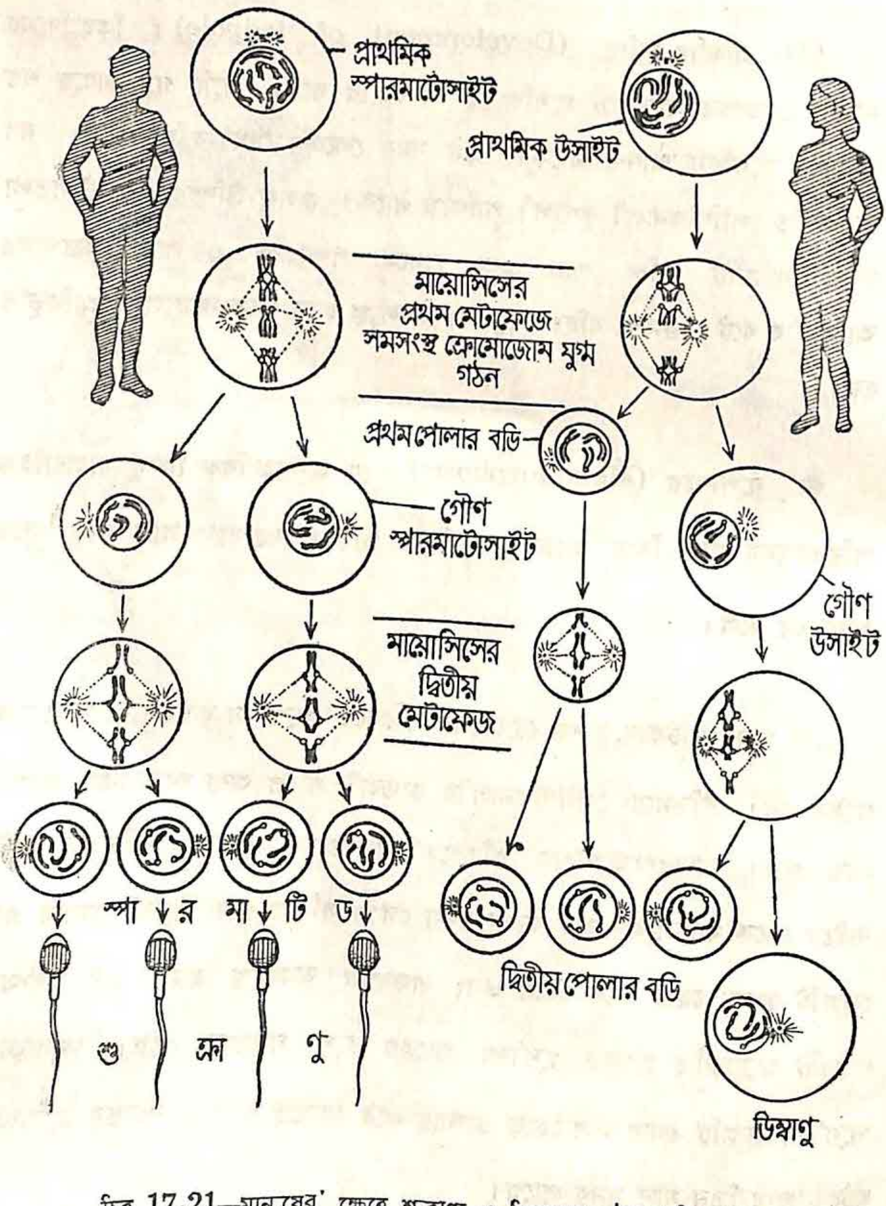
মস (Moss)	ফার্ন (Fern)
(1) মস উদ্ভিদটি নিজেই লিঙ্গধর উদ্ভিদ বা গ্যামেটোফাইট।	(1) ফার্ন উদ্ভিদটি নিজে লিঙ্গধর উদ্ভিদ বা গ্যামেটোফাইট নয়—এর প্রোথ্যালসটি গ্যামেটোফাইট।
(2) লিঙ্গধর অংশ গ্যামেটোফোর নামে পরিচিত। এটি খাড়া, দণ্ডাকার।	(2) লিঙ্গধর অংশ প্রোথ্যালস নামে পরিচিত। এটি মাটি সংলগ্ন এবং চ্যাপ্টা হৃৎপিণ্ডাকার।
(3) গ্যামেটোফোর তথাকথিত কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত। মূলের পরিবর্তে রাইজয়েড বর্তমান।	(3) প্রোথ্যালসে কাণ্ড বা পাতাসমৃদ্ধ অঙ্গ নেই। নিম্নতলে কেবল রাইজয়েড বর্তমান।
(4) লিঙ্গধর অংশে অঙ্গজ জনন ঘটে।	(4) লিঙ্গধর অংশে অঙ্গজ জনন ঘটে না।
(5) লিঙ্গধর অংশ ভিন্নবাসী (Dioecious)।	(5) লিঙ্গধর অংশ সহবাসী (Monoecious)।
(6) গ্যামেটোফোরের শীর্ষে যৌনাঙ্গ (পুংধানী ও স্ত্রীধানী) গঠিত হয়।	(6) যৌনাঙ্গ প্রোথ্যালসের তলদেশে গঠিত হয়।

মস (Moss)	ফার্ন (Fern)
(7) পুংধানী ও স্ত্রীধানী গ্যামেটোফোরের আগায় পেরিকিটীয় পাতা ও বন্ধ্যা রোম প্যারাফাইসিস দ্বারা আবৃত থাকে।	(7) পুংধানীগুলিই কেবল প্রোথ্যালসের রাইজয়েড দ্বারা আবৃত থাকে।
(8) পুংধানী গদাকৃতি।	(8) পুংধানী গোলাকার।
(9) শুক্রাণু দ্বিফ্ল্যাজেলাযুক্ত।	(9) শুক্রাণু বহুফ্ল্যাজেলাযুক্ত।
(10) স্ত্রীধানীর গ্রীবা নালীকোষের সংখ্যা 4—6।	(10) স্ত্রীধানীর গ্রীবা নালীকোষের সংখ্যা 1।

8.9. মস ও ফার্নের রেণুধর উদ্ভিদ বা স্পোরোফাইটের পার্থক্য [*Differences in Sporophytes of Moss and Fern*] :

মস (Moss)	ফার্ন (Fern)
(1) মসের রেণুধর উদ্ভিদ প্রকট (Dominant) দশা নয়। মস উদ্ভিদ বলতে গ্যামেটোফাইট দশাকে বোঝায়—স্পোরোফাইটকে নয়।	(1) ফার্নের রেণুধর উদ্ভিদ প্রকট দশা। ফার্ন উদ্ভিদ বলতে স্পোরোফাইটকে বোঝায়।
(2) মসের রেণুধর উদ্ভিদ স্বাবলম্বী নয়—পুষ্টির জন্য একে গ্যামেটোফাইট বা লিঙ্গধর উদ্ভিদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়।	(2) ফার্নের রেণুধর উদ্ভিদ স্বাবলম্বী।
(3) রেণুধর উদ্ভিদ 3—4 সেণ্টিমিটার পর্যন্ত উঁচু হয়।	(3) রেণুধর উদ্ভিদ 40—92 সেণ্টিমিটার পর্যন্ত উঁচু হয়।
(4) রেণুধর উদ্ভিদ পদ (Foot), সিটা (Seta) ও ক্যাপসিউল (Capsule)-এ বিভক্ত।	(4) রেণুধর উদ্ভিদ মূল, কান্ড (রাইজোম) ও যৌগিকপত্র অংশে বিভক্ত।
(5) সংক্ষিপ্ত পদ মাধ্যমে লিঙ্গধর উদ্ভিদ থেকে প্রয়োজনীয় জল, খনিজ লবণ ও তৈরী খাদ্য শোষিত হয়।	(5) অস্থানিক মূল দ্বারা মাটি থেকে জল ও খনিজ লবণ সরাসরি শোষিত হয়।
(6) দীর্ঘ সিটা শোষিত পদার্থকে ক্যাপসিউলে পরিবহণ করে।	(6) কান্ড শোষিত পদার্থকে পাতায় পরিবহণ করে।

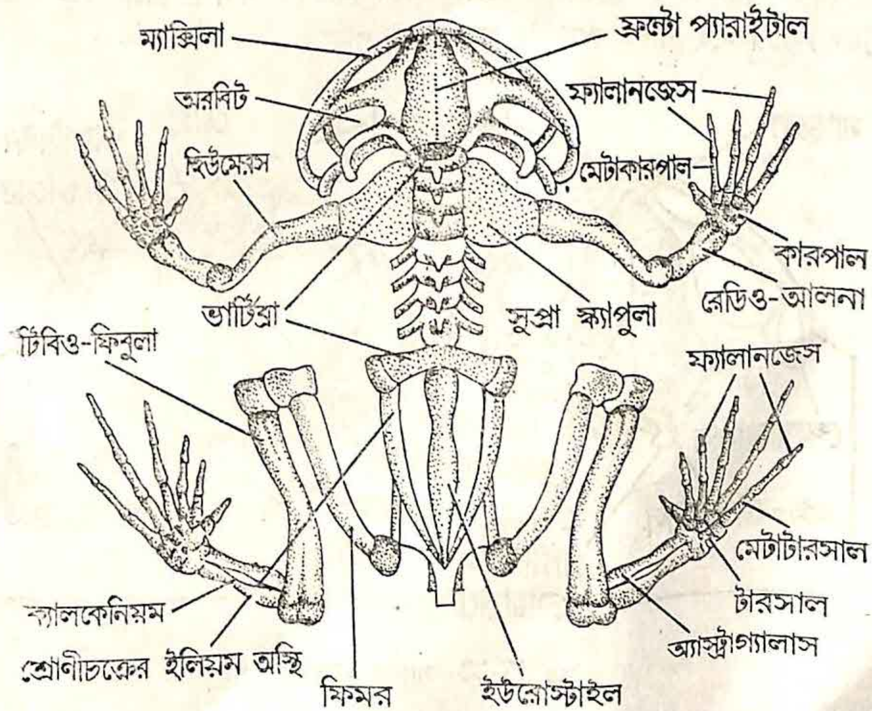
17.11. মানুষের দেহে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপাদনের চিত্ররূপ [*Diagrammatic representation of the process of Sperm and Ovum production in human being*] :



চিত্র 17·21—মানুষের ক্ষেত্রে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গঠনের চিত্ররূপ।

17.12. কুনো ব্যাঙের কঙ্কালতন্ত্র *[Skeletal system of Toad]* :

মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে কাঠামো গঠনকারী, নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদানে সাহায্যকারী এবং দেহভার বহনে সহায়তাকারী তন্ত্রকে কঙ্কালতন্ত্র বলে।



চিত্র 17·22—ব্যাঙের কঙ্কালতন্ত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্রটি প্রকৃতপক্ষে **অন্তঃকঙ্কাল** (Endoskeleton)। কুনো ব্যাঙের দেহে অন্তঃকঙ্কাল বর্তমান—**বহিঃ-কঙ্কাল** (Exoskeleton) নাই।

কুনো ব্যাঙের অন্তঃকঙ্কালতন্ত্রটি প্রধান দু'টি ভাগে বিভক্ত, যথা—

(A) অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্র (Axial skeletal system)।

(B) উপাঙ্গিক কঙ্কালতন্ত্র (Appendicular skeletal system)।

মস (Moss)	ফার্ন (Fern)
(7) সিটায় র‍্যামেণ্টা ও পাতা থাকে না।	(7) কাণ্ডে র‍্যামেণ্টা ও পাতা থাকে।
(8) মসে প্রকৃত সংবহন কলা নেই।	(8) ফার্নে উন্নত ধরনের সংবহন কলা বর্তমান।
(9) কলুমেলাকে ঘিরে রাখা স্পোর-থলিতে রেণু বা স্পোর উৎপন্ন হয়।	(9) রেণুপত্র বা স্পোরোফিলের নিম্নত্বকে বিশেষ অঙ্গ—সোরসে যে অসংখ্য রেণুস্থলী থাকে তাতেই রেণু উৎপন্ন হয়।
(10) রেণুস্থলী বাতাবকাশ দ্বারা পরিবৃত।	(10) রেণুস্থলী বাতাবকাশ দ্বারা পরিবৃত নয়। এক্ষেত্রে বিশেষ অঙ্গ ইণ্ডুসিয়ম (indusium) দ্বারা আবৃত থাকে।
(11) অপারকুলম অপসারিত হলে স্পোরথলি উন্মুক্ত হয়।	(11) ইণ্ডুসিয়ম শুকিয়ে গেলে তবেই রেণুস্থলীগুলি উন্মুক্ত হয়।
(12) জলগ্রাহী চলনক্ষম 32টি পেরিস্টোম দাঁত (Peristome Teeth)-এর সাহায্যে রেণু বিস্তৃত হয়।	(12) রেণুস্থলী প্রাকারের স্টোমিয়ম (Stomium) অংশ ফেটে গেলে এবং অ্যানুলস সংকুচিত হলে রেণু বিস্তৃত হয়।

8.10. মিউকোর [*Mucor*] :

(i) **উদ্ভিদজগতে স্থান** (Systematic position) ঃ মিউকোর **অপুষ্পক** ও **থ্যালোফাইট** (Thallophyta) **গোষ্ঠীভুক্ত ছত্রাকজাতীয়** মৃত-জীবী উদ্ভিদ।

(ii) **বসতি** (Habitat) ঃ মিউকোর গরু-ঘোড়ার মল, পচা ফল, পনির, ভিজা চামড়া, মোরব্বা, জেলী, পাঁউরুটির উপরে জন্মায় এবং সাদা তুলোর মতো আচ্ছাদন রচনা করে। পরে মিউকোরের দেহে রেণু উৎপন্ন হলে সাদা রং কালো হয়ে যায়। সেজন্য মিউকোরকে **ব্ল্যাক মোল্ড** (Black mould) নামেও অভিহিত করা হয়।

(iii) **গঠন ও জীবন-ইতিহাস** (Structure and life-history) ঃ

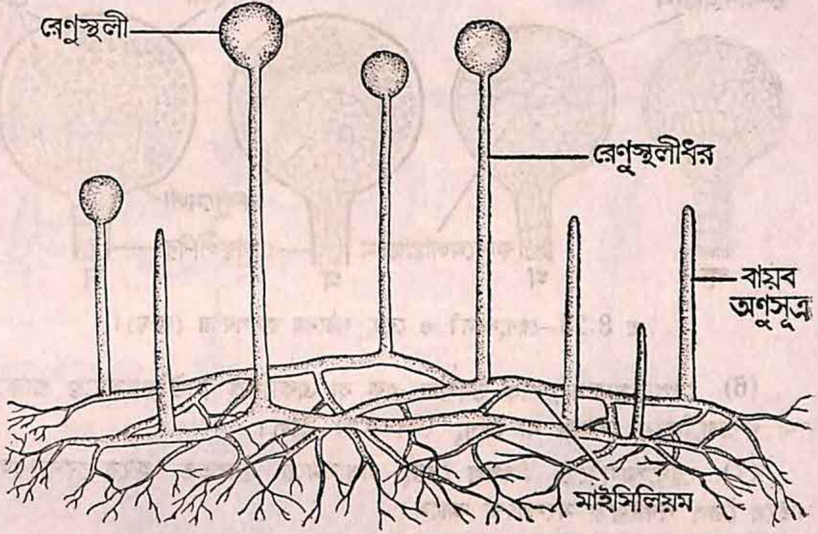
● **গঠন** (Structure) ঃ

(1) মিউকোরের দেহ অসংখ্য শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট সুতোর মতো **মাইসিলিয়ম** (mycelium) দ্বারা গঠিত।

(2) মাইসিলিয়মের প্রতিটি শাখাকে **অণুসূত্র** বা **হাইফা** (hypha) বলা হয়। অণুসূত্রগুলি বহু নিউক্লিয়সযুক্ত এবং বিভেদ-প্রাকার (septa)

বিহীন। এই প্রকার হাইফাকে **সিনোসাইটিক হাইফা** (Coenocytic hypha) বলা হয়।

(3) মিউকোরের অণুসূত্র-প্রাকার **কাইটিন** (Chitin) নামক বিশেষ এক প্রকার শর্করা দ্বারা গঠিত। প্রাকারাবদ্ধ প্রোটোপ্লাজম দানাদার এবং বহু নিউক্লিয়স ও বহু ভ্যাকুওলযুক্ত। প্রোটোপ্লাজমে **গ্লাইকোজেন** (Glycogen), **তৈলবিন্দু** (oil droplets) প্রভৃতি সঞ্চিত খাদ্য বর্তমান।



চিত্র 8·22—মিউকোরের গঠন।

● **জনন** (Reproduction) ঃ মিউকোর **অঙ্গজ, অযৌন, যৌন** এবং কখনও কখনও **অপুংজনি** (Parthenogenesis) পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে।

(A) **অঙ্গজ জনন** (Vegetative reproduction) ঃ

মিউকোর কদাচিৎ অঙ্গজ জনন পদ্ধতি অনুসরণ করে। সময় বিশেষে মিউকোরের অণুসূত্রগুলি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হয় এবং প্রতিটি খণ্ড থেকে নতুন মিউকোরের জন্ম হয়।

(B) **অযৌন জনন** (Asexual reproduction) ঃ

(1) পর্যাপ্ত খাদ্য শোষণ ক'রে মিউকোর অনুকূল পরিবেশে **রেণু** বা **গোনিডিয়ম** (Spore or Gonidium) দ্বারা অযৌন জনন সুরু করে।

(2) এই সময় কতকগুলি অণুসূত্র সোজা উপরের দিকে উঠে যায়। এগুলিকে **বায়ব অণুসূত্র** (Aerial hypha) (চিত্র 8.22) বলে।

(3) বায়ব অণুসূত্রের অগ্রভাগটি ফুলে **রেণুস্থলী** (Sporangium) তৈরী হয়।

● **5°C কম ও 48°C-এর বেশী উষ্ণতায় অংকুরোদ্গম হয় না ঃ**

5°C-এর কম ও 48°C-এর বেশী উষ্ণতায় অংকুরোদ্গম হয় না দেখানোর জন্য ফুটন্ত গরম জল (100°C) ও বরফ (0°C) পৃথক পৃথকভাবে বিকারের জলে মিশিয়ে একইভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় প্রতি ক্ষেত্রেই অংকুরোদ্গম ব্যাহত হয়। অর্থাৎ অংকুরোদ্গমের জন্য প্রতি ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক উষ্ণতার প্রয়োজন হয়।

15.11. ফল ও বীজের বিস্তার *[Dispersal of Fruits and Seeds]:*

● **ফল ও বীজের বিস্তারের সংজ্ঞা** (Definition of dispersal of fruits and seeds) ঃ

এক বা একাধিক বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে জনিতৃ উদ্ভিদদেহ থেকে ফল ও বীজের স্থানান্তরে নীত হওয়ার পদ্ধতিকে ফল ও বীজের বিস্তার বলে।

(A) **ফল ও বীজের বিস্তারের উদ্দেশ্য** (Purpose of dispersal of fruits and seeds) ঃ

নিম্নলিখিত কারণে ফল ও বীজের বিস্তারের প্রয়োজন হয়।

(1) **খাদ্যাভাব** ঃ জনিতৃ উদ্ভিদের নীচে স্বল্প পরিসরে খাদ্যের পরিমাণ সীমিত থাকে। ঐ সীমিত গণ্ডিতে যদি জনিতৃ উদ্ভিদ থেকে অসংখ্য ফল ও বীজ ছড়িয়ে পড়ে তবে শিশু উদ্ভিদগুলির মধ্যে খাদ্যের জন্য প্রবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ফলে অধিকাংশ শিশু উদ্ভিদের মৃত্যু হয়।

(2) **সূর্যালোকের অভাব** ঃ জনিতৃ উদ্ভিদের নীচে পর্যাপ্ত আলো না থাকায় শিশু উদ্ভিদ উপযুক্তভাবে সালোকসংশ্লেষ চালাতে পারে না, যার ফলে খাদ্যোৎপাদন ব্যাহত হয় এবং শিশু উদ্ভিদগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণকায় ও দুর্বল হ'য়ে পড়ে।

(3) **স্থানাভাব** ঃ সীমিত গণ্ডিতে অংকুরিত অসংখ্য বীজ থেকে উৎপন্ন শিশু উদ্ভিদগুলি স্থানাভাবের শিকার হয়। এর ফলে সব শিশু উদ্ভিদের বৃদ্ধি একই হারে হ'তে পারে না। কেবল সুস্থ ও সবল অল্প কয়েকটি উদ্ভিদ বেঁচে যায়, অধিকাংশের মৃত্যু হয়।

(4) **জল ও খনিজ লবণের অভাব** ঃ জনিতৃ উদ্ভিদের নীচে অল্প পরিসরে লভ্য জল ও খনিজ লবণের অধিকাংশই জনিতৃ উদ্ভিদ শোষণ করে নেয়। অসংখ্য অপত্য উদ্ভিদ স্বভাবতই তাদের প্রয়োজনীয় মাত্রায় জল ও খনিজ লবণ পায় না। এর ফলে অপত্য উদ্ভিদগুলির সামগ্রিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

(5) **শ্বসনবস্তুর অভাব** ঃ উপযুক্ত সূর্যালোকের অভাবে অপত্য উদ্ভিদগুলির পাতায় প্রয়োজনীয় মাত্রায় সালোকসংশ্লেষ চলতে পারে না। যার ফলে উদ্ভিদদেহে শ্বসনবস্তুর অভাব ঘটে। শ্বসনবস্তুর (গ্লুকোজের) অভাবে শ্বসনের

হার কমে আসে, শক্তি উৎপাদনে ঘাটতি পড়ে এবং পরিণামে অংগপ্রত্যংগাদির স্বাভাবিক পরিস্ফুটন ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

(6) **জননে অক্ষমতা**ঃ অপুষ্ট ও অপরিস্ফুটিত অংগে জননাংগ উৎপাদন বিঘ্নিত হয়—যা বংশবিস্তারের পরিপন্থী। জননে অক্ষমতা হেতু সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা প্রবল।

(7) **রোগাক্রমণ প্রবণতা বৃদ্ধি**ঃ অপুষ্ট অপত্য উদ্ভিদগুলি রোগদমনে অপারগ হয়, ফলে সেক্ষেত্রে রোগাক্রমণ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এইভাবে রোগাক্রান্ত অধিকাংশ অপত্য উদ্ভিদই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

(B) **ফল ও বীজ বিস্তারের উপায়** (Means for dispersal of fruits and seeds) ঃ

অধিকাংশ উদ্ভিদ ইচ্ছামতো স্থানান্তরে যেতে পারে না। তাই স্বাভাবিক-ভাবেই তাদের ফল ও বীজ স্থানান্তরে গমনাগমনে অক্ষম। সেই কারণে জনিতৃ উদ্ভিদের নীচে বা কাছাকাছি ফল ও বীজ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ঐ সব বীজ ও ফল থেকে অল্পপরিসরে অসংখ্য উদ্ভিদ জন্মায় এবং তাদের অকালমৃত্যু ঘটে। অকালমৃত্যু রোধ এবং সুস্থ-সবল জীবন-যাপনের জন্য ফল ও বীজের বিস্তার অপরিহার্য।

ফল ও বীজের বিস্তারের জন্য কোন না কোন বাহক (Vector)-**এর প্রয়োজন**। তাছাড়া কতকগুলি যান্ত্রিক পন্থায় ফল ও বীজ বিস্তৃত হয়। পরিবহণের সুবিধার জন্য বীজ ও ফলের গঠনে কতকগুলি স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। এই গঠন-বৈচিত্র্যকে অভিযোজন বলে।

ফল ও বীজের উৎকৃষ্ট বাহক হ'ল **বাতাস, জল ও পশু-পাখী**। নীচে বিভিন্ন বিস্তারপদ্ধতি এবং বিস্তারে সহায়তার জন্য ফল ও বীজের অভিযোজন সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

(a) **বায়ুর দ্বারা বিস্তার** (Dispersal by wind) ঃ

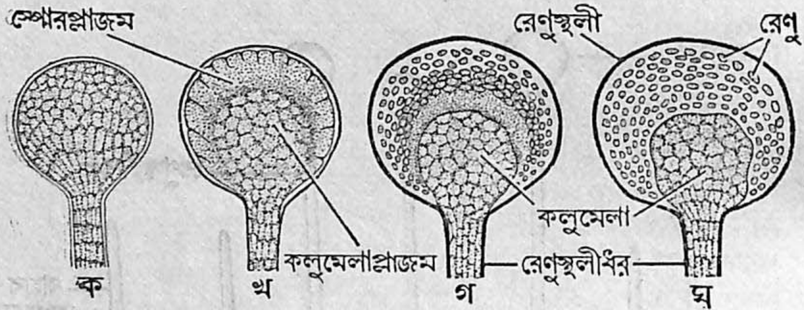
(1) **ক্ষুদ্র আয়তন ও হালকা ওজন**ঃ বায়ুর দ্বারা বিস্তার লাভের জন্য বীজ ও ফল যথাসম্ভব **ক্ষুদ্র ও হাল্কা** হয়। অতিক্ষুদ্র অর্কিড বীজের ওজন প্রায় 0.004 মিলিগ্রাম ; তাই সহজেই বায়ুর সাহায্যে **অর্কিডের বীজ** বহুদূরে বিস্তৃত হয়।

(b) **ছত্রী পদ্ধতি** (Parachute mechanism) ঃ

এমন অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের ফল বা বীজের গা থেকে নির্গত অথবা ফল বা বীজ সংলগ্ন অংশ পরিবর্তিত হ'য়ে বিভিন্ন ধরনের রোম গঠিত হয়। ঐসব রোম নানাভাবে বিন্যস্ত থেকে ফল ও বীজকে বাতাসে ভেসে যেতে সাহায্য করে।

(4) বায়ব অণুসূত্রের দণ্ডাকার যে অংশের সঙ্গে রেণুস্থলী যুক্ত থাকে তাকে **রেণুস্থলীধর** (Sporangiophore) বলে।

(5) রেণুস্থলীর মধ্যের প্রোটোপ্লাজম বাইরের দিকে **স্পোরপ্লাজম** (Sporeplasm) ও মধ্যের গম্বুজাকার **কলুমেলাপ্লাজম** (Columella-plasm)—এই দুই অংশে ভাগ হয়ে যায় (চিত্র 8.23)।



চিত্র 8·23—রেণুস্থলী ও রেণু গঠনের ক্রমপর্যায় (ক-ঘ)।

(6) স্পোরপ্লাজম থেকে উৎপন্ন এক বা একাধিক নিউক্লিয়সযুক্ত প্রাকারাবদ্ধ খণ্ডগুলিকে **স্পোর** বা **রেণু** (Spore) বলে।

(7) রেণুস্থলীতে উৎপন্ন **রেণু** যথাসময়ে বিস্তৃত হ'য়ে রেণুস্থলীর বাইরে জৈব পদার্থের সংস্পর্শে আসে।

(8) অনুকূল পরিবেশে রেণু অঙ্কুরিত হয়ে এক বা একাধিক **আদি অণুসূত্র** (Germ tube) গঠন করে।

(9) আদি অণুসূত্র ক্রমে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে মাইসিলিয়ম গঠন করে।

(C) **যৌন জনন** (Sexual reproduction) ঃ

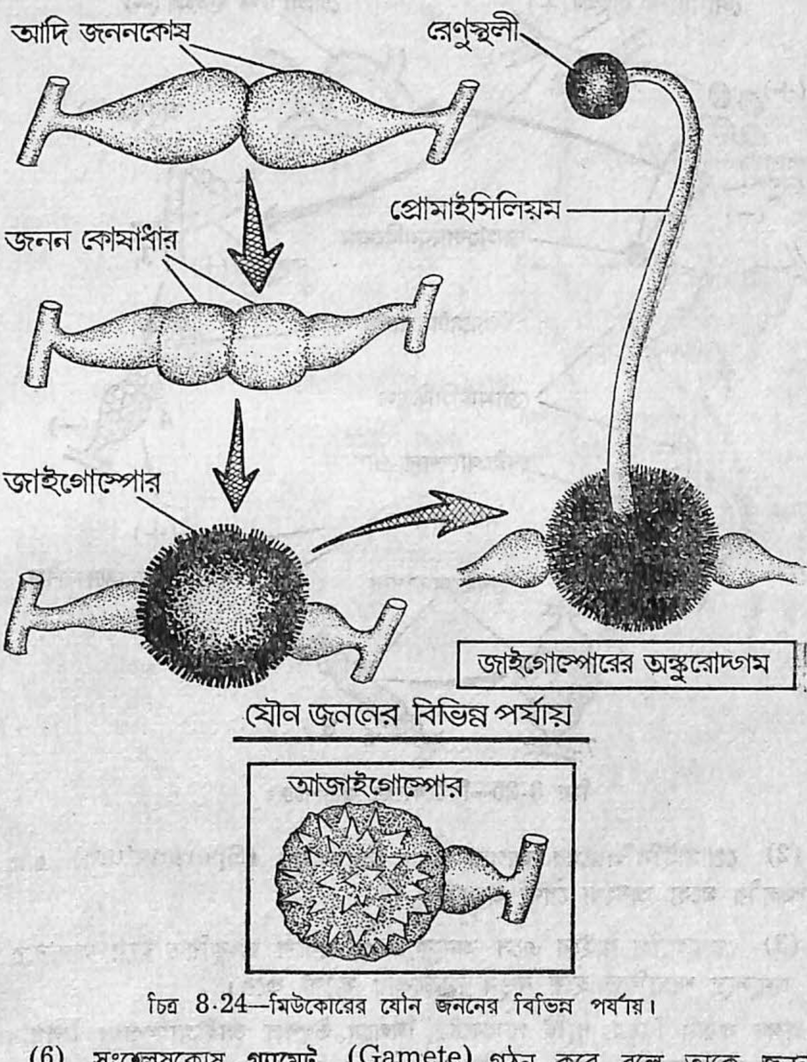
(1) খাদ্যের অভাব ঘটলে মাইসিলিয়মের বৃদ্ধি কমে যায় এবং মিউকোর যৌন পদ্ধতিতে জনন সম্পাদন করে।

(2) দেখতে অভিন্ন বিপরীত দিক থেকে আগত দুটি **জননকোষ** মিলিত হয়। এই মিলনকে **আইসোগ্যামি** (Isogamy) বলে।

(3) আপাতদৃষ্টিতে সমআকৃতির হলেও এদের একটিকে পুং ও অপরটিকে স্ত্রী অর্থাৎ যথাক্রমে **সোমাটিক হাইফা** '+' ও **সোমাটিক হাইফা** '−' রূপে চিহ্নিত করা হয় (চিত্র 8.25)।

(4) বিপরীত দিকে থেকে আগত জননকোষের আগা ফুলে গদার আকার ধারণ করে। এই অংশকে **আদি জননকোষ** (চিত্র 8.24) বলে।

(5) আদি জননকোষের আগা প্রস্থপর্দা দ্বারা খণ্ডিত হয়ে গোড়ার দিকে **সাসপেনসর** (Suspensor) এর আগায় **সংশ্লেষকোষ** (Conjugating cell) গঠিত হয়।

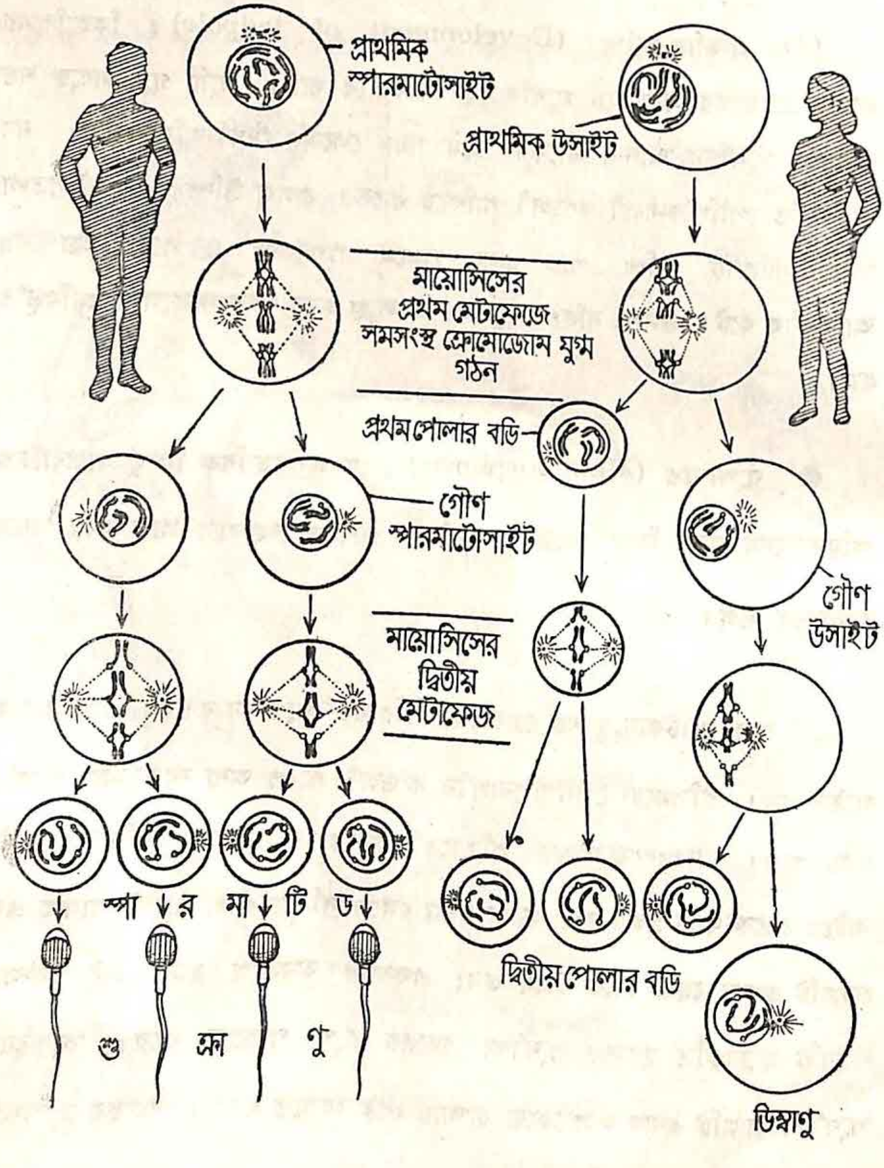


চিত্র 8.24—মিউকোরের যৌন জননের বিভিন্ন পর্যায়।

(6) সংশ্লেষকোষ **গ্যামেট** (Gamete) গঠন করে বলে তাকে **জনন-কোষাধার** (Gametangium) বলা হয় (চিত্র 8.24 ও 8.25)।

(7) দুটি গ্যামেট মিলে গোলাকার, স্থূল কণ্টকময় প্রাকার-বিশিষ্ট কৃষ্ণ-বর্ণ **জাইগোস্পোর** (Zygospore) গঠন করে।

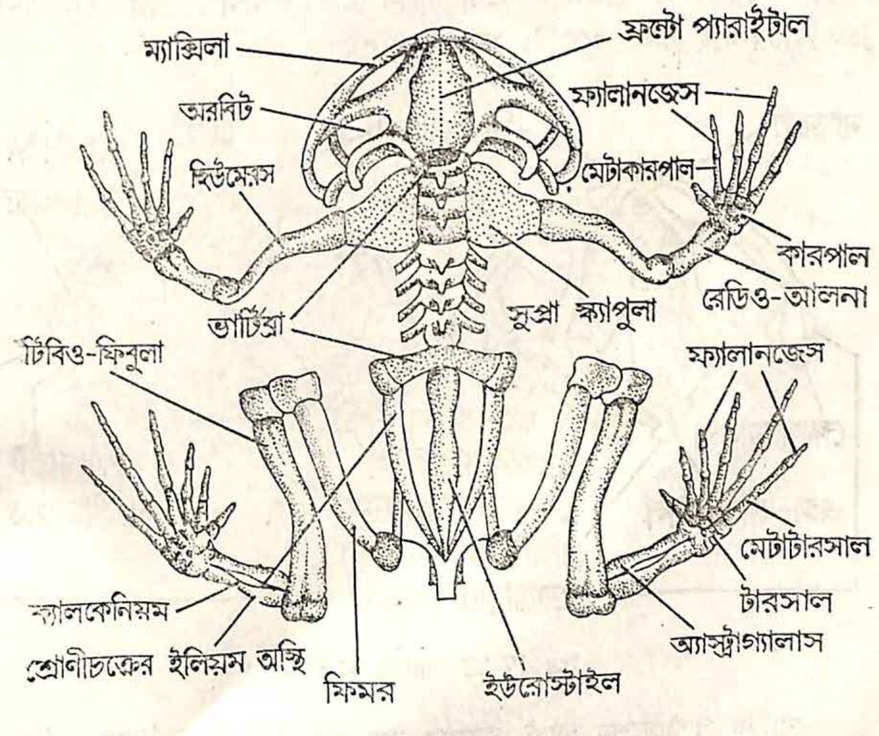
17.11. মানুষের দেহে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপাদনের চিত্ররূপ ***[Diagrammatic representation of the process of Sperm and Ovum production in human being] :***



চিত্র 17·21—মানুষের ক্ষেত্রে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গঠনের চিত্ররূপ।

17.12. কুনো ব্যাঙের কঙ্কালতন্ত্র *[Skeletal system of Toad]* :

মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে কাঠামো গঠনকারী, নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদানে সাহায্যকারী এবং দেহভার বহনে সহায়তাকারী তন্ত্রকে কঙ্কালতন্ত্র বলে।



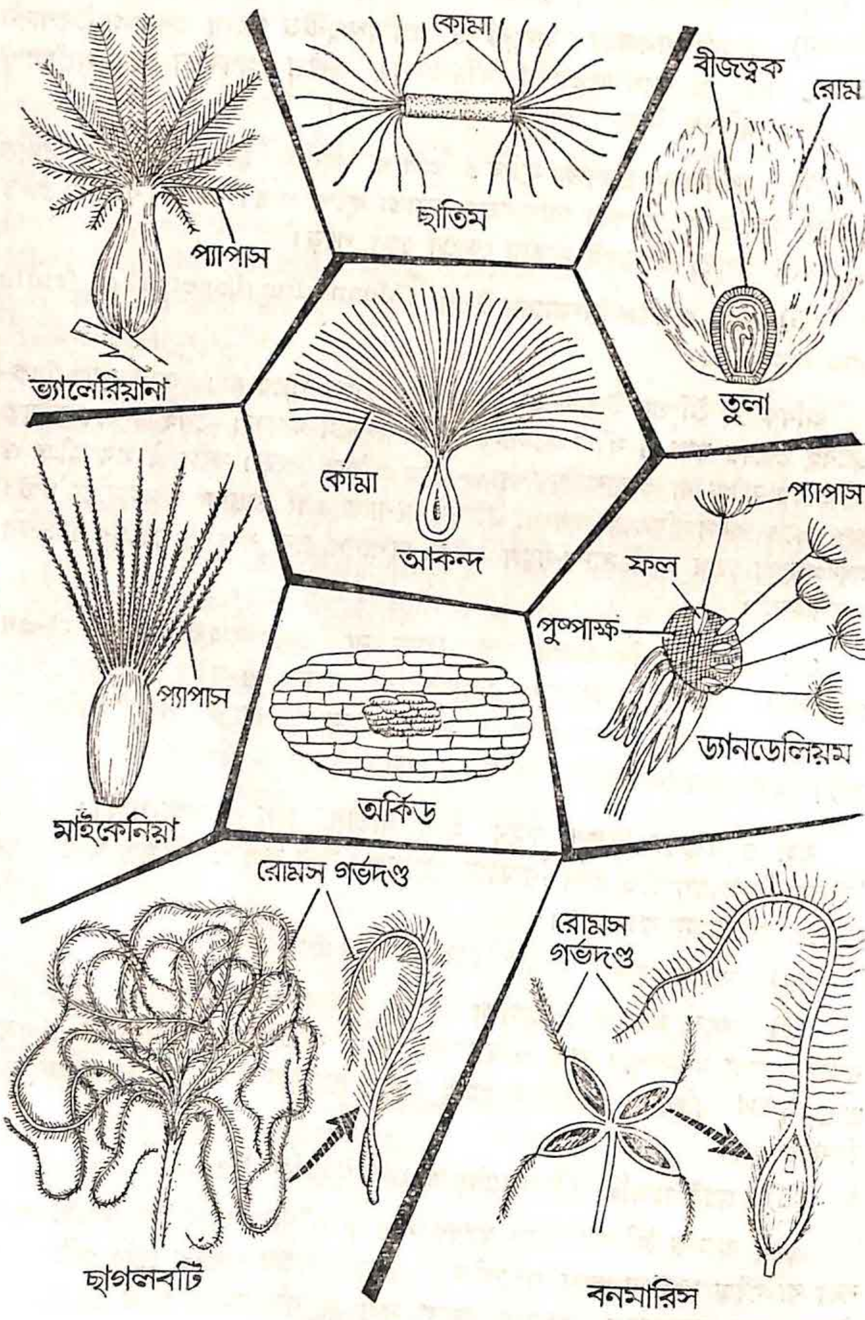
চিত্র 17.22—ব্যাঙের কঙ্কালতন্ত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্রটি প্রকৃতপক্ষে **অন্তঃকঙ্কাল** (Endoskeleton)। কুনো ব্যাঙের দেহে অন্তঃকঙ্কাল বর্তমান—**বহিঃকঙ্কাল** (Exoskeleton) নাই।

কুনো ব্যাঙের অন্তঃকঙ্কালতন্ত্রটি প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত, যথা—

(A) অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্র (Axial skeletal system)।

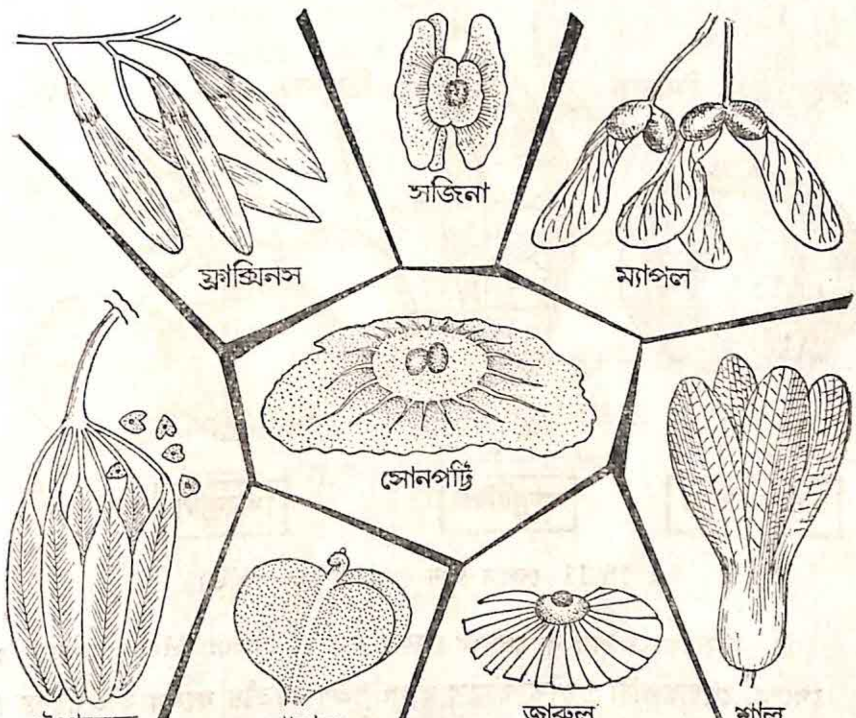
(B) উপাঙ্গিক কঙ্কালতন্ত্র (Appendicular skeletal system)।



চিত্র 15.9—বায়ুর দ্বারা বিস্তার লাভের জন্য ফল ও বীজের গঠন-বৈচিত্র্য।

(1) **গুচ্ছরোম বা কোমা** (Coma) ঃ ওড়ার সুবিধার জন্য **ছাতিম, আকন্দ** প্রভৃতি বীজের এক বা দুই দিকে গুচ্ছরোম জন্মায়, গুচ্ছাকারে নির্গত এই রোমগুলি বীজকে বাতাসে ভেসে যেতে সাহায্য করে।

(2) **পক্ষ** (Wing) ঃ **সজিনা, পারুল, জারুল** প্রভৃতির বীজ এবং **শাল, মাধবীলতা** প্রভৃতির **ফল** এক বা একাধিক **পক্ষ** (Wing), অর্থাৎ ডানার মতো উপাঙ্গের সাহায্যে বিস্তৃত হয়।



চিত্র 15·10—বায়ুর দ্বারা বিস্তারলাভের জন্য ফল ও বীজের গঠন-বৈচিত্র্য।

(3) **প্যাপাস** (Pappus) ঃ **গাঁদা, সূর্যমুখী** প্রভৃতি ফুলের বৃতি সূক্ষ্ম হাল্কা আঁশে পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তিত এই অংগকে **প্যাপাস** (Pappus) বলে। প্যাপাস **প্যারাস্যুটের** কাজ করে।

(4) **স্থায়ী পক্ষল গর্ভদণ্ড** (Permanent hairy styles) ঃ স্থায়ী ও পক্ষল গর্ভদণ্ডবিশিষ্ট **ছাগলবটির ফল** (চিত্র 15.9) বাতাসের অনুকূলে বহুদূর পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে।

8.11. স্পাইরোগাইরা [*Spirogyra*] :

(i) **উদ্ভিদজগতে স্থান** (Systematic position) ঃ স্পাইরোগাইরা **অপুষ্পক** এবং **থ্যালোফাইটা** গোষ্ঠীভুক্ত অতি সাধারণ পিচ্ছিল **সবুজ শেওলা**।



চিত্র 8.27—স্পাইরোগাইরার একটি বিবর্ধিত কোষ।

(ii) **বসতি** (Habitat) ঃ পুকুর, ডোবা, খাল, বিল প্রভৃতির মিঠা জলে স্পাইরোগাইরা স্বচ্ছন্দে ভেসে বেড়ায়। স্রোতযুক্ত ঝর্ণা বা নদীর জলে **স্পাইরোগাইরা অ্যাডনাটা** (*Spirogyra adnata*) নামে একটি প্রজাতি দেখা যায়। এরা নীচের কোষকে **হোল্ডফাস্ট** (holdfast) বা **বন্ধক**-এ রূপান্তরিত করে নিমজ্জিত বস্তুর সঙ্গে সংলগ্ন থাকে।

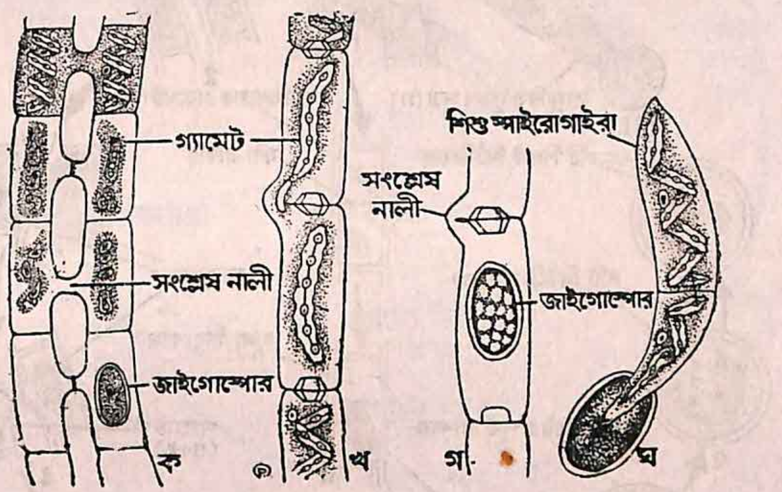
(iii) **গঠন ও জীবন-ইতিহাস** (Structure and life-history) ঃ

(1) স্পাইরোগাইরা দেখতে সুতোর মতো। (2) একটি সারিতে কোষগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকে। (3) স্পাইরোগাইরার দেহের অগ্রভাগ ও পশ্চাৎভাগের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। (4) মাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজন এবং প্রতিটি অপত্য কোষের বৃদ্ধির দ্বারা স্পাইরোগাইরার দেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটে। (5) কোষের গহ্বরময় সাইটোপ্লাজমের কেন্দ্রস্থলে থাকে **নিউক্লিয়াস**। (6) প্রতি কোষে **সর্পিলাকারে** বিন্যস্ত **ফিতার মতো ক্লোরোপ্লাস্ট** স্পাইরোগাইরার বৈশিষ্ট্য। (7) ক্লোরোপ্লাস্ট-ফিতার মধ্যে ঘন প্রতিসরণক্ষম (refractive), বর্ণহীন অসংখ্য **পাইরিনয়েড** (Pyrenoid) সম-দূরত্বে বিদ্যমান। এটি প্রকৃতপক্ষে প্রোটিন-জাতীয় পদার্থ। পাইরিনয়েডের মধ্যে শর্করাখাদ্য সঞ্চিত থাকে।

● **জনন** (Reproduction) ঃ স্পাইরোগাইরা **অঙ্গজ, যৌন ও অপুংজনি** পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে।

(A) **অঙ্গজ জনন** (Vegetative reproduction) ঃ স্পাইরোগাইরার অংশবিশেষ আকস্মিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে (খণ্ডভবন) সেই বিচ্ছিন্ন অংশ দ্রুত নতুন পূর্ণাঙ্গ দেহ গঠন করে। এটি হল অঙ্গজ **জনন প্রক্রিয়া**।

(B) যৌন জনন (Sexual reproduction) ঃ বসন্তকালে যৌন জনন আরম্ভ হয়। ঐ সময় পুং ও স্ত্রী গুণসম্পন্ন দুটি দেহ কাছাকাছি আসে। উভয়ক্ষেত্রেই পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি কোষের প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত হয়ে **গ্যামেট** গঠন করে (চিত্র 8.28ক)। জননকালে **সমান্তরালভাবে** অবস্থিত সন্নিহিত দুই স্পাইরোগাইরার কোষ থেকে নলাকার উপবৃদ্ধি সৃষ্টি হয়। নল দুটি মুখোমুখী বাড়তে থাকে এবং এক সময় পরস্পরকে স্পর্শ করে। শেষে উভয়ের সংযোগ-প্রাকার গলে গিয়ে একটি **সংশ্লেষ নালী** (Conjugating tube) গঠিত হয় (চিত্র 8.28ক)। সংশ্লেষ নালী

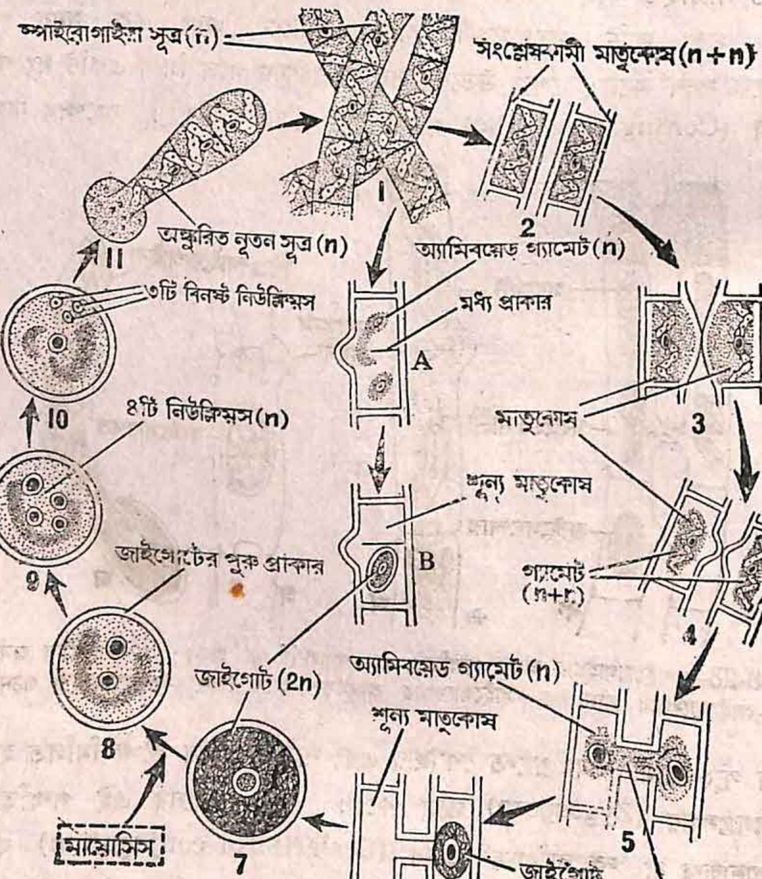


চিত্র 8·28—স্পাইরোগাইরার জনন পদ্ধতিঃ ক—স্ক্যালারিফর্ম জনন; খ—পাশ্বীয় জনন; গ—জাইগোস্পোর গঠন; ঘ—জাইগোস্পোর অঙ্কুরিত হ'য়ে শিশু স্পাইরোগাইরা গঠন।

দিয়ে পুং-গ্যামেট অন্য প্রান্তে পৌঁছায় এবং স্ত্রী-গ্যামেটের সঙ্গে মিলিত হয়ে **জাইগোস্পোর** (Zygospore) গঠন করে। যৌন জননের এই পদ্ধতিকে **সোপানাকার বা স্ক্যালারিফর্ম জনন** (Scalariform conjugation) বলে (চিত্র 8.28ক)। অপরপক্ষে একই স্পাইরোগাইরার দেহে যদি স্ত্রী এবং পুং উভয় গ্যামেটের উৎপত্তি হয় তবে সেক্ষেত্রে যে মিলন ঘটে তাকে **পাশ্বীয় জনন** (Lateral conjugation) (চিত্র 8.28খ) বলে। অনুকূল পরিবেশে জাইগোস্পোর (ঘ) অঙ্কুরিত হয়। এই সময় জাইগোস্পোরের নিউক্লিয়সে হ্রাসকরণ বিভাজন ঘটে এবং চারটি নতুন নিউক্লিয়স গঠিত হয়। চারটি নিউক্লিয়সের মধ্যে তিনটি নষ্ট হয়, কিন্তু চতুর্থটি সাইটোপ্লাজম দ্বারা আবৃত হয়ে প্রাকারাবদ্ধ

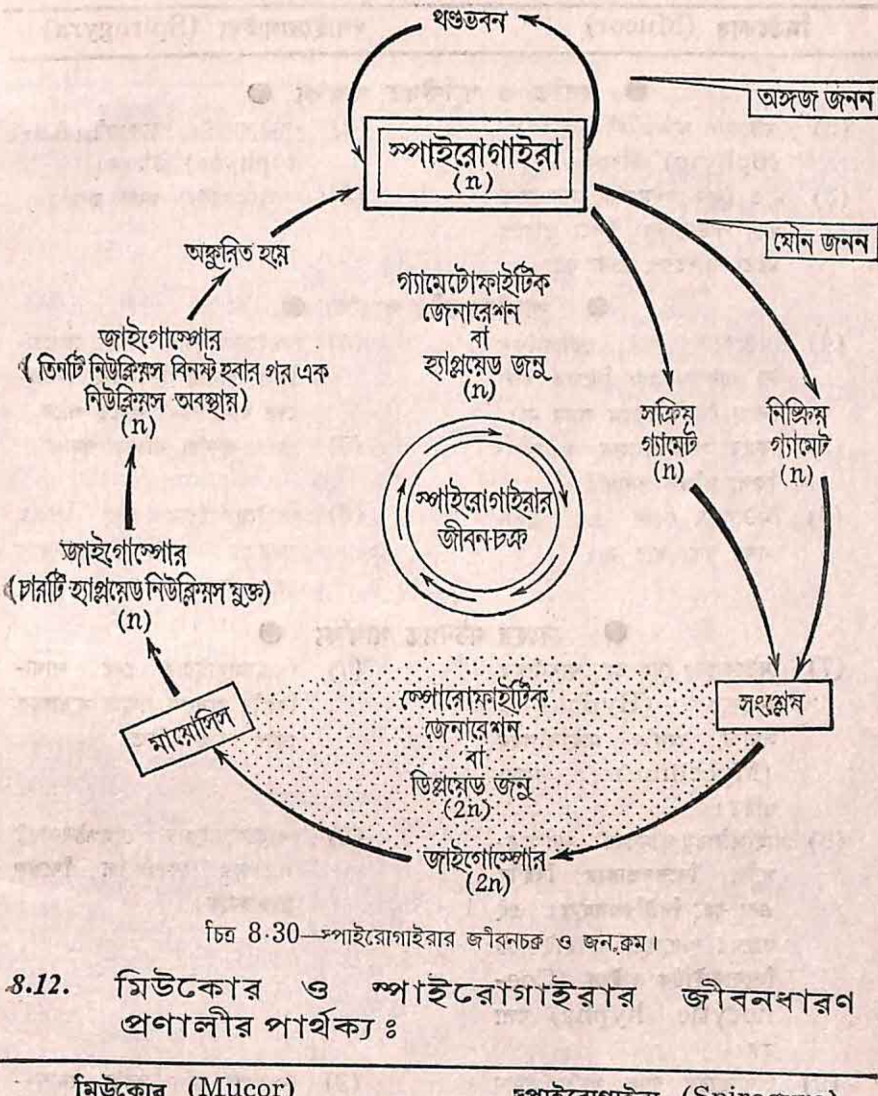
হয়। ঐ প্রাকার বিদীর্ণ হবার পর কোষটির বৃদ্ধি ঘটে এবং নতুন **শিশু স্পাইরোগাইরার** (ঘ) জন্ম হয়।

(C) **অপুংজনি** (Parthenogenesis) : কোন কারণে যৌন পদ্ধতি বিফল হলে গ্যামেটগুলি বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়ে **পার্থেনোস্পোর**



চিত্র 8·29—স্পাইরোগাইরার জনন ও জীবনচক্র।

(Parthenospore) বা **আজাইগোস্পোর** (Azygospore) গঠন করে। আজাইগোস্পোর অংকুরিত হয়ে নতুন স্পাইরোগাইরার জন্ম হয়। চিত্র 8.29 ও 8.30-এ স্পাইরোগাইরার জীবনচক্র দেখানো হল।



চিত্র 8·30—স্পাইরোগাইরার জীবনচক্র ও জনুক্রম।

8.12. মিউকোর ও স্পাইরোগাইরার জীবনধারণ প্রণালীর পার্থক্য ঃ

মিউকোর (Mucor)	স্পাইরোগাইরা (Spirogyra)
● উদ্ভিদজগতে স্থানগত পার্থক্য ●	
(1) মিউকোর অপুষ্পক (Cryptogam), সমাঙ্গদেহী (Thallophyte) গোষ্ঠীর এক ধরনের ছত্রাক (Fungus)।	(1) স্পাইরোগাইরা অপুষ্পক (Cryptogam), সমাঙ্গদেহী (Thallophyte) গোষ্ঠীর অন্তর্গত এক ধরনের শেওলা (Alga)।

মিউকোর (Mucor)	স্পাইরোগাইরা (Spirogyra)
● **বসতি ও পুষ্টিগত পার্থক্য** ●	
(2) মিউকোর **মৃতজীবী** (Saprophyte) উদ্ভিদ।	(2) স্পাইরোগাইরা **স্বভোজী** (Autophyte) উদ্ভিদ।
(3) মৃত জৈব পদার্থের (সাধারণত পচা পাউরুটির) উপরে তুলোর মতো আস্তরণ রচনা করে।	(3) স্পাইরোগাইরা জলে জন্মায়
● **শারীরবৃত্তীয় পার্থক্য** ●	
(4) মিউকোরের দেহে **ক্লোরোফিল না থাকায়—এরা নিজের খাদ্য নিজে তৈরী করতে পারে না।**	(4) স্পাইরোগাইরার দেহে **ক্লোরোফিল থাকায় নিজেরাই নিজেদের খাদ্য তৈরী করতে পারে।**
(5) কোষে **গ্লাইকোজেন** ও **তৈলবিন্দু সঞ্চিত** পদার্থ।	(5) কোষে **শর্করা সঞ্চিত** পদার্থ।
(6) মিউকোরে কোন প্রকার চলন লক্ষ্য করা যায় না।	(6) স্পাইরোগাইরার দেহ জলের স্রোতের সঙ্গে স্থানান্তরে ভেসে যায়।
● **দেহের গঠনগত পার্থক্য** ●	
(7) মিউকোরের দেহ বহু **শাখান্বিত অণুসূত্র** (Hypha)-এর সমষ্টি, অর্থাৎ **মাইসিলিয়ম** (Mycelium) দ্বারা গঠিত।	(7) স্পাইরোগাইরার দেহ **শাখাবিহীন অসংখ্য সবুজ সূত্রাকার কোষ** দ্বারা গঠিত।
(8) মাইসিলিয়ম গঠনকারী অণুসূত্রগুলি **বিভেদপ্রাকার বিহীন** এবং বহু **নিউক্লিয়সযুক্ত**। এই ধরনের অণুসূত্র বা হাইফাকে **সিনোসাইটিক হাইফা** (Coenocytic hypha) বলা হয়।	(8) স্পাইরোগাইরার দেহগঠনকারী সূত্রাকার কোষগুলি **বিভেদ প্রাকারযুক্ত।**
(9) অণুসূত্রের ব্যাস সর্বত্র সমান নয়।	(9) কোষের ব্যাস সর্বত্র সমান—অর্থাৎ কোষের গোড়া ও আগা সব সময় সমান।
(10) মিউকোরের অণুসূত্রের প্রাকার **কাইটিন** (Chitin) দ্বারা গঠিত।	(10) স্পাইরোগাইরায় কোষপ্রাকার **সেলুলোজ** (Cellulose) ও **পেকটোজ** (Pectose) দ্বারা গঠিত।
(11) দেহের উপরে মিউসিলেজ না থাকায় দেহ **পিচ্ছিল নয়।**	(11) দেহের উপরে মিউসিলেজ আবরণ থাকায় **দেহ পিচ্ছিল।**

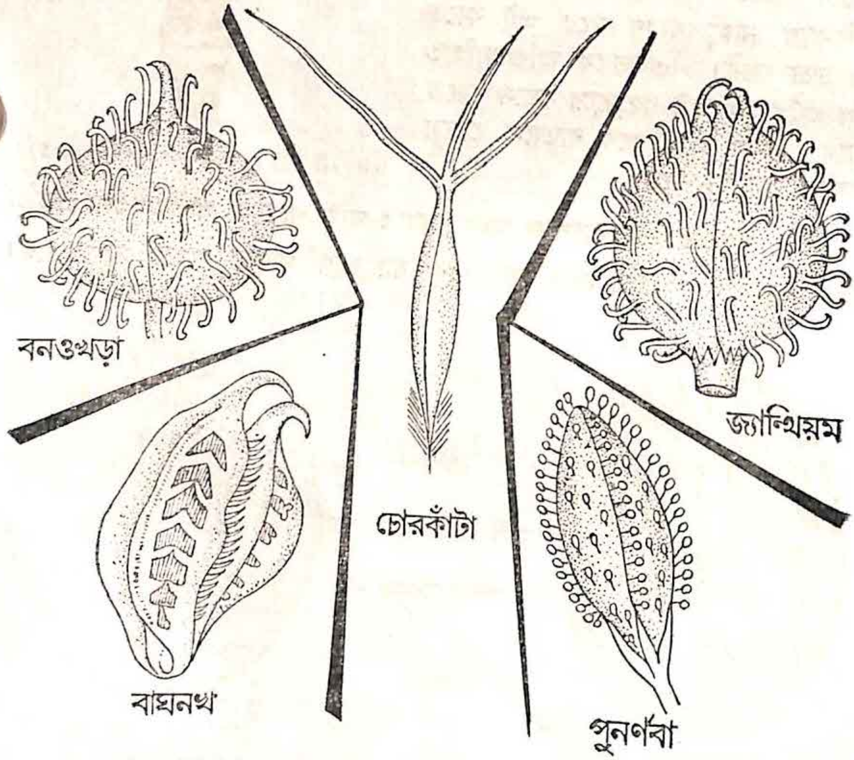
মিউকোর (Mucor)	স্পাইরোগাইরা (Spirogyra)
(12) দেহে ক্লোরোপ্লাস্ট বা পাইরিনয়েড নাই।	(12) দেহে ফিতাকৃতি ক্লোরোপ্লাস্ট (Spiral chloroplast) ও পাইরিনয়েড বর্তমান।
● জননগত পার্থক্য ●	
(13) প্রধানতঃ অযৌন (Asexual) ও যৌন (Sexual) উভয় প্রক্রিয়ায় জনন ক্রিয়া সম্পাদন করে। কদাচিৎ অপ্রজনন (Parthenogenesis) ঘটে।	(13) প্রধানত অংগজ ও যৌন প্রক্রিয়ায় জনন ক্রিয়া সম্পাদন করে। অযৌন জনন প্রক্রিয়া স্পাইরোগাইরায় দেখা যায় না। কদাচিৎ অপ্রজনন (Parthenogenesis) ঘটে।
(14) পরিণত হলে মাইসিলিয়ম থেকে কতকগুলি **স্পোর্যানজিওফোরের বা বায়ব অণুসূত্রের** উদ্ভব হয়। এদের আগায় **স্পোর্যানজিয়ম বা রেণুস্থলী** গঠিত হয়। রেণুস্থলীর মধ্যের প্রোটোপ্লাজম বাইরের দিকে **স্পোরপ্লাজম** ও কেন্দ্রের দিকে গম্বুজাকার **কলুমেলাপ্লাজম** —এই দুই অংশে বিভক্ত হয়। স্পোরপ্লাজম থেকে উৎপন্ন এক বা একাধিক নিউক্লিয়সযুক্ত প্রাকারাবদ্ধ খন্ডগুলিকে **স্পোর** (Spore) বা **রেণু** বলে। এই **রেণুগুলিই অংকুরিত হয়ে নতুন মিউকোরের জন্ম দেয়।**	(14) এই ধরনের জনন দেখা যায় না।
(15) একই রকম দেখতে দুটি **জননকোষের সংশ্লেষের মাধ্যমে আইসোগ্যামি নামক যৌন জনন সম্পন্ন হয়।** সোপানাকার বা পার্শ্বীয় জনন দেখা যায় না।	(15) একই দেহের পাশাপাশি দুটি কোষের মধ্যে **পার্শ্বীয় জনন** (Lateral) এবং দুটি বিভিন্ন স্পাইরোগাইরার দুটি কোষের মধ্যে সংশ্লেষনালী গঠন মাধ্যমে সোপানাকার (Scalariform) যৌন জনন সম্পন্ন হয়।
(16) দুটি গদাকৃতি আদি জননকোষ বিপরীত দিক থেকে অগ্রসর হয় এবং পরে উভয়ে মিলিত হয়।	(16) প্রত্যেক সংগমেচ্ছু কোষ থেকে নলাকার সংশ্লেষনালী গঠিত হয়ে পরস্পর মিলিত হয়।

থাকে এবং ঢেউ-এর ধাক্কায় অল্প সময়ে বহুদূরে বিস্তৃত হয়। পুষ্পাক্ষ এই-ভাবে জলে ভেসে চলার সময় তাতে পচন আরম্ভ হয় এবং পুষ্পাক্ষে আবদ্ধ বীজগুলি একে একে আলগা হ'য়ে জলের তলায় পড়তে থাকে এবং সময়মত অঙ্কুরিত হ'য়ে নতুন গাছের জন্ম দেয়।

(c) **স্পঞ্জ সদৃশ এরিল দ্বারা ঃ অ্যালিসমা, স্যাজিটেরিয়া** প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদের বীজ শস্যসদৃশ, এরিল যুক্ত, সেজন্য হালকা ও জলারাধী। এইসব গাছের বীজ সহজেই বহুদূরে বিস্তৃত হবার সুযোগ পায়।

(C) **প্রাণীর দ্বারা বিস্তার** (Dispersal by animals) ঃ

ফল ও বীজ বিস্তারে প্রাণীকুল উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করে। তবে



চিত্র 15.14—প্রাণীর দ্বারা বিস্তৃত হওয়ার জন্য অভিযোজন।

ণীর দ্বারা বিস্তৃত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ফল বা বীজে উপযুক্ত অভিযোজন ট।

(1) **কণ্টকাকীর্ণ বীজ ও ফল দ্বারা ঃ বীজ ও ফল কণ্টকাকীর্ণ** হলে সহজে প্রাণীর গায়ে আটকে যায়।

উদাহরণ—**বনওখড়া, বাঘনখ** (চিত্র 15 14)।

(2) **স্থায়ী বৃতি দ্বারা ঃ চোরকাঁটা গাছের স্থায়ী বৃতি** থাকায় এবং **পক্ষল গর্ভমুণ্ড** কঠিন রোমের মতো হওয়ায় ফলগুলি সহজে প্রাণীর **গায়ে** আটকে যায় (চিত্র 15.14)।

(3) **আঠালো বীজ ও ফল দ্বারা ঃ** আঠালো বীজ বা ফল অতি সহজেই বিস্তৃত হয়। **আপাং, পুনর্ণবা, হুড়হুড়ে** প্রভৃতি গাছের **আঠালো** ফল মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর গায়ে লেগে যায় এবং ঐ সব প্রাণীর অজ্ঞাতেই বহু-দূরে বাহিত হয় (চিত্র 15.14)।

(4) **ফল ও বীজের উজ্জ্বল বর্ণ দ্বারা ঃ** অত্যুজ্জ্বল লাল **কুঁচবীজকে** সুখাদ্য ভ্রমে পাখী মুখে ক'রে উড়ে যায়, কিন্তু ভুল ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে পরিত্যাগ করে। এইভাবে কুঁচবীজ বহুদূরে বিস্তৃত হয়।

(5) **সুস্বাদু বীজ ও ফল দ্বারা ঃ** সুস্বাদু বীজ ও ফল **শেয়াল, বাদুড়** ও অন্যান্য পশুপক্ষীকে আকর্ষণ করে। এই সব প্রাণী সুস্বাদু ফল বা বীজ দূরে বয়ে নিয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে অপাচ্য বীজ ও ফল মলের সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়। ঐ বীজ বা ফল থেকে কালক্রমে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়। **আম, জাম, কাঁঠাল, বট, অশ্বথ, খেজুর, কুল** প্রভৃতি বীজ এইভাবে বিভিন্ন প্রাণীর দ্বারা বিস্তৃত হয়।

(D) **যান্ত্রিক বিস্তার** (Dispersal by mechanical means) ঃ

যান্ত্রিক বিস্তার-পদ্ধতিতে কোনরূপ বাহকের প্রয়োজন হয় না। উদ্ভিদ নিজেই বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বীজকে যথাসম্ভব দূরে নিক্ষেপ করতে চেষ্টা করে।

মিউকোর (Mucor)	স্পাইরোগাইরা (Spirogyra)
(17) জননকোষদ্বয়ের যুগ্ম প্রাকার দ্রবীভূত হয় এবং দুটি গ্যামেটের মিলনে জাইগোস্পোর উৎপন্ন হয়। দুটি কোষের মিলনস্থলে অর্থাৎ মধ্যভাগে জাইগোস্পোর (Zygospore) গঠিত হয়।	(17) সংশ্লেষনালীর যুগ্ম প্রাকার গলে গিয়ে একটি পথ গঠিত হয়। ঐ পথ দিয়ে একটি গ্যামেট পুরোপুরি অন্য কোষের মধ্যে চলে আসে এবং সেখানকার অচল গ্যামেটটিকে নিষিক্ত করে। অর্থাৎ কোষের ভিতরেই জাইগোস্পোর গঠিত হয়।
(18) জাইগোস্পোর গোলাকার স্থূল, কণ্টকময় ও কৃষ্ণবর্ণ।	(18) জাইগোস্পোর ডিম্বাকার, মসৃণ ত্বকযুক্ত।
(19) জাইগোস্পোর অঙ্কুরিত হয়ে প্রোমাইসিলিয়ম গঠন করে। তার আগায় আদি রেণুস্থলী ও রেণুস্থলীর মধ্যে রেণু গঠিত হয়। আদি রেণুস্থলীতে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন ঘটে। রেণু অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মিউকোরের জন্ম হয়।	(19) জাইগোস্পোর অঙ্কুরিত হতে থাকে। এর নিউক্লিয়সে মায়োসিস বিভাজন সম্পন্ন হয়। তিনটি নিউক্লিয়সের মৃত্যু ঘটে—কেবল একটি বেঁচে থাকে। একটি নিউক্লিয়সযুক্ত জাইগোস্পোর থেকে সরাসরি নতুন স্পাইরোগাইরার জন্ম হয়।
(20) সংশ্লেষ বিফল হলে প্রত্যেক গ্যামেট থেকে আজাইগোস্পোর নামে এক প্রকার অঙ্গ গঠিত হয়। সেটি অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মিউকোরের জন্ম দেয়। এই প্রক্রিয়াকে অপুংজনি বলে।	(20) এখানেও আজাইগোস্পোরের মাধ্যমে অপুংজনি পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

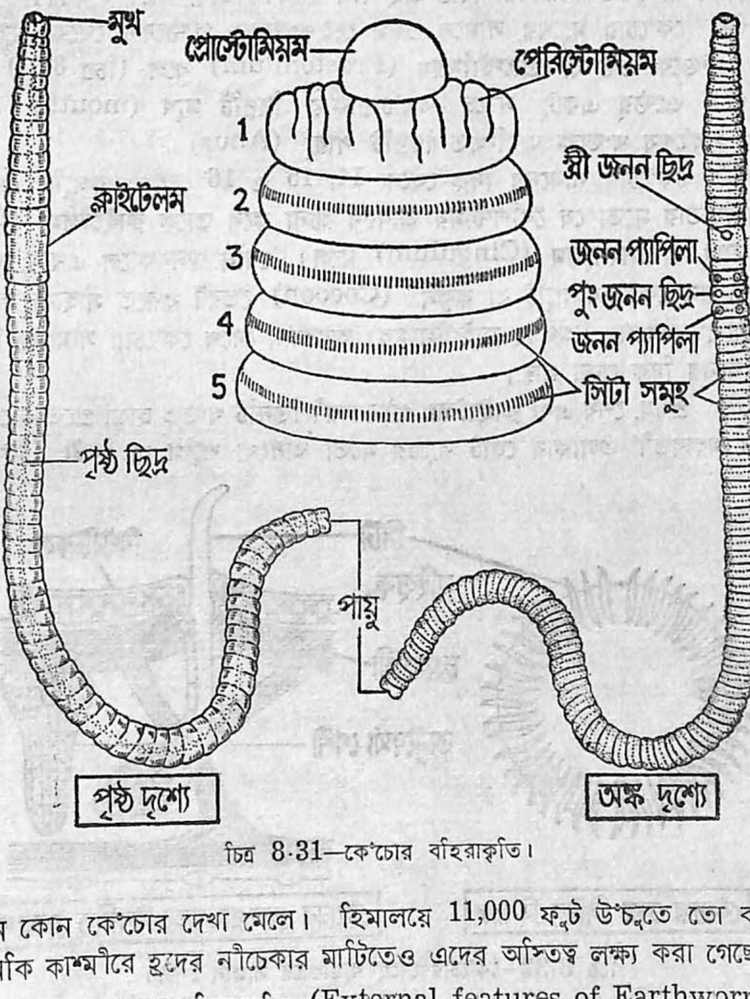
প্রাণী [Animal]

8.13. কেঁচো [*Earthworm*] :

(i) **বিজ্ঞানসম্মত নাম** (Scientific name) : কেঁচোর বিজ্ঞানসম্মত নাম ফেরিটিমা পোস্থুমা (*Pheretima posthuma*)।

(ii) **প্রাণিজগতে কেঁচোর স্থান** (Systematic position of earthworm) : কেঁচো অমেরুদণ্ডী (Invertebrate) এবং অ্যানেলিডা (Annelida) পর্ব এবং অলিগোকিটা (Oligochaeta) শ্রেণীভুক্ত প্রাণী।

(iii) **স্বভাব ও বসতি** (Habit and Habitat) ঃ কেঁচো মাটির নীচে গর্ত করে বাস করে। আলগা ভিজে মাটি এদের বেশী পছন্দ। কেঁচো নিশাচর। দিনের বেলায় এরা গর্তে চুপচাপ থাকে। রাত্রে খাবারের খোঁজে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। অত্যধিক গ্রীষ্ম ও শীতে প্রতিকূল আবহাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য এরা মাটির 12-18 ইঞ্চি নীচে গর্তের মধ্যে চলে যায়। মেরু অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র কেঁচোর দেখা মেলে। শুধু মাটিতেই নয়, স্বাদু জলেও



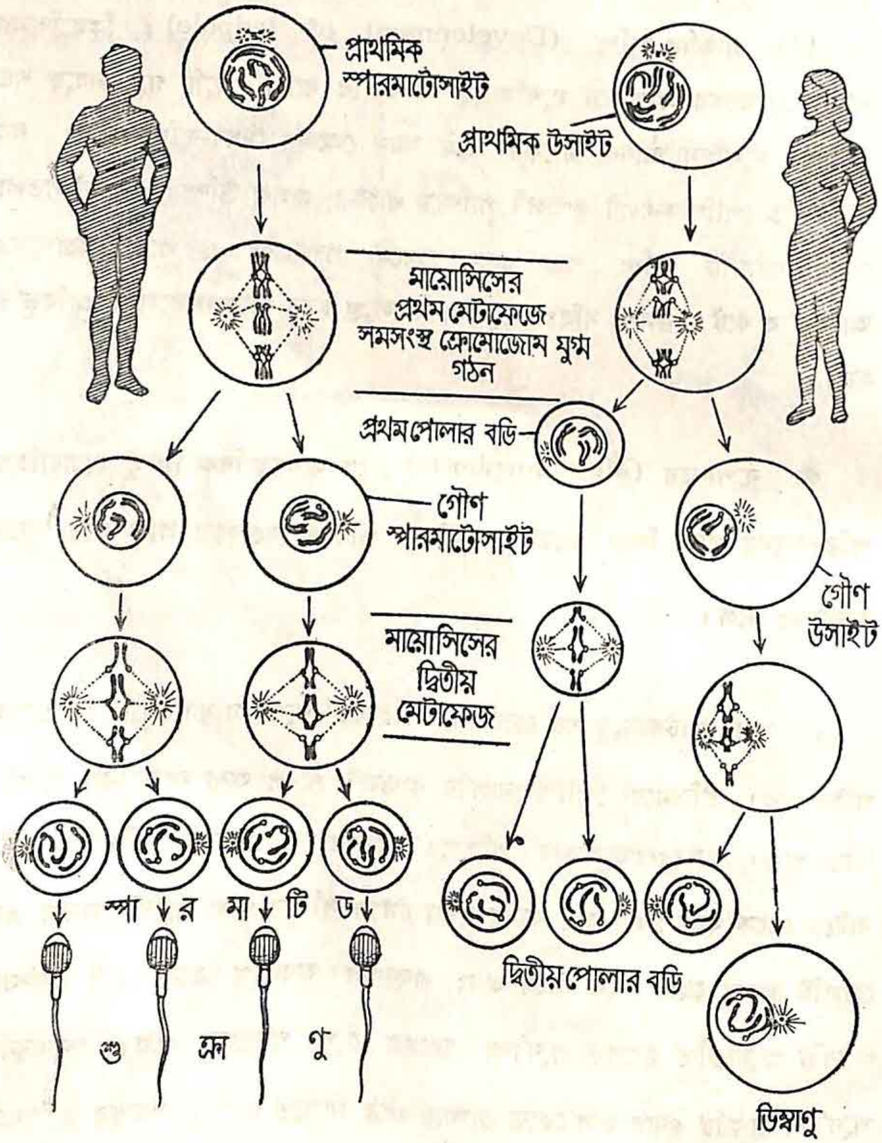
চিত্র 8·31—কেঁচোর বহিরাকৃতি।

কোন কোন কেঁচোর দেখা মেলে। হিমালয়ে 11,000 ফুট উঁচুতে তো বটেই, এমনকি কাশ্মীরে হ্রদের নীচেকার মাটিতেও এদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে।

(iv) **কেঁচোর বহিরাকৃতি** (External features of Earthworm) ঃ

(1) কেঁচোর দেহ লম্বা, গোলাকার। এদের দেহ লম্বায় সাধারণত 14 থেকে 20 সে. মি. এবং প্রস্থে প্রায় 3-5 মি. মি.। 100 থেকে 150টি আংটির মতো দেহখণ্ডক (Metamere) দ্বারা কেঁচোর দেহ গঠিত।

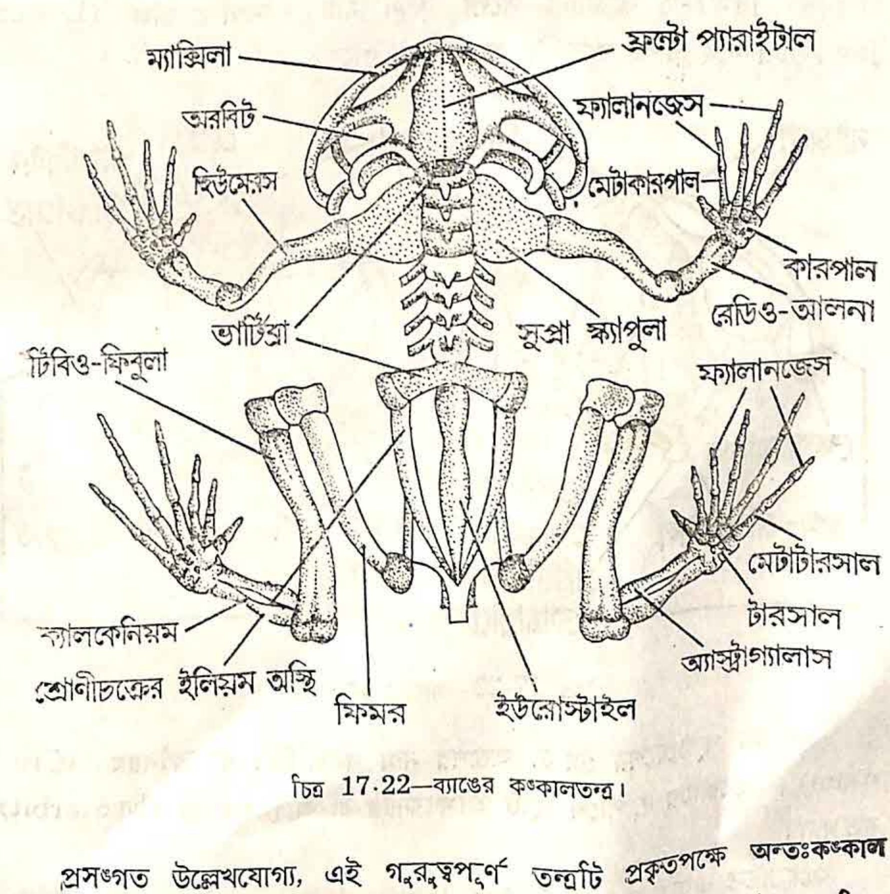
17.11. মানুষের দেহে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপাদনের চিত্ররূপ *[Diagrammatic representation of the process of Sperm and Ovum production in human being]* **:**



চিত্র 17·21—মানুষের ক্ষেত্রে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গঠনের চিত্ররূপ।

17.12. কুনো ব্যাঙের কঙ্কালতন্ত্র *[Skeletal system of Toad] :*

মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে কাঠামো গঠনকারী, নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদানে সাহায্যকারী এবং দেহভার বহনে সহায়তাকারী তন্ত্রকে কঙ্কালতন্ত্র বলে।



চিত্র 17·22—ব্যাঙের কঙ্কালতন্ত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্রটি প্রকৃতপক্ষে **অন্তঃকঙ্কাল** (Endoskeleton)। কুনো ব্যাঙের দেহে অন্তঃকঙ্কাল বর্তমান—**বহিঃ-কঙ্কাল** (Exoskeleton) নাই।

কুনো ব্যাঙের অন্তঃকঙ্কালতন্ত্রটি প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত, যথা—

(A) অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্র (Axial skeletal system)।

(B) উপাঙ্গিক কঙ্কালতন্ত্র (Appendicular skeletal system)।

মিউকোর (Mucor)	স্পাইরোগাইরা (Spirogyra)
(17) জননকোষদ্বয়ের যুগ্ম প্রাকার দ্রবীভূত হয় এবং দুটি গ্যামেটের মিলনে জাইগোস্পোর উৎপন্ন হয়। দুটি কোষের মিলনস্থলে অর্থাৎ মধ্যভাগে জাইগোস্পোর (Zygospore) গঠিত হয়।	(17) সংশ্লেষনালীর যুগ্ম প্রাকার গলে গিয়ে একটি পথ গঠিত হয়। ঐ পথ দিয়ে একটি গ্যামেট পুরোপুরি অন্য কোষের মধ্যে চলে আসে এবং সেখানকার অচল গ্যামেটটিকে নিষিক্ত করে। অর্থাৎ কোষের ভিতরেই জাইগোস্পোর গঠিত হয়।
(18) জাইগোস্পোর গোলাকার স্থূল, কণ্টকময় ও কৃষ্ণবর্ণ।	(18) জাইগোস্পোর ডিম্বাকার, মসৃণ ত্বকযুক্ত।
(19) জাইগোস্পোর অঙ্কুরিত হয়ে প্রোমাইসিলিয়ম গঠন করে। তার আগায় আদি রেণুস্থলী ও রেণুস্থলীর মধ্যে রেণু গঠিত হয়। আদি রেণুস্থলীতে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন ঘটে। রেণু অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মিউকোরের জন্ম হয়।	(19) জাইগোস্পোর অঙ্কুরিত হতে থাকে। এর নিউক্লিয়সে মায়োসিস বিভাজন সম্পন্ন হয়। তিনটি নিউক্লিয়সের মৃত্যু ঘটে—কেবল একটি বেঁচে থাকে। একটি নিউক্লিয়সযুক্ত জাইগোস্পোর থেকে সরাসরি নতুন স্পাইরোগাইরার জন্ম হয়।
(20) সংশ্লেষ বিফল হলে প্রত্যেক গ্যামেট থেকে আজাইগোস্পোর নামে এক প্রকার অঙ্গ গঠিত হয়। সেটি অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মিউকোরের জন্ম দেয়। এই প্রক্রিয়াকে অপুংজনি বলে।	(20) এখানেও আজাইগোস্পোরের মাধ্যমে অপুংজনি পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

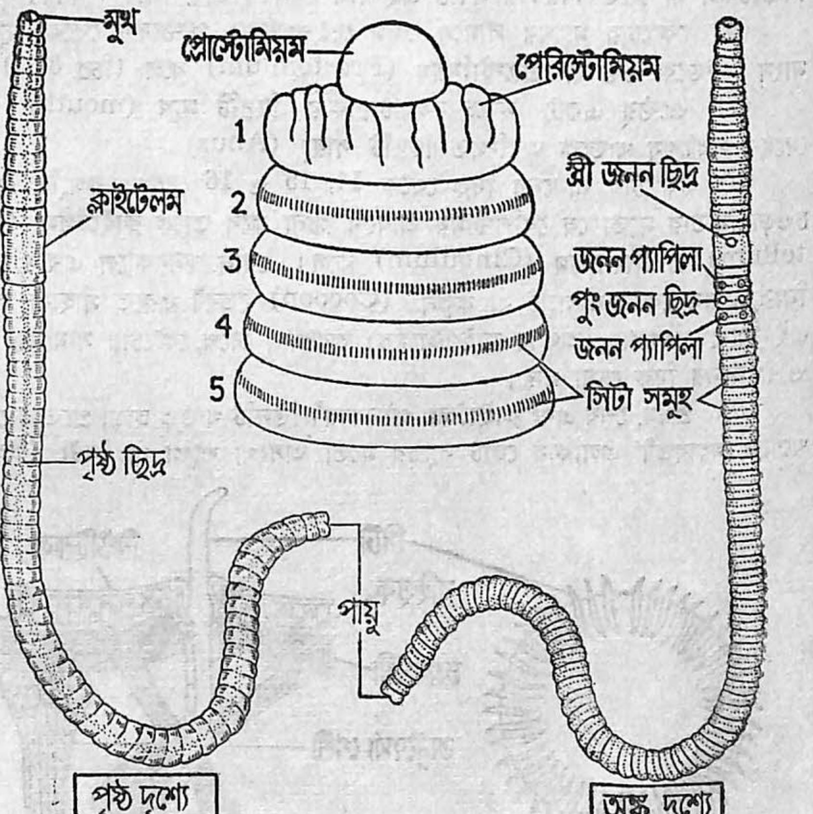
প্রাণী [Animal]

8.13. কেঁচো [*Earthworm*] :

(i) **বিজ্ঞানসম্মত নাম (Scientific name) :** কেঁচোর বিজ্ঞানসম্মত নাম ফেরিটিমা পোস্থুমা (*Pheretima posthuma*)।

(ii) **প্রাণিজগতে কেঁচোর স্থান (Systematic position of earthworm) :** কেঁচো অমেরুদণ্ডী (Invertebrate) এবং অঙ্গুরীমাল বা আনেলিডা (Annelida) পর্ব এবং অলিগোকিটা (Oligochaeta) শ্রেণীভুক্ত প্রাণী।

(iii) **স্বভাব ও বসতি** (Habit and Habitat) : কেঁচো মাটির নীচে গর্ত করে বাস করে। আলগা ভিজে মাটি এদের বেশী পছন্দ। কেঁচো নিশাচর। দিনের বেলায় এরা গর্তে চুপচাপ থাকে। রাত্রে খাবারের খোঁজে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। অত্যধিক গ্রীষ্ম ও শীতে প্রতিকূল আবহাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য এরা মাটির 12-18 ইঞ্চি নীচে গর্তের মধ্যে চলে যায়। মেরু অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র কেঁচোর দেখা মেলে। শুধু মাটিতেই নয়, স্বাদু জলেও



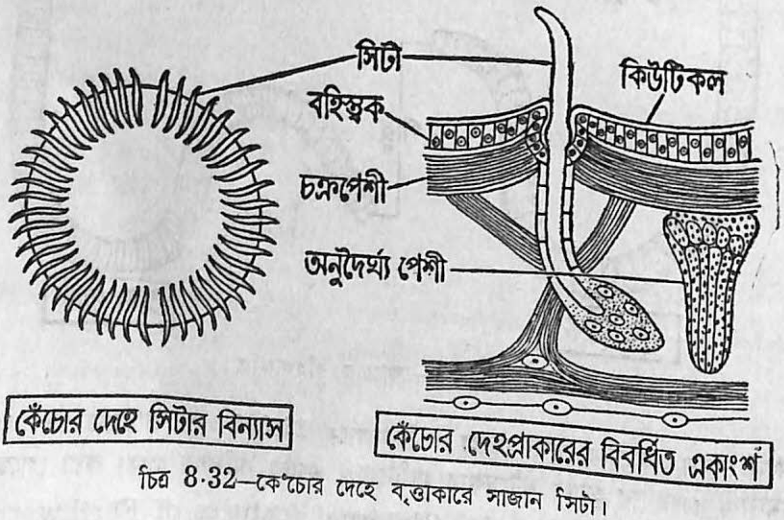
চিত্র 8·31—কেঁচোর বহিরাকৃতি।

কোন কোন কেঁচোর দেখা মেলে। হিমালয়ে 11,000 ফুট উঁচুতে তো বটেই, এমনকি কাশ্মীরে হ্রদের নীচেকার মাটিতেও এদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে।

(iv) **কেঁচোর বহিরাকৃতি** (External features of Earthworm) :

(1) কেঁচোর দেহ লম্বা, গোলাকার। এদের দেহ লম্বায় সাধারণত 14 থেকে 20 সে. মি. এবং প্রস্থে প্রায় 3-5 মি. মি.। 100 থেকে 150টি আংটির মতো দেহখণ্ডক (Metamere) দ্বারা কেঁচোর দেহ গঠিত।

(2) কেঁচোর দেহের সম্মুখভাগ সূচাল, পশ্চাদ্‌ভাগ ক্রমশঃ স্থূল।
(3) কেঁচোর রং সাধারণত পিঙ্গল তবে অঙ্কদেশ গাঢ়।
(4) কেঁচোর দেহ **কিউটিকল** বা **কৃত্তিকাবরণী** (Cuticle) দ্বারা আবৃত থাকে।
(5) দেহের মধ্যপৃষ্ঠরেখা বরাবর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত একটি গাঢ় দাগ (পৃষ্ঠদেশীয় রক্তনালী) বিস্তৃত। নরম, পাতলা ও স্বচ্ছ **কিউটিকল** বা **কৃত্তিকাবরণীর** নীচে এই দাগ ধমনী-পথকে নির্দেশ করে।
(6) কেঁচোর মুখের সামনে প্রথম দেহখণ্ডকের পৃষ্ঠদেশ থেকে ঝুলন্ত মাংস পিণ্ডকে ওষ্ঠ বা **প্রোস্টোমিয়ম** (Prostomium) বলে (চিত্র 8.31)।
(7) ওষ্ঠের একটু নীচে অর্ধচন্দ্রাকার ছিদ্রটি **মুখ** (mouth) এবং দেহের সর্বশেষ খণ্ডকে অবস্থিত ছিদ্রটি **পায়ু** (Anus)।
(8) কেঁচোর সামনের দিক থেকে 14, 15 ও 16 দেহখণ্ডকগুলি একত্রে চওড়া ফিতার মতো যে বৈশিষ্ট্যময় আবরণ রচনা করে তাকে **ক্লাইটেলম** (Clitellum) বা **সিংগুলম** (Cingulum) বলে। যৌন জননকালে এখান থেকে নিঃসৃত রস কেঁচোর গুটি বা ককুন (Cocoon) তৈরী করতে সাহায্য করে। এই বিশেষ অংশের (অর্থাৎ ক্লাইটেলমের) অবস্থান দেখে কেঁচোর সামনের দিক ও পিছনের দিক চেনা যায়।
(9) প্রথম, শেষ এবং ক্লাইটেলম গঠনকারী তিনটি খণ্ডক ছাড়া প্রত্যেক দেহখণ্ডের মধ্যবর্তী এলাকায় ছোট সূচের মতো অসংখ্য **শুঙ্গ** বা **সিটা** (Seta)



চিত্র 8.32—কেঁচোর দেহে বৃত্তাকারে সাজান সিটা।

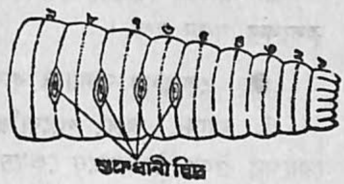
বৃত্তাকারে সাজান থাকে। সিটা সাধারণত অঙ্কদেশে এবং পার্শ্বদেশে অধিক সংখ্যায় থাকে। এগুলি দেখতে ইংরাজী "S" অক্ষরের মতো। **সিটা** চলাফেরায়, দেহকে গর্তে সংলগ্ন রাখতে এবং অনুভূতি গ্রহণে সহায়তা করে।

(10) ক্লাইটেলমের নীচে 17 ও 19 দেহখণ্ডকে পুংজনন ছিদ্রের সমরেখায় সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগে একজোড়া ক'রে **জনন-পিড়কা** (Genital pore) বর্তমান। জনন-পিড়কায় কোন ছিদ্র নেই। তবে সংগমের সময় এগুলি পেয়ালাকৃতি লাভ ক'রে চোষক (Sucker) হিসাবে কাজ করে।

(i) **অতিরিক্ত দেহছিদ্র** (Extra body openings) ঃ 14শ দেহখণ্ডকস্থ মধ্যস্থলের ছিদ্রকে **স্ত্রী-জননছিদ্র** (Female genital pore) বলে। তেমনি 18শ দেহখণ্ডকের দুপাশে অংকদেশে দুটি **পুং-জননছিদ্র** (Male genital pore) বিদ্যমান। কেঁচো **উভলিংগ** প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও সাধারণত দুটি পৃথক দেহের সহায়তায় জনন-কার্য সম্পন্ন হয়।

(ii) এদিকে 6ষ্ঠ থেকে 9ম দেহখণ্ডক পর্যন্ত প্রতিটি খণ্ডকের সংযোগস্থলে দুধারে দুটি করে **শুক্রধানী ছিদ্র** (Spermathecal aperture) বর্তমান (চিত্র 8.33)।

(iii) পিঠের দিকে 12শ থেকে শেষ দেহখণ্ডক পর্যন্ত এক জোড়া দেহখণ্ডের অন্তর্বর্তী সংযোজক রেখাতে একটি করে ছিদ্র দেখা যায়। এই ছিদ্রগুলিকে **পৃষ্ঠছিদ্র** (Dorsal pore) বলে। তবে শেষ দেহখণ্ডকের পূর্বে সংযোজক রেখাটিতে পৃষ্ঠছিদ্র থাকে না। **পৃষ্ঠছিদ্রনিঃসৃত** রস দেহকে **সিক্ত রাখে**। কেঁচো ত্বকের সাহায্যে শ্বসন চালায়। দেহত্বক সিক্ত থাকায়, গ্যাসের আদান-প্রদান সহজ হয়।



চিত্র 8·33—কেঁচোর অগ্রভাগ (পার্শ্বদৃশ্য)।

(iv) **রেচনছিদ্র** (Nephridiopore) ঃ পিঠের দিকে দুটি খণ্ডক ছাড়া সব খণ্ডকেই এলোমেলোভাবে অনেকগুলি ছিদ্র বর্তমান। এই ছিদ্রগুলিকে **নেফ্রিডিওপোর** (Nephridiopore) বলে। **নেফ্রিডিওপোরের মাধ্যমে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ দেহের বাহিরে পরিত্যক্ত হয়।**

● **কৃষিকার্যে কেঁচোর উপযোগিতা** (Importance of Earthworm in agriculture) ঃ

কেঁচো জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। তাই কৃষিকার্যে কেঁচোর অবদান অসামান্য।

নিম্নলিখিত কারণে মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়ঃ

1. **বিজ্ঞানী হেনসন** (Henson)-এর মতে এক একর জমিতে 53 হাজার কেঁচো বাস করে। এরা প্রতি বছর একর প্রতি প্রায় 80 টন ভিতরের মাটিকে বিষ্ঠাকুণ্ডলী আকারে মাটির উপরে পাঠিয়ে দেয়। ফলে উপরের **মাটি উর্বর হয়**। এইভাবে 20 বছরে পৃথিবীপৃষ্ঠের স্থূলতা 7.5 সেণ্টি-

● কয়েকটি পরিচিত উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মত নাম ●
(Scientific names of some Common Plants and their pronunciation)

বাংলা নাম বিজ্ঞানসম্মত নাম উচ্চারণ

অপরাজিতা—*Clitoria ternatea*
ক্লিটোরিয়া টারনেসিয়া
অশ্বত্থ—*Ficus religiosa*
ফিকস রিলিজিওসা
আকন্দ—*Calotropis procera*
ক্যালোট্রোপিস প্রোসেরা
আখ—*Saccharum officinarum*
স্যাকারম অফিসিনেরম
আতা—*Annona squamosa*
অ্যানোনা স্কোয়ামোসা
আদা—*Zingiber officinale*
জিনজিবার অফিসিনেলী
আনারস—*Ananasa sativa*
অ্যানানাসা স্যাটিভা
আপেল—*Pyrus malus*
পাইরস ম্যালস
আম—*Mangifera indica*
ম্যানজিফেরা ইনডিকা
আমড়া—*Spondias pinnata*
স্পনডিয়াস পিনাটা
উচ্ছে—*Momordica charantia*
মমরডিকা চ্যারানটিয়া
ওল—*Amorphophallus campanulatus*
অ্যামরফফ্যালস ক্যামপ্যানুলেটস
কচু—*Calocasia antiquorum*
ক্যালোকেসিয়া অ্যাণ্টিকোরম
কদম্ব—*Anthocephalus cadamba*
অ্যান্থোসিফেলস কদম্বা
কপি (বাঁধা)—*Brassica oleracea var. capitata*
ব্রাসিকা অলিরেসিয়া ভার ক্যাপিটাটা
কপি (ফুল)—*Brassica oleracea var. botrytis*
ব্রাসিকা অলিরেসিয়া ভার বট্রাইটিস

বাংলা নাম বিজ্ঞানসম্মত নাম উচ্চারণ

কফি—*Coffea arabica*
কফিয়া অ্যারেবিকা
কমলালেবু—*Citrus aurantium*
সাইট্রস অরেনসিয়ম
করবী—*Nerium odorum*
নেরিয়ম ওডোরম
কলা—*Musa paradisiaca*
মুসা প্যারাডিসিয়াকা
কাজুবাদাম—*Anacardium occidentale*
অ্যানাকার্ডিয়ম অক্সিডেণ্টালি
কাঁঠাল—*Artocarpus heterophyllus (A. integrifolia)*
আর্টোকারপস হেটারোফাইলস
কার্পাস—*Gossypium herbaceum*
গসিপিয়ম হার্বেসিয়ম
কৃষ্ণচূড়া—*Caesalpinia pulcherrima*
সিসালপিনিয়া পালচেরিমা
খয়ের—*Acacia catechu*
অ্যাকাসিয়া ক্যাটেচু
খেজুর—*Phoenix sylvestris*
ফিনিক্স সিলভেসট্রিস
গন্ধরাজ—*Gardenia florida*
গার্ডেনিয়া ফ্লোরিডা
গম—*Triticum aestivum*
ট্রিটিকম অ্যাসটিভম
গোলআলু—*Solanum tuberosum*
সোলেনম টিউবারোসম
গোলাপ—*Rosa centifolia*
রোজা সেন্টিফোলিয়া
চন্দন—*Santalum album*
স্যানটালম অ্যালবম

বাংলা নাম বিজ্ঞানসম্মত নাম উচ্চারণ

চন্দ্রমল্লিকা—*Chrysanthemum coronarium*
ক্রিসানথিমম করোনেরিয়ম

চা—*Camellia sinensis*
ক্যামেলিয়া সাইনেনসিস

চাঁপা—*Michelia champaca*
মাইকেলিয়া চমপাকা

চিনাবাদাম—*Arachis hypogea*
অ্যারাকিস হাইপোজিয়া

ছোলা—*Cicer arietinum*
সাইসার অ্যারিয়েটিনম

জবা—*Hibiscus rosa-sinensis*
হিবিসকস রোজা-সাইনেনসিস

জাম—*Eugenia jambolana*
ইউজেনিয়া জামবোলানা

জামরুল—*Eugenia malaccensis*
ইউজেনিয়া মালাক্কেনসিস

ঝুমকোলতা—*Passiflora suberosa*
প্যাসিফ্লোরা সুবেরোজা

টগর—*Ervaatemia divericata*
আরভেটেমিয়া ডাইভারিকাটা
(*Tabernamontana coronorea*)

টমেটো—*Lycopersicum esculentum*
লাইকোপারসিকম এসকুলেনটম

ডুমুর—*Ficus carica*
ফিকস ক্যারিকা

ঢেঁড়স—*Hibiscus esculentus*
হিবিসকস এসকুলেনটস

তাল—*Borassus flabellifer*
বোরেসস ফ্ল্যাভেলিফার

তুলসী—*Ocimum sanctum*
অসিমম স্যাংটম

থানকুনি—*Hydrocotyl asiatica*
হাইড্রোকোটিল অ্যাসিয়েটিকা

ধনে—*Coriandrum sativum*
কোরিয়েনড্রম স্যাটিভম

বাংলা নাম বিজ্ঞানসম্মত নাম উচ্চারণ

ধান—*Oryza sativa*
ওরাইজা স্যাটিভা

নয়নতারা—*Catharanthus roseus* (*Vinca rosea*)
ক্যাথারেনথস রোজিয়স

নারিকেল—*Cocos nucifera*
ককস নুসিফেরা

নেসপাতি—*Pyrus communis*
পাইরস কমিউনিস

পটল—*Trichosanthes dioica*
ট্রাইকোজায়নথিস ডাইওইকা

পদ্ম—*Nelumbium speciosum*
নেলামবিয়ম স্পেসিওসম

পলাশ—*Butea frondosa*
বুটিয়া ফ্রন্ডোসা

পাট—*Corchorus olitorius, C. capsularis*
করকোরস অলিটোরিয়স, করকোরস ক্যাপসুলারিস

পাতিলেবু—*Citrus medica*
সাইট্রস মেডিকা

পেঁপে—*Carica papaya*
ক্যারিকা প্যাপায়া

পেঁয়াজ—*Allium cepa*
অ্যালিয়ম সিপা

ফণিমনসা—*Opuntia dillenii*
অপানসিয়া ডিলেনী

বকফুল—*Sesbania grandiflora*
সেসবেনিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা

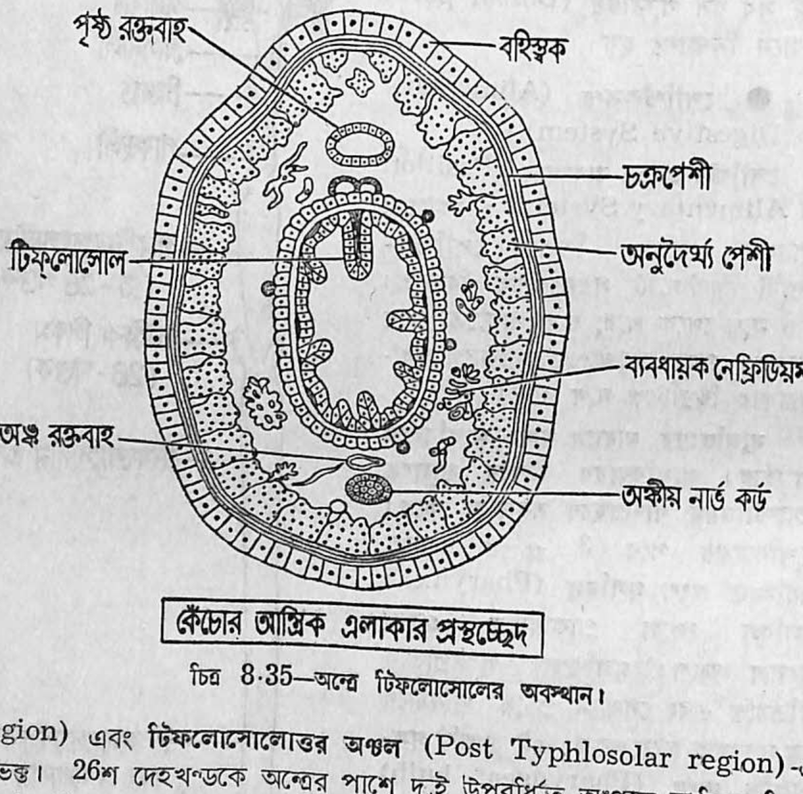
বট—*Ficus bengalensis*
ফিকস বেঙ্গালেনসিস

বাগানবিলাস—*Bougainvillaea spectabilis*
বোগেনভেলিয়া স্পেকটাবিলিস

বাঁশ—*Bambusa aurandinacea*
ব্যামবুসা অরেনডিনেসিয়া

বাসক—*Adhatoda vasica*
অ্যাঢাটোডা ভ্যাসিকা

আকৃতির বিশেষ ভাঁজটি **টিফলোসোল** (Typhlosole) নামে পরিচিত। এটি অন্ত্রগহ্বরের প্রায় কেন্দ্র পর্যন্ত ঝুলে থাকে। অন্ত্রের শোষণতল বৃদ্ধি করাই এর উদ্দেশ্য। টিফলোসোলের অবস্থান অনুযায়ী অন্ত্র **প্রাক্-টিফলোসোলীয় অঞ্চল** (Pre-typhlosolar region), **টিফলোসোলীয় অঞ্চল** (Typhlosolar



চিত্র 8·35—অন্ত্রে টিফলোসোলের অবস্থান।

region) এবং **টিফলোসোলোত্তর অঞ্চল** (Post Typhlosolar region)-এ বিভক্ত। 26শ দেহখন্ডকে অন্ত্রের পাশে দুই উপবর্ধিত অংগকে **আন্ত্রিক সিকা** (Intestinal caeca) বলে।

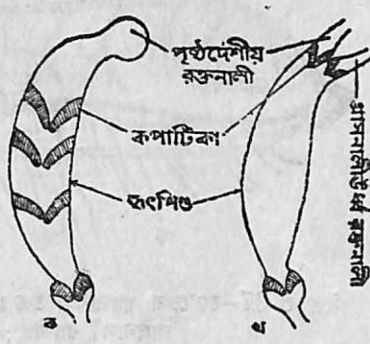
অন্ত্রের শেষাংশ **মলাশয়** (Rectum)। মলাশয়ের শেষপ্রান্ত **পায়ু**; পায়ুছিদ্র দিয়ে কুন্ডলীকৃত বিষ্ঠা দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হয়।

● **খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক** (Feeding and digestion) ঃ মাটিতে গর্ত খোঁড়ার সময় কেঁচো প্রচুর পরিমাণে বীজ, পচা পাতা, বিভিন্ন প্রাণীর ডিম্বাণু, লার্ভা প্রভৃতি গলাধঃকরণ করে। রাত্রে গর্তের বাইরে এসে কেঁচো প্রয়োজনমত পাতা ও শাক-সবজি গ্রহণ করে। গলাধঃকরণ করার আগে গলবিলীয় বাল্ব নিঃসৃত শ্লেষ্মা (mucus) দ্বারা সেগুলিকে ভিজিয়ে নরম করা হয়। কেঁচো পাতার সরু অংশকে প্রোস্টোমিয়ম দ্বারা ধরে মুখে পোড়ে। এই কাজে গলবিল চোষকের কাজ করে। সেখানকার মাংসপেশীর তরঙ্গায়িত চলন (Peristalsis) গৃহীত খাদ্যকে গ্রাসনালীতে ঠেলে পাঠায়। সেখানে খাদ্যের সঙ্গে

এনজাইম মেশে। তারপর খাদ্য স্থূল পেশীবহুল গিজার্ডে নেমে আসে। সেখানে খাদ্য নিষ্পেষিত হবার পর প্রকৃত পরিপাকের জন্য পাকস্থলীতে আসে। উপযুক্তভাবে পরিপাক করা খাদ্য তৎপরে অন্ত্রে নামে এবং সেখানেই খাদ্যরসের শোষণ ঘটে। খাদ্যের অদ্রবীভূত অংশ মাটির সঙ্গে পায়ুপথে দেহের বাইরে চলে যায়।

● **রক্তসংবহন তন্ত্র** (Circulatory system) ঃ কেঁচোর রক্ত—**রক্তকণিকা** (Blood corpuscles) ও **প্লাজমা** (Plasma) নিয়ে গঠিত। কেঁচোর **রক্তকণিকাগুলি বর্ণহীন ও নিউক্লিয়সযুক্ত।** উন্নত প্রাণীর ক্ষেত্রে **রক্তকণিকায়** হিমোগ্লোবিন থাকে, কিন্তু কেঁচোর ক্ষেত্রে **প্লাজমায় হিমোগ্লোবিন** থাকে।

কেঁচোর রক্তসংবহনতন্ত্র কতকগুলি রক্তনালী দ্বারা গঠিত। **উন্নত প্রাণীর মতো কেঁচোর দেহে প্রকৃত হৃৎপিণ্ড নাই।** অপেক্ষাকৃত মোটা ও স্পন্দনশীল ফাঁসের মতো চার জোড়া রক্তনালী হল কেঁচোর তথাকথিত **হৃৎপিণ্ড**। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলেই সারা দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে **কপাটক** বা **কপাটিকা** (Valve) থাকায় রক্ত নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয় এবং দেহের সমস্ত অংশ ঘুরে পুনরায় স্বস্থানে ফিরে আসে। বৃহৎ রক্তনালী বিভক্ত হয়ে ক্ষুদ্র রক্তনালী এবং ক্ষুদ্র রক্তনালী বিভক্ত হয়ে সূক্ষ্ম রক্তনালী গঠিত হয়। সূক্ষ্ম রক্তনালীগুলি পরে জালক (Capillary)-আকারে বিন্যস্ত থাকে।



চিত্র 8.36—কেঁচোর হৃৎপিণ্ডের গঠন ঃ (ক) 7ম, (খ) 13শ খণ্ডকের হৃৎপিণ্ড।

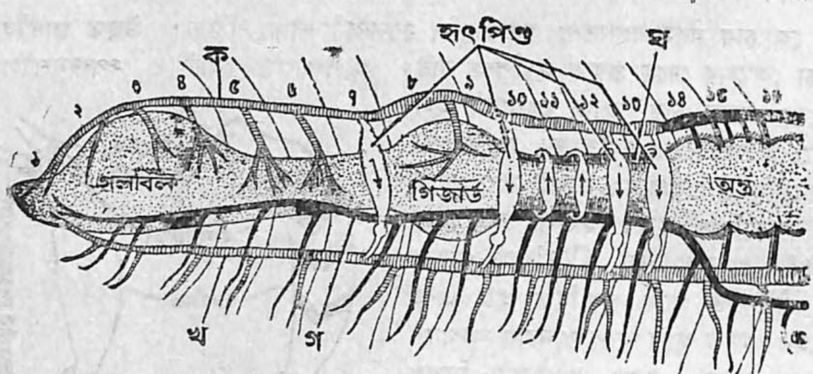
কেঁচোর রক্তসংবহনতন্ত্রে **তিনটি প্রধান রক্তনালী** আছে। নালীগুলি লম্বালম্বি দেহের সমান্তরাল রেখায় বিস্তৃত।

1. **পৃষ্ঠদেশীয় রক্তনালী বা পৃষ্ঠরক্তবাহ** (Dorsal blood vessel) ঃ দেহপ্রাকার ও পৌষ্টিক নালীর অন্তবর্তী স্থানে* পৃষ্ঠ মধ্যরেখা বরাবর এই রক্তবাহটি দেহের পিছন দিক থেকে গলবিল পর্যন্ত লম্বালম্বি বিস্তৃত। এখানে নালীটি অসংখ্য জালিকায় বিভক্ত হয়ে গলবিলকে বেষ্টন করে এবং গিজার্ড, গ্রাসনালী ও গলবিল প্রভৃতি অঙ্গে রক্ত যোগায়। পৃষ্ঠরক্তবাহের পুরু ও পেশীবহুল প্রাকারের ক্রম-সংকোচন ও প্রসারণের ফলে দেহের সম্মুখ-ভাগে রক্ত পরিচালিত হয়। হৃৎপিণ্ড মাধ্যমে অল্প পরিমাণে রক্ত অঙ্করক্তবাহে আসে।

* অর্থাৎ পৌষ্টিকনালীর উপর।

2. **অংকদেশীয় রক্তনালী** বা **অংকরক্তবাহ** (Ventral blood vessel) ঃ এটি পৌষ্টিক নালীর নীচে লম্বালম্বি বিস্তৃত। হৃৎপিণ্ড পৃষ্ঠরক্তবাহ ও অংকরক্তবাহের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করে। অংকরক্তবাহে কোন কপাটক নাই।

3. **অধঃনাভীয় রক্তবাহ** (Sub-neural blood vessel) ঃ এটি অংকীয় নার্ভসূত্রের তলা দিয়ে বিস্তৃত। প্রথম রক্তনালী দুটির চেয়ে এই নালী বেশী সরু। কেঁচোর পিছনের দিক থেকে 14শ খণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হবার পর এটি 13শ খণ্ডকে বিভক্ত হয় এবং গ্রাসনালী বা অন্ননালীর দু-পাশ দিয়ে সামনের দিকে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত চলে যায়। এই কারণে শাখা দুটিকে **পার্শ্ব অন্ননালী রক্তবাহ** বা **গ্রাসনালী-পার্শ্বীয় রক্তনালী** (Lateral oesophageal blood vessel) বলে। এই নালী দুটি দেহের অগ্রভাগ থেকে দূষিত রক্ত গ্রহণ



চিত্র 8·37—কেঁচোর রক্তসংবহনতন্ত্র ঃ ক—পৃষ্ঠরক্তবাহ ; খ—অংকরক্তবাহ ; গ—পার্শ্ব-অন্ননালী রক্তবাহ ; ঘ—ঊর্ধ্ব-অন্ত্রদেশীয় রক্তবাহ।

করে। এদিকে **ঊর্ধ্ব-অন্ত্রদেশীয় রক্তবাহ** বা **গ্রাসনালী-ঊর্ধ্ব রক্তনালী** (Supra intestinal blood vessel) নামে ক্ষুদ্র নালীটি পৃষ্ঠরক্তবাহের নীচে ও অন্ননালীর উপর দিয়ে 9ম দেহখণ্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত।

● **রেচনতন্ত্র** (Excretory system) ঃ নাইট্রোজেনঘটিত বিপাকজাত বস্তুকে রেচন পদার্থ বলে। রেচনতন্ত্র মাধ্যমে রেচন পদার্থ দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হয়।

কেঁচোর প্রধান রেচন অংগ **নেফ্রিডিয়ম*** (Nephridium)। প্রথম দুই দেহখণ্ড ব্যতীত প্রতি খণ্ডেই নেফ্রিডিয়ম বর্তমান। নেফ্রিডিয়ম দেখতে উভয় প্রান্ত খোলা কুণ্ডলীকৃত নালীর মতো।

কেঁচোর নেফ্রীডিয়ম তিন প্রকার ; যথা—

(1) **ব্যবধায়ক নেফ্রিডিয়ম** (Septal nephridium)—15শ দেহ-খণ্ডকের পরবর্তী প্রতিটি দেহখণ্ড-ব্যবধানকারী প্রাকারের উভয়পার্শ্বে ব্যবধায়ক

* নেফ্রিডিয়ম—একবচন ; নেফ্রিডিয়া (Nephridia)—বহুবচন।

নেফ্রিডিয়ম সংলগ্ন থাকে। এদের সংখ্যা 80 থেকে 100। ব্যবধায়ক **নেফ্রিডিয়মকে আদর্শ নেফ্রিডিয়ম** (চিত্র 8.37) বলে।

আদর্শ নেফ্রিডিয়মের সিলিয়াযুক্ত **ফানেলাকৃতি** অংশটিকে **নেফ্রোস্টোম** (Nephrostome) বলে। দেহগহ্বর বা সিলোমের মধ্যে নেফ্রোস্টোম অবস্থিত, অপরপ্রান্ত প্রান্তনালীতে যুক্ত। সংক্ষিপ্ত **নলাকার সোজা অংশ**, দীর্ঘ **সর্পিল** বা পাকানো অংশ এবং অগ্রভাগের নেফ্রিডিয়ম নালী নিয়ে নেফ্রিডিয়মের দেহ গঠিত।

(2) **ত্বকীয় নেফ্রিডিয়ম** (Integumentary nephridium) — ক্লাইটেলম অঞ্চলস্থ দেহখন্ডকে প্রচুর সংখ্যায় এই ধরনের নেফ্রিডিয়ম বর্তমান। প্রথম দুই দেহখন্ড ব্যতীত প্রত্যেক দেহখন্ডে ত্বকীয় নেফ্রিডিয়মের সংখ্যা 200 থেকে 500। ত্বকীয় নেফ্রিডিয়ম ক্ষুদ্রতম। এতে নেফ্রোস্টোম থাকে না। তাছাড়া এটি **রেচনছিদ্রের** (Nephridiopore) মাধ্যমে সোজাসুজি বাইরে উন্মুক্ত হয়।



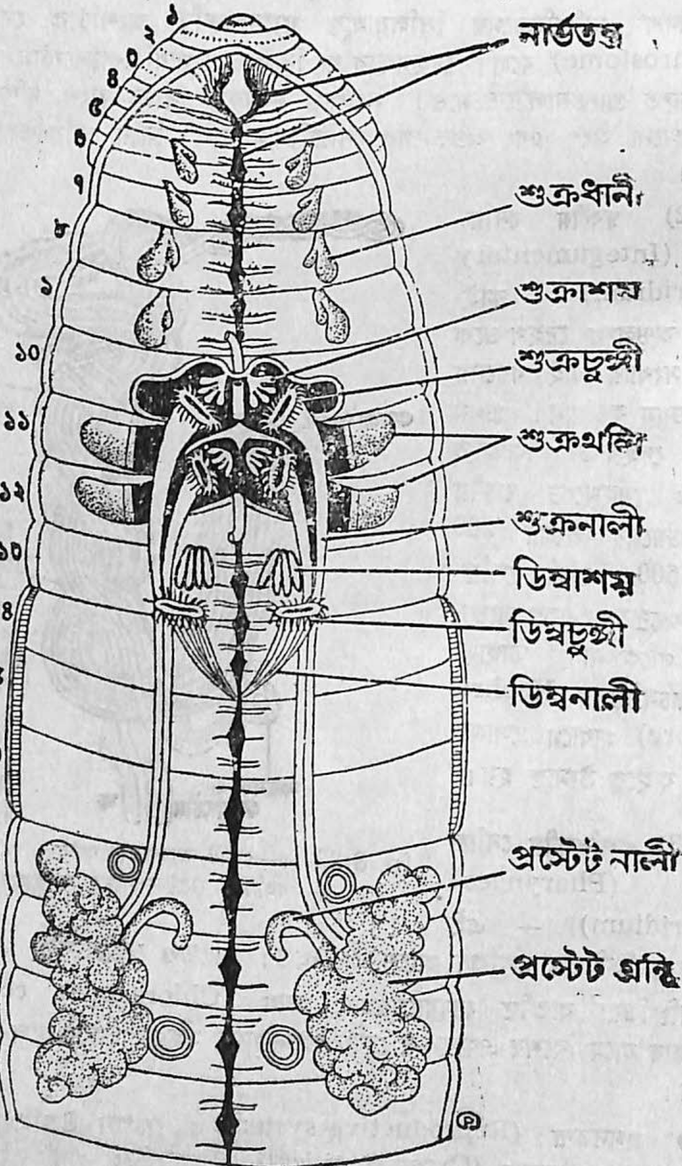
চিত্র 8.38—ক—একটি আদর্শ (ব্যবধায়ক) নেফ্রিডিয়ম ; খ—বিবর্ধিত নেফ্রোস্টোমের লম্বচ্ছেদ।

(3) **গলবিলীয় নেফ্রিডিয়ম** (Pharyngeal nephridium) — এই জাতীয় নেফ্রিডিয়ম গলবিল অংশে অবস্থিত। এতেও নেফ্রোস্টোম থাকে না।

নেফ্রিডিয়া ব্যতীত **ক্লোরাগোজেন কোষ** (Chloragogen cells) বা **পীতকোষ** নামে বিশেষ একপ্রকার কোষ রেচনকার্যে সহায়তা করে বলে অনেকের বিশ্বাস।

● **জননতন্ত্র** (Reproductive system) : কেঁচো উভলিঙ্গ প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও **পরনিষেক** (Cross fertilization) পদ্ধতিই কার্যকরী। পুংজননতন্ত্রের প্রধান অংগ দুইজোড়া **শুক্রাশয়** (Testis)। পৌষ্টিক নালীর নীচে নার্ভসূত্রের উভয় পাশে 10 ও 11 খন্ডকের প্রত্যেকটিতে একজোড়া করে শুক্রাশয় বর্তমান। শুক্রাশয় প্রধানত চার থেকে আটটি সাদা আঙুলের

মতো অংশ নিয়ে গঠিত। প্রতিটি শুক্রাশয় নীচে অবস্থিত সেই দিকের **শুক্রথলি** (Seminal vesicle)-র সংগেও যুক্ত। শুক্রাশয়ের নীচে একটি করে



চিত্র 8·39—কেঁচোর জননতন্ত্র (নার্ভতন্ত্রসহ)।

সিলিয়াযুক্ত **শুক্রচুঙ্গী** (Seminal funnel) বর্তমান। শুক্রচুঙ্গী ক্রমশঃ নলাকারে শুক্রথলি ভেদ করে নীচে নেমে আসে। এই অংশকে **শুক্রনালী**

(Vasa deferentia) বলে। অংকীয় নার্ভসূত্রের প্রতি পাশ বরাবর একটি করে শুক্রনালী 18 দেহখণ্ডে নেমে আসে এবং পাশের প্রস্টেট গ্রন্থি থেকে নির্গত প্রস্টেট নালীর সঙ্গে মিলিত হয়। প্রস্টেট গ্রন্থি আকারে বড়, রং সাদা। প্রস্টেট নালী ও সেই পাশের শুক্রনালী মিলিত হয়ে 18 দেহখণ্ডের অংকদেশে অবস্থিত দুটি **পুং-জননছিদ্রে** (Male gonopore) যুক্ত হয়। এই পথে শুক্রাণু দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। 17 ও 19 দেহখণ্ডের অংক-দেশ পুং-জননছিদ্র-সংলগ্ন উঁচু স্থান অর্থাৎ **জনন পিড়কা** (Genital papillae) জননকার্যে সহায়তা করে।

স্ত্রী-জননতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ একজোড়া **ডিম্বাশয়** (Ovary)। 12 ও 11 দেহখণ্ডের মধ্যবর্তী পর্দার পিছনে ডিম্বাশয় অবস্থিত। আঙুলের মতো কতকগুলি অংশ একত্রিত হয়ে ডিম্বাশয় গঠিত। প্রতি ডিম্বাশয়ের পশ্চাতে সিলিয়াযুক্ত যে ফানেল আছে তাকে **ডিম্বচুঙ্গী** বা **ওভিডিউকাল ফানেল** (Oviducal funnel) বলে। ডিম্বচুঙ্গী ক্রমশঃ সরু হয়ে **ডিম্বনালী** (Oviduct) গঠন করে। 14 দেহখণ্ডের অংকদেশে মধ্যস্থলে অবস্থিত স্ত্রী-জননছিদ্রে (Female genital pore) উভয় দিকের ডিম্বনালী উন্মুক্ত হয়। ডিম্বাশয়ে উৎপন্ন ডিম্বাণু ডিম্বনালী বেয়ে স্ত্রী-জননছিদ্রের ভিতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। ডিম্বাশয় ও ডিম্বনালী বাদে 6, 7, 8 ও 9 খণ্ডকে একজোড়া করে, অর্থাৎ মোট চার জোড়া **শুক্রধানী** (Spermatheca) বা **শুক্র-সঞ্চয় থলি** বর্তমান। এই থলিগুলিতে সঙ্গমকালে অন্য কেঁচোর শুক্রাণু জমা হয়। ঐ সঞ্চিত শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়।

8.14(A). মাছ *[Fish] :*

● **রুইমাছ** (Rohu fish) ঃ মাছ জলে বাস করে, এরা **প্রাথমিক জলজ প্রাণী** (Primary aquatic animal)। **মিঠা জল** (Sweet water) এবং **লোনা জল** (Saline water)-এ পৃথক পৃথক ধরনের মাছ জন্মায়। এছাড়া এমন কিছু মাছ আছে যেগুলি ঈষৎ লবণাক্ত খাঁড়ি অঞ্চলে বাস করে।

অধিকাংশ মাছের দেহ বিভিন্ন প্রকার **আঁশ** (Scale)-এ ঢাকা থাকে। তবে অনেক মাছের দেহ আঁশবিহীন। **মাগুর, ট্যাংরা, শিঙি প্রভৃতি আঁশবিহীন মাছের দৃষ্টান্ত।**

পাখনা রশ্মি (Fin ray) ও যুক্ত **জোড় পাখনা** (Paired fin) মাছের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাছের শ্বাসঅঙ্গ **ফুলকা** (Gill)। ফুলকার সাহায্যে জলে এরা শ্বসন চালায়। জল থেকে ডাঙগায় তুললে কতকগুলি মাছ মরে না। এই ধরনের মাছকে **জিওল মাছ** বলে। কৈ, শিঙি, মাগুর হ'ল এই জাতীয় মাছ। জিওল মাছ অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে বাতাসের অক্সিজেন সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে।

দেহের কাঠামোর ভিত্তিতে মাছ দু' প্রকার—**তরুণাস্থিময় মাছ** (Cartilagenous fish), যেমন—হাঙর, শংকর মাছ, গিটার মাছ, ইলেকট্রিক রে ইত্যাদি এবং **অস্থিময় মাছ** (Bony fish), যেমন—রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, কৈ ইত্যাদি।

আদর্শ অস্থিময় মাছ বলতে রুইকে এবং আদর্শ তরুণাস্থিময় মাছ বলতে হাঙরকে বোঝায়। নীচে রুই ও হাঙরের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হ'ল।

(i) **মাছের প্রকারভেদ** (Types of fish) **:** **রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস, বাটা, ট্যাংরা, তোপ্সে, ভেটকি, ইলিশ, বোয়াল, আড়, পুঁটি, শিঙি, মাগুর, কৈ** প্রভৃতি নানা জাতের এবং নানা আকৃতির মাছ আছে।

(ii) **বিজ্ঞানসম্মত নাম** (Scientific name) **:** রুই মাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম **লেবিও রোহিটা** (*Labeo rohita*)।

(iii) **প্রাণিজগতে স্থান** (Systematic position) **:** **পর্ব—কর্ডাটা** (Chordata), **উপপর্ব—ভার্টিব্রাটা** (Vertebrata) ও **শ্রেণী—অস্টিকথিস** (Osteichthes)।

(iv) **স্বভাব ও বসতি** (Habit and Habitat) **:** রুইমাছ পুকুর, খাল, বিল, নদী, হ্রদ প্রভৃতির মিঠা জলে বাস করে। বদ্ধজলে এরা ডিম পাড়ে না।

(v) **রুইমাছের বহিরাকৃতি** (External features of Rohu fish) **:** রুইমাছের মস্তকের অগ্রভাগ ও পৃষ্ঠদেশের বর্ণ ঈষৎ কালচে, কিন্তু পাখনা এবং অঙ্কদেশের রং লালচে। (1) রুই মাছের দেহ লম্বা **মাকুর মতো**। দেহ তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা—**মস্তক** (Head), **দেহকাণ্ড** (বা ধড়) (Trunk) ও **লেজ** (Tail)।

(2) দেহের মধ্যভাগ চওড়া, সম্মুখভাগ এবং পশ্চাদ্‌ভাগ ক্রমশঃ **সরু**, পার্শ্বদেশ ঈষৎ চাপা।

● **মস্তক** (Head) **:**

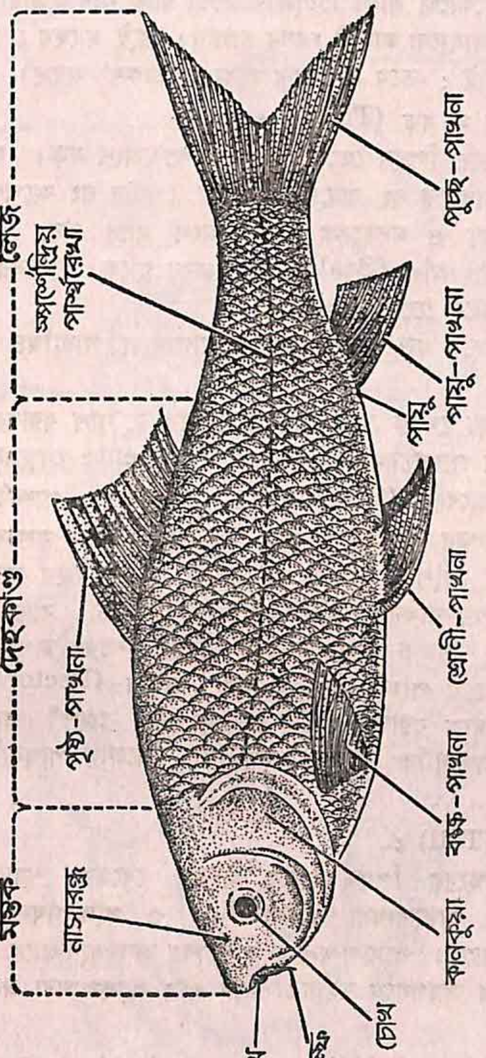
(3) কানকো পর্যন্ত দেহের সামনের অংশটি মস্তক। মস্তকের অগ্রভাগে **মুখ** ও আড়াআড়ি বিন্যস্ত **মুখছিদ্র**। মুখছিদ্র দ্বারা মাছটি খাদ্য গ্রহণ করে।

(4) মুখছিদ্রের উর্ধ্বে ও নিম্নে যথাক্রমে **উর্ধ্বোষ্ঠ** (Upper lip) এবং **নিম্নোষ্ঠ** (Lower lip) বর্তমান। ওষ্ঠদ্বয় **মাংসল** (Muscular)।

(5) মুখের দু'ধারে সাধারণত একজোড়া সুবেদী (Sensitive) **গুম্ফ** বা **বারবেল** (Barbel) থাকে।

(6) মুখের পিছনে মধ্যরেখার প্রতি পার্শ্বে একটি করে **নাসারন্ধ্র** (Nasal opening) বর্তমান। **নাসারন্ধ্র শ্বসনে অংশ গ্রহণ করে না, এটি ঘ্রাণ গ্রহণে** সহায়তা করে।

(7) নাসারন্ধ্রের পিছনে দুটি বৃহদাকার **চোখ** বর্তমান। চোখের উপরে বা নীচে পাতা নাই। তবে সমগ্র চোখের উপর বিস্তৃত স্বচ্ছ আবরণটির নাম



চিত্র 8·40—রুই মাছের বহিরাকৃতি।

উপপল্লব বা **নিকটিটেটিং মেমব্রেন** (Nictitating membrane)। **চোখ মাছের দর্শনেন্দ্রিয়।**

(8) মস্তকের প্রতি পাশে একটি করে অর্ধচন্দ্রাকৃতি **কানকো** (Operculum) আছে। কানকো সামনের দিকে যুক্ত, পিছনে মুক্ত। মুক্ত প্রান্তে

ব্রাঙ্কিওস্টিগাল মেমব্রেন (Branchiostigal membrane) নামে একটি ঝিল্লী আছে। কানকো **ফুলকা প্রকোষ্ঠ** (Gill chamber)-কে ঢেকে রাখে।

(9) প্রতি প্রকোষ্ঠে বাঁকা চিরুনীর মতো লাল বর্ণের চারটি করে **ফুলকা** থাকে। **ফুলকার সাহায্যে মাছটি শ্বসন চালায়।** রুই মাছের দেহে কোন বহিঃকর্ণ বা মধ্যকর্ণ নাই ; তবে মস্তকের মধ্যে অন্তঃকর্ণ আছে।

● **দেহকাণ্ড বা ধড়** (Trunk) ঃ

(10) কানকোর পিছন থেকে লেজ পর্যন্ত অংশ **ধড়।** ধড়ের রং সর্বত্র সমান নয়। পৃষ্ঠদেশের রং অনুজ্জ্বল লাল, পেটের রং অপেক্ষাকৃত হালকা।

(11) কানকো ও মস্তকের কিছু অংশ বাদে সমগ্র দেহ সাইক্লয়েড (Cycloid) জাতীয় আঁশ (Scale) দ্বারা ঢাকা থাকে। সামনের আঁশ পিছনের আঁশকে আংশিকভাবে ঢেকে রাখে।

(12) অঙ্কদেশে ধড় ও লেজের সংযোগস্থলে **পায়ুছিদ্র ও রেচন-জনন-ছিদ্র** বর্তমান।

(13) কানকো থেকে লেজ পর্যন্ত দেহের দু'পাশ বরাবর বিস্তৃত লম্বা দাগকে **স্পর্শেন্দ্রিয় পার্শ্বরেখা** (Lateral line sense organ) বলে। এই অংশটি অত্যন্ত **সুবেদী** (Sensitive)। **স্পর্শেন্দ্রিয় পার্শ্বরেখার সাহায্যে বিজাতীয় কোন বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করা মাছের পক্ষে সম্ভবপর।**

(14) মাছের বৈশিষ্ট্য **পাখনা** (Fins)। রুই মাছের দেহে **মোট সাতটি পাখনার** মধ্যে **জোড়-পাখনা** (Paired fin) দুটি, আর **বিজোড়-পাখনা** (Unpaired fin) তিনটি। **পাখনাগুলি মাছের সন্তরণ অঙ্গ।**

কানকোর নীচের পাখনা দুটিকে **বক্ষ পাখনা** (Pectoral fin) বলে। অঙ্কদেশে ধড়ের মাঝ বরাবর পাখনা জোড়ার নাম **শ্রোণী পাখনা** (Pelvic fin)। পিঠের মাঝামাঝি বিস্তৃত একক বড় বিজোড় পাখনাটি **পৃষ্ঠ পাখনা** (Dorsal fin)।

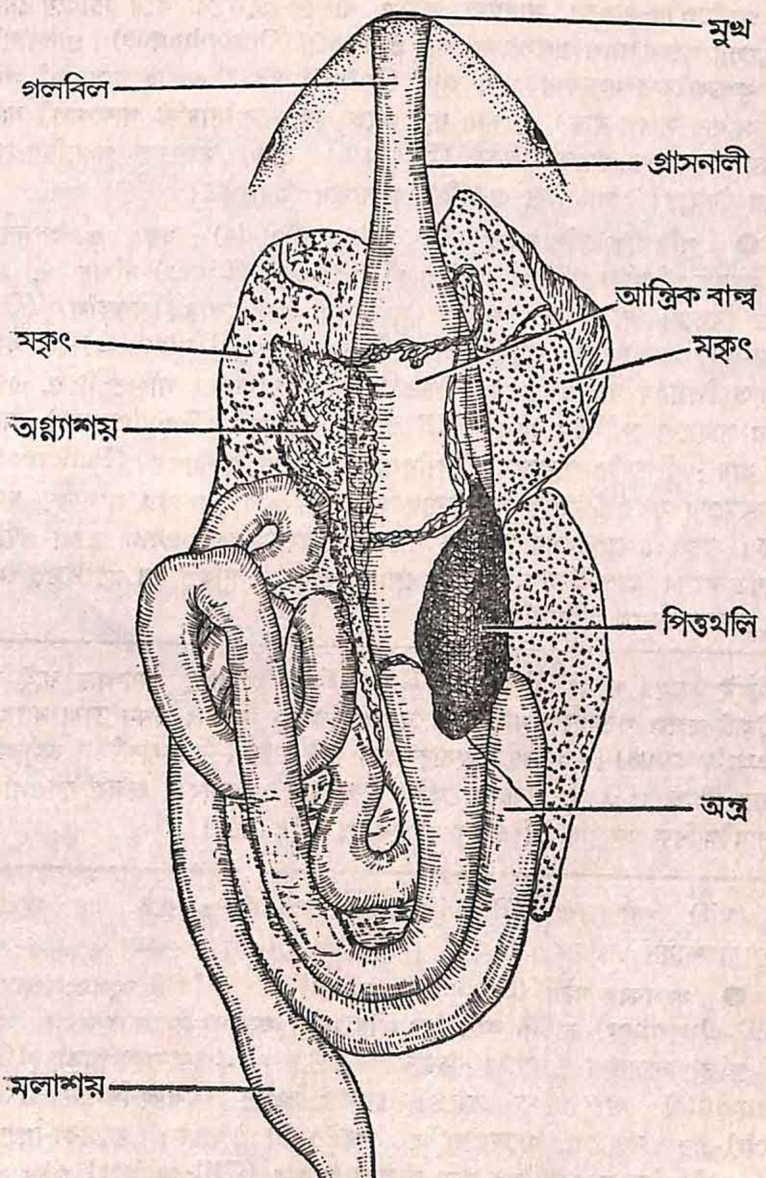
● **লেজ** (Tail) ঃ

(15) পায়ুছিদ্রের পিছন থেকে মাছের দেহের শেষাংশ **লেজ** নামে পরিচিত। লেজে **পায়ুপাখনা** (Anal fin) ও **পুচ্ছপাখনা** (Tail fin or Caudal fin) আছে। পুচ্ছপাখনা মাঝ বরাবর অসম্পূর্ণভাবে দু'ভাগে বিভক্ত। পায়ুপাখনা মাছের অগ্রগমনে সহায়তা করে এবং পুচ্ছপাখনা জলে হালের কাজ করে।

(vi) **পৌষ্টিকতন্ত্র** (Alimentary system) ঃ রুই মাছের পৌষ্টিকতন্ত্র প্রধানত **পৌষ্টিকনালী** (Alimentary canal) এবং সংশ্লিষ্ট কয়েকটি **পরিপাক গ্রন্থি** (Digestive glands) নিয়ে গঠিত।

পৌষ্টিকনালী মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। মুখের পরের অংশ **মুখবিবর।** মুখবিবরে কোন **জিব নাই।** মুখবিবরের শেষাংশকে **গলবিল** (Pharynx) বলে। গলবিল দুটি অংশে বিভক্ত। সামনের অংশ (Anterior

pharynx) প্রথমে সরু, পরে মোটা। এই অংশের দু'পাশে ফুলকাছিদ্র (Gill slit) বর্তমান। ফুলকা-ছিদ্রের মাধ্যমে জল ফুলকায় প্রবেশ করে। গলবিলের



চিত্র 8·41—রুই মাছের পৌষ্টিকতন্ত্র।

পিছনে অপেক্ষাকৃত স্থূল অংশে (Posterior pharynx) দাঁত আছে। দাঁতগুলি কঠিন। এগুলিকে **গলবিলীয় দন্ত** (Pharyngeal teeth) বলে। মাছ গলবিলীয় দন্তের সাহায্যে কঠিন খাদ্যকে টুক্‌রো করে চিবিয়ে নেয়। গলবিলের পরের অংশ প্রশস্ত নলাকার **গ্রাসনালী** (Oesophagus)। গ্রাসনালীর পরে কুন্ডলীকৃত নলাকার অংশ **অন্ত্র** (Intestine)। অর্থাৎ গ্রাসনালী সরাসরি অন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। কেননা রুই মাছে কোন **সুনির্দিষ্ট পাকস্থলী নাই**। অন্ত্রের স্থূল শেষাংশকে **মলাশয়** (Rectum) বলে। মলাশয় পায়ুছিদ্র-পথে বাইরে উন্মুক্ত। পায়ুছিদ্র জননছিদ্রের সামনে অবস্থিত।

● **পরিপাক গ্রন্থিসমূহ** (Digestive glands) ঃ যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় রুই মাছের পরিপাক গ্রন্থি। গাঢ় বাদামী রঙের **যকৃৎ** (Liver) **দক্ষিণ** ও **বাম** খন্ডে বিভক্ত। দুই যকৃৎ খন্ডের মধ্যভাগে বেলনাকার **পিত্তথলি** (Gall bladder) অবস্থিত। যকৃৎ সংলগ্ন **পিত্তথলি** (Gall bladder)-তে যকৃৎ-নিঃসৃত পিত্তরস সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে। প্রয়োজনে সঞ্চিত পিত্ত, একটি নলের সাহায্যে পৌষ্টিক নালীর 'U' আকৃতির **গ্রহণী** (Duodenum) অংশে চলে যায় ; দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিপাক গ্রন্থিটি **অগ্ন্যাশয়** (Pancreas)। দেহগহ্বরের সর্বত্র এমনকি যকৃৎকলার অভ্যন্তরেও রুই মাছের অগ্ন্যাশয় ছড়ান থাকে। যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত পাচকরস খাদ্যকে শোষণযোগ্য তরল পদার্থে পরিণত করে। অন্ত্র-জালক সেই রস শোষণ করে। শোষিত রস রক্তস্রোতে মেশে এবং কোষে কোষে পরিবেশিত হয়।

রুই মাছের খাদ্য (Food of Rohu fish) ঃ শিশু অবস্থায় রুই মাছ ছোটখাট জলজ পতঙ্গকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ তখন তারা মাংসাশী (Carnivorous)। পরিণত হবার পরে রুই মাছ নিরামিষাশী। জলাশয়ের জলের মধ্যস্তর এদের বিচরণ ক্ষেত্র। রুইমাছ সেখানকার জলজ শেওলা ও আণুবীক্ষণিক অন্যান্য উদ্ভিদকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে।

(vii) **শ্বসনতন্ত্র** (Respiratory system) ঃ রুই মাছ ফুলকার সাহায্যে শ্বসন চালায়।

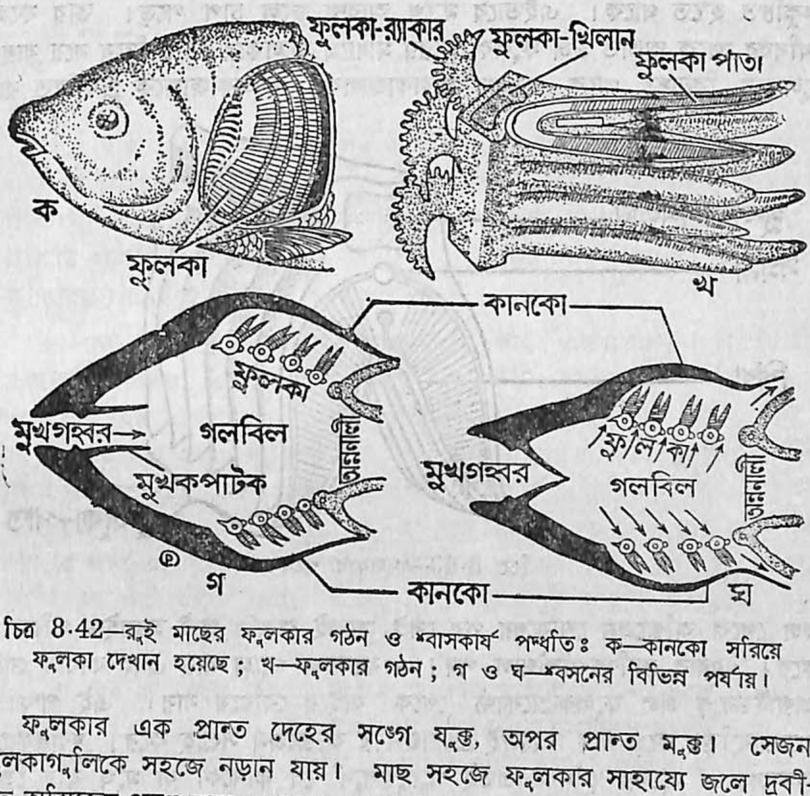
● **ফুলকার গঠন** (Structure of gills) ঃ প্রতিটি **ফুলকা প্রকোষ্ঠে** (Gill chamber) চারটি করে চিরুনীর মতো ফুলকা আছে।*

প্রতি ফুলকায় দুসারি চিরুনীর দাড়ার মতো **ফুলকা-পাতা** (Gill-filaments) বা ব্রাঙ্কি আছে। কোমলাস্থিময় **ফুলকা-খিলান** (Gill-arch)-এর সাহায্যে ফুলকাগুলি আটকানো থাকে। ফুলকা-খিলানের অভ্যন্তরীণ কিনারা প্রসারিত হয়ে **ফুলকা-র‍্যাকার** (Gill-racker) গঠন করে।

* ফুলকা প্রকোষ্ঠকে কানকো ঢেকে রাখে। কানকোর এক প্রান্ত দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অপর প্রান্ত মুক্ত। মুক্ত প্রান্তে অবস্থিত পাতলা পর্দাটিকে **ব্র্যাঙ্কিওস্টিগাল পর্দা** (Branchiostigal membrane) বলে।

ফুলকা-র‍্যাকারগুলি কঠিন বস্তুকে ফুলকার সংস্পর্শে আসতে বাধা দেয় এবং গলবিল পথে পরিচালিত খাদ্য ফুলকার উপরে এসে পড়ার প্রবণতা প্রতিহত করে।

ফুলকা পাতলা আবরণে ঢাকা থাকে। ঐ **রক্তবহনকারী** আবরণে অসংখ্য ধমনী ও শিরার জালক বিন্যস্ত থাকে। তাই ফুলকাকে লাল দেখায়।



চিত্র 8·42—রুই মাছের ফুলকার গঠন ও শ্বাসকার্য পদ্ধতিঃ ক—কানকো সরিয়ে ফুলকা দেখান হয়েছে ; খ—ফুলকার গঠন ; গ ও ঘ—শ্বসনের বিভিন্ন পর্যায়।

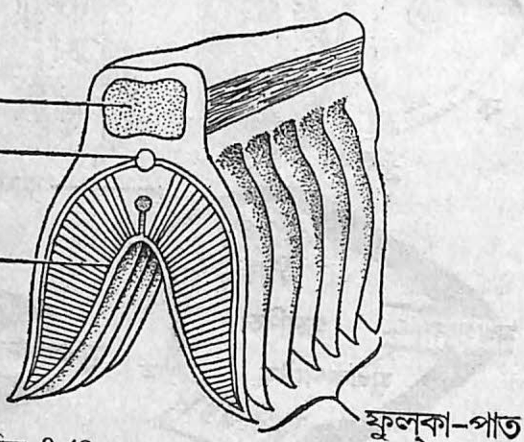
ফুলকার এক প্রান্ত দেহের সঙ্গে যুক্ত, অপর প্রান্ত মুক্ত। সেজন্য ফুলকাগুলিকে সহজে নড়ান যায়। মাছ সহজে ফুলকার সাহায্যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। শ্বসনের কাজে কানকো এবং কানকো সংলগ্ন **ব্র্যাঙ্কিওস্টিগাল পর্দা** (Branchiostegal membrane) নামক বিশেষ ঝালর সহায়তা করে।

● **মাছের শ্বাসকার্য পদ্ধতি** (Process of respiration of fish) ঃ মাছের শ্বসন পদ্ধতি দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত—**প্রশ্বাস** বা **ইন্সপিরেশান** (Inspiration) এবং **নিঃশ্বাস** বা **এক্সপিরেশান** (Expiration)।

(A) **প্রশ্বাস** বা **ইন্সপিরেশান** (Inspiration) ঃ প্রশ্বাসের সময় ফুলকা-প্রকোষ্ঠে খুব দৃঢ়ভাবে ব্র্যাঙ্কিওস্টিগাল পর্দা দ্বারা বন্ধ হয়। এরপর মাছ কানকো দু'টিকে ফুলিয়ে মুখবিবরের মেঝেকে নীচে নামায়। ফলে মাছের মুখবিবর ও গলবিলের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং মুখছিদ্র মাধ্যমে জল দ্রুত মুখ-

বিবরে প্রবেশ করে। মুখবিবরের আয়তন বৃদ্ধি করতে মুখের পেশী যথেষ্ট সহায়তা করে।

(B) **নিঃশ্বাস** বা **এক্সপিরেশান** (Expiration) ঃ প্রশ্বাসের পর শ্বাস-কার্যের দ্বিতীয় পর্যায় **নিঃশ্বাস** বা **এক্সপিরেশান**। প্রশ্বাস শেষ হবার পর মুখ-ছিদ্র ওরাল ভল্‌ভ দ্বারা বন্ধ হয়ে যায় এবং জলপূর্ণ মুখবিবরের তলদেশের পেশী সঙ্কুচিত হ'তে থাকে। এইভাবে মুখে আবদ্ধ জলে চাপ পড়ে। তার ফলে মর্খবিবর থেকে আগত জল ফুলকাছিদ্রের মাধ্যমে ফুলকার উপর দিয়ে বয়ে যায়। ফুলকায় বিন্যস্ত থাকে অসংখ্য ফুলকাজালক। ফুলকাজালকে প্রবাহিত রক্ত



চিত্র 8·43—ফুলকার গঠন।

জল থেকে অক্সিজেন শোষণের পর সেই জলেই কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। এবার ব্র্যাঙ্কিওস্টিগাল পর্দা ও কানকো খুলে যায় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত জল ফুলকাপ্রকোষ্ঠ থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তির ফলে মাছ সহজেই প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সংগ্রহ করে। শ্বাসকার্যে কানকো ও মুখের ভূমিকা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে কানকো বা মুখ যদি জোর করে খুলে রাখা যায়, তবে শ্বসন বন্ধ হয় এবং মাছের মৃত্যু ঘটে।

● **অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের সামগ্রিক তাৎপর্য** (Overal significance of Accessory respiratory organs) ঃ

জীবের দৈহিক গঠন বহুলাংশে পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ—এই ত্রিবিধ পরিবেশেই রয়েছে জীবের অস্তিত্ব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীব পরিবেশ অনুযায়ী হয় **জলচর** (Aquatic), **স্থলবাসী** (Terrestrial) অথবা **খেচর** (Volant)। পরিবেশ যেমন, জীবদেহের গঠন ও জীবনধারণ উপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনও তেমন। মাছ জলে বাস করে। জলে সাঁতার কাটা, খাদ্য

সংগ্রহ করা, শ্বাসকার্য পরিচালনা ইত্যাদির জন্য মাছের সামগ্রিক অভিযোজন লক্ষ্যণীয়। মানুষ স্থলবাসী। স্থলে বসবাস করার উপযোগী ক'রে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও বিভিন্ন তন্ত্র গঠিত। পাখী খেচর প্রাণী। বাতাসে ওড়ার উপযোগী ক'রে তাদের দৈহিক গঠন ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আবির্ভাব লক্ষ্য করার মতো।

এখন প্রশ্ন, যে যেমন পরিবেশে বাস করে তদুপযোগী সামগ্রিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন পরিবেশ উপযোগী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির প্রয়োজন কি ?

মনে রাখতে হবে, পরিবেশ সব সময় জীবের অনুকূল থাকে না। সেরকম অবস্থায় অসহনীয় প্রতিকূল পরিবেশে সংশিলষ্ট জীবের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত কোন অঙ্গের সংযোজন অনেক সময় এ-জাতীয় সমস্যা সমাধানের পথ খুলে দেয়। উদাহরণ হিসাবে জিওল মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের উল্লেখ করা যায়।

জিওল মাছের স্বাভাবিক পরিবেশ জল। কারণ এরাও অন্যান্য মাছের মতো **প্রাথমিক জলজ প্রাণী** (Primary aquatic animals)। জিওল মাছ সাধারণত ঘোলা, কর্দমাক্ত, পানাভর্তি পুকুর, নালা-ডোবায় বাস করে। এই সব জলাশয় অনেক সময় শুকিয়ে যায় অথবা মানুষের অতিরিক্ত উপদ্রবে এতই কর্দমাক্ত হ'য়ে ওঠে যে ঐ জলে স্বাভাবিক শ্বাসকার্য পরিচালনা করা এদের পক্ষে অসাধ্য হ'য়ে ওঠে। শ্বাসকার্য বন্ধ হওয়ার অর্থ মৃত্যু। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য এই সব মাছের দেহে বিশেষ ধরনের এমন সব অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে যাতে তারা প্রয়োজনবোধে ডাঙ্গায় বায়ুর অক্সিজেন শোষণ করে বেঁচে থাকতে পারে।

বস্তুতঃ যে কোন জিওল মাছকে ডাঙ্গায় রাখলেও তারা স্বচ্ছন্দে বহুদিন বেঁচে থাকে। সুতরাং জিওল মাছের দেহে অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের অস্তিত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিকূল পরিবেশে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

● **বায়ুথলি** বা **সন্তরণথলি** বা **পটকা** (Air bladder or Swim bladder) :

মাছের দেহগহ্বরে অনেকটা অংশ জুড়ে যে সাদা দুকুঠুরী বায়ুপূর্ণ থলি দেখা যায়, তাকেই **বায়ুথলি** বা **সন্তরণথলি** অথবা **পটকা** বলে।

বায়ুথলির ভিতরে বাতাসের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ক'রে মাছ ইচ্ছামতো জলে ভেসে বেড়াতে পারে। পূর্ণমাত্রায় প্রসারিত হলে বায়ুথলিতে বাতাস প্রবেশ করে। তখন মাছের ভেসে থাকার ক্ষমতা বাড়ে। সংকুচিত হলে বাতাসের মাত্রা কমে এবং ভেসে থাকার ক্ষমতা স্বাভাবিক কারণেই কমে যায়। কেননা

দেহগহ্বরে বায়ুর পরিমাণ কমে গেলে মাছের ওজন বেড়ে যায়। এইভাবে বায়ুথলিতে বাতাসের পরিমাণ ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মাছ গভীর জলে প্রবেশ করতে বা জলের উপরে উঠে আসতে পারে। সুতরাং মাছের ক্ষেত্রে বায়ুথলির তাৎপর্য অপরিসীম। পৌষ্টিক নালীর উপবর্ধিত অংগ হিসাবেই বায়ুথলির উৎপত্তি। গ্রাসনালীর শুরুতে একটি ছোট নালী দ্বারা এটি পৌষ্টিক নালীর সংগে যুক্ত। সামনের প্রকোষ্ঠ পিছনের প্রকোষ্ঠ থেকে স্থূল ও ছোট। পিছনের প্রকোষ্ঠটি ক্রমশঃ সরু। প্রকোষ্ঠ দুটি গভীর চাপা অংশের দ্বারা পৃথক থাকে।

● অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র প্রদর্শন ●

[Demonstration of Accessory respiratory structures]

জল থেকে ডাঙায় তুললে কৈ, শিংঙ, **মাগুর ল্যাটা, শোল** প্রভৃতি মাছ মরে না। এই জাতীয় মাছকে **জিওল মাছ** বলে। জিওল মাছে ফুলকা ছাড়াও **অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র** (Accessory respiratory organ) বর্তমান। জিওল মাছ অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যেই বাতাসের অক্সিজেন গ্রহণ করে ডাঙায় বেঁচে থাকে।



চিত্র 8.44 কয়েকটি জিওল মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র।

জিওল মাছ পুকুর, খাল, বিলের পাঁকে বাস করে। ঐ পরিবেশে প্রয়োজনের তুলনায় অক্সিজেনের পরিমাণ কম। পরিপূরক ব্যবস্থা হিসাবে জিওল

মাছের দেহে অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের আবির্ভাব উল্লেখযোগ্য। জিওল মাছ কিছু-ক্ষণ পর পর জলের উপর ভেসে ওঠে এবং বাতাস থেকে শ্বাস গ্রহণ ক'রে আবার জলে ডুব দেয়। **জলের উপরে ওঠার সুযোগ হারালে, জিওল মাছেরও মৃত্যু হয়।**

কৈ মাছ ঃ কৈ মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র ফুলকার উপরে অবিস্থত। এগুলি দেখতে প্রস্ফুটিত ফুলের মতো (চিত্র 8.44)। অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রগুলি ফুলকা-অস্থির (Gill-bone) সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রচুর রক্তজালক থাকায় এবং সেই রক্তজালকে প্রচুর রক্ত প্রবাহিত হওয়ায় অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রকে লাল দেখায়।

শিঙি মাছ ঃ শিঙি মাছের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা অন্য। এদের ফুলকার গায়ে ফুলকা-গহ্বরে লম্বালম্বি বিন্যস্ত একজোড়া সরু লম্বা নল অতিরিক্ত শ্বাস-যন্ত্রের কাজ করে। এই নলাকার অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রকে **শ্বাসথলি** বলে। প্রতি পার্শ্বের শ্বাসথলি পেশীর মধ্যে দিয়ে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

মাগুর মাছ ঃ মাগুর মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রকে প্রচুর শাখা-প্রশাখাযুক্ত ক্ষুদ্র উদ্ভিদের মতো (**শ্বাসবৃক্ষ**) দেখায়।

সুপ্রাব্র্যাঙ্কিয়াল কুঠরি নামে একটি আধারে মাগুর মাছের শ্বাসবৃক্ষটি অব-স্থান করে। মাগুর মাছের দেহের প্রতি পার্শ্বের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ফুলকা-খিলান থেকে শাখা-প্রশাখাযুক্ত শ্বাসবৃক্ষটির সৃষ্টি হয়, একে **আরবোরেসেন্ট অঙ্গ** (Arborescent organ) নামেও অভিহিত করা হয়।

শ্বাসবৃক্ষটির উৎপত্তিস্থলে ফুলকাপাতগুলি মিলিত হ'য়ে যে পাখার ন্যায় অঙ্গ গঠন করে তাকে **ফুলকা পাখা** (Gill fans) বলা হয়। সমগ্র শ্বাসবৃক্ষ মিউকাস পর্দায় আবৃত রক্তজালকে পূর্ণ থাকে। এর ফলে ব্যাপন ক্রিয়ায় বায়ুর অক্সিজেন রক্তে প্রবেশ করে এবং শ্বসনে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড রক্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। সরাসরি ব্যাপন ক্রিয়ায় রক্তে গ্যাসের আদান-প্রদানের সুবন্দোবস্ত থাকায় শ্বাসবৃক্ষকে এক অর্থে ফুসফুসের সমগোত্রীয় অঙ্গ বলা যায়।

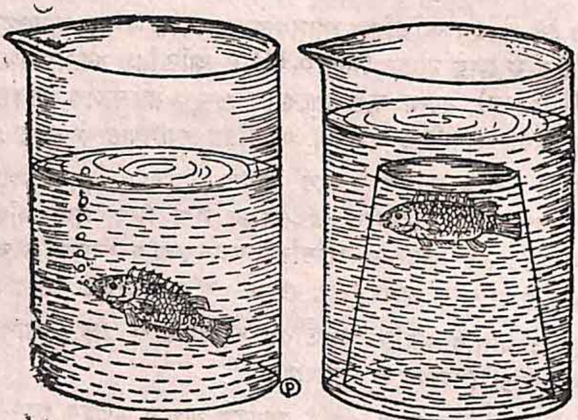
জিওল মাছ জলে ডুবিয়ে মারার পরীক্ষা

[Drowning experiment with air-breathing fish]

উপকরণ (Requisites) ঃ একটি বিকার বা কাচপাত্র, একটি কাচের গ্লাস, একটি জীবন্ত কৈ বা শিঙি মাছ ; পরিমাণ মত জল।

পদ্ধতি (Procedure) ঃ একটি বড় মুখযুক্ত কাচপাত্রকে অর্ধেকের বেশী জলপূর্ণ করে তাতে একটি কৈ বা শিঙি মাছ ছেড়ে দেওয়া হয় (চিত্র 8.45ক)। দেখা গেল, মাছটি কিছু সময় পর পর জলের উপরে উঠে শ্বাস-কার্যের জন্য প্রয়োজন মতো বাতাস গ্রহণ করছে। এখন একটি কাচের গ্লাস দিয়ে মাছটিকে এমনভাবে ঢেকে দেওয়া হল, যাতে গ্লাসটি সম্পূর্ণভাবে জলে ডুবে থাকে (চিত্র 8.45খ)।

নিরীক্ষা (Observation)ঃ কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, মাছটি উপরে ওঠার চেষ্টা করছে। গ্লাসে বারবার বাধা পেলেও মাছটি ক্রমাগত উপরে ওঠার চেষ্টা করছে এবং প্রতিবারই বিফল হয়ে ফিরে যাচ্ছে। এইভাবে কিছুক্ষণ চেষ্টা



চিত্র 8·45—জিওল মাছকে জলে ডুবিয়ে মারার পরীক্ষাঃ ক—জলের উপরে ভেসে উঠে বাতাস গ্রহণে সক্ষম মাছ ; খ—বাতাস গ্রহণে অক্ষম মৃত্যুপথযাত্রী মাছ।

চালাবার পর মাছটির দেহ ক্রমশঃ অবশ হয়ে আসে। এক সময় তার মৃত্যু হয়।

সিদ্ধান্ত (Inference)ঃ জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সাহায্যে জিওল মাছ পুরোপুরি শ্বাসকার্য চালাতে পারে না। ফলে, অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই কাজে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় জিওল মাছের মৃত্যু ঘটে।

(viii) **রক্ত-সংবহনতন্ত্র** (Circulatory system)ঃ

স্থলচর জীবের তুলনায় মাছের রক্তের পরিমাণ অল্প ও রং ফ্যাকাশে। রক্তরসে নিউক্লিয়সযুক্ত **লোহিত কণিকা** ও **শ্বেত কণিকা** ভেসে বেড়ায়।

মাছের রক্ত-সংবহনতন্ত্রের প্রধান অংগ **হৃৎপিণ্ড**। হৃৎপিণ্ড সবসময়ে পর্যায়-ক্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হওয়ার ফলে মাছের দেহের রক্ত সর্বত্র চক্রাকারে আবর্তিত হয়। হৃৎপিণ্ড তিনটি অংশে বিভক্ত—(ক) **সাইনস ভেনোসস** (Sinus venosus) ; (খ) **অলিন্দ** (Auricle) ও (গ) **নিলয়** (Ventricle)। ব্যাঙের মতো মাছের **কোনস আর্টারিওসস** নাই।

চার জোড়া **অ্যাফারেণ্ট ব্র্যাঙ্কিয়াল ধমনী** (Afferent branchial arteries) মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড থেকে অশুদ্ধ রক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে শুদ্ধ হবার জন্য ফুলকায় যায়। ফুলকা থেকে অক্সিজেনযুক্ত বিশুদ্ধ রক্ত চার জোড়া

ইফারেণ্ট ব্র্যাঙ্কিয়াল ধমনী মাধ্যমে (Efferent branchial arteries) দেহের সর্বত্র পরবেশিত হয়।

দেহের সর্বাঙ্গ থেকে দূষিত অর্থাৎ অপরিস্রুত রক্ত সাইনস ভেনোসসে এসে জমা হয়। ঐ রক্ত প্রথমে অলিন্দে ও পরে নিলয়ে যায়। প্রত্যেক প্রবেশ পথে কপাটক থাকায় রক্তপ্রবাহ একমুখী। অপরিস্রুত রক্ত চার জোড়া অ্যাফারেণ্ট ব্র্যাঙ্কিয়াল ধমনীর ভিতর দিয়ে ফুলকাগুলিতে পেঁছায়। সেখানে জলে দ্রব অক্সিজেন গ্রহণ করে রক্ত বিশুদ্ধ হয় এবং পরে **ইফারেণ্ট ব্র্যাঙ্কিয়াল ধমনী** মাধ্যমে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। রক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করার পর আবার অশুদ্ধ হয় এবং পরিস্রুত হওয়ার জন্য শিরাতন্ত্রের মাধ্যমে পুনরায় সাইনস ভেনোসসে ফিরে আসে। এইভাবে মাছের দেহে রক্ত সংবহনতন্ত্র চালু থাকে।

(ix) **জননতন্ত্র** (Reproductive system) ঃ

মাছ একলিঙ্গ প্রাণী। পুরুষ-মাছের দেহে আছে দুটি **শুক্রাশয়**। শুক্রাশয়ের পিছন থেকে উৎপন্ন দুটি **শুক্রনালী** পুং-জনন ছিদ্রে মুক্ত হয়। জননকালে পরিণত পুরুষ-মাছের শুক্রাশয়ে শুক্রাণু উৎপন্ন হয় এবং পুং-জনন ছিদ্রপথে সেগুলি বাইরে বেরিয়ে যায়।

স্ত্রী-মাছের দেহে আছে দুটি **ডিম্বাশয়** ও দুটি স্ত্রী-জনন ছিদ্র। স্ত্রী-জননতন্ত্রে কোন ডিম্বনালী নাই। তাই ডিম্বাণুগুলি ডিম্বাশয় থেকে সরাসরি দেহগহ্বরে নির্গত হয় এবং পরে স্ত্রী-জনন ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বাইরে চলে যায়। স্ত্রী-মাছ স্রোতযুক্ত মিঠাজলে একসঙ্গে অসংখ্য ডিম (ডিম্বাণু) পাড়ে। মাছের দেহের বাইরে জলাশয়ে শুক্রাণু ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে। বর্ষাকাল মাছের প্রজনন ঋতু। নিষিক্ত ডিম্বাণু নানা পরিবর্তনের পর **ভ্রূণ** (Embryo) গঠন করে। ভ্রূণ ক্রমশঃ পূর্ণাঙ্গ মাছে রূপান্তরিত হয়।

8.14(B). হাঙর *[Shark] :*

(i) **প্রাণিজগতে স্থান** (Systematic position) ঃ

পর্ব—**কর্ডাটা** (Chordata),
উপপর্ব—**ভার্টিব্রাটা** (Vertebrata),
শ্রেণী—**কনড্রিকথিস** (Chondricthyes)।

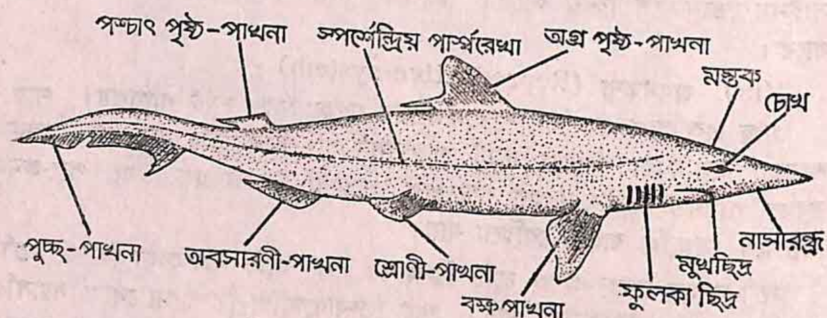
(ii) **বিজ্ঞানসম্মত নাম** (Scientific name) ঃ **স্কোলিওডন সোরাকোয়া** (*Scoliodon sorrakowah*)।

(iii) **স্বভাব ও বসতি** (Habit and Habitat) ঃ হাঙর **তরুণাস্থিময়** (Cartilagenous), **সামুদ্রিক** (Marine) প্রাণী। চলতি কথায় হাঙরকে **ডগফিস** (Dogfish) বলা হয়। হাঙরের আকৃতি নানা প্রকার। পৃথিবীতে প্রায় 250—300 জাতের হাঙর আছে। এদের মধ্যে **তিমি হাঙর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম হাঙরগোষ্ঠী**। বড় জাতের হাঙর 15—20 মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হয়।

(iv) **হাঙরের খাদ্য** (Food for shark) ঃ হাঙর **মাংসাশী** (Carnivorous) সামুদ্রিক প্রাণী। সুতরাং সমুদ্রে বসবাসকারী ছোট-বড় নানা আকারের প্রাণী হাঙরের প্রধান খাদ্য। সুযোগ পেলে হাঙর মানুষকেও শিকার ধরে।

(v) **হাঙরের বহিরাকৃতি** (External features of shark) ঃ হাঙরের দেহাকৃতি মাকুর মতো (Spindle-shaped), হাঙরের পৃষ্ঠদেশ গাঢ় ধূসর বর্ণের এবং অঙ্কদেশ অপেক্ষাকৃত হালকা ধূসর। হাঙরের সারা দেহ আণুবীক্ষণিক **প্ল্যাকয়েড আঁশ** (Placoid scale)-এ ঢাকা থাকে।

হাঙরের দেহ প্রধান তিনটি অংশে বিভক্ত ঃ—**মস্তক** (Head), **দেহকাণ্ড** বা **ধড়** (Trunk) এবং **লেজ** (Tail)।



চিত্র 8.46—হাঙরের বহিরাকৃতি।

● **মস্তক** (Head) ঃ

(1) হাঙরের মস্তক উপর-নীচে চাপা। মস্তকের অগ্রভাগ বল্লমের ফলার মতো। অংশটি **তুণ্ড** (Snout)।

(2) মস্তকের অঙ্কদেশে কিছুটা পিছনে অর্ধচন্দ্রাকার **মুখছিদ্র** (mouth) অবস্থিত।

(3) মুখছিদ্র দুটি শক্ত **চোয়ালে** (Jaw) আবদ্ধ। প্রতি চোয়ালে এক বা দুই সারিতে **তীক্ষ্নদন্ত** (Sharp teeth) বিদ্যমান।

(4) মস্তকের অগ্রভাগে অঙ্কদেশে আছে দুটি **নাসারন্ধ্র** (Nostril)। **শ্বাসকার্যের পরিবর্তে এগুলি ঘ্রাণ গ্রহণে সাহায্য করে।**

(5) নাসারন্ধ্রদ্বয়ের কিছুটা পিছনে মাথার দু'পাশে দু'টি গোলাকার **চোখ** (Eye) অবস্থিত। চোখের উপরে বা নীচে কোন পাতা নাই। অর্থাৎ হাঙরের চোখ **নেত্রপল্লববিহীন** (Without eyelids)। তবে সমগ্র চোখের উপরে বিস্তৃত একটি স্বচ্ছ আবরণ—**উপপল্লব** বা **নিকটিটেটিং মেমব্রেন** (Nictitating membrane) বর্তমান। চোখ হাঙরের দর্শনেন্দ্রিয়।

(6) মস্তকের দু' পাশে বেশ কিছুটা পিছনে পাঁচজোড়া অনাবৃত (এখানে রুই মাছের মতো কানকোর ঢাকনা নাই) **ফুলকাছিদ্র** (Gill-slits) বর্তমান।

কোন কোন হাঙরের ফুলকাছিদ্রের সামনে দুটি ক্ষয়িষ্ণু ফুলকাছিদ্র বা স্পিরাকল (Spiracle) লক্ষ্য করা যায়। ফুলকাছিদ্র শ্বাসকার্যে সহায়তা করে।

(7) মস্তকের দু' পাশে দু'টি **অন্তঃকর্ণ** (Inner nostril) বর্তমান। বাইরে থেকে এদের দেখা যায় না।

(8) মস্তকে অসংখ্য অ্যাম্পুলার ছিদ্র (Ampular aperture) বর্তমান। এইগুলি স্পর্শানুভূতি গ্রহণে সহায়তা করে।

● **দেহকাণ্ড বা ধড়** (Trunk) ঃ

(9) হাঙরের মস্তক ও লেজের মধ্যবর্তী অংশ **ধড়** বা **দেহকাণ্ড**।

(10) মস্তকের শেষপ্রান্ত থেকে লেজের অগ্রভাগ পর্যন্ত দেহের উভয় পাশে দু'টি **স্পর্শেন্দ্রিয় পার্শ্বরেখা** (Lateral line sense organ) বিদ্যমান।

(11) ধড়ের শেষ প্রান্তে দু'টি শ্রোণীপাখনার মাঝে **অবসারণীছিদ্র** (Cloacal aperture) অবস্থিত।

(12) অবসারণীছিদ্রের পিছনে দু' পাশে দু'টি **উদরছিদ্র** (Abdominal aperture) আছে।

(13) পুরুষ হাঙরের অবসারণীছিদ্রের উভয় পাশে একজোড়া তরুণাস্থি-ময় কোমল দণ্ড—**ক্ল্যাসপার** (Clasper) বর্তমান।

(14) দেহকাণ্ডে নিম্নলিখিত পাখনাগুলি অবস্থিত ঃ

(i) একজোড়া **বক্ষপাখনা** (Pectoral fins)—ফুলকাছিদ্রের পিছনে অবস্থিত।

(ii) একজোড়া **শ্রোণীপাখনা** (Pelvic fins)—বক্ষপাখনার অনেক পিছনে অবস্থিত।

(iii) দেহকাণ্ডের মধ্যভাগে পৃষ্ঠদেশে একক **অগ্রপৃষ্ঠপাখনা** (Anterior dorsal fin) অবস্থিত। ঐ পৃষ্ঠদেশ বরাবর পিছনে অবসারণী পাখনার উপরে লেজের কাছাকাছি **পশ্চাৎপৃষ্ঠপাখনা** (Posterior dorsal fin) বর্তমান।

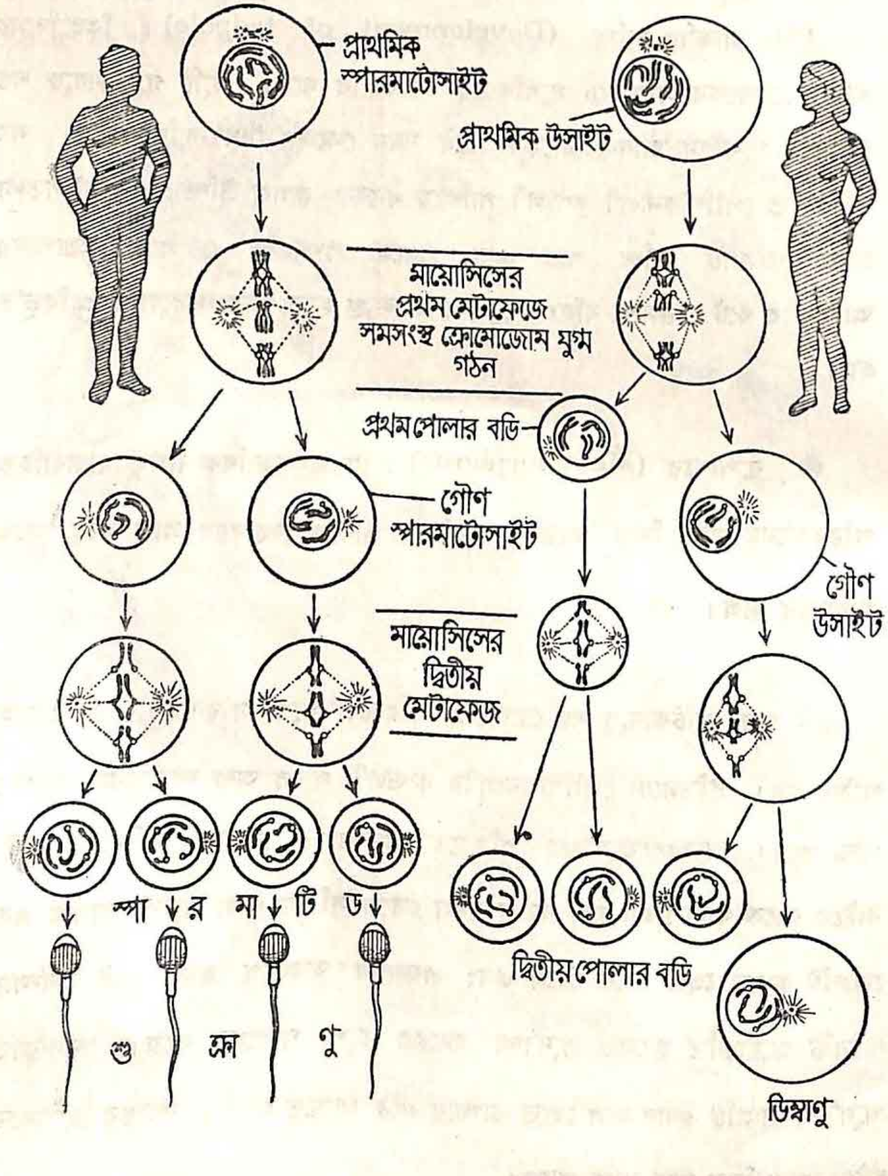
● **লেজ** (Tail) ঃ

(15) হাঙরের অবসারণীছিদ্রের পিছনে অবস্থিত **সমগ্র** অংশ লেজ।

(16) পশ্চাৎপৃষ্ঠপাখনার বিপরীতে অঙ্কদেশে **অবসারণী পাখনা** (Anal fin) অবস্থিত। এটি **অঙ্কীয়পাখনা** (Ventral fin) নামেও পরিচিত।

(17) লেজের শেষ প্রান্তের পাখনাটি **পুচ্ছপাখনা** (Caudal fin)। এটি অসম পৃষ্ঠভাগ ও অংকীয়ভাগে বিভক্ত। সেজন্য লেজটিকে **হেটারোসারকাল লেজ** (Heterocercal tail) বলা হয়।

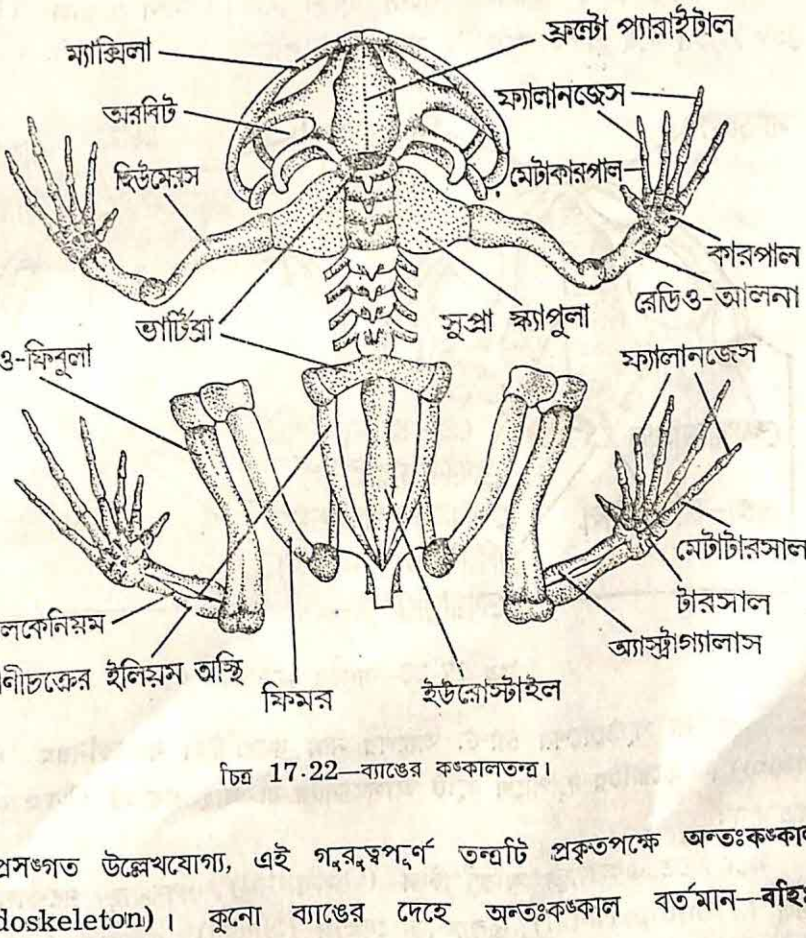
17.11. মানুষের দেহে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপাদনের চিত্ররূপ *[Diagrammatic representation of the process of Sperm and Ovum production in human being]* :



চিত্র 17·21—মানুষের ক্ষেত্রে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গঠনের চিত্ররূপ।

17.12. কুনো ব্যাঙের কঙ্কালতন্ত্র *[Skeletal system of Toad]* :

মেরুদন্ডী প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে কাঠামো গঠনকারী, নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদানে সাহায্যকারী এবং দেহভার বহনে সহায়তাকারী তন্ত্রকে কঙ্কালতন্ত্র বলে।



চিত্র 17·22—ব্যাঙের কঙ্কালতন্ত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্রটি প্রকৃতপক্ষে **অন্তঃকঙ্কাল** (Endoskeleton)। কুনো ব্যাঙের দেহে অন্তঃকঙ্কাল বর্তমান—**বহিঃকঙ্কাল** (Exoskeleton) নাই।

কুনো ব্যাঙের অন্তঃকঙ্কালতন্ত্রটি প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত, যথা—

(A) অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্র (Axial skeletal system)।

(B) উপাঙ্গিক কঙ্কালতন্ত্র (Appendicular skeletal system)।

● চলন (Locomotion) ঃ

(i) বিজোড় পাখনা—অগ্রগমনে সহায়তা করে।

(ii) জোড় পাখনা—নির্দিষ্টতলে ভেসে থাকতে অথবা উপর-নীচে যাতায়াত করতে সাহায্য করে।

(iii) পুচ্ছপাখনা—হালের কাজ করে, অর্থাৎ দিক নির্ধারক।

8.14(C). অস্থিময় ও তরুণাস্থিময় মাছের পার্থক্য *[Differences between Bony fish and Cartilagenous fish]* :

অস্থিময় মাছ রুই (Rohu)	তরুণাস্থিময় মাছ হাঙর (Shark)
(1) দেহের অন্তঃকঙ্কাল অস্থি বা হাড় (Bone) দ্বারা গঠিত।	(1) দেহের অন্তঃকঙ্কাল তরুণাস্থি (Cartilage) দ্বারা গঠিত।
(2) মস্তক দু'পাশে চাপা।	(2) মস্তক উপর-নীচে চাপা।
(3) মুখছিদ্র মস্তকের অগ্রপ্রান্তে অবস্থিত।	(3) মুখছিদ্র মস্তকের অঙ্কদেশে অবস্থিত।
(4) চার জোড়া ফুলকা ছিদ্র কানকো দ্বারা ঢাকা।	(4) পাঁচ জোড়া ফুলকা ছিদ্র কানকো দ্বারা ঢাকা নয়--সম্পূর্ণ অনাবৃত।
(5) নাসারন্ধ্র মস্তকের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত (Dorsally placed)।	(5) নাসারন্ধ্র মস্তকের অঙ্কদেশে অবস্থিত (Ventrally placed)।
(6) দেহ সাইক্লয়েড আঁশ (Cycloid Scale) দ্বারা আবৃত।	(6) দেহ প্ল্যাকয়েড আঁশ (Placoid Scale) দ্বারা আবৃত।
(7) পায়ু বর্তমান।	(7) পায়ু নাই।
(8) অবসারণী নাই।	(8) অবসারণী বর্তমান।
(9) ক্ল্যাসপার (Clasper) নাই।	(9) পুং হাঙরের ক্ল্যাসপার আছে।
(10) স্পিরাকল (Spiracle) নাই।	(10) স্পিরাকল আছে।
(11) পুচ্ছপাখনা সমভাবে বিভক্ত অর্থাৎ হোমোসারকাল (Homocercal)।	(11) পুচ্ছপাখনা পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় তলে অসমভাবে বিভক্ত অর্থাৎ হেটারোসারকাল (Heterocercal)।
(12) পটকা বা বায়ুথলি বর্তমান।	(12) পটকা বা বায়ুথলি নাই।
(13) অন্ত্রে প্যাঁচানো স্ক্রল ভালভ (Scroll valve) নাই।	(13) স্ক্রল ভালভ বর্তমান।
(14) পরিণত অবস্থায় নিরামিষাশী।	(14) সব অবস্থাতেই মাংসাশী।
(15) মিঠা জলের বাসিন্দা।	(15) সামুদ্রিক।

8.15(A). কুনো ব্যাঙ [*Toad*] : *

(i) **প্রাণিজগতে স্থান** (Systematic position) ঃ

পর্ব—**কর্ডাটা** (Chordata),
উপপর্ব—**ভার্টিব্রাটা** (Vertebrata),
শ্রেণী—**আম্ফিবিয়া** (Amphibia)।

(ii) **বিজ্ঞানসম্মত নাম** (Scientific name) ঃ কুনোব্যাঙের বিজ্ঞান-সম্মত নাম **বিউফো মেলানোস্টিকটস** (*Bufo melanostictus*)।

(iii) স্বভাব ও বসতি (Habit and Habitat) ঃ কুনো ব্যাঙ ইট-পাটকেল, কাঠ-কোঠরার আবর্জনায় ঘেরা ছায়াছন্ন পরিবেশে বাস করে। রাত্রের অন্ধকারে এরা খাদ্যের সন্ধান করে। এরা নিরীহ, নিশাচর, মাংসাশী প্রাণী। পরিণত কুনো ব্যাঙ স্থলবাসী। প্রজননকালে এবং প্রয়োজনবোধে এরা জলে নামে। বর্ষাকাল এদের প্রজনন ঋতু। এই সময় পুরুষ ব্যাঙের একটানা ডাক বর্ষায় বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করে। শীতকালে কুনো ব্যাঙ ইট-কাঠের ফাঁকে চুপচাপ পড়ে থাকে। এইভাবে নিশ্চল হ'য়ে পড়ে থাকাকে **শীতঘুম** (Hibernation) বলে।

(iv) **কুনো ব্যাঙের বহিরাকৃতি** (External features of Toad) ঃ

(1) কুনো ব্যাঙের কদাকার দেহে অসংখ্য আঁচিল বা **গুটিকা** (Wart) থাকায় দেহত্বক খসখসে। পিঠের দিকে গুটিকার সংখ্যা বেশী।

(2) কুনো ব্যাঙের দেহ **মস্তক** (Head) এবং **ধড় বা দেহকাণ্ড** (Trunk) —এই দুই অংশে বিভক্ত।

● **মস্তক** (Head) ঃ মস্তকের সম্মুখভাগ অর্ধবৃত্তাকার। সেখানে আকর্ণ বিস্তৃত **মুখ** (Mouth) বিদ্যমান। **মুখকে ঘিরে রাখে উপর-নীচে** দন্তহীন দৃঢ় **চোয়াল** (Jaw)।

(3) মস্তকের সামনের দিকে ছিদ্র দুটিকে **নাসারন্ধ্র** (Nostril) বলে। নাসারন্ধ্র শ্বসন ও ঘ্রাণ গ্রহণ যন্ত্র।

(4) নাসারন্ধ্রের পিছনে মস্তকের দুপাশে দুটি **চোখ** (Eye) অবস্থিত। প্রতিটি চোখের উপরে ও নীচে দুটি **নেত্রপল্লব** (Eyelid) আছে। **উপরের পল্লবটি নড়াচড়া করে না।** নীচেরটিতে একটি অর্ধস্বচ্ছ **উপপল্লব** (Nictitating membrane) আছে।

উপপল্লব চক্ষুগোলকের উপর প্রসারিত হয়ে ধুলোবালি থেকে চোখকে রক্ষা করে।

---

* কুনো ব্যাঙের বিভিন্ন তন্ত্র সম্বন্ধে 17 অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলা নাম বিজ্ঞানসম্মত নাম উচ্চারণ

বীন—*Vicia fava*
ভিসিয়া ফাবা
বেগুন—*Solanum melongana*
সোলেনম মেলংগানা
বেদানা—*Punica granatum*
পিউনিকা গ্রেনেটম
বেল—*Aegle marmelos*
ঈগল মারমেলস
ভুট্টা—*Zea mays*
জিয়া মেইজ
মটর—*Pisum sativum*
পাইসম স্যাটিভম
মাধবীলতা—*Hiptage madablata*
হিপটেজ ম্যাডাবলটা
মুলা—*Raphanus sativus*
র‍্যাফেনস স্যাটিভস
মেহগনি—*Swietenia mahogani*
সুইটেনিয়া মেহগনী
মেহেদী—*Duranta plumieri*
দুরন্ত প্লুমিয়েরী
মৌরী—*Foeniculum vulgare*
ফোনিকিউলম ভুলগেয়ার
যুঁই—*Jasminum auriculatum*
জেসমিনম অরিকিউলেটম
রজনীগন্ধা—*Polyanthes tuberosa*
পলিএনথিস টিউবারোজা
রবার—*Ficus elastica*
ফিকস ইলাসটিকা
রাঙা আলু—*Ipomea batatus*
আইপোমিয়া ব্যাটেটস
রাধাচূড়া—*Poinciana regia*
পইনসিয়ানা রিজিয়া
রাস্না (অর্কিড)—*Vanda roxburghii*
ভেন্ডা রক্সবার্গাই
রেড়ি—*Ricinus communis*
রিসিনস কমিউনিস

বাংলা নাম বিজ্ঞানসম্মত নাম উচ্চারণ

লংকা—*Capsicum annum*
ক্যাপসিকম অ্যানম
লজ্জাবতী—*Mimosa pudica*
মাইমোসা পুডিকা
লাউ—*Lagenaria vulgaris*
ল্যাজেনেরিয়া ভালগারিস
লিচু—*Litchi sinensis*
লিচি সাইনেনসিস
শশা—*Cucumis sativus*
কিউকিউমিস স্যাটিভস
শিমুল—*Salmalia malabarica*
সালমালিয়া মালাবারিকা
সর্বজয়া—*Canna indica*
ক্যানা ইন্ডিকা
সরিষা—*Brassica nigra*
ব্রাসিকা নাইগ্রা
সাল—*Shorea robusta*
সোরিয়া রোবাস্টা
সিনকোনা—*Cinchona officinalis*
সিনকোনা অফিসিনেলিস
সীম—*Dolicos lablab*
ডলিকস ল্যাবল্যাব
সুন্দরী—*Heritiera minor*
হেরিসিয়েরা মাইনর
সুপারি—*Areca catechu*
এরেকা ক্যাটেচু
সূর্যমুখী—*Helianthus annuus*
হেলিঅ্যান্থাস অ্যানুয়স
সেগুন—*Tectona grandis*
টেকটোনা গ্র্যান্ডিস
হাড়জোড়া—*Vitis quadrangularis*
ভাইটিস কোয়াড্রাংগুলারিস
হাতিশুঁড়—*Heliotropium indicum*
হেলিওট্রোপিয়ম ইন্ডিকম
হুড়হুড়ে—*Cleome viscosa*
ক্লিওম ভিসকোসা

কয়েকটি ফুলের বর্ণনা — 16

[Description of some flowers]

16.1. সম্পূর্ণ, সমাঙ্ক ও উভলিঙ্গ পুষ্প [*Complete, regular and bisexual flower*] :

● **জবা** (*Hibiscus rosa-sinensis*) **ফুল :**

পুষ্প (Flower) : একক, সবৃন্তক, সম্পূর্ণ, সমাঙ্ক, উভলিঙ্গ, গর্ভপাদ। বৃতির গোড়া থেকে কয়েকটি মঞ্জরী-পত্রিকা উপবৃতি (Epicalyx) গঠন ক'রে একটি আবর্তে সজ্জিত থাকে।

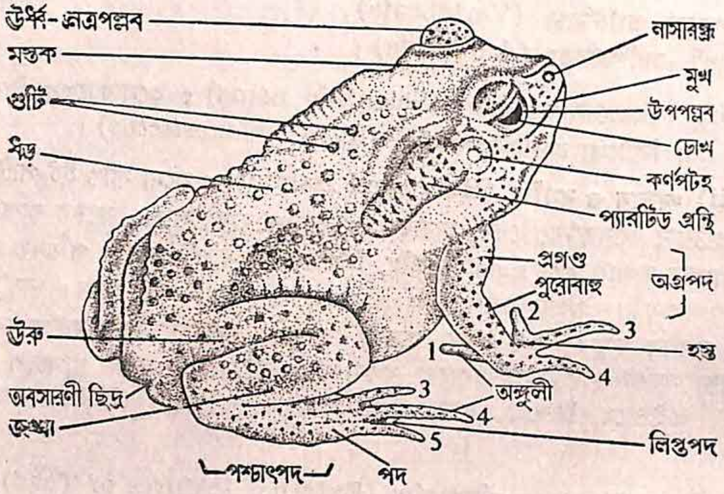


চিত্র 16·1 : জবাফুল এবং জবাফুলের ব্যবচ্ছেদিত বিভিন্ন অংশ।

বৃতি (Calyx) : বৃত্যংশ 5, যুক্ত (United), প্রান্তস্পর্শীয় (Valvate), নলাকার (Tubular), সবুজ।

দলমণ্ডল (Corolla) : দলাংশ 5, তলদেশে কিছুটা অংশ যুক্ত, টুইস্টেড, লাল।

(5) চোখের পিছনে অবস্থিত সাদা, মসৃণ, গোলাকার পর্দাকে **টিমপেনম** (Tympanum) বা **কর্ণপটহ** (Ear drum) বলে। কর্ণপটহ ব্যাঙের **শ্রবণেন্দ্রিয়।**



চিত্র 8.47—কুনো ব্যাঙের বহিরাকৃতি।

● **দেহকাণ্ড বা ধড় (Trunk) ঃ**

(6) কুনো ব্যাঙের দেহকাণ্ড স্থূল।

(7) দেহকাণ্ডের সম্মুখভাগে প্রতি কর্ণপটহের পিছনে অবস্থিত বড় গুটিদ্বয়কে বলে **প্যারটিড গ্রন্থি** (Parotid gland)। **আক্রান্ত হলে ব্যাঙ ঐ গ্রন্থি থেকে সাদা দুধের মতো বিষাক্ত রস শত্রুর দিকে ছিটিয়ে দেয়।** এছাড়া ব্যাঙের সারা দেহে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ছোট ছোট **গুটি** (Wart)।

(8) ধড়ের সঙ্গে দুজোড়া **পদ** (Limb) যুক্ত। সামনের পা দুটিকে **অগ্রপদ** (Forelimb) এবং পিছনের পা দুটিকে **পশ্চাৎপদ** (Hindlimb) বলে।

(9) অগ্রপদ **বাহু** বা **প্রগণ্ড** (Upper arm), **পুরোবাহু** (Fore arm) এবং **হস্ত বা করতল** (Hand) দ্বারা গঠিত। প্রতি করতলে **চারটি করে অঙ্গুলি** (Digits) আছে।

(10) পশ্চাৎপদ অপেক্ষাকৃত লম্বা। প্রতিটি পশ্চাৎপদ **উরু** (Thigh), **মধ্যপদ** বা **জঙ্ঘা** (Shank) এবং **পদ** (Foot)—এই তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রতি পদে **পাঁচটি করে অঙ্গুলি** (Digits) আছে।

(11) অঙ্গুলিগুলির গোড়ার অংশ পাতলা পর্দা দ্বারা পরস্পর যুক্ত। এরূপ পদকে **লিপ্তপদ** (Webbed foot) বলে। **লিপ্তপদের সাহায্যে ব্যাঙ স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটতে পারে।**

(12) দেহকাণ্ডের শেষে পশ্চাৎপদ দুটির মাঝে একটি **অবসারণী ছিদ্র** (Cloacal aperture or vent) বিদ্যমান।

8.15 B). সোনা ব্যাঙ* *[Frog] :*

(i) **প্রাণিজগতে সোনা ব্যাঙের স্থান** (Systematic position of Frog) :

পর্ব—**কর্ডাটা** (Chordata),

উপপর্ব—ভার্টিব্রাটা (Vertebrata),

শ্রেণী—আম্ফিবিয়া (Amphibia)।

(ii) **সোনা ব্যাঙের বিজ্ঞানসম্মত নাম** (Scientific name of a Frog) : **রাণা টাইগ্রিনা** (*Rana tigrina*)।

(iii) **স্বভাব ও বসতি** (Habit and Habitat) : সোনা ব্যাঙ সাধারণত নালা, ডোবা, পুকুর, বিল, জলা জায়গা অর্থাৎ জলজ পরিবেশে বাস করে।

(iv) **গঠন** (Structure) :

(1) সোনা ব্যাঙ দেখতে সুন্দর। পেটের রং স্বর্ণাভ, তাই এর নাম সোনা ব্যাঙ।

(2) এদের দেহে আঁচিল বা গুটি না থাকায় ত্বক মসৃণ ও চকচকে।

(3) সোনা ব্যাঙের দেহ **মস্তক** (Head), **ধড়** বা **দেহকাণ্ড** (Trunk) —এই দুই অংশে বিভক্ত।

● **মস্তক** (Head) :

(4) সোনা ব্যাঙের মস্তকের অগ্রভাগ সুচালো। সেখানে **আকর্ণ বিস্তৃত মুখ** বিদ্যমান। মুখকে ঘিরে রাখে চোয়াল। **উপরের চোয়ালে দাঁত বর্তমান।**

---
* সোনা ব্যাঙ **কোলা ব্যাঙ** নামেও পরিচিত।

পুংস্তবক (পুংকেশর চক্র—Androecium) : পুংকেশর অসংখ্য, এক-গুচ্ছ (Monadelphous), পুংদণ্ডগুলির সংযুক্তির ফলে একটি লাল রংয়ের ফাঁপা পুংকেশরীয় নল উৎপন্ন হয়, দললগ্ন (অর্থাৎ নীচের দিকে দলমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত), পরাগধানী যুক্ত, বৃক্কাকার (Reniform) ও একপ্রকোষ্ঠী।

স্ত্রীস্তবক (গর্ভকেশর চক্র—Gynoecium) : গর্ভপত্র 5, যুক্ত, গর্ভাশয় অধিগর্ভ, পাঁচ প্রকোষ্ঠযুক্ত। অমরাবিন্যাস অক্ষীয়—প্রতি প্রকোষ্ঠে অনেকগুলি করে ডিম্বক থাকে। গর্ভদণ্ড লম্বা, পুংদণ্ড দ্বারা উৎপন্ন ফাঁপা নলের ভিতর দিয়ে চালিত ; গর্ভমুণ্ডের সংখ্যা পাঁচ।

● **ধুতরা** (*Datura fastuosa*) **ফুল** (চিত্র 9.2) :

পুষ্প (Flower) : একক, সবৃন্তক, সম্পূর্ণ, সমাঙ্ক, উভলিঙ্গ, গর্ভপাদ।

বৃতি (Calyx) : বৃত্যংশ 5, যুক্ত, নলাকার, সবুজ।

দলমণ্ডল (Corolla) : দলাংশ 5, যুক্ত, ফানেলের মতো, টুইস্টেড, সাদা।

পুংস্তবক (পুংকেশর চক্র—Androecium) : পুংকেশর 5, দললগ্ন, বিযুক্ত, পরাগদণ্ড লম্বা, পরাগকোষ লম্বা দুই প্রকোষ্ঠযুক্ত।

স্ত্রীস্তবক (গর্ভকেশর চক্র—Gynoecium) : গর্ভপত্র 2, গর্ভাশয় দুই প্রকোষ্ঠযুক্ত, কিন্তু পরে চার প্রকোষ্ঠযুক্ত হয়। গর্ভাশয় বক্রভাবে স্থাপিত (Obliquely placed), অধিগর্ভ (Superior), অমরাবিন্যাস অক্ষীয়, গর্ভদণ্ড লম্বা, গর্ভমুণ্ড দ্বিধাবিভক্ত।

16.2. অসম্পূর্ণ, সমাঙ্ক ও একলিঙ্গ পুষ্প [*Incomplete, regular and unisexual flower*] :

● **কুমড়া** (*Cucurbita maxima*) **ফুল** (চিত্র 13.4 ও 13.5) :

পুষ্প (Flower) : একক, সবৃন্তক, অসম্পূর্ণ, সমাঙ্ক, একলিঙ্গ, গর্ভশীর্ষ।

বৃতি (Calyx) : বৃত্যংশ 5, নীচের দিকে যুক্ত, পুংপুষ্পের বৃত্যংশ সরু—স্ত্রীপুষ্পের বৃত্যংশ পত্রাকার, সবুজ।

দলমণ্ডল (Corolla) : দলাংশ 5, যুক্ত, ঘণ্টাকার, হলুদবর্ণ।

পুংপুষ্প (Male flowers) :

পুংস্তবক (**পুংকেশর চক্র**—Androecium) : পুংকেশর 3, পুংদণ্ড-গুলি বিযুক্ত, পরাগধানীগুলি যুক্ত (Syngenesious)।

স্ত্রীপুষ্প (Female flowers) :

স্ত্রীস্তবক (**গর্ভকেশর চক্র**—Gynoecium) : গর্ভপত্র 3, যুক্ত, গর্ভাশয় অধোগর্ভ, এক প্রকোষ্ঠযুক্ত, অমরাবিন্যাস বহুপ্রান্তীয়, গর্ভদণ্ড এক, ছোট, গর্ভমুণ্ড 3, প্রতিটি আবার দ্বিখণ্ডিত।

16.3. সম্পূর্ণ, অসমাঙ্গ ও উভলিঙ্গ পুষ্প *[Complete, irregular and bisexual flower] :*

● **বকফুল** (*Sesbania grandiflora*) :

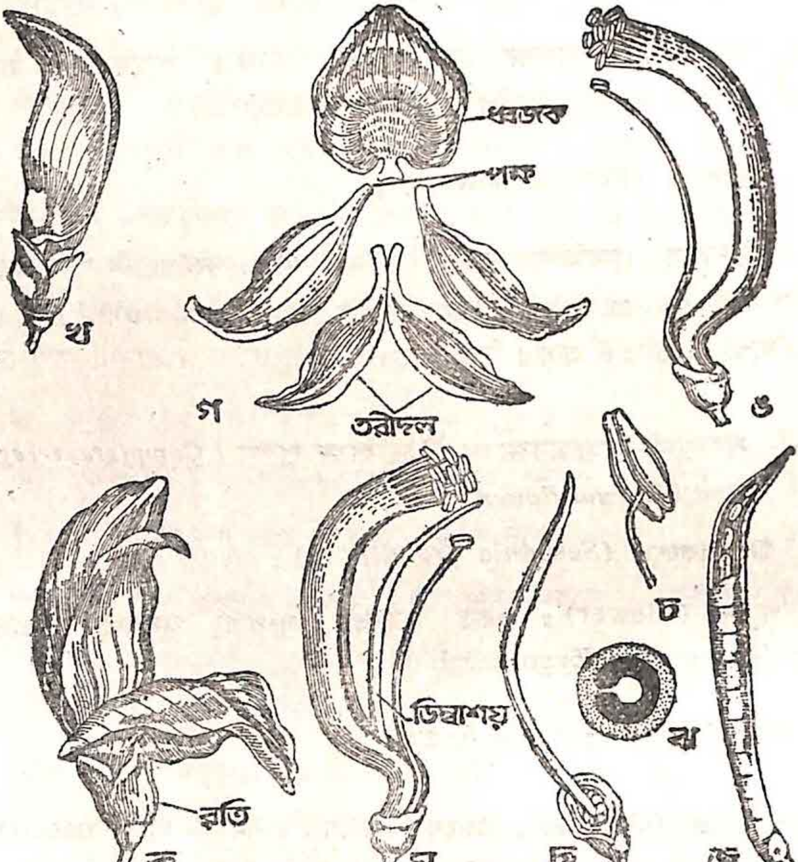
পুষ্প (Flower) : একক, সবৃন্তক, সম্পূর্ণ, অসমাঙ্গ, উভলিঙ্গ, গর্ভকটি, অপ্রতিসম (Zygomorphic)।

বৃতি (Calyx) : বৃত্যংশ 5, যুক্ত।

দলমণ্ডল (Corolla) : দলাংশ 5, প্রজাপতি-সম (Papilionaceous), পুষ্পপত্রবিন্যাস ধ্বজক (Vexillary)। বাইরের দিকে অবস্থিত সর্বাপেক্ষা বড় পাপড়িটিকে **ধ্বজক** (Standard or Vexillum), মধ্যের দুটিকে **পক্ষ** (Wing) ও একেবারে ভিতরে নৌকার মতো যুক্ত পাপড়ি দুটিকে **তরীদল** (Keel) বলে।

পুংস্তবক (**পুংকেশর চক্র**—Androecium) : পুংকেশর 10, দ্বিগুচ্ছ (Diadelphous), 9টি পুংদণ্ড একত্রিত হয়ে এক গুচ্ছে সজ্জিত কিন্তু 10ম-টি সম্পূর্ণ পৃথক।

স্ত্রীস্তবক (**গর্ভকেশর চক্র**—Gynoecium) : গর্ভপত্র 2, গর্ভাশয়, অধিগর্ভ, লম্বা, এক প্রকোষ্ঠযুক্ত, অমরাবিন্যাস প্রান্তীয়, গর্ভদণ্ড সংক্ষিপ্ত, গর্ভমুণ্ড—ভাঁজহীন, লম্বাকার, সরল।



চিত্র 16·2—বকফুলের বিভিন্ন অংশঃ ক—বকফুল ; খ—পার্শ্বদৃশ্য ; গ—দলমণ্ডলের অংশসমূহ ; ঘ—পুংকেশর চক্র ও গর্ভকেশর চক্র ; ঙ—পুংকেশর চক্র ; চ—পুংকেশর ; ছ—গর্ভকেশর ; জ—বীজসহ ফল ; ঝ—ডিম্বাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ।

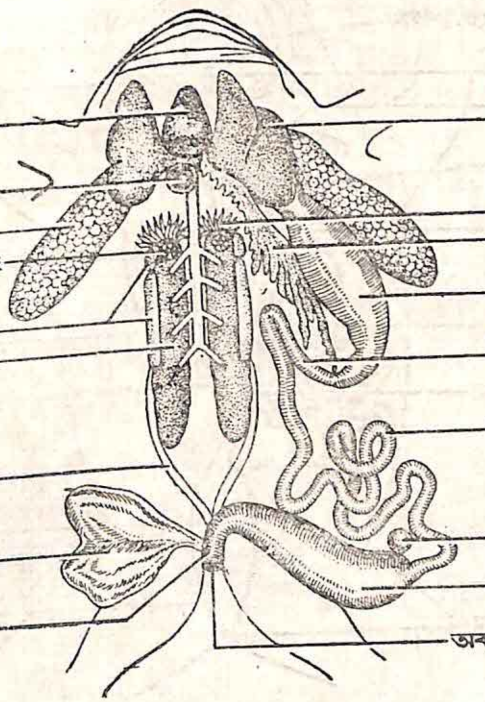
কুনো ব্যাঙের আন্তরযন্ত্র ও তাদের কার্যকলাপ 17

[Gross Anatomy of toad and general functions of the organs]

17.1. অবতরণিকা *[**Introduction**]* :

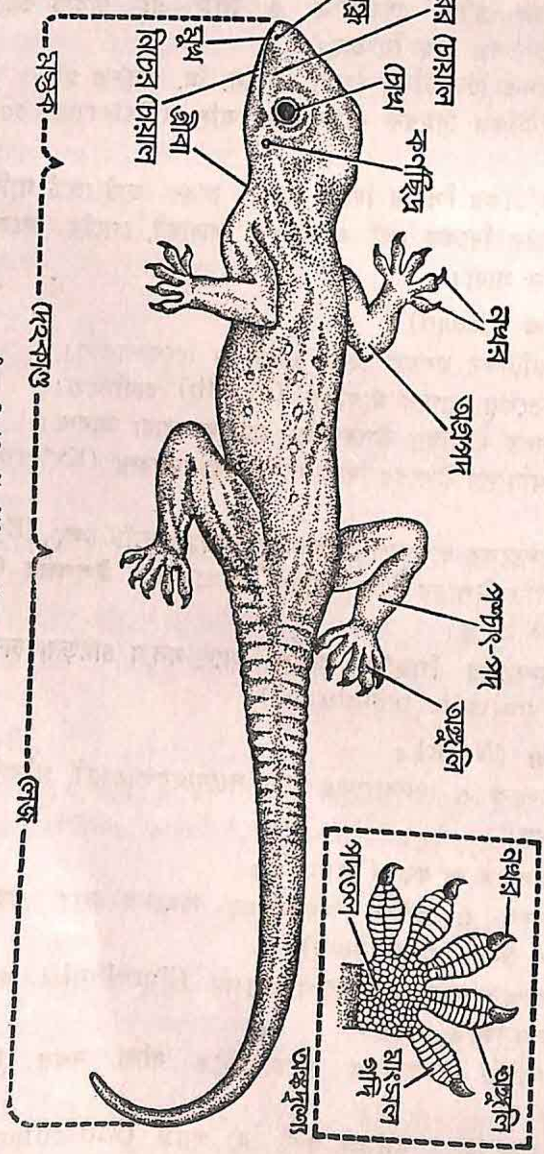
প্রাণিজগতে কুনো ব্যাঙের স্থান (Systematic position of Toad **in** Animal Kingdom) ঃ

পর্ব (Phylum)—কর্ডাটা (Chordata), উপপর্ব (Sub-phylum)—মেরুদণ্ডী (Vertebrata), অধিশ্রেণী (Super-class)—ন্যাথোস্টোমাটা বা চোয়ালযুক্ত (Gnathostomata), শ্রেণী (Class)—উভচর (Amphibia), গণ (Genus)—বিউফো (*Bufo*), প্রজাতি (Species)—মেলানোস্টিকটস (*melanostictus*)।



চিত্র 17.1—কুনো ব্যাঙের আন্তরযন্ত্র (অঙ্কদৃশ্য)।

(17) দেহকাণ্ডের শেষে দু'ধারে **পশ্চাৎপদ** (Hindlimb) অবস্থিত। পশ্চাৎপদ দু'টি **উরু, জানুতল, পদপাত** ও **অঙ্গুলিতে** বিভক্ত। এখানেও পদপাতে **মাংসল গদী** বর্তমান। পশ্চাৎপদের গঠন অগ্রপদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্থূল।



চিত্র 8·49—টিকটিকির বহিরাকৃতি।

(18) দেহকান্ড ও লেজের সংযোগস্থলে **অবসারণী ছিদ্রটি** (Cloacal aperture) আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত।

● **লেজ** (Tail) ঃ

(19) দেহকান্ডের পিছনে লম্বা (ক্রমশঃ সরু) **লেজ** বিদ্যমান। স্পর্শে বা আঘাতে এই লেজ খসে পড়ে। তবে শীঘ্রই নতুন লেজের পুনরাবির্ভাব ঘটে।

● **টিকটিকির পায়ের বৈশিষ্ট্য** (Special features of the leg of house lizard) ঃ

টিকটিকি বাড়ীর মেঝেতে যেমন হেঁটে বেড়ায়, তেমনি খাড়া দেওয়ালে বা সিলিং-এ স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতে পারে। টিকটিকির পায়ের গঠন বৈশিষ্ট্য এইভাবে চলাফেরা করার কাজে অত্যন্ত সহায়ক।

টিকটিকির প্রতিটি অঙ্গুলির মধ্যভাগ স্ফীত। ঐ অংশের অঙ্কীয়দেশে সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত দু'সারি ক্ষুদ্রাকার অবতল অংশ বর্তমান। সেজন্য অঙ্গুলিগুলির মধ্যভাগকে নরম **মাংসল গদি** (Muscular pad)-র মত দেখায়।

টিকটিকি যখন দেওয়াল বেয়ে চলে বা সিলিংয়ে ঘোরাফেরা করে তখন দেহের চাপে মাংসল গদির নিম্নাংশ থেকে বায়ু বাইরে বেরিয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বায়ু যে চাপ প্রয়োগ করে তার ফলে টিকটিকি খাড়া দেওয়ালে বা সিলিং-এ নিজের দেহকে আটকিয়ে রাখে।

8.19. গিরগিটি *[Garden Lizard] :*

(i) **গিরগিটির বিজ্ঞানসম্মত** নাম (Scientific name) ঃ **ক্যালোটিস ভার্সিকলার** (*Calotes versicolor*)।

(ii) **প্রাণিজগতে স্থান** (Systematic position) ঃ

পর্ব—**কর্ডাটা** (Chordata),
উপপর্ব—**ভার্টিব্রাটা** (Vertebrata),
শ্রেণী—**রেপটিলিয়া** (Reptilia)।

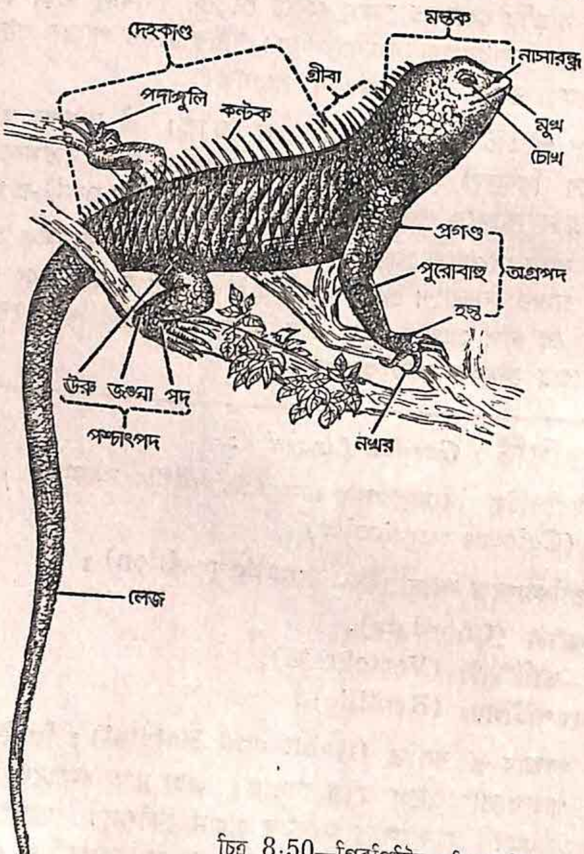
(iii) **স্বভাব ও বসতি** (Habit and Habitat) ঃ গিরগিটি বাগানে, ঝোপেঝাড়ে, গাছপালার ডালে ঘুরে বেড়ায়। এরা দ্রুত চলাচলে সক্ষম। দ্রুত চলাচল ক্ষমতা এদের আত্মরক্ষার অন্যতম প্রধান কৌশল। তাছাড়া আত্মরক্ষার তাগিদে গিরগিটি তার রং এমনভাবে পাল্টে নেয় যে তাৎক্ষণিক পরিবেশে তার অস্তিত্ব সনাক্ত করা আক্রমণকারীর কাছে কঠিন হ'য়ে পড়ে। ত্বকের **রঞ্জককোষ** ও **ক্রোমাটোফোরের** (Chromatophore) স্থানান্তরের ফলে দেহের রং পাল্টে যায়। পরিবেশের রং-এর সঙ্গে নিজের রং মিলিয়ে নেওয়ার দুর্লভ ক্ষমতা থাকায় গিরগিটি **'বহুরূপী'** নামে পরিচিত। শত্রুর মুখোমুখি হ'লে দেহের রং পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে পিঠের লম্বা কাঁটাগুলিকে এরা খাড়া করে দেয়।

গিরগিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তে খোলস ত্যাগ করে (**একডাইসিস,** Ecdysis)। এর ফলে পুরাতন আঁশ ঝড়ে যায় এবং নতুন আঁশ আবির্ভূত হয়।

(iv) **গিরগিটির বহিরাকৃতি** (External features of Garden Lizard) ঃ

(1) গিরগিটির লম্বা দেহ **মস্তক** (Head), **গ্রীবা** (Neck), **দেহকাণ্ড বা ধড়** (Trunk) ও **লেজ** (Tail)—এই চারটি অংশে বিভক্ত।

(2) গিরগিটির সারা দেহ **শুষ্ক আঁশে** (Dry scales) ঢাকা। আঁশ-গুলি ক্ষুদ্র গোলাকার এবং গিরগিটির দেহের বহিস্ত্বক থেকে উৎপন্ন।



চিত্র 8.50—গিরগিটির বহিরাকৃতি।

● **মস্তক** (Head) ঃ

(3) গিরগিটির মস্তকটি ত্রিকোণাকার।

(4) মস্তকের অগ্রভাগে **মুখছিদ্র** (Mouth) অবস্থিত। মুখছিদ্র উপর-নীচে দুটি **চোয়াল** (Jaw) দ্বারা আবদ্ধ। প্রতিটি চোয়ালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত বর্তমান। দাঁতগুলি খাদ্যবস্তুকে মুখবিবরে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

(5) মুখছিদ্রের পৃষ্ঠদেশে দুটি **বহিঃনাসারন্ধ্র** (External nostrils) খুব কাছাকাছি অবস্থিত। নাসারন্ধ্র শ্বাসকার্যে সহায়তা করে।

(6) নাসারন্ধ্রের পিছনে প্রতি পার্শ্বে একটি করে **চক্ষু** (Eye) বর্তমান। প্রতিটি চক্ষু **ঊর্ধ্ব ও নিম্নপল্লব** এবং **উপপল্লব** দ্বারা সুরক্ষিত। উপপল্লব প্রখর রৌদ্র ও ধূলাবালি থেকে চোখকে রক্ষা করে।

(7) চক্ষুর সামান্য পিছনে প্রতিপার্শ্বে **কর্ণপটহ** (Tympanum) দ্বারা আবৃত **কর্ণছিদ্র** (Auditory aperture) বর্তমান। এগুলি শ্রবণে সহায়তা করে।

(8) মস্তকের পিছনে শিরদাঁড়া বরাবর দীর্ঘ কাঁটা বর্তমান। এগুলি রূপান্তরিত আঁশ।

● **গ্রীবা** (Neck) ঃ

(9) গ্রীবা মস্তক ও ধড়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। গিরগিটির গ্রীবা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। গ্রীবা সংক্ষিপ্ত হ'লেও গ্রীবা মস্তককে আশে-পাশে ঘোরাতে সাহায্য করে। প্রজনন ঋতুতে পুং-গিরগিটির গ্রীবা লাল বর্ণ ধারণ করে।

● **দেহকাণ্ড** বা **ধড়** (Trunk) ঃ

(10) গ্রীবা ও লেজের মধ্যবর্তী স্ফীত অংশ দেহকাণ্ড বা ধড়।

(11) মস্তকের পিছন থেকে শিরদাঁড়া বরাবর যে দীর্ঘ কাঁটার সারি বর্তমান তা দেহকাণ্ডের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

(12) দেহকাণ্ডের অগ্রভাগে একজোড়া **অগ্রপদ** (Forelimb) এবং পশ্চাৎভাগে একজোড়া **পশ্চাৎপদ** (Hindlimb) অবস্থিত।

(13) অগ্রপদ **বাহু, প্রকোবাহু, মনিবন্ধ, করতল ও অঙ্গুলি**—এই পাঁচটি অংশে বিভক্ত।

(14) পশ্চাৎপদ **ঊরু, জঙ্ঘা, গোড়ালি, পদতল ও অঙ্গুলি**—এই পাঁচটি অংশে বিভক্ত।

(15) অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদের প্রতিটি অঙ্গুলি তীক্ষ্ন **নখরযুক্ত**।

(16) দেহকাণ্ড ও লেজের সংযোগস্থলে অঙ্কীয় প্রদেশে আড়াআড়ি বিন্যস্ত **অবসারণী ছিদ্র** (Cloacal aperture) বিদ্যমান।

(17) পুরুষ গিরগিটির অবসারণীস্থ একটি স্ফীত অঞ্চলে একজোড়া দ্বিধাবিভক্ত **হেমিপেনিস** (Hemipenis) বর্তমান। যৌন মিলনকালে এগুলি অবসারণী ছিদ্রপথে বাইরে আসে।

● **লেজ** (Tail) ঃ

(18) গিরগিটির লেজটি গোল ও খুব লম্বা। লেজের গোড়াটি মোটা এবং শেষ প্রান্তের দিকে ক্রমশঃ সরু। লেজটি পুরোপুরি আঁশে ঢাকা।

● **অন্যান্য লিজার্ড** (Other lizards) ঃ

লিজার্ড বলতে প্রকৃতপক্ষে **সরীসৃপ** বা **রেপটিলিয়া** (Reptilia) শ্রেণীর **স্কোয়ামাটা** (Squamata) বর্গের **ল্যাসারটিলিয়া** (Lacertilia) উপপর্বভুক্ত

সমস্ত প্রাণীকে বোঝায়। অর্থাৎ **লিজার্ড কোন বিশেষ একটি প্রাণী নয়,** পরন্তু **বিশেষ একটি প্রাণিগোষ্ঠী।**

এই গোষ্ঠীভুক্ত **গিরগিটি** বা **গার্ডেন লিজার্ড** (Garden lizard)-কে পরীক্ষাগারে সরীসৃপের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবচ্ছেদের কাজে ব্যবহার করা হয়। ঘরের মধ্যে যে লিজার্ডটি যথেচ্ছ ঘোরাফেরা করে সেটি আমাদের সবার পরিচিত **টিকটিকি** বা **হাউস লিজার্ড** (House lizard)। **গোসাপ** বা **মনিটার** (Monitor) এবং **তক্ষক** বা **গেকো** (Gecko) হ'ল অন্য দু' ধরনের লিজার্ড।

● **জীবনধারণ পদ্ধতি** (Mode of living) ঃ

গিরগিটি মাংসাশী প্রাণী। ঝোপ-ঝাড়ে ঘুরে বেড়ানো পোকামাকড়ই এদের প্রিয় ও প্রধান খাদ্য। গিরগিটির পাচনতন্ত্র মূলতঃ ব্যাঙের মত। এদের মাংসল জিবও মুখের বাইরে বেরিয়ে আসে। জিবের অগ্রভাগ দ্বিধাবিভক্ত। জিবের অগ্রভাগের সাহায্যেই গিরগিটি তার খাদ্য ধরে এবং জ্যান্ত শিকার মুখের মধ্যে পুরে নেয়। জিবের আঠালো শ্লেষ্মা শিকার ধরতে সাহায্য করে।

গিরগিটি দু'টি লম্বাকৃতি ফুসফুস (Lung) ও তৎসংলগ্ন সুদীর্ঘ একটি শ্বাসনালী (Trachea) দ্বারা শ্বাসকার্য পরিচালনা করে। গিরগিটির রক্তসংবহন-তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ **হৃৎপিন্ড** (Heart)। ব্যাঙের চেয়ে গিরিগিটির হৃৎপিন্ড কিছুটা উন্নত। এদের হৃৎপিণ্ডে নিলয় একটি। কিন্তু নিলয়টি অসম্পূর্ণভাবে বিভক্ত (Incompletely divided), সেজন্য ব্যাঙের ক্ষেত্রে অশুদ্ধ ও বিশুদ্ধ রক্তের মিশ্রণ ঘটলেও এখানে উভয় রক্ত মোটামুটি পৃথক থাকে। গিরগিটি **একলিঙ্গ** (Unisexual) প্রাণী। বহিরাকৃতি দেখে স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ করা কষ্টকর। এপ্রিল থেকে জুন গিরগিটির প্রজননকাল। স্ত্রী গিরগিটি মাটিতে গর্ত করে অথবা গাছের কোটরে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার আগে গিরগিটি তার ডিম্বনালীর (Oviduct) শেষ স্ফীত প্রান্তে জরায়ু (Uterus) নামে চিহ্নিত অংশে সাময়িকভাবে ডিমগুলিকে সঞ্চিত রাখে।

গিরগিটির পদদ্বয় দেহের তুলনায় ছোট। পদদ্বয়ের নখরযুক্ত অঙ্গুলি চলা-ফেরার সময় গাছের ডালপালা আঁকড়ে ধরতে সাহায্য করে।

8.20. কুনো ব্যাঙ ও টিকটিকির পার্থক্য *[Differences between Toad and House Lizard]* :

কুনো ব্যাঙ (Toad)	টিকটিকি (House lizard)
(1) কুনো ব্যাঙ **কর্ডাটা পর্বভুক্ত উভচর বা আম্ফিবিয়া শ্রেণীর মেরুদণ্ডী** (Vertebrate) প্রাণী।	(1) টিকটিকি **কর্ডাটা পর্বভুক্ত সরীসৃপ** বা **রেপটিলিয়া** শ্রেণীর **মেরুদণ্ডী** প্রাণী।

কুনো ব্যাঙ (Toad)	টিকটিকি (House lizard)
(2) কুনো ব্যাঙের দেহ মস্তক ও ধড়-এ বিভক্ত।	(2) টিকটিকির দেহ মস্তক, গ্রীবা, ধড় ও লেজে বিভক্ত।
(3) কুনো ব্যাঙের দেহে গ্রীবা ও লেজ নাই।	(3) টিকটিকির দেহে সুস্পষ্ট গ্রীবা ও সুদীর্ঘ লেজ বর্তমান।
(4) এদের দেহে বহিস্ত্বকীয় আঁশ নাই।	(4) এদের দেহ বহিস্ত্বকীয় আঁশে ঢাকা থাকে।
(5) এদের দেহত্বকে অজস্র ছোট-বড় গুটি বর্তমান।	(5) এদের দেহে কোন গুটি নাই।
(6) লম্বাটে বৃহদায়তন গুটি দু'টি বিষাক্ত, সাদা, দুধের মতো রসে পূর্ণ। গুটি দু'টিকে প্যারটিড গ্রন্থি বলে।	(6) প্যারটিড গ্রন্থি নাই।
(7) অগ্রপদে অঙ্গুলির সংখ্যা চার।	(7) অগ্রপদে অঙ্গুলির সংখ্যা পাঁচ।
(8) পুং-কুনো ব্যাঙের অগ্রপদে থাম্ব প্যাড বর্তমান।	(8) টিকটিকির অগ্রপদে থাম্ব প্যাড নাই।
(9) এদের পশ্চাৎপদ লিপ্তপদ।	(9) এদের পশ্চাৎপদ লিপ্তপদ নয়।
(10) এদের অঙ্গুলিতে নখর নাই।	(10) এদের অঙ্গুলিতে নখর আছে।
(11) চোয়ালে দাঁত নাই।	(11) চোয়ালে দাঁত বর্তমান।
(12) পরিবেশ অনুযায়ী দেহের রং পরিবর্তনে সক্ষম নয়।	(12) পরিবেশ অনুযায়ী দেহের রং পরিবর্তনে সক্ষম।
(13) এদের শিরদাঁড়া বরাবর দীর্ঘ কাঁটা নাই।	(13) এদের শিরদাঁড়া বরাবর দীর্ঘ কাঁটা বর্তমান।
(14) অবসারণী ছিদ্র আড়াআড়ি বিন্যস্ত নয়।	(14) অবসারণী ছিদ্র আড়াআড়ি বিন্যস্ত।
(15) এদের অঙ্গুলির অঙ্কীয় দেশে খাড়া দেওয়ালে চলাফেরা করার উপযোগী মাংসল গদি নাই।	(15) এদের প্রতিটি অঙ্গুলির অঙ্কদেশে মধ্যভাগ স্ফীত হ'য়ে মাংসল গদি গঠন করে। এর সাহায্যে টিকটিকি দেওয়ালে বা সিলিং-এ চলাফেরা করে।

8.21. গিনিপিগ *[Guineapig]* :

(i) **বিজ্ঞানসম্মত নাম** (Scientific name) : গিনিপিগের বিজ্ঞানসম্মত নাম **কেভিয়া পোরসেলস** (*Cavia porcellus*)।

(ii) **প্রাণিজগতে গিনিপিগের স্থান** (Systematic position of Guineapig) ঃ

পর্ব—**কর্ডাটা** (Chordata),
উপপর্ব—**ভার্টিব্রাটা** (Vertebrata),
শ্রেণী—**মামেলিয়া** (Mammalia)।

(iii) **স্বভাব ও বসতি** (Habit and Habitat) ঃ এরা **তীক্ষ্নদন্তী** (Rodent) ও **তৃণভোজী** (Herbivorous) প্রাণী। দিনের আলোয় গিনিপিগ কদাচিৎ গর্তের বাইরে আসে। সেই সময় এরা মাটির নীচে গর্তে নিরাপদে থাকে, রাত্রিকালে গর্ত থেকে বাইরে এসে খাদ্য সংগ্রহ করে।

(iv) **গিনিপিগের বহিরাকৃতি** (External features of Guineapig) ঃ

(1) দেহের প্রায় **সর্বাঙ্গ ঘন লোমে** (Hair) ঢাকা। তবে পদতল, মস্তকের উপরিভাগ এবং নাসারন্ধ্রের পরবর্তী অংশে লোম নাই।

(2) গিনিপিগ প্রায় 15 থেকে 20 সে. মি. লম্বা হয়।

(3) গিনিপিগের রং বাদামী, লাল বা সময় বিশেষে সাদা হয়।

(4) গিনিপিগের সুস্পষ্ট কোন লেজ নাই।

(5) গিনিপিগের দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম দেহ **মস্তক, গ্রীবা ও দেহকান্ড** বা ধড়-এ বিভক্ত।

● **মস্তক** (Head) ঃ

(6) গিনিপিগের মস্তকটি ছোট এবং ত্রিকোণাকার।

(7) মস্তকের অগ্রভাগ প্রসারিত হয়ে **তুন্ড** (Snout) গঠন করে।

(8) তুন্ডের অগ্রভাগে একজোড়া **বহিঃনাসারন্ধ্র** (External nostril) বর্তমান।

(9) নাসিকার নীচে লম্বা, শক্ত লোমগুলি **গুম্ফ** বা **ভাইব্রেসি** (Vibrassae)। নাসিকার নীচে এবং মস্তকের অগ্রভাগে **মুখ** (Mouth) অবস্থিত।

(10) মুখছিদ্র **ঊর্ধ্বোষ্ঠ** (Upper lip) এবং **নিম্নোষ্ঠ** (Lower lip) দ্বারা আবদ্ধ।

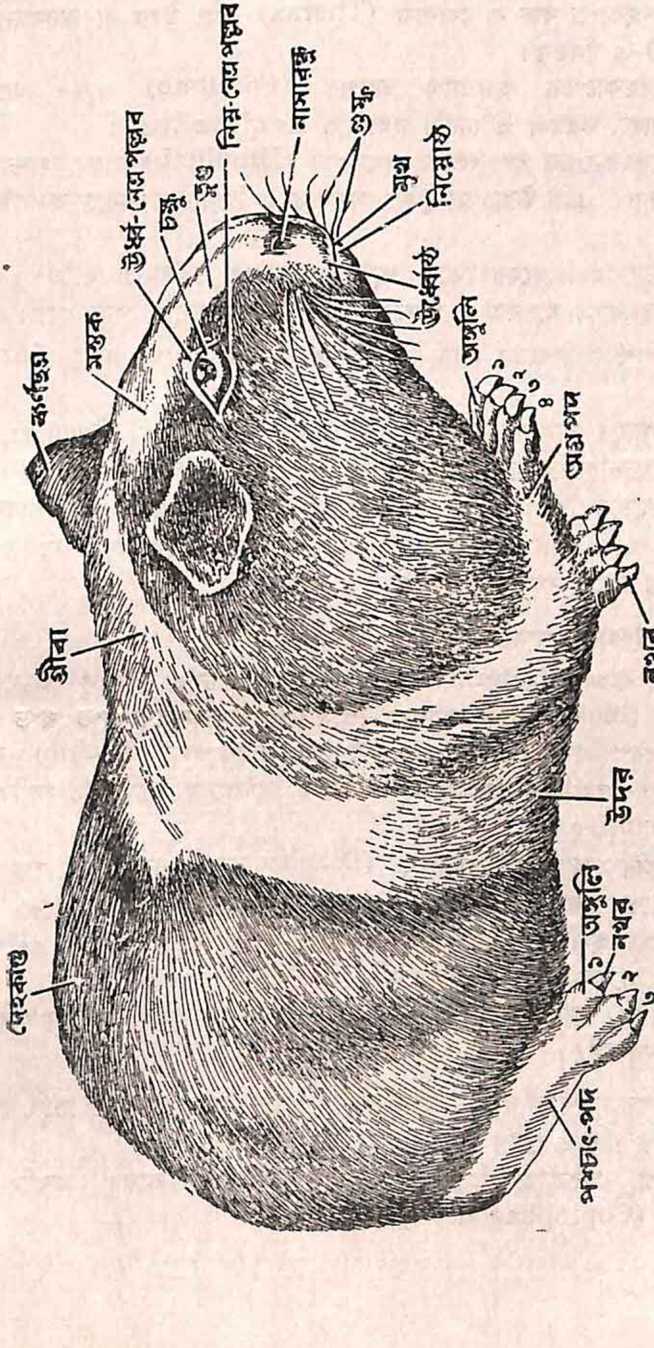
(11) ঊর্ধ্বোষ্ঠের মাঝখানটি কাটা (Cleft)। কাটা অংশের ভিতর দিয়ে সামনের দাঁতগুলি স্পষ্টই দেখা যায়।

(12) মস্তকের দু'পাশে দুটি গোলাকার **চক্ষু** (Eye) বর্তমান। চক্ষুর উপরের পাতা ও নীচের পাতা দুই-ই সঞ্চরণশীল। **চক্ষুর কোণে ক্ষয়প্রাপ্ত অংগ হিসাবে যথারীতি উপপল্লব** (Nictitating membrane) **বর্তমান**। চক্ষুর দু' পাতার ধারে সারিবদ্ধভাবে রোঁয়া (Eye lashes) আছে।

(13) চক্ষুর পিছনে দু'পাশে দু'টি বড় **বহিঃকর্ণ** বা **পিনা** (Pinna or External ear) অবস্থিত।

● **গ্রীবা (Neck) ঃ**

(14) সঞ্চরণশীল পিনার ভিতরে থাকে কর্ণছিদ্র। মস্তক ও দেহকান্ডের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে সংক্ষিপ্ত গ্রীবা। গ্রীবাকে সহজে যে-কোন দিকে ঘোরান যায়।



চিত্র 8.51—গিনিপিগের বহিরাকৃতি।

● **দেহকান্ড বা ধড়** (Trunk) ঃ

(15) গ্রীবার পিছন থেকে দেহকান্ড চওড়া ও **গোলাকার,** পরে ক্রমশঃ সরু।

(16) দেহকান্ড **বক্ষ** বা **থোরাক্স** (Thorax) এবং **উদর** বা **অ্যাবডোমেন** (Abdomen)-এ বিভক্ত।

(17) দেহকান্ডের অগ্রভাগে **অগ্রপদ** (Forelimb) যুক্ত। অগ্রপদ **বাহু, পুরোবাহু, করতল** ও চারটি নখরযুক্ত **অঙ্গুলিতে** বিভক্ত।

(18) দেহকান্ডের পশ্চাৎভাগে পশ্চাৎপদ (Hindlimb) যুক্ত। পশ্চাৎপদ অপেক্ষাকৃত দৃঢ়। এটি **উরু, জানুতল, পদপাত** ও তিনটি নখরযুক্ত **অঙ্গুলিতে** বিভক্ত।

(19) উদরের পিছনের দিকে দু'টি **স্তনবৃন্ত** (Teat) আছে। স্ত্রী-গিনিপিগে স্তনবৃন্ত সুস্পষ্ট। শাবকেরা এর সাহায্যে দুগ্ধ পান করে।

(20) পশ্চাৎপদদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশে উদরের শেষে **পায়ু** (Anus) অবস্থিত।

(21) পায়ুর সামনে **রেচনছিদ্র** (Urinary aperture) বিদ্যমান।

(22) রেচনছিদ্রের সামান্য নীচে আছে **জননছিদ্র** (Genital aperture)।

(23) পুরুষ গিনিপিগের পশ্চাৎপদের মধ্যবর্তী স্থানে **চর্ম আবরণের** (Scrotum) মধ্যে দুটি **অন্ডকোষ** (Testis) আছে। অপেক্ষাকৃত স্ফীত এই স্থানটি বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

● **জীবনধারণ পদ্ধতি** (Mode of Living) ঃ

গিনিপিগ শাকাশী (Herbivorous) প্রাণী। বাটালি আকৃতির একজোড়া **কৃন্তক দাঁত** (incisor)-এর সাহায্যে গিনিপিগ **খাদ্যবস্তুকে খন্ড খন্ড ক'রে** মুখবিবরে প্রবেশ করায়। কারণ গিনিপিগের **ছেদক দন্ত** (Caine) নাই। এদের বৃহদন্ত্রের প্রথমাংশ **কোলন** (Colon)। কোলনের অগ্রভাগটি স্ফীতকায় **সিকম** (Caecum)।

গিনিপিগের দেহগহ্বরে **মধ্যচ্ছদা** (Diaphragm) নামক পর্দা বক্ষগহ্বর ও উদরগহ্বরকে পৃথক ক'রে রাখে। মধ্যচ্ছদা শ্বাসকার্যে সহায়তা করে।

গিনিপিগের হৃৎপিন্ড উন্নত এবং মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ হৃৎপিন্ডে চারটি পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান।

গিনিপিগের **লোহিত রক্তকণিকা মানুষের মতোই নিউক্লিয়সবিহীন** (Non-nucleated)।

গিনিপিগের মস্তিষ্ক মাছ, উভচর, সরীসৃপ শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের চেয়ে অনেক উন্নত। এদের ঘ্রাণ ও শ্রবণ শক্তি প্রবল।

গিনিপিগ রাত্রিকালে নিজের পরিত্যক্ত **মল** ভক্ষণ করে। অর্থাৎ এরা **কপ্রোফেগাস** (Coprophagous) প্রাণী।

স্ত্রী গিনিপিগের জরায়ুর মধ্যেই নিষেক (অন্তঃনিষেক, internal fertilization) ঘটে এবং মানুষের মতো জরায়ুতেই ভ্রূণের বৃদ্ধি ও পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তি ঘটে। স্ত্রী গিনিপিগ আড়াই মাস গর্ভধারণের পর একসঙ্গে দু'-তিনটি বাচ্চার জন্ম দেয়। গিনিপিগ স্তন্যপায়ী প্রাণী। সুতরাং বাচ্চাগুলি মায়ের **স্তনগ্রন্থি নিঃসৃত** দুধ পান করে বড় হয়।

● **গিনিপিগের গুরুত্ব** (Importance of Guineapig) ঃ

গিনিপিগ স্তন্যপায়ীর আদর্শ প্রতিভূ। মানুষের বিভিন্ন অন্ত্র সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ এবং মানুষের দেহে প্রয়োগের আগে সদ্য আবিষ্কৃত বিভিন্ন ঔষধের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য উপযুক্ত প্রাণী হিসাবে গিনিপিগ নির্বাচিত হয়। গিনিপিগ **পরীক্ষাগারের প্রাণী** (Laboratory animal)-রূপে পরিচিত। গিনিপিগ পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলের মানুষের প্রিয় খাদ্য।

8.22. টিকটিকি ও গিনিপিগের পার্থক্য [*Differences between House Lizard and Guineapig*] :

টিকটিকি (House lizard)	গিনিপিগ (Guineapig)
(1) টিকটিকি **কর্ডাটা** পর্বভুক্ত **সরীসৃপ** বা **রেপটিলিয়া** শ্রেণীর **মেরুদণ্ডী** প্রাণী।	(1) গিনিপিগ **কর্ডাটা** পর্বভুক্ত **স্তন্যপায়ী** বা **ম্যামেলিয়া** শ্রেণীর **মেরুদণ্ডী প্রাণী।**
(2) টিকটিকির দেহ **মস্তক, গ্রীবা, ধড় ও লেজ**-এ বিভক্ত।	(2) গিনিপিগের দেহ **মস্তক, গ্রীবা** ও **ধড়**-এ বিভক্ত।
(3) টিকটিকির মোটা থেকে ক্রমশঃ সরু সুদীর্ঘ **লেজ বর্তমান।**	(3) গিনিপিগের **সুস্পষ্ট কোন লেজ** নাই।
(4) এদের দেহ **বহিস্ত্বকীয় আঁশে** ঢাকা।	(4) এদের দেহ **বহিস্ত্বকীয় আঁশে ঢাকা নয়।**
(5) দেহে **লোম** নাই।	(5) দেহের প্রায় সর্বত্র **লোম**-এ ঢাকা।
(6) এদের দেহের **শিরদাঁড়া** বরাবর **দীর্ঘ কাঁটা বর্তমান।** উত্তেজিত হ'লে কাঁটাগুলি খাড়া হয়।	(6) গিনিপিগের দেহের শিরদাঁড়া বরাবর কোনরূপ **কাঁটা নাই।**
(7) মস্তকের অগ্রভাগে তুণ্ড নাই।	(7) মস্তকের অগ্রভাগে তুণ্ড বর্তমান।
(8) নাসারন্ধ্রের চারপাশে **গুম্ফ** বা **ভাইব্রাসি** নাই।	(8) নাসারন্ধ্রের চারপাশে **গুম্ফ** বা **ভাইব্রাসি** বর্তমান।

● **কুনো ব্যাঙের বিজ্ঞানসম্মত নাম** (Scientific name of Toad) : **বিউফো মেলানোস্টিকটস** (*Bufo melanostictus*)।

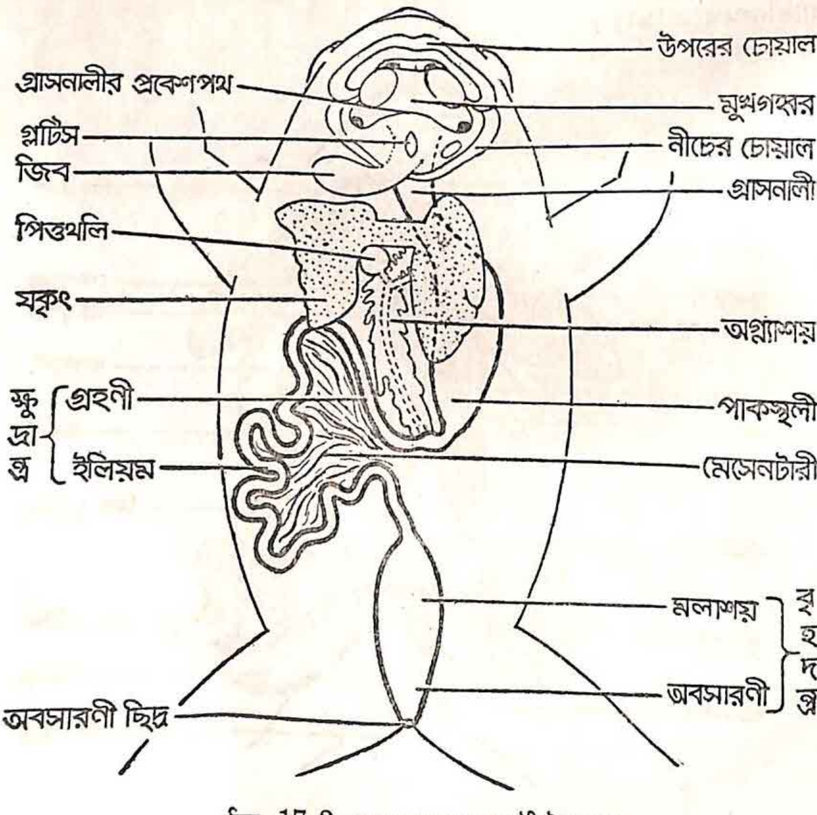
পূর্বে কুনো ব্যাঙের বহিরাকৃতি আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আন্তর-যন্ত্র (চিত্র 17.1) এবং বিভিন্ন অঙ্গ ও সেগুলির কার্যকলাপ বর্ণনা করা হল।

17.2. কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র [*Alimentary system of toad*] :

● **পৌষ্টিকতন্ত্রের সংজ্ঞা** (Definition of Alimentary system) : **যে তন্ত্রের মাধ্যমে জীব খাদ্য গ্রহণ, পাচন, শোষণ এবং অপাচ্য অংশের বহিষ্করণ ঘটায়, তাকে পৌষ্টিকতন্ত্র বলে।**

ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র :
(A) **পৌষ্টিকনালী** (Alimentary canal) ও
(B) **পরিপাক গ্রন্থি** (Digestive glands) নিয়ে গঠিত।

(A) **পৌষ্টিকনালী** (Alimentary canal) : পৌষ্টিকনালী মুখ থেকে ধড়ের শেষ প্রান্তে অবস্থিত অবসারণী ছিদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।



চিত্র 17.2—কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র।

(i) **মুখ ও মুখছিদ্র** (Mouth) ঃ কুনো ব্যাঙের ত্রিকোণাকৃতি মস্তকের সম্মুখভাগে আড়াআড়িভাবে মুখছিদ্রটি অবস্থিত। মুখছিদ্র ঊর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়াল দ্বারা আবদ্ধ। **কুনো ব্যাঙের চোয়ালে কোন দাঁত নাই।** মুখছিদ্র মাধ্যমে ব্যাঙ খাদ্য গ্রহণ করে।

(ii) **মুখবিবর** (Buccal cavity) ঃ মুখছিদ্রের পরবর্তী প্রসারিত অংশ মুখবিবর। মুখবিবরের নিম্নতলে পেশীবহুল ও সংকোচী অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জিবটির অগ্রপ্রান্ত সংযুক্ত থাকে। জিবের পশ্চাৎপ্রান্ত মুক্ত। শিকার নাগালের মধ্যে এলে ব্যাঙ জিবটিকে অতি দ্রুততায় মুখবিবরের বাইরে এনে শিকারের উপরে ছুঁড়ে দেয় এবং আঠালো জিবে শিকার ধরা পড়লে পুনরায় জিবটিকে মুখবিবরে গুটিয়ে আনে।

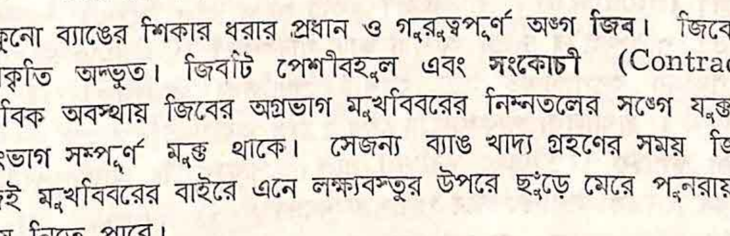
● **কুনো ব্যাঙের খাদ্য ও খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি** (Food and method of digestion of Toad) ঃ

● **কুনো ব্যাঙের খাদ্য ঃ**

কুনো ব্যাঙ **মাংসাশী প্রাণী** (Carnivorous animal)। ছোট-ছোট কীট-পতঙ্গ, পিঁপড়া, কেঁচো, ছোট শামুক ইত্যাদি জীবন্ত প্রাণী এদের প্রিয় খাদ্য। নড়াচড়া করে না এমন বস্তুকে কুনো ব্যাঙ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে না।

● **খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি ঃ**

কুনো ব্যাঙের শিকার ধরার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ **জিব**। জিবের গঠন ও প্রকৃতি অদ্ভুত। জিবটি পেশীবহুল এবং **সংকোচী** (**Contractile**), স্বাভাবিক অবস্থায় জিবের অগ্রভাগ মুখবিবরের নিম্নতলের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু পশ্চাৎভাগ সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। সেজন্য ব্যাঙ খাদ্য গ্রহণের সময় জিবটিকে সহজেই মুখবিবরের বাইরে এনে লক্ষ্যবস্তুর উপরে ছুঁড়ে মেরে পুনরায় তাকে গুটিয়ে নিতে পারে।



চিত্র 17.3—ব্যাঙের খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি।

খাদ্যের সন্ধানে এরা চারদিকে ঘুরে বেড়ায় এবং সর্বদা সজাগ ও **সন্ধানী** দৃষ্টি মেলে রাখে। উপযুক্ত শিকারের **সন্ধান** পেলে কুনো ব্যাঙ ধীরে ধীরে শিকারের নিকটবর্তী হয় এবং বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে শিকারের স্বাভাবিক

টিকটিকি (House lizard)	গিনিপিগ (Guineapig)
(9) এদের দুই চোয়ালে **ছোট ছোট দাঁত আছে।**	(9) এদের দুই চোয়ালে **ছোট-বড় অনেক দাঁত আছে।**
(10) এদের **ঊর্ধ্বোষ্ঠ কাটা নয়।** তাই দাঁতগুলি সচরাচর দেখা যায় না।	(10) এদের **ঊর্ধ্বোষ্ঠের মধ্যভাগ** কাটা। তাই কৃন্তক **দন্তগুলি** দেখা যায়।
(11) এদের **নেত্রলোম নাই।**	(11) এদের **নেত্রলোম** আছে।
(12) এদের **বহিঃকর্ণ** বা **পিনা** নাই।	(12) এদের **বহিঃকর্ণ** বা **পিনা** আছে।
(13) টিকটিকির **অগ্রপদে অঙ্গুলির সংখ্যা পাঁচ।**	(13) গিনিপিগের অগ্রপদে **অঙ্গুলির সংখ্যা চার।**
(14) এদের **পশ্চাৎপদের অঙ্গুলির সংখ্যা পাঁচ।**	(14) এদের **পশ্চাৎপদের অঙ্গুলির** সংখ্যা **তিন।**
(15) টিকটিকির প্রতিটি অঙ্গুলির অঙ্কদেশের মধ্যভাগ স্ফীত হ'য়ে **মাংসল গদি** গঠন করে। এর দ্বারা টিকটিকি স্বচ্ছন্দে খাড়া দেওয়ালে বা **সিলিং-এ চলাফেরা করতে পারে।**	(15) খাড়া দেওয়ালে বা সিলিং-এ চলাফেরা করার মতো **মাংসল গদির বন্দোবস্ত নাই।**
(16) টিকটিকি পরিবেশ অনুযায়ী **দেহের রং পরিবর্তন করতে পারে।**	(16) গিনিপিগ **পরিবেশ অনুযায়ী** দেহের রং **পরিবর্তন করতে** পারে না।
(17) স্ত্রী টিকটিকির দেহে **স্তনবৃন্ত** নাই।	(17) স্ত্রী গিনিপিগের দেহে **স্তন-বৃন্ত বর্তমান।**
(18) পুং টিকটিকির দেহে চর্ম আবরণাবদ্ধ **অন্ডকোষ নাই।**	(18) পুং গিনিপিগের দেহে চর্ম আবরণাবদ্ধ **অন্ডকোষ বর্তমান।**
(19) দেহে দ্বিধাবিভক্ত **হেমিপেনিস** আছে।	(19) **হেমিপেনিস** নাই। **পেনিস** আছে।
(20) স্থলে ও জলে উভয় পরিবেশেই বাস করে।	(20) কেবল স্থলেই বাস করে।

8.23. কুনো ব্যাঙ ও গিনিপিগের পার্থক্য *[Differences between Toad and Guineapig] :*

কুনো ব্যাঙ (Toad)	গিনিপিগ (Guineapig)
(1) কুনো ব্যাঙ **কর্ডাটা** পর্বভুক্ত উভচর বা আম্ফিবিয়া শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণী।	(1) গিনিপিগ **কর্ডাটা পর্বভুক্ত** স্তন্যপায়ী বা **মামেলিয়া** শ্রেণীর **মেরুদণ্ডী** প্রাণী।

কুনো ব্যাঙ (Toad)	গিনিপিগ (Guineapig)
(2) কুনো ব্যাঙের দেহ মস্তক ও ধড়-এ বিভক্ত।	(2) গিনিপিগের দেহ মস্তক, গ্রীবা ও ধড়-এ বিভক্ত।
(3) কুনো ব্যাঙের দেহে অজস্র ছোট-বড় গুটি বর্তমান।	(3) গিনিপিগের দেহে এ জাতীয় কোন গুটি নাই।
(4) সাদা বিষাক্ত রসপূর্ণ দু'টি প্যারটিড গ্রন্থি বর্তমান।	(4) এদের দেহে প্যারটিড গ্রন্থি নাই।
(5) দেহে লোম নাই।	(5) দেহ লোমে ঢাকা।
(6) মস্তকের অগ্রভাগে তুন্ড নাই।	(6) মস্তকের অগ্রভাগে তুন্ড আছে।
(7) নাসারন্ধ্রের চারপাশে গুম্ফ বা ভাইব্রাসি নাই।	(7) এদের নাসারন্ধ্রের চারপাশে গুম্ফ বা ভাইব্রাসি বর্তমান।
(8) কুনো ব্যাঙের চোয়ালে দাঁত নাই।	(8) গিনিপিগের চোয়ালে ছোট-বড় নানা প্রকার দাঁত আছে।
(9) ঊর্ধ্বোষ্ঠের মধ্যভাগ কাটা নয়।	(9) ঊর্ধ্বোষ্ঠের মধ্যভাগ কাটা—ঐ অংশ দিয়ে কৃন্তক দাঁত দেখা যায়।
(10) এদের নেত্রলোম নাই।	(10) এদের নেত্রলোম আছে।
(11) বহিঃকর্ণ বা পিনা নাই।	(11) বহিঃকর্ণ বা পিনা আছে।
(12) এদের জলে সাঁতার কাটার উপযোগী লিপ্তপদ আছে।	(12) লিপ্তপদ নাই।
(13) এদের অঙ্গুলিতে নখর নাই।	(13) এদের অঙ্গুলিতে নখর বর্তমান।
(14) পুং দেহের অগ্রপদে থাম্ব প্যাড বর্তমান।	(14) থাম্ব প্যাড নাই।
(15) পুং দেহে চর্ম আবরণাবদ্ধ অন্ডকোষ নাই।	(15) পুং দেহে চর্ম আবরণাবদ্ধ অন্ডকোষ বর্তমান।
(16) স্ত্রী দেহে স্তনবৃন্ত নাই।	(16) স্ত্রী দেহে স্তনবৃন্ত বর্তমান। বাচ্চা দুগ্ধ দ্বারা পালিত হয়।
(17) এদের পশ্চাৎপদে অঙ্গুলির সংখ্যা পাঁচ।	(17) এদের পশ্চাৎপদে অঙ্গুলির সংখ্যা তিন।
(18) কুনো ব্যাঙ উভচর—জলে ও স্থলে উভয় পরিবেশে বাঁচতে পারে।	(18) গিনিপিগ স্থলচর — কেবল স্থলেই বাস করে।
(19) মাংসাশী।	(19) শাকাশী।

নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ করে। তারপর উপযুক্ত সময় এলে দেহের অগ্রভাগ কিছুটা নিচু ক'রে কুনো ব্যাঙ অতিশয় ক্ষিপ্রতায় তার জিবটিকে উল্টিয়ে মুখবিবরের বাইরে আনে এবং লক্ষ্যবস্তুর উপরে ছুঁড়ে দেয়।

জিবের অগ্রভাগ চট্‌চটে রসসিক্ত থাকায় সহজেই সেই জিবে শিকার ধরা পড়ে। এবার ব্যাঙটি শিকারসহ জিবটিকে মুখবিবরের মধ্যে গুটিয়ে আনে। মুখবিবরে না পৌঁছানো পর্যন্ত ধৃত বস্তু খাদ্য না অখাদ্য তা ঠিক করা এদের পক্ষে সম্ভব হয় না। নড়াচড়া করছে এমন বস্তু দেখলেই সাধারণত এরা অতি তৎপরতায় ঐভাবে শিকারকে মুখে টেনে আনে। তবে শিকার অখাদ্য মনে হ'লে কুনো ব্যাঙ অধিকতর দ্রুততায় শিকারকে বাইরে নিক্ষেপ করে।

(iii) **গলবিল** (Pharynx) : মুখবিবরের পিছনে স্বল্প বিস্তৃত অংশটি **গলবিল** (Pharynx)। এই অংশটি খাদ্য গ্রহণ করায় সহায়তা করে।

(iv) **গ্রাসনালী** (Oesophagus) : গলবিল ও পাকস্থলীর মধ্যবর্তী পৌষ্টিকনালী অংশকে গ্রাসনালী বলে। গলবিল **গালেট** (Gullet) নামক আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত একটি ছিদ্র দ্বারা **গ্রাসনালী** বা **অন্ননালী** (Oesophagus)-র সঙ্গে যুক্ত। গ্রাসনালীর ক্রমসংকোচনে খাদ্য পাকস্থলীতে নেমে আসে।

(v) **পাকস্থলী** (Stomach) : গ্রাসনালীর পরের অংশ **পেশীবহুল পাকস্থলী** (Stomach)। পাকস্থলী একটি স্থূল থলি বিশেষ। হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্তী পাকস্থলীর চওড়া অংশটি **হার্দ-পাকস্থলী** (Cardiac stomach) এবং পিছনের অপেক্ষাকৃত সরু অংশটি **প্রণালিকা পাকস্থলী** (Pyloric stomach)। প্রণালিকা পাকস্থলীর শেষ প্রান্তে অবস্থিত বৃত্তাকার কপাটককে **প্রণালিকা কপাটক** (Pyloric valve) বলে। পাকস্থলীর অন্তঃগাত্র নিঃসৃত পাচক রস খাদ্যকে আংশিকভাবে পরিপাক করে।

(vi) **ক্ষুদ্রান্ত্র** (Small intestine) : পাকস্থলীর পরবর্তী সরু নলাকার অংশটি ক্ষুদ্রান্ত্র।

(a) **গ্রহণী** বা **ডিওডেনম** (Duodenum) : ক্ষুদ্রান্ত্রের দুটি অংশ : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশ পাকস্থলীর সঙ্গে 'U'-এর মতো বিন্যস্ত থাকে। এই অংশটিকে বলে **ডিওডেনম** (Duodenum) বা **গ্রহণী**। এখানে যকৃৎ-অগ্ন্যাশয়-নালী (Hepato-pancreatic duct) যুক্ত থাকে। এখানে খাদ্যের পরিপাক সম্পন্ন হয়।

(b) **ইলিয়ম** (Ileum) : গ্রহণীর পরবর্তী অংশ অত্যন্ত দীর্ঘ। **মেসেনটারী** (Mesentary) নামক পাতলা পর্দায় আটকানো কুণ্ডলীকৃত এই অংশটি **ইলিয়ম** (Ileum)। ইলিয়মের অন্তর্গাত্রে অবস্থিত **ভিলাই** (Villi) পাচিত খাদ্যের সার অংশ শোষণ করে।

(vii) বৃহদন্ত্র (Large intestine) ঃ ইলিয়ম ক্রমে বিস্তৃত হয়ে **বৃহদন্ত্র** (Large intestine) গঠন করে। বৃহদন্ত্রের স্থূল প্রথমাংশ **মলাশয় বা মলনালী** (Rectum) এবং শেষাংশ **অবসারণী** (Cloaca)। অবসারণী প্রকৃতপক্ষে একটি স্বল্প-পরিসর প্রকোষ্ঠ। এটি **অবসারণী ছিদ্র** (Cloacal aperture) পথে দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়।

(B) **কুনো ব্যাঙের পরিপাক গ্রন্থিসমূহ** (Digestive glands of toad) ঃ

যকৃৎ ও **অগ্ন্যাশয়** কুনো ব্যাঙের অতি প্রয়োজনীয় দুটি বড় পরিপাক গ্রন্থি। পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিগুলি পরিপাকে সহায়তা করে।

● **যকৃৎ** (Liver) ঃ গাঢ় রক্তবর্ণের যকৃৎ কুনো ব্যাঙের দেহাভ্যন্তরে হৃৎপিণ্ডকে ঘিরে থাকে। সর্ববৃহৎ এই পরিপাক গ্রন্থটি **বাম খণ্ডে** (Left lobe) ও **দক্ষিণ খণ্ডে** (Right lobe) বিভক্ত। উভয় খণ্ড একটি সরু অংশ দ্বারা যুক্ত। বামখণ্ডটি পুনরায় অস্পষ্টভাবে বিভক্ত। খণ্ড দুটির সংযোগস্থলে অবস্থিত গাঢ় সবুজবর্ণের গোলাকার থলিটি **পিত্তাশয়** বা **পিত্তথলি** (Gall bladder)। যকৃৎ নিঃসৃত **পিত্ত** (Bile) এই থলিতে জমা থাকে। যকৃৎ কোষ থেকে নিঃসৃত পিত্ত **যকৃৎনালী** (Hepatic duct) মাধ্যমে পিত্তথলিতে আসে। সেখানে সেটি পিত্তথলি থেকে সৃষ্ট **পিত্তনালী** (Cystic duct)-র সঙ্গে মিশে **সাধারণ পিত্তনালী** (Common bile duct) গঠন করে। সাধারণ পিত্তনালীটি অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হবার সময় **অগ্ন্যাশয়নালী** (Pancreatic duct)-এর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং **যকৃৎ-অগ্ন্যাশয়নালী** (Hepato-Pancreatic duct) গঠন করে। শেষোক্ত নালীটি গ্রহণীতে মুক্ত হয়। পিত্ত পরিপাকে সহায়তা করে।

● **অগ্ন্যাশয়** (Pancreas) ঃ গ্রহণী ও পাকস্থলীর মাঝে অবস্থিত অগ্ন্যাশয় হালকা হলুদবর্ণের লম্বা পরিপাকগ্রন্থি। পিত্তথলি ও যকৃৎ থেকে নির্গত একটি সরু নল **সাধারণ পিত্তনালী** (Common bile duct) হিসাবে অগ্ন্যাশয় ভেদ ক'রে গ্রহণীতে মুক্ত হয়। অগ্ন্যাশয় ভেদ করার সময় অগ্ন্যাশয় থেকে উৎপন্ন কতকগুলি সূক্ষ্মনালী সাধারণ পিত্তনালীর সঙ্গে মেশে। ঐ একই নালীপথে **অগ্ন্যাশয় রস** (Pancreatic juice) গ্রহণীতে আসে।

ব্যাঙের মুখগহ্বরে **লালাগ্রন্থি** (Salivary gland) নাই। সেখানে খাদ্যের পরিপাক হয় না। তাছাড়া কুনো ব্যাঙের চোয়ালে দাঁত নাই। ব্যাঙ জীবন্ত কীটপতঙ্গ গিলে খায়। খাদ্যবস্তু গলবিল, গ্রাসনালী দিয়ে সরাসরি পাকস্থলীতে চলে আসে। খাদ্য বেশ কিছু সময় ধরে পাকস্থলীতে থাকার সুযোগ পায়। ঐ সময় পাকস্থলীগাত্রের **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড** (HCl) ও **পেপসিন** (Pepsin) খাদ্যের সঙ্গে মেশে। হাইড্রোক্লোরিক

দ্বিতীয়ার্ধ

ধুতরা গাছের বহিরাকৃতি 9
[External Features of Dhatura]

9.1. ধুতরা **সোলানেসী** (Solanaceae) গোত্রভুক্ত **স্থলবাসী** (Terrestrial) **কাষ্ঠল** (Woody), **সবল কাণ্ডযুক্ত**, সাধারণত **একবর্ষজীবী বিরুৎ** (Annual herb) জাতীয় **সপুষ্পক দ্বিবীজপত্রী** উদ্ভিদ্।

● **ধুতরার বিজ্ঞানসম্মত নাম** (Scientific name of **Dhatura**) ঃ

(i) **ডেটুরা মেটেল** (*Datura metel* L.) (কাল ধুতরা)।

(ii) **ডেটুরা স্ট্র্যামোনিয়ম** (*Datura stramonium* L.) (শ্বেত ধুতরা)।

● **বসতি** (Habitat) ঃ প্রায় **সব ঋতুতেই**, সাধারণত **বনে-জঙ্গলে, রাস্তার দু'পাশে আগাছারূপে ধুতরা গাছ জন্মায়।** মরু অঞ্চল বা অত্যধিক শৈত্যপ্রবণ অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ধুতরার কোন না কোন প্রজাতি চোখে পড়ে।

● **বিস্তৃতি** (Distribution) ঃ এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা—পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিশেষতঃ ভারতে ধুতরার প্রায় 30টি প্রজাতি (Species) দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র—এমনকি দার্জিলিং অঞ্চলেও সাদা ফুলযুক্ত ধুতরার দেখা মেলে। এছাড়া, সিকিম, সিমলা, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলেও এই গাছ দেখা যায়।

● **ধুতরার বহিরাকৃতি** (External features of Dhatura) ঃ

(1) বিরুৎ জাতীয় এই উদ্ভিদের উচ্চতা 1—1.5 মিটার।

(2) ধুতরার দেহ **মূল, কাণ্ড ও পাতায়** বিভক্ত।

(3) মাটির নীচে বর্ধিত অংশকে **মূল** (Root) এবং মাটির উপরে বর্ধিত অংশকে **কাণ্ড** (Stem) বা **বিটপ** (Shoot) বলে।

● **মূল** (Root) ঃ

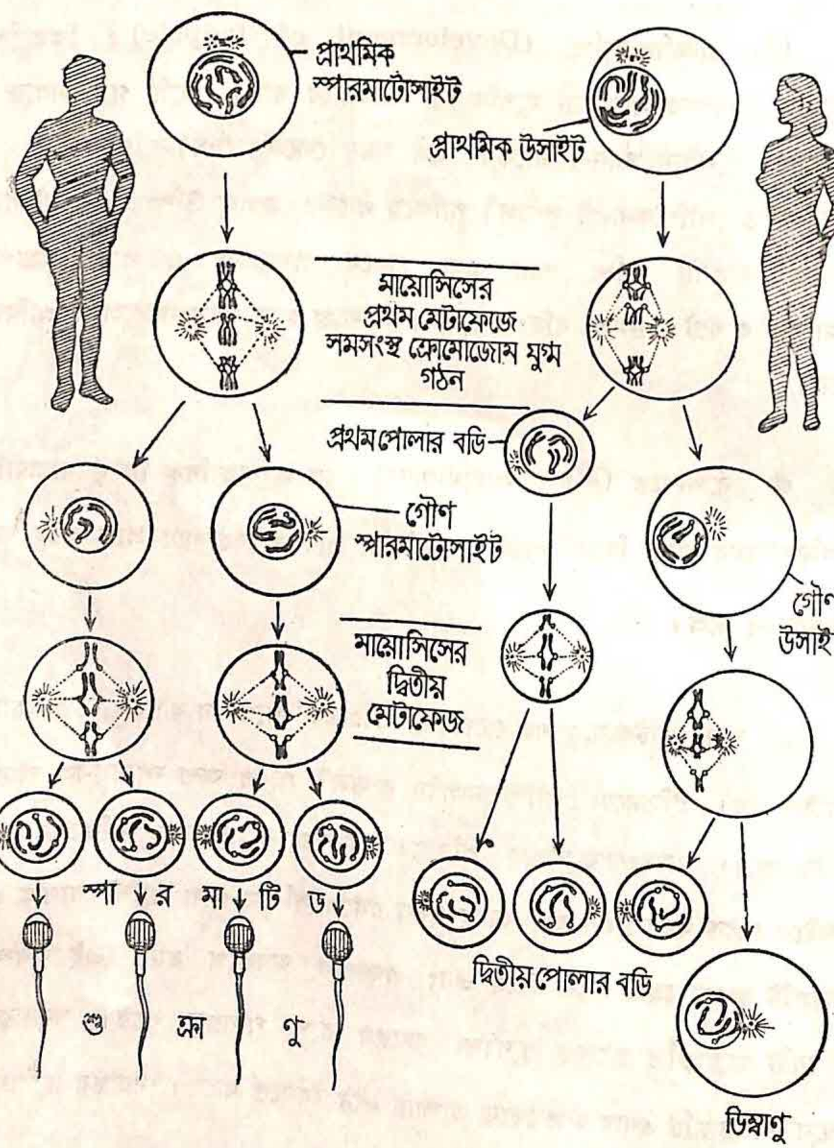
(4) মূল মাটির অনেক গভীরে প্রবেশ করে এবং শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে **প্রধান মূলতন্ত্র** (Tap root system) গঠন করে।

(5) মূলের মোচাকৃতি প্রধান অংশ **প্রধান মূল** (Tap root)।

(6) প্রধান মূল থেকে উদ্গত শাখাগুলি **শাখা মূল** (Secondary roots)।

(7) শাখা মূল থেকে উৎপন্ন সূক্ষ্ম সূত্রগুলিকে **প্রশাখা মূল** (Tertiary roots) বলে।

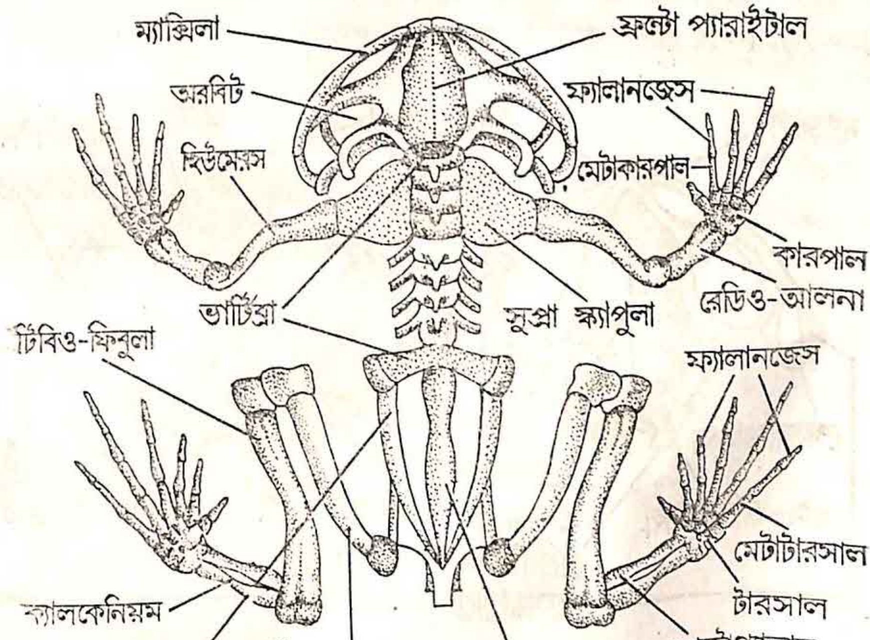
17.11. মানুষের দেহে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপাদনের চিত্ররূপ *[Diagrammatic representation of the process of Sperm and Ovum production in human being]* :



চিত্র 17·21—মানুষের ক্ষেত্রে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গঠনের চিত্ররূপ।

17.12. কুনো ব্যাঙের কঙ্কালতন্ত্র [Skeletal system of Toad] :

মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে কাঠামো গঠনকারী, নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদানে সাহায্যকারী এবং দেহভার বহনে সহায়তাকারী তন্ত্রকে কঙ্কালতন্ত্র বলে।



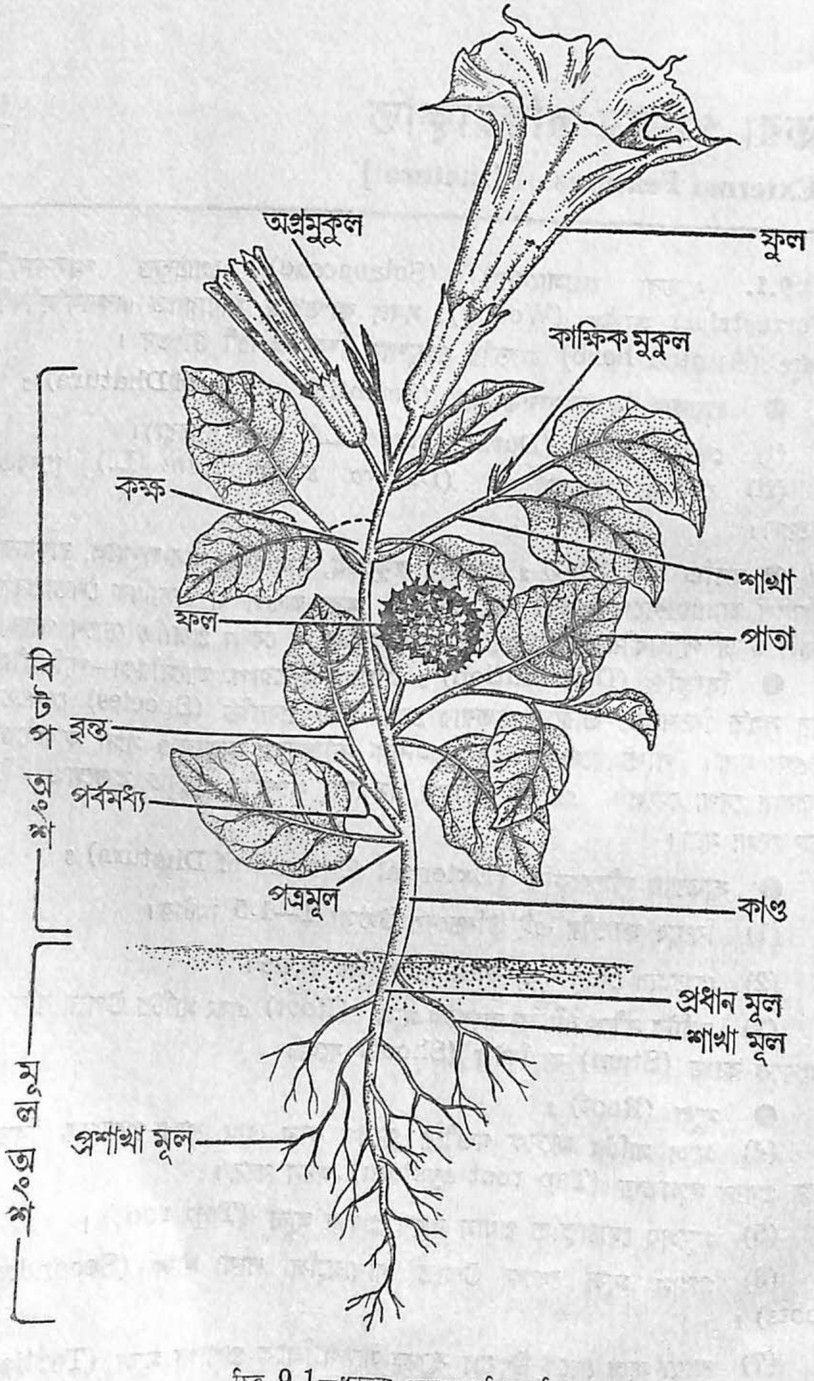
চিত্র 17·22—ব্যাঙের কঙ্কালতন্ত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্রটি প্রকৃতপক্ষে **অন্তঃকঙ্কাল** (Endoskeleton)। কুনো ব্যাঙের দেহে অন্তঃকঙ্কাল বর্তমান—**বহিঃকঙ্কাল** (Exoskeleton) নাই।

কুনো ব্যাঙের অন্তঃকঙ্কালতন্ত্রটি প্রধান দু'টি ভাগে বিভক্ত, যথা—

(A) অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্র (Axial skeletal system)।

(B) উপাঙ্গিক কঙ্কালতন্ত্র (Appendicular skeletal system)।



চিত্র 9·1—ধুতরা গাছের বহিরাকৃতি।

(8) মূলাগ্রের পাতলা আচ্ছাদনকে **মূলত্র** বা **মূলত্রাণ** বা **মূলটুপি** (Root-cap) বলে। মূলত্রের সামান্য উপরে বিস্তৃত অংশে **মূলরোমের** (Root-hair) সমাবেশ ঘটে।

● **মূলের কাজ** (Functions of Root) ঃ

(i) প্রধান মূল তার শাখা-প্রশাখার সাহায্যে উদ্ভিদকে মাটির সঙ্গে সংলগ্ন থাকতে সাহায্য করে।

(ii) **মূলরোম রস শোষণ করে।**

(iii) **মূলত্র ক্রমবর্ধমান মূলের অগ্রভাগকে রক্ষা করে।**

● **কাণ্ড** (Stem) ঃ

(9) বিটপতন্ত্রের প্রধান অংশ কাণ্ড। এটি বহু **শাখা-প্রশাখায়** বিভক্ত।

(10) কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা থেকে একাধিক **সরলপত্র** (Simple leaf) উৎপন্ন হয়।

(11) কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার যে অংশে পাতা যুক্ত থাকে, সেই অংশকে **পর্ব** (Node) এবং দুটি পর্বের মধ্যবর্তী অংশকে **পর্বমধ্য** (Internode) বলে।

(12) কাণ্ড ও পাতার মধ্যবর্তী কোণকে **কক্ষ** (Axil) বলে। কক্ষে ও কাণ্ডশীর্ষে **মুকুল** (Bud) অথবা **ফুল** (Flower) জন্মায়।

(13) কক্ষের মুকুলকে **কাক্ষিক মুকুল** বা **পার্শ্বীয় মুকুল** (Axillary bud or Lateral bud) বলে।

(14) কাণ্ডশীর্ষের মুকুলকে **শীর্ষমুকুল** বা **অগ্রমুকুল** (Apical or Terminal bud) বলে।

● **কাণ্ডের কাজ** (Functions of Stem) ঃ

(i) কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল ধারণ করে।

(ii) মূল দ্বারা শোষিত রস কাণ্ডের মাধ্যমে ঊর্ধ্বগতি লাভ করে।

(iii) কাণ্ড মাধ্যমে পাতায় উৎপন্ন খাদ্য বা সঞ্চিত খাদ্য বিভিন্ন অঙ্গে পরিবেশিত হয়।

● **পাতা** (Leaf) ঃ

(15) কাণ্ডের পর্ব থেকে নির্গত চ্যাপ্টা, প্রসারিত সবুজ বর্ণের পার্শ্বজ অঙ্গকে পাতা বলে।

(16) ধুতরা গাছে বহু পাতা থাকে। পাতাগুলির সজ্জা পদ্ধতি **একান্তর** (Alternate)।

(17) পাতা সরল (Simple) ও **সবৃন্তক** (Petiolate)।

(18) বৃন্তের গোড়ায় উপপত্র (Stipule) থাকে না, অর্থাৎ পাতা **অনুপপত্রিক** (Exstipulate)।

(19) পাতাগুলি **'ওভেট'** (Ovate) আকৃতির এবং **মসৃণ** (Smooth)।

(20) পাতার কিনারা **একটানা** (Entire) বা সামান্য ঢেউ-খেলানো (Wavy)।

(21) **পাতার আগা সূক্ষ্মকোণ** (Acute)-এ শেষ হয়।

(22) শিরাবিন্যাস **একশিরাল জালিকাকার** (Unicostate reticulate)।

● **পাতার কাজ** (Functions of Leaves) ঃ

(i) পাতা সালোকসংশ্লেষ মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করে।

(ii) পাতার মাধ্যমে **বাষ্পমোচন** ঘটে।

(iii) পাতা শ্বসনে অংশগ্রহণ করে।

● **ফুল** (Flower) ঃ

(23) **ফুল একটি পরিবর্তিত বিটপ।**

(24) ধুতরার প্রতিটি পাতার কক্ষে একটি করে ফুল জন্মায়।



চিত্র 9·2—ধুতরা ফুলের বিভিন্ন অংশ ও ফল।

(25) ফুল **সবৃন্তক** (Petiolate), **সম্পূর্ণ** (Complete), **সুষম** (Regular), **উভলিঙ্গ** (Bisexual) এবং **গর্ভপাদ** (Hypogynous)।

(26) ফুলে পুষ্পপত্র (Bract) থাকে না।

(27) সংক্ষিপ্ত পুষ্পদণ্ডের (Peduncle) উপরে **পুষ্পাক্ষ** (Thalamus) বর্তমান।

(28) **পুষ্পাক্ষের** উপরে যথারীতি চারটি **পুষ্পপত্রের স্তবক** (Whorl of floral leaves) অবস্থিত।

(a) **বৃতি** (Calyx) :

(29) ধুতরা ফুলের বাইরের **স্তবকটি বৃতি**।

(30) বৃতি **পাঁচটি বৃত্যংশ** (Sepal) দ্বারা গঠিত।

(31) বৃত্যংশগুলি একে অপরের সঙ্গে মিলে **নলাকার** (Tubular calyx) বৃতি গঠন করে।

(32) বৃতির রং সবুজ।

● **বৃতির কাজ** (Functions of Calyx) : বৃতি ফুলের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে রক্ষা করে।

(b) **দলমণ্ডল** (Corolla) :

(33) বৃতির উপরের স্তবক দলমণ্ডল।

(34) পাঁচটি পরস্পর-সংযুক্ত **দলাংশ** (Petal) দ্বারা দলমণ্ডল গঠিত।

(35) দলমণ্ডল **ফানেলাকৃতি**।

(36) দলমণ্ডলের রং সাধারণত সাদা।

● **দলমণ্ডলের কাজ** (Functions of Corolla) :

(i) দলমণ্ডল ভিতরের অত্যাবশ্যকীয় জননঅঙ্গগুলিকে রক্ষা করে।

(ii) বিশেষ গন্ধ ছড়িয়ে দলমণ্ডল পরাগযোগে সাহায্যকারী কীটপতঙ্গ আকর্ষণ করে।

(c) **পুংস্তবক** বা **পুংকেশরচক্র** (Androecium) :

(37) পুংস্তবক পাঁচটি **পুংকেশর** (Stamen) দ্বারা গঠিত।

(38) পুংকেশরগুলি **দললগ্ন** (Epipetalous)।

(39) ধুতরার **পুংদণ্ড** (Filament) লম্বা। তবে এর অনেকটা অংশই দলের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, কেবল উপরের সামান্য অংশ মুক্ত।

(40) **পরাগধানী** (Anther) পুংদণ্ডের শীর্ষে অবস্থিত।

● **পুংস্তবকের কাজ** (Functions of Androecium) :

(i) পুংস্তবক পুংকেশরের পরাগধানী অংশে পরাগ বা রেণু (Pollen grains) উৎপাদন করে।

(ii) রেণুর মধ্যে শুক্রাণু (Sperm) গঠিত হয়।

(d) **স্ত্রীস্তবক** বা **গর্ভকেশরচক্র** (Gynoecium) :

(41) পুষ্পাক্ষের শীর্ষদেশে অবস্থিত সর্বোচ্চ স্তবকটি স্ত্রীস্তবক।

(42) এতে দুটি গর্ভপত্র (Carpel) বর্তমান।

(43) গর্ভপত্রের নীচের স্ফীত অংশটি **ডিম্বাশয়** (Ovary)। ডিম্বাশয় তেরচাভাবে বিন্যস্ত (obliquely placed) থাকে।

(44) গর্ভাশয়ের উপরে দণ্ডাকার অংশ **গর্ভদণ্ড** (Style)।

(45) গর্ভদণ্ড শীর্ষদেশে দুভাগে বিভক্ত হয়ে **গর্ভমুণ্ড** বা **গর্ভশীর্ষ** (Stigma) গঠন করে।

অ্যাসিড খাদ্যে মিশে পাকস্থলীতে আম্লিক মাধ্যম সৃষ্টি করে। সেই আম্লিক মাধ্যমে প্রোটিন **ভঙ্গক এনজাইম পেপসিন** খাদ্যের প্রোটিনকে ভেঙে **প্রোটিওজ, পেপটোন** ও **পলিপেপটাইড**-এ পরিণত করে। এইভাবে পাকস্থলীতে অর্ধপাচিত খাদ্য মণ্ডের আকার ধারণ করে। একে **খাদ্যমণ্ড** বা **ফুড কাইম** (Food chyme) বলে। খাদ্যমণ্ড পাকস্থলী থেকে প্রণালিকা ছিদ্রপথে **ডিওডেনামে** আসে। ডিওডেনামে **যকৃৎ-অগ্ন্যাশয়নালী** মাধ্যমে পিত্ত ও অগ্ন্যাশয় রস **এসে** পৌঁছায়। **পিত্তে কোন এনজাইম থাকে না।** তবে অগ্ন্যাশয় রসে প্রোটিন-ভঙ্গক বা প্রোটিওলাইটিক এনজাইম **ট্রিপসিন** (Trypsin), শ্বেতসারভঙ্গক বা অ্যামাইলোইটিক এনজাইম **অ্যামাইলেজ** (Amylase) এবং ফ্যাট ভঙ্গক **বা** লাইপোলাইটিক এনজাইম **লাইপেজ** (Lipase) থাকে। এদিকে গ্রহণী নিঃসৃত রসে এবং অগ্ন্যাশয় ও পিত্তরসে **সোডিয়াম বাইকার্বোনেট** (Sodium bicarbonate) জাতীয় ক্ষারীয় পদার্থ থাকায় সেটি লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে প্রশমিত করে।

ট্রিপসিন প্রোটিনের পেপটোন ও প্রোটিওজকে ভেঙে **অ্যামাইনো অ্যাসিড** (Amino acid), **অ্যামাইলেজ** (Amylase) কার্বোহাইড্রেটকে ভেঙে **মলটোজে** (Maltose) এবং **লাইপেজ** (Lipase) ফ্যাট জাতীয় খাদ্যকে ভেঙে **ফ্যাটি অ্যাসিড** (Fatty acid) ও **গ্লিসারল** (Glycerol)-এ পরিণত করে।

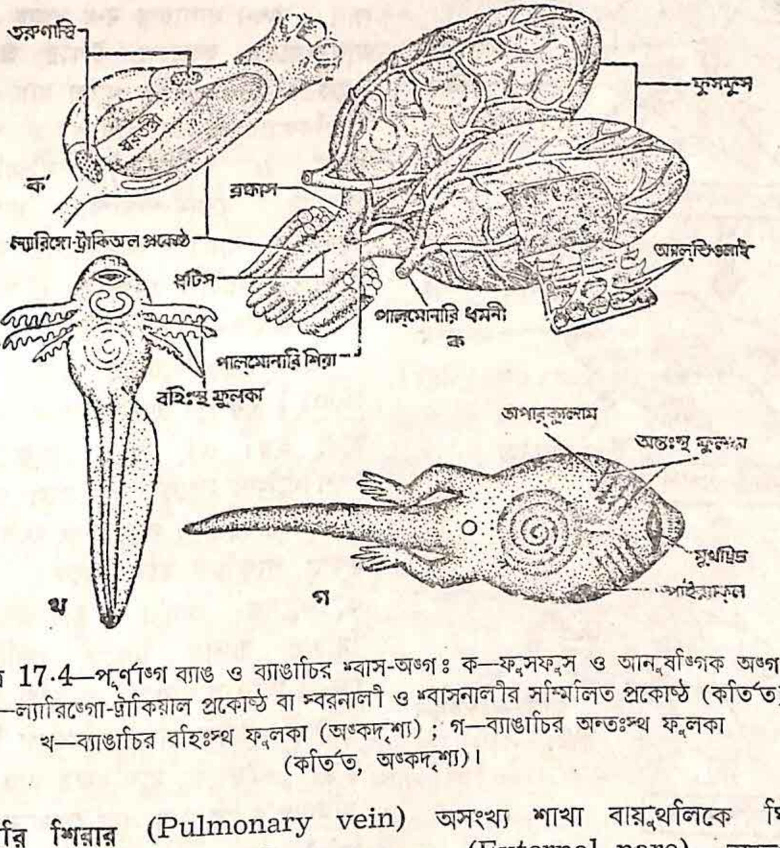
ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তর্গত নিঃসৃত প্রোটিনভঙ্গক **ইরেপসিন** (Erepsin) এবং শর্করাভঙ্গক মলটেজ (Maltase) যথাক্রমে খাদ্যের অর্ধপাচ্য অবশিষ্ট প্রোটিনকে ভেঙে অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং মলটোজকে ভেঙে **গ্লুকোজ** (Glucose)-এ পরিণত করে।

ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তর্গাত্রে অবস্থিত অসংখ্য রক্তজালক সমৃদ্ধ ভিলাই ব্যাপন ক্রিয়ায় অ্যামাইনো অ্যাসিড ও গ্লুকোজ শোষণ করে। **ল্যাকটিয়াল** (Lacteal) দ্বারা ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল শোষিত হয়। প্রথমটি সরাসরি রক্তস্রোতে এবং দ্বিতীয়টি লসিকাতন্ত্র মাধ্যমে কলাকোষে পৌঁছে দেহকে পুষ্ট করে। অপাচ্য খাদ্য মলাশয়ে জমা হয়। বৃহদন্ত্রে কিছুটা জলীয় পদার্থ শোষিত হয়। পরে অপাচ্য অংশ মলরূপে অবসারণী ছিদ্রপথে দেহমুক্ত হয়।

17.3. কুনো ব্যাঙের শ্বাসতন্ত্র *[Respiratory system of toad]* :

ফুসফুস (Lung), **দেহত্বক** (Skin), **মুখবিবর** এবং **গলবিলের শৈষ্মিক ঝিল্লী** (Mucous membrane) প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গ দ্বারা কুনো ব্যাঙের শ্বসন সম্পন্ন হয়। তাছাড়া **ব্যাঙাচি অবস্থায় ব্যাঙ মাছের মতো ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য** চালায়। শ্বাসকার্যের সময় দেহে অক্সিজেন গৃহীত হয় ও কার্বন ডাই-অক্সাইড দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হয়।

(A) **ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য** (Pulmonary respiration) ঃ হৃৎপিন্ডের দুদিকে বিস্তৃত দুটি ফুসফুস শ্বাসকার্যের প্রধান **যন্ত্র।** ফুসফুস **গোলাপী বর্ণের স্থিতিস্থাপক থলি বিশেষ।** প্রত্যেকটি **ফুসফুস** ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। এই প্রকোষ্ঠগুলিকে **বায়ুথলি** বা **অ্যালভিওলাই** (Alveoli) বলে। **পালমোনারি ধমনী** (Pulmonary artery) ও **পাল-**



চিত্র 17·4—পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ ও ব্যাঙাচির শ্বাস-অঙ্গ ঃ ক—ফুসফুস ও আনুষঙ্গিক অঙ্গ ; ক'—ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াল প্রকোষ্ঠ বা স্বরনালী ও শ্বাসনালীর সম্মিলিত প্রকোষ্ঠ (কর্তিত); খ—ব্যাঙাচির বহিঃস্থ ফুলকা (অংকদৃশ্য) ; গ—ব্যাঙাচির অন্তঃস্থ ফুলকা (কর্তিত, অংকদৃশ্য)।

মোনারি শিরার (Pulmonary vein) অসংখ্য শাখা বায়ুথলিকে ঘিরে রাখে। ফুসফুস ছাড়া **বহিঃস্থ নাসারন্ধ্র** (External nare), **অন্তঃস্থ নাসারন্ধ্র** (Internal nare), **ব্রঙ্কস** বা **ক্লোম-শাখাদ্বয়** (Bronchi), **ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াল প্রকোষ্ঠ** (Laryngo-tracheal chamber), **স্বরনালী ও শ্বাসনালীর সম্মিলিত প্রকোষ্ঠ, ভয়েস বক্স** প্রভৃতি শ্বাসকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

● **কুনো ব্যাঙের শ্বাসকার্য পদ্ধতি** (Mechanism of Respiration of Toad) ঃ **অ্যাসপিরেশান** (Aspiration), **ইনস্‌পিরেশান** (Inspiration) ও **এক্সপিরেশান** (Expiration)—এই তিনটি পর্যায়ে **ফুসফুসীয় শ্বাসকার্য সম্পন্ন হয়।**

● **স্ত্রীস্তবকের কাজ** (Functions of Gynoecium) :

(i) স্ত্রীস্তবকের ডিম্বাশয় অংশে **ডিম্বক** (Ovule) গঠিত হয়।

(ii) ডিম্বকমধ্যস্থ ভ্রূণনালীতে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়।

● **ফল** (Fruit) :

(46) ধুতরা গাছে ক্যাপসিউল (Capsule) জাতীয় সরল, গোল ফল উৎপন্ন হয়।

(47) ফল কণ্টকময়।

(48) ফলের মধ্যে প্রচুর বীজ উৎপন্ন হয়।

● **ফলের কাজ** (Functions of Fruit) :

(i) ফলের মধ্যে বীজ উৎপন্ন হয়।

(ii) বীজ থেকে নতুন গাছ জন্মায়।

● **ধুতরার ব্যবহার** (Uses of Dhatura) :

ধুতরা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ **ঔষধি উদ্ভিদ** (Medicinal plant)। ধুতরা গাছের বিভিন্ন অংশ নানাবিধ রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ভারতে ঔষধি হিসাবে ধুতরা গাছের বাৎসরিক চাহিদা প্রায় 40 কুইণ্টাল। নীচে ধুতরা গাছের ব্যবহার ও গুরুত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করা হ'ল :

(1) আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় বেগুনী রং-এর ধুতরা **(কনক-ধুতরা) পাতার রস ফোলা** বা **বেদনায়, ঠাণ্ডা লেগে গলা ফোলা** বা **দাঁতের গোড়া ফোলা প্রভৃতি উপসর্গ নিরাময়ে চমকপ্রদ কাজ দেয়।**

(2) **কৃমির উৎপাত দমনে** এই রস বিশেষ কার্যকরী।

(3) 3-4টি ধুতরার **বীজ পিষে সেবন করলে** অজীর্ণ **রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।**

(4) **ধুতরার কাণ্ড ও শুকনো পাতা চূর্ণ দ্বারা নির্মিত চুরুটের ধূমপান করলে শ্বাসকষ্টের লাঘব হয়।**

(5) ধুতরার মূলজাত **ডেটুরিন** (Daturine) উপক্ষার **হাঁপানির** (Asthma) **উপশম করে।**

মূল

[Root]

10.1. সূচনা *[Introduction] :*

ভ্রূণ (Embryo) উদ্ভিদের আদি দশা। বীজপত্র (Cotyledon) ও ভ্রূণাক্ষ (Axis) একত্রে ভ্রূণ গঠন করে। ভ্রূণাক্ষের নিম্নগামী অংশ ভ্রূণমূল (Radicle)। ভ্রূণমূল পরিণত হয়ে মূল গঠন করে। মূল মাটিতে প্রবেশ ক'রে উদ্ভিদকে মাটির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন রাখে এবং মাটির রস শোষণ করে।

মনে রাখতে হবে উদ্ভিদের মৃৎগত অংশমাত্রই মূল নয়। বটের ঝুরি আংশিকভাবে এবং অর্কিডের মূল সম্পূর্ণভাবে মাটির উপর থাকে। অপরদিকে আদা, আলু, ওল প্রভৃতি পরিবর্তিত কাণ্ড মাটির মধ্যেই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ বা অবস্থান বিচার করে মূলকে কাণ্ড থেকে পৃথক করা চলে না। প্রধানত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠনে মূল ও কাণ্ডের পার্থক্য ধরা পড়ে।

10.2. মূলের সংজ্ঞা *[Definition of Root] :*

ভ্রূণাক্ষের নিম্নগামী ভ্রূণমূল অংশের বর্ধিত ও পরিণত রূপকে মূল বলে।

10.3. মূলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য *[Some important features of Root] :*

(1) মূল সাধারণত উদ্ভিদের অধোগামী অক্ষ (descending axis)।

(2) মূল অনুকূল অভিকর্ষী (positively geotropic)—অর্থাৎ মূল অভিকর্ষ বলের অনুকূলে বৃদ্ধি পায়।

(3) মূল প্রতিকূল আলোকবর্তী (negatively phototropic)—অর্থাৎ মূল আলোক উৎসের বিপরীত দিকে এগিয়ে চলে।

(4) মূল অনুকূল জলবর্তী (positively hydrotropic)—অর্থাৎ মূল জলের উৎসের দিকে ধাবিত হয়।

(5) মূলের আগায় মূলত্র (root-cap) বা মূলপকেট (root-pocket) বা মূলজেব থাকে।

(6) মূলে পর্ব (node) বা পর্বমধ্য (internode) থাকে না।

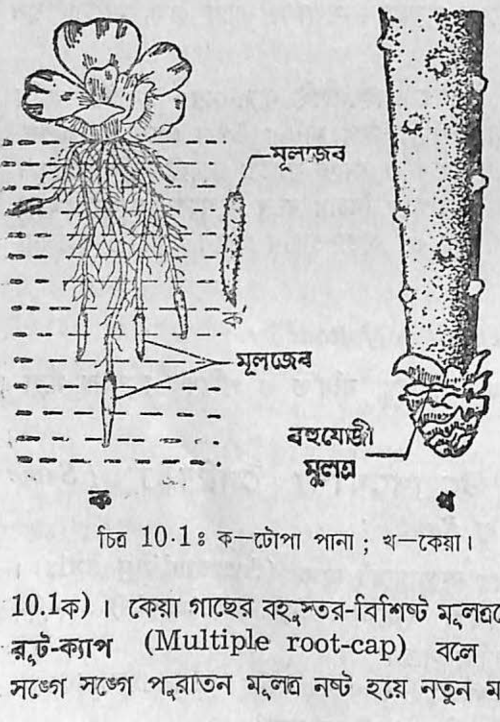
(7) মূলে অগ্রমুকুল থাকে না।

(8) মূলে সাধারণত পাতা বা ফুল উৎপন্ন হয় না।
(9) মূলরোম সর্বদা এককোষী।
(10) মূল সাধারণত বর্ণহীন।

10.4. আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশ ও অংশগুলির কাজ
[Different parts of a typical root and their functions] :

বীজের ভ্রূণাক্ষের ভ্রূণমূল বৃদ্ধি পেয়ে যে শাখাপ্রশাখাযুক্ত মূল সৃষ্টি করে তাকে আদর্শ মূল বলা হয়।

আদর্শ মূল প্রধানত নিম্নলিখিত চারটি সুস্পষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত (চিত্র 10.2 ও 10.3) ঃ



চিত্র 10.1ঃ ক—টোপা পানা ; খ—কেয়া।

(1) মূলত্র অঞ্চল বা **রুট-ক্যাপ রিজিয়ন** (Root-cap region) ঃ মূলের অগ্রভাগে টুপির মতো যে বিশেষ অঙ্গের আবরণ থাকে, তাকে **মূলত্র** বা **মূলটুপি** (Root-cap) বলে। মূলত্র দ্বারা অধিকৃত নির্দিষ্ট স্থানটি **মূলত্র অঞ্চল।**

স্থলজ উদ্ভিদে মূলত্র থাকে, কিন্তু জলজ উদ্ভিদে তা থাকে না। সেখানে বিশেষ ধরনের যে আলগা টুপি থাকে, তাকে মূলজেব বা **রুট পকেট** (Root-pocket) বলে (চিত্র 10.1ক)। কেয়া গাছের বহুস্তর-বিশিষ্ট মূলত্রকে **বহুযোজী মূলত্র** বা **মাল্টিপল রুট-ক্যাপ** (Multiple root-cap) বলে (চিত্র 10.1খ)। মূলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন মূলত্র নষ্ট হয়ে নতুন মূলত্রের সৃষ্টি হয়।

● **কাজ** (Function) ঃ

(i) **মূলত্র মাটির মধ্যে বর্ধনশীল মূলকে ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে।**

(ii) **মূলত্রের আবরণী কোষগুলি থেকে নির্গত পিচ্ছিল রস মাটিকে নরম করে** ; ফলে মূল মাটির ভিতরে সহজে বাড়তে পারে।

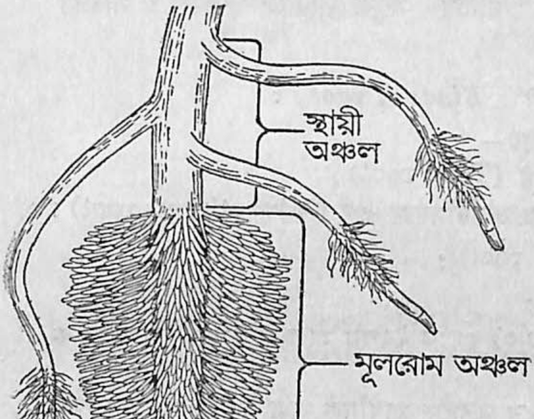
(2) **বর্ধনশীল অঞ্চল** বা **গ্রোইং রিজিয়ন** (Growing region) ঃ মূলত্র অঞ্চলের উপরের অংশে ক্রমাগত কোষ-বিভাজন ঘটে। ফলে অন্যান্য অংশ

অপেক্ষা ঐ অংশটি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। মূলের দ্রুত কোষ-বিভাজনক্ষম অঞ্চলটিকে **বর্ধনশীল অঞ্চল** বলা হয়।

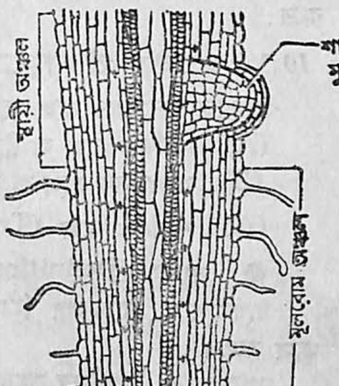
● **কাজ** (Function) ঃ দ্রুত কোষ-বিভাজন হওয়ার জন্য এই অঞ্চল মূলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটায়।

(3) **মূলরোম অঞ্চল** বা **রুট হেয়ার রিজিয়ন** (Root-hair region) ঃ বর্ধনশীল অঞ্চলের উপরে অনেকখানি অংশ জুড়ে অসংখ্য মূলরোম (Root-hair) জন্মায়। ক্ষুদ্রতম মূলরোমগুলি মূলত্রের নিকটে এবং ক্রমশঃ দীর্ঘ মূলরোমগুলি উপরের দিকে থাকে। মূলরোম দ্বারা আবৃত অংশ **মূলরোম অঞ্চল** (Root-hair region)।

মূলরোম অঞ্চলের পিছনে বা সামনে, অর্থাৎ অন্য কোন স্থান থেকে মূলরোম জন্মায় না। মূলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পুরাতন স্থানের মূলরোম শুকিয়ে যায়। পরিবর্তে ক্রমশঃ বর্ধিত নির্দিষ্ট মূলরোম অঞ্চলেই



চিত্র 10·2—মূলের বিভিন্ন অঞ্চল।



চিত্র 10.3—মূলের বিভিন্ন অঞ্চল (দীর্ঘচ্ছেদ)।

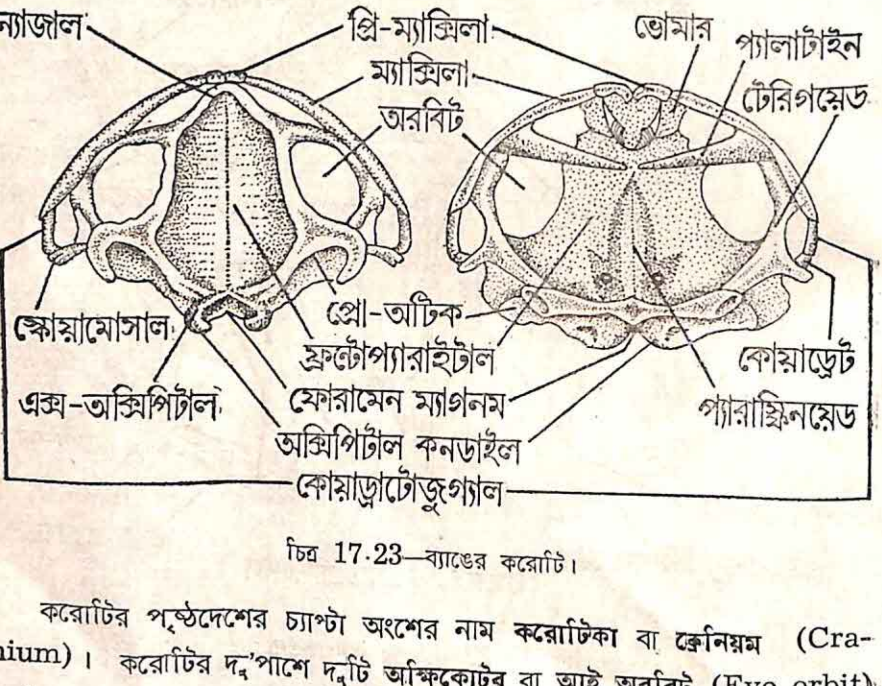
কেবল নতুন মূলরোম সৃষ্টি হয়। মূলত্র অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে মূলরোম অঞ্চলও ক্রমাগত মাটির ভিতরে অগ্রসর হয়। **মূলরোমের আয়ু কয়েকটি দিন বা কয়েক সপ্তাহ মাত্র।***

* সূর্যমুখী গোত্রীয় কোন গাছের মূলরোম তিন বৎসর পর্যন্ত কার্যকরী থাকে।

(A) **কুনো ব্যাঙের অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্র** (Axial skeletal system of Toad) ঃ

(1) **মাথার খুলি বা করোটি** (Skull) ঃ

কুনো ব্যাঙের মাথার খুলি বা করোটি কতকটা ত্রিভুজাকার (Triangular)। এটি কতকগুলি অস্থি ও তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত, ঊর্ধ্ব চোয়াল (Upper jaw)-টি করোটির সঙ্গে মিলে যায়। নিম্ন চোয়াল (Lower jaw)-টির দুই প্রান্ত করোটির সঙ্গে যুক্ত থাকে।



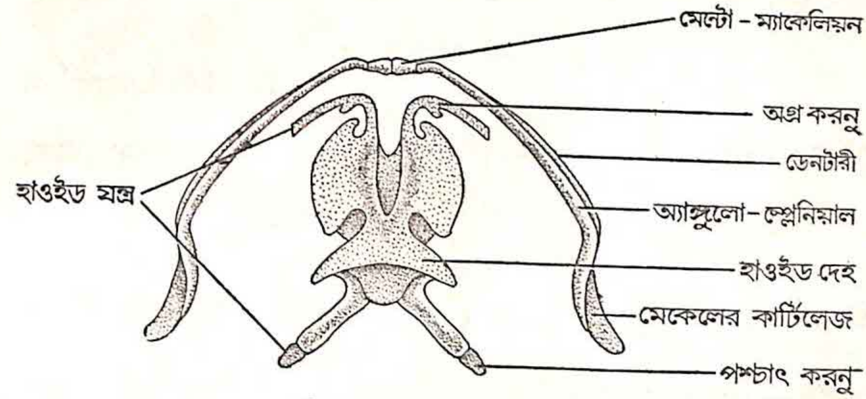
চিত্র 17.23—ব্যাঙের করোটি।

করোটির পৃষ্ঠদেশের চ্যাপ্টা অংশের নাম **করোটিকা** বা **ক্রেনিয়ম** (Cranium)। করোটির দু'পাশে দুটি **অক্ষিকোটর** বা **আই অরবিট** (Eye orbit) বর্তমান।

করোটিতে একজোড়া **অক্সিপিটাল** (Occipital), একজোড়া **ফ্রন্টোপ্যারাইটাল** (Frontoparietal), একজোড়া **নেজাল** (Nasal), একজোড়া **প্রিম্যাক্সিলা** (Pre-maxilla), **একজোড়া কোয়াড্রাটোজুগ্যাল** (Quadratojugal) নামক বিভিন্ন অস্থি বর্তমান। করোটির পিছনের দিকে অবস্থিত বড় **গহ্বরটি ফোরামেন ম্যাগনম** (Foramen magnum)।

ফোরামেন ম্যাগনমের প্রতি পাশে একটি করে উত্তল **অক্সিপিটাল কনডাইল**

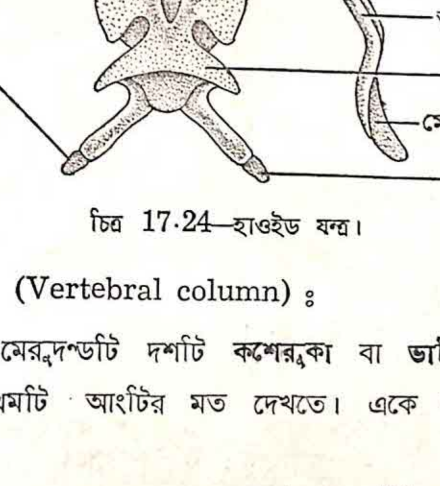
(Occipital condyle) বর্তমান। মুখগহ্বরের তলদেশে তরুণাস্থিময় **হাওইড যন্ত্র** (Hyoid apparatus) বর্তমান।



চিত্র 17·24—হাওইড যন্ত্র।

(2) **মেরুদণ্ড** (Vertebral column) ঃ

কুনো ব্যাঙের মেরুদণ্ডটি দশটি **কশেরুকা** বা **ভার্টিব্রা** (Vertebra) দ্বারা গঠিত। প্রথমটি আংটির মত দেখতে। একে **অ্যাটলাস** (Atlas) বলে।



চিত্র 17·25—অ্যাটলাস।

দ্বিতীয় থেকে অষ্টম পর্যন্ত কশেরুকাগুলিকে আদর্শ কশেরুকা (Typical vertebra) বলে।

একটি আদর্শ কশেরুকায় **সেন্ট্রাম** (Centrum), **নিউরাল আর্চ** (Neural arch), **নিউরাল স্পাইন** (Neural spine), **ট্রান্সভার্স প্রসেস** (Transverse process), **প্রি-জাইগাপোফাইসিস** (Pre-zygapophysis) ও **পোস্ট-জাইগাপোফাইসিস** (Post-zygapophysis) নামে বিশেষ কতকগুলি অংশ বর্তমান।

● কাজ (Functions) ঃ (i) মূলরোম **মাটি থেকে রস শোষণ করে।** রস প্রকৃতপক্ষে মাটির জল ও জলে দ্রব নানারূপ খাদ্যবস্তুর মিশ্রণ মাত্র।

(ii) মূলরোম **গাছকে মাটির সঙ্গে দৃঢ়-সংলগ্ন থাকতে সাহায্য করে।**

(4) **স্থায়ী অঞ্চল** বা **পারমানেণ্ট রিজিয়ন** (Permanent region) ঃ মূলরোম অঞ্চলের পিছনে বিস্তৃত অংশটি **স্থায়ী অঞ্চল** (Permanent region)। স্থায়ী অঞ্চলে মূল পরিণত হয় এবং সেখান থেকে অসংখ্য দৃঢ় শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন হয়ে উদ্ভিদের চারদিকে ছড়িয়ে যায়। শাখা-প্রশাখাগুলি উদ্ভিদকে মাটির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন রাখে। শাখা-প্রশাখার অপরিণত অংশও একইভাবে উপরি-উক্ত চারটি অঞ্চলে বিভেদিত।

● কাজ (Functions) ঃ (i) এই অঞ্চলের মাধ্যমে মূলরোম দ্বারা শোষিত রস কাণ্ডে পরিবাহিত হয়।

(ii) এই অঞ্চলটিও গাছকে মাটির সঙ্গে দৃঢ়সংলগ্ন থাকতে সাহায্য করে।

10.5. মূলের প্রকারভেদ *[Kinds of root]* :

উৎপত্তি অনুসারে মূল দু'প্রকার—

(A) **স্থানিক মূল** বা **ট্রু রুট** (True root)।

(B) **অস্থানিক মূল** বা **অ্যাডভেনটিসিয়াস রুট** (Adventitious root)।

(A) **স্থানিক মূল** (True root) ঃ

● **সংজ্ঞা** (Definition) ঃ

ভ্রূণমূল বা **র‍্যাডিকল** (radicle) **থেকে উৎপন্ন মূলকে ট্রু রুট** বা **স্থানিক মূল বলে।**

আকৃতি ও উৎপত্তির ক্রমানুসারে মূলকে **প্রাথমিক মূল** (Primary root) বা **প্রধান মূল** (Tap root), **শাখা মূল** (Secondary-root) এবং **প্রশাখা মূল** (Tertiary root) বলা হয়। অঙ্কুরিত বীজের **ভ্রূণমূল** মাটির মধ্যে খাড়াভাবে প্রবেশ করে (চিত্র 10.4ক) এবং তা থেকেই **প্রধান মূল** জন্মায় (চিত্র 10.4খ)। প্রধান মূলের শাখাকে **শাখা মূল** এবং শাখার শাখাকে **প্রশাখা মূল** বলে। **ভ্রূণমূল থেকে উৎপন্ন হয় বলে এই ধরনের মূলকে স্থানিক মূল** (Normal root) বলা হয়।

(B) **অস্থানিক মূল** (Adventitious root) ঃ

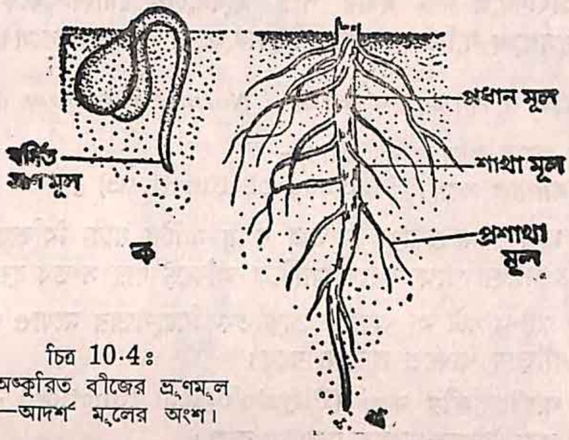
● **সংজ্ঞা** (Definition) ঃ **ভ্রূণমূল ছাড়া উদ্ভিদের যে-কোন অংশ থেকে উৎপন্ন মূলকে অস্থানিক মূল** (Adventitious root) বলে।

আখ, বাঁশ, ভুট্টা প্রভৃতি গাছের পর্ব থেকে অসংখ্য মূল উৎপন্ন হয়। এগুলি অস্থানিক মূল। বটগাছের ঝুরিও অস্থানিক মূলের উদাহরণ। **পাথরকুচি** গাছের পাতার কিনারা থেকে বা বিগোনিয়া গাছের পাতার শিরা থেকে উৎপন্ন **পত্রাশ্রয়ী মূলও** অস্থানিক।

10.6. প্রধান মূল ও শিফামূল বা গুচ্ছমূল [*Tap root and Fibrous root*] :

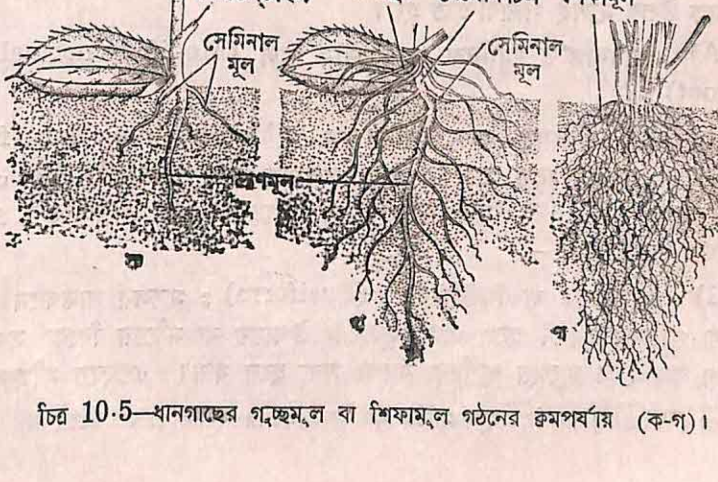
● **প্রধান মূল** (Tap root) ঃ

স্থানিক মূলের প্রধান অক্ষ স্থূল ও দৃঢ়। এটি সোজাসুজি মাটির গভীরে প্রবেশ করে। মূলের গোড়াটি মোটা কিন্তু আগাটি ক্রমশঃ সরু (চিত্র 10.4খ)। এই জাতীয় মূলকে **প্রধান মূল** বলে। **পুঁই, পালং, আম, বট, নিম** প্রভৃতি গাছের মূল প্রধান মূল। দ্বিবীজপত্রী গাছেই প্রধানত, এই জাতীয় মূল দেখা যায়।



চিত্র 10·4 ঃ
ক—অঙ্কুরিত বীজের ভ্রূণমূল
খ—আদর্শ মূলের অংশ।

● **প্রধান মূলের সংজ্ঞা** (Definition of Tap root) ঃ **মাটির গভীরে খাড়াভাবে বর্ধিত স্থানিক মূলের প্রধান অক্ষকে প্রধান মূল বলে।**



চিত্র 10·5—ধানগাছের গুচ্ছমূল বা শিফামূল গঠনের ক্রমপর্যায় (ক-গ)।

অ্যাসিড খাদ্যে মিশে পাকস্থলীতে আম্লিক মাধ্যম সৃষ্টি করে। সেই আম্লিক মাধ্যমে প্রোটিন **ভঙ্গক এনজাইম পেপসিন** খাদ্যের প্রোটিনকে ভেঙে **প্রোটিওজ, পেপটোন ও পলিপেপটাইড**-এ পরিণত করে। এইভাবে পাকস্থলীতে অর্ধপাচিত খাদ্য মণ্ডের আকার ধারণ করে। একে **খাদ্যমণ্ড** বা **ফুড কাইম** (Food chyme) বলে। খাদ্যমণ্ড পাকস্থলী থেকে প্রণালিকা ছিদ্রপথে **ডিওডেনমে** আসে। ডিওডেনমে **যকৃৎ-অগ্ন্যাশয়নালী** মাধ্যমে পিত্ত ও অগ্ন্যাশয় রস এসে পৌঁছায়। **পিত্তে কোন এনজাইম থাকে না।** তবে অগ্ন্যাশয় রসে প্রোটিন-ভঙ্গক বা প্রোটিওলাইটিক এনজাইম **ট্রিপসিন** (Trypsin), শ্বেতসারভঙ্গক বা অ্যামাইলোইটিক এনজাইম **অ্যামাইলেজ** (Amylase) এবং ফ্যাট ভঙ্গক বা লাইপোলাইটিক এনজাইম **লাইপেজ** (Lipase) থাকে। এদিকে গ্রহণী নিঃসৃত রসে এবং অগ্ন্যাশয় ও পিত্তরসে **সোডিয়াম বাইকার্বোনেট** (Sodium bicarbonate) জাতীয় ক্ষারীয় পদার্থ থাকায় সেটি লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে প্রশমিত করে।

ট্রিপসিন প্রোটিনের পেপটোন ও প্রোটিওজকে ভেঙে **অ্যামাইনো অ্যাসিড** (Amino acid), **অ্যামাইলেজ** (Amylase) কার্বোহাইড্রেটকে ভেঙে **মলটোজে** (Maltose) এবং **লাইপেজ** (Lipase) ফ্যাট জাতীয় খাদ্যকে ভেঙে **ফ্যাটি অ্যাসিড** (Fatty acid) ও **গ্লিসারল** (Glycerol)-এ পরিণত করে।

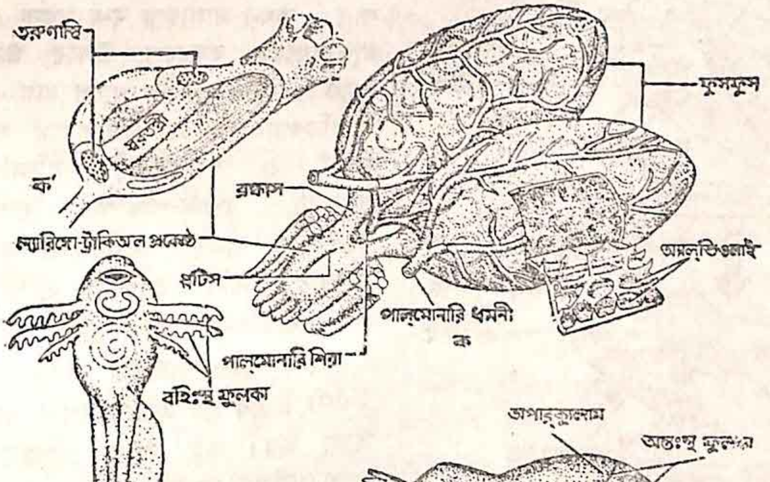
ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তর্গত নিঃসৃত প্রোটিনভঙ্গক **ইরেপসিন** (Erepsin) এবং শর্করাভঙ্গক মলটেজ (Maltase) যথাক্রমে খাদ্যের অর্ধপাচ্য অবশিষ্ট প্রোটিনকে ভেঙে অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং মলটোজকে ভেঙে **গ্লুকোজ** (Glucose)-এ পরিণত করে।

ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তর্গাত্রে অবস্থিত অসংখ্য রক্তজালক সমৃদ্ধ ভিলাই ব্যাপন ক্রিয়ায় অ্যামাইনো অ্যাসিড ও গ্লুকোজ শোষণ করে। **ল্যাকটিয়াল (Lacteal)** দ্বারা ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল শোষিত হয়। প্রথমটি সরাসরি রক্তস্রোতে এবং দ্বিতীয়টি লসিকাতন্ত্র মাধ্যমে কলাকোষে পৌঁছে দেহকে পুষ্ট করে। অপাচ্য খাদ্য মলাশয়ে জমা হয়। বৃহদন্ত্রে কিছুটা জলীয় পদার্থ শোষিত হয়। পরে অপাচ্য অংশ মলরূপে অবসারণী ছিদ্রপথে দেহমুক্ত হয়।

17.3. কুনো ব্যাঙের শ্বাসতন্ত্র *[Respiratory system of toad]* :

ফুসফুস (Lung), **দেহত্বক** (Skin), **মুখবিবর** এবং **গলবিলের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী** (Mucous membrane) প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গ দ্বারা কুনো ব্যাঙের শ্বসন সম্পন্ন হয়। তাছাড়া **ব্যাঙাচি অবস্থায় ব্যাঙ মাছের মতো ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।** শ্বাসকার্যের সময় দেহে অক্সিজেন গৃহীত হয় ও কার্বন ডাই-অক্সাইড দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হয়।

(A) **ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য** (Pulmonary respiration) : হৃৎপিণ্ডের দুদিকে বিস্তৃত দুটি ফুসফুস শ্বাসকার্যের প্রধান যন্ত্র। **ফুসফুস গোলাপী বর্ণের স্থিতিস্থাপক থলি বিশেষ।** প্রত্যেকটি **ফুসফুস** ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। এই প্রকোষ্ঠগুলিকে **বায়ুথলি বা অ্যালভিওলাই** (Alveoli) বলে। **পালমোনারি ধমনী** (Pulmonary artery) ও **পাল-**



চিত্র 17.4—পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ ও ব্যাঙাচির শ্বাস-অঙ্গ : ক—ফুসফুস ও আনুষঙ্গিক অঙ্গ ; ক'—ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াল প্রকোষ্ঠ বা স্বরনালী ও শ্বাসনালীর সম্মিলিত প্রকোষ্ঠ (কর্তিত); খ—ব্যাঙাচির বহিঃস্থ ফুলকা (অঙ্কদৃশ্য) ; গ—ব্যাঙাচির অন্তঃস্থ ফুলকা (কর্তিত, অঙ্কদৃশ্য)।

মোনারি শিরার (Pulmonary vein) অসংখ্য শাখা বায়ুথলিকে ঘিরে রাখে। ফুসফুস ছাড়া **বহিঃস্থ নাসারন্ধ্র** (External nare), **অন্তঃস্থ নাসারন্ধ্র** (Internal nare), **ব্রঙ্কস বা ক্লোম-শাখাদ্বয়** (Bronchi), **ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াল প্রকোষ্ঠ** (Laryngo-tracheal chamber), **স্বরনালী ও শ্বাসনালীর সম্মিলিত প্রকোষ্ঠ, ভয়েস বক্স** প্রভৃতি শ্বাসকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

● **কুনো ব্যাঙের শ্বাসকার্য পদ্ধতি** (Mechanism of Respiration of Toad) : **অ্যাসপিরেশান** (Aspiration), **ইনস্পিরেশান** (Inspiration) ও **এক্সপিরেশান** (Expiration)—এই তিনটি পর্যায়ে ফুসফুসীয় শ্বাসকার্য সম্পন্ন হয়।

শিফামূল বা গুচ্ছমূল (Fibrous root) ঃ **ধান, পেঁয়াজ, ভুট্টা, ঘাস** প্রভৃতি একবীজপত্রী পরিণত উদ্ভিদে সাধারণতঃ স্থায়ী প্রধান মূল থাকে না। এদের ভ্রূণমূল ও তৎসংলগ্ন সেমিনাল মূল ক্ষণস্থায়ী। প্রাথমিক মূল স্বাভাবিকভাবে মাটিতে প্রবেশ করলেও অতি শীঘ্র সেটি নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই গাছকে মাটিতে আটকে রাখতে ও মাটির রস শোষণ করার জন্য ভ্রূণ মূলের নিম্নাংশ থেকে সরু সুতোর মতো মূল উৎপন্ন হয়। এই মূলগুলিই **গুচ্ছমূল** বা **শিফামূল*** (চিত্র 10.5)।

● **শিফামূল বা গুচ্ছমূলের সংজ্ঞা** (Definition of fibrous root) ঃ **ক্ষণস্থায়ী প্রধানমূল নষ্ট হবার পরে ভ্রূণমূলের গোড়া থেকে সরু সুতোর মতো যে মূলগুচ্ছ সৃষ্টি হয় তাকে শিফামূল বা গুচ্ছমূল বলে।**

10.7. মূলের সাধারণ কাজ *[Normal functions of root] :*

মূলের প্রধান কাজ দুটি, যথা ঃ—

(1) **যান্ত্রিক কাজ** (Mechanical functions) ঃ

(i) মূল শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে মাটির মধ্যে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যায়। এতে গাছের পক্ষে সহজে মাটিকে আঁকড়ে ধরা সম্ভব হয়।

(ii) ঝড়-ঝাপটা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিরূপতার মধ্যেও মূল উদ্ভিদকে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে।

(2) **শারীরবৃত্তীয় কাজ** (Physiological function) ঃ মাটি থেকে রস শোষণ করা উদ্ভিদ-মূলের অন্যতম কাজ।

10.8. পরিবর্তিত মূল *[Modified root] :*

সাধারণ কাজ ছাড়াও উদ্ভিদমূল প্রয়োজনে বিশেষ কাজ করে। সেজন্য মূলের নানারূপ সময়োপযোগী আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে। স্থানিক ও অস্থানিক উভয় মূলই পরিবর্তিত হয়।

(A) **পরিবর্তিত স্থানিক** বা **প্রধান মূল** (Modified normal or tap root) ঃ

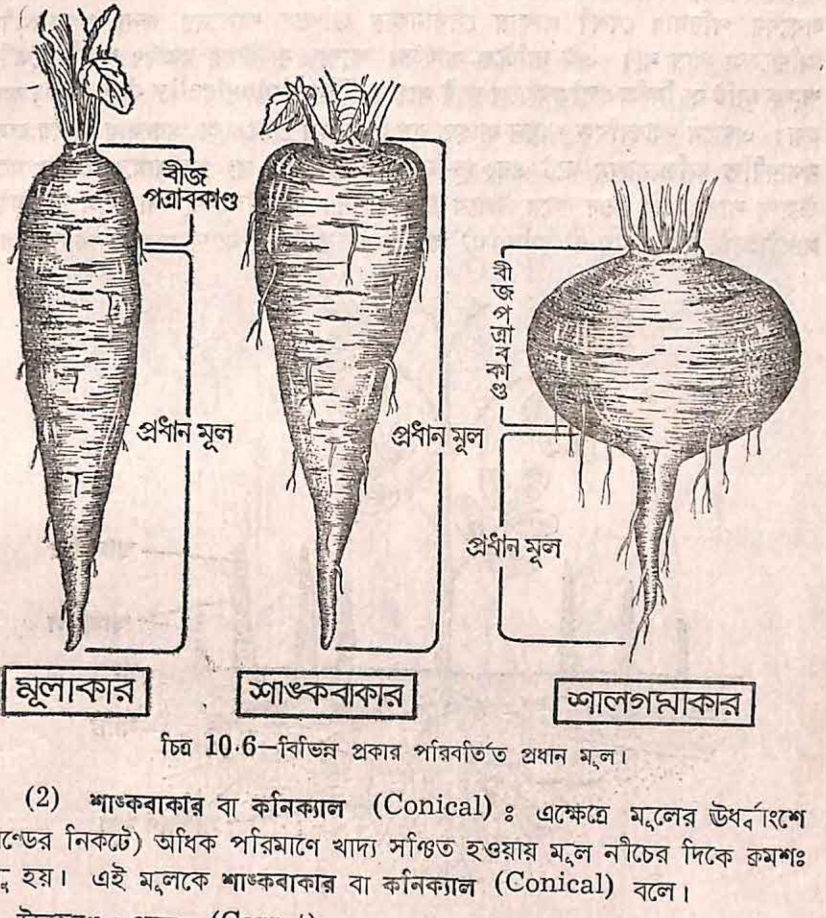
(ক) **খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য পরিবর্তন** (Modification for food storage) ঃ **স্থানিক মূল প্রধানত খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য পরিবর্তিত হয়।** এদের **ভাণ্ডার মূল** (Storage root) বলে। খাদ্যসঞ্চয়ের জন্য পরিবর্তিত প্রধান **মূল তিন প্রকার**, যথা—

(1) **মূলাকার বা ফিউজিফর্ম** (Fusiform) ঃ মূলের মাঝখানে খাদ্য সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশী হলে এবং তুলনায় উপরের বা নীচের দিকে সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হলে মূলের দু'দিক ক্রমশঃ সরু হয়ে যায়। এক্ষেত্রে **বীজপত্রাব-**

* গম (Wheat)-এর শিফামূল মাটির পাঁচ ফুট গভীর পর্যন্ত প্রবেশ করে।

কাণ্ড* বা হাইপোকোটিল (Hypocotyl) অংশও প্রধান ম‍ূলের মতো খাদ্য সঞ্চয়ে অংশ গ্রহণ করে। এর‍ূপ পরিবর্তিত ম‍ূলকে **ম‍ূলাকার** বা **ফিউজিফর্ম** (Fusiform) বলে।

উদাহরণ ঃ ম‍ূলা (Radish)।



চিত্র 10·6—বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তিত প্রধান ম‍ূল।

(2) **শাঙ্কবাকার** বা **কনিক্যাল** (Conical) ঃ এক্ষেত্রে ম‍ূলের ঊর্ধ্বাংশে (কাণ্ডের নিকটে) অধিক পরিমাণে খাদ্য সঞ্চিত হওয়ায় ম‍ূল নীচের দিকে ক্রমশঃ সর‍ু হয়। এই ম‍ূলকে **শাঙ্কবাকার** বা **কনিক্যাল** (Conical) বলে।

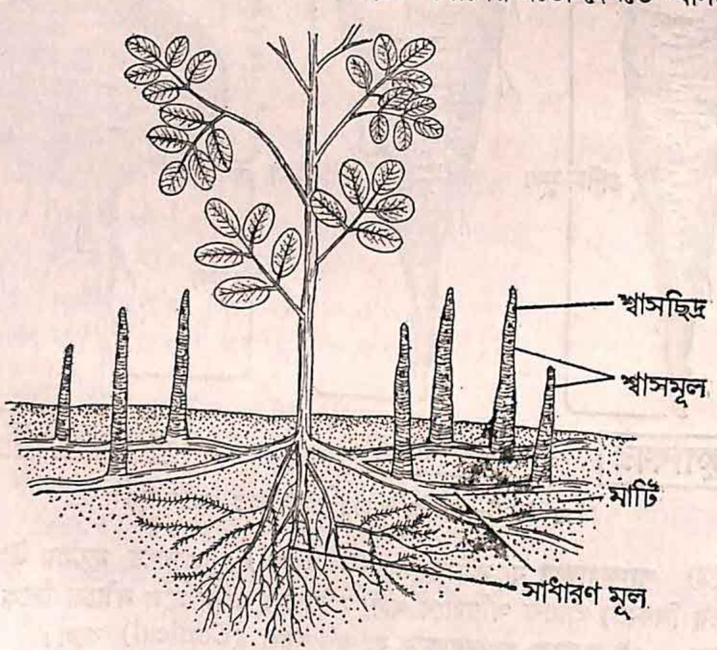
উদাহরণ ঃ গাজর (Carrot)।

(3) **শালগমাকার** বা **নেপিফর্ম** (Napiform) ঃ এই জাতীয় পরিবর্তিত ভাণ্ডার ম‍ূলে খাদ্যের অসম বণ্টনের জন্য বীজপত্রাবকাণ্ড ও আংশিকভাবে প্রধান ম‍ূল সর্বাপেক্ষা স্ফীত হয়। উপর ও নীচের দিকে সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হওয়ায় অঙ্গটি হঠাৎ সর‍ু হয়ে শেষ হয় এবং ম‍ূলটিকে মোটাম‍ুটি গোলাকার দেখায়। এই ধরনের ম‍ূল **শালগমাকার** বা **নেপিফর্ম** (Napiform)। এই জাতীয় পরিবর্তিত ম‍ূলের গোলাকার অংশের চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ বীজপত্রাবকাণ্ড।

* ভ্র‍ূণাক্ষের বীজপত্র-সংলগ্ন নিম্নাংশকে বীজপত্রাবকাণ্ড বলে।

উদাহরণ ঃ শালগম (Turnip), **বীট** (Beet)।

(খ) **শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য পরিবর্তন** (Modification for physiological purpose) ঃ সুন্দরবন অঞ্চলের লবণাক্ত জলাভূমিতে কতকগুলি বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ জন্মায়। ঐ অঞ্চলের মাটি কর্দমাক্ত ও তাতে লবণের পরিমাণ বেশী থাকায় সেখানকার উদ্ভিদ শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পায় না। এই মাটিকে কার্যতঃ শুষ্ক বা ঊষর অর্থাৎ **শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মাটি বা ফিজিওলজিক্যাল ড্রাই সয়েল** (Physiologically dry soil) বলা হয়। এখানে স্বাভাবিক শ্বসন ব্যাহত হয়। এহেন প্রতিকূল অবস্থায় বাঁচার জন্য যথারীতি অভিযোজন ঘটে এবং ভূ-নিম্নস্থ শাখামূল বা প্রশাখামূল থেকে বহু উল্লম্ব শাখা মাটি ভেদ ক'রে উপরে উঠে আসে। এগুলিকেই **শ্বাসমূল** বা **নিউম্যাটোফোর** (Pneumatophore) বলা হয়। গোঁজের মতো দেখতে শ্বাসমূলের



চিত্র 10.7—সুন্দরী গাছের শ্বাসমূল।

আগায় বহু **শ্বাসছিদ্র** বা **নিউম্যাথোড** (Pneumathode) থাকে। শ্বাসছিদ্রের ভিতর দিয়ে অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং সাবলীলভাবে প্রয়োজনীয় শ্বসন-পদ্ধতি চলতে থাকে।

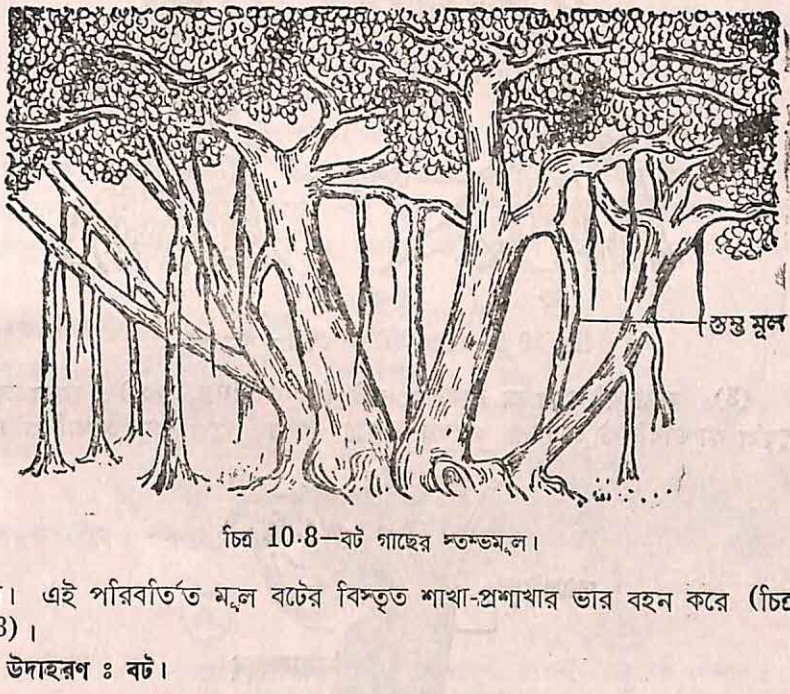
উদাহরণ ঃ সুন্দরী, গরান, গেও ইত্যাদি (চিত্র 10.7)।

(B) **পরিবর্তিত অস্থানিক মূল** (Modified adventitious root) ঃ স্থানিক মূলের মতো অস্থানিক মূলও পরিবর্তিত হয়। **খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য**

পরিবর্তন ছাড়াও নানাবিধ যান্ত্রিক কাজের জন্য অস্থানিক মূল বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়।

1. **যান্ত্রিক কাজের জন্য পরিবর্তন** (Modification for mechanical purpose) ঃ

(1) **স্তম্ভমূল** বা **প্রপ রুট** (Prop root) ঃ কোন কোন উদ্ভিদের শাখা থেকে খাড়াভাবে কতকগুলি অস্থানিক মূল ঝুলতে থাকে। ঐ মূলগুলি নীচে নেমে মাটি স্পর্শ করে এবং ক্রমশঃ স্থূল হয়ে স্তম্ভের আকার ধারণ করে। স্তম্ভের মতো দেখতে এই বিশেষ মূলকে **স্তম্ভমূল** বা **প্রপ রুট** (Prop root)



চিত্র 10.8—বট গাছের স্তম্ভমূল।

বলে। এই পরিবর্তিত মূল বটের বিস্তৃত শাখা-প্রশাখার ভার বহন করে (চিত্র 10.8)।

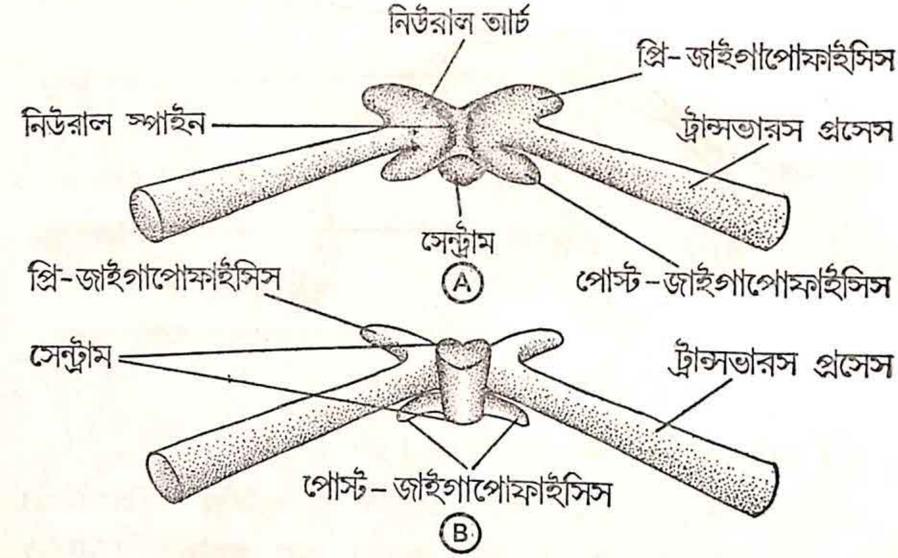
উদাহরণ ঃ বট।

● **সংজ্ঞা (Definition) ঃ কাণ্ডের শাখা-প্রশাখা থেকে নির্গত যে অস্থানিক মূল খাড়াভাবে নেমে এসে মাটিতে প্রবেশ করার পর ক্রমশঃ স্থূল হ'য়ে স্তম্ভাকার লাভ করে তাকে স্তম্ভমূল বলে।**

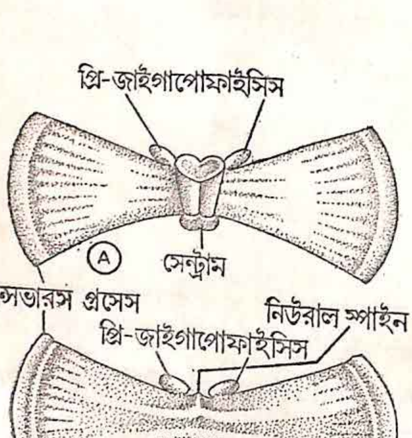
(2) **ঠেশমূল** বা **স্টিল্ট রুট** (Stilt root) ঃ অধিক শাখা-প্রশাখাযুক্ত দুর্বল কাণ্ডের যে সব উদ্ভিদ সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে অথবা নালা, ডোবা ইত্যাদির পাশে জন্মায় তাদের কাণ্ডের গোড়ার দিকের পর্ব থেকে বহু অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। অস্থানিক মূলগুলি গাছকে খাড়াভাবে দাঁড় করিয়ে রাখে। তির্যকভাবে বর্ধিত এই মূলগুলিকে **ঠেশমূল** বা **স্টিল্ট রুট** (Stilt root) (চিত্র 10.9ক ও খ) বলে।

উদাহরণ ঃ কেয়া, আখ, ভুট্টা ইত্যাদি।

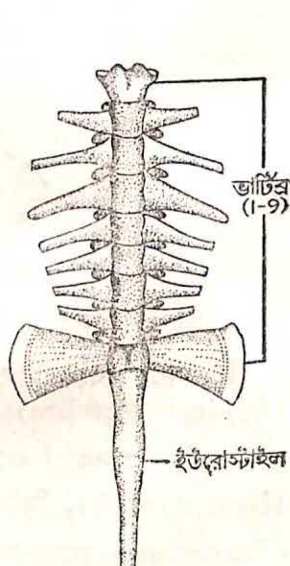
নবম কশেরুকা (Ninth vertebra) বা **স্যাক্রাল ভার্টিব্রা** (Sacral vertebra) কশেরুকার মধ্যে সবচেয়ে বড়। এর ট্রান্সভার্স প্রসেস চওড়া হয়ে পাখার মত বিস্তৃত (চিত্র 17.27, 17.28 ও 17.29)।



চিত্র 17·26—ব্যাঙের একটি আদর্শ কশেরুকা :
A—পৃষ্ঠদৃশ্য ; B—অংকদৃশ্য।

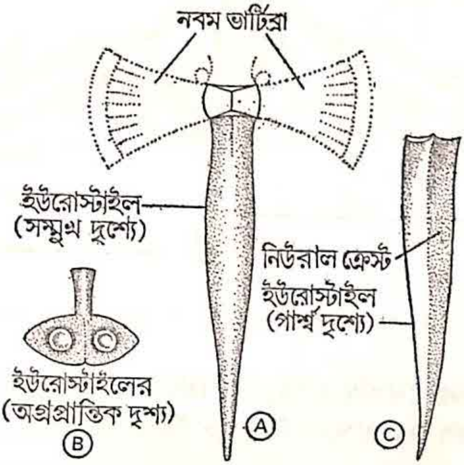


চিত্র 17·27—ব্যাঙের নবম কশেরুকা :
A—পৃষ্ঠদৃশ্য ; B—অংকদৃশ্য।



চিত্র 17·28—ইউরোস্টাইল এবং তৎসংলগ্ন কশেরুকা (ভার্টিব্রা) সমূহ।

দশম কশেরুকা (Tenth vertebra) প্রকৃতপক্ষে একটিমাত্র কশেরুকা নয়। এখানে অনেকগুলো কশেরুকা মিলিত হয়ে একটি কশেরুকার আকৃতি নেয়। এটিকে লম্বা দণ্ডের মতো দেখায়। এটি নবম কশেরুকার পিছন থেকে দেহের শেষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই কশেরুকাটিকে **ইউরোস্টাইল** (Urostyle) বলে (চিত্র 17.28 ও 17.29)।



চিত্র 17·29—ব্যাঙের ইউরোস্টাইল ঃ
A-C—বিভিন্ন দৃশ্যে।

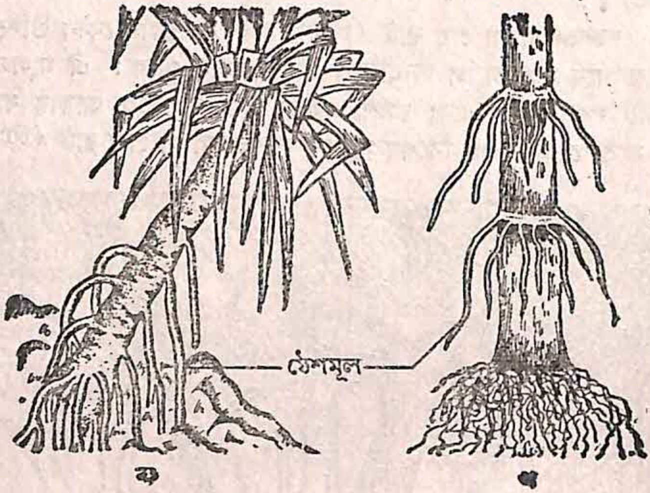
ইডরোস্টাইলকে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন রকম দেখায়। ইউরোস্টাইলের পৃষ্ঠদেশে মাঝ বরাবর একটি **নিউরাল ক্রেস্ট** (Neural crest), অর্থাৎ বিশেষ ধরনের খাঁজ বর্তমান।

(B) উপাঙ্গিক কঙ্কালতন্ত্র (Appendicular skeletal system) ঃ কুনো ব্যাঙের উপাঙ্গিক কঙ্কালতন্ত্রটি **উরশ্চক্র** বা **পেকটোরাল** গার্ডল (Pectoral girdle), **অগ্রপদের অস্থি** (Bones of forelimb) এবং **শ্রোণীচক্র** বা **পেলভিক গার্ডল** (Pelvic girdle) ও **পশ্চাৎপদের অস্থি** (Bones of hind-limb) দ্বারা গঠিত।

(1) উরশ্চক্র বা **পেকটোরাল গার্ডল** (Pectoral girdle) ঃ

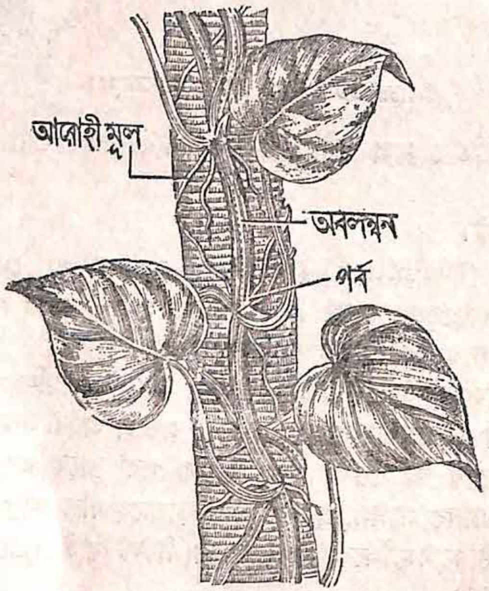
উরশ্চক্র কুনো ব্যাঙের বক্ষদেশে অবস্থিত সরু অস্থি বিশেষ। এটি দক্ষিণ ও বাম—এই দুটি সমান অংশে বিভক্ত। প্রতিটি অর্ধাংশ **স্ক্যাপুলা** (Scapula), **সুপ্রা-স্ক্যাপুলা** (Supra scapula), **কোরাকয়েড** (Coracoid), **এপিকোরাকয়েড** (Epicoracoid), **প্রিকোরাকয়েড** (Precoracoid), **ক্ল্যাভিকল** (Clavicle), **গ্লিনয়েড ক্যাভিটি** (Glenoid cavity) প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। উভয় অংশের মধ্যভাগে অর্থাৎ সংযোগস্থলে একটি

● সংজ্ঞা (Definition) : অধিক শাখা-প্রশাখাযুক্ত দুর্বল কান্ডের উদ্ভিদের কান্ডের গোড়ার দিকের পর্ব থেকে তির্যকভাবে বর্ধিত যান্ত্রিক বলদায়ী অস্থানিক মূলগুলিকে ঠেশমূল বলে।



চিত্র 10·9—ঠেশমূল : ক—কেয়া ; খ—ভুট্টা।

(3) **আরোহী মূল বা ক্লাইম্বিং রুট (Climbing root)** : কোন কোন দুর্বল কান্ডবিশিষ্ট লতানো গাছের ক্ষেত্রে কান্ড থেকে বহু অস্থানিক মূল



চিত্র 10·10—গজপিপুলের আরোহী মূল।

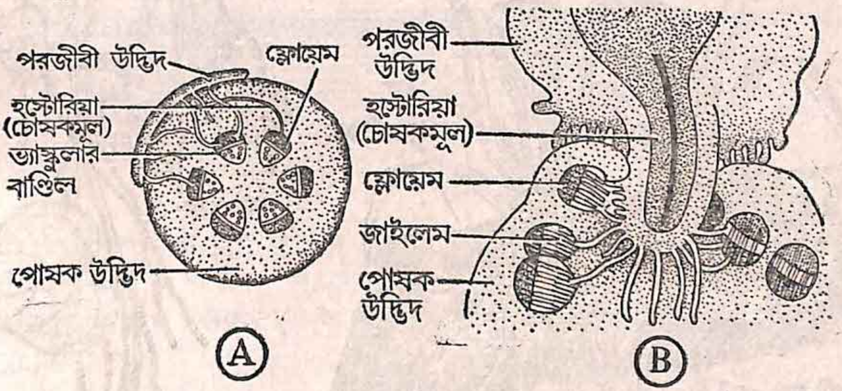
নির্গত হয়। এই মূলগুলি দুর্বল কাণ্ডের উদ্ভিদকে কোন অবলম্বনকে জড়িয়ে উপরে উঠতে সাহায্য করে। আরোহণে সাহায্যকারী এই মূলগুলিকে **আরোহী মূল** বা **ক্লাইম্বিং রুট** (Climbing root) (চিত্র 10.10) বলে।

উদাহরণ ঃ গজপিপুল, পান ইত্যাদি।

● **সংজ্ঞা** (Definition) **ঃ দুর্বল কাণ্ডের উদ্ভিদের পর্ব থেকে উদ্গত যে সব অস্থানিক মূল অবলম্বনকে জড়িয়ে ধরে সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদকে আরোহণে সাহায্য করে তাদের আরোহী মূল বলে।**

2. **শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য পরিবর্তন** (Modification for physiological purpose) ঃ যান্ত্রিক কাজ ছাড়াও **শারীরবৃত্তীয় কাজের** জন্য মূল পরিবর্তিত হয়।

(1) **চোষকমূল** বা **প্যারাসাইটিক রুট** (Parasitic root) ঃ দেহে ক্লোরোফিল না থাকায় খাদ্য উৎপাদনে অক্ষম কিছু উদ্ভিদ জীবন্ত অন্য উদ্ভিদের (পোষকের) উপরে পরজীবী হিসাবে বাস করে। এরা নিজ দেহ থেকে বিশেষ এক প্রকার মূল উৎপন্ন করে এবং আক্রান্ত গাছের খাদ্য-পরিবহন নল বা **ভ্যাস্কুলার বান্ডিলের** (Vascular bundle) মধ্যে (অর্থাৎ, ফ্লোয়েমের মধ্যে)



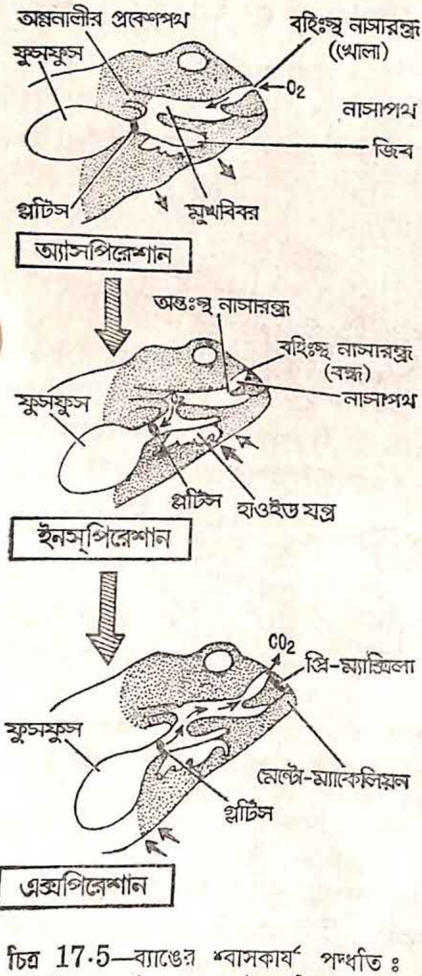
চিত্র 10·11 ঃ A—পোষকের প্রস্থচ্ছেদ ; B—স্বর্ণলতার চোষকমূল (পোষক উদ্ভিদ ও পরজীবী উদ্ভিদের প্রস্থচ্ছেদ)।

সেই মূলগুলিকে প্রবেশ করায়। এইভাবে এরা পোষকের অর্থাৎ আশ্রয়দাতার দেহ থেকে প্রস্তুত খাদ্য টেনে নেয়। যে মূলগুলি এইভাবে তৈরী খাদ্য শোষণের কাজে উদ্ভিদকে সাহায্য করে, সেগুলিকে **চোষকমূল** বা **প্যারাসাইটিক রুট** বা **হস্টোরিয়া** (Sucking root or Parasitic root or Haustoria) বলে (চিত্র 10.11A ও 10.11B)।

উদাহরণ ঃ স্বর্ণলতা, আলোকলতা।

● **সংজ্ঞা** (Definition) **ঃ পরজীবী উদ্ভিদ যে বিশেষ মূলের সাহায্যে পোষকের দেহ থেকে প্রস্তুত খাদ্য টেনে নিয়ে পুষ্ট হয় তাকে চোষকমূল বলে।**

(1) **অ্যাসপিরেশান** (Aspiration) : অ্যাসপিরেশানের সময় **মুখবিবরের তলদেশ ঝুলে** পড়ে। এতে **মুখবিবরের আয়তন বৃদ্ধি পায়** এবং নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়ে বাতাস মুখবিবরে প্রবেশ করে। এই সময় গ্লটিসটি বন্ধ থাকে।



চিত্র 17·5—ব্যাঙের শ্বাসকার্য পদ্ধতি : ক্রমপর্যায়ে অ্যাসপিরেশান, ইনস্পিরেশান ও এক্সপিরেশান।

(2) **ইনস্পিরেশান** (Inspiration) : পরবর্তী পর্যায় ইনস্পিরেশান। তখন **নাসারন্ধ্র বন্ধ থাকে** এবং **মুখবিবরের তলদেশ উপরে উঠতে** থাকে। ফলে **গ্লটিস খুলে যায়** এবং মুখবিবরের বাতাস পর্যায়ক্রমে স্বরনালী ও শ্বাসনালীর সম্মিলিত প্রকোষ্ঠ, ক্লোম-শাখাম্বয় মাধ্যমে ফুসফুসে যায়। ফুসফুসের বায়ুথলিতে যথারীতি অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর আদান-প্রদান ঘটে।

(3) **এক্সপিরেশান** (Expiration) : এর পর এক্সপিরেশান পর্যায় সুরু হয়। এই সময় দেহকান্ডের পেশীগুলির সংকোচনের ফলে ফুসফুসের উপর চাপ পড়ে এবং **ফুসফুস ক্রমশঃ সংকুচিত হতে থাকে।** এতে ফুসফুসের কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত বাতাস উন্মুক্ত গ্লটিসের ভিতর দিয়ে মুখবিবরে অ্যাসপিরেশান পর্যায়ে গৃহীত বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। এইভাবে **মুখবিবরে বাতাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং সেখানে চাপ সৃষ্টি করে।** বাতাসের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে **মিশ্র বাতাসের কিছুটা নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে বাইরে চলে যায়।** সঙ্গে সঙ্গে নাসারন্ধ্রে পুনরায় বাতাস প্রবেশ করতে সুরু করে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে উপরোক্ত তিন পর্যায়ের সাহায্যে ব্যাঙের শ্বাসকার্য সম্পন্ন হয়।

(B) **দেহত্বকের সাহায্যে শ্বাসকার্য** (Cutaneous Respiration) :

ব্যাঙের ভিজা চামড়ায় অসংখ্য জালক ছড়িয়ে থাকে। জালকে প্রবাহিত রক্ত সহজেই ব্যাপনক্রিয়ায় বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং বায়ুতেই কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে।

ব্যাঙ **শীতঘুম** বা **হাইবারনেশান** (Hibernation)-এ থাকার সময় প্রধানত শীতকালে এই ধরনের শ্বাসকার্য চালায়।

● শীতঘুম বা হাইবারনেশান (Hibernation) ●

কুনো ব্যাঙকে প্রায় সারা বছরই নিজ বসতির আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। বর্ষাকালে এদের উচ্ছ্বলতা বর্ষার পরিবেশকে করে তোলে মুখর ও উজ্জীবিত। ব্যাঙের বিশেষ ডাক ছাড়া বর্ষার কল্পনা অবাস্তব।

কিন্তু শীতকালে এরা মূক। তখন এদের পরিচিত ডাক একেবারেই শোনা যায় না, এমনকি ব্যাঙের কোন অস্তিত্ব আদৌ আছে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে! বস্তুত এই সন্দেহ অমূলক। শীতকালে নিজেদের অস্তিত্ব প্রচারে সোচ্চার না হ'লেও এরা মাটির নীচে গর্তে অথবা ইট-পাথরের ফাঁকে যথা-সম্ভব নিরিবিলি স্থানে চুপচাপ কাটিয়ে দেয়।

কুনো ব্যাঙ **অনুষ্ণশোণিত প্রাণী** (Poikilothermic animal)। শীত-কালে এদের দেহের উষ্ণতা পরিবেশ অনুযায়ী কমে যায়। অধিকাংশ উভচর, সরীসৃপ এবং কোন কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে। তখন এদের পক্ষে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করা সম্ভবপর হয় না। এই সময় এরা খাদ্য গ্রহণ করে না। মুখবিবরের নিম্নাংশ ওঠা-নামা করা ছাড়া এদের দেহের অন্য কোন অংশ নড়াচড়া করে না। দেহে সঞ্চিত ফ্যাট থেকে এরা তখনকার মতো বাঁচার রসদ সংগ্রহ করে। ঐ সময় জীবনযাপন উপযোগী ন্যূনতম বিপাক ক্রিয়া চলে। চামড়া ও মুখবিবরের সাহায্যে এরা প্রয়োজনীয় শ্বসন চালিয়ে নেয়। শীতের আগে এই জাতীয় প্রাণীরা প্রচুর পরিমাণে আহার ক'রে জড়বৎ পড়ে থাকে। জীবের শীতকালীন এই নিষ্ক্রিয়তাকে **শীতঘুম** বা **হাইবারনেশান** বলে। বসন্তকালে উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনযাপন শুরু হয়।

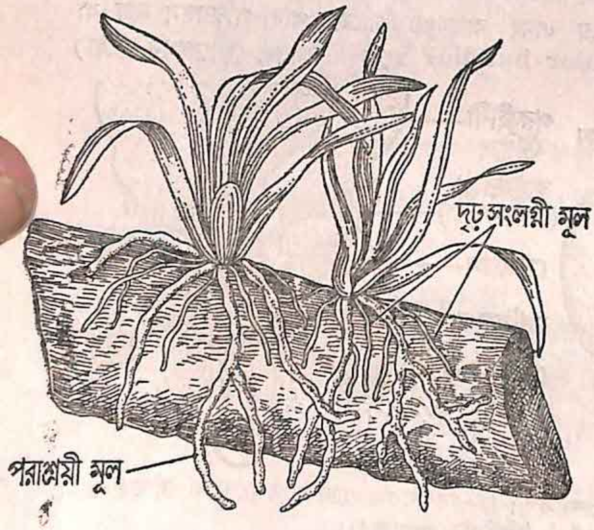
(C) ব্যাঙাচি দশায় শ্বাসকার্য (Respiration of Tadpole) :

কুনো ব্যাঙের জীবনচক্রে লার্ভা (Larva) বা ব্যাঙাচি (Tadpole) হ'ল প্রথম দশা। কুনো ব্যাঙের লার্ভা বা ব্যাঙাচি ফুলকা ও ত্বকের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। ব্যাঙাচির প্রথমাবস্থায় তিন জোড়া পালকের ন্যায় **ফুলকা** (Gill) থাকে। ফুলকাগুলি রক্তজালকসমৃদ্ধ। দেহের বাইরে থাকার জন্য ফুলকাগুলিকে **বহিঃস্থফুলকা** (External gills) বলা হয়। পরবর্তী অবস্থায় গলবিলের অন্তঃপ্রাকারে **অন্তঃস্থফুলকা** (Internall gill) গঠিত হ'লে বহিঃস্থফুলকা অবলুপ্ত হয়। ব্যাঙাচি জলে থাকে। বহিঃস্থফুলকা কুনো ব্যাঙকে ব্যাঙাচি অবস্থায় জলের অক্সিজেন গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

(2) **পরাশ্রয়ী মূল বা এপিফাইটিক রুট (Epiphytic root) ঃ** এমন অনেক উদ্ভিদ আছে যারা সরাসরি মাটিতে জন্মায় না, অন্য গাছের উপর জন্মায়। এইসব গাছের দৃঢ়সংলগ্নী মূল আশ্রয়দাতাকে জড়িয়ে ধরে (চিত্র 10.12)। অন্য মূলগুলি বাতাসের জলীয় বাষ্প শোষণ ক'রে জলের চাহিদা মেটায়। মূলের ত্বকের নীচে অবস্থিত জল শোষণকারী বিশেষ কলাকে **ভেলামেন** (Velamen) বলে। জলীয় বাষ্প শোষণকারী এই বিশেষ মূলগুলি **পরাশ্রয়ী মূল বা এপিফাইটিক রুট** (Epiphytic root) (চিত্র 10.12)।

উদাহরণ ঃ অর্কিড।

● **সংজ্ঞা** (Definition) ঃ **পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের বিশেষভাবে অভিযোজিত এবং ভেলামেনযুক্ত যে অস্থানিক মূলগুলি বাতাসের জলীয় বাষ্প শোষণ ক'রে জলের চাহিদা মেটায় তাদের পরাশ্রয়ী মূল বলে।**



চিত্র 10·12—অর্কিডের পরাশ্রয়ী মূল।



চিত্র 10·13—গুলঞ্চের আত্তীকরণ মূল।

(3) **আত্তীকরণ মূল বা অ্যাসিমিলেটরী রুট (Assimilatory root) ঃ** কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্ভিদের শাখা-প্রশাখা থেকে উৎপন্ন সুতোর মতো সবুজ অস্থানিক মূল বাতাসে ঝুলতে থাকে। বাইরের সবুজ এই আস্তরণ খাদ্য প্রস্তুতে সহায়তা করে। খাদ্য প্রস্তুতে সক্ষম এই মূলগুলিকে **আত্তীকরণ মূল বা অ্যাসিমিলেটরী রুট** (Assimilatory root) (চিত্র 10.13) বলা হয়।

উদাহরণ ঃ গুলঞ্চ।

● সংজ্ঞা (Definition) ঃ কাণ্ডের শাখা-প্রশাখা থেকে উৎপন্ন যে সব ক্লোরোফিলযুক্ত অস্থানিক মূল সূর্যালোকের উপস্থিতিতে খাদ্য প্রস্তুতে সহায়তা করে তাদের আত্তীকরণ মূল বলে।

(4) জলজ শ্বাসমূল বা অ্যাকোয়াটিক ব্রিদিং রুট (Aquatic breathing root) ঃ কোন কোন উদ্ভিদের ভাসমান কাণ্ডের পর্ব থেকে



চিত্র 10·14—কেশরার জলজ শ্বাসমূল।

কয়েকটি অস্থানিক মূল স্পঞ্জের মতো স্ফীত হয়ে উদ্ভিদটিকে জলে ভেসে থাকতে, এমনকি শ্বসনেও সাহায্য করে। এই মূলগুলিকে **জলজ শ্বাসমূল** বা **ভাসমান মূল** (Aquatic breathing root or Floating root) (চিত্র 10.14) বলে।

উদাহরণ ঃ **কেশরদাম** বা **কেশরা**।

● সংজ্ঞা (Definition) ঃ **জলজ উদ্ভিদের ভাসমান কাণ্ডের পর্ব থেকে উৎপন্ন স্পঞ্জ সদৃশ বাতাবকাশযুক্ত যে অস্থানিক মূলগুচ্ছ গাছকে ভেসে থাকতে ও শ্বসনে সাহায্য করে তাকে জলজ শ্বাসমূল বলে।**

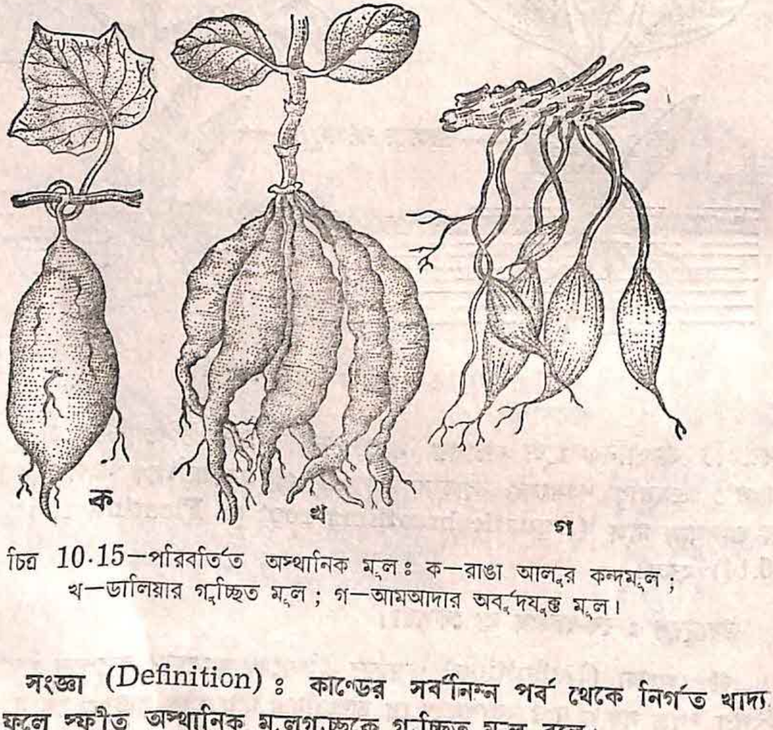
(i) **কন্দমূল** বা **টিউবারাস রুট** (Tuberous root) ঃ ব্রততী (Creeper)-র ভূসংলগ্ন লতানো কাণ্ডের পর্ব থেকে উৎপন্ন অস্থানিক মূল খাদ্য সঞ্চয় ক'রে কন্দের মতো স্ফীত হয়। স্ফীত এবং খাদ্যসঞ্চয়ী এই অস্থানিক মূলগুলিকে **কন্দমূল** বা **টিউবারাস রুট** (Tuberous root) (চিত্র 10.15ক) বলে।

উদাহরণ ঃ **রাঙা আলু**।

● **সংজ্ঞা (Definition) ঃ খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য ব্রততীর কন্দের মতো স্ফীত অস্থানিক মূলকে কন্দমূল বলে।**

(ii) **গুচ্ছিত মূল** বা **ফ্যাসিকিউলেটেড রুট** (Fasciculated root) ঃ কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ডের সর্বনিম্ন পর্ব থেকে গুচ্ছাকারে একাধিক অস্থানিক মূল নির্গত হয় এবং সেগুলি প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় ক'রে স্ফীত হয়। এইরূপ গুচ্ছাকারে সজ্জিত অস্থানিক মূলকে **গুচ্ছিত মূল** বলে।

উদাহরণ ঃ ডালিয়া, শতমূলী, অর্কিস (একপ্রকার অর্কিড জাতীয় উদ্ভিদ) ইত্যাদি।



চিত্র 10·15—পরিবর্তিত অস্থানিক মূলঃ ক—রাঙা আলুর কন্দমূল ; খ—ডালিয়ার গুচ্ছিত মূল ; গ—আমআদার অর্বুদযুক্ত মূল।

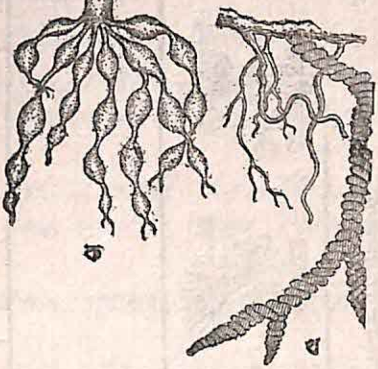
● **সংজ্ঞা (Definition) ঃ কাণ্ডের সর্বনিম্ন পর্ব থেকে নির্গত খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে স্ফীত অস্থানিক মূলগুচ্ছকে গুচ্ছিত মূল বলে।**

(iii) **অর্বুদযুক্ত মূল** বা **নডিউলোজ রুট** (Nodulose root) ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে ভূনিম্নস্থ কাণ্ডের পর্ব থেকে উৎপন্ন অস্থানিক মূলের অগ্রভাগটিই কেবল খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে স্ফীত হয় এবং অন্যান্য অংশ অপরিবর্তিত থাকে। এই রূপ অগ্রস্ফীতিযুক্ত অস্থানিক ভাণ্ডার মূলকে **অর্বুদযুক্ত মূল** বা **নডিউলোজ রুট** (Nodulose root) (চিত্র 10.15গ) বলে।

উদাহরণ ঃ আমআদা।

● **সংজ্ঞা (Definition) ঃ ভূনিম্নস্থ কাণ্ড থেকে উদ্গত অস্থানিক মূলের অগ্রস্ফীত খাদ্যসঞ্চয়ী অংশকে অর্বুদযুক্ত মূল বলে।**

(iv) **মালাকৃতি বা মনিলিফর্ম রুট (Moniliform root) ঃ** অনেক সময়ে খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে অস্থানিক ভাণ্ডার মূল নিজ দৈর্ঘ্য বরাবর পর্যায়ক্রমে



চিত্র 10·16 ঃ ক—ঘাসের মালাকৃতি মূল ;
খ—ইপিকাকের বলয়াকৃতি মূল।

স্ফীত ও সংকুচিত হ'য়ে জপের মালার মতো দেখতে হয়। এই ধরনের বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট অস্থানিক ভাণ্ডার মূলকে **মালাকৃতি** বা **মনিলিফর্ম রুট** বা **বিডেড্ রুট** (Moniliform or Beaded root) (চিত্র 10.16ক) বলে।

উদাহরণ ঃ মুথাঘাস।

● **সংজ্ঞা (Definition) ঃ খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে মালার আকৃতিবিশিষ্ট যে অস্থানিক মূল নিজ দৈর্ঘ্যবরাবর পর্যায়ক্রমে স্ফীত ও সংকুচিত হয় তাকে মালাকৃতি মূল বলে।**

(v) **বলয়াকৃতি মূল বা অ্যানিউলেটেড রুট (Annulated root) ঃ** অনেক সময় অস্থানিক ভাণ্ডার মূলের সমগ্র দৈর্ঘ্য বরাবর গোলাকার চাকতির ন্যায় স্ফীত অংশগুলিকে বলয়াকারে সজ্জিত থাকতে দেখা যায়। এই ধরনের অস্থানিক ভাণ্ডার মূলকে **বলয়াকৃতি মূল** বলা হয়।

উদাহরণ ঃ ইপিকাক।

● **সংজ্ঞা (Definition) ঃ সমগ্র দৈর্ঘ্য বরাবর গোলাকার চাকতির ন্যায় স্ফীত এবং বলয়াকারে সজ্জিত অস্থানিক ভাণ্ডার মূলকে বলয়াকৃতি মূল বলে।**

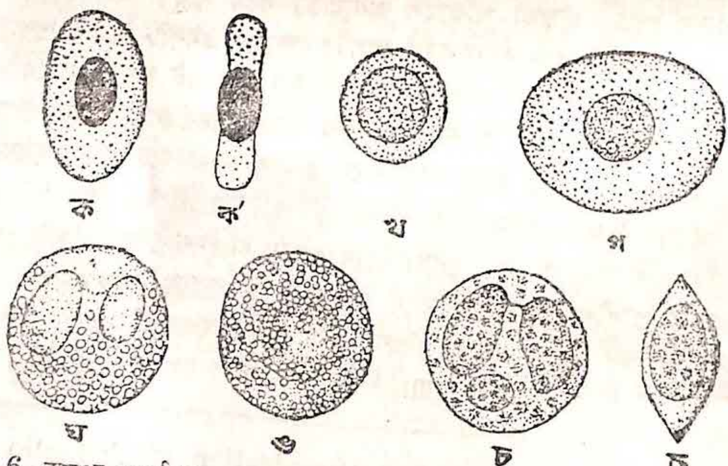
17.4. কুনো ব্যাঙের রক্ত সংবহনতন্ত্র [*Circulatory system of Toad*] :

ব্যাঙের রক্তসংবহনতন্ত্র—রক্ত, হৃৎপিণ্ড এবং ধমনী, শিরা ও জালক নামে বিভিন্ন রক্তনালী দ্বারা গঠিত।

● **রক্ত (Blood) ঃ** রক্ত একপ্রকার তরল যোগকলা (Liquid connective tissue)। হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin) নামক লৌহঘটিত প্রোটিন থাকায় অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর মতো ব্যাঙের রক্তও লাল। রক্ত রক্তবাহের মধ্যে আবদ্ধ থেকে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ ব্যাঙের ক্ষেত্রে **রুদ্ধ বা বদ্ধ রক্তসংবহন পদ্ধতি** (Closed vascular system) লক্ষ্য করা যায়। ব্যাঙের রক্তের প্রধান উপাদান দুটি—(1) রক্তকণিকা (Blood corpuscles) এবং রক্তরস (Blood plasma)।

(1) **রক্তকণিকা (Blood corpuscles) ঃ** কুনো ব্যাঙের রক্তকণিকা তিন প্রকার, যথা—

(a) **লোহিত রক্তকণিকা** (Red blood corpuscles or Erythrocytes)।



চিত্র 17·6—ব্যাঙের রক্তকণিকা ; ক—লোহিত কণিকা ; ক'—পার্শ্বদৃশ্য লোহিতকণিকা ; খ-চ—বিভিন্ন আকৃতির ও প্রকৃতির শ্বেত কণিকা ; ছ—অণুচক্রিকা।

(b) **শ্বেত রক্তকণিকা** (White blood corpuscles or Leucocytes)।

(c) **অণুচক্রিকা** (Platelets or Thrombocytes)।

(a) **লোহিত রক্তকণিকা (RBC or Erythrocytes) ঃ** ব্যাঙের লোহিত রক্তকণিকা উভোত্তল, ডিম্বাকৃতি ও নিউক্লিয়াসযুক্ত। এদের সাইটোপ্লাজমে হিমোগ্লোবিন নামক **শ্বাসরঞ্জক** (Respiratory pigment) থাকে। হিমোগ্লোবিন লৌহঘটিত প্রোটিন। লোহিত রক্তকণিকার এই হিমোগ্লোবিনই

অক্সিজেন গ্রহণ ক'রে কোষে কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং সেখান থেকে বিপাকজাত কার্বন ডাই-অক্সাইড রেচন অঙ্গে বহন করে আনে।

কুনো ব্যাঙের লোহিত কণিকার আয়তন প্রায় 15-20 মাইক্রন। কুনো ব্যাঙের এক ঘন মিলিমিটার রক্তে প্রায় 3-4 লক্ষ লোহিত কণিকা বর্তমান।

(b) **শ্বেত রক্তকণিকা** (WBC or Leucocytes) ঃ কুনো ব্যাঙের শ্বেত-রক্তকণিকাগুলি গোলাকার এবং নিউক্লিয়সযুক্ত। শ্বেত রক্তকণিকাগুলি বর্ণহীন। নিউক্লিয়সের গঠন ও সাইটোপ্লাজমে দানাময় পদার্থের প্রকৃতির বিভিন্নতা অনু-সারে শ্বেত রক্তকণিকা কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত। কুনো ব্যাঙের প্রতি ঘন মিলি-মিটার রক্তে 5-7 হাজার শ্বেত রক্তকণিকা বর্তমান।

● **কাজ** (Functions) ঃ শ্বেত রক্তকণিকা কুনো ব্যাঙের দেহে রোগ-জীবাণু প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে অথবা ক্ষণপদ সৃষ্টি দ্বারা রক্তে অণুপ্রবিষ্ট ক্ষতিকর রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে।

(c) **অণুচক্রিকা** (Platelets or Thrombocytes) ঃ কুনো ব্যাঙের অণুচক্রিকা নিউক্লিয়সযুক্ত **বেমাকৃতি** (Spindle-shaped), অর্থাৎ দু'মুখ সুচালো ক্ষুদ্রাকৃতি রক্তকোষ।

● **কাজ** (Function) ঃ অণুচক্রিকা রক্ত তঞ্চনে সহায়তা করে। সুতরাং ক্ষতস্থানে দ্রুত রক্ত তঞ্চন ঘটিয়ে রক্তপাত বন্ধ করাই অণুচক্রিকার প্রধান কাজ।

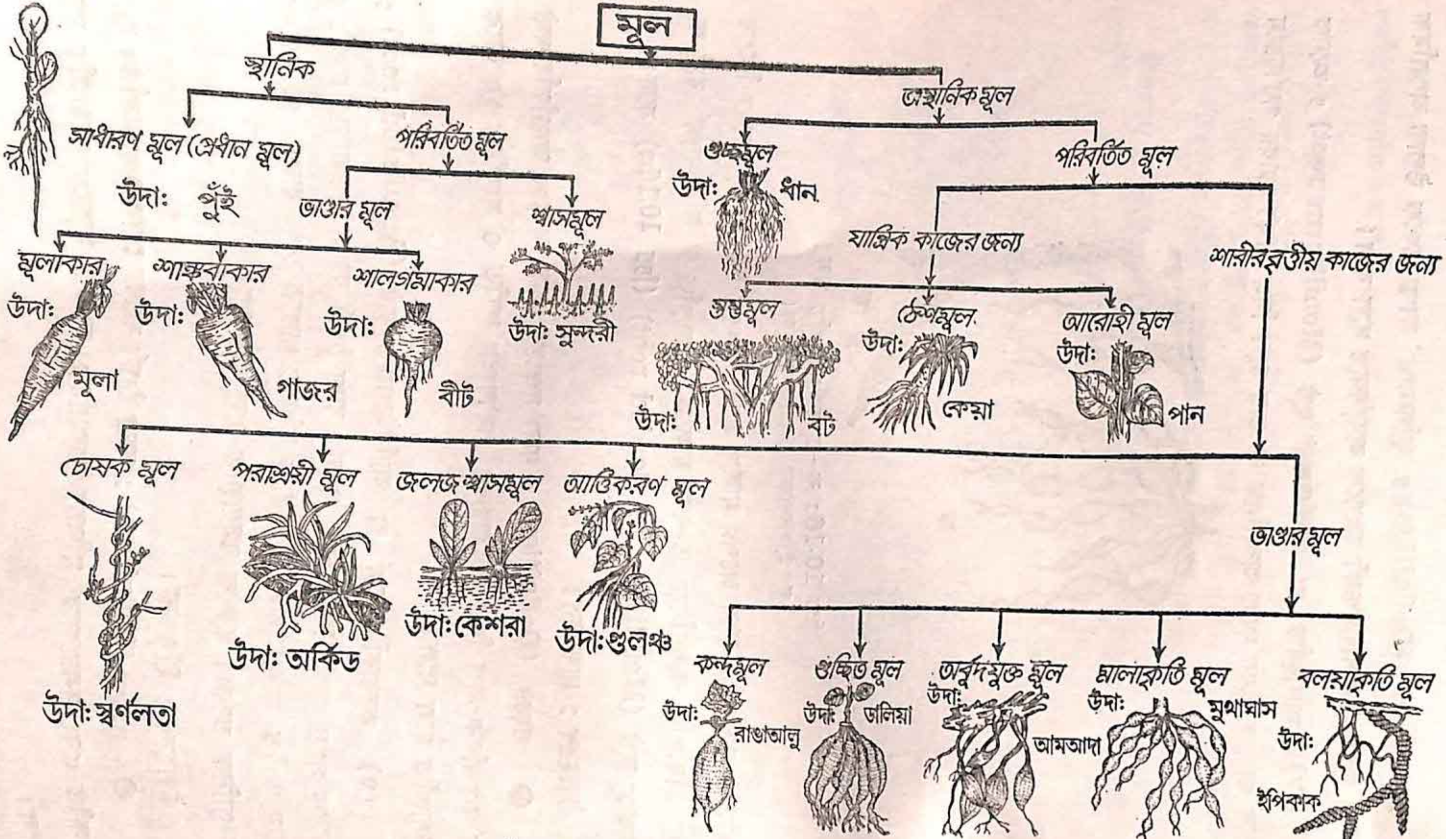
(2) **রক্তরস** (Blood plasma) ঃ রক্তের যে তরল অংশে রক্তকণিকাগুলি ভাসমান থাকে তাকে রক্তরস বলে। রক্তরসের প্রায় 92% জল, বাকি 8% জৈব ও অজৈব পদার্থে পূর্ণ থাকে।

● **কাজ** (Function) ঃ রক্তরসের মাধ্যমে বিভিন্ন খাদ্যসার, খনিজ লবণ, শর্করা, হরমোন, বর্জ্যপদার্থ, ভাইটামিন, উৎসেচক প্রভৃতি দ্রবীভূত অবস্থায় কোষে কোষে পরিবেশিত হয়। সেখানে উৎপন্ন বিপাকজাত রেচন পদার্থ—যেমন ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড প্রভৃতি দেহমুক্ত হবার জন্য রক্তরসের মাধ্যমেই রেচন অঙ্গে ফিরে আসে।

● **হৃৎপিণ্ডের গঠন** (Structure of Heart) ঃ হৃৎপিণ্ড কুনো ব্যাঙের কেন্দ্রীয় রক্তসরবরাহক যন্ত্র। বক্ষের অঙ্কীয় তলে যকৃতের উপরে ত্রিকোণাকার গাঢ় লাল বর্ণের হৃৎপিণ্ডটি অবস্থিত। **হৃৎধরাঝিল্লি** বা **পেরি-কার্ডিয়ম** (Pericardium) নামক একটি স্বচ্ছ পাতলা পর্দা দ্বারা হৃৎপিণ্ড আবৃত থাকে। এই পর্দাটি এপিকার্ডিয়ম (Epicardium), মায়োকার্ডিয়ম (Myocardium) এবং এণ্ডোকার্ডিয়ম (Endocardium) স্তরে বিভেদিত।

কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডটি **তিনটি প্রধান** ও দুটি আনুষঙ্গিক প্রকোষ্ঠ দ্বারা গঠিত। দু'টি **অলিন্দ** (Auricle) ও একটি **নিলয়** (Ventricle) প্রধান

নীচে মূলের শ্রেণীবিভাগের [illegible] ছক দেওয়া হ'ল ঃ



চিত্র 10·17—মূলের শ্রেণীবিভাগের ছক।

10.9. মূলের কাজ [*Functions of the root*] :

A. **সাধারণ কাজ** (Normal functions) ঃ

(1) মূল **উদ্ভিদকে মাটির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখে** (যান্ত্রিক কাজ)।

(2) মূল মূলরোমের সাহায্যে উদ্ভিদের জন্য **মাটি থেকে রস শোষণ করে** (শারীরবৃত্তীয় কাজ)।

(3) শোষিত রস শাখা-প্রশাখা ও প্রধান মূলের সাহায্যে **কাণ্ড ও পাতায় পরিচালিত হয়** (শারীরবৃত্তীয় কাজ)।

B. **বিশেষ কাজ** (Special functions) ঃ

● **শারীরবৃত্তীয় কাজ** (Physiological functions) ঃ

(1) স্থানিক বা অস্থানিক ভান্ডার মূলে **ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য খাদ্য সঞ্চিত থাকে।**

(2) শ্বাসমূলের সাহায্যে সুন্দরী-জাতীয় উদ্ভিদ **শ্বাসকার্য চালায়।**

(3) **চোষক মূল দ্বারা পরজীবী উদ্ভিদ পোষক-দেহ থেকে রস শোষণ করে।**

(4) পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ **পরাশ্রয়ী মূলের সাহায্যে বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করে।**

(5) **আত্তীকরণ মূলের সাহায্যে গ্লুকোজ খাদ্য তৈরী করে।**

● **যান্ত্রিক কাজ** (Mechanical functions) ঃ

(6) বট, কেয়া প্রভৃতি উদ্ভিদের মূল কাণ্ড বা শাখা-প্রশাখার ভার বহন করে।

(7) পান, গজপিপ্পল প্রভৃতি লতানো উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে অবলম্বনকে জড়িয়ে উপরে উঠে।

(8) স্পঞ্জের মতো মূলের সাহায্যে কেশরদাম জলে ভেসে থাকে।

✻ জেনে রাখা ভাল ✻

10.10. অধিমূল বা রুট বাট্রেস [*Root Buttress*] :

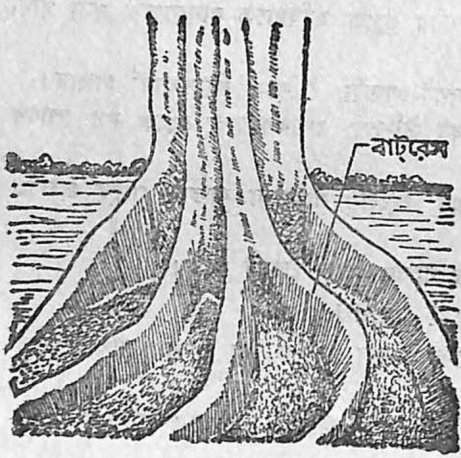
শিমুল, বয়ড়া প্রভৃতি গাছের কাণ্ডের নিম্নাংশ থেকে উদ্গত কতকগুলি মূল নৌকোর হালের মতো চ্যাপ্টা হ'য়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে (চিত্র 10.18)। **অন্তর্গঠন বিচারে এই অঙ্গগুলি** অংশত মূল ও অংশত কাণ্ড। এগুলি উদ্ভিদের দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। বিশেষ ধরনের এই মূলগুলিকে **অধিমূল** বা **রুট বাট্রেস** বলে।

10.11. মূলবিহীন উদ্ভিদ বা মূল সর্বস্ব উদ্ভিদ [*Rootless plants and plants that are all roots*] :

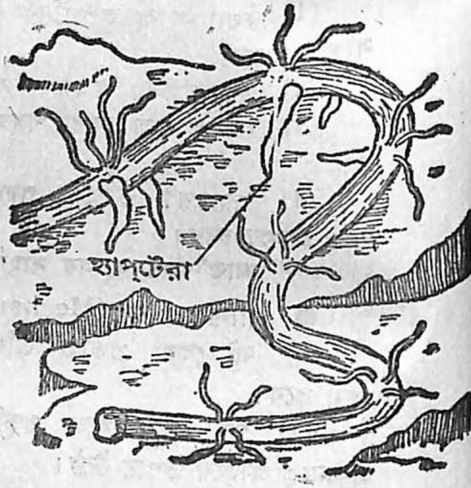
সাধারণত সপুষ্পক উদ্ভিদের মূল থাকলেও কতকগুলি উদ্ভিদে মোটেই মূল থাকে না। যেমন—

(1) **উলফিয়া** (*Wolffia,* এক ধরনের ক্ষুদি পানা) সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সপুষ্পক উদ্ভিদ এর সম্পূর্ণ দেহটি পাতার মতো চ্যাপ্টা অঙ্গ দিয়ে তৈরী—যাকে পাতাও বলা চলে আবার পর্ণকান্ডও বলা চলে।

(2) **পাতাঝাঁঝি** (*Utricularia*) নামক জলজ পতঙ্গভুক উদ্ভিদটিরও মূল নাই।



চিত্র 10·18—শিমুলের রুট বাট্রেস।



চিত্র 10·19—পোডোস্টেমন।

(3) **পোডোস্টেমন** (*Podostemon*) (চিত্র 10.19) নামক উদ্ভিদের দেহের সবটাই মূল। এই উদ্ভিদের দেহ থেকে হ্যাপটেরা (Haptera) নামক বিশেষ এক ধরনের মূল সৃষ্টি হয়। সেগুলির সাহায্যে উদ্ভিদটি পাথরের গায়ে লেগে থাকে।

● **প্রদর্শন ও পরীক্ষা** (Demonstration and experiment) ঃ

10.12. মূলের অন্তর্গঠন [*Internal structure of root*] :

(A) **দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদমূলের অন্তর্গঠন** (Internal Structure of a Dicotyledonous root) ঃ

● **ছোলা মূল** (Gram root) ঃ (চিত্র 10.20)।

উদ্ভিদমূলের অন্তর্গঠন পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত **দ্বিবীজপত্রী কচি মূলের** (যথা—ছোলা) একটি সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ গ্রহণ করতে হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের

নীচে পরীক্ষা করলে পরিধির দিক থেকে কেন্দ্রের দিকে পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত কলাস্তর দেখা যায়ঃ

(1) **ম‍ূলত্বক** বা **এপিব্লেমা** বা **পিলিফেরাস স্তর** (Epiblema or Piliferous layer) ঃ

(i) পাশাপাশি চক্রাকারে বিন্যস্ত ঘন সন্নিবিষ্ট **একসারি ব্যারেলাকৃতি প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা ম‍ূলত্বক** গঠিত।

(ii) কিউটিকলের আবরণ না থাকায় এদের কোষ-প্রাকার অত্যন্ত পাতলা।

(iii) ম‍ূলত্বক থেকে **এককোষী ম‍ূলরোম** (Unicellular root hairs) উৎপন্ন হয়।

(2) **বহির্মজ্জা** বা **বহিঃস্তর** বা **কর্টেক্স** (Cortex) ঃ

(i) ম‍ূলত্বকের নীচ থেকে অন্তস্ত্বক পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে **বহির্মজ্জা** বলে।

(ii) বহির্মজ্জা পাতলা প্রাকারবিশিষ্ট, কোষান্তর রন্ধ্রময় প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত।

(3) অন্তস্ত্বক বা **এণ্ডোডারমিস** (Endodermis) ঃ

(i) বহির্মজ্জার একেবারে ভিতরের স্তরটি অন্তস্ত্বক (Endodermis)।

(ii) ম‍ূলত্বকের প্যারেনকাইমার মতো অন্তস্ত্বকেও ব্যারেলাকৃতি প্যারেনকাইমাগ‍ুলি একস্তরে সজ্জিত থাকে। কোষগ‍ুলি পার্শ্ব-প্রাকারে বৈশিষ্ট্যময় **ক্যাসপেরিয়ান ফিতা** (Casparian strip) বর্তমান।

(4) **কেন্দ্রস্তম্ভ** বা **স্টীলি** (Stele) ঃ

(i) অন্তস্ত্বকের ভিতরে অবস্থিত সমগ্র অংশটি কেন্দ্রস্তম্ভ। কেন্দ্রস্তম্ভ নিম্নলিখিত চারটি অংশে বিভক্ত ঃ—

(a) **পরিচক্র** বা **পেরিসাইকল** (Pericycle) ঃ

(i) কেন্দ্রস্তম্ভের বাইরের দিকে অন্তস্ত্বক-সংলগ্ন প্যারেনকাইমা স্তরটিকে **পরিচক্র** বা **পরিধিস্তর** বা **পেরিসাইকল** (Pericycle) বলে।

(b) **নালিকা বাণ্ডিল** বা **ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল** (Vascular bundle) ঃ অর্থাৎ সমসংখ্যক জাইলেম ও ফ্লোয়েম (প্রতিটির সংখ্যা চার) প‍ৃথক প‍ৃথকভাবে পাশাপাশি অবস্থিত।

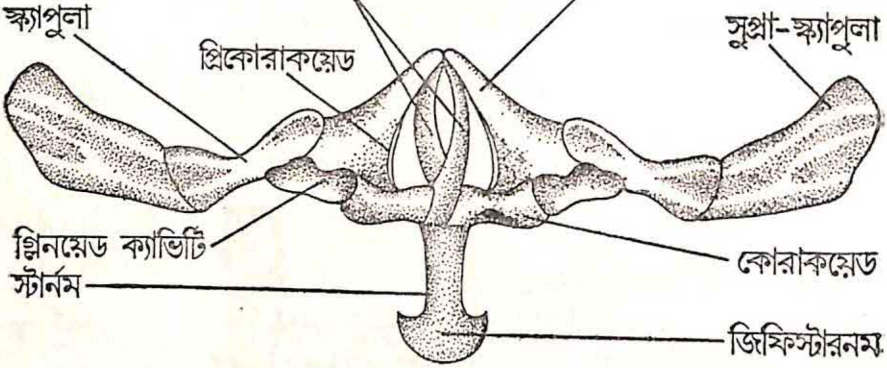
অর্থাৎ সমসংখ্যক জাইলেম ও ফ্লোয়েম প‍ৃথক প‍ৃথকভাবে পাশাপাশি অবস্থিত।

(ii) ব‍ৃহদাকার জাইলেমগ‍ুলিকে **মেটাজাইলেম** (Metaxylem) এবং ক্ষ‍ুদ্রাকার জাইলেমগ‍ুলিকে **প্রোটোজাইলেম** (Protoxylem) বলে (চিত্র 10.20)।

(iii) মেটাজাইলেম কেন্দ্রের দিকে এবং প্রোটোজাইলেম পরিধির দিকে বিন্যস্ত থাকে।

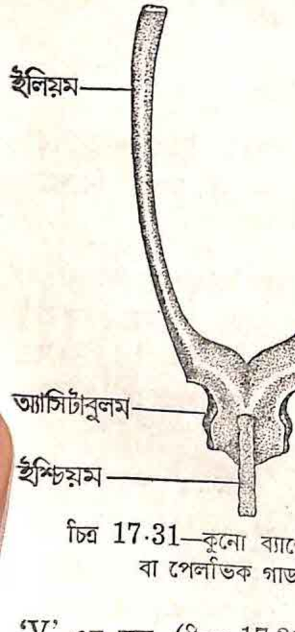
(c) **যোজককলা** বা **কনজাংটিভ টিস‍ু** (Conjunctive tissue) ঃ

চ্যাপ্টা অংশ বর্তমান। এর উপরিভাগ **স্টার্নম** (Sternum) এবং অর্ধচন্দ্রাকার বাঁকা নিম্নাংশ **জিফিস্টারনম** (Xiphisternum) (চিত্র 17.30)।

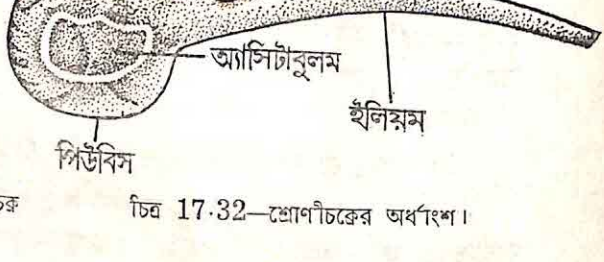


চিত্র 17·30—কুনো ব্যাঙের উরশ্চক্র বা পেকটোরাল গার্ডল।

(2) **শ্রোণীচক্র বা পেলভিক গার্ডল** (Pelvic girdle) ঃ
এটি কুনো ব্যাঙের দেহকাণ্ডের পিছনের দিকে অবস্থিত। এটিকে দেখতে



চিত্র 17·31—কুনো ব্যাঙের শ্রোণীচক্র বা পেলভিক গার্ডল।



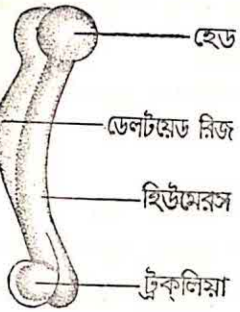
চিত্র 17·32—শ্রোণীচক্রের অর্ধাংশ।

'V'-এর মত (চিত্র 17.31)। শ্রোণীচক্রও দুটি সমান অংশে বিভক্ত। প্রতিটি অর্ধাংশ **ইলিয়ম** (Ileum), **ইশ্চিয়ম** (Ischium) ও **পিউবিস** (Pubis) নামক তিনটি অস্থি দ্বারা গঠিত। এই তিনটি অস্থির সংযোগস্থলের গহ্বরটির নাম

অ্যাসিটাবুলম (Acetabulum)। শ্রোণীচক্রের প্রতি অর্ধাংশ **অস্-ইনোমিনেটম** (Os-innominatum) নামে পরিচিত।

(3) **অগ্রপদের অস্থিসমূহ** (Bones of fore limb) :

কুনো ব্যাঙের দুটি অগ্রপদ উরশ্চক্রের দু'দিকে যুক্ত। প্রতিটি অগ্রপদ **হিউ-**



চিত্র 17·33—কুনো ব্যাঙের হিউমেরস।

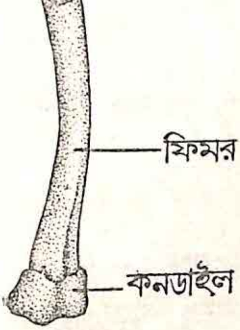


চিত্র 17·34—কুনো ব্যাঙের রেডিও-আলনা।

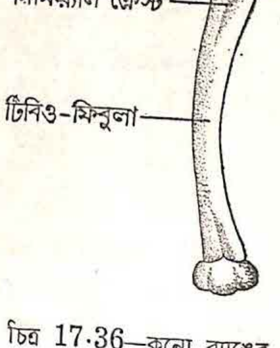
মেরস (Humerus), **রেডিও-আলনা** (Radio-ulna), **কারপাল** (Carpal), **মেটাকারপাল** (Metacarpal) ও **ফ্যালানজেস** (Phalanges) দ্বারা গঠিত।

(4) **পশ্চাৎপদের অস্থিসমূহ** (Bones of hind-limb) :

কুনো ব্যাঙের দুটি পশ্চাৎপদ শ্রোণীচক্রের দু'দিকে যুক্ত। পশ্চাৎপদ **ফিমর** (Femur), **টিবিও-ফিবুলা** (Tibio-fibula), **অ্যাস্ট্রাগ্যালস ক্যালকেনিয়ম**



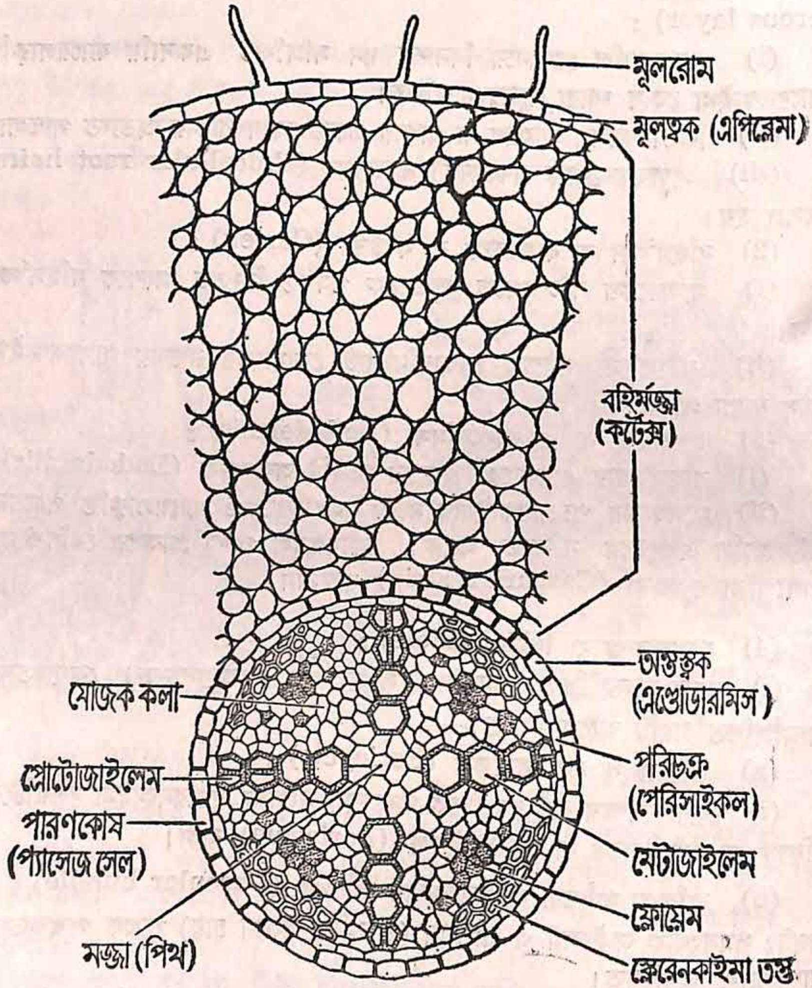
চিত্র 17·35—কুনো ব্যাঙের ফিমর।



চিত্র 17·36—কুনো ব্যাঙের টিবিও-ফিবুলা।

(Astragalus-calcanium), **টারসাল** (Tarsal), **মেটাটারসাল** (Metatarsal) ও **ফ্যালানজেস** (Phalanges) নামক অস্থিসমূহ দ্বারা গঠিত।

(i) জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলার মাঝখানে কোষান্তর রন্ধ্রহীন পাতলা প্রাকারাবদ্ধ প্যারেনকাইমা কলাকে **যোজক কলা** বা **কনজাংটিভ টিস্যু** (Conjunctive tissue) বলে।



চিত্র 10·20—দ্বিবীজপত্রী মূলের অন্তর্গঠনের আংশিক চিত্ররূপ (প্রস্থচ্ছেদে)।

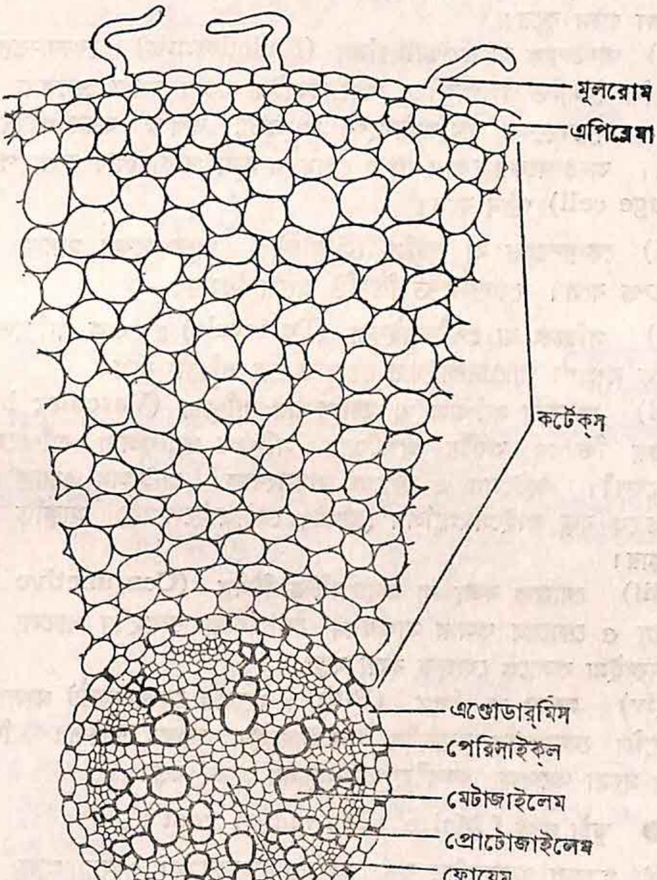
(d) **মজ্জা বা পিথ (Pith) ঃ**

(i) মূলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্যারেনকাইমা কোষগোষ্ঠীকে **মজ্জা বা পিথ** (Pith) বলে। মজ্জা গঠনকারী কোষগুলির মধ্যে কোন কোষান্তর রন্ধ্র থাকে না।

(B) **একবীজপত্রী মূলের অন্তর্গঠন** (Internal structure of Monocotyledonous roots) ঃ

● **কচুমূল** [Arum (*Colocasia sp*) root] ঃ

একটি কচি কচু মূলের মূলরোম অঞ্চলের সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে পরীক্ষা করলে নিম্নলিখিত কলাগুলিকে পরিধির দিক থেকে কেন্দ্রের দিকে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত থাকতে দেখা যায়।



চিত্র 10·21—একবীজপত্রী কচু মূলের অন্তর্গঠনের আংশিক চিত্ররূপ (প্রস্থচ্ছেদ)।

(1) **মূলত্বক বা এপিব্লেমা বা পিলিফেরাস স্তর** (Epiblema or Piliferous layer) ঃ

(i) মূলের একেবারে বাইরের দিকে এক স্তরে পাশাপাশি বিন্যস্ত পিপাকৃতি কোষান্তর রন্ধ্রহীন প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা মূলত্বক গঠিত।

(ii) কোষগুলির বাইরের দিকে কিউটিকল থাকে না।

(iii) মূলত্বকের কয়েকটি কোষ প্রলম্বিত হ'য়ে এককোষী মূলরোম গঠন করে।

(2) **বহির্মজ্জা** বা **বহিঃস্তর** বা **কর্টেক্স** (Cortex) : মূলত্বকের নীচে থেকে অন্তস্ত্বক (এণ্ডোডারমিস) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে থাকা কোষান্তর রন্ধ্রহীন আলগাভাবে বিন্যস্ত অসংখ্য প্যারেনকাইমা কোষ একত্রে বহির্মজ্জা গঠন করে।

(3) **অন্তস্ত্বক** বা **এণ্ডোডারমিস** (Endodermis) : কোষান্তর রন্ধ্রহীন পাশাপাশি বিন্যস্ত পিপাকৃতি প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা চক্রাকার অন্তস্ত্বক গঠিত। অন্তস্ত্বকের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থূলতা, অর্থাৎ **ক্যাসপেরিয়ান ফিতা** বর্তমান। অন্তস্ত্বকের কোন কোন কোষ পাতলা প্রাকারাবদ্ধ হ'য়ে **পারণ কোষ** (Passage cell) গঠন করে।

(4) **কেন্দ্রস্তম্ভ** বা **স্টিলি** (Stele) : অন্তস্ত্বকের মধ্যের অংশটিকে কেন্দ্রস্তম্ভ বলে। কেন্দ্রস্তম্ভ তিনটি অংশে বিভক্ত:—

(i) **পরিচক্র** বা **পেরিসাইকল** (Pericycle) : এক সারিতে বিন্যস্ত অন্তস্ত্বক সংলগ্ন প্যারেনকাইমার কোষস্তরকে **পরিচক্র** বলে।

(ii) **নালিকা বাণ্ডিল** বা **ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল** (Vascular bundle) : পরিচক্রের ভিতরে অরীয় পদ্ধতিতে সজ্জিত ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের সংখ্যা 6-এর বেশী। জাইলেম ও ফ্লোয়েম **সমসংখ্যক**। জাইলেম **এক্সার্ক**। তুলনামূলকভাবে বড় জাইলেমগুলির (অর্থাৎ মেটাজাইলেমের) আকৃতি গোল বা ডিম্বাকার।

(iii) **যোজক কলা** বা **কনজাংটিভ টিস্যু** (Conjunctive tissue) : জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলার মাঝখানে কোষান্তর রন্ধ্রহীন পাতলা প্রাকারাবদ্ধ প্যারেনকাইমা কলাকে যোজক কলা বলে।

(iv) **মজ্জা** বা **পিথ** (Pith) : মূলের কেন্দ্রস্থলটি মজ্জা। মজ্জার কোষগুলি কোষান্তর রন্ধ্রহীন প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত। দ্বিবীজপত্রী মূলের মজ্জা অপেক্ষা একবীজপত্রী মূলের মজ্জা বড়।

● **ভুট্টা মূল** [Maize (*Zea mays*) root] :

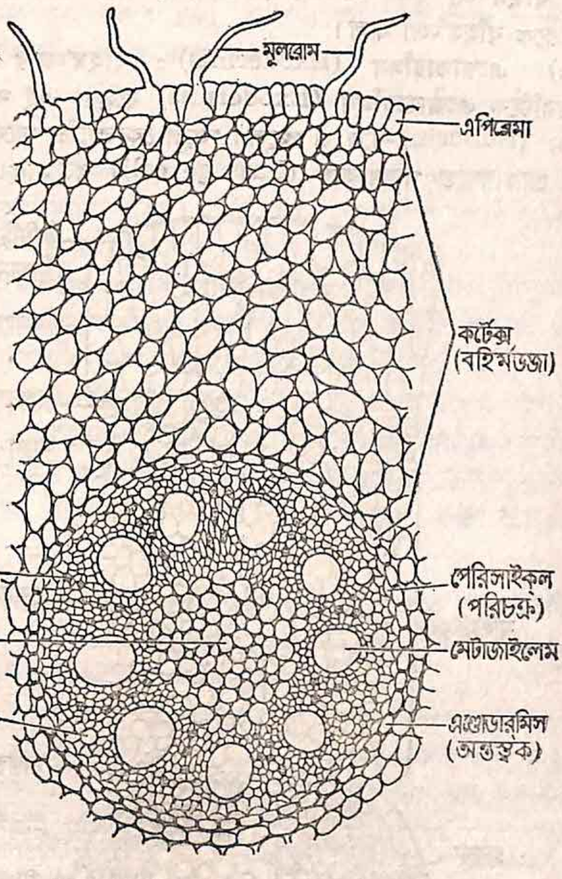
ভুট্টা মূলের অন্তর্গঠন কচু মূলের অনুরূপ। কচু মূল থেকে এর পার্থক্যগুলিই কেবল উল্লেখ করা হল :

(1) পরিচক্র একস্তরে বিন্যস্ত তবে আংশিকভাবে স্ক্লেরেনকাইমা দ্বারা গঠিত।

(2) মেটাজাইলেমগুলি অন্যান্য জাইলেম অপেক্ষা অত্যধিক বড়।

(3) মেটাজাইলেমগুলিকে ঘিরে থাকা প্যারেনকাইমার প্রাকার স্থূলীভূত।

(4) মজ্জা অপেক্ষাকৃত বড়।



চিত্র 10·22—ভুট্টা মূলের অন্তর্গঠন।

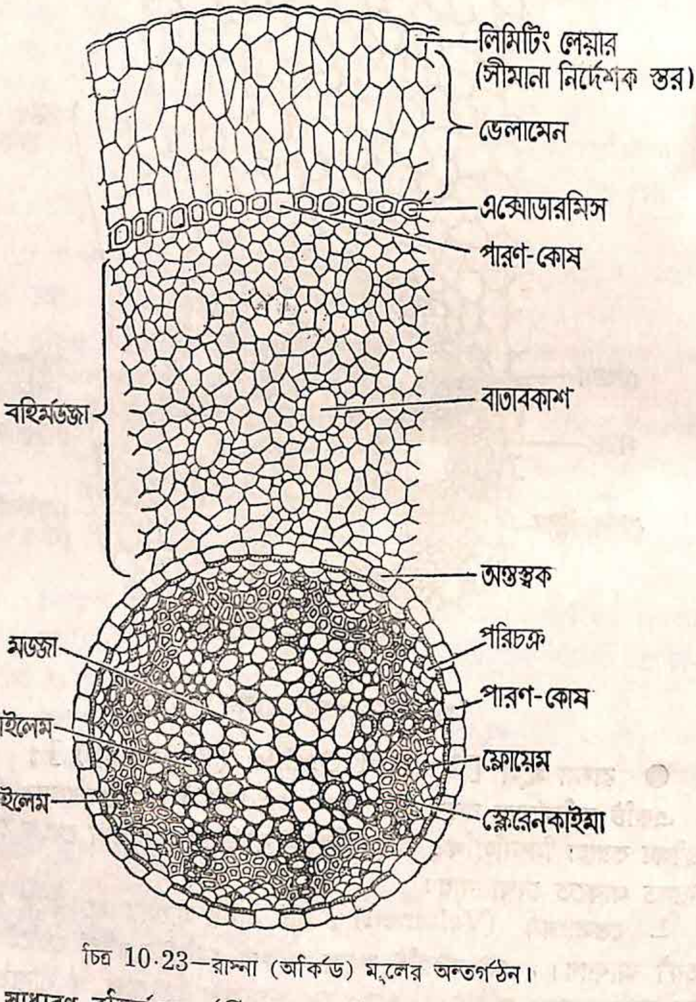
● **রাস্না মূল** [Root of Orchid (*Vanda sp*)] :

একটি অর্কিডের বায়ব মূল (aerial root)-এর প্রস্থচ্ছেদ (চিত্র 10.23) পরীক্ষা করলে নিম্নলিখিত কলাগুলিকে পর্যায়ক্রমে পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে বিন্যস্ত থাকতে দেখা যায়।

1. **ভেলামেন** (Velamen) : এটি রাস্না মূলের একেবারে বাইরের বহুস্তরী আবরণ। এই স্তরটি স্থূল প্রাকার বেষ্টিত দীর্ঘ প্রোটোপ্লাজমবিহীন মৃত কোষ দ্বারা গঠিত। এদের কোষ-প্রাকার ছিদ্রযুক্ত ও নানাভাবে স্থূলীভূত। ভেলামেনের সর্বাপেক্ষা বাইরের কোষস্তরকে সীমানা নির্দেশক স্তর বা **লিমিটিং লেয়ার** (Limiting layer) বলে। এখানে কোন মূলরোম নেই। ভেলামেন প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার স্পঞ্জ সদৃশ (sponge-like) কলা। বায়ুমণ্ডল থেকে শোষিত জল এতে জমা থাকে।

2. **বহির্মজ্জা** (Cortex) : ভেলামেনের নীচে অন্তস্ত্বক পর্যন্ত বিস্তৃত কোষস্তরকে বহির্মজ্জা বলে।

(a) **এক্সোডারমিস** (Exodermis) : বহির্মজ্জার একেবারে বাহিরের কোষস্তরটিকে **এক্সোডারমিস** (Exodermis) বলে। এই স্তরের কোষ-প্রাকার সুবেরিন (Suberin)-যুক্ত ও স্থূল। স্থূল কোষগুলি মাঝে মাঝে কতকগুলি পাতলা প্রাকারযুক্ত **পারণকোষ** (Passage cell) বর্তমান।



চিত্র 10·23—রাস্না (অর্কিড) মূলের অন্তর্গঠন।

(b) **সাধারণ বহির্মজ্জা** (General Cortex) : এক্সোডারমিসের নীচে থেকে অন্তস্ত্বক পর্যন্ত সুবিস্তৃত বহুস্তরী প্যারেনকাইমা সাধারণ বহির্মজ্জা গঠন করে। এই কলার কোষগুলি কোষান্তর রন্ধ্রযুক্ত এবং ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত। এই স্তরে বাতাবকাশ বিদ্যমান।

(c) **অন্তস্ত্বক** (Endodermis) ঃ পাশাপাশি বিন্যস্ত পিপাকৃতি প্যারেন-কাইমা দ্বারা চক্রাকার অন্তস্ত্বক গঠিত। অন্তস্ত্বকের কোন কোন কোষ পাতলা প্রাকারাবদ্ধ হ'য়ে যথারীতি পারণকোষ গঠন করে।

3. **কেন্দ্রস্তম্ভ** বা **স্টীলি** (Stele) ঃ কেন্দ্রস্তম্ভ নিম্নলিখিত চারিটি অংশে বিভক্ত ঃ—

(i) **পরিচক্র** বা **পেরিসাইকল** (Pericycle) ঃ এটি একসারিতে বিন্যস্ত স্থূল প্রাকারযুক্ত কোষ দ্বারা গঠিত। শুধু মাত্র অন্তস্ত্বকের পারণ কোষগুলির বিপরীতে অবস্থিত পরিচক্র কোষগুলি পাতলা প্রাকারযুক্ত।

(ii) **নালিকা বাণ্ডিল** বা **ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল** (Vascular bundles) ঃ পরিচক্রের ভিতরে অরীয় পদ্ধতিতে বিন্যস্ত, 6-এর অধিক সংখ্যক বাণ্ডিলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলা পৃথক পৃথক গুচ্ছে সজ্জিত থাকে।

(iii) **যোজক কলা** (Conjunctive tissue) ঃ জাইলেম কলাগুচ্ছের মধ্যবর্তী স্থানগুলি প্যারেনকাইমা কলায় পূর্ণ। আবার ফ্লোয়েম কলাগুলিকে ঘিরে রাখে স্ক্লেরেনকাইমা কলা। উভয়প্রকার কলাকে একত্রে যোজক কলা বলে।

(iv) **মজ্জা** বা **পিথ** (Pith) ঃ মূলের কেন্দ্রাংশকে মজ্জা বলে। মজ্জা প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত।

10.13. দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী মূলের অন্তর্গঠনের পার্থক্য *[Differences between the internal structures of a dicot root and a monocot root]* :

দ্বিবীজপত্রী মূল (ছোলা) (Dicot root)	**একবীজপত্রী মূল** (কচু) (Monocot root)
(1) ভ্যাস্কুলার ব্যাণ্ডিলের সংখ্যা চার (অন্যত্র দুই থেকে ছয়)।	(1) ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের সংখ্যা ছয়-এর বেশী।
(2) জাইলেম বহুভুজাকার।	(2) জাইলেম ডিম্বাকার বা গোলাকার।
(3) মজ্জা থাকলে তা কেন্দ্রের অল্প স্থান অধিকার করে থাকে।	(3) মজ্জা সর্বদা বর্তমান এবং তা কেন্দ্রের বৃহৎ অংশ অধিকার করে থাকে।
(4) কর্টেক্স বা বহিঃস্তরের বিস্তৃতি অপেক্ষাকৃত কম।	(4) বহিঃস্তরের বিস্তৃতি তুলনামূলক-ভাবে বেশী।

10.14. মাটি থেকে জল ও রস শোষণ *[Absorption of water and sap from the soil]* :

বাঁচার জন্য জল ছাড়াও অজৈব লবণের প্রয়োজন আছে। মাটির জলে প্রয়োজনীয় নানাবিধ লবণ দ্রবীভূত থাকে এবং সাধারণভাবে এই দ্রবণকে **রস** (Sap) বলা হয়।

ভিন্ন দুটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় জল ও রসের শোষণ ঘটে। সময় বিশেষে তরুণ মূলরোমবিহীন অংশও রসশোষণে সক্ষম। এককোষী মূলরোম বেলুনের মতো স্ফীতকায়। মূলরোমের পাতলা প্রাকার এবং তাতে ক্যালসিয়ম পেক্‌টেটের বিশেষ আস্তরণ মাটি থেকে রস ও জলকে ভিতরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। মূলরোমের প্রাকার-সংলগ্ন সাইটোপ্লাজম অর্ধভেদ্য পর্দার কাজ করে। ফলে **অভিস্রবণ** (Osmosis) চলার উপযোগী অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

10.15. অভিস্রবণ [*Osmosis*] :

● **অভিস্রবণের সংজ্ঞা** (Definition of Osmosis) ঃ **অর্ধভেদ্য পর্দা** (Semi permeable membrane) বা **প্রভেদক ভেদ্য পর্দা** (differentially permeable membrane) **দ্বারা পৃথক করা দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণের দ্রাবক** (solvent)-**এর অণু যে বিশেষ ব্যাপন ক্রিয়ায় একে অন্যের দিকে পরিবাহিত হয়, তাকে অভিস্রবণ বলে।**

সাধারণত কম ঘনত্বের দ্রাবক বেশী ঘনত্বের দ্রাবকের দিকে দ্রুত ধাবিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে **অন্তঃঅভিস্রবণ** (Endosmosis)* বলে। অভিস্রবণ চলতে থাকলে এক সময় দুটি পৃথকীকৃত তরলের সমঘনত্বে আসার সম্ভাবনা থাকে। **সমঘনত্বে আসামাত্রই অভিস্রবণ বন্ধ হয়।** কিন্তু উভয় তরলের ঘনত্বের পার্থক্য বরাবর বজায় রাখতে পারলে ক্রমাগত অন্তঃঅভিস্রবণ চলতে পারে।

10.16. অভিস্রবণের পরীক্ষা [*Experiment on Osmosis*] :

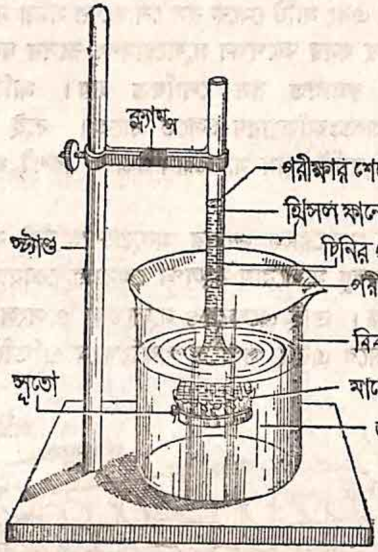
● **প্রয়োজনীয় সামগ্রী** (Requisites) ঃ

(i) একটি বিকার।
(ii) একটি থিসল ফানেল।
(iii) মাছের পটকা বা পার্চমেণ্ট কাগজ।
(iv) জল।
(v) ইওসিন রং।
(vi) চিনির গাঢ় জলীয় দ্রবণ।
(vii) সুতো।
(viii) স্ট্যান্ড।
(ix) একটি লাল গ্লাস মার্কিং পেন্সিল।

● **পদ্ধতি** (Procedure) ঃ স্ট্যান্ডের পাটাতনের উপরে তিন-চতুর্থাংশ জলপূর্ণ একটি বিকার রাখা হল। থিসল ফানেলের চওড়া মুখটি একটি মাছের পটকা দ্বারা ঢেকে বিকারের জলে ডুবিয়ে দেওয়া হল। ফানেলের লম্বা নলটি স্ট্যান্ডের সঙ্গে ক্ল্যাম্প করা হল। কিছু ইওসিন রং মিশিয়ে বিকারের জলের রং লাল করা হল।

* বেশী ঘনত্বের দ্রাবক কম ঘনত্বের দ্রাবকের দিকে যেতে থাকলে তাকে বহিঃঅভিস্রবণ (Exosmosis) বলে।

এবার ফানেলের সরু মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে চিনির গাঢ় দ্রবণ ঢালা হল। চিনির দ্রবণের উচ্চতা বরাবর পেন্সিল দিয়ে চিহ্ন দেওয়া হল। জলের মধ্যে থিসল ফানেলের মুখটি ডুবে থাকায় অচিরে অসম ঘনত্বযুক্ত দুটি দ্রবণের অভি-স্রবণ শুরু হয়।



চিত্র 10·24—অভিস্রবণের পরীক্ষা।

● **নিরীক্ষা** (Observation) : কয়েক ঘণ্টা পর দেখা গেল, ফানেলের নলে দ্রবণের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সঙ্গে গাঢ় দ্রবণের রং-ও কিছুটা লালচে হয়েছে। ফানেলের নলে পুনরায় দ্রবণের উচ্চতা বরাবর চিহ্ন দেওয়া হল।

● **সিদ্ধান্ত** (Inference) : কম ঘনত্বযুক্ত তরল পদার্থ অধিক ঘনত্বযুক্ত তরল পদার্থের দিকে দ্রুত ধাবিত হয়। তাই ফানেলের মধ্যে রাখা অধিক ঘনত্বযুক্ত চিনি-গোলা-জলের দিকে সাধারণ জল চালিত হয়। ফলে ফানেলের জলতলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। দুই চিহ্নের পার্থক্য দেখে ফানেলে অনুপ্রবিষ্ট জলের পরিমাপ করা যায়।

উপরের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, **অন্তঃঅভিস্রবণ পদ্ধতিতে কম ঘনত্বের তরল বেশী ঘনত্বের তরলের দিকে দ্রুত ধাবিত হয়।**

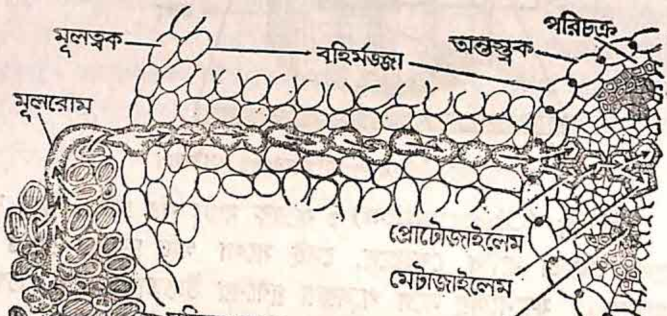
10.17. মূলরোম দ্বারা জল ও রস শোষণ পদ্ধতি *[Method of absorption of water and sap by root hairs] :*

মূলরোম এককোষী (Unicellular)। এর প্রোটোপ্লাজম কোষপর্দা (Plasma membrane) ও কোষ-প্রাকার (Cell wall) দ্বারা আবৃত থাকে। কোষ প্রাকার ভেদ্যপর্দার মতো কাজ করলেও কোষ-পর্দার আচরণ বহুলাংশে

প্রভেদক ভেদ্যপর্দার (Differentially permeable membrane) অনুরূপ।

মূলরোমের মধ্যে অবস্থিত প্রোটোপ্লাজমের গাঢ়ত্ব মূলরোমের বাইরে অবস্থিত মৃত্তিকাস্থ রস অপেক্ষা গাঢ়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অভিস্রবণ প্রক্রিয়া চলার মতো অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং মাটি থেকে রস শোষণের সময় মূলরোমে অন্তঃ-অভিস্রবণ ঘটে। **মাটির রসের ঘনত্ব অপেক্ষা মূলরোমস্থ রসের ঘনত্ব সর্বদা বেশী থাকে। ফলে মাটি থেকে ক্রমাগত রস শোষিত হয়।** মাটিতে জলমিশ্রিত লবণের ঘনত্ব কম থাকলে অন্তঃঅভিস্রবণ চলতে থাকে। দুই ঘনত্বের পার্থক্য যতক্ষণ বজায় থাকে ততক্ষণ মাটির রস মূলরোম-মধ্যস্থ বেশী ঘনত্বযুক্ত তরলের মধ্যে প্রবেশ করে।

অন্তঃঅভিস্রবণের সময় মূলরোমে জলের অনুপ্রবেশ ঘটে বলে মূলরোমস্থ তরলের ঘনত্ব কমে যায়। কিন্তু মূলরোম-সংলগ্ন কোষের কোষরসের ঘনত্ব তখন তুলনামূলকভাবে বেশী থাকে। তাই এক্ষেত্রেও মূলরোম ও সংলগ্ন কোষের মধ্যে অন্তঃঅভিস্রবণ চলে। এইভাবে একই পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে প্রতিটি সংলগ্ন কোষে



চিত্র 10·25—মূলরোম দ্বারা জল ও রসশোষণ।

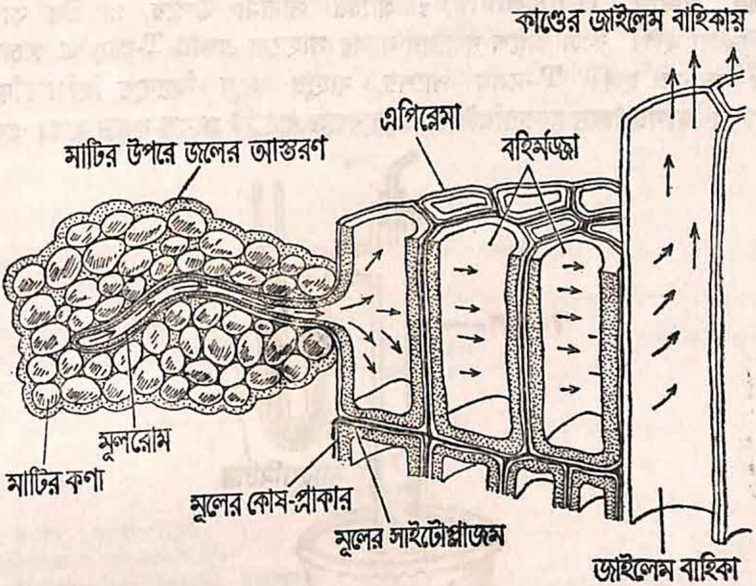
ক্রমাগত অনুসৃত হওয়ার ফলে (কোষান্তর অভিস্রবণের ফলে) **মাটির জলমিশ্রিত লবণ প্রথমে মূলরোমে, পরে বহির্মজ্জায় এবং শেষে জাইলেম বাহিকায়** পৌঁছায়।

● **মূলরোম দ্বারা শোষিত রসের জাইলেম বাহিকায় অনুপ্রবেশ :**

জাইলেম বাহিকাগুলি মৃত। প্রোটোপ্লাজমবিহীন জাইলেম বাহিকাগুলি স্বাভাবিক কারণেই সজীব কোষের মতো অন্তঃঅভিস্রবণ চালাতে পারে না। রসকে জাইলেম বাহিকা মাধ্যমে প্রথমে কাণ্ডে এবং পরে পাতায় পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় রস শোষণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

পক্ষান্তরে যে সব প্যারেনকাইমাকোষ জাইলেম বাহিকাকে পরিবৃত রাখে সেগুলিতে অনবরত কোষান্তর অভিস্রবণ ঘটে। ফলে তারা ক্রমশঃ দ্রুত **রসস্ফীত**

(Turgid) হয়। পূর্ণ রসস্ফীতি জনিত টান টান অবস্থার ফলে এইসব কোষের কোষ-প্রাকারে এক প্রকার চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপকে **রসস্ফীতি চাপ** (Turgor pressure) বলে। জাইলেম বাহিকার নিকটস্থ প্যারেনকাইমা কোষগুলির সম্মিলিত রসস্ফীতি চাপের প্রভাবে এই কোষগুলি থেকে অতিরিক্ত জল বাইরে আসে এবং জাইলেম বাহিকায় প্রবেশ করে।



চিত্র 10.26—ত্রিমাত্রিক দৃশ্যে মূলরোম দ্বারা শোষিত তরল পদার্থের গতিপথ।

10.18. মূলজ প্রেষ [*Root pressure*] :

রসকে জাইলেম বাহিকার মাধ্যমে উপরে পাঠানোর জন্য মূলের বহির্মজ্জা কোষে সৃষ্ট চাপকেই **মূলজ প্রেষ** বা **রুট প্রেসার** (Root pressure) বলা হয়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, মূলজ প্রেষ এককভাবে **রসের উৎস্রোতে** (Ascent of sap)* উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না।

● **মূলজ প্রেষের সংজ্ঞা** (Definition of Root pressure) : **মূলের বহির্মজ্জায় সৃষ্ট যে চাপের সাহায্যে মূলরোম দ্বারা শোষিত জল জাইলেম বাহিকায় প্রবেশ করে তাকে মূলজ প্রেষ বলে।**

10.19. মূলজ প্রেষের পরীক্ষা [*Experiment on Root pressure*] :

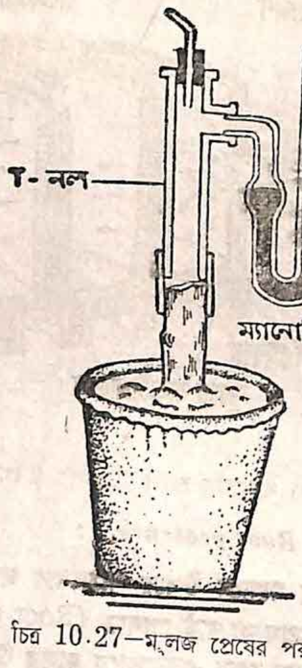
● **প্রয়োজনীয় সামগ্রী** (Requisites) :

(i) টবে লাগানো একটি চারা গাছ,

* রসের উৎস্রোত সম্বন্ধে Art. 11.16-তে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(ii) T-আকৃতির একটি কাচনল,
(iii) একটি ম্যানোমিটার,
(iv) একটি মুখবন্ধ নল,
(v) একটি ছিপি,
(vi) একটি রবারের নল ও ভেসলিন।

● **পদ্ধতি (Procedure)**ঃ মাটির সামান্য উপরে গাছটির কান্ড কেটে ফেলা হল। কাটা অংশে রবারের নলের সাহায্যে একটি T-আকৃতি কাচনল জুড়ে দেওয়া হল। T-নলের পাশের বাহুর মুখ ছিদ্রযুক্ত ছিপি দিয়ে বন্ধ ক'রে ছিপির ছিদ্রে ম্যানোমিটারের বাল্‌বযুক্ত বাহুটি প্রবেশ করান হল। এখন



চিত্র 10.27—মূলজ প্রেষের পরীক্ষা।

T-নলের উপরের খোলামুখ দিয়ে জল ঢেলে পুরো T-নল ও বাল্‌বের বাকি ঊর্ধ্বাংশ জলপূর্ণ করার পর (পূর্বেই ম্যানোমিটারের ঊর্ধ্ববাহু ও বাল্‌বের নীচের অর্ধাংশ পারদ দ্বারা পূর্ণ থাকে) মুখটি ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল। ছিপির মধ্যে দিয়ে একমুখ বন্ধ একটি কাচনল প্রবেশ করান হল। সংযোগস্থলগুলি ভেসলিনের প্রলেপ দিয়ে ভালভাবে বায়ু-নিরোধক করা হল। টবের মাটিতে জল সিঞ্চন ক'রে ম্যানোমিটারের ঊর্ধ্ববাহুটিতে পারদের উচ্চতা বরাবর দাগ দিয়ে পরীক্ষা-পাত্রটিকে কয়েক ঘণ্টা রেখে দেওয়া হল।

● **নিরীক্ষা (Observation)**ঃ নির্দিষ্ট সময় পরে দেখা গেল, ম্যানোমিটারের পারদ পূর্বের দাগ ছাড়িয়ে উপরে উঠে এসেছে এবং সংগে সংগে বাল্‌বে জলের তলরেখা নেমে গেছে।

● **সিদ্ধান্ত** (Inference) ঃ বাইরে থেকে T-নলের জলে চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কেবল গাছের কাটা অংশ থেকে কোন তরল পদার্থ নির্গত হয়ে ঐ চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে বহির্মজ্জার কোষগুলি জাইলেম বাহিকায় ক্রমাগত জল ঠেলে দিয়ে যে চাপের সৃষ্টি করেছে, সেই চাপের ফলেই রস ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। কাণ্ডের কাটা অংশের ভিতর দিয়ে উদ্গত জল T-নলের জলে চাপ দিয়েছে। এক্ষেত্রে **ম্যানোমিটারের পারদকে উপরে ঠেলে পাঠাতে সক্ষম চাপই হল মূলজ প্রেষ।** ম্যানোমিটারে রক্ষিত পারদের প্রথম ও শেষ উচ্চতার পার্থক্য নির্দিষ্ট সময়ে মূলজ প্রেষের পরিমাণকে নির্দেশ করে।

10.20. নীচের ছকে মূলের শ্রেণীবিভাগ দেখানো হল ঃ

মূল
- স্থানিক
  - সাধারণ (প্রধান মূল) (যেমন—পুঁই)
  - পরিবর্তিত মূল
    - ভাণ্ডার মূল
      - মূলাকার (যেমন—মূলা)
      - শঙ্কুবাকার (যেমন—গাজর)
      - শালগমাকার (যেমন—বীট, শালগম)
    - শ্বাসমূল (যেমন—সুন্দরী)
- অস্থানিক
  - গুচ্ছমূল (যেমন—ধান)
  - পরিবর্তিত মূল
    - যান্ত্রিক কাজের জন্য
      - স্তম্ভমূল (যেমন—বট)
      - ঠেশমূল (যেমন—কেয়া)
      - আরোহীমূল (যেমন—পান)
    - শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য
      - চোষকমূল (যেমন—স্বর্ণলতা)
      - পরাশ্রয়ী মূল (যেমন—অর্কিড)
      - জলজ শ্বাসমূল (যেমন—কেশরদাম)
      - আত্তীকরণ মূল (যেমন—গুলঞ্চ)
      - ভাণ্ডার মূল
        - কন্দ মূল—(যেমন—রাঙা আলু)
        - গুচ্ছিত মূল—(যেমন—শতমূলী)
        - অর্বুদযুক্ত মূল—(যেমন—আমআদা)
        - মালাকৃতি মূল—(যেমন—মুথাঘাস)
        - বলয়াকৃতি মূল—(যেমন—ইপিকাক)

কাণ্ড
[Stem]

11

11.1. সূচনা [*Introduction*] :

অঙ্কুরিত **বীজের ভ্রূণমুকুল** (Plumule) ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে গঠন করে **বিটপ** (Shoot)। বিটপ সাধারণত মাটির উপরে বৃদ্ধি পায় এবং প্রয়োজনমত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হ'য়ে পাতা, ফুল, ফল ধারণ করে। বিটপের প্রধান **ঊর্ধ্বগামী অক্ষটি** (Ascending axis) প্রকৃতপক্ষে **কাণ্ড** (Stem)। বস্তুতঃ **ভ্রূণমুকুল** (Plumule) থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদঅঙ্গকে **কাণ্ড** বলা হয়। কাণ্ড তার পত্রকক্ষে মুকুল সৃষ্টি দ্বারা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। পাতা, ফুল সমন্বিত শাখা-প্রশাখা নিয়ে কালক্রমে সেটি ভূপৃষ্ঠের উপরে **বিটপতন্ত্র** (Shoot system) গঠন করে।

পাতা, ফুল ও ফল ধারণ করা ছাড়াও কাণ্ড রস ও খাদ্য পরিবহনের পথ হিসাবে কাজ করে। কাণ্ড সচরাচর গোলাকার। অধিকাংশ কাণ্ড মাটির উপরে খাড়াভাবে বাড়ে। বিশেষ পরিস্থিতিতে মাটির নীচে অথবা মাটির সঙ্গে সংলগ্ন থেকেও কাণ্ড বৃদ্ধি পায়। কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ড এতই সংক্ষিপ্ত যে, সেক্ষেত্রে কাণ্ড নেই বলে মনে হয়।

বহিরাকৃতির বিচারে **কাণ্ডের কতকগুলি বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ** আছে। এই লক্ষণগুলির সাহায্যে কাণ্ডকে অন্যান্য উদ্ভিদাংগ—বিশেষ করে মূল থেকে সহজে পৃথক করা যায়। মৃৎগত কাণ্ডকে আপাতদৃষ্টিতে মূল বলে ভ্রম হতে পারে। সেক্ষেত্রে কাণ্ডের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি জানা থাকলে অঙ্গটিকে চিনতে অসুবিধা হয় না।

● **কাণ্ডের সংজ্ঞা** (Definition of Stem) : **সাধারণত মাটির উপরে অবস্থিত এবং উদ্ভিদের ভ্রূণমুকুল থেকে গঠিত বিটপের প্রধান ঊর্ধ্বগামী অঙ্গকে কাণ্ড বলে।**

11.2. কাণ্ডের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য [*Some important features of stem*] :

(i) কাণ্ড সাধারণত উদ্ভিদের **ঊর্ধ্বগামী অঙ্গ** (Ascending axis)।

(ii) কাণ্ড ভ্রূণের ভ্রূণমুকুল থেকে উৎপন্ন হয়।

(iii) **কাণ্ড পর্ব ও পর্বমধ্যে বিভক্ত।**

(iv) **কাণ্ডের পর্ব থেকে পাতা এবং সময় বিশেষে মূল নির্গত হয়।**

(v) **কাণ্ডের অগ্রভাগে অগ্রমুকুল** (Apical bud) **এবং পাতার কক্ষে কাক্ষিক মুকুল** (Axillary bud) **জন্মায়।**

(vi) কাণ্ড আলোর উৎসের দিকে ধাবিত হয়, অর্থাৎ কাণ্ড **আলোক অনুকূলবর্তী** (Positively phototropic)।

(vii) কাণ্ড সাধারণত মাটি ছেড়ে উপরের দিকে, অর্থাৎ অভিকর্ষ বলের বিপরীত দিকে চালিত হয় (**অভিকর্ষ প্রতিকূলবর্তী**, Negatively, geotropic)।

(viii) এছাড়া কাণ্ডে বিশেষ কতকগুলি ক্ষতচিহ্ন থাকে। এগুলির মধ্যে **পত্রক্ষত** (Leaf scar) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

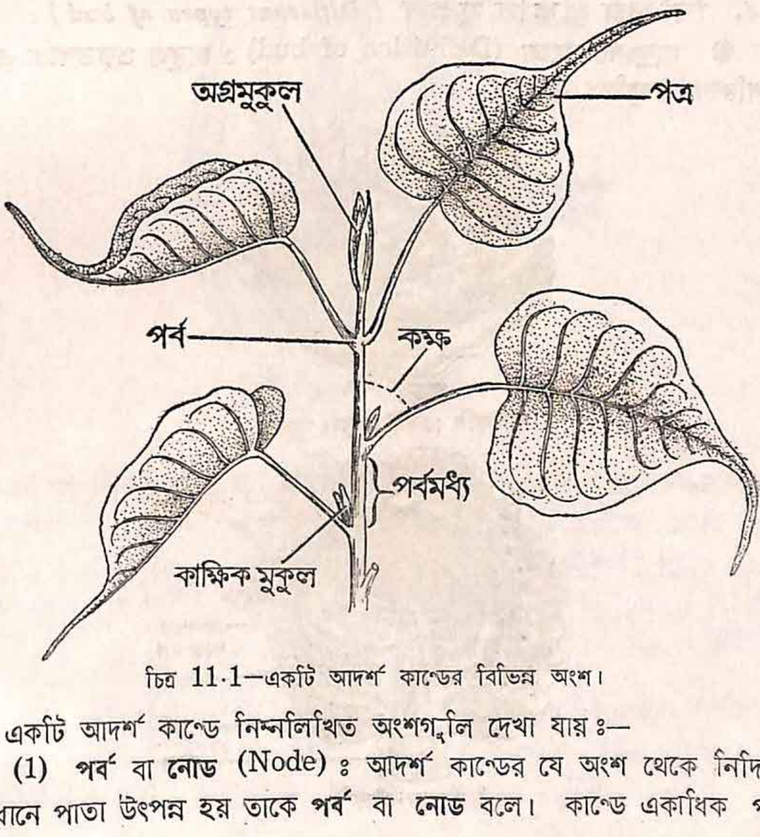
(ix) প্রথমাবস্থায় কাণ্ড বর্ণহীন, পরে সাধারণত **রং দাঁড়ায় সবুজ**।

(x) কাণ্ড মসৃণ বা রোমশ। **রোমগুলি সর্বদা বহুকোষী** (Multicellular)।

(xi) কাণ্ডের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ গঠন-বৈশিষ্ট্য আছে।

11.3. একটি আদর্শ কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ [*Different parts of a typical stem*] :

● **আদর্শ কাণ্ডের সংজ্ঞা** (Definition of typical Stem) : **ভ্রূণমুকুল থেকে উৎপন্ন বায়ব বিটপের কেন্দ্রীয় অক্ষকে আদর্শ কাণ্ড বলে।**

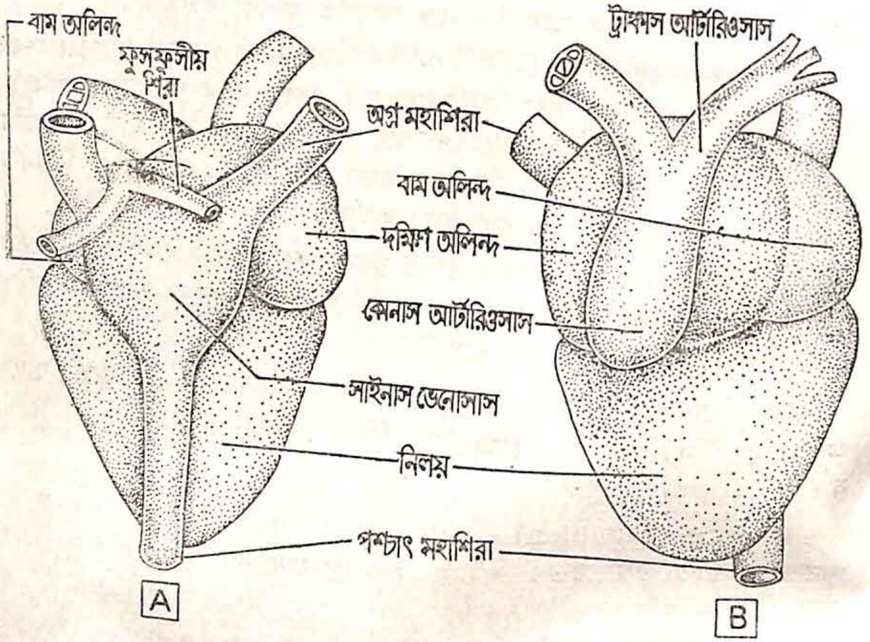


চিত্র 11·1—একটি আদর্শ কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ।

একটি আদর্শ কাণ্ডে নিম্নলিখিত অংশগুলি দেখা যায় :—

(1) **পর্ব** বা **নোড** (Node) : আদর্শ কাণ্ডের যে অংশ থেকে নির্দিষ্ট ব্যবধানে পাতা উৎপন্ন হয় তাকে **পর্ব** বা **নোড** বলে। কাণ্ডে একাধিক পর্ব থাকে।

প্রকোষ্ঠ। একটি **সাইনাস ভেনোসাস** (Sinus venosus) ও একটি **কোনাস আর্টারিওসাস** (Conus arteriosus) হ'ল আনুষঙ্গিক প্রকোষ্ঠ।



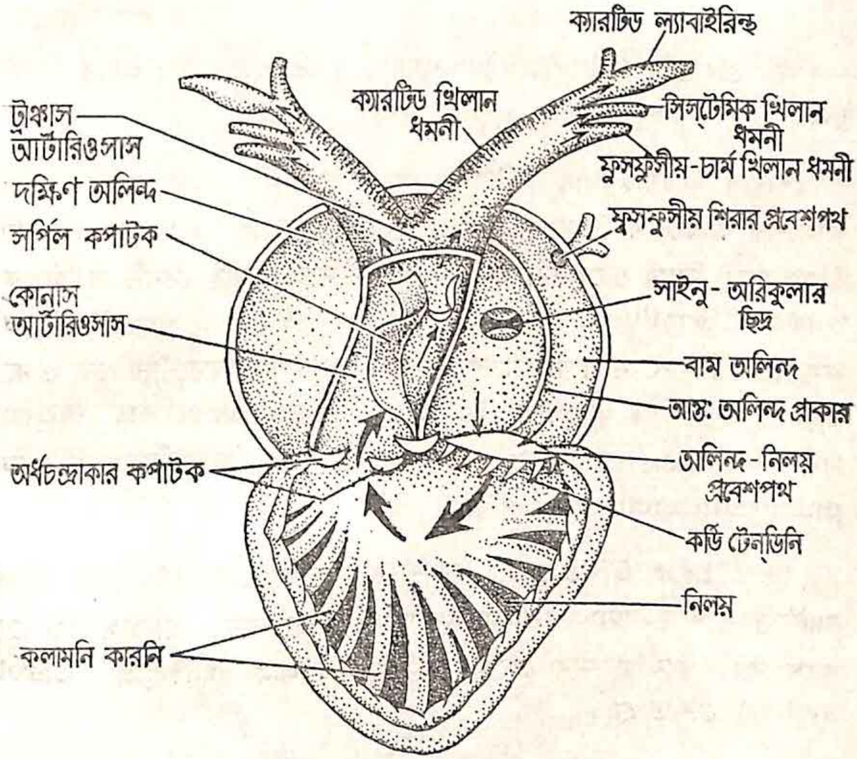
চিত্র 17.7—ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের বহিরাকৃতি ঃ
A—অঙ্কদৃশ্য ; B—পৃষ্ঠদৃশ্য।

সাইনাস ভেনোসাস (Sinus venosus) ঃ কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত ত্রিকোণাকার থলির মতো অঙ্গটি সাইনাস ভেনোসাস। দুটি **অগ্র মহাশিরা** (Pre caval veins) ও একটি **পশ্চাৎ মহাশিরা** (Post caval vein)-র মিলনে সাইনাস ভেনোসাস গঠিত হয়। সাইনাস ভেনোসাস প্রকৃতপক্ষে একটি **গ্রাহক প্রকোষ্ঠ** (Receiving chamber)। দুটি অগ্র মহাশিরা ও একটি পশ্চাৎ মহাশিরা মাধ্যমে কুনো ব্যাঙের সর্বাঙ্গ থেকে দূষিত রক্ত সাইনাস ভেনোসাসে আসে।

সাইনাস ভেনোসাস **সাইনু-অরিকুলার ছিদ্র** (Sinu-auricular aperture) দ্বারা দক্ষিণ অলিন্দের সঙ্গে যুক্ত। ছিদ্রটি **সাইনু-অরিকুলার কপাটক** (Sinu-auricular valve) দ্বরা নিয়ন্ত্রিত। এই ছিদ্রপথেই সাইনাস ভেনোসাস থেকে রক্ত দক্ষিণ অলিন্দে নেমে আসে।

অলিন্দ (Auricles) ঃ কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডে অলিন্দের সংখ্যা দুই—একটি **দক্ষিণ অলিন্দ** (Right auricle) ও অন্যটি **বাম অলিন্দ** (Left

auricle)। দক্ষিণ অলিন্দটি অপেক্ষাকৃত বড়। অলিন্দ দু'টি **আন্তঃ অলিন্দ প্রাকার** (Inter-auricular septum) দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পৃথক থাকে। বাম



চিত্র 17·8—কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ।

অলিন্দে **ফুসফুসীয় শিরা** (Pulmonary vein) উন্মুক্ত হয়। উভয় অলিন্দ একটি **অলিন্দ-নিলয় প্রবেশপথ** বা **অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র** (Auriculo-ventricular aperture) দ্বারা নিলয়ের সঙ্গে যুক্ত। ছিদ্রটি **অলিন্দ-নিলয় কপাটক** (Auriculo-ventricular valve) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অলিন্দ দু'টিও প্রকৃতপক্ষে হৃৎপিণ্ডের গ্রাহক প্রকোষ্ঠ।

নিলয় (Ventricle) ঃ ত্রিকোণাকার ও পুরু পেশীবহুল নিলয়টি একটি **অবিভক্ত প্রেরক প্রকোষ্ঠ** (Forwarding chamber)। **করোনারী সালকাস** (Coronary sulcus) নামক একটি আড়াআড়ি ভাঁজ থাকার জন্য বাইরে থেকে অলিন্দ দু'টিকে নিলয় থেকে পৃথক করা যায়। নিলয়ের মধ্যে নিলয়ের অন্তঃ-

(2) **পর্বমধ্য** বা **ইণ্টারনোড** (Internode) : কাণ্ডে দু'টি পর্বের মধ্যবর্তী পত্রবিহীন অংশকে **পর্বমধ্য** বা **ইণ্টারনোড** বলে।

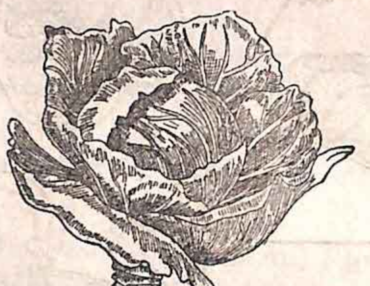
(3) **পাতা** বা **পত্র** বা **লিফ** (Leaf) : পর্ব থেকে এক বা একাধিক পাতা উৎপন্ন হয়। পাতা হ'ল পর্ব থেকে উৎপন্ন কাণ্ডের চ্যাপ্টা, পার্শ্বজ সবুজ অংগ। উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন রীতিতে পাতাগুলি কাণ্ডের উপরে সজ্জিত থাকে (**পত্রবিন্যাস**, Phyllotaxy)।

(4) **কক্ষ** বা **অ্যাক্সিল** (Axil) : পর্ব থেকে উৎপন্ন পাতা কাণ্ডের সংগে যে কোণ (Angle) সৃষ্টি করে তাকে **কক্ষ** বলে।

(5) **মুকুল** বা **বাড** (Bud) : পাতার কক্ষে মুকুল থাকে। এই মুকুলকে **কাক্ষিক মুকুল** বা **অ্যাক্সিলারী বাড** (Axillary bud) বলে। আবার কাণ্ডের ক্রমবর্ধমান অক্ষের আগায় অবস্থিত মুকুল **অগ্রমুকুল** বা **শীর্ষমুকুল** বা **এপিক্যাল বাড** বা **টারমিন্যাল বাড** (Apical or Terminal bud) নামে পরিচিত।

11.4. বিভিন্ন প্রকার মুকুল [*Different types of bud*] :

● **মুকুলের সংজ্ঞা** (Definition of bud) : **মুকুল প্রকৃতপক্ষে একটি অপরিণত সংকুচিত বিটপ।**



বাঁধাকপি (একটি সর্ববৃহৎ মুকুল)



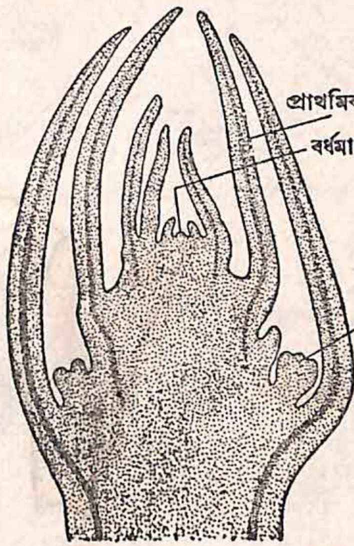
দীর্ঘচ্ছেদে বাঁধাকপি

চিত্র 11·2—বাঁধাকপি সর্ববৃহৎ মুকুল।

কাণ্ডের সমস্ত চরিত্রগত লক্ষণই মুকুলে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে। সংকুচিত থাকার জন্যই লক্ষণগুলি তত প্রকট নয়। **মুকুলের মধ্যে বাঁধাকপি সর্ববৃহৎ** (চিত্র 11.2)। পরীক্ষা করলে দেখা যায়, এখানেও পর্ব ও পর্বমধ্য বর্তমান। পর্ব থেকে উদ্গত পাতাগুলি এখানে অপরিণত।

(1) **অবস্থান অনুসারে মুকুল** প্রধানত দু'প্রকার—**অগ্রমুকুল** বা **শীর্ষমুকুল** (Apical or terminal bud) এবং **পার্শ্বমুকুল** বা **কাক্ষিক মুকুল** (Lateral or axillary bud)। কাণ্ড বা শাখা-প্রশাখার অগ্রভাগের মুকুল অগ্রমুকুল। পাতার কক্ষের মুকুল কাক্ষিক মুকুল।

(2) **প্রকৃতি অনুসারে মুকুল** দু'প্রকার—**পুষ্পমুকুল** (Flower bud) এবং **পত্রমুকুল** বা **কাণ্ডমুকুল** (Leaf bud or stem bud)। যে মুকুল



চিত্র 11·3—মুকুলের দীর্ঘচ্ছেদ।

কেবল পুষ্প উৎপন্ন করে তাকে পুষ্পমুকুল বলে। পত্র-বিশিষ্ট শাখায় রূপান্তরিত মুকুলকে পত্রমুকুল বা কাণ্ডমুকুল বলে। স্বাভাবিক নিয়মে পুষ্পমুকুল ও কাণ্ডমুকুল থেকে যথাক্রমে পুষ্প ও কাণ্ডের উৎপত্তি ঘটে। এছাড়া **মিশ্রমুকুল*** (Mixed bud) নামে আর এক ধরনের মুকুল আছে। প্রয়োজনবোধে মিশ্রমুকুল পুষ্পমুকুল অথবা পত্রমুকুলে রূপান্তরিত হয়। **আপেলের পুষ্পমুকুল প্রকৃতপক্ষে** একটি **মিশ্রমুকুল** (Mixed bud)।

(3) **উৎপত্তি অনুসারে** উক্ত তিন প্রকার মুকুলই **স্থানিক মুকুল** (Normal bud)। নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত কাণ্ডের যেকোন স্থান, এমন কি মূল বা পাতা থেকে উৎপন্ন মুকুলকে **অস্থানিক মুকুল** (Adventitious bud)

* অধিকাংশ কাক্ষিক মুকুল এবং শীর্ষমুকুল প্রায়শ পত্রমুকুল ও মিশ্রমুকুলে রূপান্তরিত হয়।

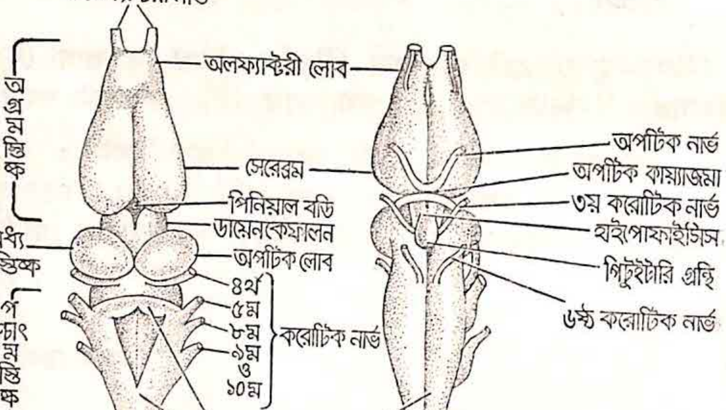
17.13. কুনো ব্যাঙের নার্ভতন্ত্র [*Nervous system of Toad*] :

যে তন্ত্র জীবদেহের বিভিন্ন অংশে উদ্দীপনা পরিবহন ও বিভিন্ন অঙ্গের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় সহায়তা করে তাকে নার্ভতন্ত্র বলে।

কুনো ব্যাঙের নার্ভতন্ত্রটি দেহের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত এবং সেটি **কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র, প্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র ও স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্রে** বিভক্ত।

(1) **কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র** (Central nervous system) ঃ কুনো ব্যাঙের কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রটি **মস্তিষ্ক** (Brain) ও **সুষুম্নাকাণ্ড** (Spinal cord) নিয়ে গঠিত।

(A) **মস্তিষ্ক** (Brain) ঃ করোটি (Cranium)-র আধারে কুনো ব্যাঙের মস্তিষ্কটি অবস্থিত। মস্তিষ্ক **মেনিনজেস** (Meninges) নামক বিশেষ একটি পর্দায় আবৃত থাকে। মস্তিষ্কটি **অগ্রমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক ও পশ্চাৎমস্তিষ্ক** —এই তিনটি অংশে বিভক্ত।



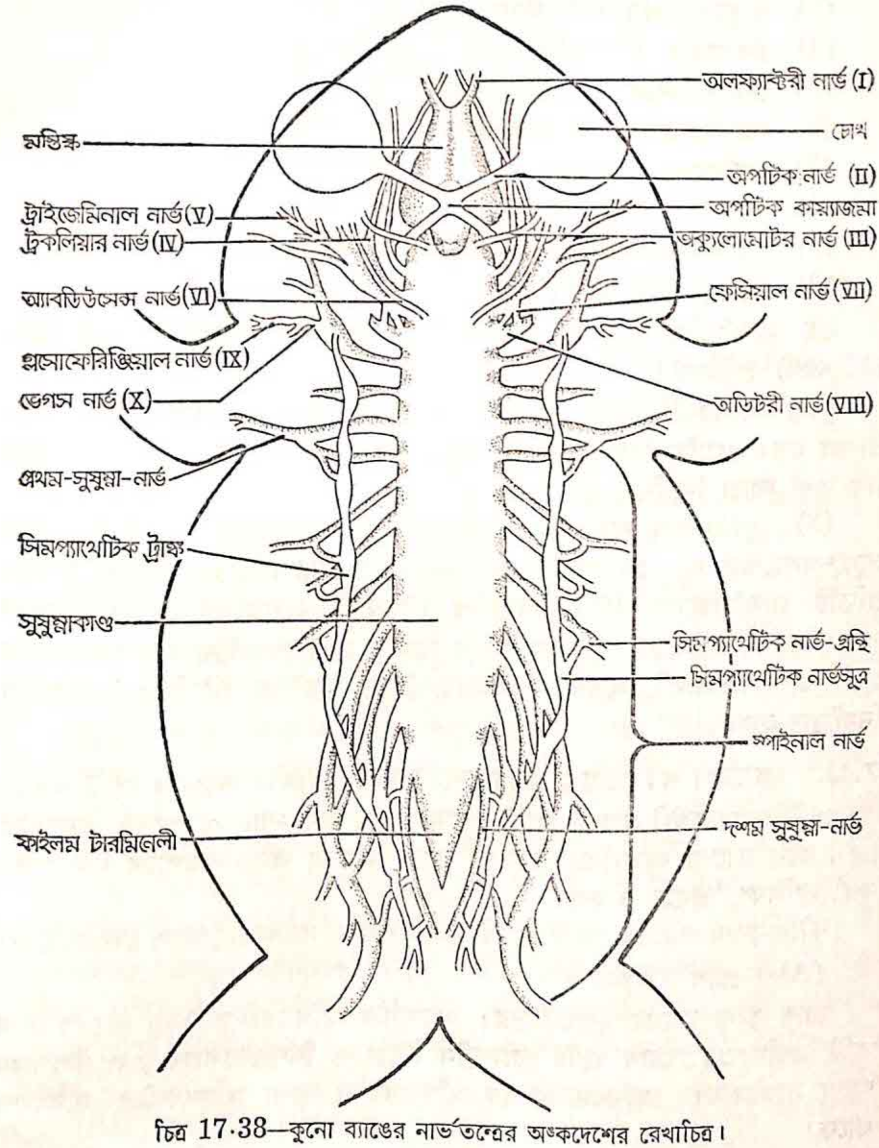
চিত্র 17·37—কুনো ব্যাঙের মস্তিষ্কের গঠন ঃ
বামে—পৃষ্ঠদৃশ্য ও দক্ষিণে—অঙ্কদৃশ্য।

(i) **অগ্রমস্তিষ্ক** (Forebrain) বা **প্রোসেনকেফালন** (Prosencephalon) ঃ এটি পুনরায় **টেলেনকেফালন** ও **ডায়েনকেফালন** নামক অংশে বিভক্ত। টেলেনকেফালনটি প্রধানত দুটি অলফ্যাক্টরী লোব, সেরেব্রম (গুরুমস্তিষ্ক) নিয়ে গঠিত। ডায়েনকেফালনটি **পিনিয়াল বডি, হাইপোফাইসিস, এপিফাইসিস, পিটুইটারি বডি, অপটিক কায়াজমা** ইত্যাদি অংশ দ্বারা গঠিত।

(ii) **মধ্যমস্তিষ্ক** (Midbrain) বা **মেসেনকেফালন** (Mesencephalon) ঃ এটি একটি সংক্ষিপ্ত অংশ। এখানে **অপটিক লোব** অবস্থিত।

(iii) **পশ্চাৎমস্তিষ্ক বা রম্বেনকেফালন** (Rhombencephalon) ঃ এটি মস্তিষ্কের পশ্চাৎ অংশ।

(B) **সুষুম্নাকান্ড বা স্পাইনাল কর্ড** (Spinal cord) ঃ এটি পশ্চাৎ-মস্তিষ্কের মেডালা অবলংগাটা থেকে উৎপন্ন হয় এবং ফোরামেন ম্যাগনাম দিয়ে বেরিয়ে মেরুদণ্ডের নিউরাল কেনালের মধ্যে বিস্তৃত থাকে।

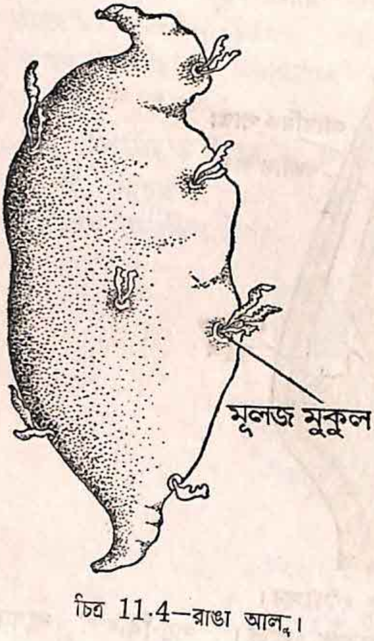


চিত্র 17·38—কুনো ব্যাঙের নার্ভতন্ত্রের অংকদেশের রেখাচিত্র।

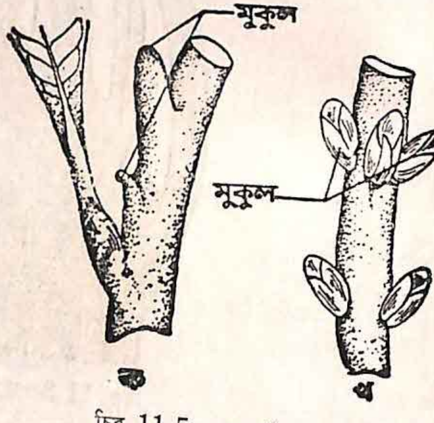
(2) **প্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র** (Peripheral nervous system) ঃ এটি 10 **জোড়া করোটিক নার্ভ** (Cranial nerve) এবং 10 জোড়া **সুষুম্না নার্ভ**

বলে। **রাঙা আলুর** উপরে উৎপন্ন **মূলজ মুকুল** (Radical bud) (চিত্র 11.4) এবং **পাথরকুচির পাতায়** উৎপন্ন **পত্রজ মুকুল** (Epiphyllous bud) সেই কারণেই অস্থানিক মুকুলের পর্যায়ে পড়ে।

দুরন্ত, চা প্রভৃতি গাছের কাণ্ডের কাটা অংশ থেকে পুনরায় মুকুল জন্মায়। এইসব মুকুলও প্রকৃতপক্ষে অস্থানিক। কাক্ষিক মুকুলের উপরে বা পাশে উৎপন্ন এক বা একাধিক মুকুলকে **আনুষঙ্গিক মুকুল** (Accessory bud) বলে (চিত্র 11.5)। প্রথমটি (চিত্র 11.5ক) **উপরিপন্ন** (Superposed) এবং দ্বিতীয়টি (চিত্র 11.5খ) **সমপার্শ্বীয়** (Collateral) মুকুল। **ওয়ালনাটে উপরিপন্ন** এবং **বেগুন, লঙ্কা** প্রভৃতি গাছে **সমপার্শ্বীয়** মুকুল জন্মায়।



চিত্র 11.4—রাঙা আলু।

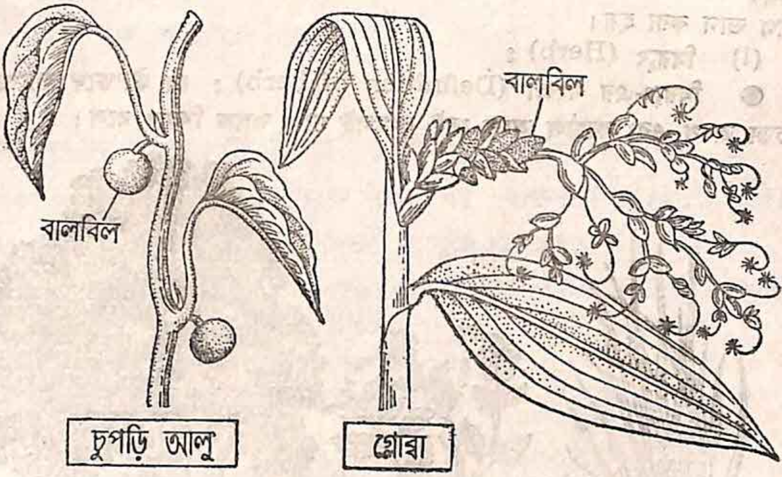


চিত্র 11.5—আনুষঙ্গিক মুকুল ঃ ক—উপরিপন্ন ; খ—সমপার্শ্বীয়।

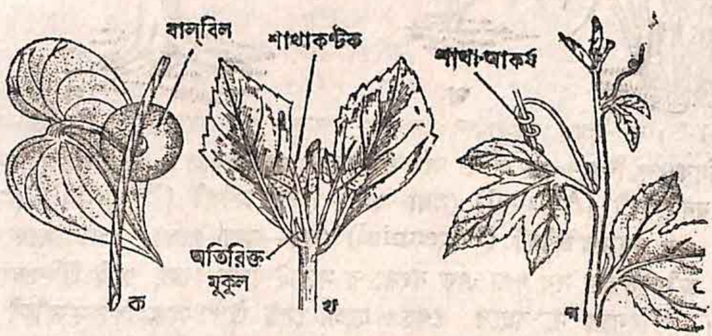
● **রূপান্তরিত মুকুল** বা **মেটামরফসড্ বাড** (Metamorphosed bud) ঃ বিশেষ বিশেষ কাজ করার জন্য মুকুল বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত হ'তে পারে।

প্রয়োজনে মুকুল **বাল্‌বিল** (Bulbil) (যেমন—খামআলু বা চুপড়ি আলু, গেলাব্বা), **শাখা-কণ্টক** (Thorn) (যেমন—বেল, দুরন্ত) ও **শাখা-আকর্ষ** (Tendril) (যেমন—ঝুমকোলতা, কুমড়ো) প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়। কাক্ষিক মুকুলের সামগ্রিক রূপান্তরের ফলে **বাল্‌বিল** উৎপন্ন হয়। পরিণত ও পরিপক্ক বাল্‌বিল কক্ষচ্যুত হ'য়ে মাটির সংস্পর্শে এলে তা থেকে অনুকূল ঋতুতে নতুন

গাছ জন্মায়। শাখা-কণ্টক কাক্ষিক মুকুলের রূপান্তর। এগুলি প্রতিরোধী অঙ্গহিসাবে ব্যবহৃত হয়। এদিকে শাখা-আকর্ষও কাক্ষিক মুকুলের রূপান্তর। শাখা-আকর্ষ উদ্ভিদকে আরোহণে সাহায্য করে।



চিত্র 11·6—বালবিলে রূপান্তরিত মুকুল।



চিত্র 11·6 (A)—বিভিন্ন প্রকার রূপান্তরিত মুকুল : ক—খামআলু (চুপড়ি আলু) ; খ—দুরন্ত ; গ—ঝুমকোলতা।

11.5. কাণ্ডের আকৃতি ও প্রকৃতি [*Size and form of stem*] :

আকৃতি, প্রকৃতি ও গঠনের দিক থেকে কাণ্ড বৈচিত্র্যময়। কাণ্ডের দৈর্ঘ্য 1 সে. মি. থেকে কয়েকশত মিটার ; প্রস্থ একটি ফুলের প্রস্থের অনুরূপ, এমনকি 1.6 মিটার বা তারও বেশী। কাণ্ড নরম বা রসাল, অথবা কঠিন বা কাষ্ঠল।

(Spinal nerve) দ্বারা গঠিত। করোটিক নার্ভ ও সুষুম্না নার্ভ যথাক্রমে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়। কুনো ব্যাঙের 10 জোড়া করোটিক নার্ভ যথাক্রমে—

(1) **অলফ্যাক্টরী** (Olfactory),
(2) **অপটিক** (Optic),
(3) **অকুলোমোটর** (Oculomotor),
(4) **ট্রকলিয়ার** (Trochlear),
(5) **ট্রাইজেমিনাল** (Trigeminal),
(6) **অ্যাবডিউসেন্স** (Abducens),
(7) **ফেসিয়াল** (Facial),
(8) **অডিটরী** (Auditory),
(9) **গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল** (Glossopharyngeal) এবং
(10) **ভেগাস** (Vagus)।

এই নার্ভগুলি **সংবেদ** (Sensory), **চেষ্টীয়** (Motor) এবং **মিশ্র** (Mixed) প্রকৃতির।

কুনো ব্যাঙের 10 জোড়া সুষুম্না নার্ভ মেরুদণ্ডের কশেরুকার ফাঁক থেকে উৎপন্ন হয়। এগুলি মিশ্র প্রকৃতির। কুনো ব্যাঙের প্রান্তীয় নার্ভতন্ত্রটি কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(3) **স্বতঃক্রিয়া নার্ভতন্ত্র** (Autonomic nervous system) ঃ এটি সুষুম্নাকাণ্ডের দু'পাশে সমান্তরালে অবস্থিত দুটি নার্ভরজ্জু দ্বারা গঠিত। প্রতিটি নার্ভরজ্জুতে 10টি **নার্ভগ্রন্থি** (Nerve ganglia) থাকে। প্রতিটি নার্ভগ্রন্থি থেকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নার্ভসূত্র নির্গত হয়। স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড, খাদ্যনালী, মূত্রনালী, ধমনী, শিরা প্রভৃতির অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়।

17.14. কুনো ব্যাঙের জ্ঞানেন্দ্রিয় *[Sense organs of Toad] :*

যে ইন্দ্রিয় গোষ্ঠী মাধ্যমে প্রাণী দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শের অনুভূতি গ্রহণ করে তাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। কুনো ব্যাঙের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি হ'ল **চক্ষু**, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক।

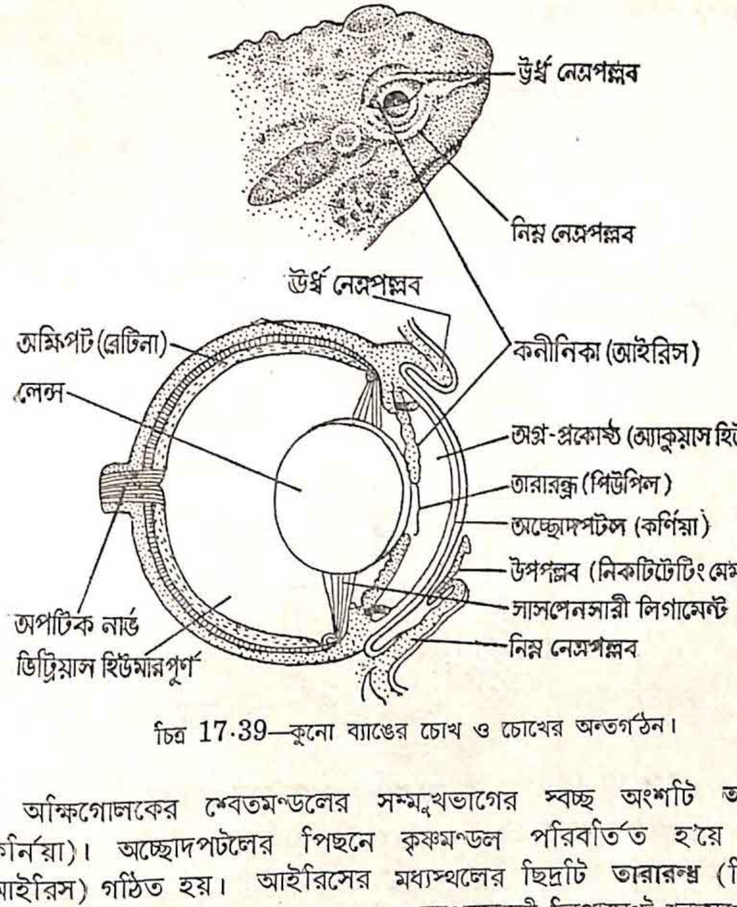
নীচে কুনো ব্যাঙের প্রধান দু'টি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল।

(A) **চোখ** (Eye) ঃ

চোখ কুনো ব্যাঙের দর্শনেন্দ্রিয়। করোটির অক্ষিকোটরে কুনো ব্যাঙের **চোখ** দুটি অবস্থিত। চোখ দু'টি রোমহীন **ঊর্ধ্ব** ও **নিম্ননেত্রপল্লব** এবং **উপপল্লব** দ্বারা সুরক্ষিত। অক্ষিগোলকদ্বয় অক্ষিপেশীর দ্বারা অক্ষিকোটরে সুসংবদ্ধ থাকে।

অক্ষিগোলকের তিনটি স্তর—বাইরের স্তরটি **শ্বেতমণ্ডল** (স্ক্লেরা) (Sclera), মধ্যেরটি **কৃষ্ণমণ্ডল** (কোরইড) এবং ভিতরেরটি **অক্ষিপট** (রেটিনা)।

অক্ষিপটের পিছনে অপটিক নার্ভ যুক্ত থাকে। অক্ষিপটের যে বিন্দুতে অপটিক নার্ভ যুক্ত থাকে সেখানে কোন প্রতিবিম্ব গঠিত হয় না। সেজন্য ঐ স্থানটিকে **অন্ধবিন্দু** বলে।



চিত্র 17·39—কুনো ব্যাঙের চোখ ও চোখের অন্তর্গঠন।

অক্ষিগোলকের শ্বেতমণ্ডলের সম্মুখভাগের স্বচ্ছ অংশটি **অচ্ছোদপটল** (কর্নিয়া)। অচ্ছোদপটলের পিছনে কৃষ্ণমণ্ডল পরিবর্তিত হয়ে **কণীনিকা** (আইরিস) গঠিত হয়। আইরিসের মধ্যস্থলের ছিদ্রটি **তারারন্ধ্র** (পিউপিল)। তারারন্ধ্রের ঠিক পিছনে থাকে **লেন্স**। সাসপেনসারী লিগামেণ্ট লেন্সকে স্বস্থানে ধরে রাখে। লেন্সের পিছনের বৃহৎ প্রকোষ্ঠটি **ভিট্রিয়াস হিউমার**-এ এবং একইভাবে অগ্রপ্রকোষ্ঠটি অ্যাকুয়াস হিউমারে পূর্ণ থাকে।

গঠনগত সাদৃশ্য থাকলেও মানুষের ও ব্যাঙের দর্শন পদ্ধতি ভিন্ন। কুনো ব্যাঙের মস্তিষ্কের দু'পাশে দু'টি চোখ থাকায় একই সময়ে দু'টি চোখে দু' ধরনের প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। একে **একনেত্র দৃষ্টি** (Monocular vision) বলা হয়।

(B) **কান** (Ear) ঃ

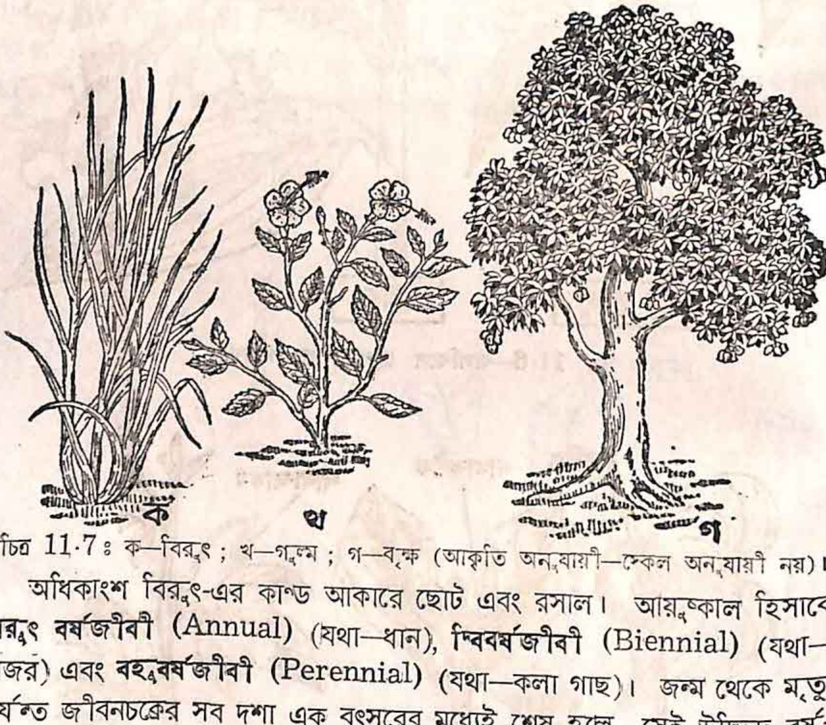
কান কুনো ব্যাঙের শ্রবণেন্দ্রিয়। মস্তকের দু' পাশে চোখের অল্প পিছনে ব্যাঙের কান দু'টি অবস্থিত।

11.6. বিরুৎ, গুল্ম ও বৃক্ষ [*Herb, Shrub and Tree*] :

কাণ্ডের আকৃতি, উচ্চতা এবং কাষ্ঠল অংশের তারতম্যের ভিত্তিতে উদ্ভিদকে **বিরুৎ** (Herb), **গুল্ম** (Shrub) ও **বৃক্ষ** (Tree)—এই তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়।

(i) **বিরুৎ** (Herb) ঃ

● **বিরুৎ-এর সংজ্ঞা** (Definition of herb) ঃ **যে উদ্ভিদে কাণ্ডের উচ্চতা অল্প এবং কাষ্ঠল অংশ নেই বললেই চলে তাকে বিরুৎ বলে।**



চিত্র 11·7 ঃ ক—বিরুৎ ; খ—গুল্ম ; গ—বৃক্ষ (আকৃতি অনুযায়ী—স্কেল অনুযায়ী নয়)।

অধিকাংশ বিরুৎ-এর কাণ্ড আকারে ছোট এবং রসাল। আয়ুষ্কাল হিসাবে **বিরুৎ বর্ষজীবী** (Annual) (যথা—ধান), **দ্বিবর্ষজীবী** (Biennial) (যথা—গাজর) এবং **বহুবর্ষজীবী** (Perennial) (যথা—কলা গাছ)। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনচক্রের সব দশা এক বৎসরের মধ্যেই শেষ হলে, সেই উদ্ভিদ বর্ষজীবী। জীবনচক্র দু'-বছরে শেষ হলে, সেই উদ্ভিদকে দ্বিবর্ষজীবী এবং দু'বছরের বেশী সময় লাগলে সেই উদ্ভিদ বহুবর্ষজীবী। অধিকাংশ গুল্ম ও বৃক্ষ বহুবর্ষজীবী।

(ii) **গুল্ম** (Shrub) ঃ

● **গুল্মের সংজ্ঞা** (Definition of shrub) ঃ **প্রকৃত গুঁড়িহীন মধ্য আকারের কাষ্ঠল উদ্ভিদকে গুল্ম* বলে।**

মাটি-সংলগ্ন অংশ থেকে বা মাটির সামান্য ওপর থেকে গুল্মের কাণ্ড একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। যেমন—জবা, গন্ধরাজ ইত্যাদি।

* মাটির সামান্য উপরে গুল্ম শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে যায়।

(iii) বৃক্ষ (Tree) ঃ

● **বৃক্ষের সংজ্ঞা** (Definition of Tree) ঃ **কাষ্ঠল ও প্রকৃত গুঁড়ি-বিশিষ্ট দীর্ঘ উদ্ভিদকে বৃক্ষ বলে।**

যেমন—**আম, শাল** ইত্যাদি।

11.7. সবল কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ *[Plants with strong stem]* :

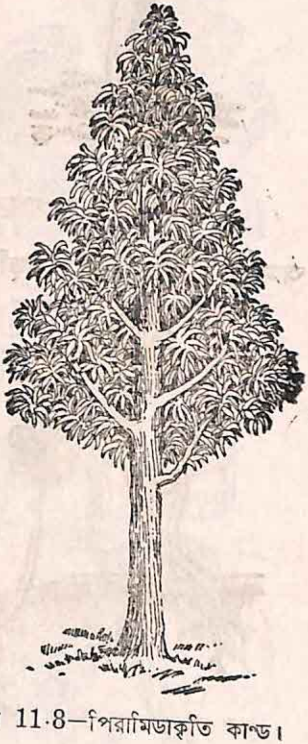
কাষ্ঠল অংশ কম থাকলে কাণ্ড দুর্বল হয়, কাষ্ঠল অংশ বেশী থাকলে কাণ্ড সবল হয়। সবল কাণ্ডের উদ্ভিদ প্রধানতঃ চার প্রকার ঃ—

(1) **পিরামিডাকৃতি** বা **এক্সকারেণ্ট** (Excurrent)—যেমন, **দেবদারু,** পাইন ইত্যাদি। এখানে গুঁড়ির উপরের অংশ থেকে ক্রমশঃ ছোট শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন হয়, ফলে গাছটিকে পিরামিডের মতো দেখায় (চিত্র 11.8)।

(2) **গম্বুজাকৃতি** বা **ডেলিকোয়েসেণ্ট** (Deliquescent)—অনির্দিষ্ট কাল বাড়তে পারে না এমন কাণ্ড যদি দ্রুত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়, তবে গাছটিকে গম্বুজের মত দেখায়। এই জাতীয় গাছকে **গম্বুজাকৃতি** বা **ডেলিকোয়েণ্ট** বলে (চিত্র 11.9)। যেমন—**বট, কাঁঠাল, আম** ইত্যাদি।

(3) **অশাখকাণ্ড** বা **কডেক্স** (Caudex)—শাখা-প্রশাখাহীন দৃঢ়, স্তম্ভাকার লম্বা কাণ্ডকে **অশাখকাণ্ড** বা **কডেক্স** বলে। যেমন—**তাল, সুপারি, নারিকেল** (চিত্র 11.9খ) ইত্যাদি।

(4) **তৃণকাণ্ড** বা **কাম** (Culm)—শাখা-প্রশাখাযুক্ত কঠিন বা নিরেট পর্ব ও ফাঁপা পর্বমধ্যযুক্ত কাণ্ডকে **তৃণকাণ্ড** বা **কাম** বলা হয়। যেমন—**বাঁশ।**

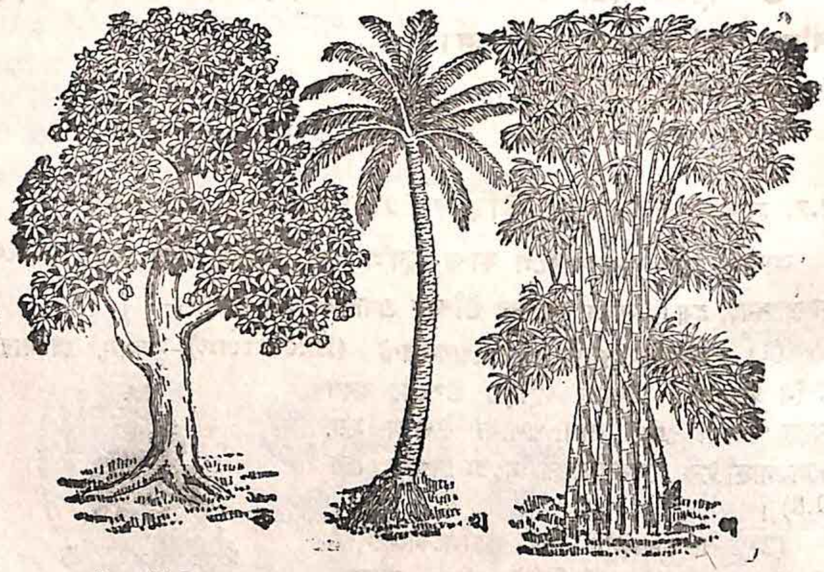


চিত্র 11.8—পিরামিডাকৃতি কাণ্ড।

11.8. দুর্বল কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ *[Plants with weak stem]* :

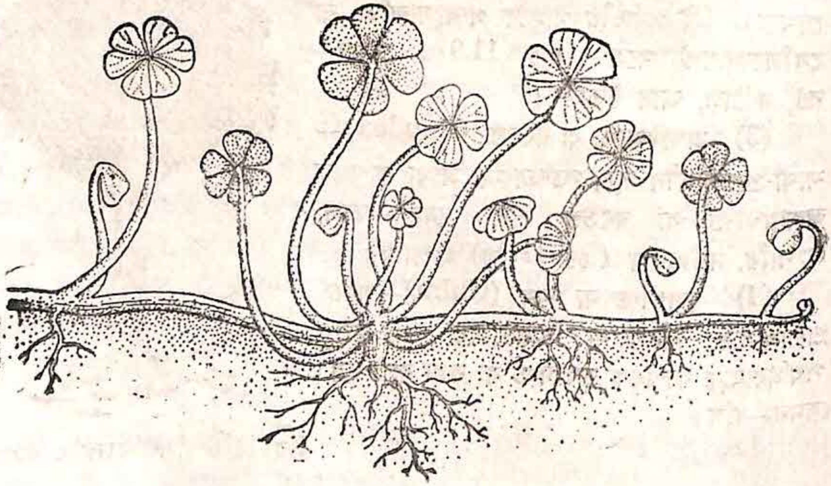
অধিকাংশ বিরুৎ-এর কাণ্ড দুর্বল। কাণ্ড দুর্বল হলে তা মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে অথবা আলোর সন্ধানে কোন-না-কোন অবলম্বনকে জড়িয়ে

উপরের দিকে উঠতে চায়। প্রথমটিকে **ব্রততী** বা **ক্রিপার** (Creeper) এবং শেষেরটিকে **রোহিণী** বা **ক্লাইম্বার** (Climber) বলে। দূর্বাঘাস, থানকুনি,



চিত্র 11.9ঃ ক—গম্বুজাকৃতি কাণ্ড ; খ—অশাখকাণ্ড ; গ—তৃণকাণ্ড।

আমরুল (চিত্র 11.10) প্রভৃতি হল ব্রততী ; মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে চলার

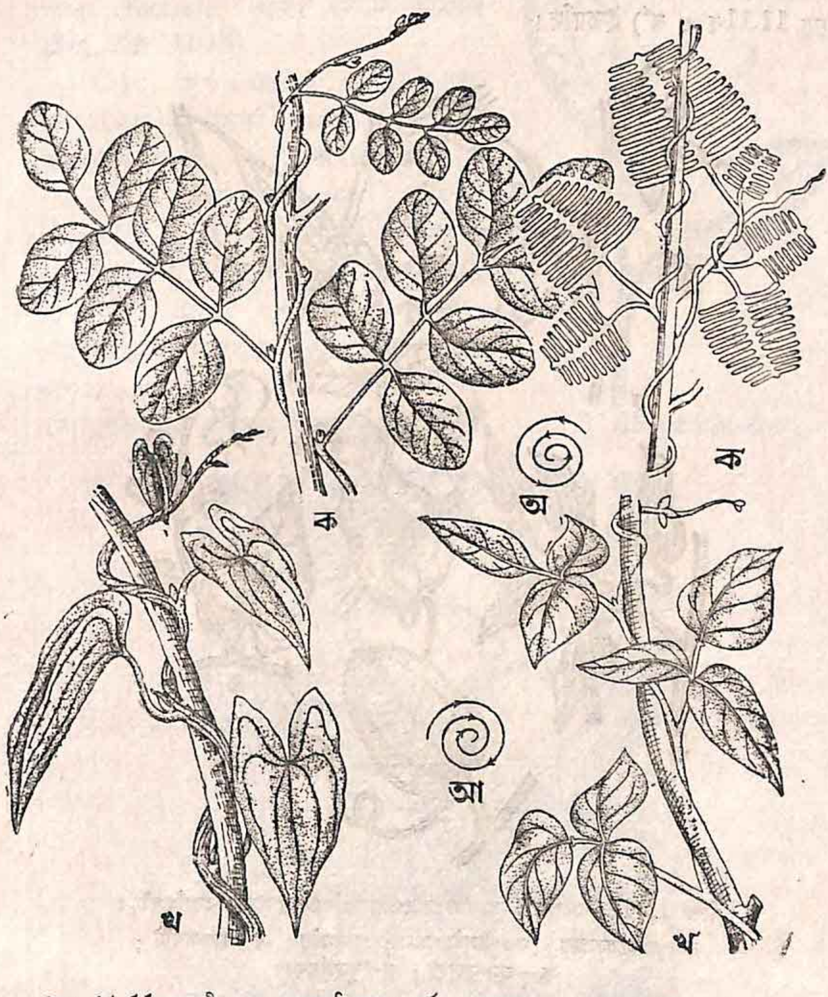


চিত্র 11.10—ব্রততী (আমরুল)।

সময় ব্রততীর পর্ব থেকে অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। লাউ, কুমড়ো, অপরাজিতা প্রভৃতি হ'ল রোহিণী।

11.9. বিভিন্ন প্রকার রোহিণী *[Different types of climber] :*

● রোহিণীর সংজ্ঞা (Definition of climber) ঃ দুর্বল কাণ্ডের যে উদ্ভিদ অবলম্বনকে জড়িয়ে ধরে ঊর্ধ্বে আরোহণ করে তাকে রোহিণী বলে। রোহিণী নানা প্রকার, যেমন—

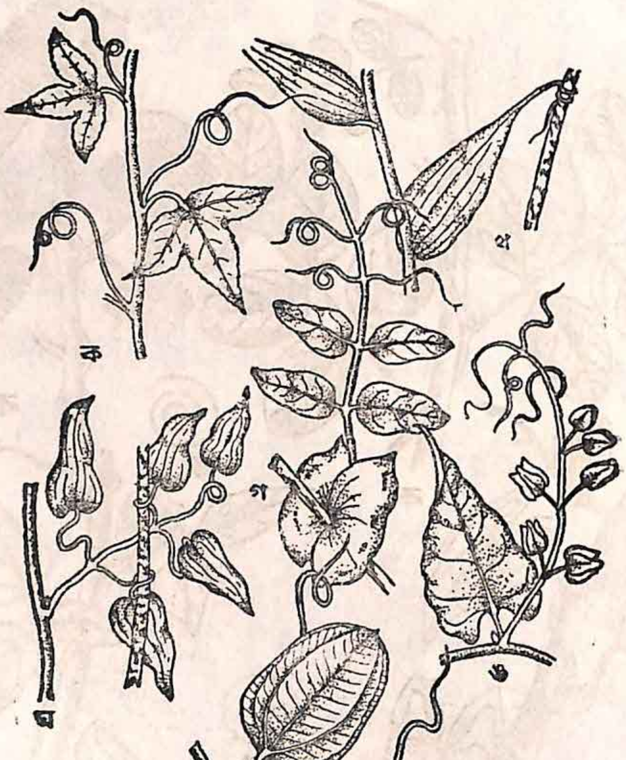


চিত্র 11·11—বল্লী ঃ ক—অপরাজিতা ; ক'—তরুলতা ; খ—খামআলু ; খ'—সীম।

(1) বল্লী (Twiner)—যে সব দুর্বল কাণ্ডের উদ্ভিদ নিজ নিজ কাণ্ডের সাহায্যে অবলম্বনকে জড়িয়ে উপরে ওঠে তাদের বল্লী বলে। বল্লী দু'প্রকার—

(i) **বামাবর্ত** বা **সিনিসট্রোর্স** (Sinistrorse)—এই জাতীয় রোহিণীর কাণ্ড ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে অর্থাৎ ডানদিকে থেকে বাঁদিকে ঘোরে। যেমন—**অপরাজিতা, তরুলতা** (চিত্র 11.11ক ও ক′) ইত্যাদি।

(ii) **দক্ষিণাবর্ত** বা **ডেক্সট্রোর্স** (Dextrorse)—এই জাতীয় রোহিণীর কাণ্ড ঘড়ির কাঁটার মত বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঘোরে। যেমন—**খামআলু, সীম** (চিত্র 11.11খ ও খ′) ইত্যাদি।



চিত্র 11·12—কয়েকটি দুর্বল কাণ্ডের উদ্ভিদ (আকর্ষ-রোহিণী)ঃ
ক—ঝুমকোলতা ; খ—উলটচণ্ডাল ; গ—মটর ; ঘ—ছাগলবটি ;
ঙ—অনন্তলতা ; চ—কুমারিকা।

(2) **মূল-রোহিণী** (Root-climber)—রোহিণী যখন অস্থানিক মূলের সাহায্যে আরোহণ করে। যেমন—**পান, গজপিপুল** (চিত্র 10.10) ইত্যাদি।

(3) **আকর্ষ-রোহিণী** (Tendril-climber)—রোহিণী যখন দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে উৎপন্ন আকর্ষ দ্বারা আরোহণ করে। যেমন—**ঝুমকোলতা, কুমড়ো, মটর, উলটচণ্ডাল, ছাগলবটি, কুমারিকা, অনন্তলতা** (চিত্র 11.12) ইত্যাদি।

(4) **অঙ্কুশ-রোহিণী** (Hook-climber) —রোহিণী যখন অঙ্কুশ দ্বারা আরোহণ করে। যেমন—**কাঁঠালি চাঁপা** (চিত্র 11.13)।

(5) **কণ্টক-রোহিণী** (Thorn-climber)—রোহিণী যখন কাঁটার সাহায্যে আরোহণ করে। যেমন—**বাগানবিলাস**।

(6) **কাষ্ঠললতা** বা **লায়ানেস** (Lianes) বা **লায়ানাস** (Lianas)—**কাঞ্চনলতা** বা **মাধবীলতা** কঠিন কাণ্ডের রোহিণী। সুউচ্চ বৃক্ষশীর্ষে অবলীলাক্রমে আরোহণ করবার পর এদের কাণ্ড কাষ্ঠল ও স্থূল হয়। এই ধরনের রোহিণীকে কাষ্ঠললতা (চিত্র 11.14) বলে।



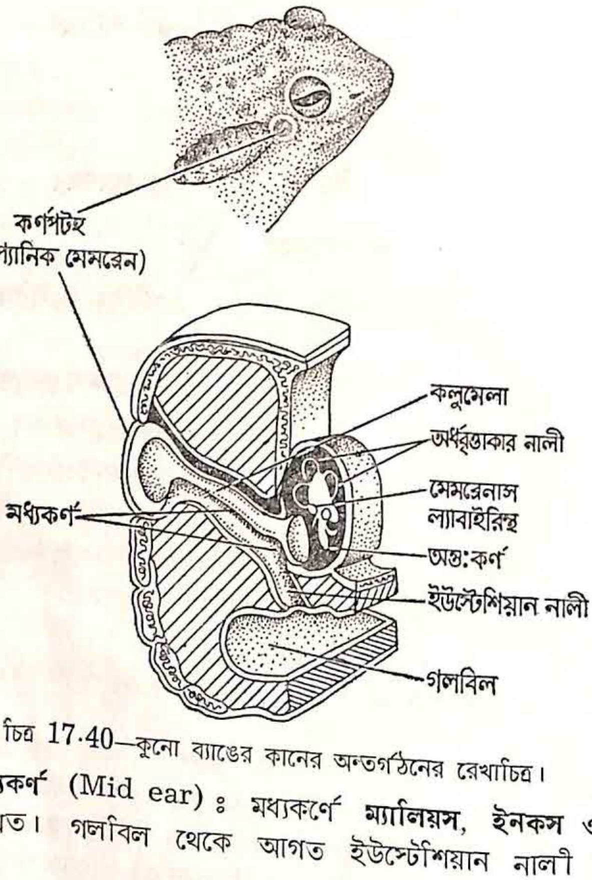
চিত্র 11·13—কাঁঠালি চাঁপা।



চিত্র 11·14—লায়ানাস বা কাষ্ঠললতা।

কুনো ব্যাঙের কর্ণছত্র (Pinna) নাই। কুনো ব্যাঙের কান তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা—বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ।

(i) **বহিঃকর্ণ** (External ear) ঃ এটি **কর্ণপটহ** (Tympanic membrane) দ্বারা গঠিত।



চিত্র 17.40—কুনো ব্যাঙের কানের অন্তর্গঠনের রেখাচিত্র।

(ii) **মধ্যকর্ণ** (Mid ear) ঃ মধ্যকর্ণে **ম্যালিয়স, ইনকস ও স্টেপিস** অস্থিত্রয় অবস্থিত। গলবিল থেকে আগত ইউস্টেশিয়ান নালী মধ্যকর্ণের সঙ্গে যুক্ত।

(iii) **অন্তঃকর্ণ** (Internal ear) ঃ এটি মেমব্রেনাস ল্যাবাইরিন্থ, অর্ধবৃত্তাকার নালী, ইউট্রিকুলস প্রভৃতি অংশগুলি নিয়ে গঠিত।

কুনো ব্যাঙের কান শ্রবণেন্দ্রিয় হিসাবে কাজ করা ছাড়াও দেহের ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে।

কুনো ব্যাঙের বিভিন্ন তন্ত্র ব্যবচ্ছেদ ও পর্যবেক্ষণ 18

[Dissection and observation of different systems of Toad]

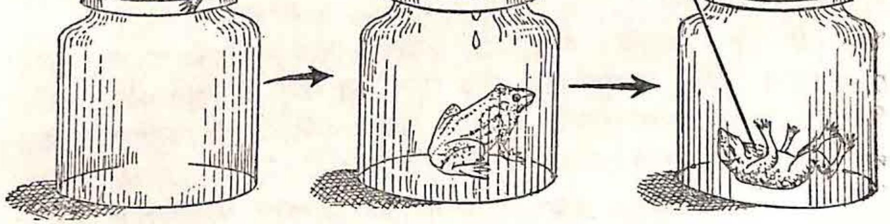
18.1. কুনো ব্যাঙের ব্যবচ্ছেদ *[Dissection of Toad]* :

(A) **ব্যবচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ** (Requisites for dissection) ঃ

(i) একটি জীবন্ত কুনো ব্যাঙ।
(ii) ডিসেকটিং বক্স।
(iii) একটি ঢাকনাযুক্ত কাচের জার।
(iv) ক্লোরোফর্ম।
(v) জল।
(vi) আলপিন।
(vii) একটি ডিসেকটিং ট্রে।

(B) **কুনো ব্যাঙকে সংজ্ঞাহীন করার পদ্ধতি** (Process of anaesthesia of Toad) ঃ

একটি ঢাকনাযুক্ত কাচের জার নিয়ে তাতে একটি জীবন্ত কুনো ব্যাঙ



চিত্র 18·1—ক্লোরোফর্মের সাহায্যে কুনো ব্যাঙকে সংজ্ঞাহীন করার পদ্ধতি।

রেখে তাতে কয়েক ফোঁটা ক্লোরোফর্ম দিয়ে ঢাকনাটি বন্ধ করা হ'ল। এতে অলপ-ক্ষণ পরে ব্যাঙটি সংজ্ঞাহীন হয় (চিত্র 18·1)।

(7) **অ্যাডহেসিভ রোহিণী** (Adhesive climber)—এই জাতীয় রোহিণীর কান্ড থেকে উৎপন্ন আকর্ষের অগ্রভাগ আঠাল, চ্যাপ্টা চাকতিতে রূপান্তরিত হয়। আঠাল চাকতিগুলি দৃঢ়ভাবে অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে, ফলে রোহিণী ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠে যায়। এই ধরনের উদ্ভিদকে **অ্যাডহেসিভ রোহিণী** বলে।



চিত্র 11.14A—অ্যাডহেসিভ রোহিণী।

11.10. পরবর্তিত কাণ্ড [*Modified stem*] :

প্রয়োজনে মূলের মতো কান্ডের আকৃতি-প্রকৃতিতেও পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তিত অবস্থাতেও সেখানে কান্ডের চরিত্রগত লক্ষণগুলি প্রচ্ছন্নভাবে থেকে যায়। সেই লক্ষণগুলি দেখে অংগটিকে কান্ড বলে চেনা সম্ভব। বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তিত কান্ড সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হল :

(*A*) মৃৎগত বা ভূনিম্নস্থ পরিবর্তিত কাণ্ড [*Underground modified stem*] :

● **মৃৎগত পরিবর্তিত কান্ডের সংজ্ঞা** (Definition of modified underground stem) : **কান্ড বা কান্ডাংশ পরিবর্তিত হয়ে মাটির মধ্যে বাড়তে থাকলে তাকে মৃৎগত পরিবর্তিত কান্ড বলে।**

● **মৃৎগত পরিবর্তিত কান্ডের কান্ড-চরিত্র** (Stem nature of underground modified stem) :

(i) পর্ব ও পর্বমধ্য বর্তমান।

(ii) কাক্ষিক মুকুল বা অগ্রমুকুল থাকে।

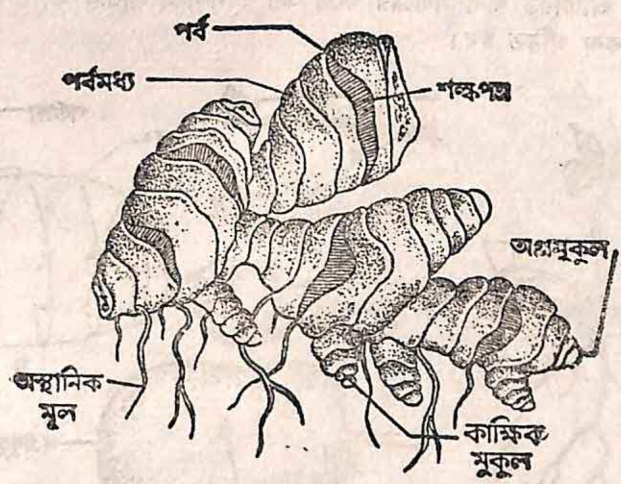
(iii) অন্তত শল্কপত্র হিসাবেও পাতা উপস্থিত।

নীচে বিভিন্ন প্রকার মৃৎগত কান্ডের বর্ণনা দেওয়া হল :

(1) **গ্রন্থিকান্ড বা রাইজোম** (Rhizome) : (চিত্র 11.15) :

(i) এটি একপ্রকার মৃৎগত রসালো কান্ড—এটি মাটির নীচে অনুভূমিকভাবে বর্ধিত হয়।

(ii) এই প্রকার কাণ্ডে **সুস্পষ্ট পর্ব** ও **পর্বমধ্য** বর্তমান এবং পর্ব থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **শল্কপত্র** (scale leaf) নির্গত হয়। শল্কপত্র প্রকৃতপক্ষে রূপান্তরিত পত্র।



চিত্র 11·15—গ্রন্থিকাণ্ড (আদা)।

(iii) শল্কপত্রের কক্ষ থেকে **কাক্ষিক মুকুল** জন্মায় ; পরে সেই কাক্ষিক মুকুল শাখায় পরিবর্তিত হয়।

(iv) শাখা-প্রশাখায় উৎপন্ন অগ্রমুকুল মাটির উপরে **বায়বীয় কাণ্ড** (aerial stem) গঠন করে এবং উপযুক্ত সময়ে তাতে ফুল ফোটে।

(v) বৃদ্ধির অনুপযুক্ত ঋতুতে মাটির উপরের বিস্তার শুকিয়ে যায়।

(vi) গ্রন্থিকাণ্ডে পর্বের নিম্নাংশ থেকে প্রচুর অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়।

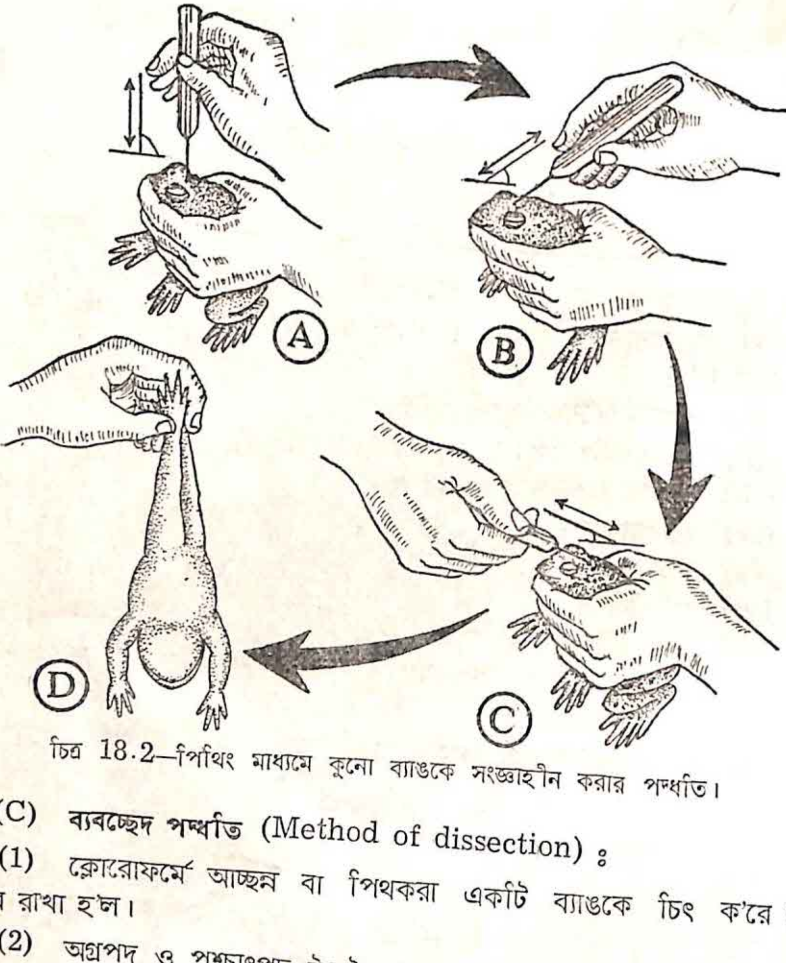
(vii) মানকচুর গ্রন্থিকাণ্ড কখনও কখনও মাটির উপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এরূপ গ্রন্থিকাণ্ডকে **মূলাকার কাণ্ড** বা **রুট-স্টক** (Root-stock) বলে।

উদাহরণ : আদা ও হলুদ।



চিত্র 11·16—মানকচুর মূলাকার কাণ্ড।

ক্লোরোফর্ম না পেলে পিথিং পদ্ধতিতেও ব্যাঙকে সংজ্ঞাহীন করা চলে (চিত্র 18.2)।



চিত্র 18.2—পিথিং মাধ্যমে কুনো ব্যাঙকে সংজ্ঞাহীন করার পদ্ধতি।

(C) **ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি** (Method of dissection) ঃ

(1) ক্লোরোফর্মে আচ্ছন্ন বা পিথকরা একটি ব্যাঙকে চিৎ ক'রে ট্রের উপরে রাখা হ'ল।

(2) অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদ টানটান ক'রে ট্রের মোমের সঙ্গে সেগুলিকে আটকে দেওয়া হ'ল।

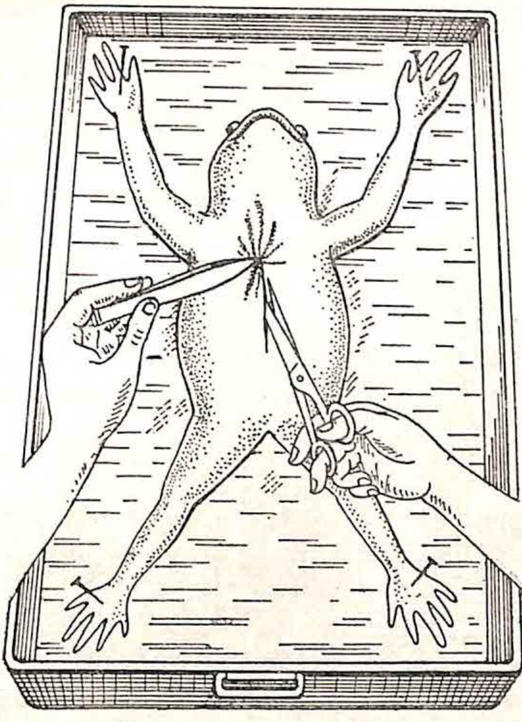
(3) ট্রেতে পরিমিত জল ঢেলে ফরসেপ দিয়ে ব্যাঙের বুকের চামড়া টেনে তোলা হ'ল। তারপর বড় কাঁচি দিয়ে ছিদ্র ক'রে ঐ ছিদ্রে কাঁচির ভোঁতা দিকটি ঢুকিয়ে প্রথমে অঙ্কীয় মধ্যরেখা বরাবর এবং পরে পশ্চাৎপদ ও অগ্রপদ বরাবর চামড়া কেটে ফেলা হ'ল (চিত্র 18.3)।

(4) চামড়া টেনে দেহের দু'ধারে টানটান ক'রে আলপিনের সাহায্যে আটকে দেওয়া হ'ল।

(5) অঙ্কীয় মধ্যরেখা বরাবর পেশীস্তরে যে দাগ দেখা যায় সেই দাগ বরাবর পেশীস্তর কেটে দু'পাশের পেশীস্তরকে চামড়ার মতো একইভাবে

টানটান ক'রে আলপিনের সাহায্যে ট্রের মোমে আটকে দেওয়া হ'ল। অথবা পেশীস্তর যথাসম্ভব কেটে বাদ দেওয়া হ'ল।

(6) এইভাবে উন্মুক্ত দেহগহ্বরে আন্তরযন্ত্র ও বিভিন্ন তন্ত্র দৃষ্টিগোচর হয়।



চিত্র 18·3—ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতির শুরুতে।

18.2. কুনো ব্যাঙের আন্তরযন্ত্র বা ভিসেরা ব্যবচ্ছেদ ক'রে বিভিন্ন যন্ত্র পর্যবেক্ষণ [*Dissection of the general viscera of a toad and observation of various organs*] :

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে দেহগহ্বর উন্মুক্ত করলে নিম্নলিখিত অংগগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

● **পর্যবেক্ষণ** (Observation) ঃ

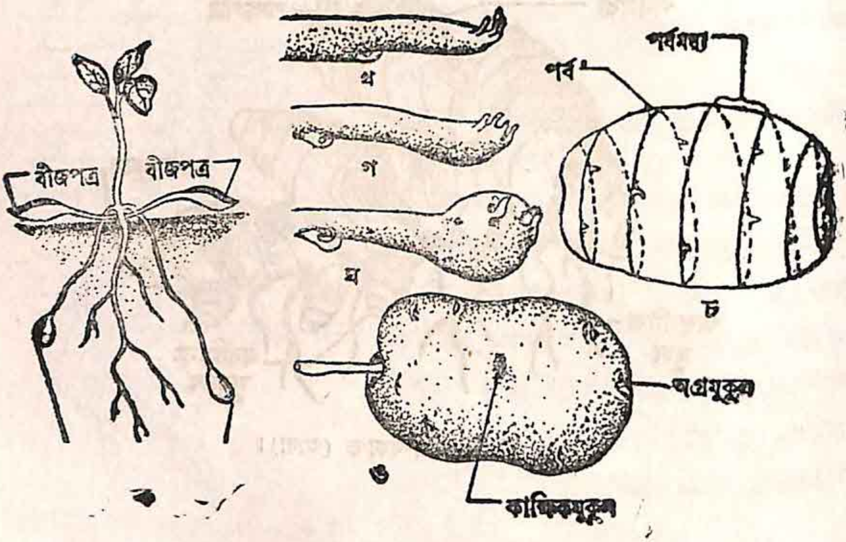
(1) দেহগহ্বরের সামনের দিকে ত্রিকোণাকার **হৃৎপিণ্ডটি** (Heart) পেরিকার্ডিয়ম থলির মধ্যে অবস্থিত।

(2) হৃৎপিণ্ডের দু'পাশে কিছুটা নীচে তিনখণ্ডে বিভক্ত বাদামী রং-এর যকৃৎ বিদ্যমান। মধ্যখণ্ডে গোলাকার **পিত্তাশয়** (Gall bladder) বর্তমান।

(2) **স্ফীতকন্দ** বা **টিউবার** (Tuber) ঃ

(i) এটি একপ্রকার **মৃৎগত পরিবর্তিত কাণ্ড** এবং **স্ফীতকন্দ** বা **স্থূলকন্দ** বা **টিউবার** নামে পরিচিত।

(ii) অতিরিক্ত খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে এর ভূনিম্নস্থ শাখার অগ্রভাগ স্ফীত হয়ে স্ফীতকন্দ গঠিত হয়।



চিত্র 11·17—স্ফীতকন্দ (গোলআলু)ঃ ক—আলুগাছে অপরিণত স্ফীতকন্দ ; খ-ঙ—স্ফীতকন্দ গঠনের বিভিন্ন দশা ; চ—স্ফীতকন্দে পর্ব ও পর্বমধ্যের অবস্থান।

(iii) স্ফীতকন্দে যথারীতি **পর্ব ও পর্বমধ্য বর্তমান।**

(iv) স্ফীতকন্দের যে স্থানগুলিতে **মুকুল** জন্মায় সেই স্থানগুলিকে **পর্ব** বলে।

(v) অপরিণত অবস্থায় পর্বে শল্কপত্র থাকে, কিন্তু পরিণত স্ফীতকন্দ থেকে শল্কপত্র ঝরে গিয়ে পত্রক্ষতের সৃষ্টি হয়।

(vi) পর্বে অবনমিত পত্রক্ষত-সহ কাক্ষিক মুকুলগুলিকে **'চোখ'** বলে।

(vii) কখনও কখনও স্ফীতকন্দে অস্থানিক মূল জন্মায়।

উদাহরণ ঃ **আলু** (Potato)।

(3) **গুঁড়িকন্দ, গুটিকাকন্দ** বা **কর্ম** (Corm) ঃ

(i) গুঁড়িকন্দ সর্ববৃহৎ মৃৎগত পরিবর্তিত কাণ্ড।

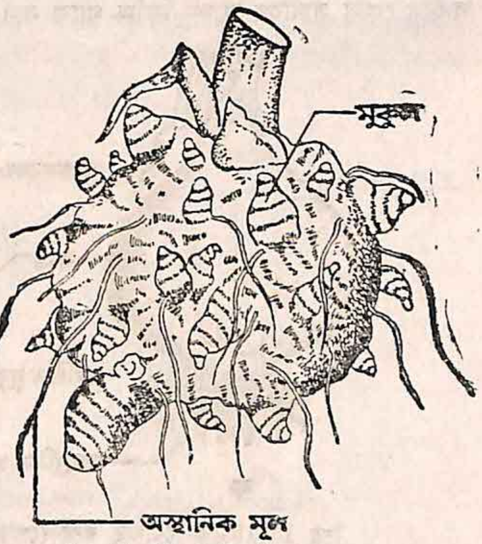
(ii) এটি খাড়াভাবে বর্ধিত হয়।

(iii) মৃৎগত কাণ্ডটিতে **পর্ব ও পর্বমধ্য** বিদ্যমান।

(iv) পর্বে সময় বিশেষে **শল্কপত্র** লক্ষ্য করা যায়।

(v) পর্ব থেকে **মুকুল** (Bud) জন্মায়, অর্থাৎ মুকুলগুলি অপত্য গুঁড়িকন্দ।

(vi) এই ধরনের পরিবর্তিত কাণ্ডের বিভিন্ন স্থান থেকে **অস্থানিক মূল** উৎপন্ন হয়।



চিত্র 11·18—গুঁড়িকন্দ (ওল)।

(4) **কন্দ বা বালব্** (Bulb) ঃ

(i) কন্দ সবচেয়ে ছোট পরিবর্তিত মৃৎগত কাণ্ড।

(ii) কাণ্ডটি সংকুচিত হয়ে ক্ষুদ্রাকার উত্তল চাকতির আকার লাভ করে।

(iii) **পর্ব ও পর্বমধ্য** বর্তমান। তবে অত্যধিক সংকুচিত হওয়ার জন্য সেগুলি **অস্পষ্ট থেকে যায়।**

(iv) কন্দে কাণ্ডের খাদ্য আদৌ সঞ্চিত হয় না।

(v) পর্ব থেকে উৎপন্ন **শল্কপত্রগুলিতে খাদ্য সঞ্চিত হয় বলে সেগুলিকে রসাল শল্কপত্র** (Fleshy scale leaf) **বলে।**

(vi) শল্কপত্র একের পর এক কাণ্ডকে বেষ্টন করে থাকে।

(vii) শলপপত্রগুলির কক্ষ থেকে যথারীতি **কাক্ষিক মুকুল** জন্মায়। মুকুলগুলি অপত্য কন্দে রূপান্তরিত হয়।

(viii) সংকুচিত কাণ্ডের নিম্নাংশ থেকে অস্থানিক মূল (**গুচ্ছমূল**) উৎপন্ন হয়।

(ix) অগ্রমুকুল অনুকূল পরিবেশে বায়বীয় বিটপ গঠন করে।

কন্দ দু' প্রকার ঃ

(1) **বেষ্টিত কন্দ** বা **টিউনিকেটেড বাল্ব** (Tunicated bulb)—শল্কপত্রগুলি পর্যায়ক্রমে একটির পর একটিকে বেষ্টন করে। তাছাড়া একটি শল্কঝিল্লী (Tunic) শল্কপত্রগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে রাখে। উদাহরণ—**পেঁয়াজ** (চিত্র 11.19), **রসুন**।

(3) হৃৎপিণ্ডের দু'পাশে গোলাপী বর্ণের স্পঞ্জের মতো ফুসফুস অবস্থিত।

(4) পৌষ্টিকতন্ত্র মুখ থেকে শুরু হ'য়ে প্রথমে গ্রাসনালী (Oesophagus) ও পরে স্ফীত **পাকস্থলী** (Stomach) গঠন করে। পাকস্থলীর



চিত্র 18.4—কুনো ব্যাঙের ব্যবচ্ছেদিত আন্তরযন্ত্র।

উপরের 'U' আকৃতির অংশ **ডিওডেনম** (Duodenum)। এখানেই ফিকে হলুদবর্ণের **অগ্ন্যাশয়** (Pancreas) অবস্থিত। গ্রহণীর পরের **ইলিয়ম**

(Ileum) অংশটি মেসেনটারী পর্দার মধ্যে পেঁচিয়ে থাকে। এর পরের অংশটি **বৃহদন্ত্র** (Large intestine)। বৃহদন্ত্রের শেষাংশ **মলাশয়** (Rectum) ও **অবসারণী** (Cloaca)। অবসারণী দেহের শেষ প্রান্তে আড়া-আড়িভাবে বিন্যস্ত অবসারণী ছিদ্রে উন্মুক্ত।

(5) পাকস্থলীর নিকটে গাঢ় লাল বর্ণের গোলাকার গ্রন্থিটি **প্লীহা** (Spleen)।

(6) উদর-গহ্বরে বাদামী রং-এর সীমবীজাকৃতি অংগটি **বৃক্ক** (Kidney)। বৃক্কের অগ্রভাগে হলুদ বর্ণের আঙুলের মতো অংগ **মেদপুঞ্জ** (Fat bodies) অবস্থিত। বৃক্ক থেকে **গবিনী** (Ureter) উৎপন্ন হ'য়ে **মূত্রস্থলীতে** (Urinary bladder) শেষ হয়েছে।

(7) পুং ব্যাঙের মেদপুঞ্জের নীচে **শুক্রাশয়** (Testes) অবস্থিত। তার উপরে যুক্ত **বিডার-এর অংগ** (Bidder's organs)।

(8) পরিণত স্ত্রী ব্যাঙের থলথলে বৃহদাকার **ডিম্বাশয়** (Ovary) কাল রং-এর। ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন **ডিম্বনালী** (Oviduct) নীচে নেমে এসেছে।

(9) স্ফীত হরতনাকার **মূত্রস্থলীটি** অবসারণী ছিদ্রে মুক্ত।

● **প্রয়োজনমতো কয়েকবার ট্রের জল পাল্টে পিনফ্ল্যাগ দিয়ে উল্লিখিত অংগগুলি নির্দেশ কর। ব্যবচ্ছেদিত ব্যাঙের সমস্ত আন্তরযন্ত্রের ছবি এঁকে লেবেল কর।**

18.3. কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র ব্যবচ্ছেদ এবং বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ *[Dissection of alimentary system of toad and observation of its different parts] :*

(1) পূর্ব নির্দেশমতো একটি সংজ্ঞাহীন ব্যাঙের দেহগহ্বর উন্মুক্ত ক'রে ট্রেতে সেটিকে যথারীতি আটকে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, বৃক্ক, মূত্রস্থলী, জনন অংগ প্রভৃতি কেটে বাদ দেওয়া হ'ল।

● **পর্যবেক্ষণ** (Observation) :

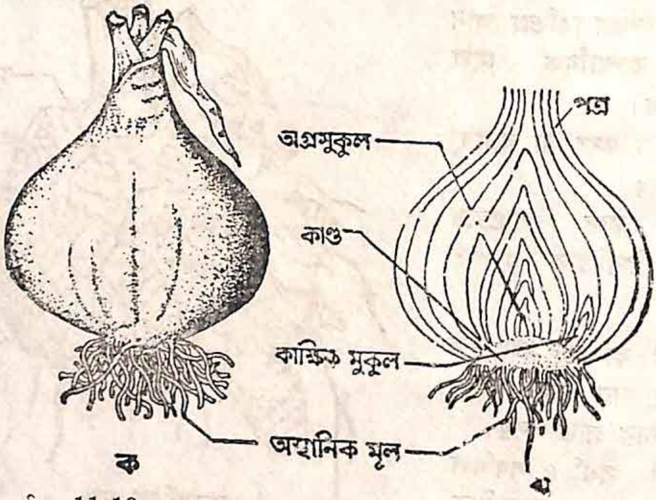
(2) মুখবিবরের শেষ প্রান্ত থেকে **গ্রাসনালী** শুরু হ'য়েছে।

(3) **যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, পিত্তাশয়** প্রভৃতি অংগগুলি তুলির সাহায্যে পরিষ্কার করা হ'ল।

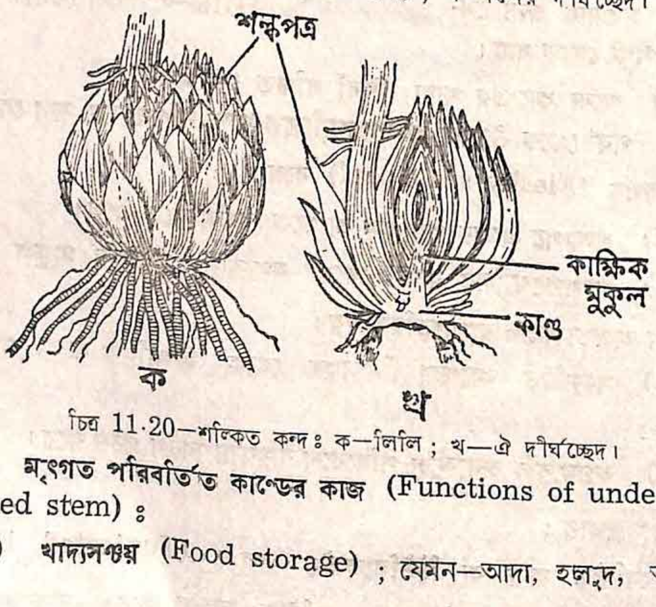
(4) গ্রাসনালীর পরের অংশের স্থূলকায় এবং প্রশস্ত থলিটি **পাকস্থলী**।

(5) পাকস্থলীর পরবর্তী অংশ **ক্ষুদ্রান্ত্র**। মেসেনটারী পর্দা কেটে ক্ষুদ্রান্ত্রের গোটানো অংশ খুলে দেওয়া হ'ল। পাকস্থলীর সংগে 'U' আকৃতির

(2) **শল্কিত কন্দ বা স্কেলি বাল্‌ব** (Scaly bulb)—শল্কিত কন্দের শল্কপত্রগুলি অনিয়মিত ও আংশিকভাবে কাণ্ডকে বেষ্টন করে থাকে এবং বাইরে কোন সাধারণ শুষ্ক ঝিল্লি থাকে না। উদাহরণ—লিলি (চিত্র 11.20)।



চিত্র 11·19—ক—বেষ্টিত কন্দ (পেঁয়াজ) ; খ—কন্দের দীর্ঘচ্ছেদ।



চিত্র 11·20—শল্কিত কন্দঃ ক—লিলি ; খ—ঐ দীর্ঘচ্ছেদ।

● **মৃৎগত পরিবর্তিত কাণ্ডের কাজ** (Functions of underground modified stem) ঃ

(1) **খাদ্যসঞ্চয়** (Food storage) ; যেমন—আদা, হলুদ, আলু, ওল প্রভৃতি।

(2) **অঙ্গজ-জনন** (Vegetative reproduction) বা মুকুলের সাহায্যে বংশ-বিস্তার ; যেমন—আলু, ওলের মুখী প্রভৃতি।

(3) **প্রতিকূলজীবিতা** (Perennation), অর্থাৎ প্রতিকূল অবস্থাতেও জীবিত থাকার ক্ষমতা। যেমন—আদা, হলুদ. মানকচু ইত্যাদি।

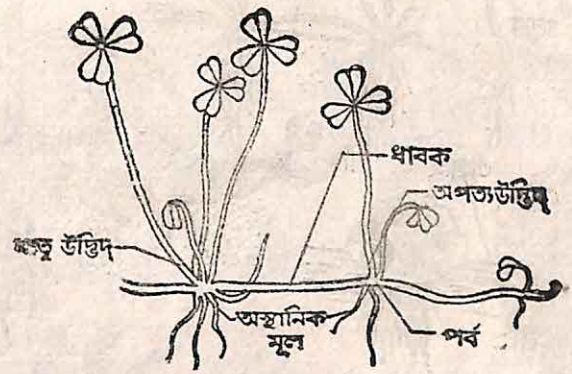
(B) . অর্ধ-বায়বীয়): পরিবর্তিত কাণ্ড [*Sub-aerial modified stem*] :

প্রধানতঃ অঙ্গজ-জননের সুবিধার জন্য কতকগুলি কাণ্ড ভূমি-সংলগ্ন অবস্থায় মাটির সমান্তরালে বর্ধিত হয়।

● **অর্ধ-বায়বীয় পরিবর্তিত কাণ্ডের সংজ্ঞা** (Definition of sub-aerial modified stem) ঃ অঙ্গজজননের সুবিধার জন্য যে সব কাণ্ড মাটির সামান্য উপরে বা নীচে বৃদ্ধি পায় তাদের অর্ধ-বায়বীয় পরিবর্তিত কাণ্ড বলে।

অর্ধবায়বীয় পরিবর্তিত কাণ্ড নিম্নলিখিত চার প্রকার ঃ—

(i) **ধাবক বা রানার** (Runner) ঃ আমরুল, শুষনি প্রভৃতি গাছে



চিত্র 11·21—রানার বা ধাবক (আমরুল)।

সরু দীর্ঘ পর্বমধ্যযুক্ত শাখাগুলিকে **ধাবক** বা **রানার** (Runner) (চিত্র 11.21) বলে। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর ধাবকের অগ্রভাগে প্রথমে অস্থানিক মূল ও পরে বায়ব-বিটপ গঠিত হয়। পাতার কক্ষ থেকে উৎপন্ন শাখা একই পদ্ধতিতে মাতৃ-উদ্ভিদের চারিদিকে বিস্তৃত হয়। বিচ্ছিন্ন হবার পর ঐ শাখাগুলিই নতুনভাবে জীবন শুরু করে।

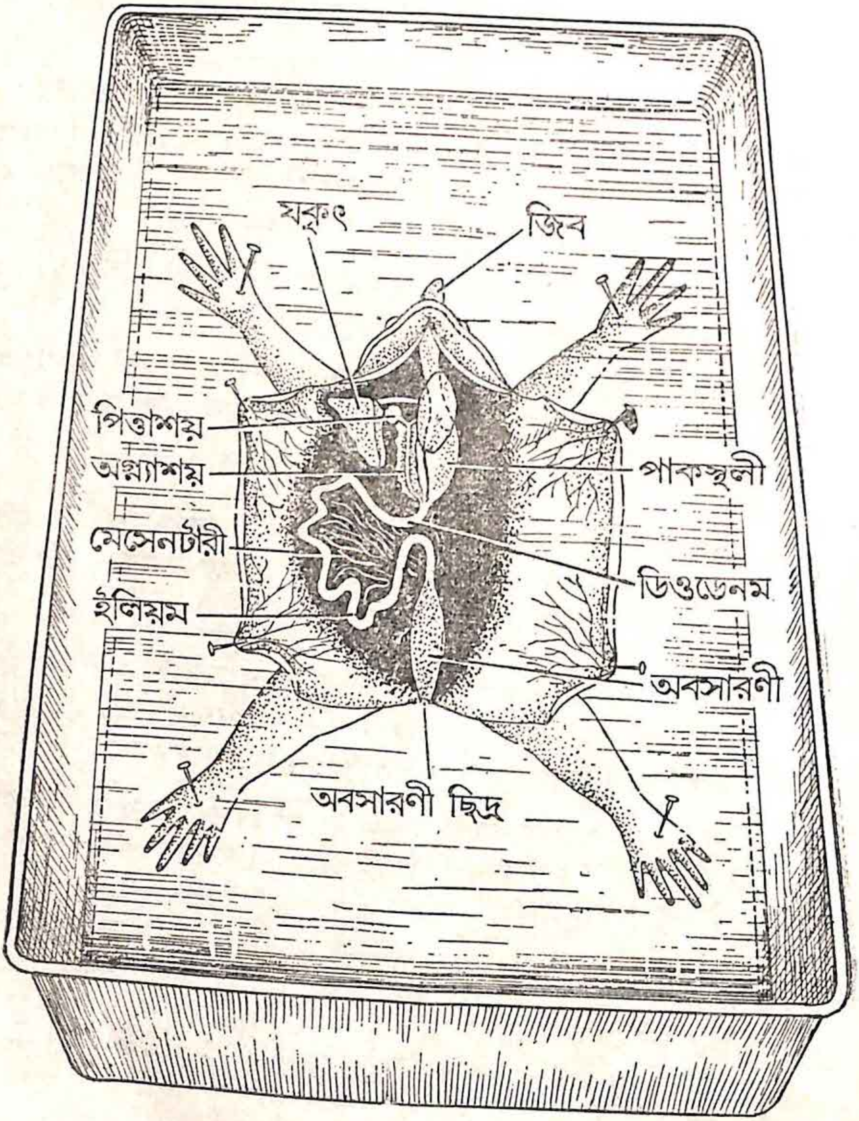
(ii) **বক্রধাবক বা স্টোলন** (Stolon) ঃ **থানকুনি, মেন্থা** প্রভৃতি গাছে ধনুকের মতো বাঁকা পর্বমধ্যকে **বক্রধাবক** বা **স্টোলন** (Stolon) বলে (চিত্র 11.22)।

(iii) **প্ররোহ** বা **অফসেট** (Offset) ঃ হ্রস্ব ও স্থূল পর্বমধ্যযুক্ত **শাখাকে প্ররোহ বা হ্রস্বধাবক** বা **অফসেট** (Offset) বলে (চিত্র 11.22)। উদাহরণ—**কচুরীপানা, বড়পানা।**

(iv) **ঊর্ধ্বধাবক বা সাকার** (Sucker) ঃ চন্দ্রমল্লিকা, পুদিনা প্রভৃতি গাছের ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের কাক্ষিক মুকুল থেকে উৎপন্ন কতকগুলি শাখা

প্রথমাংশ ডিওডেনম এবং শেষাংশ ইলিয়ম। ইলিয়মের পরবর্তী স্ফীত অংশ মলাশয় (Rectum)। মলাশয়ের শেষাংশ অবসারণী।

(6) এরপর ছুরির সাহায্যে শ্রোণীচক্র দু'ভাগে কেটে চাপ দেওয়া হ'ল—এতে অবসারণী ছিদ্রটি দৃষ্টিগোচর হয়।

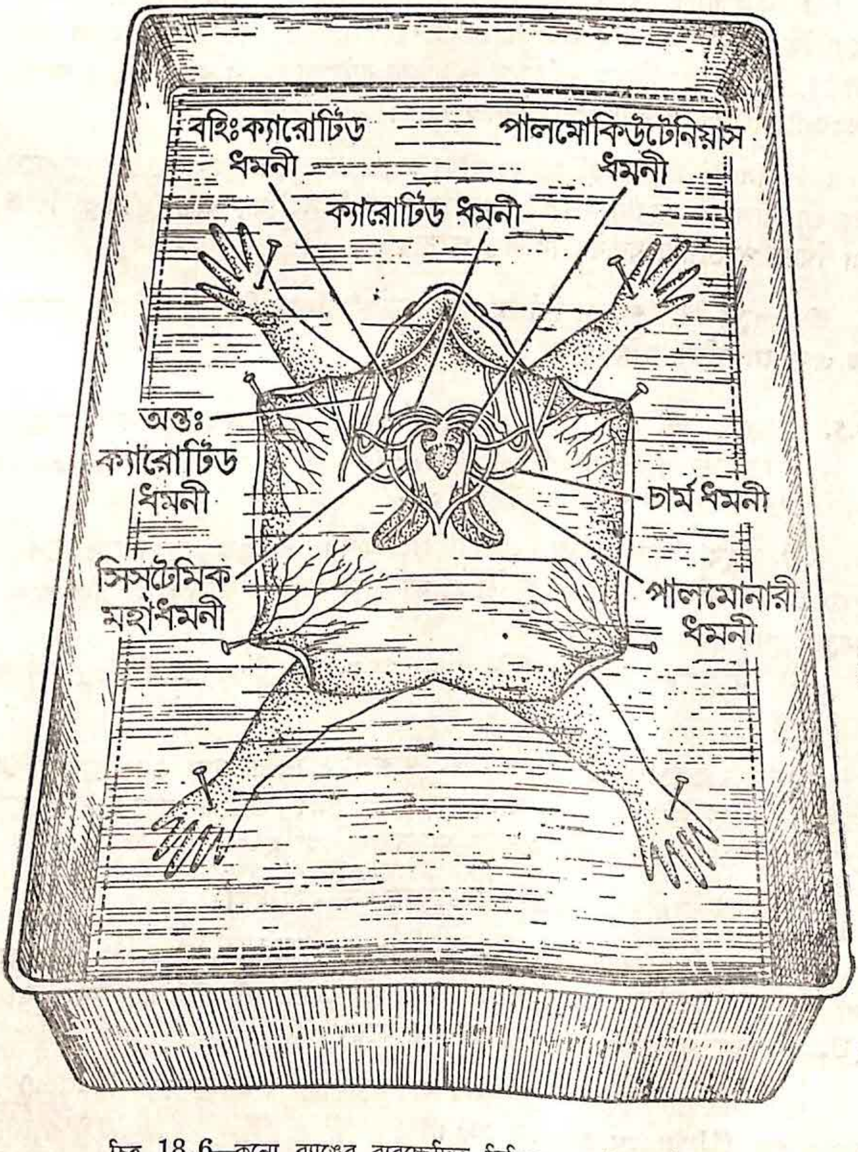


চিত্র 18.5—কুনো ব্যাঙের ব্যবচ্ছেদিত পৌষ্টিকতন্ত্র।

● পূর্বনির্দেশমতো পৌষ্টিকতন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন অঙ্গ পিন-ক্ল্যাগ ক'রে নির্দেশ কর, ছবি আঁক ও বিভিন্ন অংশ লেবেল কর।

18.4. কুনো ব্যাঙের ধমনী আর্চ ব্যবচ্ছেদ এবং বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ [*Dissection of arterial arches of toad and observation of its different parts*] :

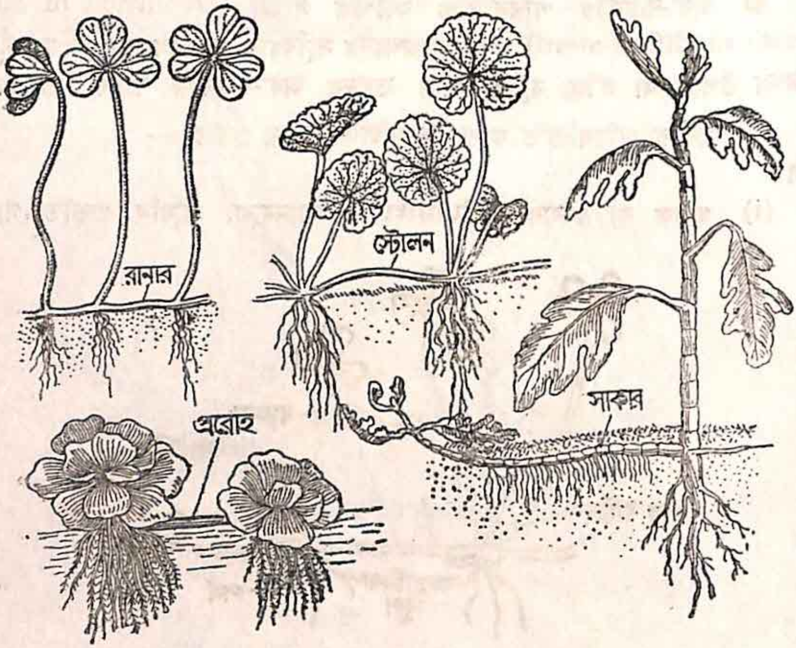
(1) পূর্বনির্দেশমতো দেহগহ্বর উন্মুক্ত করা হ'ল।



চিত্র 18.6—কুনো ব্যাঙের ব্যবচ্ছেদিত বিভিন্ন ধমনী আর্চসমূহ।

(2) হৃৎপিণ্ডকে ঢেকে রাখা পেরিকার্ডিয়ম থলিটিকে সাবধানে ছোট কাঁচি ও চিমটার সাহায্যে কেটে ফেলা হ'ল।

মাটির মধ্যে সমান্তরালভাবে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর মাটি ভেদ করে উপরে ওঠে। শাখার নিম্নাংশে অস্থানিক মূল সৃষ্টি হয়। বিচ্ছিন্ন হবার পর ঐ শাখাই নতুন গাছের জন্ম দেয়। এই জাতীয় শাখাকে **ঊর্ধ্বধাবক** বা **সাকার** (Sucker) বলে (চিত্র 11.22)।



চিত্র 11·22—রানার (আমরুল) ; স্টোলন (থানকুনি) ; অফসেট বা প্ররোহ (বড়পানা) ; সাকার (চন্দ্রমল্লিকা)।

11.11. বায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড বা মেটামরফসড্ স্টেম *[Metamorphosed stem]* :

বিশেষ বিশেষ কাজ করার জন্য কখনও কখনও উদ্ভিদ-অঙ্গের অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে। এতে অঙ্গটির আকৃতি এমন পাল্টে যায়, যাতে তার প্রকৃত চরিত্র চেনা কষ্টকর হয়ে পড়ে। অঙ্গের এরূপ অস্বাভাবিক পরিবর্তনকেই রূপান্তর বলা হয়।

রূপান্তরিত হলেও বিশেষ কতকগুলি লক্ষণ, যেমন—অভ্যন্তরীণ গঠন, উৎপত্তিস্থল ও অবস্থান প্রভৃতি চরিত্রগত লক্ষণ দ্বারা অঙ্গটিকে সনাক্ত করা সম্ভব। কাণ্ড ঐভাবে রূপান্তরিত হলে তাকে **রূপান্তরিত কাণ্ড** বলে।

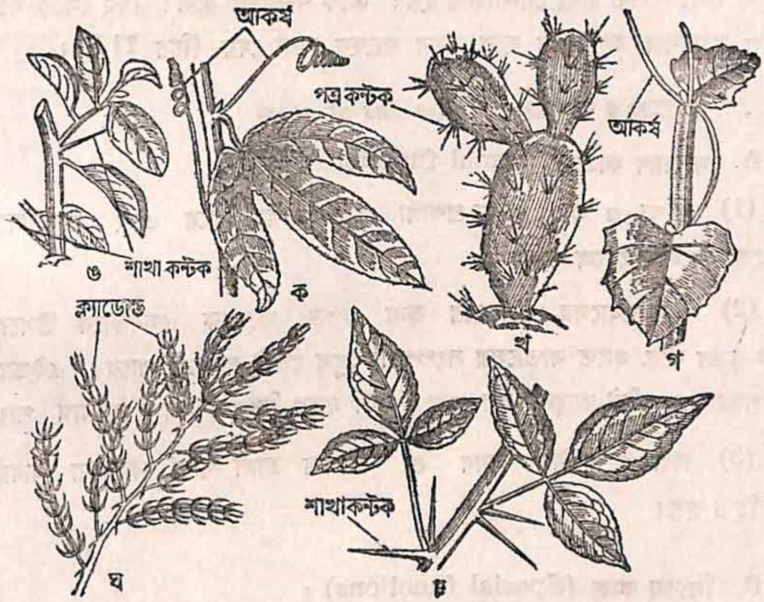
● **বায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ডের সংজ্ঞা** (Definition of metamorphosed stem) : **বিশেষ বিশেষ কার্যসাধনের জন্য উদ্ভিদের বায়বীয় কাণ্ডের**

অস্বাভাবিক পরিবর্তিত রূপকে বায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড বা মেটামরফসড্ স্টেম বলে।

বায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড চার প্রকার :

(1) **শাখা-কণ্টক বা থরন** (Thorn) : **আত্মরক্ষার** জন্য কোন কোন গাছের বিশেষ কতকগুলি শাখা বা কাক্ষিক মুকুল অস্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে **শাখা-কণ্টক** বা **থরন**-এ রূপান্তরিত হয় (চিত্র 11.23ঙ ও চ)। শাখা-কণ্টকের আগা ক্রমশঃ সরু হয়। কখনও কখনও পাতা বা ফুল উৎপন্ন ক'রে শাখা-কণ্টক কাণ্ড-চরিত্র প্রকাশ করে।

উদাহরণ : **দুরন্ত, বৈঁচি, বেল, ময়না** প্রভৃতি।



চিত্র 11·23—শাখা-কণ্টক ঙ—(বৈঁচি) ও চ—বেল ; কাণ্ড-আকর্ষ ক—(ঝুমকোলতা) ও গ—(হাড়জোড়া) ; পর্ণকাণ্ড খ—(ফণিমনসা) ; ক্ল্যাডোড ঘ—(শতমূলী)।

(2) **কাণ্ড-আকর্ষ বা স্টেম-টেনড্রিল** (Stem-tendril) : রোহিণীকে আরোহণে সাহায্য করার জন্য কোন কোন রোহিণীর মুকুল **কাণ্ড-আকর্ষ** বা **স্টেম-টেনড্রিল** (Stem-tendril)-এ রূপান্তরিত হয়।

উদাহরণ : **ঝুমকোলতা, হাড়জোড়া, শিবকুল, অনন্তলতা** প্রভৃতি (চিত্র 11.23ক ও গ)।

(3) **পর্ণকাণ্ড বা ফাইলোক্ল্যাড (Phylloclade)** ঃ কোন কোন উদ্ভিদের এক বা একাধিক পর্বমধ্য চ্যাপ্টা হয়ে পাতার আকৃতি লাভ করে এবং পাতার মতো **সালোকসংশ্লেষ** চালায়। একাধিক পর্বমধ্যযুক্ত রূপান্তরিত কাণ্ডকে **পর্ণকাণ্ড** বা **ফাইলোক্ল্যাড** (Phylloclade) বলে। **উদাহরণ** ঃ ফণিমনসা। এক পর্বমধ্যযুক্ত রূপান্তরিত কাণ্ডকে **ক্ল্যাডোড** (Cladode) বলে (চিত্র 11.23খ ও ঘ)।

উদাহরণ ঃ **শতমূলী**।

(4) **বালবিল** (Bulbil) ঃ কোন কোন উদ্ভিদের কাক্ষিক মুকুল খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য স্ফীত এবং গোলাকার হয়। একে **বালবিল** বলে। দেহ থেকে খসে পড়লে বালবিল অঙ্কুরিত হয়ে নতুন গাছের জন্ম দেয় (চিত্র 11.6)।

11.12. কাণ্ডের কাজ *[Functions of stem] :*

A. **সাধারণ কাজ** (Normal functions) ঃ

(1) কাণ্ড ও তার শাখা-প্রশাখা পাতা ধারণ করে এবং সেগুলিকে উপযুক্ত আলোয় মেলে ধরে।

(2) পরাগযোগের সুবিধার জন্য কাণ্ড ফুলকে এমনভাবে উপরের দিকে তুলে ধরে, যাতে বাতাসের সংস্পর্শে এসে সেটি দুলতে পারে। এইভাবে কীটপতঙ্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং পরাগ দূরে বিস্তৃত হবার সুযোগ পায়।

(3) জল ও খনিজ লবণ ও অন্যান্য তরল খাদ্য কাণ্ডের মাধ্যমে সংবাহিত হয়।

B. **বিশেষ কাজ** (Special functions) ঃ

(1) কাণ্ড পরিবর্তিত হয়ে খাদ্যসঞ্চয় করতে সাহায্য করে।

(2) সবুজ কাণ্ড সালোকসংশ্লেষ চালিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করে।

(3) কাণ্ড রূপান্তরিত হয়ে আরোহণে সাহায্য করে।

(4) কণ্টকে রূপান্তরিত হয়ে কাণ্ড আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

(5) কাণ্ড বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়ে প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করে (প্রতিকূলজীবিতা, Perennation)।

(6) কাণ্ড অঙ্গজ-জননে সাহায্য করে।

11.15. নীচে বিভিন্ন প্রকার কাণ্ডের এবং পরপৃষ্ঠায় সেগুলির সচিত্র ছক দেওয়া হলঃ

কাণ্ড

- সাধারণ
  - সবল
    - পিরামিডাকৃতি (পাইন)
    - গম্বুজাকৃতি (বট)
    - অশাখকাণ্ড (তাল)
    - তৃণকাণ্ড (বাঁশ)
  - দুর্বল
    - ব্রততী (আমরুল)
    - রোহিণী :
      - বল্লী (অপরাজিতা)
      - মূল-রোহিণী (পান)
      - আকর্ষ-রোহিণী (কুমড়ো)
      - অঙ্কুশ-রোহিণী (কাঁঠালি চাপা)
      - কণ্টক-রোহিণী (বাগানবিলাস)
      - কাষ্ঠললতা (মাধবীলতা)
- পরিবর্তিত
  - মৃৎগত
    - গ্রন্থিকাণ্ড (আদা)
    - স্ফীতকন্দ (আলু)
    - গুঁড়িকন্দ (ওল)
    - কন্দ (পেঁয়াজ)
  - অর্ধ-বায়বীয়
    - ধাবক (আমরুল)
    - বক্রধাবক (থানকুনি)
    - হ্রস্বধাবক (কচুরিপানা)
    - উর্ধ্বধাবক (চন্দ্রমল্লিকা)
- রূপান্তরিত (বায়বীয় কাণ্ড)
  - শাখা-কণ্টক (দুরন্ত)
  - কাণ্ড-আকর্ষ (ঝুমকোলতা)
  - পর্ণকাণ্ড (ফণিমনসা)
  - বালবিল (খামালু)

(3) এরপর নিডলের সাহায্যে ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস-এর আবরণীটিকে সাবধানে ছিঁড়ে দেওয়া হ'ল। এতে তিনটি **অ্যাওর্টিক আর্চ** দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলি **ক্যারোটিড আর্চ** (Carotid arch), **সিসটেমিক আর্চ** (Systemic arch) এবং **পালমোকিউটেনিয়াস আর্চ** (Pulmocutaneous arch)।

(4) ক্যারোটিড আর্চ অনুসরণ ক'রে **ক্যারোটিড ল্যাবাইরিন্থ, অন্তঃক্যারোটিড ধমনী** ও **বহিঃক্যারোটিড ধমনী** পরিষ্কার করা হ'ল। লক্ষ্য করা গেল যে, বহিঃক্যারোটিড মুখগহ্বরে ও মাথার বাইরের অংশে রক্ত সরবরাহ করে। অন্তঃক্যারোটিড মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ করে।

(5) সিসটেমিক আর্চ বরাবর লক্ষ্য ক'রে দেখা গেল হৃৎপিণ্ডের দু'পাশে ঘুরে গ্রাসনালীকে বেষ্টন ক'রে দু'পাশের দুটি সিসটেমিক আর্চ নীচের দিকে চলে গিয়ে পৃষ্ঠরেখা বরাবর মিলিত হ'য়েছে।

● **পূর্ব নির্দেশমতো বিভিন্ন ধমনী আর্চগুলিকে পিনক্যাগ দিয়ে নির্দেশ কর এবং সেগুলির ছবি এঁকে লেবেল কর।**

18.5. পুরুষ ও স্ত্রী কুনো ব্যাঙের রেচনতন্ত্র ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি [*Method of dissection of Excretory system of Male and Female Toad*] :

(1) পূর্ব নির্দেশমতো একটি সংজ্ঞাহীন ব্যাঙের দেহগহ্বর উন্মুক্ত ক'রে **পৌষ্টিকতন্ত্র, মেদপুঞ্জ, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, পিত্তাশয়** প্রভৃতি অঙ্গসমূহ অপসারণ করা হ'ল।

(2) সাবধানে শ্রোণীচক্র (Pelvic girdle) কেটে অবসারণী ছিদ্র উন্মুক্ত করা হ'ল।

পুরুষ ব্যাঙের ক্ষেত্রে বৃক্কের সঙ্গে যুক্ত বিডার-এর অঙ্গ এবং মেদপুঞ্জকে সাবধানে অপসারিত করা হ'ল। পক্ষান্তরে স্ত্রী ব্যাঙের ক্ষেত্রে দেহগহ্বর থেকে ডিম্বাশয়, ডিম্বনালী, জরায়ু অপসারণ করা হ'ল।

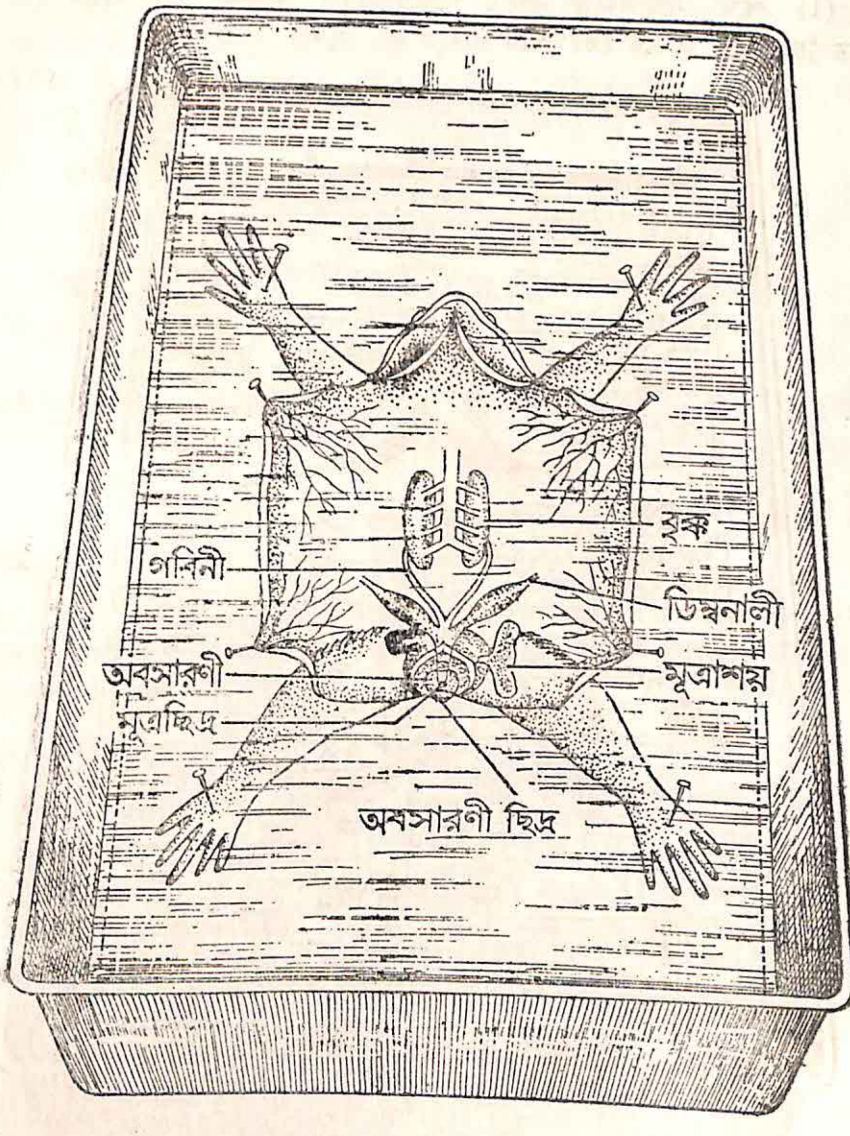
(3) এইভাবে কুনো ব্যাঙের রেচনতন্ত্র বার করা হ'ল।

(4) এদের রেচনতন্ত্র **একজোড়া বৃক্ক** (Kidney) এবং **একজোড়া** গবিনী (Ureter) দ্বারা গঠিত। পুরুষের ক্ষেত্রে গবিনী **রেচন-জনন নালী** (Urino-genital duct) হিসাবে কাজ করে।

(5) এছাড়া আছে **মূত্রস্থলী** বা **মূত্রাশয়** (Urinary bladder) ও **রেচন-ছিদ্র** (Urinary aperture)।

(6) পুরুষ ব্যাঙের ক্ষেত্রে রেচন-ছিদ্রটি **রেচন-জনন ছিদ্র** (Urino-genital aperture) হিসাবে কাজ করে।

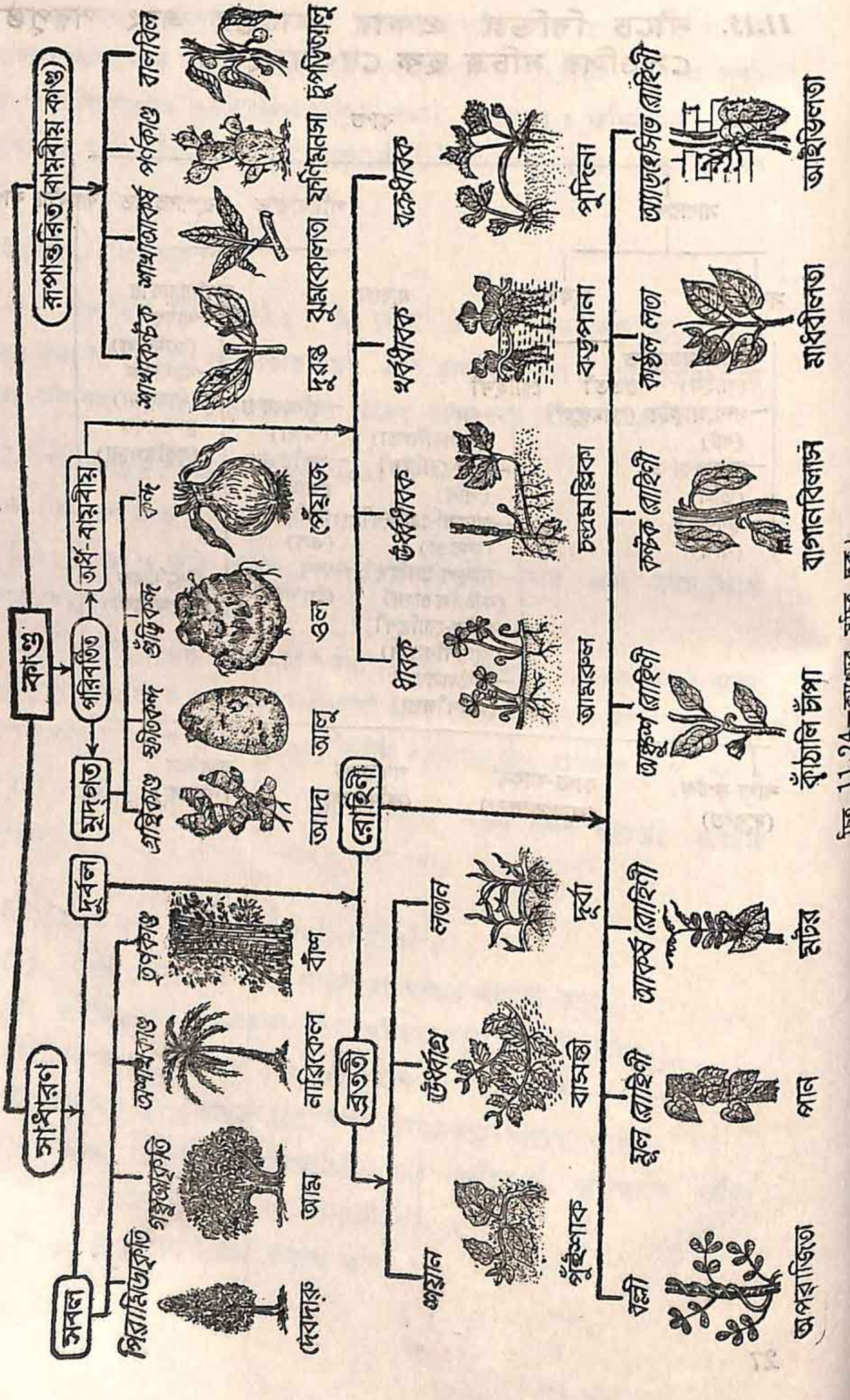
(7) স্ত্রী ব্যাঙের মূত্রছিদ্র ও জননছিদ্র ভিন্ন। মূত্রছিদ্র অবসারণীতে উন্মুক্ত।



চিত্র 18·7—কুনো ব্যাঙের ব্যবচ্ছেদিত রেচনতন্ত্র।

(8) অবসারণী থেকে রেচন পদার্থ **অবসারণী ছিদ্র** পথে দেহমুক্ত হয়।

● **পূর্ব নির্দেশমতো বিভিন্ন রেচন অঙ্গ পিনফ্ল্যাগ দিয়ে নির্দেশ কর। সেগুলির ছবি আঁক এবং লেবেল কর।**



চিত্র 11.24—কাণ্ডের সচিত্র ছক।

11.14. মূল ও কাণ্ডের পার্থক্য *[Differences between Root and stem]* :

মূল (Root)	কাণ্ড (Stem)
(1) মূল ভ্রূণমূল থেকে উৎপন্ন হয়।	(1) কাণ্ড ভ্রূণমুকুল থেকে উৎপন্ন হয়।
(2) উদ্ভিদের নিম্নগামী অক্ষ (Descending axis)।	(2) উদ্ভিদের ঊর্ধ্বগামী অক্ষ (Ascending axis)।
(3) আলোক-উৎসের বিপরীত দিকে এবং সাধারণত মাটির মধ্যে প্রবেশ করে।	(3) আলোক-উৎসের দিকে বর্ধিত হয় এবং সাধারণত মাটির উপরে থাকে।
(4) মূলে পর্ব বা পর্বমধ্য থাকে না।	(4) কাণ্ডে পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে।
(5) মূল সাধারণত বর্ণহীন, অবস্থা বিশেষে সবুজ হয়।	(5) কাণ্ডের রং সাধারণত সবুজ, অবস্থা বিশেষে বর্ণহীন হয়।
(6) মূল সাধারণত পাতা, ফুল ও ফল ধারণ করে না।	(6) পাতা, ফুল ও ফল ধারণ করাই কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য।
(7) মূলের আগায় বা পাশে সাধারণত মুকুল জন্মায় না।	(7) কাণ্ডের আগায় বা পাশে মুকুল জন্মায়।
(8) মূলের অগ্রভাগে মূলত্র থাকে।	(8) কাণ্ডের অগ্রভাগে মূলত্র থাকে না।
(9) মূলের অগ্রভাগে মুকুল থাকে না।	(9) কাণ্ডের অগ্রভাগে মুকুল থাকে।
(10) মূলরোম এককোষী।	(10) কাণ্ডের রোম বহুকোষী।
(11) মূলের শাখা-প্রশাখা ভিতরের কলা থেকে জন্মায় (Endogenous)।	(11) কাণ্ডের শাখা-প্রশাখা বাইরের কলা থেকে জন্মায় (Exogenous)।

11.15. কাণ্ডের অন্তর্গঠন *[Internal structure of stem]* :

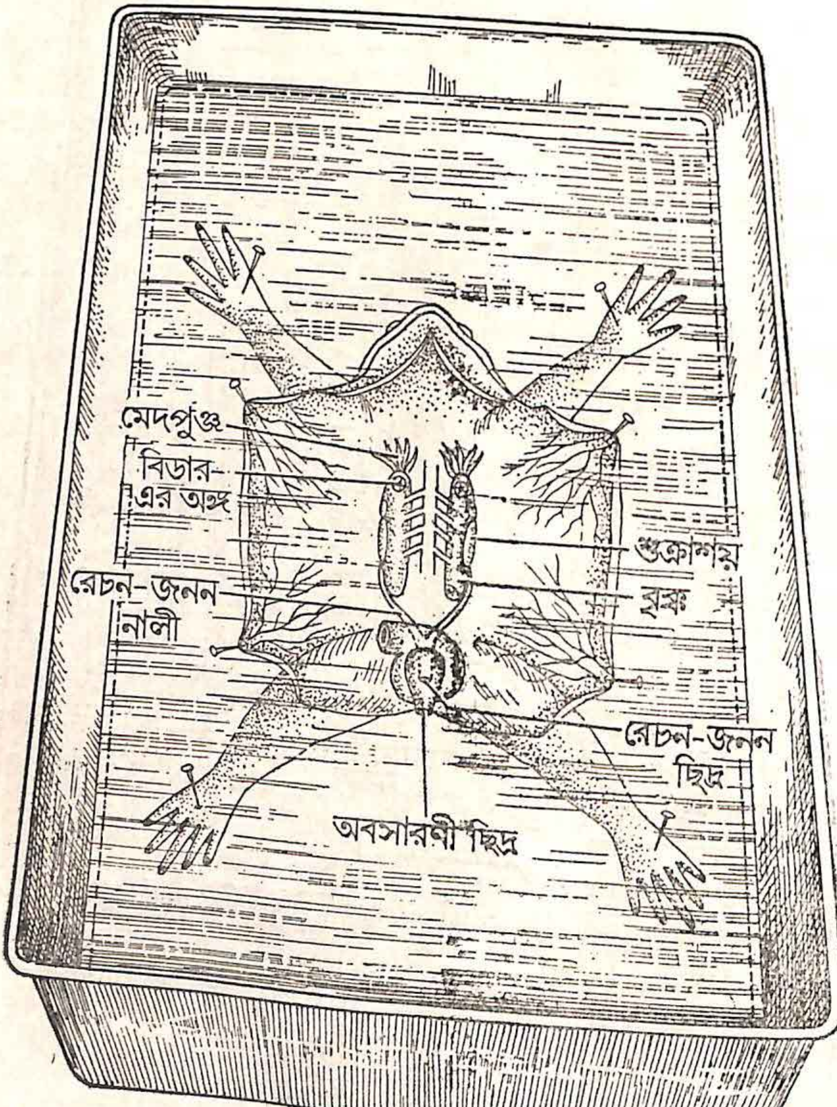
A. **দ্বিবীজপত্রী কাণ্ড** (Dicot stem) : একটি কচি **সূর্যমুখী কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ** অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে পরীক্ষা করলে পরিধির দিক থেকে কেন্দ্রের দিকে নিম্নলিখিত কলাস্তরগুলিকে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত থাকতে দেখা যায়।

1. **বহিস্ত্বক** বা **এপিডারমিস** (Epidermis) : পিপাকৃতি এবং বাইরের দিকে কিউটিকলযুক্ত একস্তরে সজ্জিত সজীব কোষ দ্বারা বহিস্ত্বক গঠিত। বহিস্ত্বক থেকে বহুকোষী রোম উদ্গত হয়।

2. **বহির্মজ্জা** বা **কর্টেক্স** (Cortex) : বহিস্ত্বক-সংলগ্ন একাধিক স্তরবিশিষ্ট কোলেনকাইমাকে **অধস্ত্বক** বা **হাইপোডারমিস** (Hypodermis),

18.6. পুরুষ কুনো ব্যাঙের জননতন্ত্র ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি ***[Method of dissection of reproductive system of a Male toad] :***

(1) পূর্ব নির্দেশমতো একটি পুরুষ কুনো ব্যাঙকে সংজ্ঞাহীন ক'রে ট্রেতে চিৎ ক'রে আটকে দেহগহ্বর উন্মুক্ত করা হ'ল।



চিত্র 18.8—পুরুষ কুনো ব্যাঙের ব্যবচ্ছেদিত জননতন্ত্র।

(2) দেহগহ্বর থেকে পৌষ্টিকতন্ত্র ও আনুষঙ্গিক পরিপাক গ্রন্থি-সমূহ, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, মূত্রস্থলী অপসারণ করা হ'ল।

(3) এবার পুংজননতন্ত্রটি যথাসম্ভব সাবধানে পরিষ্কার করা হ'ল।

(4) তারপর ট্রের অপরিষ্কার জল পাল্টে নেওয়া হ'ল।

(5) কুনো ব্যাঙের পুংজননতন্ত্রটি বৃক্কের সঙ্গে যুক্ত একজোড়া **শুক্রাশয়** (Testes), একজোড়া **বিডার-এর অঙ্গ** (Bidder's organs), **মেদপুঞ্জ** (Fat bodies), একজোড়া **গবিনী** (Ureter) অর্থাৎ, **রেচন-জনন নালী,** একটি **রেচন-জননছিদ্র** (Urino-genital aperture) দ্বারা গঠিত।

(6) এবার শ্রোণীচক্রটি কেটে অবসারণীটিকে উন্মুক্ত করা হ'ল। দেখা গেল রেচন-জননছিদ্রটি অবসারণীতে উন্মুক্ত।

● **পূর্ব নির্দেশমতো পুরুষ ব্যাঙের জননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ পিন-ফ্ল্যাগ দ্বারা নির্দেশ কর। অঙ্গগুলির ছবি আঁক এবং লেবেল কর।**

18.7. স্ত্রীকুনো ব্যাঙের জননতন্ত্র ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি ***[Method of dissection of reproductive system of a Female toad] :***

(1) পূর্ব নির্দেশমতো একটি স্ত্রী কুনো ব্যাঙকে সংজ্ঞাহীন করার পর ট্রেতে চিৎ ক'রে আটকে দেহগহ্বর উন্মুক্ত করা হ'ল।

(2) দেহগহ্বর থেকে পৌষ্টিকতন্ত্র ও আনুষঙ্গিক পরিপাক গ্রন্থি-সমূহ, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, মূত্রাশয় বা মূত্রস্থলী প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ-সমূহ অপসারণ করা হ'ল।

(3) এবার স্ত্রী জননতন্ত্রটি যথাসম্ভব সাবধানে পরিষ্কার করা হ'ল।

(4) তারপর ট্রের অপরিষ্কার জল পাল্টে নেওয়া হ'ল।

(5) কুনো ব্যাঙের স্ত্রী জননতন্ত্রটি একজোড়া **ডিম্বাশয়** (Ovary), একজোড়া **ডিম্বনালী** (Oviduct), একটি **স্ত্রী জননছিদ্র** (Female genital aperture) নিয়ে গঠিত। ডিম্বনালীদ্বয় তিনটি অংশে বিভেদিত, যথা—

(i) **ডিম্বচুঙ্গী** (Oviducal funnel)।

(ii) **প্যাঁচানো নালী** (Coiled tube)।

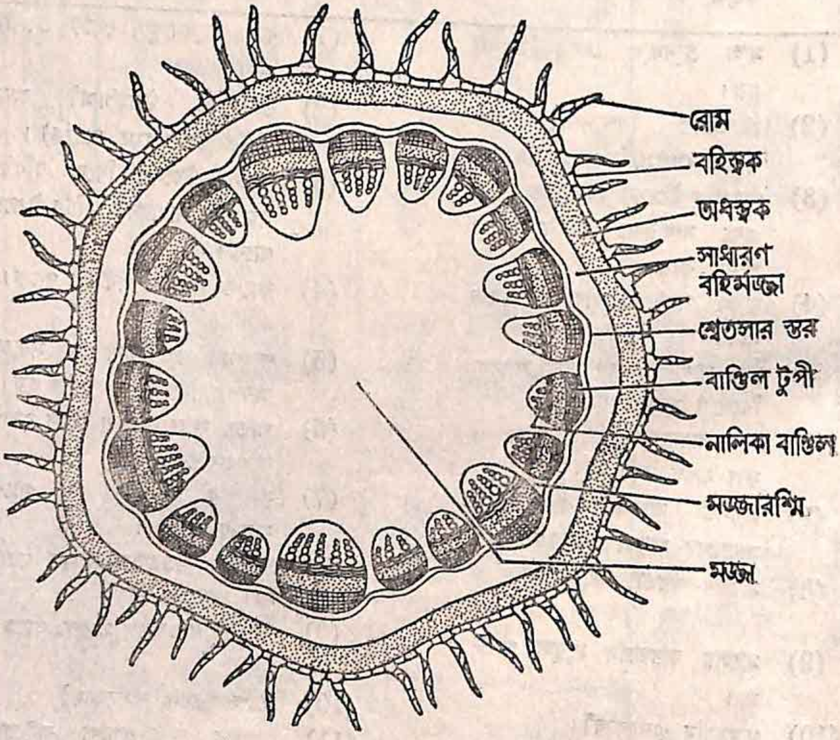
(iii) **জরায়ু** (Uterus)।

(6) এবার শ্রোণীচক্রের মধ্যভাগ কেটে অবসারণীটি বার করা হ'ল।

(7) স্ত্রী ব্যাঙের ক্ষেত্রে পৃথক মূত্রছিদ্র ও জননছিদ্র লক্ষ্য করা যায়।

(8) অবসারণী অবসারণীছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে উন্মুক্ত।

নীচের বহৃৎ অংশটিকে **সাধারণ বহির্মজ্জা** এবং এর একেবারে ভিতরের শ্বেতসারপূর্ণ স্তরটিকে **শ্বেতসার স্তর** (Starch Sheath) বা **অন্তস্ত্বক** বা **এণ্ডোডারমিস** (Endodermis) বলে। শ্বেতসার স্তরটি তরঙ্গায়িত (Wavy)। সাধারণ বহির্মজ্জায় **রেজীন নালী** (Resin canal) থাকে।

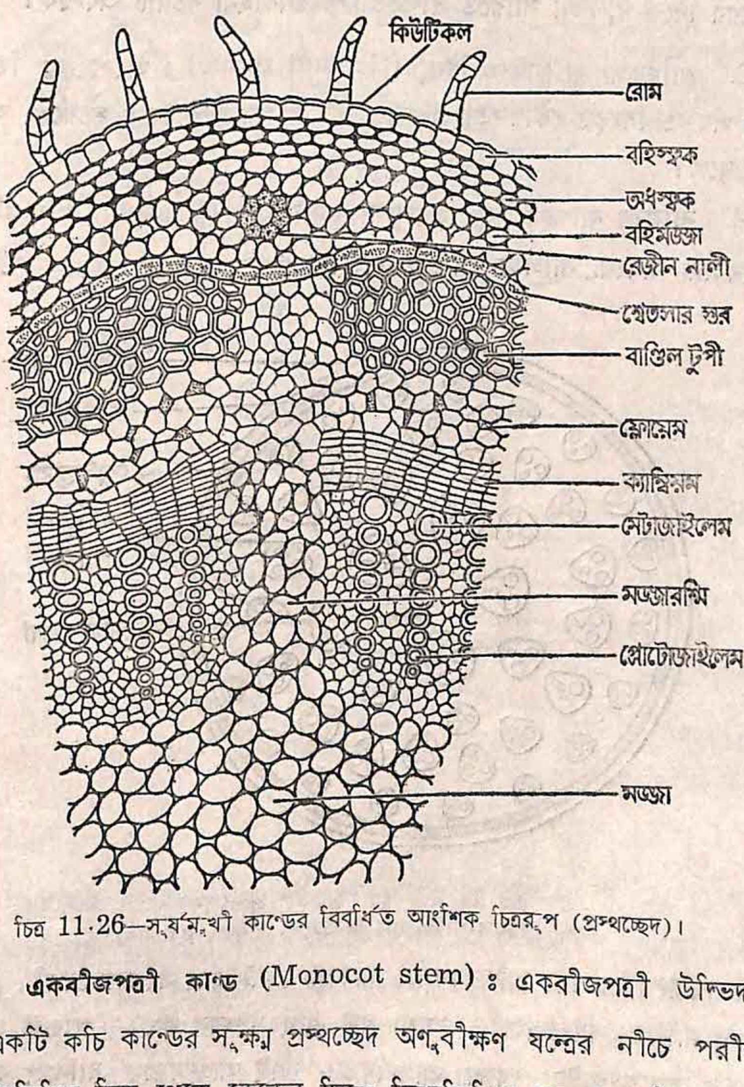


চিত্র 11·25—সূর্যমুখী কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ।
(নিম্ন বিবর্ধন-শক্তিসম্পন্ন অভিলক্ষ্য মাধ্যমে দৃশ্যমান)।

3. **কেন্দ্রস্তম্ভ বা স্টীল** (Stele) ঃ অন্তস্ত্বকের ভিতরে সমগ্র অংশটি **কেন্দ্রস্তম্ভ বা স্টীল**। পৃথক পৃথক অবস্থানে চক্রাকারে সজ্জিত বিশেষ অংশগুলিকে **নালিকা বাণ্ডিল** বা **ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল** (Vascular bundle) বলে। উপরে **ফ্লোয়েম** (Phloem), নীচে জাইলেম (Xylem) এবং মধ্যে ভাজক-কলা অর্থাৎ **ক্যাম্বিয়ম** (Cambium) স্তর দ্বারা প্রতিটি ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল গঠিত। এরূপ নালিকা বাণ্ডিলকে সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় ও মুক্ত বলে। মেটাজাইলেমগুলিকে পরিধির দিকে এবং প্রোটোজাইলেমগুলিকে কেন্দ্রের দিকে বিন্যস্ত থাকতে দেখা যায়।

প্রতিটি বাণ্ডিলের মাথায় স্ক্লেরেনকাইমার গুচ্ছকে **বাণ্ডিল টুপী** বা **বাণ্ডিল ক্যাপ** (Bundle cap) বলে। দুটি বাণ্ডিলের মধ্যবর্তী স্থান

পাতলা প্রাকারযুক্ত সুদীর্ঘ প্যারেনকাইমা দ্বারা পূর্ণ থাকে। এগুলিকে **মজ্জারশ্মি** বা **মজ্জাংশু** বা **মেডালারী রে** (Medullary Ray) বলে। কেন্দ্রটিও পাতলা প্রাকার ও কোষান্তর রন্ধ্রযুক্ত প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত। এই অংশটি **অজ্জা** বা **পিথ** (Pith)।



চিত্র 11·26—সূর্যমূখী কাণ্ডের বিবর্ধিত আংশিক চিত্ররূপ (প্রস্থচ্ছেদ)।

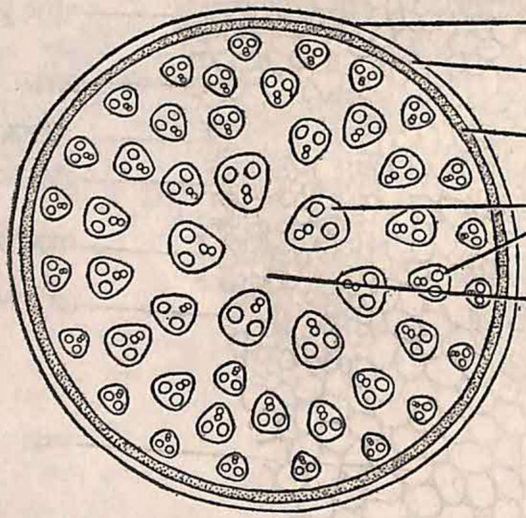
B. **একবীজপত্রী কাণ্ড** (Monocot stem) : একবীজপত্রী উদ্ভিদ—ভুট্টার একটি কচি কাণ্ডের সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে পরীক্ষা করলে পরিধির দিক থেকে কেন্দ্রের দিকে নিম্নলিখিত কলাস্তরগুলি পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত রয়েছে দেখা যায়।

1. **বহিস্ত্বক** বা **এপিডারমিস** (Epidermis) ঃ পিপাকৃতি বাইরের দিকে কিউটিকলযুক্ত একস্তরে সজ্জিত সজীব প্যারেনকাইমা দ্বারা ত্বকটি গঠিত। বহিস্ত্বকে রোম নাই।

2. **অধস্ত্বক** বা **হাইপোডারমিস** (Hypodermis) ঃ বহিস্ত্বক-সংলগ্ন ভিতরের দিকে দু-তিন সারিতে সজ্জিত স্ক্লেরেনকাইমা স্তরটি অধস্ত্বক।

3. **আদিকলা বা গ্রাউণ্ড টিসু** (Ground tissue) ঃ অধস্ত্বকের ভিতরে কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত কোষান্তর রন্ধ্রযুক্ত সজীব প্যারেনকাইমার স্তরকে আদি-কলা বলে।

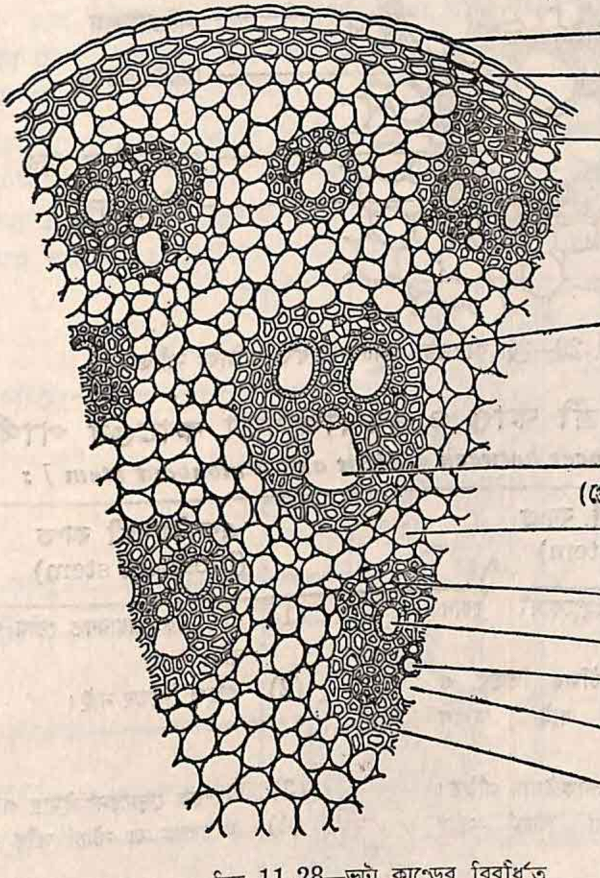
4. **নালিকা বাণ্ডিল** বা **ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল** (Vascular bundle) ঃ আদিকলায় অসংখ্য নালিকা বাণ্ডিল এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকে। পরিধির



চিত্র 11.27—ভুট্টা কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ।
(নিম্ন বিবর্ধন-শক্তিসম্পন্ন অভিলক্ষ্য মাধ্যমে দৃশ্যমান)।

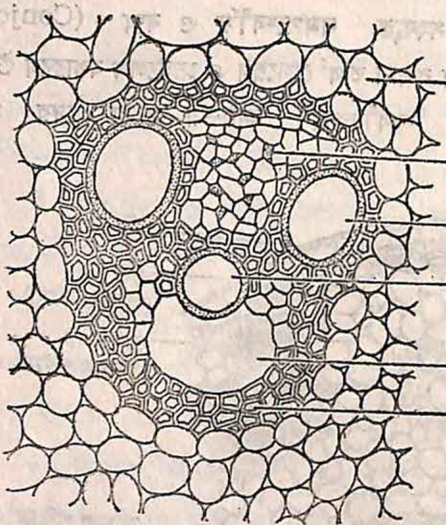
দিকে বিন্যস্ত নালিকা বাণ্ডিলগুলি আকারে ছোট এবং সংখ্যায় বেশী। কেন্দ্রের দিকের নালিকা বাণ্ডিলগুলি ক্রমশঃ বড় এবং সংখ্যায় কম। প্রতিটি নালিকা বাণ্ডিল স্ক্লেরেনকাইমা দ্বারা আচ্ছাদিত। এই আচ্ছাদনকে **বাণ্ডিল আবরণী বা বাণ্ডিল সীদ** (Bundle sheath) বলা হয়।

প্রতিটি নালিকা-বাণ্ডিল **সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় ও বন্ধ** (Conjoint, collateral and closed)। বন্ধ কথার অর্থ ফ্লোয়েম ও জাইলেম যথাক্রমে উপরে এবং নীচে অবস্থান করলেও, দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের মতো এদের মাঝে ক্যাম্বিয়ম নাই।



চিত্র 11·28—ভুট্টা কাণ্ডের বিবর্ধিত আংশিক চিত্ররূপ (প্রস্থচ্ছেদ)।

জাইলেম বাহিকাগুলি 'Y'-এর মতো সজ্জিত। 'Y'-এর দুই বাহু **মেটাজাইলেম** ও নীচের দণ্ড **প্রোটোজাইলেম** দ্বারা গঠিত। প্রোটোজাইলেমের একেবারে নীচের গহ্বরটি **প্রোটোজাইলেম ক্যাভিটি** বা **লাইসিজিনাস রন্ধ্র** (Protoxylem cavity or Lysigenous cavity) নামে পরিচিত। 'Y'-আকৃতিবিশিষ্ট জাইলেমের দুই বাহুর মাঝখানে ফ্লোয়েম বর্তমান। ফ্লোয়েম কেবল সীভনল ও সঙ্গীকোষ দ্বারা গঠিত।



চিত্র 11·29—ভুট্টা কাণ্ডের একটি বিবর্ধিত নালিকা বাণ্ডিল।

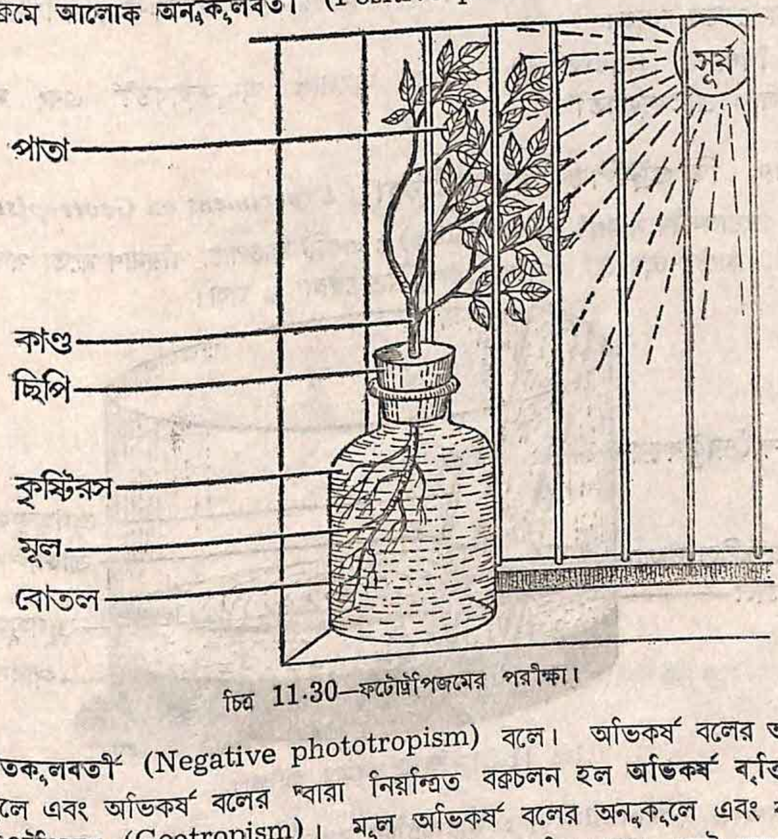
1.16. দ্বিবীজপত্রী কাণ্ড ও একবীজপত্রী কাণ্ডের পার্থক্য *[Differences between a dicot and a monocot stem]* :

দ্বিবীজপত্রী কাণ্ড (Dicot stem)	একবীজপত্রী কাণ্ড (Monocot stem)
(1) বহিস্ত্বকে বহুকোষী রোম থাকে।	(1) বহিস্ত্বকে সাধারণত রোম থাকে না।
(2) আদিকলা স্টিলির ভিতর ও বাহির—এই দুই অংশে বিভেদিত।	(2) এরূপ বিভেদ নাই।
(3) অধস্ত্বক কোলেনকাইমায় গঠিত।	(3) অধস্ত্বক স্ক্লেরেনকাইমায় গঠিত।
(4) অন্তস্ত্বক বা স্টার্চ সীদ বর্তমান।	(4) অন্তস্ত্বক বা স্টার্চ সীদ নাই।
(5) নালিকা বাণ্ডিলগুলি চক্রাকারে সজ্জিত থাকে।	(5) নালিকা বাণ্ডিলগুলি আদি-কলায় এলোমেলোভাবে ছড়ান থাকে।
(6) নালিকা বাণ্ডিল সংযুক্ত, সম-পার্শ্বীয় ও মুক্ত।	(6) নালিকা বাণ্ডিল সংযুক্ত, সম-পার্শ্বীয় ও বদ্ধ।
(7) বাণ্ডিল আবরণ নাই, তবে বাণ্ডিল টুপী আছে।	(7) বাণ্ডিল আবরণ আছে, তবে বাণ্ডিল টুপী নাই।
(8) কেন্দ্রে মজ্জা আছে।	(8) মজ্জা নামে কোন পৃথক কলা নাই।

11.17. উদ্ভিদের উপর আলো ও অভিকর্ষের প্রভাব [*Influence of light and gravity on plants*] :

প্রকৃতির সঙ্গে উদ্ভিদ-অংগের সম্পর্ক নিবিড়। আলো, মাটি, জল উদ্ভিদের উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। কান্ড আলোর উৎসের দিকে বেঁকে যায় এবং পাতাগুলিকে পর্যাপ্ত আলো শোষণের উপযোগী করে মেলে ধরে। মূল অভিকর্ষের টানে সাড়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জলের উৎসের দিকে অগ্রসর হয়। এগুলি প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদের দিক পরিবর্তন, অর্থাৎ **বক্র চলন** (Movement of curvature)।

আলোকের গতিপথ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বক্রচলনকে **আলোকবৃত্তি** বা **ফটোট্রপিজম** (Phototropism) বলে। উদ্ভিদের কাণ্ড আলোক-উৎসের দিকে বেঁকে গেলেও মূল আলোক-উৎসের বিপরীত দিকে ঘুরে যায়। এরূপ বক্রচলনকে যথাক্রমে **আলোক অনুকূলবর্তী** (Positive phototropism) এবং **আলোক**



চিত্র 11·30—ফটোট্রপিজমের পরীক্ষা।

প্রতিকূলবর্তী (Negative phototropism) বলে। অভিকর্ষ বলের অনুকূলে এবং অভিকর্ষ বলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বক্রচলন হল **অভিকর্ষ বৃত্তি** বা **জিওট্রপিজম** (Geotropism)। মূল অভিকর্ষ বলের অনুকূলে এবং কান্ড অভিকর্ষ বলের প্রতিকূলে অর্থাৎ বিপরীত দিকে বৃদ্ধি পায়। তাই মূল ও কান্ডকে যথাক্রমে **অভিকর্ষ অনুকূল** (Positive geotropic) ও **অভিকর্ষ প্রতিকূল** (Negative geotropic) অংগ বলে।

11.18. ফটোট্রপিজমের পরীক্ষা [*Experiment on Phototropism*] : [চিত্র *11.30*]

প্রয়োজনীয় সামগ্রী (Requisites) ঃ একটি কাচের বোতল, একটি ছোট চারা গাছ, প্রয়োজনমত ক্নপ্টরস এবং একটি দ্বিখণ্ডিত ছিপি।

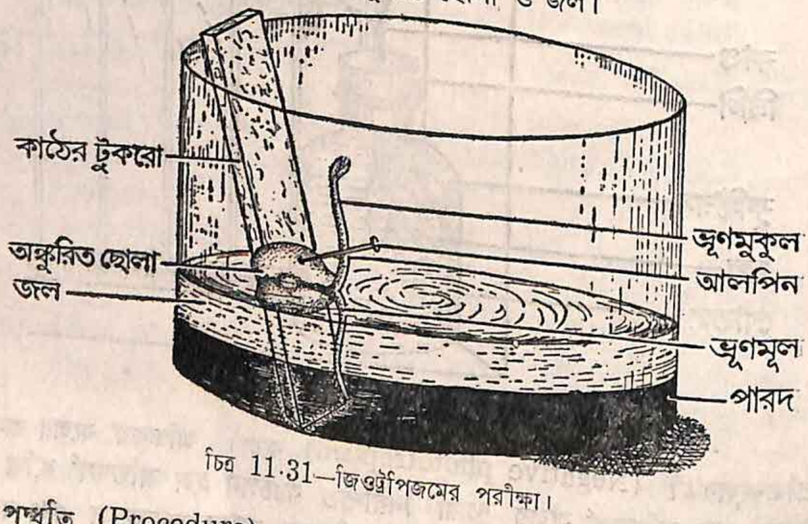
পদ্ধতি (Procedure) ঃ বোতলের গলা পর্যন্ত ক্নপ্টরস পূর্ণ করা হল। বোতলের মধ্যে একটি সদ্য-তোলা চারা গাছ দ্বিখণ্ডিত ছিপির ভিতর দিয়ে এমনভাবে প্রবেশ করান হল, যাতে মূল ক্নপ্টরসে ডুবে থাকে। ছিপির উপরে অন্য একটি গর্ত করে বায়ু যাতায়াতের পথ রাখা হল। এবার সূর্যালোক প্রবেশ করে এমন একটি অন্ধকার ঘরের খোলা জানালার ধারে বোতলটিকে রাখা হল।

নিরীক্ষা (Observation) ঃ কয়েকদিন পরে দেখা গেল গাছটির কাণ্ড আলোক-উৎস অর্থাৎ জানালার দিকে এবং গাছটির মূল আলোক-উৎসের বিপরীত দিকে বেঁকে গেছে।

সিদ্ধান্ত (Inference) ঃ কাণ্ড আলোক অনুকূলবর্তী এবং মূল আলোক প্রতিকূলবর্তী।

11.19. জিওট্রপিজমের পরীক্ষা [*Experiment on Geotropism*]:

প্রয়োজনীয় সামগ্রী (Requisites) ঃ একটি কাচপাত্র, পরিমাণ মতো পারদ, একটি কাঠের টুকরো, আলপিন, অঙ্কুরিত ছোলা ও জল।



চিত্র 11·31—জিওট্রপিজমের পরীক্ষা।

পদ্ধতি (Procedure) ঃ কাচপাত্রটির অংশবিশেষ পারদপূর্ণ করে তাতে সামান্য জল ঢেলে দেওয়া হল। একটি কাঠের টুকরোয় অঙ্কুরিত ছোলাবীজটিকে আলপিনের সাহায্যে আটকে এমনভাবে জলের উপরে রাখা হল, যাতে

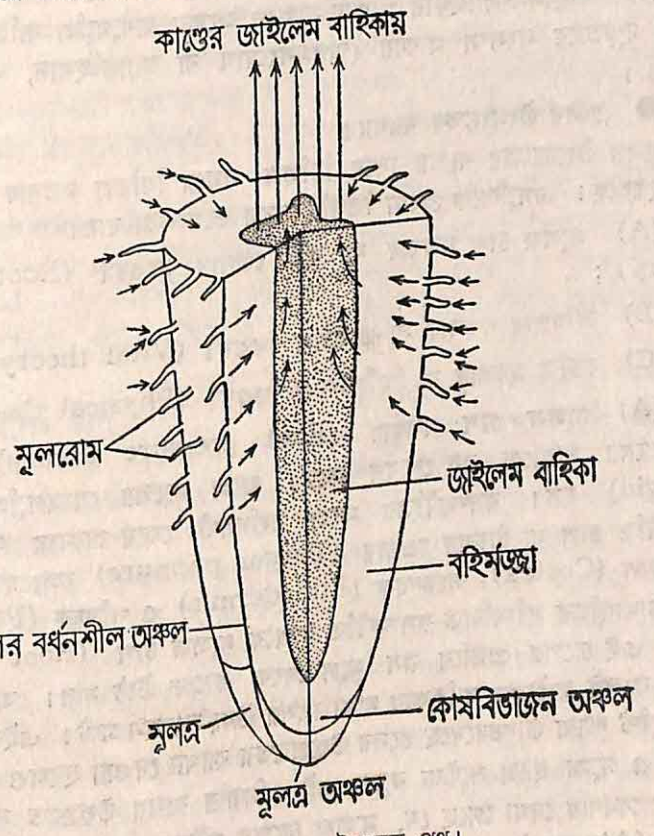
ভ্রূণমূল পারদের সংস্পর্শে থাকে। এ অবস্থায় পাত্রটিকে অন্ধকার ঘরে রাখা হল।

নিরীক্ষা (Observation) ঃ কয়েকদিন পর দেখা গেল, ভ্রূণমূল পারদের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং ভ্রূণমুকুল উপরের দিকে উঠে গেছে।

সিদ্ধান্ত (Inference) ঃ উদ্ভিদের মূল অনুকূল অভিকর্ষী এবং কাণ্ড প্রতিকূল অভিকর্ষী।

11.20. রসের উৎস্রোত [*Ascent of Sap*] :

মূলদ্বারা শোষিত জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ উপাদানকে একত্রে **রস** বা **স্যাপ** (Sap) বলে। এই রস উদ্ভিদদেহে জাইলেম বাহিকার মাধ্যমে ঊর্ধ্ব-গতি লাভ করে এবং পরিশেষে পাতার মেসোফিল কলায় পৌঁছায়। রসের এই



চিত্র 11·32—রসের উৎস্রোত পথ।

ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহকে **রসের উৎস্রোত** বলে। রসের উৎস্রোতে বাধা পড়লে উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটে।

● **রসের উৎস্রোতের সংজ্ঞা** (Definition of Ascent of sap) ঃ **মূল দ্বারা শোষিত জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ যে প্রক্রিয়ায় জাইলেম বাহিকার মাধ্যমে অভিকর্ষের বিপরীতে উদ্ভিদের ঊর্ধ্বাংশসমূহে প্রবাহিত হয় তাকে রসের উৎস্রোত বলে।**

উদ্ভিদদেহে জাইলেমবাহিকাগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে মূল থেকে পাতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এর ফলেই জাইলেম বাহিকার মধ্যে মূল থেকে পাতা পর্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন জলস্তম্ভ সৃষ্টি হয়। অবিচ্ছিন্ন জলস্তম্ভ সৃষ্টির প্রধান কারণ তিনটি, যথা—

(1) জাইলেম বাহিকাগুলির গহ্বর অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

(2) জাইলেম বাহিকার গহ্বরে অবস্থিত জলের অণুগুলির **সমসংযোগ** বা **কোহিশান** (Cohesion)-এর জন্য পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকার প্রবণতা।

(3) জাইলেম বাহিকার প্রাকার-সংলগ্ন জলের অণুগুলি বাহিকা-প্রাকারের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকার (**অসমসংযোগ** বা **অ্যাডহিসান**, Adhesion) প্রবণতা।

● **রসের উৎস্রোতের ব্যাখ্যা ঃ**

রসের উৎস্রোতের ব্যাখ্যা দিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদ উপস্থাপিত করা হ'য়েছে। এগুলিকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(A) **মূলজ চাপ মতবাদ বা রুট প্রেসার থিওরী** (Root pressure theory) ;

(B) **অধিপ্রাণ মতবাদ** বা **ভাইটাল থিওরী** (Vital theory) এবং

(C) **ভৌত মতবাদ** বা **ফিজিক্যাল থিওরী** (Physical theory)।

(A) **মূলজ চাপ মতবাদ** (Root pressure theory) ঃ উদ্ভিদ মূলরোমের সাহায্যে রস শোষণ করে। ফলে মূলের কোষগুলি **রসস্ফীত** (Turgid) হয়। রসস্ফীতির ফলে সংশ্লিষ্ট কোষ-প্রাকারে সৃষ্ট চাপকে **রসস্ফীতি চাপ** বা **টারগর প্রেসার** (Turgor pressure) বলা হয়। মূলের **বহির্মজ্জা** (Cortex), **অন্তস্ত্বক** (Endodermis) ও **পরিচক্র** (Pericycle)-এর কোষগুলির সম্মিলিত রসস্ফীতি চাপকে **মূলজ চাপ** (Root pressure) বলে। এই চাপের প্রভাবে রস মূল থেকে কাণ্ডে উঠে যায়। অর্থাৎ মূলজ চাপের ফলেই জাইলেম বাহিকার মধ্যে রসের ঊর্ধ্বসংবহন ঘটে। এইভাবে মূলজ চাপ সৃষ্টি দ্বারা উদ্ভিদদেহে রসের উৎস্রোতের ব্যাখ্যা দেওয়া হ'লেও বাস্তবক্ষেত্রে বিরুৎ ও গুল্ম ছাড়া সুউচ্চ বৃক্ষে এই প্রক্রিয়ায় রসের উৎস্রোত সম্ভব নয়। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে যে, মূলজ চাপের পরিমাণ স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের (Atmospheric pressure) দ্বিগুণের বেশী কখনই নয়।

(B) **অধিপ্রাণ মতবাদ** (Vital theories) ঃ এই মতবাদে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস রসের উৎস্রোত প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদের সজীব কোষগুলির

জীবনবিধায়ক প্রক্রিয়ার (Vital activities) উপর নির্ভরশীল। অধিপ্রাণ মতবাদগুলির মধ্যে গডলিউস্কি (Godlewski, 1884)-র **রিলে পাম্প মতবাদ** (Relay pump theory) এবং বাঙালী বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (J. C. Bose, 1923)-র মতবাদ অন্যতম।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানকালে অধিপ্রাণ মতবাদকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না, কারণ পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, জীবিত কোষগুলিকে মেরে ফেললেও রসের উৎস্রোত অব্যাহত থাকে।

(C) **ভৌত মতবাদ** (Physical theories) : এই মতবাদ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ভৌত প্রক্রিয়া রসের উৎস্রোতের কারণ। নীচে রসের উৎস্রোত সংক্রান্ত ভৌত মতবাদগুলি আলোচনা করা হ'ল :—

(i) **বায়ুমণ্ডলীয় চাপ** (Atmospheric pressure) : এই মতবাদ অনুযায়ী রসের উৎস্রোত ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, বায়ুমণ্ডলীয় চাপ জলকে জাইলেম বাহিকার মধ্যে দিয়ে উপরে ঠেলে পাঠায়। তবে সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের প্রভাবে জলস্তম্ভ 9 মিটারের উপরে উঠতে সক্ষম নয়। আবার বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কার্যকরী হওয়ার জন্য যে মুক্ত তলের (Free surface) প্রয়োজন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। সুতরাং এই মতবাদ রসের উৎস্রোত ব্যাখ্যায় অপরাগ।

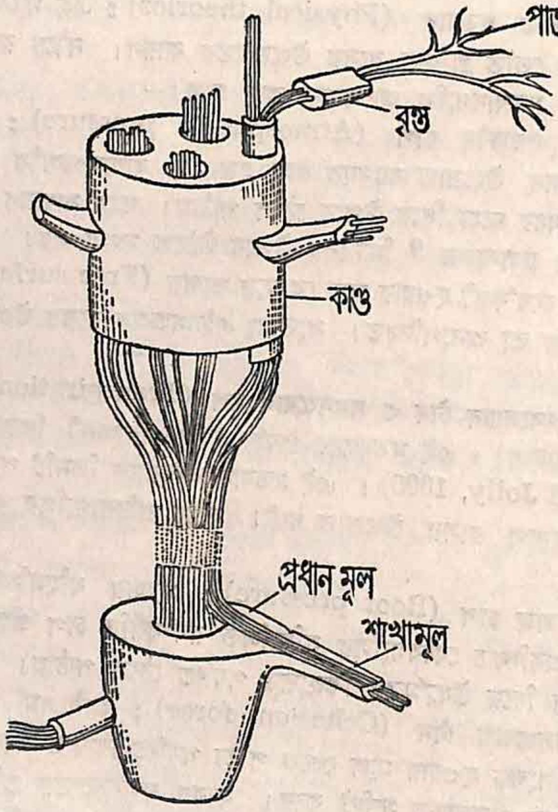
(ii) **বাষ্পমোচন টান ও সমসংযোগ বল** (Transpiration pull and cohesion force) : এই মতবাদের প্রবক্তা হ'লেন বিজ্ঞানী **ডিক্সন** ও **জলি** (Dixon and Jolly, 1895)। এই মতবাদ অনুসারে তিনটি পৃথক প্রক্রিয়ার মিলিত ফলস্বরূপ রসের উৎস্রোত ঘটে। নীচে প্রক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া হ'ল।

(1) **মূলজ চাপ** (Root pressure) : মূলের বহির্মজ্জা, অন্তস্ত্বক ও পরিচক্রে অবস্থিত কোষগুলির সম্মিলিত রসস্ফীতি চাপ জলকে জাইলেম বাহিকার মধ্যে দিয়ে ঊর্ধ্বমুখে কিছুদূর পর্যন্ত ঠেলে পাঠায়।

(2) **সমসংযোগ টান** (Cohesion force) : জাইলেম বাহিকাগুলির ব্যাস অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ায় মূল থেকে পাতা পর্যন্ত বিস্তৃত জলের অণুগুলি একটি অবিচ্ছিন্ন জলস্তম্ভ সৃষ্টি করে। কারণ জলস্তম্ভের প্রতিটি জলকণা সমসংযুক্তি বলের প্রভাবে পরস্পর দৃঢ়সংলগ্ন থাকে। অন্যদিকে জলস্তম্ভ যাতে জাইলেম বাহিকার গা বেয়ে উপরে উঠার সময় পিছলে নেমে না যায়, সেজন্য জাইলেম-প্রাকার সংলগ্ন জলকণা ও জাইলেম বাহিকার অণুর মধ্যে অসমসংযোগজনিত বল (Adhesive force) সক্রিয় হয়। ফলে জলস্তম্ভ জাইলেম বাহিকার গায়ে লেগে থাকে। মূলজ চাপ জাইলেম বাহিকার জলস্তম্ভে অনবরত জল-অণু যুক্ত করে।

(3) **বাষ্পমোচন টান** (Transpiration pull) : বাষ্পমোচনের সময় পত্ররন্ধ্র পথে অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়। পাতার জাইলেম বাহিকা-

সংলগ্ন (মেসোফিল কলার) কোষগুলি সরাসরি জাইলেম বাহিকা থেকে জল শোষণ করে। কোষান্তর অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় এই কোষগুলি থেকে জল এরপর পাশাপাশি অবস্থিত অন্যান্য কোষে প্রবেশ করে। জাইলেম বাহিকা থেকে দূরে অবস্থিত এই কোষগুলি থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় জল ক্রমশঃ কোষান্তর রন্ধ্রে এবং সেখান থেকে পত্ররন্ধ্র সংলগ্ন বাতাবকাশ (Air space)-এ জমতে থাকে। বাতাবকাশ থেকে জলকণা প্রথমত পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে উদ্ভিদদেহের



চিত্র 11·33—রসের উৎস্রোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী জাইলেম বাহিকাগুলির মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিন্যাস।

বাইরে বেরিয়ে যায়। বাষ্পমোচনের প্রভাবে জাইলেম বাহিকা থেকে ক্রমাগত জল বেরিয়ে যাবার ফলে জলস্তম্ভে যে টান পড়ে তাকে **বাষ্পমোচন টান** (Transpiration pull) বলা হয়। পাতা থেকে বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় জলের অণু বেরিয়ে গেলে ক্রমশঃ কাণ্ড এবং শেষে মূলের জাইলেম বাহিকার জলস্তম্ভে যে টান সৃষ্টি হয় তার ফলে মূলের জাইলেম বাহিকার জলস্তম্ভে ক্রমাগত জল অণু যুক্ত হয়। বাষ্পমোচন টান জাইলেম বাহিকায় জলস্তম্ভটিকে

উপরের দিকে টেনে তোলে। এইভাবে অব্যাহত গতিতে রসের উৎস্রোত চলতে থাকে। প্রসংগত উল্লেখ্য, মূলরোম জলশোষণ ক'রে জলের যোগান অক্ষুণ্ণ রাখে।

11.21. রসের উৎস্রোতের পরীক্ষা [*Experiment on Root pressure*] :

- **প্রয়োজনীয় সামগ্রী** (Requisites) ঃ
  - (i) একটি কাচের গ্লাস।
  - (ii) মূলসমেত একটি রজনীগন্ধা গাছ।
  - (iii) জল।
  - (iv) ইয়োসিন রং।
  - (v) ক্ষুর।
  - (vi) স্লাইড ও কভারস্লিপ।
  - (vii) অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

পদ্ধতি (Procedure) ঃ এক গ্লাস জলে সামান্য ইয়োসিন রং গুলে তাতে একটি ফুলসমেত রজনীগন্ধার গাছ দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। কয়েক ঘণ্টা পরে মূল, কাণ্ড, পাতা প্রভৃতির প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে পরীক্ষা করা হল।



চিত্র 11·34—রজনীগন্ধা গাছে রসের উৎস্রোত।

নিরীক্ষা (Observation) ঃ দেখা গেল ফুল এবং পাতায় লালের ছোপ লেগেছে। মূল, কাণ্ড বা পাতার প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করতে দেখা গেল ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলির জাইলেম অংশই কেবল লাল হয়েছে।

সিদ্ধান্ত (Inference) ঃ মূলের দ্বারা শোষিত রস কাণ্ডের ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের জাইলেম বাহিকার ভিতর দিয়ে উপরে ওঠে এবং পাতায় ছড়িয়ে পড়ে।

পাতা
[Leaf]

12

12.1. সূচনা [*Introduction*] :

ফুল ফোটার আগে সম্ভবত পাতাই উদ্ভিদের সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি-আকর্ষী অঙ্গ। মাঠ, বন, গভীর অরণ্য যে দিকেই দৃষ্টি যাক না কেন, সর্বত্রই সবুজের মেলা। উদ্ভিদ-অঙ্গে পাতার সমারোহ এবং সর্বোপরি তাতে ক্লোরোফিলের প্রাচুর্যই পাতার শ্যামলিমার রহস্য। ক্লোরোফিলের সাহায্যে সবুজ উদ্ভিদ প্রধানত পাতায় শর্করা খাদ্য উৎপাদন করে। প্রকৃতপক্ষে **পাতাই উদ্ভিদের রান্নাঘর।** তাই উদ্ভিদ-জীবনে পাতার গুরুত্ব অপরিসীম। কান্ড বা শাখা-প্রশাখার পর্ব থেকে পাতা উৎপন্ন হয়। পাতার কক্ষ থেকে কাক্ষিক মুকুল জন্মায়। সাধারণত পাতার আকৃতি চ্যাপ্টা, রং সবুজ এবং বৃদ্ধি নির্দিষ্ট।

● **পাতার সংজ্ঞা** (Definition of leaf) : **পাতা কান্ডের অসদৃশ** (dissimilar), **চ্যাপ্টা পার্শ্বজ অঙ্গ।**

12.2. আদর্শ পাতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য [*Some characteristics of typical leaf*] :

(1) আদর্শ পাতা প্রধানত **পত্রমূল** (Leaf-base or Hypopodium), **পত্রবৃন্ত** (Petiole or Mesopodium) এবং **ফলক** (Leaf blade or lamina or Epipodium)—এই তিনটি অংশে বিভক্ত।

(2) আদর্শ পাতার কক্ষে সর্বদা মুকুল থাকে।

(3) অধিক পরিমাণে সূর্যালোক শোষণের জন্য আদর্শ পাতা যথাসম্ভব চ্যাপ্টা হয়।

(4) আদর্শ পাতার সজ্জারীতি ও অবস্থান এবং গঠন উপযুক্ত সূর্যালোক শোষণের অনুকূল।

(5) আদর্শ পাতার রং স্বাভাবিক অবস্থায় সবুজ।

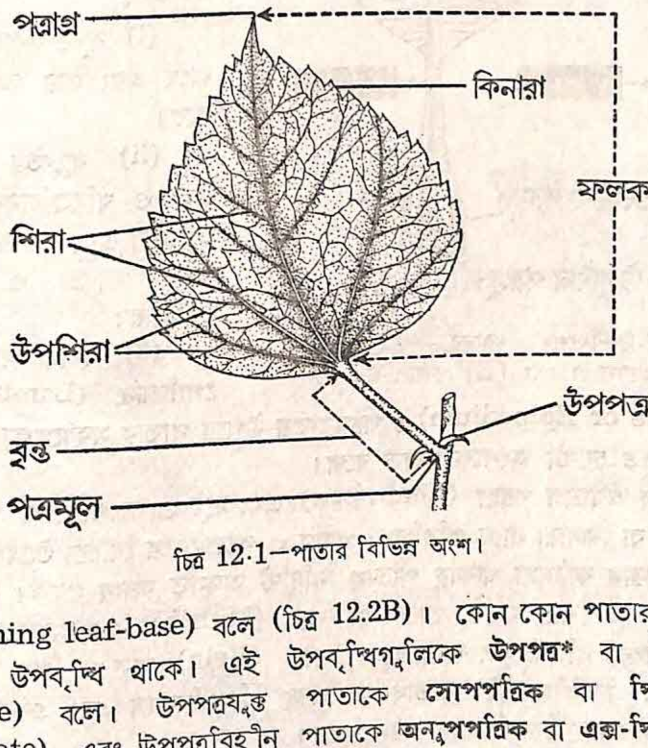
(6) আদর্শ পাতায় সুনির্দিষ্ট রীতিতে পত্ররন্ধ্র সজ্জিত থাকে।

12.3. পাতার বিভিন্ন অংশ [*Different parts of a typical leaf*] :

একটি আদর্শ পাতা সাধারণত তিনটি অংশে বিভক্ত : **পত্রমূল, বৃন্ত** ও **ফলক।**

(1) **পত্রমূল বা হাইপোপোডিয়ম** (Leaf-base or Hypopodium) ঃ **পাতা যে অংশে কান্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে, সেই অংশটিকে পত্রমূল বলে।** অধিকাংশ পাতার পত্রমূল সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট।

আম, অপরাজিতা, লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের পত্রমূল স্ফীত হয়। এই ধরনের পত্রমূলকে **উপাধান পত্রমূল** বা **পালভিনাস** (Pulvinus) বলে (চিত্র 12.2A)। কলা, ঘাস প্রভৃতির পত্রমূল প্রসারিত হয়ে কান্ডকে সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন করে থাকে। এই ধরনের পত্রমূলকে **কান্ডবেষ্টক পত্রমূল** বা **সিদিং লিফবেস**



চিত্র 12.1—পাতার বিভিন্ন অংশ।

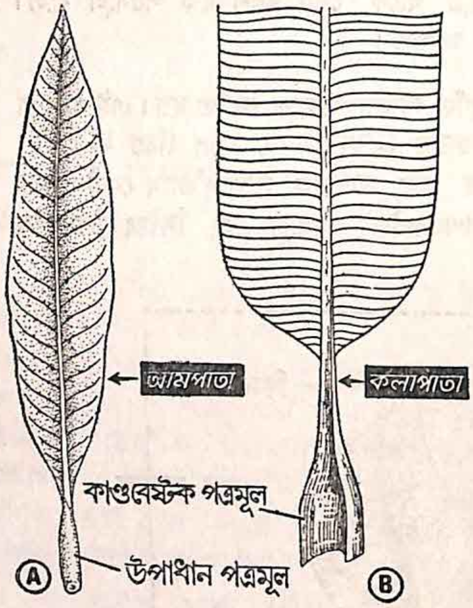
(Sheathing leaf-base) বলে (চিত্র 12.2B)। কোন কোন পাতার পত্রমূলে পার্শ্বজ উপবৃদ্ধি থাকে। এই উপবৃদ্ধিগুলিকে **উপপত্র*** বা **স্টিপিউল** **(Stipule)** বলে। উপপত্রযুক্ত পাতাকে **সোপপত্রিক** বা **স্টিপিউলেট** **(Stipulate)** এবং উপপত্রবিহীন পাতাকে **অনুপপত্রিক** বা **এক্স-স্টিপিউলেট** **(Exstipulate)** পত্র বলে।

● **পত্রমূলের কাজ** (Function of leaf-base) ঃ পত্রমূল পাতাকে কান্ড ও তার শাখা-প্রশাখার সঙ্গে যুক্ত রাখে।

(2) **পত্রবৃন্ত বা মেসোপোডিয়ম** (Petiole or Leaf-stalk or Mesopodium) সাধারণত যে দন্ডাকার অংশটি পত্রমূল ও উপরের বিস্তৃত চ্যাপ্টা ফলকের মধ্যে সংযোগ সাধন করে, তাকে পত্রবৃন্ত বলে। পত্রবৃন্ত ফলকের ভার

* 12.3, 12.4 ও 12.5 চিত্রে কয়েক প্রকার পরিবর্তিত উপপত্র দেখান হল।

বহন করে এবং ফলককে সূর্যালোকে মেলে ধরে। বৃন্ত থাকলে পাতাকে **সবৃন্তক** (Sessile) বলে, যেমন—জবা। বৃন্ত না থাকলে পাতাকে **অবৃন্তক** (Sessile) বলা হয়, যেমন—ধান।



চিত্র 12·2—বিশেষ ধরনের পত্রমূল: (A) আমপাতা এবং (B) কলাপাতা।

● **বৃন্তের কাজ** (Functions of Petiole) :

(i) বৃন্ত ফলককে ধরে রাখে এবং তার ভার বহন করে।

(ii) বৃন্তের মাধ্যমে জল ও খনিজ লবণ ফলকে পৌঁছায় এবং ফলকে উৎপন্ন খাদ্য কান্ড ও মূলে পৌঁছায়।

(3) **ফলক** বা **এপিপোডিয়ম** (Lamina or leaf blade or Epipodium) : পত্রবৃন্তের উপরে পাতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিস্তৃত চ্যাপ্টা অংশকে **ফলক** বলে।

ফলকের অগ্রভাগ **পত্রাগ্র** (Leaf-apex) এবং দুই প্রান্ত **পত্রপ্রান্ত** (Leaf-margin) বা কিনারা নামে পরিচিত। পত্রাগ্র ও পত্রপ্রান্তের বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। **শিরা-উপশিরার** কাঠামো থাকায় পাতার নির্দিষ্ট আকৃতি বজায় থাকে। ফলকের মাঝ-বরাবর যে শিরা থাকে, তাকে **মধ্যশিরা** (Midrib) এবং মধ্যশিরার দুপাশে বিস্তৃত বলিষ্ঠ শাখাগুলিকে **শিরা** (Vein) বলে। শিরা ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে দ্বিবীজপত্রী পাতায় **জালিকা শিরাবিন্যাস** এবং একবীজপত্রী পাতায় **সমান্তরাল শিরাবিন্যাস** গঠন করে।

● **ফলকের কাজ** (Functions of lamina) :

(i) পাতায় ফলক ক্লোরোফিল যুক্ত হওয়ায় সেখানে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শর্করা খাদ্য উৎপন্ন হয়।

(ii) ফলকের মাধ্যমে বাষ্পমোচন ঘটে।

(iii) ফলক শ্বাসকার্যে সহায়তা করে।

ফলকে শিরা-উপশিরা থাকার জন্যই পাতার দৃঢ়তা বজায় থাকে। শিরাগুলি প্রধানত ভ্যাস্কুলার টিসু বা সংবহন কলা দ্বারা গঠিত। মূলের, কান্ডের ও পাতার সংবহন কলা ক্রমান্বয়ে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত।

সেজন্যই মূল দ্বারা শোষিত জল ও জলে দ্রবীভূত অজৈব লবণ ফলকের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে একদিকে যেমন দেহ পুষ্ট হয়, অন্যদিকে তেমনি পাতা স্বচ্ছন্দে শর্করা উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। পাতায় উৎপন্ন খাদ্য শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়েই সর্বত্র পরিচালিত হয়।

12.4. উপপত্র *[Stipule]* :

(i) **মুক্তপার্শ্বীয়**—পত্রমূলের দুপাশে অবস্থিত পরস্পর মুক্ত সূত্রাকার উপপত্র (জবাপাতা, ঢেঁড়স পাতা) ;

(ii) **বৃন্তলগ্ন**—উপপত্রদ্বয়ের নিম্নাংশ বৃন্তের সঙ্গে সংযুক্ত (গোলাপ পাতা) ;

(iii) **কাক্ষিক**—উপপত্রদ্বয় সংযুক্ত হয়ে পাতার কক্ষে অবস্থান করে (গন্ধরাজ পাতা) ;



চিত্র 12·3—কয়েক প্রকার উপপত্র : ক—জবা ; খ—গোলাপ ; গ—গন্ধরাজ।



চিত্র 12·4—কয়েক প্রকার উপপত্র : ক—রঙ্গন ; খ—পানমরিচ ; গ—মটর।

(iv) **বৃন্তমধ্যক**—বেগুন পাতা ;
(v) **কান্ডবেষ্টক**—পানমরিচ পাতা ;
(vi) **ফলকাকার**—পরিবর্তিত উপপত্র (মটর পাতা) ;
(vii) **আকর্ষীভূত**—পরিবর্তিত উপপত্র (কুমারিকা পাতা) ;
(viii) **কণ্টকাকার**—পরিবর্তিত উপপত্র (কুল পাতা) ;
(ix) **মকুলাবরণ শল্ক**—পরিবর্তিত পাতা (কাঁঠাল)।

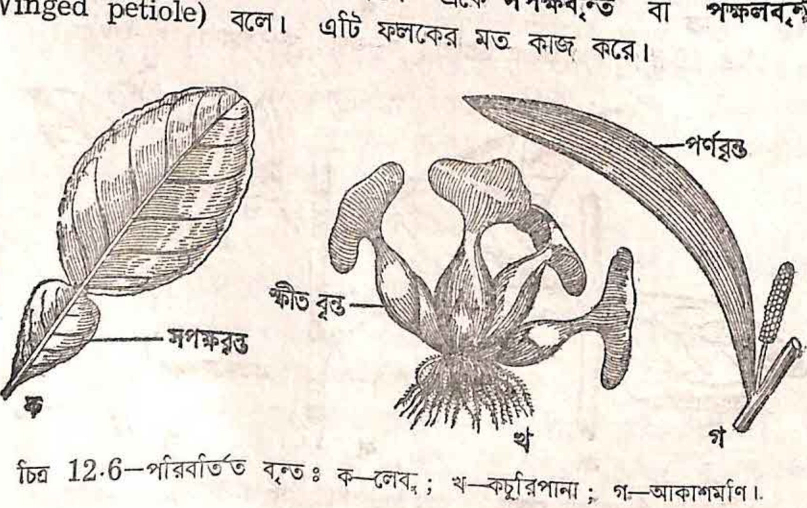


চিত্র 12·5—কয়েকটি পরিবর্তিত উপপত্র : ক—কুমারিকা ; খ—কুল ; গ—কাঁঠাল।

12.5. বৃন্তের পরিবর্তন [*Modification of Petioles*] :

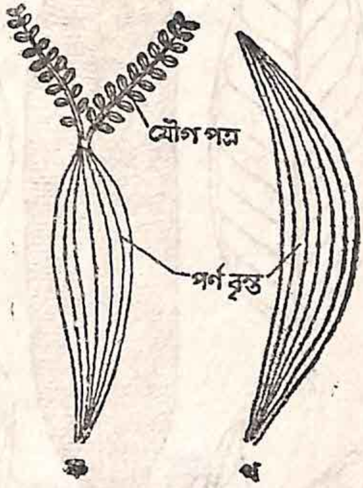
বিশেষ কাজে লিপ্ত থাকার জন্য বৃন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়। যেমন—

(i) লেবুর বৃন্ত পাতার মত। একে **সপক্ষবৃন্ত** বা **পক্ষলবৃন্ত** (Winged petiole) বলে। এটি ফলকের মত কাজ করে।



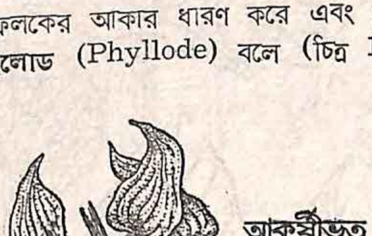
চিত্র 12·6—পরিবর্তিত বৃন্ত : ক—লেবু ; খ—কচুরিপানা ; গ—আকাশমণি।

(ii) কচুরিপানার বৃন্ত ফোলা স্পঞ্জের মতো। একে **স্ফীতবৃন্ত** (Swollen petiole) বলে। জলে ভেসে থাকার জন্য এগুলির কোষে প্রচুর বাতাস ভরা থাকে।



চিত্র 12·7—আকাশমণি পাতা: ক—অপরিণত অবস্থায়; খ—পরিণত অবস্থায়।

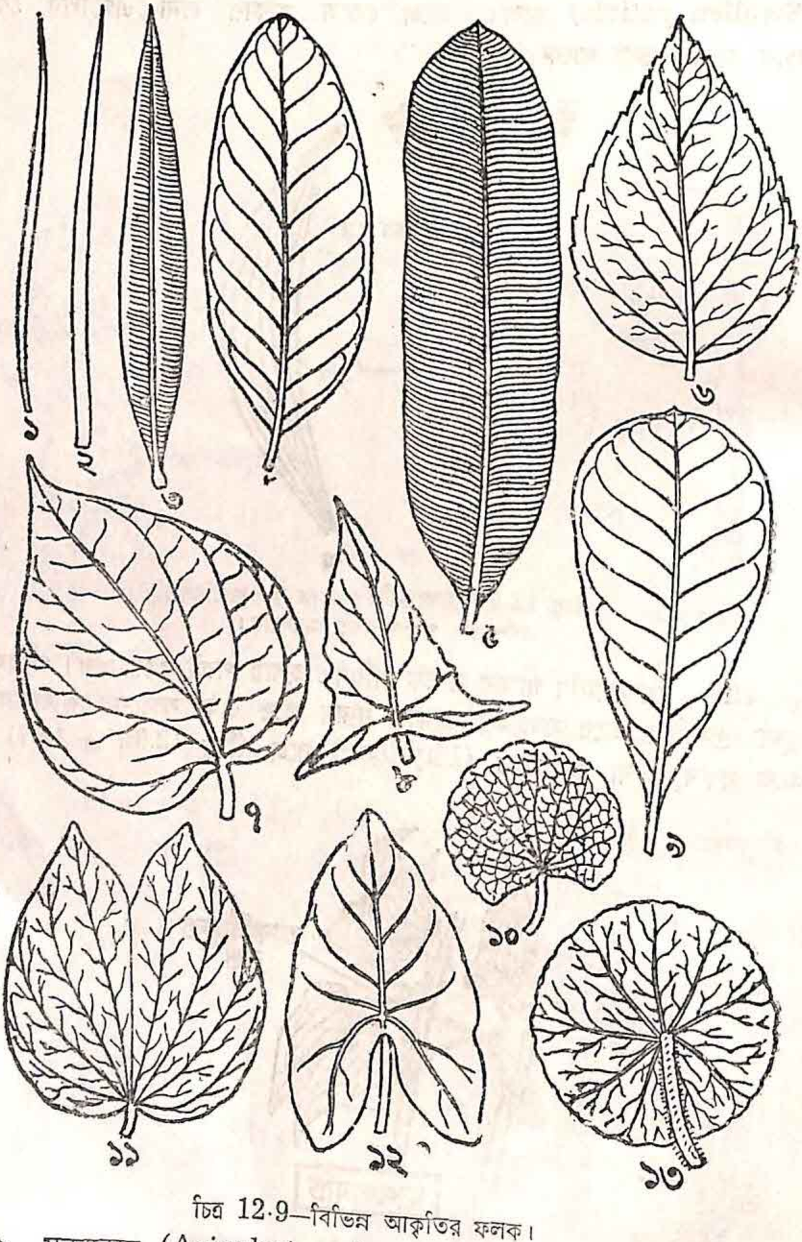
(iii) আকাশমণি গাছের ফলক পরিণত হবার পরই ঝরে যায়। পরিবর্তে বৃন্ত প্রসারিত হয়ে ফলকের আকার ধারণ করে এবং ফলকের কাজ করে। একে **পর্ণবৃন্ত** বা **ফাইলোড** (Phyllode) বলে (চিত্র 12.6গ ও 12.7)।



চিত্র 12·8—ছাগলবাটির আকর্ষীভূত বৃন্ত।

(iv) ছাগলবাটির বৃন্ত আকর্ষের মত হয়ে আশ্রয়কে জড়িয়ে ধরে। একে আকর্ষীভূত বৃন্ত (Tendrillar petiole) বলে।

12.6. বিভিন্ন আকৃতির ফলক [*Different shapes of Lamina*] :

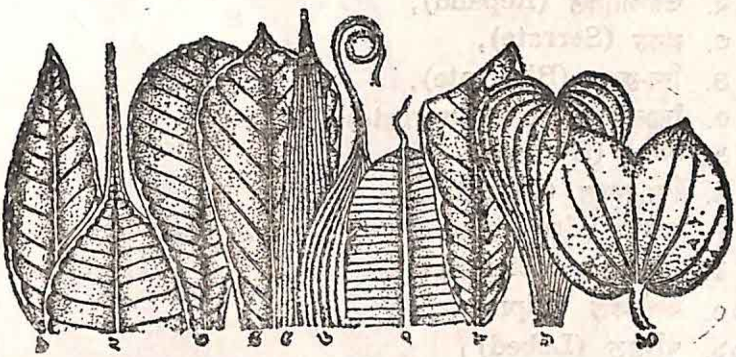


চিত্র 12.9—বিভিন্ন আকৃতির ফলক।

১. সূচ্যাকার (Acicular)—পাইন ;
২. রেখাকার (Linear)—ঘাস ;
৩. ভল্লাকার (Lanceolate)—করবী ;

৪. উপবৃত্তাকার (Elliptical)—নয়নতারা ;
৫. আয়তাকার (Oblong)—কলা ;
৬. ডিম্বাকার (Ovate)—জবা ;
৭. তাম্বূলাকার (Cordate)—পান ;
৮. কলম্বপত্রাকার (Hestate)—কলমি ;
৯. বিডিম্বাকার (Obovate)—কাজুবাদাম ;
১০. বৃক্কাকার (Reniform)—থানকুনি ;
১১. বিতাম্বূলাকার (Obcordate)—কাঞ্চন ;
১২. মানকপত্রাকার (Sagittate)—মানকচু ;
১৩. বৃত্তাকার (Orbicular)—পদ্ম।

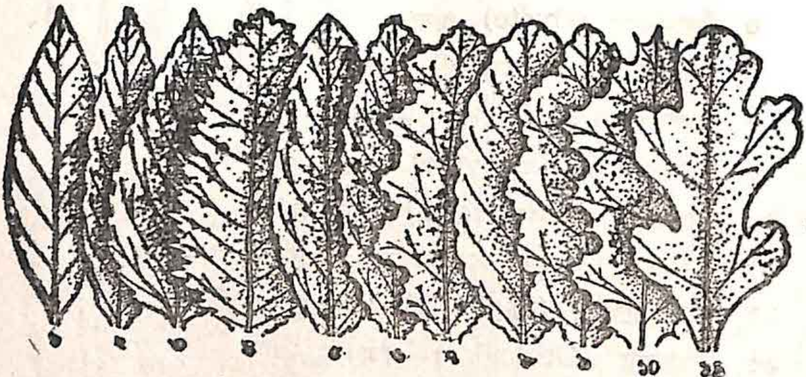
12.7. বিভিন্ন প্রকার পত্রাগ্র [*Different types of leaf-apex*] :



চিত্র 12·10—বিভিন্ন প্রকার পত্রাগ্র।

১. সূক্ষ্মাগ্র (Acute)—আম,
২. দীর্ঘাগ্র (Acuminate)—অশ্বত্থ,
৩. স্থূলাগ্র (Obtuse)—কাঠবাদাম,
৪. সূক্ষ্ম খর্বাগ্র (Mucronate)—নয়নতারা,
৫. কণ্টকিত (Spiny)—আনারস,
৬. আকর্ষীভূত (Tendrillar)—উলটচণ্ডাল,
৭. সূত্রাগ্র (Cirrhose)—কলা,
৮. খণ্ডিতাগ্র (Truncate)—সাগু,
৯. খাঁজযুক্ত (Emarginate)—বড়পানা,
১০. ভাঁজযুক্ত (Retuse)—কাঞ্চন।

12.8. বিভিন্ন প্রকার পত্র প্রান্ত *[Different types of leaf-margin] :*



চিত্র 12.11—বিভিন্ন প্রকার পত্রপ্রান্ত।

১. অখণ্ড (Entire),
২. তরঙ্গায়িত (Repand),
৩. ক্রকচ (Serrate),
৪. দ্বি-ক্রকচ (Biserrate),
৫. বিক্রকচাকার (Retroserrate),
৬. দন্তর (Dentate),
৭. দ্বি-দন্তর (Bidentate),
৮. সভঙ্গ (Crenate),
৯. দ্বি-সভঙ্গ (Bicrenate),
১০. কণ্টকিত (Sipny),
১১. খণ্ডিত (Lobed)।

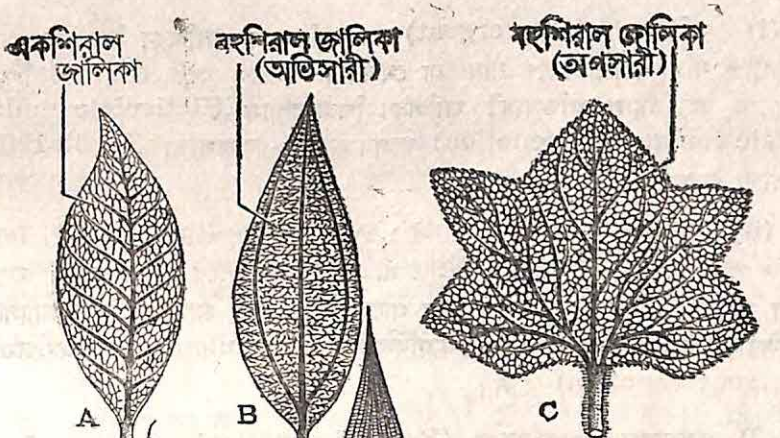
12.9. শিরাবিন্যাস বা ভেনেসান *[Venation] :*

● শিরাবিন্যাসের সংজ্ঞা (Definition of venation) ঃ **ফলকে শিরা ও উপশিরার বিন্যাসরীতিকে শিরাবিন্যাস বলে।**

শিরাবিন্যাস প্রধানতঃ দু' প্রকার—**জালিকা** (Reticulate) **শিরাবিন্যাস** ও **সমান্তরাল** (Parallel) **শিরাবিন্যাস।**

(1) **জালিকা শিরাবিন্যাস** (Reticulate venation) ঃ **জালিকা-বিন্যাসে শিরাগুলি ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে শিরার জাল সৃষ্টি করে।** মাটিতে চাপা পড়া একটি অশ্বত্থ পাতাকে কিছুদিন পরে উঠিয়ে আলোয় মেলে ধরলে জালিকা-বিন্যাস সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। জালিকা শিরাবিন্যাস **একশিরাল** অথবা **বহুশিরাল।**

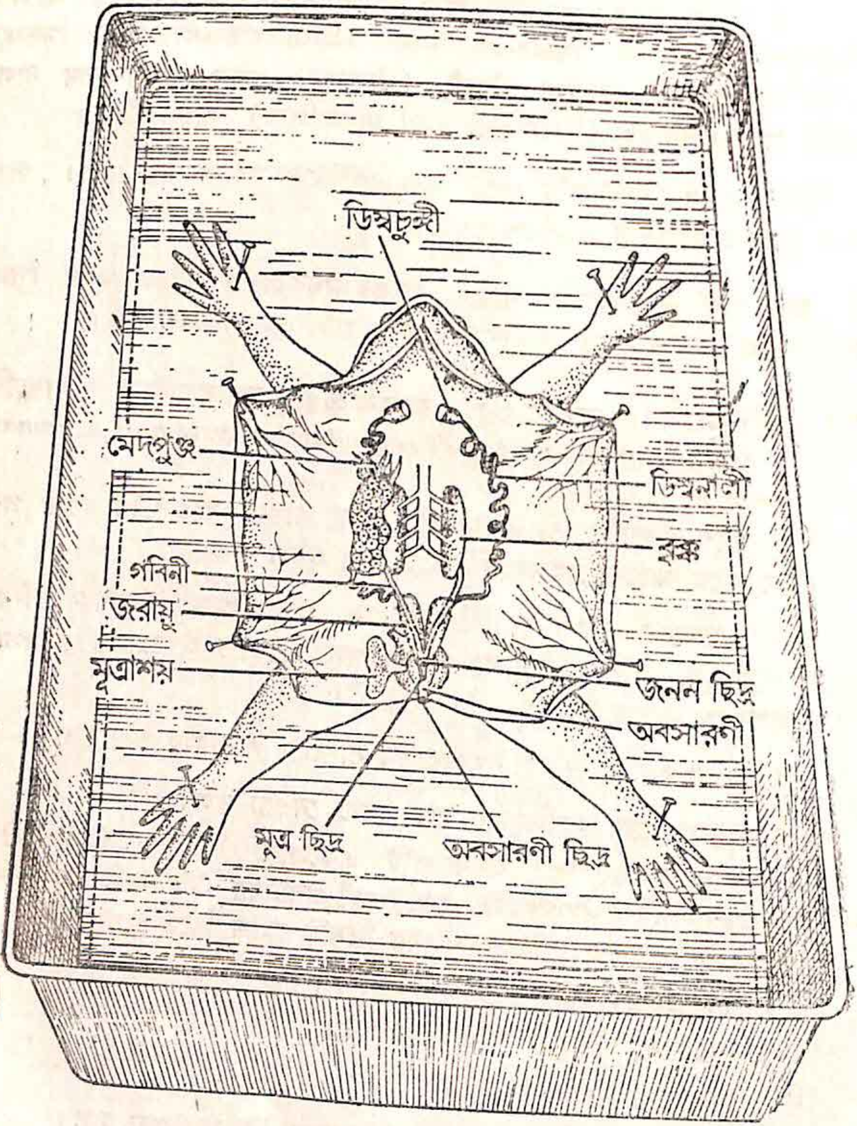
(a) **একশিরাল জালিকা** (Unicostate Reticulate) : অশ্বত্থ, আম (চিত্র 12.12A), জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছের পাতার ফলকে মাঝ-বরাবর একটি **মধ্যশিরা** (Midrib) থাকে। মধ্যশিরার দু'পাশ থেকে শিরার উদ্ভব হয়।



চিত্র 12·12—বিভিন্ন প্রকার শিরাবিন্যাস :
A—আম (একশিরাল জালিকা), B—তেজপাতা (বহুশিরাল জালিকা অভিসারী), C—কুমড়াপাতা (বহুশিরাল জালিকা অপসারী), D—কলাপাতা (একশিরাল সমান্তরাল), E—বাঁশ পাতা (বহুশিরাল সমান্তরাল অভিসারী), F—তালপাতা (বহুশিরাল সমান্তরাল অপসারী)।

জালিকা শিরাবিন্যাসে পাতায় একটি স্থূল মধ্যশিরা থাকলে সেই শিরাবিন্যাস **একশিরাল** বা **পক্ষল** (Unicostate or Pinnate) **জালিকা**।

● পূর্ব নির্দেশমতো জননতন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন অংগ পিনফ্ল্যাগ দিয়ে নির্দেশ ক'রে জননতন্ত্রের ছবি আঁক ও লেবেল কর।



চিত্র 18.9—স্ত্রী কুনো ব্যাঙের ব্যবচ্ছেদিত জননতন্ত্র।

মনুষ্য জীবন সম্পর্কিত জীব 19

[Organisms in relation to Human Life]

19.1. সূচনা [*Introduction*] :

মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখেই অন্যান্য জীবের গুরুত্ব নির্ধারিত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় জীব-গোষ্ঠীই সংখ্যায় অগণিত। এদের আকার, প্রকৃতি ও জীবনযাপন প্রণালী অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। জগতে অগণিত উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকলেও কেবল জীবন ধারণের জন্য অঙ্গাঙ্গি জড়িত উদ্ভিদ বা প্রাণীই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নীচে মনুষ্যজীবন সম্পর্কিত কয়েকটি অতি পরিচিত জীব সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

19.2. উদ্ভিদ [*Plants*] :

(1) তুলা (Cotton)

পৃথিবীতে তন্তু উৎপাদনকারী উদ্ভিদের মধ্যে তুলার চাহিদা ও উৎপাদন বেশী, তুলনামূলকভাবে তুলার দামও সস্তা। অতি প্রাচীনকাল থেকেই তুলা মানুষের পরিচিত। গ্রীক ও রোমান গ্রন্থে তুলার উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টপূর্ব 1800 থেকে ভারতে তুলার ব্যবহার শুরু হয়েছে। পরবর্তীকালে 1500 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতই ছিল তুলাশিল্পের প্রাণকেন্দ্র।

হিন্দুরা সর্বপ্রথম তুলার কাপড় বোনা শুরু করলেও মুসলমানরাই ইউরোপকে সর্বপ্রথম তুলার সঙ্গে পরিচিত করান। কিন্তু পৃথিবীর সর্বোচ্চ তুলা উৎপাদক দেশ হিসাবে শীর্ষস্থান দখল করে আছে আমেরিকা। দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী যৌথভাবে ভারত ও পাকিস্তান। অন্যান্য তুলা উৎপাদন-কারী দেশের মধ্যে রাশিয়া, চীন, মিশর, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশের নাম করা যায়।

বিভিন্ন জাতির কার্পাস গাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার তুলা পাওয়া যায়। বীজের উপরের সূক্ষ্ম তন্তুময় রোমই তুলা নামে পরিচিত। তুলা গাছ আসলে বহুবর্ষজীবী গুল্ম। চাষের সুবিধার জন্য এই গাছকে বর্ষজীবী পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। তুলা গাছ প্রচুর শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে দেড় থেকে আড়াই মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। জলের নিকটবর্তী স্যাঁতস্যাঁতে বালুকাময় মাটিতে তুলার চাষ ভাল হয়। এজন্য ভারত, মিশর ও অন্যান্য তুলা উৎপাদন-কারী দেশের নদী-উপত্যকায় ফলন বেশী। **তুলা পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যেই সংগ্রহের উপযোগী হয়ে যায়।**

(b) **বহুশিরাল জালিকা** (Multicostate Reticulate) : **মধ্যশিরার পরিবর্তে একই স্থান থেকে বহু স্থূল শিরার উদ্ভব** হলে, তাকে **বহুশিরাল বা করতলাকার** (Multicostate or Palmate) **জালিকা** বলা হয়।

বহুশিরাল জালিকা বিন্যাস দু'প্রকার—

(i) **অভিসারী** (Convergent) : বহুশিরাল জালিকা বিন্যাসে স্থূল শিরাগুলি যদি পত্রাগ্রে মিশে যায় বা মেশবার উপক্রম করে, তবে সেই শিরা-বিন্যাসকে **বহুশিরাল অভিসারী জালিকা শিরাবিন্যাস** (Reticulate multi-costate convergent venation) বলে। যেমন—**তেজপাতা** (চিত্র 12.12B), **কুলপাতা** ইত্যাদি।

(ii) **অপসারী** (Divergent) : **লাউ, কুমড়া** (চিত্র 12.12C), **ঝিঙে** প্রভৃতি পাতায় স্থূল শিরাগুলি মিলিত না হয়ে ক্রমশঃ দূরে ছড়িয়ে যায়। ফলে, এদের আদৌ মিলিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। এই জাতীয় শিরাবিন্যাসকে **বহুশিরাল অপসারী জালিকা শিরাবিন্যাস** (Reticulate multicostate divergent venation) বলে।

(2) **সমান্তরাল শিরাবিন্যাস** (Parallel venation) : **সমান্তরাল শিরা-বিন্যাসে শিরা-উপশিরাগুলি জাল সৃষ্টি না ক'রে সর্বদা একে অপরের সমান্ত-রালে বিন্যস্ত থাকে।** সমান্তরাল শিরাবিন্যাসও যথারীতি **একশিরাল** বা **বহু-শিরাল** হয়।

(a) **একশিরাল সমান্তরাল** (Unicostate Parallel) : একটি মধ্য-শিরার দুপাশে পাখীর পালকের মত বিন্যস্ত শিরাগুলি ও শিরা থেকে উৎপন্ন শাখাশিরাগুলি যখন পরস্পর সমান্তরালে বিন্যস্ত হয়, তখন তাকে একশিরাল সমান্তরাল শিরাবিন্যাস বলে। উদাহরণ—**কলাপাতা** (12.12D), **কলাবতী পাতা** ইত্যাদি।

(b) **বহুশিরাল সমান্তরাল** (Multicostate Parallel) : একই স্থান থেকে বহু স্থূল শিরার উদ্ভব হলে এবং সেগুলি পরস্পর সমান্তরালে বিন্যস্ত থাকলে, সেই শিরাবিন্যাসকে বহুশিরাল সমান্তরাল শিরাবিন্যাস বলে। বহুশিরাল শিরাবিন্যাস যথারীতি অভিসারী বা অপসারী হয়।

(i) **অভিসারী : বাঁশপাতায়** (চিত্র 12.12E) **বহুশিরাল অভিসারী সমান্তরাল শিরাবিন্যাস** (Multicostate parallel convergent venation) দেখা যায়।

(ii) **অপসারী** (Multicostate parallel divergent venation) : **তালপাতায়** (চিত্র 12.12F) **বহুশিরাল অপসারী সমান্তরাল শিরাবিন্যাস** দেখা যায়। পর পৃষ্ঠায় শিরাবিন্যাসের ছক দেওয়া হল :

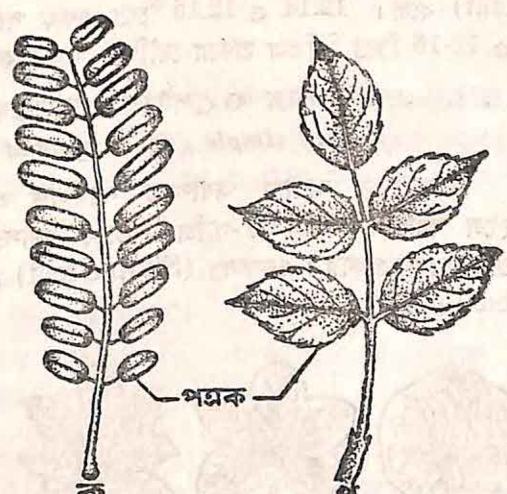
শিরাবিন্যাস (Venation)

- জালিকাকার (Reticulate)
  - একশিরাল (Unicostate) — আমপাতা
  - বহুশিরাল (Multicostate)
    - অভিসারী (Convergent) (তেজপাতা)
    - অপসারী (Divergent) (কুমড়াপাতা)
- সমান্তরাল (Parallel)
  - একশিরাল (Unicostate) — কলাপাতা
  - বহুশিরাল (Multicostate)
    - অভিসারী (Convergent) (বাঁশপাতা)
    - অপসারী (Divergent) (তালপাতা)

12.10. একক পত্র ও যৌগিক পত্র [*Simple leaf and compound leaf*] :

● **একক পত্রের সংজ্ঞা** (Definition of simple leaves) : **যে পাতা একটিমাত্র অখণ্ড ফলক বা আংশিকভাবে কর্তিত ফলক দ্বারা গঠিত, তাকে একক পত্র বলে।**

● **যৌগিক পত্রের সংজ্ঞা** (Definition of compound leaves) : **যে পাতার ফলকের কিনারা সম্পূর্ণভাবে কর্তিত হয়ে মধ্যশিরা স্পর্শ করার পর ছোট ছোট পাতার আকৃতি-বিশিষ্ট পত্রক (Leaflet) গঠন করে তাকে যৌগিক পত্র বলে।**



চিত্র 12·13—যৌগিক পত্র : ক—তেঁতুল, খ—গোলাপ।

আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছের পাতার ফলকের কিনারা একটানা—মোটেই কর্তিত নয়। কিন্তু মূলা, সরিষা, চন্দ্রমল্লিকা, শেয়ালকাঁটা, গাঁদা প্রভৃতি গাছের পাতার কিনারা আংশিকভাবে কর্তিত।

কর্তনের গভীরতার তারতম্য ঘটলেও উভয় ক্ষেত্রেই পাতার কক্ষে মুকুল থাকে। পত্রকগুলি বৃন্তের প্রলম্বিত অংশ অর্থাৎ **পত্রক-অক্ষ বা র‍্যাকিসের**

কৃত্রিম প্রজনন পন্থা অনুসরণে তুলা গাছের শত শত সংকর প্রজাতি উদ্ভাবিত হয়েছে। তাই চরিত্র ও প্রকৃতি বিচারে তুলা নানা ধরনের। আমাদের দেশে **গসিপিয়ম হারবেসিয়ম** (*Gossypium herbaceum*) নামক **তুলা** গাছের চাষই বেশী হয়।



চিত্র 19.1 : ক ও খ—দু'প্রকার কার্পাস তুলা গাছ ; ক' ও খ'—তুলা ফল।

ইরান, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেও এই প্রজাতির চাষ বেশী হয়। এই তুলা থেকে কাপড়, কার্পেট, চাদর প্রভৃতি উৎপাদন হয়। উলের সঙ্গেও এই তুলা মেশান হ'য়ে থাকে। সর্বোচ্চ মানের তুলা উৎপাদক দেশ মিশর। এই দেশের তুলা **মিশরীয় তুলা** (Egyptian cotton) নামে খ্যাত।

বীজ থেকে তুলা পৃথক করার সহজ পদ্ধতি বহুদিন পর্যন্ত অজ্ঞাত থাকায়, তুলা উৎপাদন অত্যধিক ব্যয়সাধ্য ছিল। ইদানিং বহু উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে তুলাশিল্পে বিপ্লব এসেছে। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তুলা এখন পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তন্তু।

● **তুলার ব্যবহার ও গুরুত্ব (Use and importance of cotton) ঃ** তুলা গাছের বিভিন্ন অংশ নানাভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন—

(i) শুধু তুলা এবং সময় বিশেষে তুলার সঙ্গে অন্যান্য তন্তু মিশিয়ে নানা প্রকার বস্ত্র উৎপাদিত হয়।

(ii) আজকাল কস্টিক সোডা প্রয়োগে তন্তুগুলিকে অত্যুজ্জ্বল ও সিল্কসদৃশ করা হয়। এই পদ্ধতিকে **মারসিরাইজ (Mercerize)** করা বলে।

(iii) ভালভাবে পরিষ্কার করা তন্তুগুলির তৈলাক্ত আবরণী অপসারণ করে **শোষক তুলা (Absorbent cotton)** উৎপাদন হয়। এই তুলা চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

(iv) বয়নশিল্পে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আগে পরিত্যক্ত হোত তুলার এমন সব অংশও আজকাল কাজে লাগানো হয়। পূর্বে বীজ ও অন্যান্য সব অংশ অপ্রয়োজনীয় বস্তু মনে করে ফেলে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। আজকাল তুলা গাছের প্রায় সব অংশই কাজে লাগে। এতে বহু টাকার সাশ্রয় হয়।

(v) তুলার কান্ড ভাল জ্বালানি। কান্ড-তন্তু কাগজশিল্পে ব্যবহৃত হয়।

(vi) ঔষধ উৎপাদনে তুলার মূল কাজে লাগে।

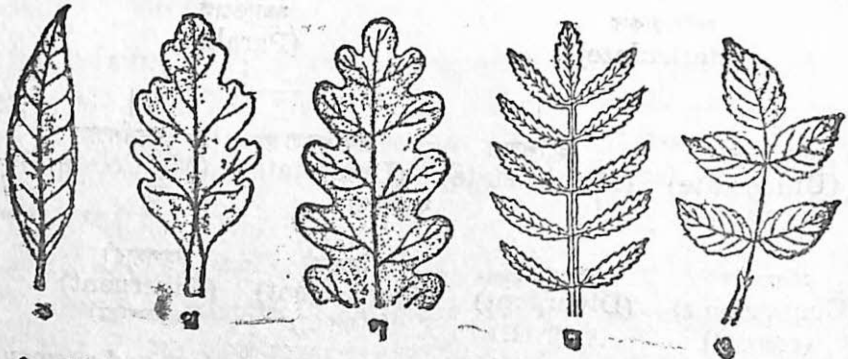
(vii) তুলা গাছের বীজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী। তুলাবীজ থেকে রন্ধনযোগ্য তেল উৎপন্ন হয়।

(viii) তুলার খইল হইতে সার, গবাদিপশুর খাদ্য ও ময়দা উৎপন্ন হয়।

(2) পাট (Jute)

তন্তু উৎপাদক উদ্ভিদের মধ্যে তুলার পরেই পাটের স্থান। তুলা অপেক্ষা পাটের মূল্য অনেক কম হলেও সম্ভবত পাটই সর্বাধিক ব্যবহৃত তন্তু। পাট গাছের ছাল থেকে পাট উৎপন্ন হয়। **করকোরস ক্যাপসুলারিস** (*Corchorus capsularis*) এবং **করকোরস ওলিটোরিয়স** (*Corchorus olitorius*) নামে দু'প্রকার গাছ থেকে পাট উৎপন্ন হয়। তবে **হিবিসকস ক্যানাবিনস** (*Hibiscus cannabinus*) নামক গাছ থেকেও একপ্রকার নিকৃষ্ট ধরনের পাট পাওয়া যায়। এই পাট সাধারণের কাছে **ম্যাস্তা পাট** নামে পরিচিত।

(Rachis) দুপাশে (যেমন, তেঁতুল—চিত্র 12·13ক) অথবা দুপাশে ও অগ্রবিন্দুতে যুক্ত থাকে (যেমন, গোলাপ—চিত্র 12·13খ)। এই ধরনের পাতাকে **পক্ষল যৌগিক পত্র** (Pinnate compound) বলে (চিত্র 12.13)। পত্রক-



চিত্র 12·14ঃ ক—জালিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত একক পত্র এবং ঙ—পক্ষল যৌগিক পত্র, খ-ঘ—একক পত্র থেকে পক্ষল যৌগিক পত্রের উৎপত্তির অন্তর্বর্তী দশাসমূহ।

গুলি বৃন্তের আগায় একটি বিন্দুতে **যুক্ত থাকলে** (যেমন—ছাতিম, চিত্র 12·15ঙ), সেই পাতাকে **করতলাকার যৌগিক পত্র** (Palmate compound leaf) বলে। 12.14 ও 12.15 চিত্রে একক পত্র থেকে যৌগিক পত্রের বিবর্তন ও 12·16 চিত্রে বিভিন্ন প্রকার যৌগিক পত্রের আকৃতি দেখান হল।

12.11. একক পত্র ও যৌগিক পত্রের প্রকারভেদ [*Different types of simple and compound leaves*] :

পত্রবৃন্তের আগায় অবস্থিত পত্রফলক অখণ্ডিত বা খণ্ডিত। খণ্ডিত হ'লে **পত্রক** (Leaflets)-গুলি কিভাবে বিন্যস্ত তার উপর ভিত্তি ক'রে পাতা প্রধানতঃ দু প্রকার ঃ **এককপত্র** (Simple leaf) এবং **যৌগিকপত্র** (Compound leaf)।



চিত্র 12·15ঃ ক—করতলাকার জালিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত একক পত্র এবং ঙ—করতলাকার যৌগিক পত্র, খ-ঘ—একক পত্র থেকে করতলাকার যৌগিক পত্রের উৎপত্তির অন্তর্বর্তী দশাসমূহ।

(1) **একক পত্র** (Simple leaf) ঃ এক্ষেত্রে পাতার ফলকটি অখণ্ডিত অথবা খণ্ডিত হলেও খণ্ডনের গভীরতা কখনই মধ্যশিরা স্পর্শ করে না। উদাহরণ—**আম, জাম, কাঁঠাল** ইত্যাদি।

(2) **যৌগিক পত্র** (Compound leaf) ঃ এক্ষেত্রে ফলকটি খণ্ডিত হ'য়ে একাধিক পত্রক-এ বিভক্ত হয় এবং খণ্ডভবনের গভীরতা মধ্যশিরা স্পর্শ করে। এইভাবে যৌগিক পত্রের বৃন্তশীর্ষে দুই বা ততোধিক পত্রক গঠিত হয়। পাতার কক্ষে কাক্ষিক মুকুল থাকে। কিন্তু পত্রক-কক্ষে (Axil of the leaflets) কাক্ষিক মুকুল থাকে না।

যৌগিক পত্র প্রধানত দু'প্রকার ঃ

(i) **পক্ষল যৌগিক পত্র** (Pinnate Compound leaf) এবং

(ii) **করতলাকার যৌগিক পত্র** (Palmate Compound **leaf)**।

(1) **পক্ষল যৌগিক পত্র** (Pinnate Compound leaf) ঃ পাতার পত্রকগুলি পত্রক-অক্ষের (Rachis) দু'পাশে পাখীর পালকের মত বিন্যস্ত থাকলে তাকে পক্ষল যৌগিক পত্র বলে।

পক্ষল যৌগিক পত্র দু'প্রকার ঃ—

(a) **অচূড় পক্ষল যৌগিক পত্র** (Paripinnate Compound leaf) ঃ এক্ষেত্রে পক্ষল যৌগিক পত্রের পত্রকগুলি পত্রক-অক্ষের দু'পাশে জোড়ায়-জোড়ায় অবস্থান করে।

উদাহরণ—**তেঁতুল** (চিত্র 12.13ক)।

(b) **সচূড় পক্ষল যৌগিক পত্র** (Imparipinnate Compound **leaf)** ঃ এক্ষেত্রে পক্ষল যৌগিক পত্রের পত্রকগুলি পত্রক-অক্ষের দু'পাশে জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করলেও **পত্রক-অক্ষের অগ্রভাগে একটি অতিরিক্ত পত্রক** থাকে।

উদাহরণ—**গোলাপ** (চিত্র 12·13খ)।

(2) **করতলাকার যৌগিক পত্র** (Palmate Compound leaf) ঃ করতলাকার যৌগিক পত্রে কোন পত্রক-অক্ষ থাকে না। এক্ষেত্রে এক বা একাধিক পত্রক পত্রবৃন্তের অগ্রভাগে আঙুলের ন্যায় বিন্যস্ত থাকে।

করতলাকার যৌগিক পত্র নানা প্রকার ঃ—(চিত্র 12.16)।

(a) **একফলক** (Unifoliate) ঃ বৃন্তের অগ্রভাগে একটিমাত্র পত্রক থাকলে সেই যৌগিক পত্রকে **করতলাকার একফলক** বলা হয়।

উদাহরণ—**লেবু**।

(b) **দ্বিফলক** (Bifoliate) ঃ বৃন্তের অগ্রভাগে দু'টি পত্রক থাকলে সেই যৌগিক পত্রকে **করতলাকার দ্বিফলক** বলা হয়।

পাট গাছ সরু, দীর্ঘ এবং বর্ষজীবী। দৈর্ঘ্যে এই গাছ দেড় থেকে তিন মিটার। পাট গাছে হলুদ বর্ণের ফুল হয়। পাটচাষের পক্ষে প্রচুর জল ও উত্তাপ যেমন প্রয়োজন, তেমনি পলিমাটি বা বেলেমাটি অত্যন্ত উপযোগী। ভারতে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও ওড়িষার নিম্ন নদী-উপত্যকায় পাটের ফলন ভাল। ভারতে পশ্চিমবঙ্গেও সর্বাধিক পাট উৎপন্ন হয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু ও মাটি পাটচাষের পক্ষে খুবই অনুকূল। পাটবীজ বোনার তিন-চার মাসের মধ্যে পাট গাছ কাটার উপযুক্ত হয়। কাণ্ডগুলি বাণ্ডিল বেঁধে জলা জমিতে বা ছোটখাট নালা-ডোবায় পচতে দেওয়া হয়। গাছে ফুল থাকা অবস্থাতেই গাছ কেটে ফেলতে হয়। কয়েকদিন পরে কাণ্ড কাচার উপযুক্ত হলে, কাঠের বা বাঁশের হাতার সাহায্যে পিটিয়ে লম্বা তন্তুগুলিকে পাটকাঠি থেকে আলাদা করতে হয়। পাটের তন্তুগুলি বেশ শক্ত এবং এদের দৈর্ঘ্য প্রায় কাণ্ডের দৈর্ঘ্যের সমান। অধিক আর্দ্রতায় পাটের তন্তুগুলি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। যাই-হোক, প্রতিটি সভ্য ও শিল্পোন্নত দেশ ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে পাট আমদানী করে। সম্ভবত মালয় ও সিংহলে পাটের চাষ শুরু হলেও, বাংলাদেশ ও ভারতই আজ সর্বাধিক পাট রপ্তানীকারী দেশ। 1980-'81 খ্রীষ্টাব্দের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ 65 লক্ষ বেল।



চিত্র 19.2—পাট গাছ।

● **পাটের ব্যবহার ও গুরুত্ব (Use and importance of Jute) :**

(i) চাল, ধান, গম, ভুট্টা, আলু ও অন্যান্য শস্য সংরক্ষণ বা বহনযোগ্য বস্তা পাটের তন্তু থেকেই প্রস্তুত হয়।

(ii) পাট-তন্তু থেকে মোটা জাতের কাপড়ও উৎপন্ন হয়।

(iii) পাট থেকে দড়ি, কার্পেট, থলি প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়।

(iv) পাট গাছের স্বল্পদৈর্ঘ্য তন্তু বা পাঁকাটি কাগজ-শিল্পে গুরুত্ব-পূর্ণ কাঁচামাল।

(v) পাঁকাটি জ্বালানী হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীকারী দেশের মধ্যে ভারতের স্থান দ্বিতীয়।

(3) ধান (Paddy)

পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের প্রধান খাদ্য চাল। ধান থেকে চাল হয়। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার ধানের চাষ হয়। সুদূর অতীতে কবে ধানের চাষ সুরু হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোথাও কোন নির্ভরযোগ্য উল্লেখ নাই। সম্ভবত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন এক জায়গায় জন্ম হলেও পরবর্তীকালে পৃথিবীর সমস্ত উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে ধান চাষ ছড়িয়ে পড়ে। চীনে প্রায় 4000 বৎসর পূর্বে ধানের চাষ শুরু হয়। অবশ্য, গ্রীক যুগের পূর্বেই ভারতে ধান চাষের সূত্রপাত। ইটালীতে সর্বপ্রথম 1468 খ্রীষ্টাব্দে ধান চাষ সুরু হয়। 1690 খ্রীষ্টাব্দে ম্যাডাগ্যাসকার থেকে আমেরিকার দক্ষিণ ক্যারোলিনায় ধান চাষের পত্তন হয়।

ধান সাধারণতঃ 60 সেমি. থেকে 125 সেমি· উ'চু **ঘাসজাতীয় বর্ষজীবী উদ্ভিদ**। আজকাল বিভিন্ন ধরনের ধানের চাষ করা হয়। জলসেচ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় সারা বৎসর ধরেই ধানের চাষ হয়। ইদানিং অধিক ফলনশীল বিভিন্ন প্রজাতির ধানের চাষ ক্রমবর্ধমান। কেবল ভারতেই প্রায় 400 প্রজাতির ধান চাষ হয়। প্রকৃতপক্ষে বর্ষাকালই ধান চাষের উপযুক্ত সময়। উত্তম জলসেচ ব্যবস্থা ধানচাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। জল-ধারণক্ষম এ'টেল বা কাদামাটিতে ধানচাষ ভাল হয়।

নানারূপ সংকর ধানের চাষ বৃদ্ধি পেলেও পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতঃ **আউস**, **আমন** ও **বোরো** ধানের চাষ হয়। আউস ধান ডাঙা জমিতে, আমন ধান জলধারণক্ষম জমিতে এবং বোরো ধান জলে ডোবা জমিতে ভাল হয়। তিন ধরনের ধানের মধ্যে আমন ধান স্বাদে, গন্ধে অতুলনীয়। সহজপাচ্যতাও এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

● **ধানের ব্যবহার ও গুরুত্ব** (Use and importance of Paddy) ঃ

(i) চাল অধিকাংশ মানুষের প্রধান খাদ্য। চাল থেকে প্রচুর পরিমাণে শর্করা, স্নেহ এবং সামান্য পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। প্রোটিনের স্বল্পতার জন্য ভাতের সঙ্গে মুগ, মুসুর, ছোলা, মটর, অড়হর প্রভৃতি প্রোটিন সমৃদ্ধ ডাল ব্যবহার করার প্রচলন হয়েছে।

(ii) কলে ছাঁটা হলে চালের পুষ্টিকর উপাদানগুলি বেরিয়ে যায়, সেজন্য ঢেঁকিছাঁটা চাল শরীরের পক্ষে ভাল।

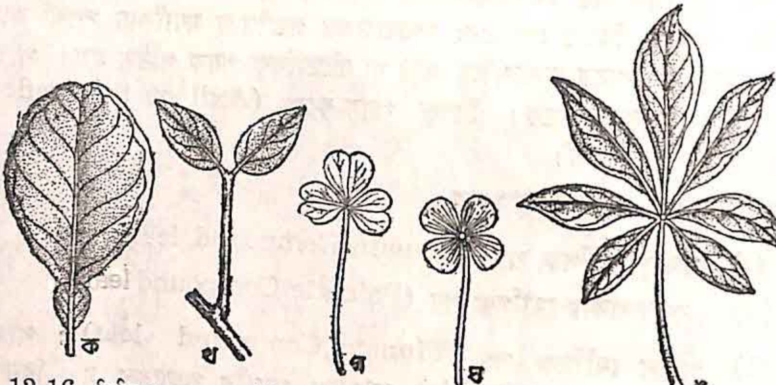
(iii) চাল ছাঁটাই করার পর পরিত্যক্ত তুষ প্রধানত জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(iv) আজকাল চালের কুঁড়ো থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তেল নিষ্কাশনের পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে।

উদাহরণ—হিঙ্গন।

(c) ত্রিফলক (Trifoliate) ঃ বৃন্তের অগ্রভাগে যখন তিনটি পত্রক থাকে সেই যৌগিক পত্রকে করতলাকার ত্রিফলক বলা হয়।

উদাহরণ—আমরুল।



চিত্র 12.16—বিভিন্ন প্রকার যৌগিক পত্র ঃ ক—একফলক (লেবু), খ—দ্বিফলক (হিঙ্গন), গ—ত্রিফলক (আমরুল), ঘ—চতুঃফলক (শুষনি), ঙ—অঙ্গুলাকার (শিমুল)।

(d) চতুঃফলক (Quadrifoliate) ঃ বৃন্তের অগ্রভাগে চারটি পত্রক থাকলে সেই যৌগিক পত্রকে করতলাকার চতুঃফলক বলা হয়।

উদাহরণ—শুষনি।

(e) অঙ্গুলাকার (Digitate) ঃ বৃন্তের অগ্রভাগে চারটির বেশী পত্রক থাকলে সেই যৌগিক পত্রকে করতলাকার অঙ্গুলাকার বলা হয়।

উদাহরণ—শিমুল, ছাতিম ইত্যাদি।

12.12. একক পত্র ও যৌগিক পত্রের পার্থক্য [*Differences between simple leaves and compound leaves*] :

একক পত্র (Simple leaves)	যৌগিক পত্র (Compound leaves)
(1) একটিমাত্র অখণ্ড বা আংশিক-ভাবে খণ্ডিত ফলক দ্বারা একক পত্র গঠিত।	(1) পাতার ফলক সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত হয়ে পত্রক গঠন করে।
(2) কাণ্ড বা শাখার পর্বে একক পত্র যুক্ত থাকে।	(2) পত্রক অক্ষের দু'পাশে বা অগ্র-ভাগে পত্রক যুক্ত থাকে।
(3) সাধারণত প্রতিটি একক পত্রের কক্ষে কাক্ষিক মুকুল থাকে।	(3) যৌগিক পত্রের কক্ষে কাক্ষিক মুকুল থাকলেও, পত্রকের কক্ষে কখনই মুকুল থাকে না।
(4) পত্রমূলে উপপত্র থাকতে পারে।	(4) পত্রক-মূলে কখনই উপপত্র থাকে না।

একক পত্র (Simple leaves)	যৌগিক পত্র (Compound leaves)
(5) পত্রগুলি যে অক্ষের উপরে বিন্যস্ত থাকে, তার আগায় অগ্র-মুকুল থাকে।	(5) পত্রক-অক্ষের অগ্রভাগে অগ্র-মুকুল থাকে না।
(6) উদাহরণঃ আম, কাঁঠাল, ডালিয়া, জবা প্রভৃতি গাছের পাতা একক পত্র।	(6) উদাহরণঃ গোলাপ, ছাতিম, সজিনা, শিমুল, অপরাজিতা, শুষনি প্রভৃতি গাছের পাতা যৌগিক পত্র।

12.13. একক পত্র ও পত্রকের পার্থক্য [*Differences between simple leaf and a leaflet*] :

একক পত্র (Simple leaves)	পত্রক (Leaflet)
(1) একক পত্র কাণ্ড বা শাখা-প্রশাখার পর্বে উৎপন্ন হয়।	(1) পত্রক পত্রক-অক্ষের দুপাশে বা অগ্রভাগে যুক্ত থাকে।
(2) একক পত্রের কক্ষে কাক্ষিক মুকুল থাকে।	(2) পত্রকের কক্ষে কাক্ষিক মুকুল থাকে না।
(3) একক পত্রে উপপত্র (Stipule) থাকতে পারে।	(3) পত্রকে উপপত্র থাকে না।
(4) একক পত্রে উপপত্রক (Stipel) থাকে না।	(4) পত্রক-মূলে উপপত্রক থাকতে পারে।
(5) একক পত্রের সর্পিলবিন্যাস (Spiral phyllotaxy) লক্ষ্য করা যায়।	(5) পত্রকের সর্পিলবিন্যাস লক্ষ্য করা যায় না।
(6) একক পত্রের কক্ষ থেকে শাখা উৎপন্ন হয়।	(6) পত্রকের কক্ষ থেকে শাখা উৎপন্ন হয় না।

12.14. একক পত্রযুক্ত ছোট শাখা ও পক্ষল যৌগিক পত্রের পার্থক্য [*Differences between a small branch bearing simple leaves and pinnate compound leaves*] :

সময় সময় একক পত্রযুক্ত ছোট শাখা ও পক্ষল যৌগিক পত্রের পার্থক্য ধরা পড়ে না। আপাতদৃষ্টিতে এরা একই বলে মনে হয়। পর-পৃষ্ঠায় বর্ণিত পার্থক্যগুলির সাহায্যে এদের পৃথক করা যায়।

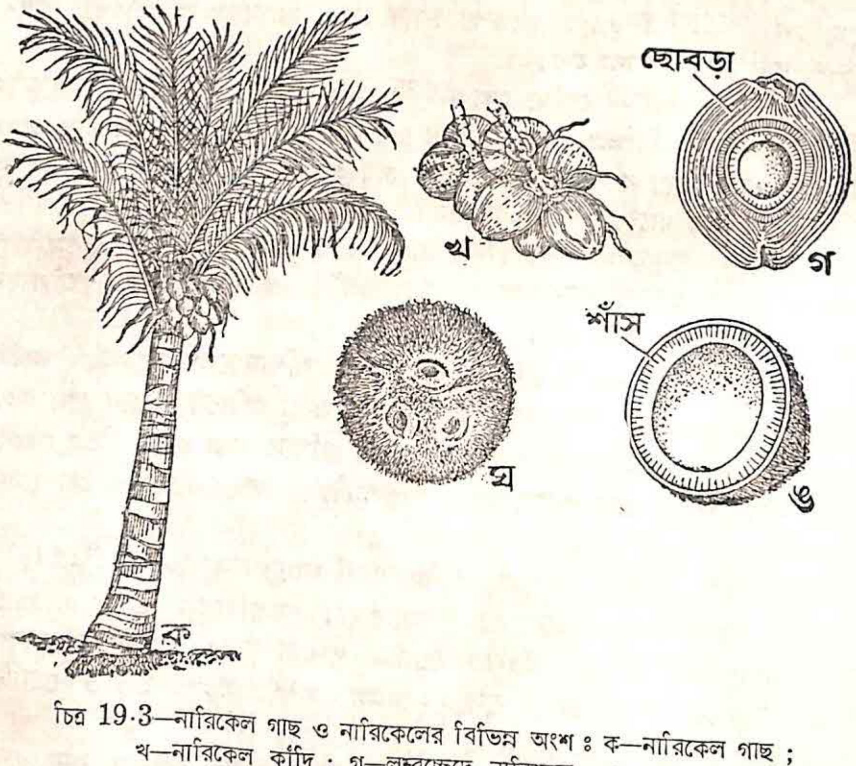
(v) গবাদি পশু, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণীর খাদ্য হিসাবেও কুঁড়ো ও খুদ ব্যবহৃত হয়।

(vi) খড় গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য।

(vii) এছাড়া ঘর ছাওয়া, টুপি, জুতা ও অন্যান্য বহুবিধ সামগ্রী উৎপাদনে খড় নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, **ধানের প্রতিটি অংশই কোন না কোন কাজে লাগে।**

(4) নারিকেল (Coconut)

অর্থকরী গাছের মধ্যে নারিকেল বিশিষ্টতার দাবী রাখে। কোটি কোটি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে গাছটি অঙ্গাঙ্গী জড়িত। আদি নিবাস মালয় হলেও পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে



চিত্র 19·3—নারিকেল গাছ ও নারিকেলের বিভিন্ন অংশ ঃ ক—নারিকেল গাছ ; খ—নারিকেল কাঁদি ; গ—লম্বচ্ছেদে নারিকেল ; ঘ—ছোবড়া ছাড়ান নারিকেল ; ঙ—শাঁসসুদ্ধ নারিকেলের মালা।

নারিকেল জন্মায়। সমুদ্রোপকূলে, পুকুরের বা ঝিলের পাড়ে সারি সারি নারিকেল গাছের সৌন্দর্য শুধু কবির নয়, সাধারণ মানুষেরও মন টানে।

নারিকেল প্রকৃতপক্ষে উষ্ণমণ্ডলের গাছ। যে কোন মাটিতেই নারিকেল গাছ জন্মায়। তবে নোনা মাটিতে নারিকেলের ফলন ও গঠন উন্নত মানের হয়।

প্রায় প্রতিটি গ্রামের গৃহস্থদের বাড়ীর আশপাশে প্রচুর নারিকেল গাছ দেখা যায়। সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী পণ্য। বীজতলায় কয়েক মাসের মধ্যেই নারিকেল বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং এক বৎসর পর সেই চারা নির্দিষ্ট গর্তে বসানো হয়। সাত-আট বছরের মধ্যে গাছে ফুল ও ফল ধরে। বছরের সব সময়ে নারিকেল পাওয়া যায়।

● **নারিকেলের ব্যবহার ও গুরুত্ব** (Use and importance of coconut) ঃ

নারিকেল গাছের কোন অংশই ফেলা যায় না। প্রতিটি অংশই কোন না কোন কাজে লাগে। যেমন—

(i) কচি ডাব অত্যন্ত উপাদেয় ও উপকারী পানীয়। কচি ডাবের শাঁস রসনা তৃপ্তিকর। নারিকেলের শাঁস প্রকৃতপক্ষে সস্য (Endosperm)।

(ii) পরিপুষ্ট শাঁস নারিকেল তেলের কাঁচামাল। সাবান ও নানাবিধ প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদনেও নারিকেল তেল ব্যবহৃত হয়।

(iii) নারিকেলের শুকনো শাঁস বিভিন্ন মুখরোচক খাদ্যের পুষ্টিকর উপাদান।

(iv) খইল পশুর খাদ্য ও সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(v) নারিকেল গাছের বলিষ্ঠ কাণ্ড খুঁটি, সিঁড়ি ইত্যাদি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(vi) নারিকেলের অপ্রস্ফুটিত পুষ্পমঞ্জরী (মোচা) থেকে মিষ্টি রস পাওয়া যায়।

(vii) রস থেকে নারিকেল গুড়, ভিনিগার তৈরী হয়।

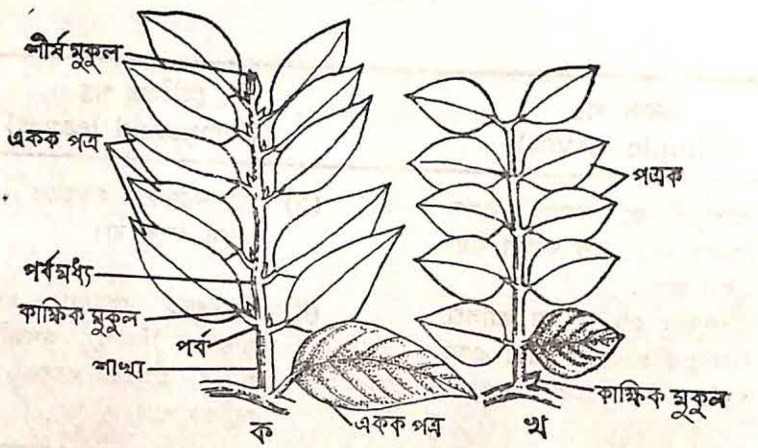
(viii) নারিকেল ছোবড়া থেকে দড়ি, গদি, কার্পেট, পাপোষ প্রভৃতি তৈরী হয়। কেরালা, মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে নারিকেল ছোবড়া কাজে লাগাবার জন্য বহু শিল্প গড়ে উঠেছে।

(ix) নারিকেল গাছের পাতাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। নারিকেল পাতায় ঘর ছাওয়া হয়, এমনকি ঝুরি, মাথার টুপি প্রভৃতি তৈরী করা হয়।

(x) পাতার কঠিন শিরা একত্রে গুচ্ছাকারে বেঁধে নিলে ঝাঁটা তৈরী হয়। ঝাঁটাকাঠি বার করে নেবার পর পরিত্যক্ত অংশ জ্বালানী হিসাবে কাজে লাগে।

(xi) মুকুল ও কচি কাণ্ডশীর্ষ স্যালাড বা সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গাছের ছাল থেকে রজন (Resin) এবং মূল থেকে ঔষধ উৎপন্ন হয়।

বস্তুতঃ **নারিকেল গাছের প্রতিটি অংশ মানুষের কাজে লাগে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী সরবরাহে নারিকেল গাছের অবদান অতুলনীয়।**



চিত্র 12.17 : ক—একক পত্রযুক্ত ছোট শাখা, খ—পক্ষল যৌগিক পত্র।

একক পত্রযুক্ত ছোট শাখা (A branch with simple leaves)	পক্ষল যৌগিক পত্র (Pinnate compound leaves)
(1) শাখার শীর্ষে শীর্ষমুকুল থাকে।	(1) যৌগিকপত্রের শীর্ষে শীর্ষমুকুল থাকে না।
(2) শাখার কক্ষে মুকুল থাকে না।	(2) যৌগিকপত্রের কক্ষে কাক্ষিক মুকুল থাকে।
(3) শাখার উপর বিন্যস্ত একক পত্রগুলির কক্ষে কাক্ষিক মুকুল থাকে।	(3) যৌগিক পত্রে পত্রকগুলির কক্ষে মুকুল থাকে না।
(4) শাখায় পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে।	(4) যৌগিক পত্রের পত্রক-অক্ষে পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে না।
(5) শাখায় একটি পত্রের গোড়ায় উপপত্র থাকতে পারে।	(5) যৌগিক পত্রের পত্রকের গোড়ায় উপপত্র থাকে না।

12.15. পত্রবিন্যাস বা ফাইলোট্যাক্সি [*Phyllotaxy*] :

● **পত্রবিন্যাসের সংজ্ঞা** (Definition of Phyllotaxy) : **কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার উপর পাতার সজ্জারীতিকে পত্রবিন্যাস বা ফাইলোট্যাক্সি বলে।**

পত্রবিন্যাস প্রধানত তিন প্রকার—(1) **একান্তর,** (2) **অভিমুখ** ও (3) **আবর্ত।** সাধারণত প্রতি পর্ব থেকে মাত্র একটি করে পাতা জন্মায়।

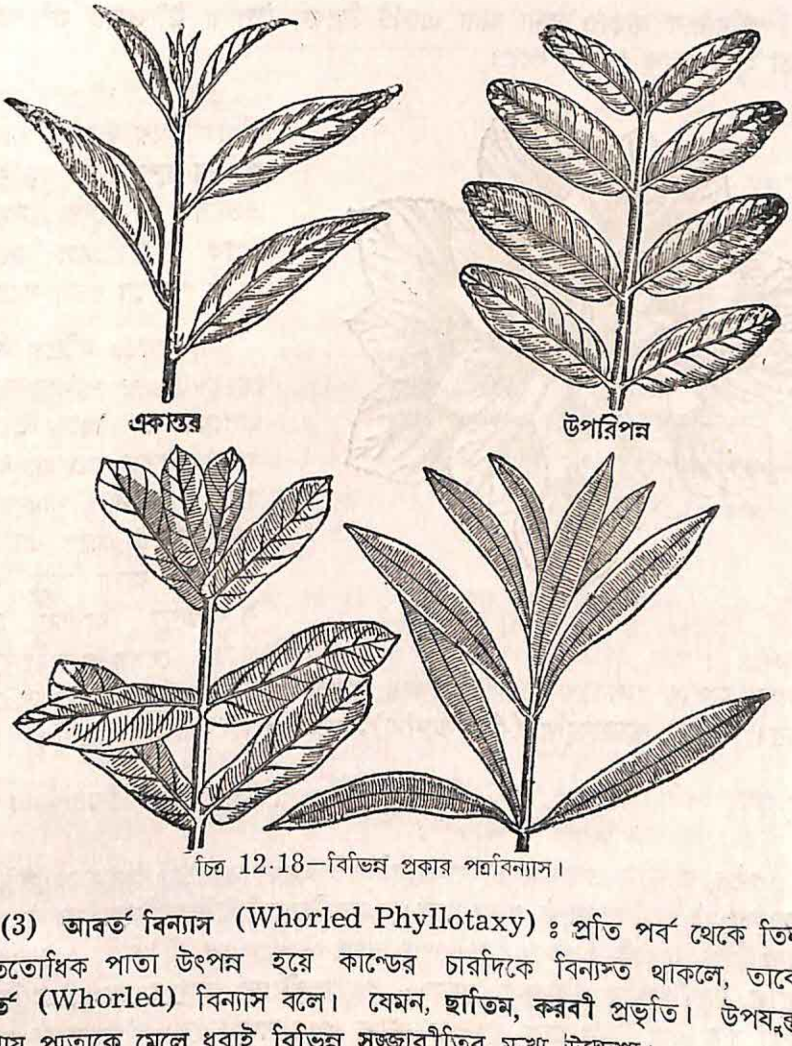
(1) **একান্তর বিন্যাস** (Alternate Phyllotaxy) : পাতাগুলি দুই বা ততোধিক সারিতে বিন্যস্ত থাকলে, সেই সজ্জারীতিকে **একান্তর** বা **সর্পিল** (Alternate or Spiral) পত্রবিন্যাস বলে। যেমন—জবা, ধান, ভুট্টা ইত্যাদি।

(2) **অভিমুখ বিন্যাস** (Opposite Phyllotaxy) : প্রতি পর্ব থেকে দুটি মাত্র পাতা উৎপন্ন হলে এবং পাতা দুটি একে অপরের বিপরীতদিকে

বিন্যস্ত থাকলে, সেই সজ্জারীতিকে **অভিমুখ** (Opposite) পত্রবিন্যাস বলে। অভিমুখ পত্রবিন্যাস দু' প্রকার। যথা—

(i) **অভিমুখ তির্যকপন্ন** (Opposite decussate) ঃ আকন্দ, রঙ্গন প্রভৃতি গাছে পাতার স্তবকগুলি একে অন্যের ভিন্নতলে অর্থাৎ সমকোণে বিন্যস্ত থাকে। এই রীতিকে বলে **অভিমুখ তির্যকপন্ন** (Opposite decussate)।

(ii) **অভিমুখ উপরিপন্ন** (Opposite superposed) ঃ **পেয়ারা, মালতী-লতা** প্রভৃতি গাছে পাতার স্তবকগুলি পরস্পর একই তলে বিন্যস্ত থাকে। এই বিন্যাসরীতিকে **অভিমুখ উপরিপন্ন** (Opposite superposed) বলে।



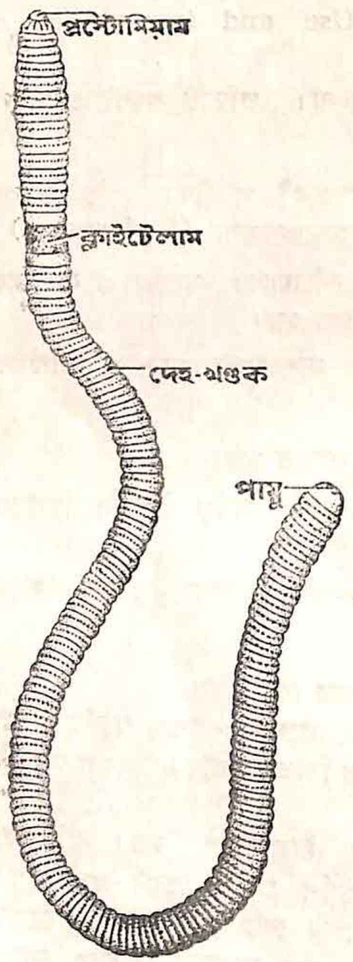
চিত্র 12.18—বিভিন্ন প্রকার পত্রবিন্যাস।

(3) **আবর্ত বিন্যাস** (Whorled Phyllotaxy) ঃ প্রতি পর্ব থেকে তিন **বা** ততোধিক পাতা উৎপন্ন হয়ে কাণ্ডের চারদিকে বিন্যস্ত থাকলে, তাকে **আবর্ত** (Whorled) বিন্যাস বলে। যেমন, **ছাতিম, করবী** প্রভৃতি। উপযুক্ত আলোয় পাতাকে মেলে ধরাই বিভিন্ন সজ্জারীতির মুখ্য উদ্দেশ্য।

19.3. প্রাণী [*Animals*] :

(A) 1. কেঁচো (Earthworm)

আনেলিডা পর্বভুক্ত কেঁচো অত্যন্ত পরিচিত প্রাণী। মাঠে, ঘাটে বিশেষতঃ বর্ষাকালে ঘরের আনাচে-কানাচে কেঁচো দেখলে আমরা বিরক্ত হই। কিন্তু এই প্রাণীটি চাষীদের পরম বন্ধু। মাঠে গর্ত ক'রে কেঁচো নিজের বাসা তৈরী করে। **গর্তটির বিন্যাস অর্ধচন্দ্রাকার। গর্তের এক দিকে থাকে মুখ ও অন্য দিকে থাকে পায়ুছিদ্র।**



চিত্র 19.4—কেঁচো।

● **কেঁচোর গুরুত্ব** (Importance of Earthworm) ঃ

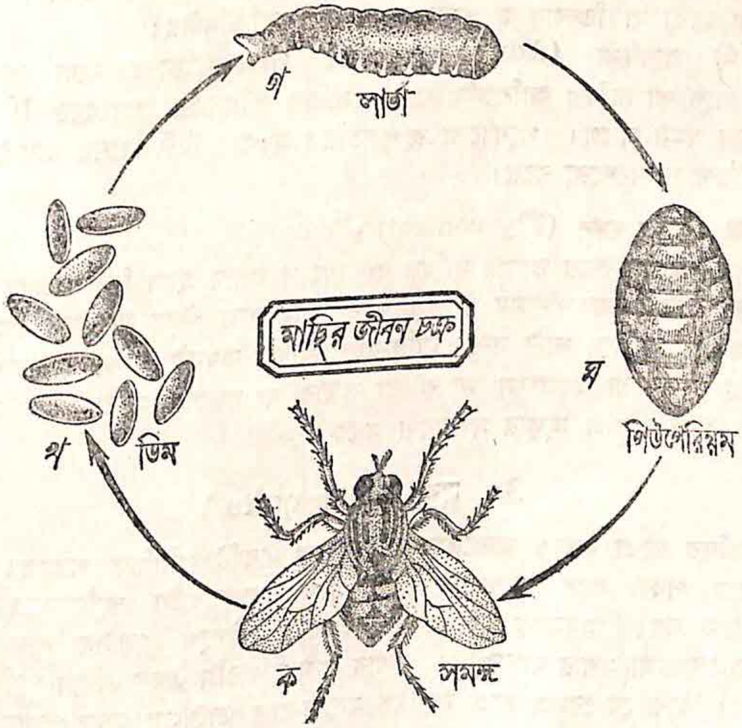
মাটি-মিশ্রিত খাদ্যগ্রহণ ক'রে কেঁচো গর্তের উপরে বিষ্ঠাকুণ্ডলী ত্যাগ করে। এতে জমির উপরের বালি-কাঁকর বিষ্ঠাকুণ্ডলীর নীচে চাপা পড়ে। জমির উপরে মাটির এই আস্তরণ মাটিকে উর্বর করে। কারণ, বিষ্ঠায় বহুবিধ অজৈব রাসায়নিক পদার্থ থাকে। তাছাড়া, কেঁচোর গর্ত দিয়ে বাতাস, জল, আলো সহজে মাটির গভীরে প্রবেশ করে। সেজন্য গাছ অতি দ্রুত বাড়তে পারে এবং ফলন ভাল হয়। সুতরাং, জমি কর্ষণ ও সার প্রয়োগ উভবিধ কাজেই কেঁচো সহায়তা করে। এতে চাষীর কষ্ট অনেকাংশে লাঘব হয়।

মহামতি **ডারউইন** (Darwin) বলেছেন, **কেঁচো জমির স্বাভাবিক কর্ষক**। বৈজ্ঞানিক **হেনসন** (Henson) গবেষণা করে দেখিয়েছেন, বাগানের এক একর জমিতে প্রায় 53 হাজার কেঁচো বাস করে। ডারউইন এই বক্তব্য সমর্থন করে বলেন, ঐ কেঁচোগুলি প্রতি বৎসর প্রায় দশ টন মাটি বিষ্ঠাকুণ্ডলী হিসাবে উপরে পাঠিয়ে দেয়। সুতরাং, সাধারণ মানুষের কাছে অবহেলার পাত্র হলেও **কেঁচো চাষীর পরম বন্ধু**। জমির ফলন বাড়াতে কেঁচো যেভাবে সাহায্য করে, তাতে এই প্রাণীটি অবহেলিত হবার যোগ্য নয়।

2. মাছি (House-fly)

প্রাণিজগতের আরথ্রোপডা পর্বভুক্ত এই প্রাণীটি আমাদের কেবল বিরক্তি উৎপাদন ও ক্ষতিই করে। যেখানেই আবর্জনা এবং পচা মাছ, ফলমূল বা মিষ্টির গন্ধ, সেখানেই মাছি হানা দেয়। মাছির লোমশ দেহে কফ, থুথু, মল-মূত্র সহজেই আটকে যায় এবং সেই মাছি খাদ্যে বসলে খাদ্য দূষিত হয়। তাছাড়া, মাছির ঘনঘন বমন ও মলত্যাগ প্রবণতা এই কাজে যথেষ্ট সহায়তা করে।

মাছি আকারে ছোট, আধ সেণ্টিমিটার থেকে দেড় সেণ্টিমিটারের মতো লম্বা। দেহ—মাথা, বুক ও উদর অংশে বিভক্ত। মাথায় অবস্থিত শুঁড়ের সাহায্যে মাছি খাদ্যবস্তুর রস শুষে নেয়। এক জোড়া ডানা মাছিকে স্বচ্ছন্দে দ্রুত উড়তে সাহায্য করে। সচরাচর আমরা যে মাছি দেখি তার বিজ্ঞানসম্মত নাম মুসকা ডোমেস্টিকা (*Musca domestica*)।



চিত্র 19.5—মাছির জীবন-চক্র।

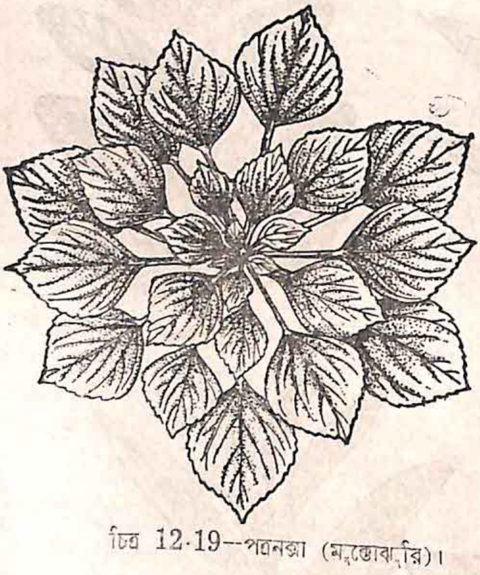
মাছি আমাশয় (Dysentery), টাইফয়েড (Typhoid), কলেরা (Cholera), উদরাময় (Diarrhoea), যক্ষ্মা (Tuberculosis) প্রভৃতি মারাত্মক রোগের জীবাণুবাহক। সেজন্য বাড়ির মধ্যে বা বাড়ির কাছাকাছি এলাকা যাতে পরিচ্ছন্ন থাকে এবং মাছির বাসোপযোগী হয়ে না ওঠে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

পত্রবিন্যাস

- একান্তর (উদাঃ জবা)
- অভিমুখ
  - উপরিপন্ন (উদাঃ পেয়ারা)
  - তির্যকপন্ন (উদাঃ আকন্দ)
- আবর্ত (উদাঃ করবী)

12.16. পত্রনক্সা বা পাতার মোজাইক *[Leaf Mosaic]* :

পত্রবিন্যাস ছাড়াও অন্য আর একটি বিশেষ উপায়ে উদ্ভিদের অধিকাংশ পাতা সূর্যালোক শোষণ করে।



চিত্র 12·19—পত্রনক্সা (মুক্তোঝুরি)।

এক্ষেত্রে কাণ্ডের পর্বে সর্পিলাকারে উৎপন্ন পাতাগুলির বৃন্ত ছোট-বড় হয়। এভাবে উদ্ভিদের সমস্ত ফলক একই তলে বিন্যস্ত থেকে **পত্রনক্সা** রচনা করে।

সাধারণতঃ নীচের পর্ব থেকে উৎপন্ন পাতার বৃন্ত উপরের পর্ব থেকে উৎপন্ন পাতার বৃন্ত অপেক্ষা দীর্ঘ হয়। ফলে, পাতাগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট থেকে একটানা পত্রপৃষ্ঠ রচনা করে এবং সূর্যালোক অপচয় রোধ করে। যেসব গাছ প্রধানত ছায়ায় অর্থাৎ, অপর্যাপ্ত আলোয় জন্মায়, সেগুলিকে পত্রনক্সা রচনা করতে দেখা যায়। যেমন, **মুক্তোঝুরি** (*Acalypha*), **আমরুল** (*Oxalis*) ইত্যাদি।

12.17. সমাঙ্কপৃষ্ঠ ও বিষমপৃষ্ঠ পাতা *[Isobilateral and Dorsiventral leaves]* :

গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি চারিত্রিক লক্ষণের তারতম্য অনুসারে পাতাকে সমাঙ্কপৃষ্ঠ বা বিষমপৃষ্ঠ পাতা বলে। **একবীজপত্রী উদ্ভিদে সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতা এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে বিষমপৃষ্ঠ পাতা উৎপন্ন হয়।** সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতাগুলি তির্যকভাবে বিন্যস্ত থাকে ; পাতাগুলিতে সমান্তরাল শিরাবিন্যাস দেখা যায় এবং উভয় ত্বকে রং-এর গাঢ়ত্ব প্রায় সমান হয়। বিষমপৃষ্ঠ পাতা-

গুলি ভূত্বকের সঙ্গে মোটামুটি সমান্তরালে থাকে। তাতে জালিকা শিরা-বিন্যাস দেখা যায় এবং ঊর্ধ্বত্বক অধিকতর গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়। উভয়-প্রকার পাতার অন্তর্গঠনেও যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়।

12.18. বিষমপৃষ্ঠ ও সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতার বহিরাকৃতিগত পার্থক্য [*Differences in external features between Dorsiventral leaf and Isobilateral leaf*] :

বিষমপৃষ্ঠ পাতা (Dorsiventral leaf)	সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতা (Isobilateral leaf)
(1) পাতাগুলি ভূত্বকের সঙ্গে মোটামুটি সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত থাকে।	(1) পাতাগুলি ভূত্বকের সঙ্গে তির্যক-ভাবে বিন্যস্ত থাকে।
(2) পাতার শিরাবিন্যাস জালিকাকার।	(2) পাতার শিরাবিন্যাস সমান্তরাল।
(3) ঊর্ধ্ববহিস্ত্বক গাঢ় সবুজ বর্ণের।	(3) ঊর্ধ্ব ও নিম্নবহিস্ত্বক ফিকা সবুজ বর্ণের।
(4) মেসোফিলে দু'প্রকার কোষ (প্যালিসেড ও স্পঞ্জি) থাকে।	(4) মেসোফিলে এক প্রকার কোষ (স্পঞ্জি সদৃশ) থাকে।
(5) কেবল নিম্নবহিস্ত্বকে পত্ররন্ধ্র থাকে।	(5) ঊর্ধ্ব ও নিম্ন—উভয় বহিস্ত্বকেই পত্ররন্ধ্র থাকে।

12.19. বিষমপৃষ্ঠ পাতার অন্তর্গঠন [*Internal structure of a Dorsiventral leaf*] :

● **আমপাতা** [Mango (*Mangifera indica*) leaf] ঃ

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একটি বিষমপৃষ্ঠ পাতার (যেমন, আম) প্রস্থচ্ছেদ পরীক্ষা করলে, নিম্নলিখিত কলাগুলি দৃষ্টিগোচর হয়।

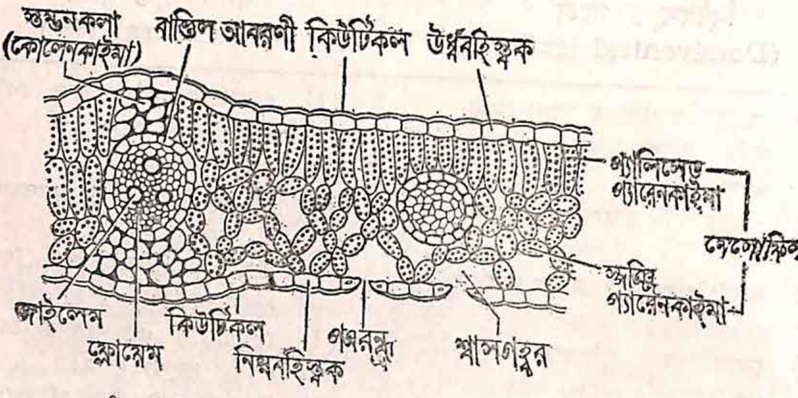
1. **ঊর্ধ্ব বহিস্ত্বক** (Upper epidermis) ঃ একস্তরে বিন্যস্ত পিপাকৃতি ঘনসন্নিবিষ্ট প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত উপরের একটানা স্তর হল ঊর্ধ্ব বহিস্ত্বক ; এর উপরে কিউটিকলের প্রলেপ থাকে।

2. **নিম্ন বহিস্ত্বক** (Lower epidermis) ঃ পাতার নীচে পিপাকৃতি ঘনসন্নিবিষ্ট প্যারেনকাইমা স্তরটিকে নিম্নবহিস্ত্বক বলে। এতে মাঝে মধ্যে ফাঁকা স্থান থাকে। ঐ ফাঁকা স্থানগুলিকে **পত্ররন্ধ্র** বা **স্টোমাটা** (Stomata) বলে। পত্ররন্ধ্রসংলগ্ন গহ্বরটি **শ্বাসগহ্বর** (Respiratory cavity) বা **সাব-স্টোমাটাল ক্যাভিটি** (Sub-stomatal cavity)।

3. **মেসোফিল** (Mesophyll) ঃ ঊর্ধ্ব ও নিম্ন বহিস্ত্বকের মধ্যবর্তী অংশে প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত আদিকলাকে মেসোফিল বলে। মেসোফিল দু'প্রকার প্যারেনকাইমায় গঠিত। যথা—প্যালিসেড ও স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা।

(a) **প্যালিসেড প্যারেনকাইমা** (Palisade parenchyma) ঃ কতকগুলি লম্বা বা স্তম্ভাকার মেসোফিল কোষ ঊর্ধ্ব বহিস্ত্বকের সঙ্গে সমকোণে বিন্যস্ত থাকে।

এগুলিতে প্রচুর ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। দু-তিন স্তরে বিন্যস্ত এই কোষগুচ্ছকে **প্যালিসেড প্যারেনকাইমা** (Palisade parenchyma) বলে।



চিত্র 12·20—বিষমপৃষ্ঠ (আম) পাতার প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)।

(b) **স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা** (Spongy parenchyma) ঃ প্যালিসেড প্যারেনকাইমার পরে নিম্নবহিস্ত্বক পর্যন্ত বিস্তৃত বাকি অংশ প্রায় গোলাকার কোষ দ্বারা গঠিত এবং এই অংশকে **স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা** (Spongy parenchyma) বলে। এই স্পঞ্জি প্যারেনকাইমায় প্রচুর **কোষান্তর রন্ধ্র** থাকে।

4. **নালিকা বান্ডিল** বা **ভ্যাস্কুলার বান্ডিল** (Vascular bundle) ঃ মধ্যশিরা, শাখাশিরা, উপশিরাগুলি নানা আকারের নালিকা বান্ডিলের অবস্থান নির্দেশ করে। প্রতিটি বান্ডিল উপরের দিক **জাইলেম** ও নীচের দিক **ফ্লোয়েম** দ্বারা গঠিত। বান্ডিলের উপরে একস্তর-বিশিষ্ট প্যারেনকাইমা আচ্ছাদনকে **বান্ডিল আবরণী** বা **বান্ডিল সীদ** (Bundle sheath) বলে। বড় বড় বান্ডিল-আবরণীর উপর ও নীচে অর্থাৎ ঊর্ধ্বত্বক এবং নিম্ন বহিস্ত্বক পর্যন্ত বিস্তৃত কোলেনকাইমার স্তম্ভন কলা থাকে।

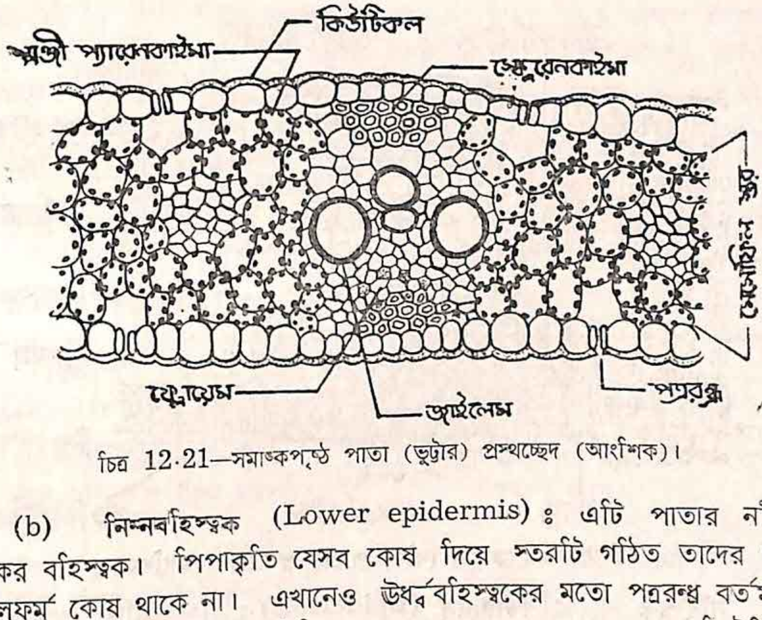
12.20. সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতার অন্তর্গঠন [***Internal structure of Isobilateral leaves***] :

(A) **ভুট্টা পাতা** [Maize (*Zea mays*) leaf] ঃ

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে একটি ভুট্টা পাতার প্রস্থচ্ছেদ পরীক্ষা করলে পর-পৃষ্ঠায় লিখিত কলা-বিন্যাস লক্ষ্য করা যায় ঃ

1. **বহিস্ত্বক** বা **এপিডারমিস** (Epidermis) ঃ পিপাকৃতি পাশাপাশি সজ্জিত কোষান্তর রন্ধ্রযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা বহিস্ত্বক গঠিত। বহিস্ত্বক দুপ্রকার ঃ—

(a) **ঊর্ধ্ববহিস্ত্বক** (Upper epidermis) ঃ এটি পাতার উপরের দিকের বহিস্ত্বক। এই কোষস্তরের নির্দিষ্ট কোন কোন অংশে স্ফীতকায় কোষগুচ্ছ **বা বুলিফর্ম কোষ** (Bulliform cells) দেখা যায়। ঊর্ধ্ববহিস্ত্বকে পত্ররন্ধ্র বর্তমান। ঊর্ধ্ববহিস্ত্বকে কিউটিকল বর্তমান।



চিত্র 12·21—সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতা (ভুট্টার) প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)।

(b) **নিম্নবহিস্ত্বক** (Lower epidermis) ঃ এটি পাতার নীচের দিকের বহিস্ত্বক। পিপাকৃতি যেসব কোষ দিয়ে স্তরটি গঠিত তাদের মধ্যে বুলিফর্ম কোষ থাকে না। এখানেও ঊর্ধ্ববহিস্ত্বকের মতো পত্ররন্ধ্র বর্তমান। নিম্নবহিস্ত্বকের উপরে ঊর্ধ্ববহিস্ত্বকের অনুরূপ ও সমান পুরু কিউটিকল বর্তমান।

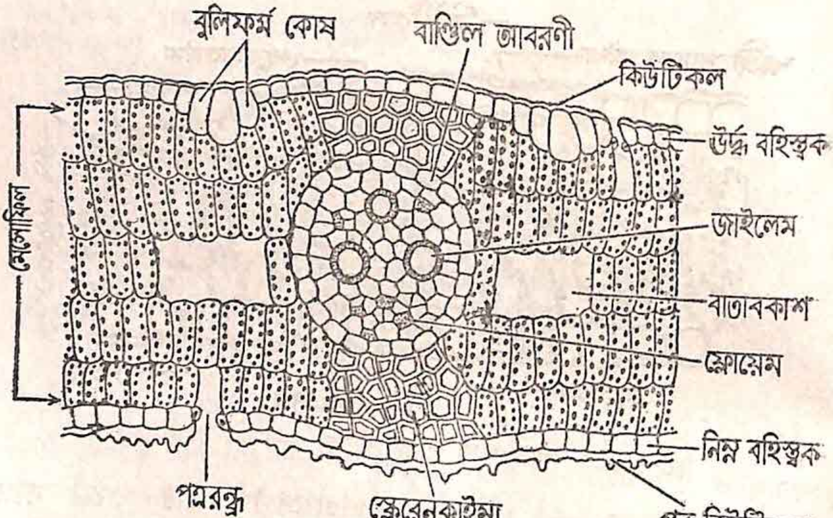
2. **মেসোফিল** (Mesophyll) ঃ ঊর্ধ্ববহিস্ত্বক ও নিম্নবহিস্ত্বকের মধ্যবর্তী অংশের আদিকলাকে **মেসোফিল** বলে। অসংখ্য গোল বা ডিম্বাকার প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা মেসোফিল গঠিত। মেসোফিল স্পঞ্জি ও প্যালিসেড প্রকৃতিতে বিভক্ত নয়। মেসোফিলের সব কলাই একই প্রকার এবং স্পঞ্জি ধরনের। মেসোফিল কোষগুলিতে প্রচুর ক্লোরোপ্লাস্ট বর্তমান। মেসোফিল কলার মধ্যেই একাধিক ছোট-বড় নালিকা বাণ্ডিল বিন্যস্ত থাকে।

3. **নালিকা বাণ্ডিল** বা **ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল** (Vascular bundles) ঃ প্রতিটি নালিকা বাণ্ডিলের উপরের দিকে জাইলেম ও নীচের দিকে ফ্লোয়েম কলা বিন্যস্ত থাকে। এই দুটি কলার মধ্যে ক্যাম্বিয়ম নামক ভাজক কলা নাই। প্রতিটি নালিকা বাণ্ডিল একস্তরবিশিষ্ট প্যারেনকাইমা দ্বারা বেষ্টিত থাকে।

এই আবরণীটিকে **বাণ্ডিল আবরণী** (Bundle sheath) বলে। বড় নালিকা বাণ্ডিলগুলি ঊর্ধ্ব বহিস্ত্বক ও নিম্নবহিস্ত্বক-এর সঙ্গে **স্ক্লেরেনকাইমা** কোষস্তর দ্বারা যুক্ত থাকে। পাতার মধ্যশিরা, শিরা ও উপশিরাগুলি প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন মাপের নালিকা বাণ্ডিলের অবস্থান নির্দেশ করে।

(B) **বাঁশ পাতা** [Bamboo (*Bambusa*) leaf] ঃ

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে একটি বাঁশপাতার প্রস্থচ্ছেদ পরীক্ষা করলে নিম্নলিখিত কলাবিন্যাস লক্ষ্য করা যায় ঃ—



চিত্র 12·22—সমাঙ্কপৃষ্ঠ (বাঁশ) পাতায় প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)।

1. **বহিস্ত্বক** বা **এপিডারমিস** (Epidermis) ঃ পিপাকৃতি পাশাপাশি সজ্জিত কোষান্তররন্ধ্রহীন প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা বহিস্ত্বক গঠিত, বহিস্ত্বক দু'প্রকার ঃ—

(a) **ঊর্ধ্ববহিস্ত্বক** (Upper epidermis) ঃ পাতার উপরের দিকের বহিস্ত্বক এটি। এই কোষস্তরের কোন কোন অংশে স্ফীতকায় কোষগুচ্ছ বা **বুলিফর্ম কোষ** (Bulliform cells) থাকে। ঊর্ধ্ববহিস্ত্বকের কোষগুলিতে সিলিকা বা বালির কেলাস থাকে। ঊর্ধ্ববহিস্ত্বকের উপরে কিউটিকলের প্রলেপ পড়ে। ত্বক কোষ থেকে কতকগুলি দৃঢ়, তীক্ষ্ন রোম নির্গত হয়।

(b) **নিম্নবহিস্ত্বক** (Lower epidermis) ঃ এটি পাতার একেবারে নীচের কোষস্তর। নিম্নবহিস্ত্বকের কোষগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি ঊর্ধ্ববহিস্ত্বকস্থ কোষগুলির অনুরূপ। বাঁশপাতার নিম্নবহিস্ত্বকেই মূলতঃ পত্ররন্ধ্র বর্তমান। নিম্নবহিস্ত্বকের উপরে ঊর্ধ্ববহিস্ত্বক অপেক্ষা অধিক পুরু কিউটিকল স্তর বর্তমান।

2. **মেসোফিল** (Mesophyll) ঃ ঊর্ধ্ব ও নিম্নবহিস্ত্বকের মধ্যে অবস্থিত ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত প্যারেনকাইমা কলার স্তরকে মেসোফিল বলে। মেসোফিল একই প্রকার স্তম্ভাকার ঘনসন্নিবিষ্ট প্যারেনকাইমা কলা দ্বারা গঠিত। এদের প্রাকারের দিকে সারিবদ্ধভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট বর্তমান। মেসোফিল কলার মধ্যে মাঝ বরাবর একাধিক বৃহদায়তন বাতাবকাশ বর্তমান।

3. **নালিকা বাণ্ডিল** বা **ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল** (Vascular bundles) ঃ নালিকা বাণ্ডিলগুলি উপরের দিকে জাইলেম এবং নীচের দিকে ফ্লোয়েম কলার সমন্বয়ে গঠিত। উভয় কলার মধ্যবর্তী স্থানে ক্যাম্বিয়ম নামক ভাজক কলাস্তর নাই। নালিকা বাণ্ডিলগুলি দু' প্রকার—ছোট ও বড়। উভয় নালিকা বাণ্ডিল পর্যায়ক্রমে সমান্তরাল সারিতে সজ্জিত থাকে। প্রতিটি বাণ্ডিল প্যারেনকাইমার **বাণ্ডিল আবরণী** (Bundle sheath) দ্বারা আবদ্ধ। বড় বাণ্ডিলগুলি ঊর্ধ্ব- ও নিম্নবহিস্ত্বকের সঙ্গে স্ক্লেরেনকাইমা কলা দ্বারা যুক্ত।

12.21. বিষমপৃষ্ঠ ও সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতার অন্তর্গঠনের পার্থক্য [*Differences in the internal structure between Dorsiventral leaf and Isobilateral leaf*] :

বিষমপৃষ্ঠ পাতা (Dorsiventral leaf)	সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতা (Isobilateral leaf)
(1) ঊর্ধ্ব বহিস্ত্বকে কোন পত্ররন্ধ্র থাকে না। কেবল নিম্ন বহিস্ত্বকে থাকে।	(1) ঊর্ধ্ব ও নিম্ন উভয় বহিস্ত্বকেই পত্ররন্ধ্র থাকে।
(2) ঊর্ধ্ব বহিস্ত্বকের কিউটিকল স্তর নিম্ন বহিস্ত্বকের কিউটিকল স্তর অপেক্ষা অধিক পুরু।	(2) দুই বহিস্ত্বকেই প্রায় সমান পুরু কিউটিকল স্তর থাকে।
(3) মেসোফিল কলা প্যালিসেড ও স্পঞ্জি প্যারেনকাইমায় বিভক্ত।	(3) মেসোফিল কলা কেবল একই প্রকার সাধারণ প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত।

12.22. পাতার কাজ [*Functions of leaves*] :

I. ● **সাধারণ কাজ** (Normal functions) ঃ

পাতার প্রধান কাজ চারিটি—

(1) উদ্ভিদদেহের অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় জল **বাষ্পমোচন** বা **প্রস্বেদন** (Transpiration) প্রক্রিয়ায় প্রধানত পাতার পত্ররন্ধ্র দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

(2) পাতা **সালোকসংশ্লেষ** (Photosynthesis) প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিলের সাহায্যে সূর্যালোক শোষণ ক'রে জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের সহ-

● **জীবন-চক্র** [Life-cycle]

মাছির জীবন-চক্র নিম্নলিখিত চারিটি দশায় সম্পন্ন হয় :—

(1) **ডিম** (Egg) : **মাছি দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে** এবং নোংরা জিনিষের উপরে একসঙ্গে প্রায় 100 থেকে 200 ডিম পাড়ে। প্রতি ঋতুতে মাছি 5 থেকে 6 বার ডিম পাড়ে।

(2) **লার্ভা** (Larva or Maggot) : সাদা ডিম থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই **শূককীট** বা **লার্ভা** (Larva) জন্মায়। লার্ভার পা থাকে না। এরা পচা খাদ্য, মল প্রভৃতির মধ্যে ঢুকে যায়।

(3) **পিউপা** (Pupa) : শূককীট পর্যাপ্ত আহার ক'রে 5 থেকে 7 দিনের মধ্যে **মূককীট** বা **পিউপা** (Pupa)-য় রূপান্তরিত হয়। এগুলি পিপার মতো বা ডিম্বাকার, লম্বায় প্রায় এক সেণ্টিমিটার।

(4) **পূর্ণাঙ্গ** (Adult) : পরবর্তী পাঁচ-সাতদিনের মধ্যে মূককীট থেকে পূর্ণাঙ্গ মাছির আবির্ভাব ঘটে। মাছির জীবন-চক্র শেষ হতে 10 থেকে 21 দিন সময় লাগে। পূর্ণাঙ্গে রূপান্তরিত হওয়ার 2-5 দিনের মধ্যেই স্ত্রী-মাছি ডিম পাড়া শুরু করে।

● **মাছি দমন** (Fly control) :

দ্রুত বংশবিস্তারে তৎপর মাছির বংশ ধ্বংস করতে হলে **ডিম পাড়ার যোগ্য সম্ভাব্য নোংরা আবর্জনাময় স্থানগুলিতে কীটনাশক ঔষধ বা তেল স্প্রে করা প্রয়োজন।** বাজারে **কাটা ফল, মাছি-বসা খাবার কখনই খাওয়া উচিত নয়।** উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন না করলে কলেরা বা যক্ষ্মার মতো কঠিন রোগের কবলে প'ড়ে অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে।

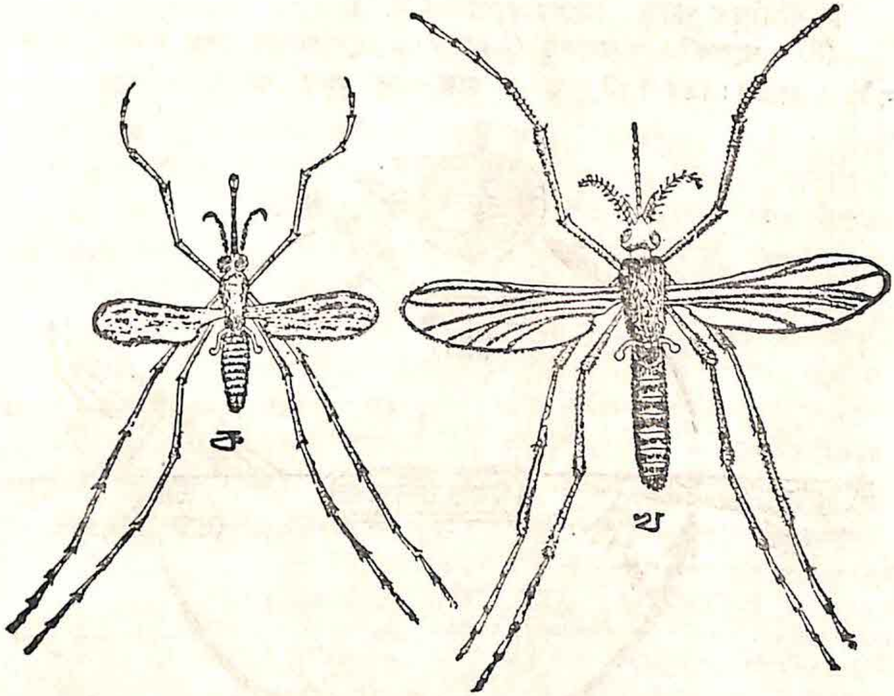
3. মশা (Mosquito)

মাছির মতো **মশাও আরথ্রোপডা পর্বভুক্ত** একটি পরিচিত **পতঙ্গ।** মশা অন্ধকার পছন্দ করে, অন্ধকার রাত্রে মশার গুণগুণানি শ্রুতিমধুর হলেও সুখদায়ক নয়। অনবরত দ্রুত ডানার ঝাপটায় ঐরূপ একটানা শব্দ ওঠে। বদ্ধ জলাজায়গা মশার বাসস্থান। মশার কামড় খায়নি এমন মানুষ পৃথিবীতে দুর্লভ। মশা যে কেবল হুল ফুটিয়ে যন্ত্রণা দেয় তাই নয়, নানা প্রকার রোগ-জীবাণুও রোগীর দেহ থেকে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রামিত করে।

ম্যালেরিয়া, গোদ, ডেঙ্গুজ্বর, পীতজ্বর প্রভৃতি মারাত্মক রোগ বিস্তারে মশা সহায়তা করে। এজন্য অবশ্য কেবল স্ত্রী-মশাই দায়ী। পুং-মশা মোটেই রক্ত পান করে না, এরা গাছের রস খেয়ে জীবনধারণ করে। স্ত্রী-মশা কিন্তু রক্ত ছাড়া অন্য কিছুই আহার করে না। দেহের সম্মুখভাগে সংলগ্ন **প্রোবোসিস** (Probosis) বা শোষকনলের সাহায্যে স্ত্রী-মশা রক্ত শোষণ করে। অসুস্থ ব্যক্তির দেহ থেকে রক্ত শোষণ করার পর সুস্থ ব্যক্তির শরীরে হুল ফোটালে রোগ-জীবাণু সুস্থ দেহে সংক্রামিত হয়।

মশা তিন প্রকার—অ্যানোফিলিস (*Anopheles*), **কিউলেক্স** (*Culex*) ও এডিস (*Aedes*)। এগুলি যথাক্রমে **ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া** এবং **ডেঙ্গু** ও **পীতজ্বরের** জীবাণু বহন করে।

কিউলেক্স মশা বদ্ধ জলাশয়ে এবং **অ্যানোফিলিস মশা পরিষ্কার** জলে ডিম পাড়ে। অ্যানোফিলিসের শূককীট জলতলের সমান্তরালে ভাসে, কিন্তু কিউলেক্সের শূককীট মাথা নীচু করে তির্যকভাবে ভাসে। এদের **বসার ধরন**



চিত্র 19·6—মশা, ক—অ্যানোফিলিস ; খ—কিউলেক্স।

দেখেও পূর্ণাঙ্গ অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশাকে সহজেই চেনা যায়। অ্যানোফিলিস সূক্ষ্মকোণে বসে। কিউলেক্স সর্বদা সমান্তরাল অবস্থায় বসে এবং পেছনের পা-দুটিকে দেহের ওপরে উঠিয়ে দেয়।

● **জীবন-চক্র** (Life-cycle) ঃ

মশার জীবন-চক্র নিম্নলিখিত চারটি দশায় সম্পন্ন হয় ঃ

(1) **ডিম** (Egg) ঃ মশকী জলে ডিম পাড়ে ; অ্যানোফিলিস মশকী একত্রে 200-300টি ডিম পাড়ে। মজা ডোবা, নালা, পুকুর প্রভৃতির জল—এমনকি বাড়ির আশপাশে যে কোন ক্ষুদ্র জলাধার মশকীর ডিম পাড়ার উপযুক্ত জায়গা।

যোগিতায় শর্করা-খাদ্য ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে। এতে বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ হয়।

(3) **পাতায় শ্বসন** (Respiration) চলে। সেই সময় বাতাসের অক্সিজেন গৃহীত ও উদ্ভিদ-দেহের কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসেই পরিত্যক্ত হয়।

(4) ফলকে বিন্যস্ত শিরা-উপশিরা পাতার কাঠামো তৈরী করে, জল ও খনিজ লবণ পাতায় পৌঁছে দেয় এবং দেহের সর্বত্র তৈরী খাদ্য পরিবেশন করে।

II. ● **বিশেষ কাজ** (Special functions) : (Art. 12.34 দ্রষ্টব্য।)

12.23. বাষ্পমোচন বা প্রস্বেদন [*Transpiration*] :

উদ্ভিদ মাটি থেকে প্রয়োজনাতিরিক্ত জল শোষণ করলেও সংগৃহীত জলের সামান্য অংশই শর্করা খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। উদ্বৃত্ত জল যাতে বিপাক-ক্রিয়ায় বিঘ্ন না ঘটায়, সেজন্য উদ্ভিদ কেবলমাত্র দিনের বেলায় ঐ উদ্বৃত্ত জল বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে পরিত্যাগ করে।

● **বাষ্পমোচনের সংজ্ঞা** (Definition of Transpiration) : **যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় সজীব উদ্ভিদ অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে পরিত্যাগ করে, তাকে বাষ্পমোচন বলে।**

প্রধানতঃ পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমেই বাষ্পমোচন হয়, সময় বিশেষে পাতার **কিউটিকল** মাধ্যমে বাষ্পমোচন সম্পন্ন হয়। তদুপরি **লেণ্টিসেল** (Lenticel) নামক এক বিশেষ অঙ্গের মাধ্যমেও বাষ্পমোচন হতে পারে। উল্লিখিত তিন প্রকার বাষ্পমোচন প্রক্রিয়াকে যথাক্রমে **স্টোমাটাল** (Stomatal), **কিউটিকুলার** (Cuticular) এবং **লেনটিসেলার** (Lenticellar) বাষ্পমোচন বলে।

পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বাষ্পমোচন পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই পদ্ধতিতেই সর্বাধিক বাষ্পমোচন ঘটে। **ফলকে পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা, পত্ররন্ধ্র গহ্বরের হ্রাস-বৃদ্ধি, আলোকের তীব্রতা, মাটিতে জলের পরিমাণ** প্রভৃতি শর্তগুলি **বাষ্পমোচন-হারকে** (Transpiration rate) নিয়ন্ত্রণ করে। সময় সময় পত্ররন্ধ্র বেশী খোলা থাকার জন্য বাষ্পমোচন হার বৃদ্ধি পায় এবং পাতা ঝিমিয়ে যায়। একই কারণে প্রচণ্ড রোদে লাউ, কুমড়া প্রভৃতি গাছের পাতা সাময়িকভাবে ঝিমিয়ে পড়ে। তবে, এই লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পত্ররন্ধ্র বন্ধ হতে শুরু করে এবং দ্রুত পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে।

12.24. বাষ্পমোচন ও বাষ্পায়নের সম্বন্ধ [*Relation between Transpiration and Evaporation*] :

পারিপার্শ্বিক ভৌত শর্ত (Physical factors) উভয় প্রক্রিয়াকে সমভাবে প্রভাবিত করলেও বাষ্পমোচন ও বাষ্পায়ন এক নয়।

বাষ্পায়ন কেবলমাত্র ভৌত শর্তের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। অপরদিকে বাষ্পমোচন ভৌত শর্ত ছাড়াও সজীব কোষের প্রোটোপ্লাজম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেজন্য বাষ্পমোচনকে শারীরবৃত্তীয় কাজ বলা হয়।

12.25. বাষ্পমোচনের তাৎপর্য *[Significance of Transpiration] :*

বাষ্পমোচনের মাধ্যমে স্থলজ উদ্ভিদের দেহ থেকে এত বেশী পরিমাণে জল বেরিয়ে যায় যে, বহু উদ্ভিদ-শারীরতত্ত্ববিদ্ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বাষ্পমোচন পদ্ধতিটি আদৌ উপকারী কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। কারণ, গরম ও শুকনো দিনে অত্যধিক জল পরিত্যাগ করার ফলে অনেক উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটে। তবে বাষ্পমোচন থেকে বেশ কতকগুলি সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন—

(1) বাষ্প পরিত্যাগ করার ফলে জলস্তম্ভে, অর্থাৎ মূল দ্বারা শোষিত জলে ঊর্ধ্বটান সৃষ্টি হয়।

(2) এতে জলস্তম্ভ অবিচ্ছিন্নভাবে উপরে উঠে আসে।

(3) এইভাবে **রসের উৎস্রোতে বাষ্পমোচন সহায়তা করে।**

(4) বাষ্পমোচন পরোক্ষে **লবণ গ্রহণে সাহায্য করে।**

(5) জল শোষণকালে অজৈব লবণ গৃহীত হয় বলে **কোষরসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে অভিস্রবণ চলতে পারে।**

(6) **বাষ্পমোচন দ্বারা উদ্ভিদদেহ শীতল হয়।**

(7) বাষ্পমোচন সারা অঙ্গে জল ছড়িয়ে পড়তে সহায়তা করে।

এইসব সুবিধার কথা বিবেচনা করলে মনে হয় বাষ্পমোচনের ক্ষতিকর দিক থেকে উপকারের দিকটাই বেশী ভারি। তাই বিজ্ঞানী **কার্টিস** (Curtis, 1962) বলেছেন, **"ক্ষতি করলেও উদ্ভিদের পক্ষে বাষ্পমোচন** অত্যন্ত **প্রয়োজনীয় একটি পদ্ধতি"** (Transpiration is a necessary evil)।

12.26. বাষ্পমোচনের পরীক্ষা *[Experiment on Transpiration]:*

● **উপকরণ** (Requisites) ঃ

(i) অ্যালুমিনিয়ম টবে লাগান একটি গাছ,
(ii) একটি বেলজার,
(iii) প্লাস্টিক কাগজ,
(iv) সুতো ও ভেসলিন,
(v) জল।

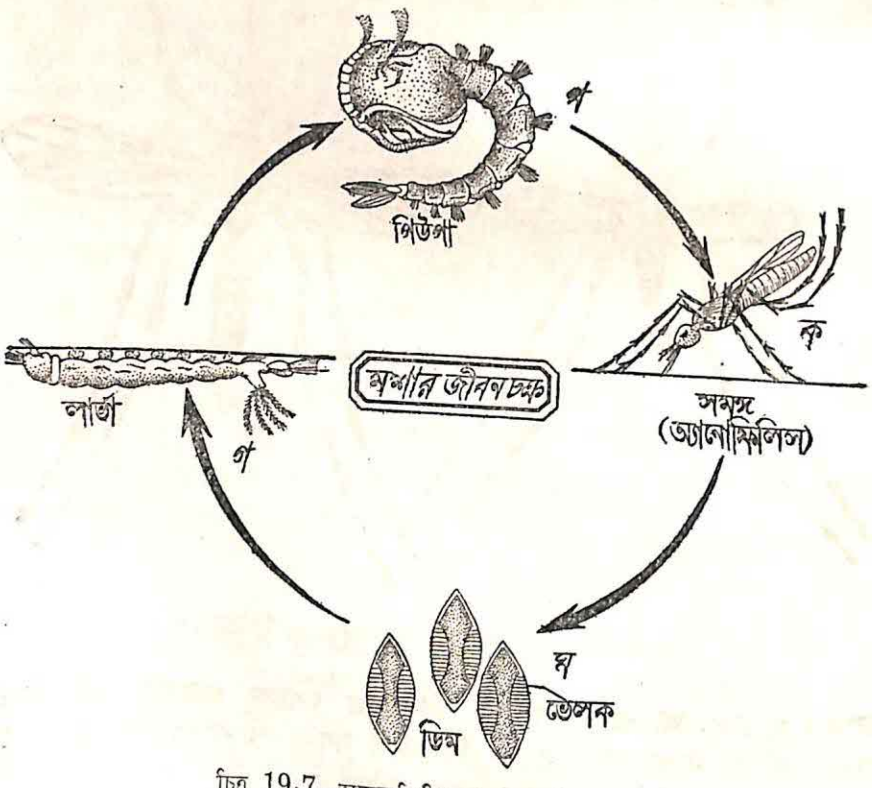
● **পরীক্ষা পদ্ধতি** (Procedure) ঃ টবের মাটিতে প্রচুর জল দিয়ে টবসুদ্ধ গাছটিকে পরীক্ষাগারের টেবিলে আলোকিত স্থানে বসান হল। টবের মাটি প্লাস্টিকের কাগজে ঢেকে সুতোর সাহায্যে কাগজটিকে টবের সঙ্গে শক্ত

অ্যানোফিলিসের ডিম জলে পৃথক পৃথক ভাবে ভাসে। ডিমগুলির আকার ছোট, খালি চোখে দেখা যায় না বললেই চলে। দেখতে **মাকুর মতো** (Spindle-shaped) ডিমগুলির দুপাশে ভেলক (raft) থাকে (চিত্র 19.7)। ভেলক বাতাসে পূর্ণ হওয়ায় ডিমগুলি স্বচ্ছন্দে ভেসে বেড়ায়। এভাবে দু-আড়াই দিন কেটে যায়।

কিউলেক্স মশা একসঙ্গে 200-400টি ডিম পাড়ে। লম্বা ডিমগুলি পরস্পর যুক্ত থাকে। কিউলেক্স মশার ডিমে ভেলক নাই।

নিম্নলিখিত পর্যায়ে ডিমের রূপান্তর ঘটে ঃ

(2) **শূককীট** বা **লার্ভা** (Larva) ঃ রূপান্তরের প্রথম অবস্থা **শূক**-কীট বা লার্ভা। ডিম ফুটে লার্ভা বেরিয়ে আসে। লার্ভা বহু খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ড-



চিত্র 19.7—অ্যানোফিলিস মশার জীবন-চক্র।

গুলির দুপাশে গুচ্ছ গুচ্ছ খোঁচা খোঁচা রোম থাকে। লম্বা দেহটি মস্তক, বক্ষ ও উদর—এই তিনটি অংশে বিভক্ত। মস্তকের দুপাশে শুঁড় ও দুটি চক্ষু আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী এদের প্রধান খাদ্য। লার্ভা সাঁতারে বেশ পটু।

(3) **মূককীট** বা **পিউপা** (Pupa) ঃ 8-10 দিনের মধ্যে 3-4 বার খোলস ত্যাগ ক'রে লার্ভা মূককীট বা পিউপায় রূপান্তরিত হয়। পরি-

পত শূককীটের মস্তকের দিকে খোলস ফাটিয়ে মূককীট বা পিউপা বাইরে আসে। মস্তক, বক্ষ ও উদর—এই তিনটি অংশে পিউপা বিভক্ত। একটি স্বচ্ছ ঢাকনায় পিউপা ঢাকা থাকে। পিউপার আকার ',' (কমা)-র মতো, মস্তকটি অস্বাভাবিক বড় এবং গোলাকার।

মস্তকের ওপরে চোখের ঠিক নিচেই একজোড়া শ্বাসনল বর্তমান। শ্বাসনলের আগায় অবস্থিত শ্বাসছিদ্র সর্বদা জলতলের ওপরে থাকে। পিউপার মুখ নাই, তাই খাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। 2-3 দিন এই অবস্থায় কাটলে দেহের খোলস লম্বালম্বিভাবে ফেটে যায় এবং পূর্ণাঙ্গ মশা বের হয়ে আসে।

(4) **সমঙ্গ (পূর্ণাঙ্গ মশা) বা ইমাগো** (Imago) ঃ 2-3 দিন পর পিউপা থেকে পূর্ণাঙ্গ মশা জন্মায়। খোলস ছেড়ে বাইরে আসামাত্রই মশা উড়তে পারে না, খোলসের ওপরেই বসে থাকে। ডানাগুলি শুকিয়ে শক্ত হওয়ামাত্র পূর্ণাঙ্গ মশা উড়ে যায়।

● **মশা দমন** (Mosquito control) ঃ সংক্রামক রোগ থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য মশার বংশ ধ্বংস করা উচিত। নালা, নর্দমা, বদ্ধ জলা—যেখানেই মশা জন্মাবার সম্ভাবনা, সেখানেই কেরোসিন, ডি. ডি. টি. বেগন ইত্যাদি কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়। ঐ জায়গাগুলিতে যাতে জল না জমে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। প্রত্যেকটি রাস্তা, বাড়ীর সংলগ্ন এলাকা আবর্জনামুক্ত রাখা দরকার। পূর্ণাঙ্গ মশা ধ্বংস করা কষ্টকর। সেজন্য ডিম, শূককীট বা মূককীট দশায় মশাকে বিনষ্ট করা প্রয়োজন। এদিকে প্রত্যেকের সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত।

● **অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশার জীবন-চক্রের বিভিন্ন দশার পার্থক্য ঃ**

দশা	অ্যানোফিলিস মশা	কিউলেক্স মশা
ডিম	এরা পরিষ্কার জলে ডিম পাড়ে। ডিমগুলি ছাড়াছাড়াভাবে জলে ভাসে। প্রতিটি ডিম ভেলক যুক্ত।	এরা অপরিষ্কার এবং বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে। ডিমগুলিতে ভেলক থাকে না।
শূককীট	এদের শূককীটগুলি জলের উপরিতলের সঙ্গে সমান্তরালে ভাসে।	এদের শূককীটগুলি জলের উপরিতলের সঙ্গে প্রায় 45° কোণে ভাসে।
মূককীট	এদের মূককীটে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শ্বাসনালী থাকে।	এদের মূককীটে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ শ্বাসনালী থাকে।
পূর্ণাঙ্গ	অ্যানোফিলিস মশা 45° কোণ করে বসে। ওড়বার সময় এদের ডানা থেকে ভন্ ভন্ শব্দ হয়।	কিউলেক্স মশা প্রায় সমান্তরালভাবে বসে। ওড়বার সময় এদের ডানা থেকে কোন শব্দ হয় না।

করে বেঁধে দেওয়া হল। তারপর টবটিকে একটি বেলজার চাপা দেওয়া হ'ল। বেলজারের কিনারায় ভেসলিন দিয়ে পরীক্ষা পাত্রটিকে বায়ু নিরোধক করা হ'ল।

● **নিরীক্ষা** (Observation) ঃ কিছু পরে দেখা গেল, বেলজারের ভেতরের গায়ে বিন্দু বিন্দু জলকণা জমেছে।



চিত্র 12·23—বাষ্পমোচনের পরীক্ষা।

● **সিদ্ধান্ত** (Inference) ঃ প্লাস্টিক কাগজে ঢাকা টবের ভিজা মাটি থেকে জলকণা বাইরে আসা অসম্ভব।

এক্ষেত্রে কেবল গাছের পাতা থেকেই জল পরিত্যক্ত হতে পারে। ঐভাবে পরিত্যক্ত জল বেলজারের ঠান্ডা গায়ের সংস্পর্শে এসে বিন্দু বিন্দু জলকণায় পরিণত হয়েছে ; অর্থাৎ **গাছ বাষ্পমোচন করেছে।**

● **সাবধানতা** (Precaution) ঃ বেলজারের কিনারা বরাবর যাতে ভালভাবে ভেসলিন লাগানো হয় সেদিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখতে হবে — অন্যথায় বাইরের জলীয় বাষ্প ভেতরে প্রবেশ ক'রে পরীক্ষায় বিঘ্ন ঘটাবে। প্রয়োজনমত ব্লটিং কাগজ ভিজিয়ে বাইরে থেকে বেলজারটি ঠান্ডা করতে হবে। নচেৎ বেলজার উত্তপ্ত হলে বাষ্পমোচনে উৎপন্ন জলীয় বাষ্প জলবিন্দুতে পরিণত হয় না।

12.27. সালোকসংশ্লেষ [*Photosynthesis*] :

● **সালোকসংশ্লেষের সংজ্ঞা** (Definition of Photosynthesis) ঃ **যে পদ্ধতিতে সবুজ উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের সমন্বয়ে কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্য উৎপাদন এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে, তাকে সালোকসংশ্লেষ বলে।**

স্বভোজী উদ্ভিদ নিজেই নিজের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করে।

এই পদ্ধতিতেই বাতাসের মুক্ত কার্বন সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন খাদ্যে বাঁধা পড়ে এবং দেহের অঙ্গীভূত হয়। সেজন্য সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে

অংগার আত্তীকরণ (Carbon assimilation) পদ্ধতিও বলা হয়। সজীব উদ্ভিদের ক্লোরোফিলযুক্ত কোষেই* কেবল সালোকসংশ্লেষ চলে। ক্লোরোফিল একটি জৈব অণুঘটক (Biocatalyst)। নিজে অপরিবর্তিত থেকে একই ক্লোরোফিল ক্রমাগত সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া চালিয়ে যায়।

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার প্রধান সর্ত হল সূর্যালোক। **এই প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিরূপে শর্করা খাদ্যে শৃঙ্খলিত হয়।** শ্বসনের সময় সেই শক্তিই তাপ-শক্তিরূপে শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে দেহের নানাবিধ বিপাক ক্রিয়া চালাতে সাহায্য করে।

● **সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতি** (Mechanism of Photosynthesis) : স্থলজ উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। কার্বন ডাই-অক্সাইড পত্ররন্ধ্রের ভিতর দিয়ে প্রবেশ ক'রে কোষান্তর রন্ধ্রপথে মেসোফিল (Mesophyll) কলায় পেঁছায়। জলজ উদ্ভিদ ব্যাপন ক্রিয়ার জলে দ্রব কার্বন ডাই-অক্সাইড সারা অংগ দিয়ে শোষণ করে। মূল জল শোষণ ক'রে মেসোফিল কোষে পেঁছে দেয়। ঐ জলে কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত হয়। মেসোফিল কলায় প্রচুর ক্লোরোফিল থাকে। সালোকসংশ্লেষের সময় সৌরশক্তির প্রভাবে ক্লোরোফিলের সহায়তায় কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে এবং ধারাবাহিক জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে পরিশেষে শর্করা খাদ্য উৎপন্ন হয়।

জটিল সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটিকে নিম্নলিখিত সহজ ও সরল সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় :

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$$

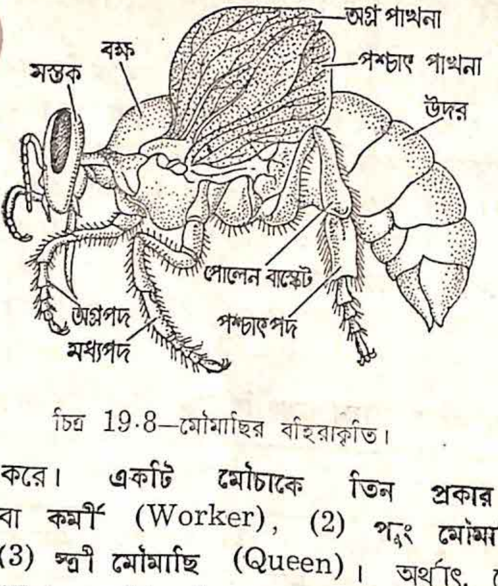
জটিল রাসায়নিক পদ্ধতির ধারাবাহিক ধাপগুলি সম্বন্ধে পুরোপুরি জানা এখনও সম্ভব হয়নি। তবে সালোকসংশ্লেষ যে একটি **জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া** (Oxidation-reduction process) তাতে দ্বিমত নাই। সালোকসংশ্লেষকারী কোষমাত্রেই তাতে একপ্রকার **হাইড্রোজেন গ্রাহক** (Hydrogen acceptor) থাকে।

এই পদার্থটি জলের হাইড্রোজেন পরমাণু গ্রহণ ক'রে তাকে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সংগে যুক্ত হতে সাহায্য করে। এইভাবে জল জারিত এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বিজারিত হয়। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তি স্থৈতিক-

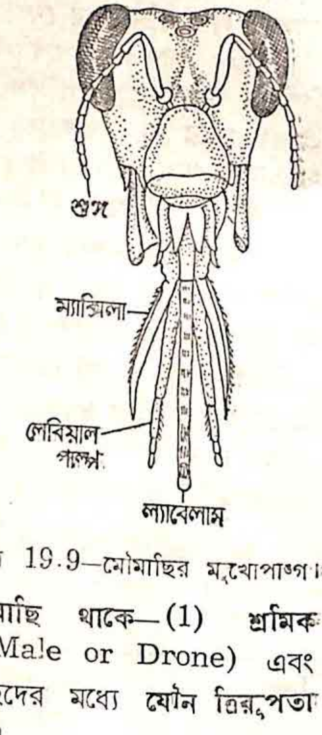
* মূল বা উদ্ভিদের অন্যান্য ভূ-নিম্নস্থ অংশের কোষের ক্লোরোফিল থাকে না। সেই কারণে সেখানে সালোকসংশ্লেষ সম্ভব নয়। ক্লোরোফিল না থাকার প্রধান কারণ সূর্যালোকের অভাব। সূর্যালোক না পেলে ক্লোরোফিল গঠিত হয় না। মৃৎগত কাণ্ড আলুর কোষমধ্যস্থ লিউকোপ্লাস্টিড সূর্যালোক পেলে ক্লোরোপ্লাস্টিডে পরিবর্তিত হয়। এই কারণে মাঝে মাঝে আলুর রং সবুজ হতে দেখা যায়।

4. মৌমাছি (Honey Bee)

মশা বা মাছির সমগোত্রীয় পতঙ্গ হলেও মৌমাছি **সমাজবদ্ধ জীব** (Social insect) এবং **উপকারী পতঙ্গ** (Benificial insect)। এদের জীবন-যাপন প্রণালী থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। অর্থকরী প্রাণী হিসাবেও মৌমাছির গুরুত্ব অপরিসীম। মৌমাছির বাসায় অর্থাৎ, মৌচাকে একসঙ্গে প্রায় 50,000 থেকে 80,000টি মৌমাছি বাস



চিত্র 19·8—মৌমাছির বহিরাকৃতি।



চিত্র 19·9—মৌমাছির মুখোপাঙ্গ।

করে। **একটি মৌচাকে তিন প্রকার মৌমাছি থাকে**—(1) **শ্রমিক** বা **কর্মী** (Worker), (2) **পুং মৌমাছি** (Male or Drone) এবং (3) **স্ত্রী মৌমাছি** (Queen)। অর্থাৎ, মৌমাছিদের মধ্যে **যৌন ত্রিরূপতা** (Trimorphism) লক্ষ্য করা যায় (চিত্র 19·11)।

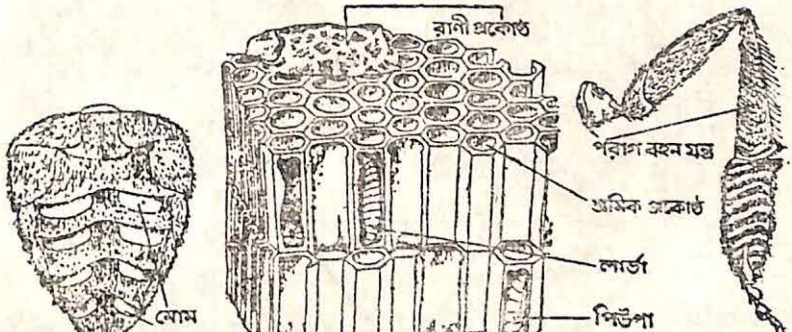
● **যৌনত্রিরূপতা (Trimorphism) ঃ**

শ্রমিক (Worker) ঃ প্রতিটি মৌচাকে এদের সংখ্যা কয়েক হাজার, অর্থাৎ মৌচাকের শতকরা 90 ভাগ মৌমাছি শ্রমিক। **এরা নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে উৎপন্ন হয়।** প্রকৃতপক্ষে এরা স্ত্রী মৌমাছি, তবে এদের কোন জনন ক্ষমতা নাই। এরা মৌচাক পরিচর্যা, নেকটার সংগ্রহ, অন্যান্য মৌমাছির পরিচর্যা, মোম তৈয়ারী ইত্যাদি কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। সেজন্য শ্রমিক মৌমাছিকে **ধাত্রী মৌমাছিও** বলা হয়। শত্রুনিধন করাও এদের অন্যতম কাজ। এদের আয়ুষ্কাল প্রায় 3 মাস।

পুরুষ (Drone) ঃ প্রতি মৌচাকে প্রায় দু'শোর মতো পুরুষ মৌমাছি থাকে। **এরা অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে উৎপন্ন হয়।** এদের দেহ শ্রমিক-এর দেহ

অপেক্ষা সামান্য বড়। পুরুষের দেহে মোমগ্রন্থি, পরাগবহন যন্ত্র ও হুল থাকে না। প্রজননে অংশগ্রহণ করাই এদের প্রধান কাজ। সেজন্য এরা অত্যন্ত কুঁড়ে প্রকৃতির। প্রজনন সমাপ্ত হবার পর এদের অধিকাংশের মৃত্যু হয়।

রাণী (Queen) ঃ প্রতিটি মৌচাকে একটি মাত্র রাণী মৌমাছি থাকে। স্থূল উদর বিশিষ্ট রাণী মৌমাছির দেহ দীর্ঘতম। **নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে** রাণীর জন্ম হয়। এদের দেহে পরাগবহন যন্ত্র ও মোমগ্রন্থি থাকে না। মৌচাকের কুঠরিতে কুঠরিতে ডিম পাড়াই রাণীর কাজ। চাহিদার সর্বোচ্চ সীমায় রাণী দিনে 300 মত ডিম পাড়ে। শ্রমিক মৌমাছি কর্তৃক সংগৃহীত মধু পান করে রাণী বেঁচে থাকে। রাণীর আয়ুষ্কাল প্রায় 3 বৎসর।



চিত্র 19.10 ঃ ক—কর্মী মৌমাছির উদর ; খ—মৌচাক ; গ—কর্মীর পশ্চাৎপদ।

চাষোপযোগী মৌমাছির মধ্যে **এপিস মেলিফিকা** (*Apis mellifica*), **এপিস ডরসাটা** (*Apis dorsata*), **এপিস ইন্ডিকা** (*Apis indica*) এবং **এপিস ফ্লোরিয়া** (*Apis florea*) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

● **মৌমাছির জীবন-চক্র** [Life cycle of Bee] ঃ

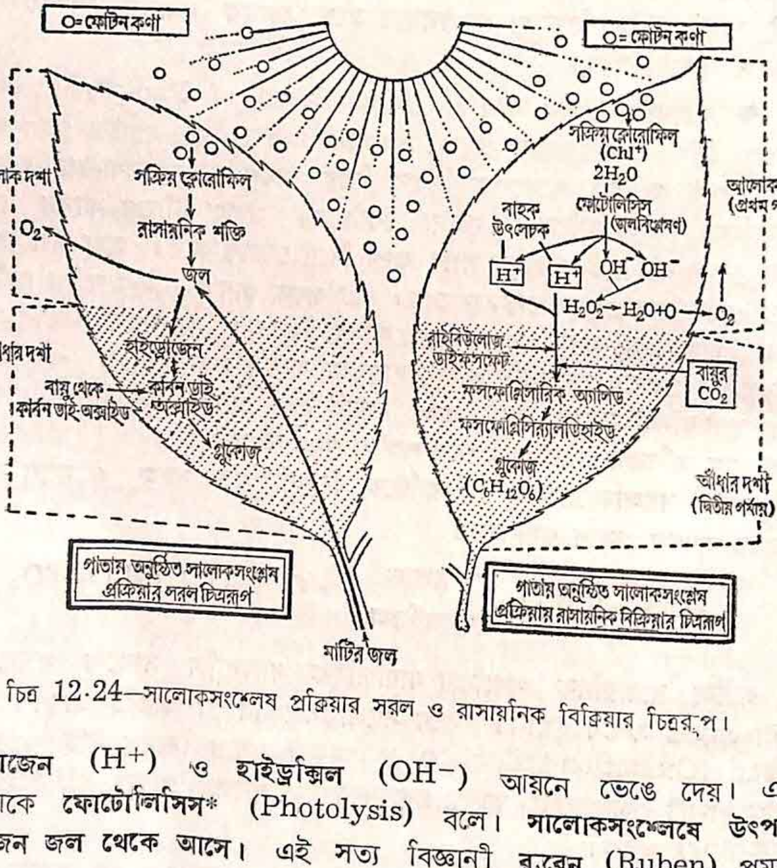
মৌচাকে উপযুক্ত স্থানের অভাব ঘটলে, মৌমাছি অন্যত্র উড়ে যায়। ঐ সময়ে উড়ন্ত অবস্থায় রাণী ও পুরুষ মৌমাছির দৈহিক মিলন ঘটে। এই উড্ডয়নকে **বৈবাহিক উড্ডয়ন** (Nuptial flight) বলে। মিলনের পরেই পুরুষ মৌমাছির মৃত্যু ঘটে। নতুন চাকে ফিরে এসে চাকের প্রতিটি কুঠরীতে রাণী একটি একটি করে ডিম পাড়ে।

মৌমাছির জীবন-চক্র নিম্নলিখিত **চারটি দশায়** সম্পন্ন হয় ঃ

(1) **ডিম্ব** (Egg) ঃ নিষিক্ত ডিম থেকে রাণী ও শ্রমিক জন্মায়। এদের কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা স্বভাবতই '2n' বা **ডিপ্লয়েড** (Diploid)। কিন্তু, অনিষিক্ত ডিম থেকে পুরুষ জন্মায় বলে তাদের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক, অর্থাৎ 'n' বা **হ্যাপলয়েড** (Haploid)।

রাসায়নিক শক্তিরূপে শর্করা খাদ্যে শৃঙ্খলিত হয়। **আলোক দশা ও আঁধার দশার** মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল থেকে শর্করা খাদ্য উৎপন্ন হয়।

● **আলোক দশা** (Light phase) ঃ আলোক দশায় সূর্যালোকের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সূর্যালোক থেকে **ফোটন** (Photon) নামক অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য সৌরকণা বর্ষিত হয়। সৌরশক্তিকে ফোটন কণারূপে শোষণ ক'রে ক্লোরোফিল সক্রিয় (Chl+) হয়। সক্রিয় ক্লোরোফিলই জলকে



চিত্র 12·24—সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সরল ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার চিত্ররূপ।

হাইড্রোজেন (H^+) ও **হাইড্রক্সিল** (OH^-) আয়নে ভেঙে দেয়। এই বিক্রিয়াকে **ফোটোলিসিস*** (Photolysis) বলে। **সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন অক্সিজেন জল থেকে আসে।** এই সত্য বিজ্ঞানী **রুবেন** (Ruben) প্রমাণ করেন।

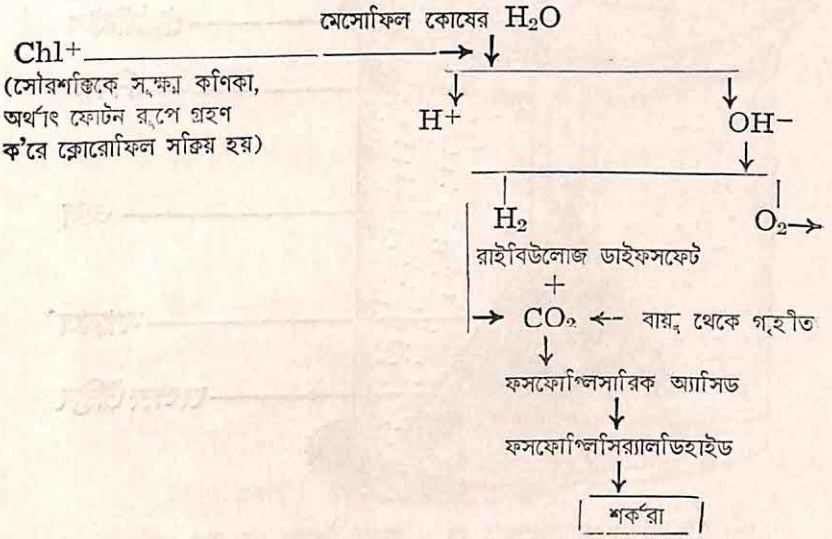
● **আঁধার দশা** (Dark phase) ঃ **আলোক দশার পর আঁধার দশা শুরু** হয়। এই দশায় আলোর প্রয়োজন হয় না। তাই অন্ধকারেও এই দশা চলে। কেবল উৎসেচক ও তাপের প্রভাবে মেসোফিল কোষস্থ **রাইবিউলোজ ডাইফসফেট** (Ribulose diphosphate) নামক রাসায়নিক যৌগ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ ক'রে পরবর্তী রাসায়নিক বিক্রিয়া চালাতে সাহায্য করে।

* এটি হিল বিক্রিয়া (Hill reaction) নামে পরিচিত।

এর ফলে **ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড** (Phosphoglyceric acid) নামে এক অন্তর্বর্তী পদার্থ উৎপন্ন হয়। এইভাবে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড সরাসরি উদ্ভিদদেহে সংশ্লেষিত জৈব যৌগের অঙ্গীভূত হয়।

সেজন্য সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিকে **অঙ্গার আত্তীকরণ** বলে। ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড পরে হাইড্রোজেন আয়ন দ্বারা জারিত হয়ে **ফসফোগ্লিসির‍্যালডিহাইড** (Phosphoglyceraldehyde) উৎপন্ন করে। পরিশেষে ধারাবাহিক জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়।

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটির সংক্ষিপ্ত রূপ নীচের ছকে দেখান হইল ঃ—



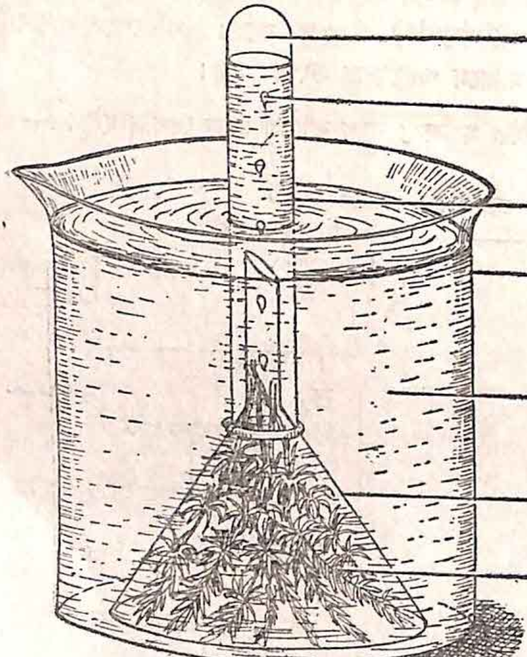
12.28. সালোকসংশ্লেষের পরীক্ষা [*Experiments on Photosynthesis*] :

(1) **সালোকসংশ্লেষের সময় অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এবং আলোকের প্রয়োজন হয়** (Oxygen is evolved and light is required during photosynthesis) ঃ

● উপকরণ (Requisites) ঃ

(i) একটি বিকার,
(ii) একটি ছোটগলা ফানেল,
(iii) একটি টেস্টটিউব,
(iv) কিছু জলজ সবুজ উদ্ভিদ,
(v) অল্প পরিমাণে সাধারণ সোডাজল ও ক্ষারীয় পটাশিয়ম পাইরোগ্যালেট দ্রবণ।

● **পরীক্ষা পদ্ধতি** (Procedure) : তিন-চতুর্থাংশ জলপূর্ণ একটি বিকারে একগুচ্ছ জলজ উদ্ভিদ নিয়ে তার কাটা কাণ্ডগুলি ঊর্ধ্বমুখী রাখা হ'ল। ছোটগলা ফানেল দিয়ে উদ্ভিদগুলিকে এমনভাবে ঢেকে দেওয়া হল, যাতে ফানেলের নল সম্পূর্ণভাবে জলের তলায় চলে যায়। এখন একটি জলপূর্ণ টেস্টটিউবের মুখ বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ফানেলের নলের উপরে সাবধানে নামিয়ে দেওয়া



চিত্র 12·25—সালোকসংশ্লেষে যে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তার পরীক্ষা।

হল যাতে টেস্টটিউবের জল নেমে আসতে না পারে। বিকারের জলে সামান্য সোডা জল মেশান হল। এইভাবে দুপ্রস্থ পরীক্ষা-পাত্রের ব্যবস্থা ক'রে একটিকে সূর্যালোকে, অন্যটিকে অন্ধকারে রাখা হল।

● **নিরীক্ষা** (Observation) : কিছুক্ষণের মধ্যে **সূর্যালোকে রাখা পরীক্ষাপাত্রটি থেকে ক্রমান্বয়ে বুদবুদ উৎপন্ন হতে দেখা যায়।** বুদবুদ যতই উপরে উঠে মিলিয়ে যায়, ততই টেস্টটিউবের জলতল নীচে নেমে আসে। অপর-পক্ষে অন্ধকারে রাখা দ্বিতীয় পরীক্ষাপাত্রটিতে মোটেই বুদবুদ উৎপন্ন হয় না।

● **সিদ্ধান্ত** (Inference) : (i) বুদবুদ প্রকৃতপক্ষে গ্যাসীয় পদার্থ। ক্ষারীয় পটাশিয়ম পাইরোগ্যালেট দ্রবণ টেস্টটিউবে প্রবেশ করান মাত্র গ্যাসটি শোষিত হয় এবং টেস্টটিউব পুনরায় জলপূর্ণ হয়। ক্ষারীয় পটাশিয়ম পাইরোগ্যালেট দ্রবণের কেবলমাত্র অক্সিজেন শোষণ করার ক্ষমতা

আছে। এ থেকে প্রমাণিত হল, সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন গ্যাসটি অক্সিজেন। অর্থাৎ, **সালোকসংশ্লেষ চলাকালে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়।**

(ii) অন্ধকারে উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ চালাতে পারে না, তাই সেখানে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ, **সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জন্য আলোর প্রয়োজন।**

● **সাবধানতা** (Precaution) ঃ ফানেলের দণ্ডটি যাতে অনেকখানি জলের নীচে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, নচেৎ ঐ ফানেলের দণ্ডের উপরে টেস্টটিউবটিকে বসাতে বা সেখান থেকে বার করতে অসুবিধে হবে।

(2) **কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া সালোকসংশ্লেষ হয় না** (Photosynthesis is impossible without carbon dioxide) ঃ

● **উপকরণ** (Requisites) ঃ

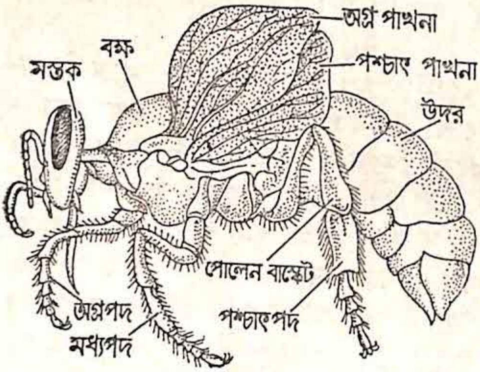
(i) একটি কনিক্যাল ফ্লাস্ক,
(ii) মাঝামাঝি ভাগ করা একটি কর্কের ছিপি,
(iii) কিছু কস্টিক পটাশ দ্রবণ ও ভেসলিন,
(iv) একটি টবে লাগানো শ্বেতসারমুক্ত সতেজ গাছ,
(v) কিছুটা অ্যালকোহল,
(vi) কিছুটা 1% আয়োডিন দ্রবণ ও
(vii) একটি ওয়াটার বাথ।

● **পরীক্ষা পদ্ধতি** (Procedure) ঃ কাচের কনিক্যাল ফ্লাস্কটিতে অল্প পরিমাণে কস্টিক পটাশ দ্রবণ নিয়ে বোতলের মুখটি দ্বিখণ্ডিত ছিপি দ্বারা বন্ধ করা হল। কয়েকদিন অন্ধকারে রাখা ও শ্বেতসারমুক্ত গাছের একটি পাতার অর্ধাংশ ফ্লাস্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হ'ল। ইতিমধ্যে কর্ক ও কনিক্যাল ফ্লাস্কের কিনারা বরাবর ভেসলিন লাগিয়ে পরীক্ষা পাত্রটিকে বায়ু নিরোধক করা হ'ল। এবার পরীক্ষা পাত্রটিকে সূর্যালোকে রেখে দেওয়া হ'ল। কয়েক ঘণ্টা বাদে ঐ পাতাটিকে ওয়াটার বাথে রাখা ফুটন্ত অ্যালকোহলে রেখে ক্লোরোফিল-মুক্ত করার পর সেটিকে আয়োডিন দ্রবণে ডোবান হল।

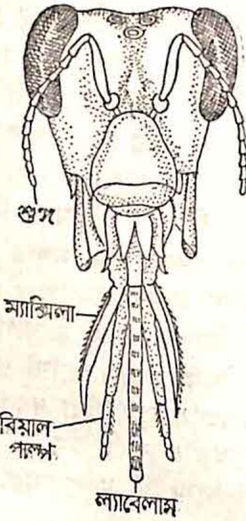
● **নিরীক্ষা** (Observation) ঃ কনিক্যাল ফ্লাস্কের ভিতরে রাখা পত্রাংশ বর্ণহীন থাকে কিন্তু তার বাইরের পত্রাংশ নীলবর্ণ ধারণ করে।

4. মৌমাছি (Honey Bee)

মশা বা মাছির সমগোত্রীয় পতঙ্গ হলেও মৌমাছি **সমাজবদ্ধ জীব** (Social insect) এবং **উপকারী পতঙ্গ** (Benificial insect)। এদের জীবন-যাপন প্রণালী থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। অর্থকরী প্রাণী হিসাবেও মৌমাছির গুরুত্ব অপরিসীম। মৌমাছির বাসায় অর্থাৎ, মৌচাকে একসঙ্গে প্রায় 50,000 থেকে 80,000টি মৌমাছি বাস



চিত্র 19.8—মৌমাছির বহিরাকৃতি।



চিত্র 19.9—মৌমাছির মুখোপাঙ্গ।

করে। **একটি মৌচাকে তিন প্রকার মৌমাছি থাকে**—(1) **শ্রমিক** বা **কর্মী** (Worker), (2) **পুং মৌমাছি** (Male or Drone) এবং (3) **স্ত্রী মৌমাছি** (Queen)। অর্থাৎ, মৌমাছিদের মধ্যে **যৌন ত্রিরূপতা** (Trimorphism) লক্ষ্য করা যায় (চিত্র 19.11)।

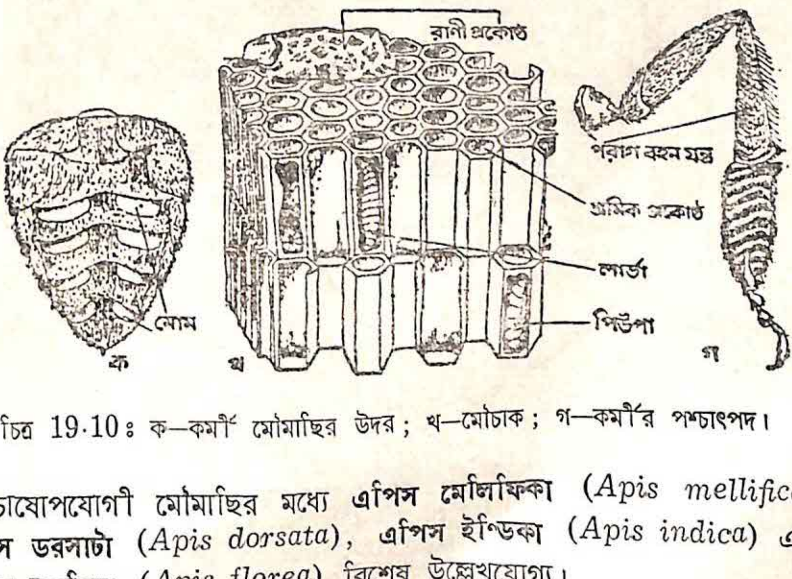
● যৌনত্রিরূপতা (Trimorphism) ঃ

শ্রমিক (Worker) ঃ প্রতিটি মৌচাকে এদের সংখ্যা কয়েক হাজার, অর্থাৎ মৌচাকের শতকরা 90 ভাগ মৌমাছি শ্রমিক। **এরা নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে উৎপন্ন হয়।** প্রকৃতপক্ষে এরা স্ত্রী মৌমাছি, তবে এদের কোন জনন ক্ষমতা নাই। এরা মৌচাক পরিচর্যা, নেকটার সংগ্রহ, অন্যান্য মৌমাছির পরিচর্যা, মোম তৈয়ারী ইত্যাদি কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। সেজন্য শ্রমিক মৌমাছিকে **ধাত্রী মৌমাছিও** বলা হয়। শত্রুনিধন করাও এদের অন্যতম কাজ। এদের আয়ুষ্কাল প্রায় 3 মাস।

পুরুষ (Drone) ঃ প্রতি মৌচাকে প্রায় দুশোর মতো পুরুষ মৌমাছি থাকে। **এরা অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে উৎপন্ন হয়।** এদের দেহ শ্রমিক-এর দেহ

অপেক্ষা সামান্য বড়। পুরুষের দেহে মোমগ্রন্থি, পরাগবহন যন্ত্র ও হুল থাকে না। প্রজননে অংশগ্রহণ করাই এদের প্রধান কাজ। সেজন্য এরা অত্যন্ত কুঁড়ে প্রকৃতির। প্রজনন সমাপ্ত হবার পর এদের অধিকাংশের মৃত্যু হয়।

রাণী (Queen) ঃ প্রতিটি মৌচাকে একটি মাত্র রাণী মৌমাছি থাকে। স্থূল উদর বিশিষ্ট রাণী মৌমাছির দেহ দীর্ঘতম। **নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে** রাণীর জন্ম হয়। এদের দেহে পরাগবহন যন্ত্র ও মোমগ্রন্থি থাকে না। মৌচাকের কুঠরিতে কুঠরিতে ডিম পাড়াই রাণীর কাজ। চাহিদার সর্বোচ্চ সীমায় রাণী দিনে 300 মত ডিম পাড়ে। শ্রমিক মৌমাছি কর্তৃক সংগৃহীত মধু পান করে রাণী বেঁচে থাকে। রাণীর আয়ুষ্কাল প্রায় 3 বৎসর।



চিত্র 19.10ঃ ক—কর্মী মৌমাছির উদর ; খ—মৌচাক ; গ—কর্মীর পশ্চাৎপদ।

চাষোপযোগী মৌমাছির মধ্যে **এপিস মেলিফিকা** (*Apis mellifica*), **এপিস ডরসাটা** (*Apis dorsata*), **এপিস ইন্ডিকা** (*Apis indica*) এবং **এপিস ফ্লোরিয়া** (*Apis florea*) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

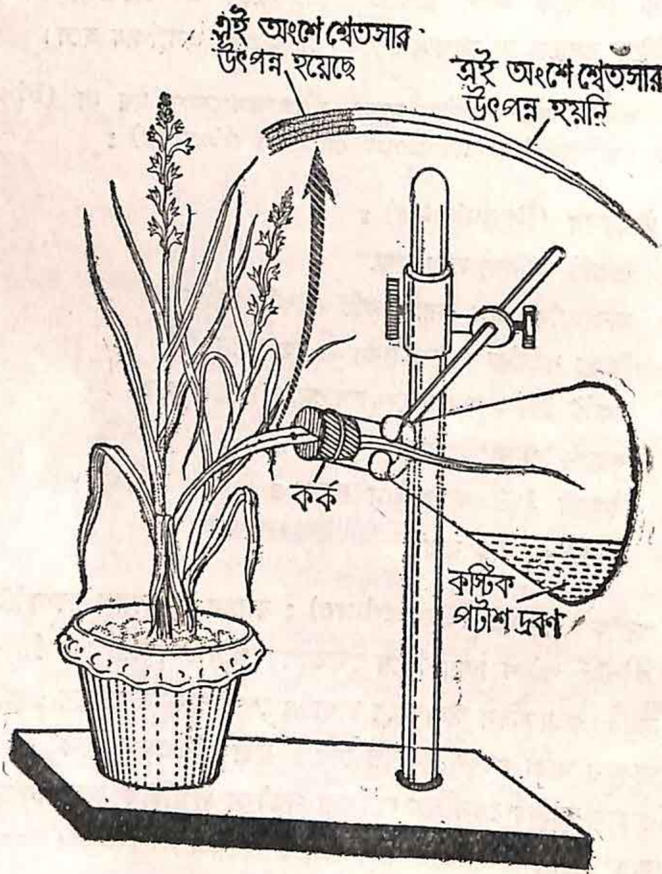
● **মৌমাছির জীবন-চক্র** [Life cycle of Bee] ঃ

মৌচাকে উপযুক্ত স্থানের অভাব ঘটলে, মৌমাছি অন্যত্র উড়ে যায়। ঐ সময়ে উড়ন্ত অবস্থায় রাণী ও পুরুষ মৌমাছির দৈহিক মিলন ঘটে। এই উড্ডয়নকে **বৈবাহিক উড্ডয়ন** (Nuptial flight) বলে। মিলনের পরেই পুরুষ মৌমাছির মৃত্যু ঘটে। নতুন চাকে ফিরে এসে চাকের প্রতিটি কুঠরীতে রাণী একটি একটি করে ডিম পাড়ে।

মৌমাছির জীবন-চক্র নিম্নলিখিত চারটি দশায় সম্পন্ন হয় ঃ

(1) **ডিম** (Egg) ঃ নিষিক্ত ডিম থেকে রাণী ও শ্রমিক জন্মায়। এদের কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা স্বভাবতই '2n' বা **ডিপলয়েড** (Diploid)। কিন্তু, অনিষিক্ত ডিম থেকে পুরুষ জন্মায় বলে তাদের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক, অর্থাৎ 'n' বা **হ্যাপলয়েড** (Haploid)।

● **সিদ্ধান্ত (Inference) :** ফ্লাস্কের বাইরে অবস্থিত পত্রাংশ স্বাভাবিকভাবে সালোকসংশ্লেষ চালিয়ে শ্বেতসার উৎপন্ন করে। সেজন্য ঐ অংশটি আয়োডিনের সংস্পর্শে আসা মাত্র নীলবর্ণ ধারণ করে। কিন্তু বোতলের ভিতরের অংশটি সূর্যালোক ও জল পেয়েও সালোকসংশ্লেষ চালাতে পারেনি। কারণ বোতলের ভিতরের কার্বন ডাই-অক্সাইড কস্টিক পটাশ দ্রবণ পূর্বেই শুষে নেওয়ায় ঐ অংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড পায়নি।



চিত্র 12·26—সালোকসংশ্লেষে কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষা।

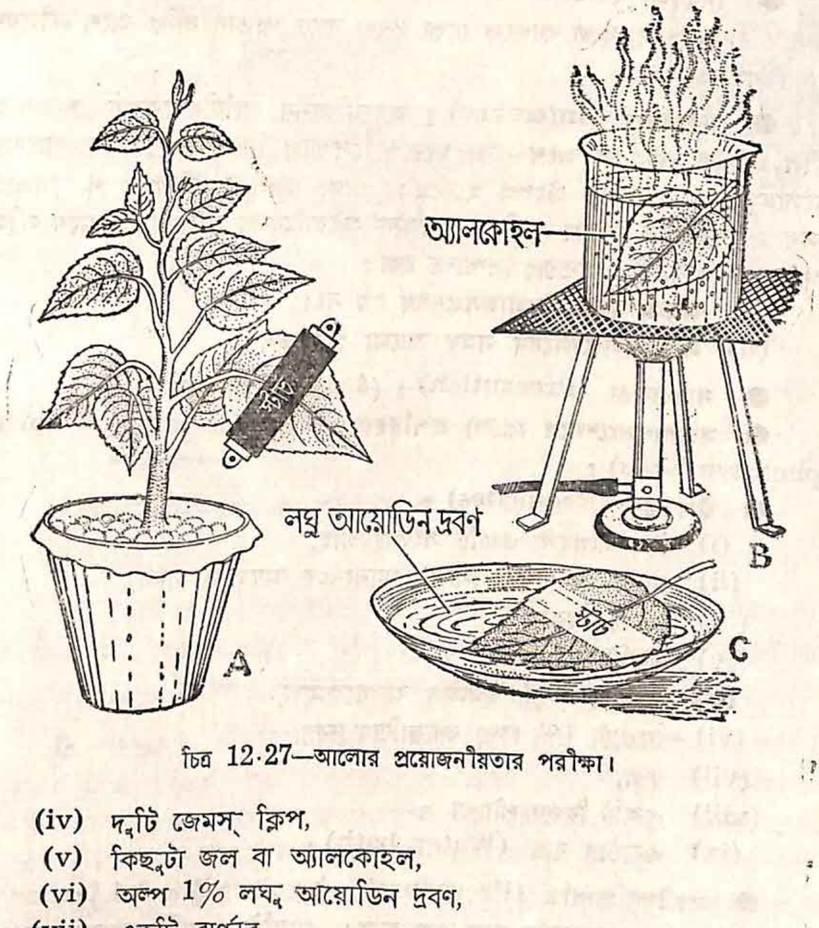
অর্থাৎ, কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া সালোকসংশ্লেষ হয় না।

● **সাবধানতা (Precaution) :** (4 নং পরীক্ষার মতো)।

(3) **আলো ছাড়া সালোকসংশ্লেষ হয় না** (Photosynthesis is not possible without light) :

● **উপকরণ** (Requisites) :

(i) টবে লাগানো একটি সতেজ গাছ,
(ii) এক টুকরো কাল কাগজ,
(iii) একটি বিকার,

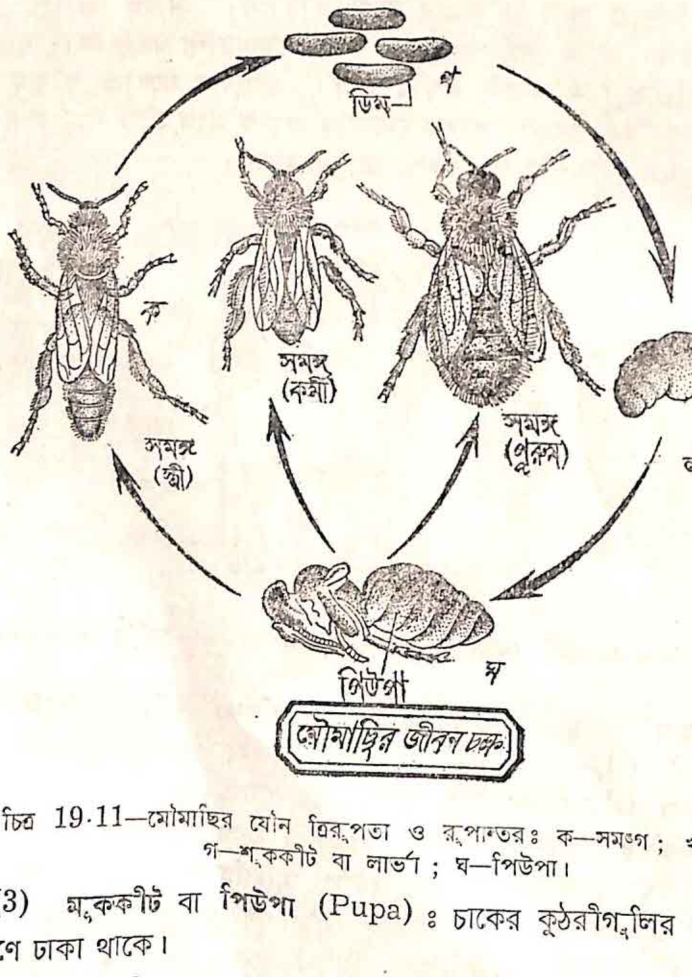


চিত্র 12·27—আলোর প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষা।

(iv) দুটি জেমস্ ক্লিপ,
(v) কিছুটা জল বা অ্যালকোহল,
(vi) অল্প 1% লঘু আয়োডিন দ্রবণ,
(vii) একটি বার্ণার,
(viii) একটি ত্রিপদ স্ট্যান্ড,
(ix) একটি ওয়াটার বাথ।

● **পরীক্ষা পদ্ধতি** (Procedure) : টবে লাগানো গাছটিকে কয়েকদিন অন্ধকারে রেখে শ্বেতসার মুক্ত করা হল। পুনরায় সূর্যালোকে রাখার পূর্বে

(2) **শূককীট বা লার্ভা** (Larva) ঃ ডিম থেকে 3 দিন পর লার্ভা নির্গত হয়। 3 দিনের বেশী **রাজকীয় জেলী** (Royal jelly) খেতে পেলে লার্ভা থেকে রাণী জন্মায়। তিনদিন পর মধুসিক্ত পরাগ অর্থাৎ মৌমাছির **রুটি** (Bee bread) খেতে পেলে লার্ভা শ্রমিক ও পুরুষ মৌমাছিতে রূপান্তরিত হয়।



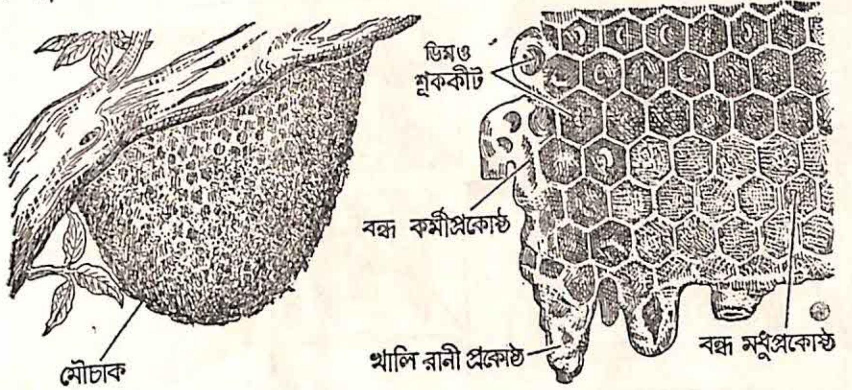
চিত্র 19·11—মৌমাছির যৌন ত্রিরূপতা ও রূপান্তর ঃ ক—সমঙ্গ ; খ—ডিম ; গ—শূককীট বা লার্ভা ; ঘ—পিউপা।

(3) **মূককীট বা পিউপা** (Pupa) ঃ চাকের কুঠরীগুলির মুখ মোমের আবরণে ঢাকা থাকে।

পিউপা কুঠরীতে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় প্রায় 2 সপ্তাহ কাটায়। তারপর আবরণীর মধ্যেই নানা পরিবর্তনের ফলে পিউপা ক্রমশঃ পূর্ণাঙ্গ মৌমাছিতে রূপান্তরিত হয়। মূককীট অবস্থায় রাণী, পুরুষ ও শ্রমিক যথাক্রমে $7\frac{1}{4}$ দিন, $14\frac{1}{4}$ দিন এবং 12 দিন কাটায়।

(4) **পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি বা ইমাগো** (Imago) ঃ পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি লালা আবরণী ও কুঠরীর মুখ কেটে বাইরে চলে যায়।

● মধু (Honey) ঃ মৌমাছি ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায়। ফুলের নেকটার-গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত একপ্রকার শর্করা জাতীয় মিষ্টি রস কর্মী মৌমাছিরা সংগ্রহ ক'রে এনে চাকের কোষে কোষে সঞ্চয় করে। পরে মৌমাছিরা এই রস গিলে নিয়ে তাদের মধুথলি (Honey-Sac)-তে সঞ্চয় করে রাখে। সেখানে লালার মিশ্রণের ফলে নেকটার আর্দ্র বিশ্লেষিত (Hydrolysed) হয়। এভাবে সেটি সুক্রোজ জাতীয় শর্করা গ্লুকোজ, লেভুলোজ ও ফ্রাকটোজে রূপান্তরিত হয়। মৌমাছিরা ঐ রূপান্তরিত শর্করা চাকের কোষে কোষে উগরিয়ে (Regargitate) দেয়।



চিত্র 19·12—মৌচাক ও মৌচাকের অভ্যন্তরভাগ।

এরপর কর্মী মৌমাছিরা পাখনার ঝাপটায় তাতে ক্রমাগত বাতাস দিতে থাকে। ফলে বাষ্পীভবন পদ্ধতিতে জল উবে যায়। আর্দ্রবিশ্লেষিত ও তৎপরে জলশূন্য ঘন নেকটারই মধু। মধু তৈরী হবার পর মৌমাছিরা প্রতিটি কোষের মুখ মোমের আবরণ দিয়ে বন্ধ করে দেয়।

● মৌচাষ (Apiculture) ঃ আমাদের দেশে বনে-জঙ্গলে, বাড়ীর কড়ি-বরগার ফাঁকে মৌমাছিরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে মৌচাক তৈরী করে। সুন্দরবনের জঙ্গলে প্রচুর মৌচাক তৈরী হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাক ভেঙে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মধু সংগ্রহের ফলে মধুর বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়। কারণ চাক নিংড়ে মধু নিষ্কাশনের সময় শূককীটের দেহ-নিঃসৃত রস, মৌমাছির মল, ডিম এবং মোম প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণ ঘটে। এইভাবে মধু নিষ্কাশনের ফলে চাকের রাণী মৌমাছিটিরও মৃত্যু হয় এবং পরবর্তীকালে চাক তৈরীর সম্ভাবনা সমূলে বিনষ্ট হয়। সেজন্য কৃত্রিম উপায়ে মৌমাছি পালন সুচিন্তিত এক বৈজ্ঞানিক পন্থা।

● কৃত্রিম উপায়ে মৌমাছি পালন (Artificial bee-keeping) ঃ গ্রামে-গঞ্জে কৃত্রিম উপায়ে মৌমাছি পালন পদ্ধতি আজ অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই পদ্ধতি অনুসরণে বিশুদ্ধ মধু উৎপাদন সম্ভব। কৃত্রিম উপায়ে মৌচাষের জন্য সর্বাগ্রে বিশেষভাবে নির্মিত একটি কাঠের বাক্স বা ব্রুড কুঠরি* (Brood chamber)-র

* ল্যাঙস্ট্রথ (Langstroth) নামক এক ধর্মযাজক এই কুঠরির উদ্ভাবক।

গাছটির একটি পাতার দু' পিঠ সমান মাপের কাল কাগজে ঢেকে কাগজ দুটি জেমস ক্লিপ দিয়ে আটকে দেওয়া হল। এরপর টবটিকে সারাদিন সূর্যালোকে রেখে সালোকসংশ্লেষ চলতে দেওয়া হল। সন্ধ্যার পর পাতাটি ছিঁড়ে কাগজ ও ক্লিপ সরিয়ে ফুটন্ত জলে বা ওয়াটার বাথে রাখা ফুটন্ত অ্যালকোহলে কিছুক্ষণ রাখলে পাতাটি ক্লোরোফিল মুক্ত হয় এবং সাদা দেখায়। এবার জল বা অ্যালকোহল থেকে উঠিয়ে পাতাটিকে 1% লঘু আয়োডিন দ্রবণে ডোবান হল।

● **নিরীক্ষা** (Observation) : আয়োডিন দ্রবণ থেকে পাতাটিকে তুলে আনতে দেখা গেল, কাল কাগজে ঢাকা অংশ বাদে পাতার বাকি অংশ নীলবর্ণ ধারণ করেছে।

● **সিদ্ধান্ত** (Inference) : আয়োডিনের ছোঁয়ায় কেবল শ্বেতসারই নীল হয়—সুতরাং যে অংশ নীল হয়েছে, সেখানে নিঃসন্দেহে সালোকসংশ্লেষ চলেছে এবং শ্বেতসার উৎপন্ন হয়েছে। ঢাকা অংশ সূর্যালোক না পাওয়ায় সেখানে শ্বেতসার উৎপন্ন হয়নি। সেজন্য আয়োডিনের ছোঁয়ায় ঐ অংশ নীলবর্ণ ধারণ করেনি। সুতরাং সিদ্ধান্ত হল :

(i) **আলো ছাড়া সালোকসংশ্লেষ হয় না।**
(ii) **সালোকসংশ্লেষের সময় আলো প্রয়োজন।**

● **সাবধানতা** (Precaution) : (4 নং পরীক্ষার মতো)।

● **সালোকসংশ্লেষে আলো অপরিহার্য** (Light is essential during photosynthesis) :

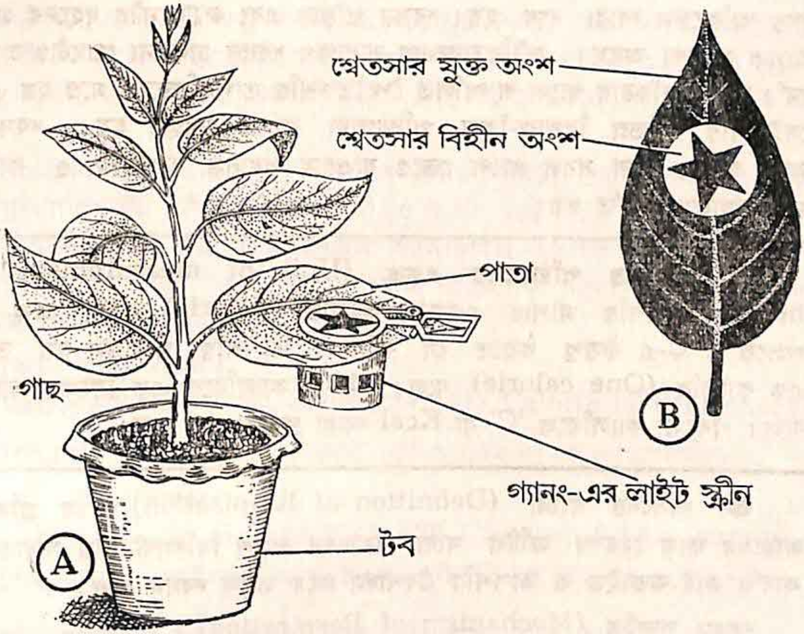
● **উপকরণ** (Requisites) :

(i) টবে লাগানো একটি সতেজ গাছ,
(ii) গ্যানং-এর লাইট স্ক্রিন (গ্যানং-এর আলোক পর্দা),
(iii) একটি বিকার,
(iv) একটি পেট্রিডিস,
(v) কিছুটা 50% ইথাইল অ্যালকোহল,
(vi) কিছুটা 1% লঘু আয়োডিন দ্রবণ,
(vii) জল,
(viii) একটি ত্রিপদ স্ট্যান্ড ও
(ix) ওয়াটার বাথ (Water bath)।

● **পরীক্ষা পদ্ধতি** (Procedure) : টবসহ গাছটিকে 3-4 দিন অন্ধকার ঘরে রেখে তাকে শ্বেতসার মুক্ত করা হ'ল। গাছটির একটি পাতায় গ্যানং-এর লাইট স্ক্রিন যুক্ত করা হ'ল। গ্যানং-এর লাইট স্ক্রিনটি একটি টিনের কৌটো বিশেষ। এর গোলাকার গাত্র ছিদ্রযুক্ত। কৌটোর ঢাকনাটি তারকাকার (Star-shaped) ছিদ্রযুক্ত। ঢাকনাটি একটি স্প্রিং দ্বারা কৌটোর সঙ্গে যুক্ত।

লাইট স্ক্রিনযুক্ত পরীক্ষাপাত্র সহ গাছটিকে এবার 6-7 ঘণ্টা সূর্যালোকে রাখা হ'ল। ঐ সময়ের পর লাইট স্ক্রিনটি খুলে সংশ্লিষ্ট পাতাটিকে গাছ থেকে

ছিঁড়ে নেওয়া হ'ল। এবার পাতাটিকে ওয়াটার বাথে রাখা ফুটন্ত অ্যালকোহলে কয়েক মিনিট রেখে তাকে ক্লোরোফিলমুক্ত করা হ'ল। এবার পাতাটিকে ভালভাবে জলে ধুয়ে লঘু আয়োডিন দ্রবণে ডোবানো হ'ল।



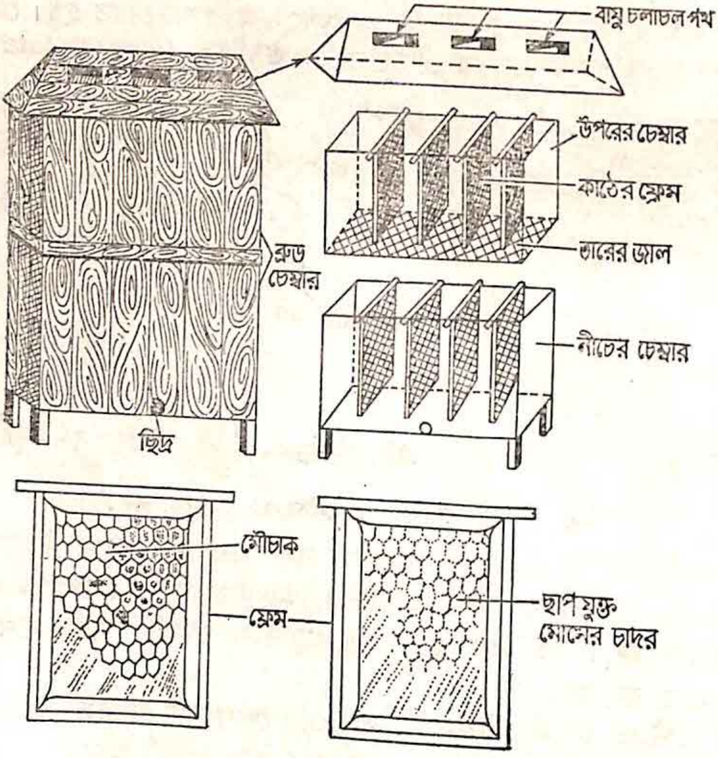
চিত্র 12·28—গ্যানং-এর লাইট স্ক্রিনের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষে আলোর অপরিহার্যতার পরীক্ষা।

● **নিরীক্ষা** (Observation) ঃ আয়োডিন দ্রবণ থেকে পাতাটিকে তুলে আনতে দেখা গেল পাতার যে অংশ সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসেনি সেই অংশ ছাড়া পাতার বাকি অংশ নীলবর্ণ ধারণ করেছে।

● **সিদ্ধান্ত** (Inference) ঃ পরীক্ষার পূর্বে গাছটিকে অন্ধকার ঘরে রাখার ফলে গাছের পাতা শ্বেতসারমুক্ত ছিল। পরীক্ষার পরে দেখা গেল পাতাটির যে অংশ সূর্যালোক পেয়েছে সেই অংশেই কেবল নীলবর্ণ হ'য়েছে, অর্থাৎ সেখানে শ্বেতসার উৎপন্ন হয়েছে—বাকি অংশে শ্বেতসার উৎপন্ন হয়নি। সুতরাং উপরোক্ত পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত হ'ল **সালোকসংশ্লেষে আলোক অপরিহার্য**।

● **সাবধানতা** (Precaution) ঃ গাছটিকে সম্পূর্ণভাবে শ্বেতসার মুক্ত করতে হবে নইলে পরীক্ষা বিফলে যাবে। অ্যালকোহল ফোটাতে **ওয়াটার বাথ** (Water bath) ব্যবহার করা ভাল। আয়োডিনে ডোবাবার আগে বর্ণহীন পাতাটিকে ভালভাবে জলে ধুয়ে নিতে হবে।

প্রয়োজন হয় (চিত্র 19·13)। বাক্সটি দেখতে কুঁড়ে ঘরের মতো। এই বাক্সটির উপরের ঢাকনা বন্ধ থাকে। এর নীচের দিকে এক পাশে মৌমাছির যাতায়াতের পথ আছে। বাক্সটির মধ্যে প্রথমে একটি রাণী, কতকগুলি পুরুষ এবং কয়েকশ কর্মী মৌমাছির থাকার ব্যবস্থা রাখা হয়। শ্রমিক মৌমাছিগুলি প্রতিদিন বাক্স

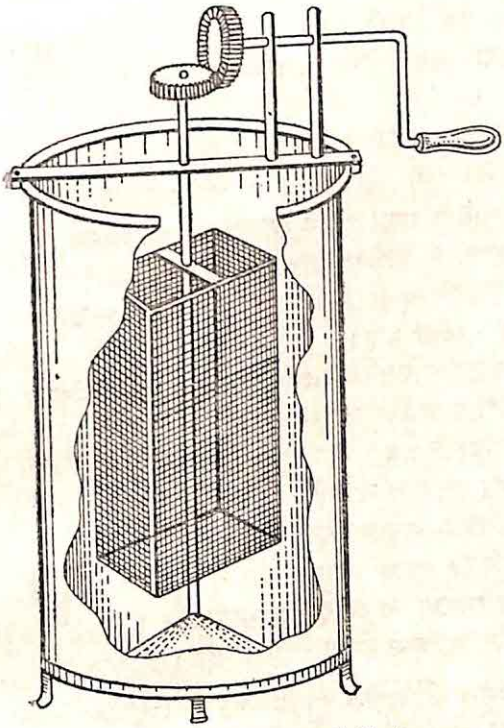


চিত্র 19·13—কৃত্রিম উপায়ে মৌচাষের বাক্স ও তার বিভিন্ন অংশ।

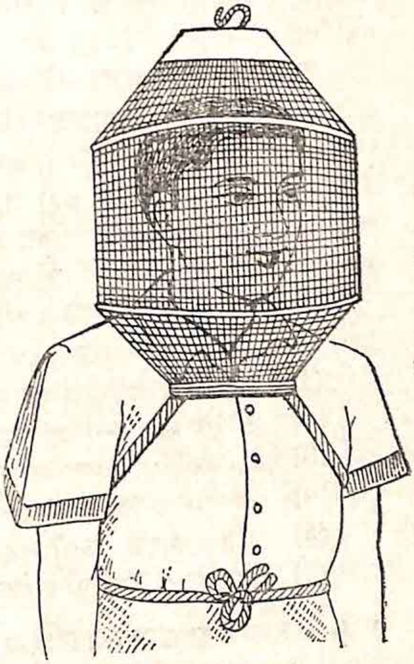
থেকে বেরিয়ে এসে নিকটবর্তী সরিষা, আম, বেল, লেবু ইত্যাদি ফুলের নেকটার সংগ্রহ ক'রে পুনরায় মৌচাকে ফিরে আসে। সেখানে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নেকটার মধুতে রূপান্তরিত হয়। নেকটার সংগ্রহকালে বহিরাগত বহু মৌমাছি এদের দলে ভিড়ে যায়।

● **মধু সংগ্রহ** (Honey collection) : চাক বড় হ'লে ঢাকনা সরিয়ে মৌমাছিদের নষ্ট না করে আস্ত ফ্রেমটি উঠিয়ে আনা হয়। সেখান থেকে চাকটি কেটে নিয়ে পুনরায় ফ্রেমটিকে স্বস্থানে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মধু নিষ্কাশনের জন্য আজকাল ফ্লেচার (Fletcher) ও হেরোড-হ্যাম্পসল (Herrod-Hempsall) নামক দুটি ভিন্ন মডেলের মধু নিষ্কাশক সেণ্ট্রিফিউজ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। মধু নিষ্কাশনের পর ফ্রেমসহ চাকটি বাক্সের মধ্যে স্থাপন করা হয়।

বাক্সের চাক থেকে মধু নিষ্কাশনের জন্য জালের মুখোস, একটি মৌমাছি জাল, একজোড়া গ্লাভস, ছুরি ও একটি সেণ্ট্রিফিউজ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।



চিত্র 19·14—মধু নিষ্কাশক সেণ্ট্রিফিউজ যন্ত্র।



চিত্র 19·15—মধুসংগ্রহকারীর জালের মুখোস।

● **মধুর রাসায়নিক গঠন** (Chemical composition of honey) : মধু অত্যন্ত সুগন্ধি—ঘন তরল পদার্থ। এতে জলের পরিমাণ 17-18% এবং লেভুলোজ, ডেক্সট্রোজ জাতীয় শর্করার পরিমাণ 78%। এছাড়া মধুতে Fe, Cu, Mn, Cl, Ca, K, Na, P, S, Al, Mg; Si প্রভৃতি খনিজ পদার্থ বর্তমান। মধুতে অ্যাসেটিক অ্যাসিড, ফর্মিক অ্যাসিড ও ম্যালিক অ্যাসিড বর্তমান। মধুতে ভাইটামিন A, B ও C; ইনভারটেজ, ডায়াসটেজ প্রভৃতি উৎসেচক এবং ক্যারোটিন জ্যান্থোফিল নামক রঙ্গক বর্তমান।

● **মৌ-মোমের রাসায়নিক গঠন** (Chemical composition of bee-wax) : সাধারণত পামিটিক অ্যাসিড ও মাইরিসিল কোহল দ্বারা মৌ-মোম গঠিত। মৌ-মোম জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু জাইলল, ইথার, ক্লোরোফর্ম প্রভৃতিতে দ্রবণীয়। মৌ-মোমের গলনাঙ্ক 60°-65°C।

● **মধুর ব্যবহার** (Use of honey) :

(1) রক্তের হিমোগ্লোবিন গঠনে মধুর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

12.29. শ্বসন [Respiration] :

শ্বসন (Respiration) শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ 'respiare' থেকে। ফরাসী বিজ্ঞানী **ল্যাভয়সিয়ার** (Lavoisier) 1780 খ্রীষ্টাব্দে বলেন খাদ্য-বস্তু অক্সিজেন দ্বারা দগ্ধ হয়। শ্বসন প্রক্রিয়া এবং জ্বালানীর দহনের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। জীবিতাবস্থায় সারাক্ষণ শ্বসন চালানো প্রোটোপ্লাজমের ধর্ম। শ্বসন প্রক্রিয়ায় খাদ্যে শৃঙ্খলিত স্থৈতিকশক্তি তাপশক্তিরূপে মুক্ত হয় এবং সেই শক্তি বিভিন্ন বিপাক-ক্রিয়া পরিচালনা করতে ব্যবহৃত হয়। শ্বসনের সময় জটিল খাদ্য সরল খাদ্যে ভেঙে যাওয়ায় প্রধানত তাপশক্তি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়।

● **তাপশক্তি পরিমাপের একক** (Unit of measurement of heat) : তাপশক্তি মাপার একককে **ক্যালরি** (Calorie) বলে। এক গ্রাম জলকে 1°C-এ উত্তপ্ত করতে যে পরিমাণ তাপশক্তি প্রয়োজন হয় তাকে এক ক্যালরি (One calorie) বলে। 1000 ক্যালরিকে এক কিলো ক্যালরি বলে। কিলো ক্যালরিকে 'C' বা Kcal দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

● **শ্বসনের সংজ্ঞা** (Definition of Respiration) : **যে প্রক্রিয়ায় জারণের ফলে দেহস্থ জটিল খাদ্য সরলতম অংশে বিশ্লিষ্ট হয়ে সাধারণতঃ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও তাপশক্তি উৎপাদন করে তাকে শ্বসন বলে।**

শ্বসন পদ্ধতি (Mechanism of Respiration) :

স্থলজ উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে এবং জলজ উদ্ভিদ জল থেকে জলে দ্রব অক্সিজেন শোষণ করে। প্রাণীর মত উদ্ভিদের নির্দিষ্ট কোন শ্বাসতন্ত্র নাই। পত্ররন্ধ্র ও কোষান্তর রন্ধ্রগুলির মাধ্যমে বায়বীয় পদার্থের আদান-প্রদান ঘটে। প্রধানত বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে যে শ্বসন চলে তাকে **সবাত শ্বসন** (Aerobic respiration) এবং বাতাসের অক্সিজেন ছাড়াই যে শ্বসন চলে তাকে **অবাত শ্বসন** (Anaerobic respiration) বলে। শ্বসন দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়।

● **প্রথম পর্যায়** (First phase) : শ্বসনের প্রথম পর্যায় **গ্লাই-কোলিসিস** (Glycolysis)। এই পর্যায়ে নানান জটিল ধারাবাহিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট **পাইরুভিক অ্যাসিড** (Pyruvic acid) উৎপন্ন করে। অক্সিজেন ছাড়াই এই পর্যায় চলে ; সুতরাং **সবাত** বা **অবাত শ্বসন উভয় ক্ষেত্রেই গ্লাইকোলিসিস সাধারণ পর্যায়।**

● **দ্বিতীয় পর্যায়** (Second phase) : এই পর্যায় দুভাবে সম্পন্ন হয়। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সবাত শ্বসন এবং অনুপস্থিতিতে অবাত শ্বসন চলে। **সবাত শ্বসনে পাইরুভিক অ্যাসিড** জারিত হয়ে **ক্রেবস্ চক্র**

(Krebs' cycle) বা **ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড** (TCA) **চক্র মাধ্যমে বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড উৎপন্ন করে।** এই সময় প্রতিটি পাইরুভিক অ্যাসিডের অণু থেকে 3 অণু জল ও 3 অণু কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। একটি গ্লুকোজ অণু ভেঙে দুটি পাইরুভিক অণু উৎপন্ন হয় বলে মোট 6 অণু জল ও 6 অণু কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। সেই সঙ্গে প্রচুর তাপশক্তি নির্গত হয়।

বাতাসের মুক্ত অক্সিজেনের অভাবে **অবাত শ্বসনে** পাইরুভিক অ্যাসিড **অ্যাসিট্যালডিহাইড** (Acetaldehyde) ও কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপাদন করে। পরে অ্যাসিট্যালডিহাইড থেকে **ইথাইল অ্যালকোহল** (Ethyl alcohol) ও অল্পমাত্রায় তাপশক্তি নির্গত হয়। শ্বসন প্রক্রিয়াকে নিম্নলিখিত সমীকরণ মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়ঃ

(ক) **সবাত শ্বসন ঃ**

$C_6H_{12}O_6+6O_2 \rightarrow 6CO_2+6H_2O+673$ Calorie of heat energy

(গ্লুকোজ)+(অক্সিজেন)→(কার্বন ডাই-অক্সাইড)+(জল)+(তাপশক্তি)

(খ) **অবাত শ্বসন ঃ**

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH+2CO_2+28$ Calorie of heat energy

(গ্লুকোজ) →(ইথাইল অ্যালকোহল)+(কার্বন ডাই-অক্সাইড)+(তাপশক্তি)

12.30. সবাত শ্বসন ও অবাত শ্বসনের সম্বন্ধ [*Relation between Aerobic and Anaerobic Respiration*] :

প্রথম অবস্থায় সবাত শ্বসন ও অবাত শ্বসনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম পর্যায় **গ্লাইকোলিসিস**। এই পর্যায়ে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অক্সিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি পরবর্তী পর্যায়কে নিয়ন্ত্রণ করে। অক্সিজেন পেলে সবাত শ্বসন এবং অক্সিজেন না পেলে অবাত শ্বসন চলে।

● **গ্লাইকোলিসিসের সংজ্ঞা** (Definition of Glycolysis) **ঃ যে শ্বসন বিক্রিয়ায় বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে গ্লুকোজ আংশিকভাবে জারিত হ'য়ে পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তাকে গ্লাইকোলিসিস বলে।**

এম্বডেন (Embden), **মেয়ারহফ** (Mayerhof) ও **পার্নেস** (Parnes) শ্বসনে গ্লাইকোলিসিস পর্যায়টির উদ্ভাবক। এই তিন বিজ্ঞানীর নামের আদ্যক্ষর অনুসারে গ্লাইকোলিসিস পর্যায়কে EMP পথ বলা হয়।

● **ক্রেবস চক্রের সংজ্ঞা** (Definition of Krebs' cycle) **ঃ যে শ্বসন বিক্রিয়ায় পাইরুভিক অ্যাসিড জারিত হ'য়ে বিভিন্ন প্রকার অ্যাসিড ও** ATP **(অ্যাডিনোসিন ট্রাইফাসফেট) নামক শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে আবিষ্কর্তা ক্রেবের নামানুসারে ক্রেবস চক্র বলা হয়।**

(2) দুধ বা অন্য পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে মধু টনিকের কাজ করে।

(3) সর্দি, কাশি, কোষ্ঠবদ্ধতা, হৃৎপিণ্ডের অসুখ, স্নায়ুদৌর্বল্য, অপুষ্টি প্রভৃতি রোগে মধু অত্যন্ত ফলপ্রদ।

(4) প্রাশ্চাত্য দেশে মধু থেকে মদ তৈরী হয়।

(5) আয়ুর্বেদিক ঔষধ প্রস্তুতে এবং ঔষধ সেবনকালে মধুর ব্যবহার সর্বাধিক।

● **মধুর খাদ্যমূল্য** (Food-value of honey) ঃ মানুষ নানাভাবে মধু ব্যবহার করে। মধুমেহ (Diabetes) রোগীর এবং পরিশ্রমী মানুষের পক্ষে মধু একটি আদর্শ খাদ্য। এক পাউন্ড মধুতে 6.5 লেভুলোজ বা ফলশর্করা, 5.5 আউন্স ডেক্সট্রোজ, 9 গ্রাম সুক্রোজ, 3 আউন্স জল, 7 গ্রাম ডেক্সট্রাইন, 1 গ্রাম লোহা, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি এবং 4% অজ্ঞাত পদার্থ বর্তমান। এক গ্রাম মধু থেকে 3.2 Kcal শক্তি পাওয়া যায়।

● **মোম** (Bee-wax) ঃ শ্রমিক মৌমাছির মোম-গ্রন্থি নিঃসৃত রস শুকিয়ে মোম তৈরী হয়। মোম নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা—

(1) মোমবাতি প্রস্তুতে মোম ব্যবহৃত হয় ;
(2) বাটিক ছাপার কাজে মোমের ব্যবহার যথেষ্ট ;
(3) ডিসেকটিং ট্রে তৈরীর জন্য মোম ব্যবহৃত হয় ;
(4) প্রসাধন ও অঙ্গরাগ প্রস্তুতিতে মোম ব্যবহৃত হয় ;
(5) কঠিন কাগজ তৈরী করতে মোমের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ;
(6) বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজেও মোম ব্যবহৃত হয়।

19.4. মশা ও মৌমাছির শূককীটের পার্থক্য [*Differences between the Larvae of Mosquito and Honey bee*] :

মশার শূককীট	মৌমাছির শূককীট
(1) দেহের অগ্রভাগ স্থূল এবং পশ্চাৎভাগ সরু।	(1) উভয় দিকই সরু।
(2) বক্ষ সর্বাপেক্ষা চওড়া অংশ।	(2) বক্ষ বা উদর কোনটাই উল্লেখ-যোগ ভাবে চওড়া নয়।
(3) মস্তকে জোড়া পুঞ্জাক্ষি, শুঙ্গ, চোয়াল এবং ভোজনবুরুশ আছে।	(3) এই ধরনের কোন অংগ নাই।
(4) উদরখণ্ডগুলির প্রত্যেকটিতে একগুচ্ছ করে সংবেদী কূর্চ থাকে।	(4) কূর্চ থাকে না।
(5) শ্বাসনালী-ফুলকা থাকে।	(5) শ্বাসনালী-ফুলকা থাকে না।
(6) এই দশা 8-10 দিন স্থায়ী হয়।	(6) এই দশা 6 দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।
(7) প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হয় না।	(7) পরিণত হলে মৌচাকের প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হয়।

কয়েকটি প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নাম

(Scientific names of some animals)

নাম — বিজ্ঞানসম্মত নাম — উচ্চারণ

অ্যামিবা—*Amoeba proteus*
অ্যামিবা প্রোটিয়স

মনোসিস্‌টিস—*Monocystis pheretimi*
মনোসিস্‌টিস ফেরিটিমি

প্যারামেসিয়ম—*Paramoecium caudatum*
প্যারামেসিয়ম কডেটম

স্পঞ্জ—*Sycon gelatinosum*
সাইকন জিলেটিনোসম

হাইড্রা—*Hydra vulgaris*
হাইড্রা ভালগারিস

প্ল্যানেরিয়া—*Planeria sp.*
প্ল্যানেরিয়া স্পিসিজ

যকৃৎ-কৃমি—*Fasciola hepatica*
ফ্যাসসিওলা হিপাটিকা

ফিতা-কৃমি—*Taenia solium*
টিনিয়া সোলিয়ম

গোল-কৃমি—*Ascaris lumbicroides*
অ্যাসকারিস লাম্বিক্রয়ডিস

গোদা-কৃমি—*Wuchereria bancrofti*
উচেরেরিয়া ব্যাংকরফটি

হুক-ওয়ার্ম—*Ancylostoma duodenale*
অ্যানসাইক্লোস্টোমা ডুওডিনালী

কেঁচো—*Pheretima posthuma*
ফেরিটিমা পোস্থুমা

জোঁক—*Hirudinaria granulosa*
হিরুডিনারিয়া গ্রানুলোসা

গলদা চিংড়ি—*Macrobrachium rosenbergii*
ম্যাক্রোব্রাকিয়ম রোজেনবারগাই

নাম — বিজ্ঞানসম্মত নাম — উচ্চারণ

কাঁকড়া—*Scylla serrata*
স্কাইলা সেরাটা

তেঁতুলে বিছা—*Scolopendra amazonica*
স্কোলোপেণ্ড্রা অ্যামাজোনিকা

কেন্নো—*Thyropygus sp.*
থাইরোপাইগাস স্পিসিজ

আরশোলা—*Periplaneta americana*
পেরিপ্ল্যানেটা আমেরিকানা

ঘাস-ফড়িং—*Poecillocerus sp.*
পোসিলোসেরস স্পিসিজ

মৌমাছি—*Apis mellifica*
A. dorsata ; *A. florea* ; *A. indica*
এপিস মেলিফিকা, এ· ডরসাটা, এ· ফ্লোরিয়া, এ· ইন্ডিকা

মাছি—*Musca domestica*
মুসকা ডোমেস্টিকা

ছারপোকা—*Cimex lectularius*
সিমেক্স লেকটুলারিয়স

উকুন—*Pediculus humanus copitis*
পেডিকুলস হিউমেনস কোপিটিস

প্রজাপতি—*Melanitis ismene*
মেলানিটিস ইসমেনী

লাল পিঁপড়া—*Oecephyla smaragdyna*
ইসিফাইলা স্মারাগডিনা

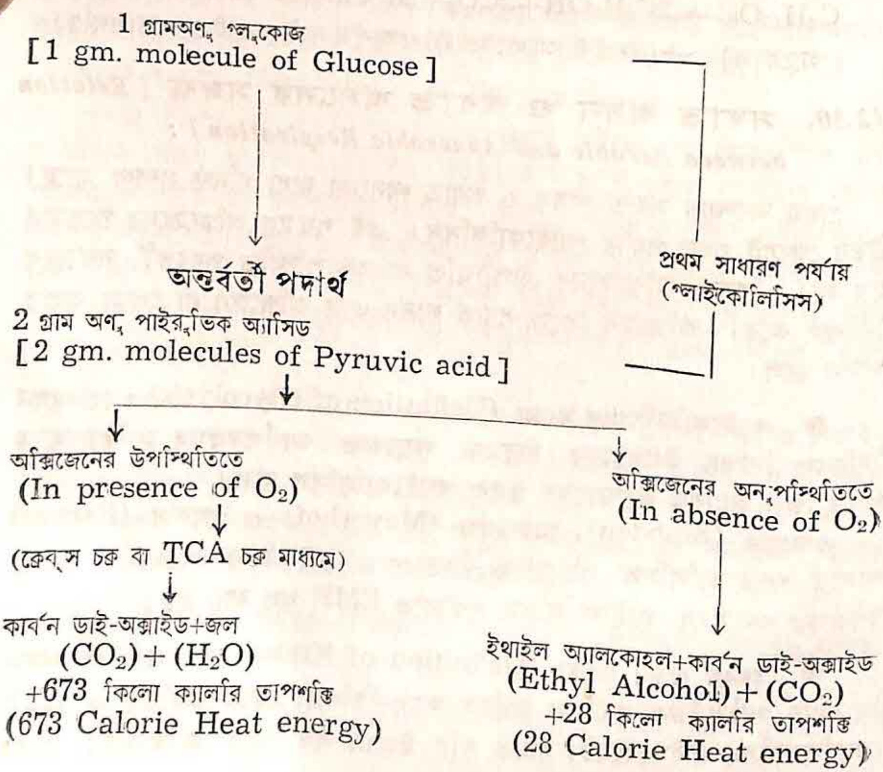
কালো পিঁপড়া—*Camponotus compressus*
ক্যাম্পোনোটস কমপ্রেসস

মাকড়সা—*Heteropoda venatoria*
হেটারোপডা ভেনাটোরিয়া

● **ক্রেবস চক্রকে ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড চক্র বা সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র বলা হয় কেন?** (Why is Krebs' cycle called Tricarboxylic acid cycle (TCA cycle) or Citric acid cycle ?) ঃ গ্লাইকোলিসিসের পরের বিক্রিয়া পাইরুভিক অ্যাসিড জারণ। এটি নানাপ্রকার উৎসেচকের সাহায্যে চক্রাকারে অনুষ্ঠিত হয় এবং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন অ্যাসিড উৎপন্ন করে। চক্রটির উদ্ভাবকের নামানুসারে চক্রটি ক্রেবস চক্র নামে পরিচিত।

ক্রেবস চক্রে সর্বপ্রথম উৎপন্ন অ্যাসিডটির নাম **সাইট্রিক অ্যাসিড** (Citric acid)। সেজন্য চক্রটি সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র নামেও পরিচিত। সাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে তিনটি কার্বক্সিল বর্গ আছে বলে চক্রটির অপর নাম **ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড চক্র।**

নীচের ছকটি থেকে সবাত শ্বসন ও অবাত শ্বসনের সম্বন্ধ বোঝা যাবে ঃ



12.31. সবাত শ্বসন ও অবাত শ্বসনের পার্থক্য *[Differences between Aerobic and anaerobic respiration]* :

সবাত শ্বসন (Aerobic respiration)	অবাত শ্বসন (Anaerobic respiration)
(1) অক্সিজেন ছাড়া সবাত শ্বসন হয় না।	(1) অক্সিজেন ছাড়াই অবাত শ্বসন হয়।
(2) কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন হয়।	(2) কার্বন ডাই-অক্সাইড ও ইথাইল অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়।
(3) ক্রেব্‌স চক্রের মাধ্যমে পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে নানাপ্রকার অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।	(3) ক্রেব্‌স চক্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় না—তাই বিভিন্ন অ্যাসিড উৎপাদনের প্রশ্ন ওঠে না।
(4) সম্পূর্ণ জারণের ফলে প্রতি গ্রাম অণু গ্লুকোজ থেকে 673 কিলো ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয়।	(4) অসম্পূর্ণ জারণের ফলে প্রতি গ্রাম অণু গ্লুকোজ থেকে 25-28 কিলো ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয়।
(5) গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়ার উল্টো পথে বহু পদার্থ পুনর্গঠিত হয়।	(5) কোন পদার্থই ঐ পথে পুনর্গঠিত হয় না।
(6) রাসায়নিক সমীকরণ— $C_6H_{12}O_6+6O_2 \rightarrow 6CO_2 +6H_2O+673$ Kcal	(6) রাসায়নিক সমীকরণ— $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH +2CO_2+25-28$ Kcal

12.32. শ্বসন ও দহনের পার্থক্য *[Differences between Respiration and Combustion]* :

শ্বসন (Respiration)	দহন (Combustion)
(1) শ্বসন জীবদেহে চলে।	(1) মৃত জীবদেহে ও জড়বস্তুতে দহন চলে।
(2) শ্বসন একটি নিয়ন্ত্রিত জারণ প্রক্রিয়া।	(2) দহন একটি অনিয়ন্ত্রিত জারণ প্রক্রিয়া।
(3) শ্বসনের সময় খাদ্যমধ্যস্থ স্থৈতিকশক্তি ধীরে ও পর্যায়ক্রমে মুক্ত হয়।	(3) দহনের ফলে অল্প সময়ে খাদ্য-বস্তু দ্রুত বিনষ্ট হয় এবং দ্রুত শক্তি উৎপন্ন হয়।
(4) তাপশক্তি উৎপন্ন হয়—আলোক শক্তি নয়।	(4) তাপশক্তি ও আলোক শক্তি উভয়ই উৎপন্ন হয়।
(5) অক্সিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে শ্বসন চলে।	(5) অক্সিজেন ছাড়া দহন সম্ভব নয়।

নাম	বিজ্ঞানসম্মত নাম	উচ্চারণ

পুকুরের দুখোল ঝিনুক—*Lamellidens marginalis*
ল্যামেলিডেন্স মারজিনালিস
আপেল শামুক—*Pila globosa*
পাইলা গ্লোবোসা
লম্বা স্থল শামুক—*Achatina fulica*
অ্যাকাটিনা ফুলিকা
তারামাছ—*Asterias sp.* *Astropecten sp.*
অ্যাসটেরিয়স/অ্যাসট্রোপেকটেন স্পিসিজ
হাঙর—*Scoliodon sarrakowah*
স্কোলিওডন সারাকোয়া
রুই—*Labeo rohita*
লেবিও রোহিটা
কাতলা—*Catla catla*
কাতলা কাতলা
মৃগেল—*Cirrhina mrigala*
সিরিনা ম্রিগালা
ইলিশ—*Hilsa ilisha*
হিলসা ইলিসা
ভেটকি—*Lates calcarifer*
ল্যাটিস ক্যাল্কেরিফার
কালবোস—*Labeo calbaus*
লেবিও কালবাউস
পুঁটি—*Barbus swarna*
বারবস স্বর্ণ
কৈ—*Anabus testudineus*
অ্যানাবস টেসটুডিনিয়স
মাগুর—*Clarias batrachus*
ক্লেরিয়াস ব্যাট্রাকস
সিঙ্গি—*Heteropneustes fossilis*
হেটিরপনিউসটেস ফসিলিস
ল্যাটা—*Channa punctatus*
ছানা পাংটেটস

নাম	বিজ্ঞানসম্মত নাম	উচ্চারণ

মশা—*Anopheles sp.* *Culex sp. and Stegomia sp.*
অ্যানোফিলিস/কিউলেক্স/স্টেগোমিয়া স্পিসিজ
সিলভার ফিস (রুপোমাছ)—*Lepisma saccharina*
লেপিসমা সাকারিনা
ঝিঁঝিপোকা—*Acheta domesticus*
আকেটা ডোমেসটিকস
কাঠি পোকা—*Diapheromera femorata*
ডায়াফেরোমেরা ফিমোরাটা
উই পোকা—*Odontotermas redemani*
ওডন্টোটারমাস রেডিমানি
ফড়িং—*Macromia sp.*
ম্যাক্রোমিয়া স্পিসিজ
কুমীর—*Crocodilus porosus*
ক্রোকোডাইলস পোরোসস
কচ্ছপ—*Chelone sp.*
চিলোন স্পিসিজ
পায়রা—*Columba livia demestica*
কলম্বো লিভিয়া ডোমেস্টিকা
উটপাখী—*Struthio sp.*
স্ট্রুথিও স্পিসিজ
চিল—*Milvus migrans*
মিলভস মাইগ্রানস
শালিক—*Acridotheres tristis*
অ্যাক্রিডোথেরেস ট্রিসটিস
পাতি কাক—*Corvus splendens*
করভস স্পেলডেন্স
দাঁড় কাক—*Corvus macrorhynchos*
করভস ম্যাক্রোরিংকস
চড়ুই—*Passer domesticus*
প্যাসার ডোমেসটিকস

নাম বিজ্ঞানসম্মত নাম উচ্চারণ

টুনটুনি—*Orthotomus sutorius*
অরথোটোমস সুটোরিয়স
ইমিউ—*Dromaeus sp.*
ড্রমিয়স স্পিসিজ
গিনিপিগ—*Cavia porcellus*
কেভিয়া পোরসেলস
খরগোস—*Oryctolagus cuniculus*
অরিকটোলাগস কিউনিকিউলস
ইঁদুর—*Rattus rattus*
র‍্যাটস র‍্যাটস
ছুঁচো—*Suncus murinus*
সুনকস মিউরিনস
বাদুড়—*Pteropus marginatus*
টেরোপস মারজিনেটস
চামচিকে—*Pipistrellus mimus*
পিপিসটেলস মাইমস
সোনা ব্যাঙ—*Rana tigrina*
রানা টাইগ্রিনা
কোলা ব্যাঙ—*Bufo melanostictus*
বিউফো মেলানোস্টিকটস
গোখরো সাপ—*Naja naja*
নাজা নাজা
কোবরা সাপ—*Naja tripudians*
নাজা ট্রাইপুডিয়ান্স
চন্দ্রবোড়া—*Vipera russellii*
ভাইপেরা রুসেল্লাই
টিকটিকি—*Hemidectylus fluviviridis*
হেমিডেকটাইলস ফ্লুভিভিরিডিস
গিরগিটি—*Calotes versicolor*
ক্যালোটিস ভারসিকলর
কাঠবিড়ালী—*Funambulus pennanti*
ফুনামবুলস পিনানটি

নাম বিজ্ঞানসম্মত নাম উচ্চারণ

জিরাফ—*Giraffe camelopardanis*
জিরাফি ক্যামেলোপারডানিস
ক্যাঙারু—*Macropus sp.*
ম্যাক্রোপস স্পিসিজ
নেকড়ে—*Canis lupus*
কেনিস লুপস
শিয়াল—*Canis aurens*
কেনিস অরেন্স
কুকুর—*Canis familiaris*
কেনিস ফ্যামিলিয়ারিস
খ্যাঁকশিয়াল—*Vulpes sp.*
ভালপেস স্পিসিজ
সিংহ—*Felis leo*
ফেলিস লিও
বাঘ—*Felis tigris*
ফেলিস টাইগ্রিস
হায়না—*Hyaena cabalbus sp.*
হায়েনা ক্যাবালবাস স্পিসিজ
ঘোড়া—*Equus sp.*
ইকুয়াস স্পিসিজ
হাতি—*Elephas indicus*
এলিফাস ইন্ডিকস
তিমি—*Megaptera sp.*
মেগাপটেরা স্পিসিজ
হনুমান—*Presbytis entellus*
প্রেসবাইটিস এনটেলস
বানর—*Macaca mulatta*
ম্যাকাকা মিউলাটা
ওরাং ওটাং—*Pongo sp.*
পংগো স্পিসিজ
সিম্পাঞ্জি—*Pan sp.*
পান স্পিসিজ
গরিলা—*Gorilla sp.*
গোরিলা স্পিসিজ
মানুষ—*Homo sapiens*
হোমো সেপিএন্স

শ্বসন (Respiration)	দহন (Combustion)
(6) শ্বসনে উৎসেচকের সাহায্য চাই।	(6) উৎসেচকের দরকার হয় না।
(7) তাপ বৃদ্ধিতে উৎসেচক নষ্ট হয় এবং শ্বসন বন্ধ হয়।	(7) তাপ বৃদ্ধিতে দহন দ্রুততর হয়।
(8) খাদ্যের স্থৈতিক শক্তি অংশত তাপশক্তিরূপে নির্গত হয় এবং অংশত ATP নামক উচ্চশক্তি-ধারক ফসফেটযৌগে আবদ্ধ হয়। ATP শক্তি জীবের বিভিন্ন জৈবনিক কাজে ব্যবহৃত হয়।	(8) দাহ্যবস্তুর স্থৈতিক শক্তি অংশত আলোকশক্তি এবং বাকি অংশ তাপশক্তিরূপে নির্গত হয়।

12.33. সবাত শ্বসনের পরীক্ষা [*Experiment on Aerobic respiration*] :

● **প্রয়োজনীয় সামগ্রী (Requisites) ঃ**

(i) একটি রেসপিরোস্কোপ,
(ii) একটি বিকার,
(iii) কিছুটা পারদ,
(iv) একটি কস্টিক পটাশ দণ্ড,
(v) কিছু দলাংশ বা অংকুরিত ছোলা বীজ*,
(vi) একটি ক্ল্যাম্পসহ স্ট্যান্ড ও
(vii) লাল পেন্সিল।

● **পদ্ধতি (Procedure) ঃ** দলাংশ বা ছোলাবীজগুলি রেসপিরোস্কোপের বালবের মধ্যে রাখা হল। বিকারে পারদ ভরে তার মধ্যে রেসপিরোস্কোপের লম্বা কাচনলটি ডুবিয়ে স্ট্যান্ডের সঙ্গে ক্ল্যাম্প করা হল। এক টুকরো কস্টিক পটাশ দণ্ড পরীক্ষা পাত্রে প্রবেশ করান মাত্র পারদস্তম্ভ কিছুটা উপরে উঠে আসে এবং দণ্ডটি পারদস্তম্ভের উপরে ভাসতে থাকে। এখন পারদের উচ্চতা বরাবর লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে পরীক্ষা-পাত্রটিকে রেখে দেওয়া হল।

● **নিরীক্ষা (Observation) ঃ** পরের দিন দেখা গেল, পারদস্তম্ভের উচ্চতা বেড়ে গেছে।

● **সিদ্ধান্ত (Inference) ঃ** কস্টিক পটাশ দণ্ড কেবল কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণে সক্ষম। নলের মধ্যে যেটুকু কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে, তাও কস্টিক পটাশ দণ্ড প্রবেশ করানোর সঙ্গে সঙ্গেই শোষিত হয়। সেজন্য প্রথমেই

---

* ছোলা বীজের পরিবর্তে ফুলের পাপড়ি ব্যবহার করা যায়। সবুজ পাতা ব্যবহার করলে রেসপিরোস্কোপের বাল্বটি কাল কাগজে ঢেকে দিতে হবে, নইলে একই সঙ্গে সালোকসংশ্লেষ চলতে থাকবে এবং শ্বসনের পরীক্ষাটিকে বিঘ্নিত করবে।

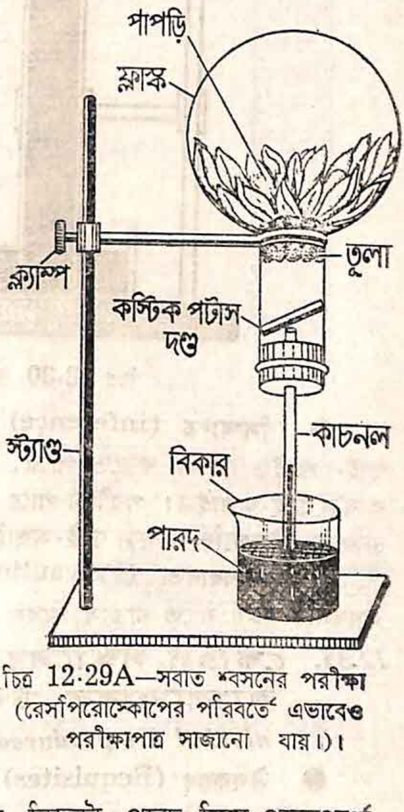
পারদস্তম্ভ কিছুটা উপরে উঠে আসে। পরের বার পারদস্তম্ভ ওঠার অর্থ, সেখানে আরও কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হওয়া। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড পুনরায় কস্টিক পটাশ দ্বারা শোষিত হয় এবং ঐ ফাঁকা স্থান পারদ দখল করে, যার ফলে পারদস্তম্ভের উচ্চতা আরো বৃদ্ধি পায়। নতুন করে রেসপিরোস্কোপে কার্বন ডাই-অক্সাইডের আবির্ভাব থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বীজগুলি সবাত শ্বসন চালিয়েছে এবং তার ফলেই কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়েছে।

● **সাবধানতা** (Precaution) ঃ রেসপিরোস্কোপে KOH দণ্ড প্রবেশ করানোর সময় যাতে বাতাস প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

12.34. অবাত শ্বসনের পরীক্ষা *[Experiment of Anaerobic Respiration] :*

● **প্রয়োজনীয় সামগ্রী** (Requisites) ঃ

(i) একটি টেস্টটিউব,
(ii) একটি বিকার,
(iii) কিছুটা পারদ,
(iv) অল্প কিছু অংকুরিত বীজ,
(v) একটি কস্টিক পটাশ দণ্ড,
(vi) ক্ল্যাম্পসহ একটি স্ট্যাণ্ড ও
(vii) একটি ফরসেপ।

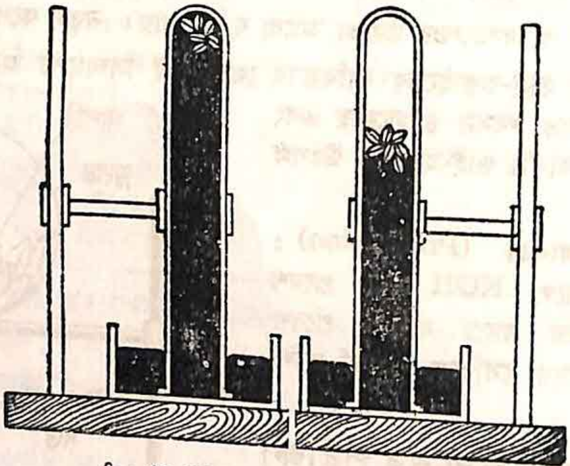


চিত্র 12·29A—সবাত শ্বসনের পরীক্ষা (রেসপিরোস্কোপের পরিবর্তে এভাবেও পরীক্ষাপাত্র সাজানো যায়।)।

● **পদ্ধতি** (Procedure) ঃ বিকারে কিছুটা পারদ নিয়ে পারদপূর্ণ একটি টেস্টটিউব বিকারের পারদে এমনভাবে উল্টে দেওয়া হল, যাতে পারদস্তম্ভ নীচে নেমে আসে। টেস্টটিউবের মুখটি পারদে ডুবে থেকেও যাতে বিকারের তলরেখা স্পর্শ না করে সেইভাবে টেস্টটিউবটি ক্ল্যাম্পের সঙ্গে যুক্ত করা হল।

খোসা ছাড়ানো কয়েকটি অংকুরিত ছোলা বীজ ফরসেপের সাহায্যে টেস্টটিউবের মুখে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পারদের উপরে ভেসে ওঠে। এই অবস্থায় পরীক্ষা-পাত্রটিকে একদিন পরীক্ষাগারে রাখা হল।

● **নিরীক্ষা** (Observation) ঃ পরের দিন দেখা গেল, পারদস্তম্ভ অনেক নীচে নেমে এসেছে। একখণ্ড কস্টিক পটাশ দণ্ড টেস্টটিউবটিতে প্রবেশ করানোর সঙ্গে সঙ্গে পারদস্তম্ভ পুনরায় যথাস্থানে ফিরে যায়।



চিত্র 12·30—অবাত শ্বসনের পরীক্ষা।

● **সিদ্ধান্ত** (Inference) ঃ কস্টিক পটাশ দণ্ড কেবলমাত্র কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে উৎপন্ন গ্যাস নিঃসন্দেহে কার্বন ডাই-অক্সাইড। পরীক্ষা-পাত্রে প্রথমে কোন গ্যাস ছিল না। অবাত শ্বসন চালিয়ে বীজগুলি কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করেছে।

● **সাবধানতা** (Precaution) ঃ টেস্টটিউবে ছোলা বা KOH প্রবেশ করানোর সময় যাতে বাতাস প্রবেশ না করে সেদিকে সতর্ক থাকতে হয়।

12.35. কোহল সন্ধানের সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অ্যালকোহল উৎপন্ন হয় *[Carbon dioxide and alcohol are produced during Alcoholic fermentation]* :

● **উপকরণ** (Requisites) ঃ

(i) একটি কুনের কোহল সন্ধান পাত্র,
(ii) কিছুটা 10% চিনির দ্রবণ,
(iii) কিছু ঈস্ট পাউডার,
(iv) খানিকটা তুলো,
(v) সামান্য কস্টিক পটাশ (KOH) দ্রবণ।

● **পরীক্ষা পদ্ধতি** (Procedure) ঃ ঈস্ট পাউডার মেশানো চিনির দ্রবণ দ্বারা কোহল সন্ধান পাত্রটি এমনভাবে পূর্ণ করা হ'ল যাতে পাত্রের বাল্বযুক্ত বিশেষ অংশটির অর্ধেক ভর্তি থাকে। এবার খোলা মুখে তুলোর আলগা ছিপি দিয়ে পাত্রটিকে কয়েক ঘণ্টা রেখে দেওয়া হ'ল।

● **নিরীক্ষা** (Observation) ঃ পরীক্ষান্তে দেখা গেল কোহল সন্ধান পাত্রের খাড়া বন্ধ নলে চিনির দ্রবণের উচ্চতা হ্রাস পেয়েছে, কারণ দ্রবণটি অনেক নীচে নেমে এসেছে। এদিকে তুলোর আলগা ছিপির মধ্যে থেকে অ্যালকোহলের গন্ধ অনুভব করা যায়। এখন ঐ দ্রবণটিতে KOH মেশালে নলটি পুনরায় উক্ত চিনির দ্রবণে পূর্ণ হ'য়ে যায়।

● **সিদ্ধান্ত** (Inference)ঃ খাড়া নলে দ্রবণের উচ্চতা হ্রাসের অর্থ সেখানে কোন না কোন গ্যাসের উপস্থিতি। KOH দ্বারা গ্যাসটি শোষিত হওয়ায় গ্যাসটি নিঃসন্দেহে কার্বন ডাই-অক্সাইড। পরীক্ষা পাত্র থেকে অ্যালকোহলের গন্ধ বেরুনোর অর্থ সেখানে কোহল সন্ধান চলেছে।

সুতরাং উপরের পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কোহল সন্ধানের মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অ্যালকোহল উৎপন্ন করে।



চিত্র 12·30A—কুনের কোহলসন্ধান পাত্র।

● **সাবধানতা** (Precaution) ঃ পরীক্ষা শেষে যাতে দ্রবণ নীচে নেমে এসে ছিপির গা দিয়ে উপচে না পড়ে সেজন্য, সন্ধান পাত্রের কিছুটা অংশ খালি রাখতে হয়।

12.36. সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের পার্থক্য *[Differences between Photosynthesis and Respiration] :*

সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis)	শ্বসন (Respiration)
(1) সালোকসংশ্লেষে শক্তি সঞ্চিত হয়।	(1) শ্বসনে শক্তি নির্গত হয়।
(2) এই প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষিত হয়।	(2) এই প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যক্ত হয়।

সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis)	শ্বসন (Respiration)
(3) সালোকসংশ্লেষে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়।	(3) শ্বসনে অক্সিজেন শোষিত হয়।
(4) প্রক্রিয়াটি কেবল সবুজ উদ্ভিদেই চলে।	(4) প্রতিটি জীবকোষেই শ্বসন চলে।
(5) আলোক ছাড়া সালোকসংশ্লেষ হয় না।	(5) আলোকের প্রয়োজন হয় না, শ্বসন দিবারাত্র চলে।
(6) সালোকসংশ্লেষে সবুজ উদ্ভিদের খাদ্য উৎপন্ন হয়।	(6) শ্বসনে খাদ্যের দহন ঘটে।
(7) সালোকসংশ্লেষের ফলে উদ্ভিদের ওজন বাড়ে।	(7) শ্বসনে ওজন কমে।
(8) এটি উপচিতি (Anabolic) প্রক্রিয়া।	(8) এটি অপচিতি (Catabolic) প্রক্রিয়া।

12.37. পাতার বিশেষ কাজ এবং রূপান্তরিত পাতা *[Special functions of leaves and metamorphosed leaves]* :

সাধারণ কাজ ছাড়াও পাতাকে অনেক সময় বিশেষ কাজ করতে হয়। যেমন—

1. **পত্রকণ্টক** বা **স্পাইন** (Spine) : আত্মরক্ষার জন্য শেয়ালকাঁটার পাতার কিনারা ও খেজুর পাতার আগা পত্রকণ্টকে রূপান্তরিত হয়।

2. **কূর্চ** বা **ব্রিসল্** (Bristle) : আত্মরক্ষার জন্য ফণিমনসার পাতা সরু, সূচালো, শক্ত কাঁটায় রূপান্তরিত হয়।

3. **পর্ণবৃন্ত** বা **ফাইলোড** (Phyllode) : অপরিণত অবস্থায় ফলক খসে পড়লে বৃন্ত ফলকের আকার ধারণ করে এবং পাতার কাজ চালায় (চিত্র 12.7ক)।

4. **আকর্ষীভূত পাতা** বা **টেন্ড্রিলার লিফ্** (Tendrillar leaf) : আরোহণে সুবিধার জন্য পাতার বৃন্ত আকর্ষে রূপান্তরিত হয়।

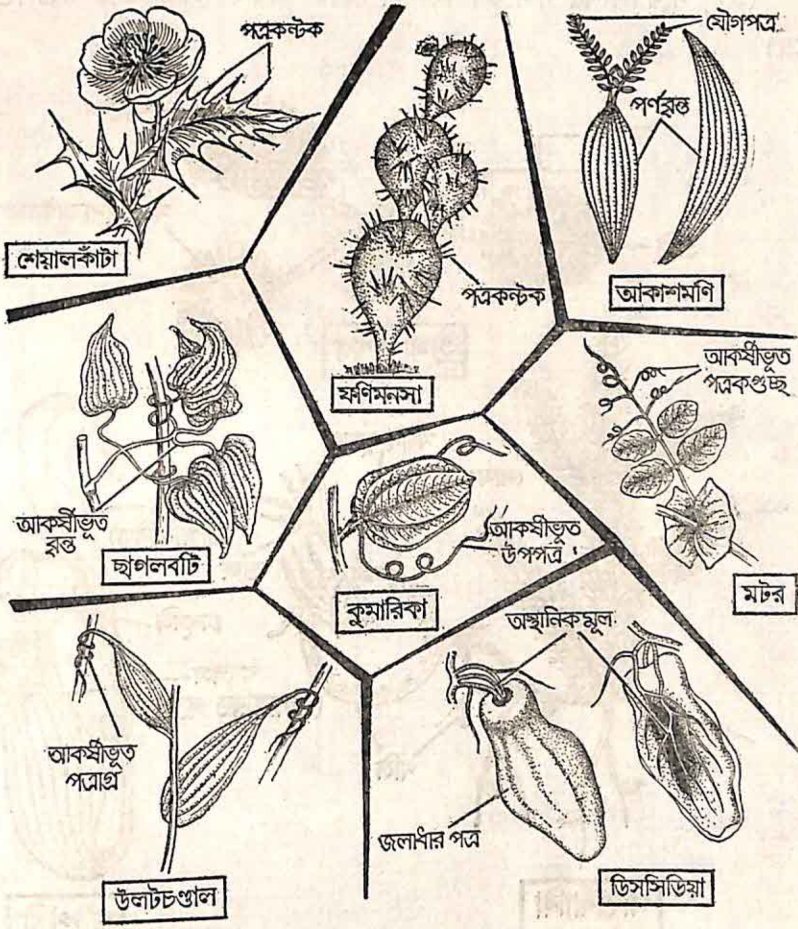
(i) **ছাগলবাটিতে**—বৃন্ত (চিত্র 12.8)।

(ii) **মটরে** যৌগিক পত্রের শেষ পত্রকগুলি (চিত্র 11·12গ)।

(iii) **কুমারিকায়** উপপত্র (চিত্র 11.12চ)।

(iv) **উলটচণ্ডালে** পাতার আগা (চিত্র 11·12খ)।

5. **খাদ্য-সঞ্চয়ী পাতা** (Storage leaf) ঃ পাথরকুচি, পুঁই, ঘৃতকুমারীর পাতা খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য স্থূল হয়।



চিত্র 12·31—বিভিন্ন প্রকার রূপান্তরিত পাতা।

6. **জল-সঞ্চয়ী পাতা** (Leaf as water reservoir) ঃ আসাম ও মেঘালয়ের জঙ্গলে **ডিসসিডিয়া** (*Dischidia*) নামক উদ্ভিদের পাতার ফলক কলসের আকার লাভ করে। এতে প্রচুর জল সঞ্চিত থাকে। এই **জলাধার পত্রে** অস্থানিক মূল প্রবেশ করিয়ে গাছ দরকার মতো জল শোষণ করে (চিত্র 12.31)।

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ প্রশ্ন (*General Questions*) :

1. জীবের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা ক'রে জড়ের সঙ্গে জীবের পার্থক্য দেখাও।

2. জীববিজ্ঞানের প্রধান শাখাগুলি নিয়ে আলোচনা কর।

3. জীববিজ্ঞানের পরিধি, গুরুত্ব ও প্রয়োগ সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধারণ প্রশ্ন (*General Questions*) :

1. শ্রেণীবিভাগ বলিতে কি বোঝ? ছকের সাহায্যে উদ্ভিদজগতের শ্রেণীবিভাগ দেখাও। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর দুইটি করিয়া বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর এবং একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

2. দ্বিপদ নামকরণ বলিতে কি বোঝ? শ্রেণীবিভাগের উদ্দেশ্য কি? প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম লিখিবার পদ্ধতি কি?

3. পুষ্টি অনুযায়ী উদ্ভিদজগতের শ্রেণীবিভাগ কর। প্রতিটি শ্রেণীর দুইটি করিয়া বৈশিষ্ট্য ও একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

4. শ্রেণীবিভাগের একক কি? নিম্নতম ও ঊর্ধ্বতম একক সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? সনাক্তকরণের সহিত শ্রেণীবিভাগের সম্বন্ধ নিরূপণ কর।

5. কৃত্রিম, স্বাভাবিক ও অভিব্যক্তি নির্দেশক শ্রেণীবিভাগের পার্থক্য কি? আমাদের দেশে সর্বাধিক প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি কোন্‌টি? শ্রেণীবিভাগটির সংক্ষিপ্ত ছক পরিবেশন কর।

6. বেন্থাম ও হুকার কোন্ ধরনের শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন? সেই শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

7. পর্ব বা ফাইলাম কাহাকে বলে? প্রাণিজগৎ কয়টি পর্বে বিভক্ত? প্রত্যেকটি পর্বের দুইটি করিয়া বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

8. মেরুদণ্ডী প্রাণী কাহাকে বলে? মেরুদণ্ডী প্রাণীরা কয় শ্রেণীতে বিভক্ত? মানুষ যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাহার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।

9. কর্ডাটা ও অকর্ডাটা প্রাণীর পার্থক্যগুলি সারিবদ্ধ কর।

10. মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি উল্লেখ কর। নিম্নলিখিত প্রাণীগুলিকে নিজ নিজ পর্বের অন্তর্ভুক্ত কর। (a) যকৃৎকৃমি, (b) হাইড্রা, (c) অক্টোপাস, (d) চিংড়ি, (e) কেঁচো, (f) বাদুড়, (g) অ্যামিবা, (h) স্কুইড, (i) তারামাছ, (j) গোলকৃমি।

11. কোষবিহীন প্রাণী বলতে কি বোঝ? একটি কোষবিহীন প্রাণীর উদাহরণ দাও। বাথস্পঞ্জ কোথা হইতে পাওয়া যায়?

12. সাইফন, হাইড্রা, প্ল্যানেরিয়া, হুকওয়ার্ম, কেঁচো, বিছা, শামুক এবং তারামাছ কোন্ কোন্ পর্বের অন্তর্ভুক্ত? অন্ততঃ চারিটি পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।

13. নিম্নলিখিত প্রাণীগুলি কোন্ কোন্ পর্বভুক্ত লেখ এবং প্রতিটি পর্বের তিনটি করিয়া বৈশিষ্ট্য লেখঃ

(i) চিংড়ি মাছ, (ii) জেলি মাছ, (iii) সিলভার মাছ, (iv) তারা মাছ ও (v) তিমি মাছ।

14. ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণী কাহাকে বলে? স্পঞ্জকে একটি পৃথক উপরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ কি?

15. মেরুদণ্ডী প্রাণীর বিভিন্ন শ্রেণীর নাম লিখ এবং প্রতিটি শ্রেণীর একটি করিয়া ভারতীয় উদাহরণ দাও। টিকটিকি ও গিনিপিগ যে দুইটি শ্রেণীর অন্তর্গত সেই দুইটি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য বল।

16. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ

(ক) থ্যালস, (খ) মৃতজীবী, (গ) রাইজয়েড, (ঘ) স্বভোজী, (ঙ) আদ্য-প্রাণী, (চ) নোটোকর্ড, (ছ) কর্ডাটা, (জ) কোষবিহীন প্রাণী, (ঝ) সিলেনটেরন, (ঞ) নির্মোচন, (ট) নালীপদ, (ঠ) মেটামিয়ার, (ড) ম্যানটল।

● নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন [*Objective Questions*]ঃ

17. পাশের বন্ধনী হইতে উপযুক্ত শব্দ নির্বাচন পূর্বক বাক্যগুলি সম্পূর্ণ কর।

(ক) যে উদ্ভিদের কখনই ফল হয় না তাহাকে বলে — (**গুপ্তবীজী, নগ্নবীজী, একবীজপত্রী**)।

(খ) মৃত, গলিত জৈবপদার্থের উপরে জন্মায় — (**ছত্রাক, শেওলা, ফার্ণ**)।

(গ) এদেশে প্রচলিত উদ্ভিদ-শ্রেণীবিভাগের প্রবক্তা — (**ডারউইন, বেন্থাম-হুকার, এঙলার**)।

(ঘ) অণুবীক্ষণিক প্রাণীর পর্ব — (**পরিফেরা, প্রোটোজোয়া, নিডারিয়া**)।

(ঙ) যে প্রাণীর দেহস্তরে মেসোগ্লিয়া থাকে তাকে বলে — (**দ্বিস্তরবিশিষ্ট প্রাণী, ত্রিস্থরবিশিষ্ট প্রাণী, ক্ষণপদযুক্ত প্রাণী**)।

(চ) প্রাণীর খোলস ত্যাগ করার নাম — (**রেচন, শ্বসন, নির্মোচন**)।

(ছ) ফিতাকৃমির পর্ব হইল — (**আরথ্রোপডা, আনেলিডা, প্ল্যাটিহেলমিনথিস**)।

(জ) মাছের আছে জোড়া — (**পাখনা, আঁশ, লেজ**)।

(ঝ) সাগরকুসুম যে পর্বভুক্ত তাহার নাম — (**নিডারিয়া, পরিফেরা, আনেলিডা**)।

(ঞ) স্পঞ্জিলার পর্বের নাম — (**প্রোটোজোয়া, প্ল্যাটিহেলমিনথিস, পরিফেরা**)।

(ট) এণ্ট্যামিবা — (**স্বাধীনজীবী, পরজীবী, মিথোজীবী**)।

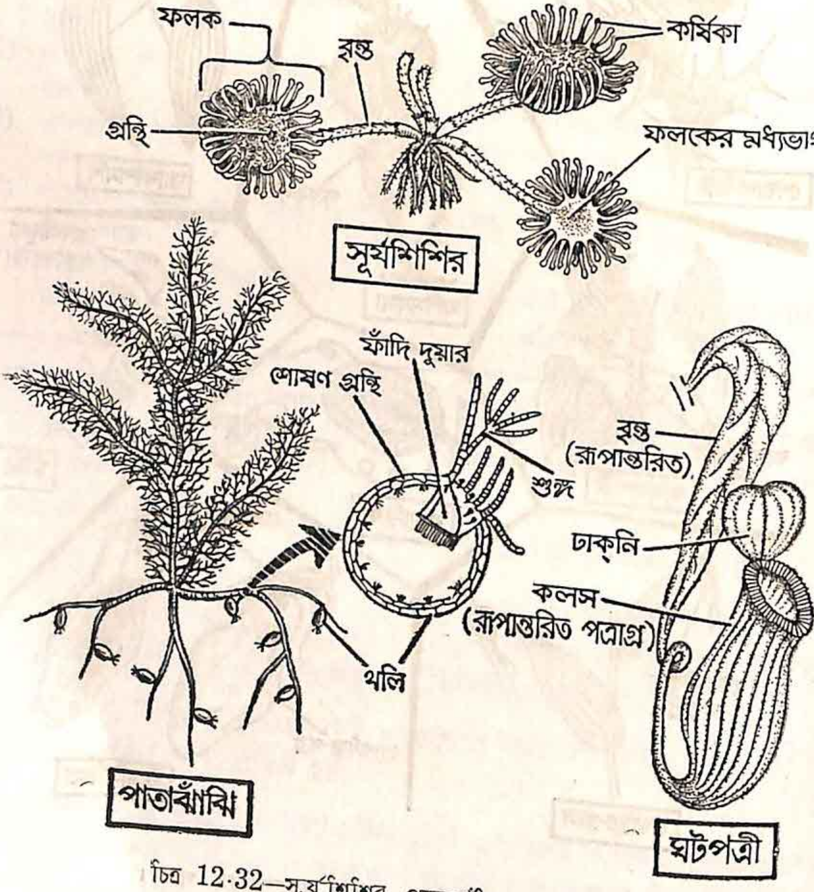
(ঠ) সালামাণ্ডারের শ্রেণীর নাম — (**অ্যাভিস, রেপটিলিয়া, অ্যাম্ফিবিয়া**)।

(ড) স্তন্যপায়ীর দেহ-আচ্ছাদন হইল — (**আঁশ, চুল, কিউটিকল**)।

7. **পতঙ্গভুক উদ্ভিদের পাতার রূপান্তর** (Metamorphosis of Leaves of insectivorous plants) ঃ

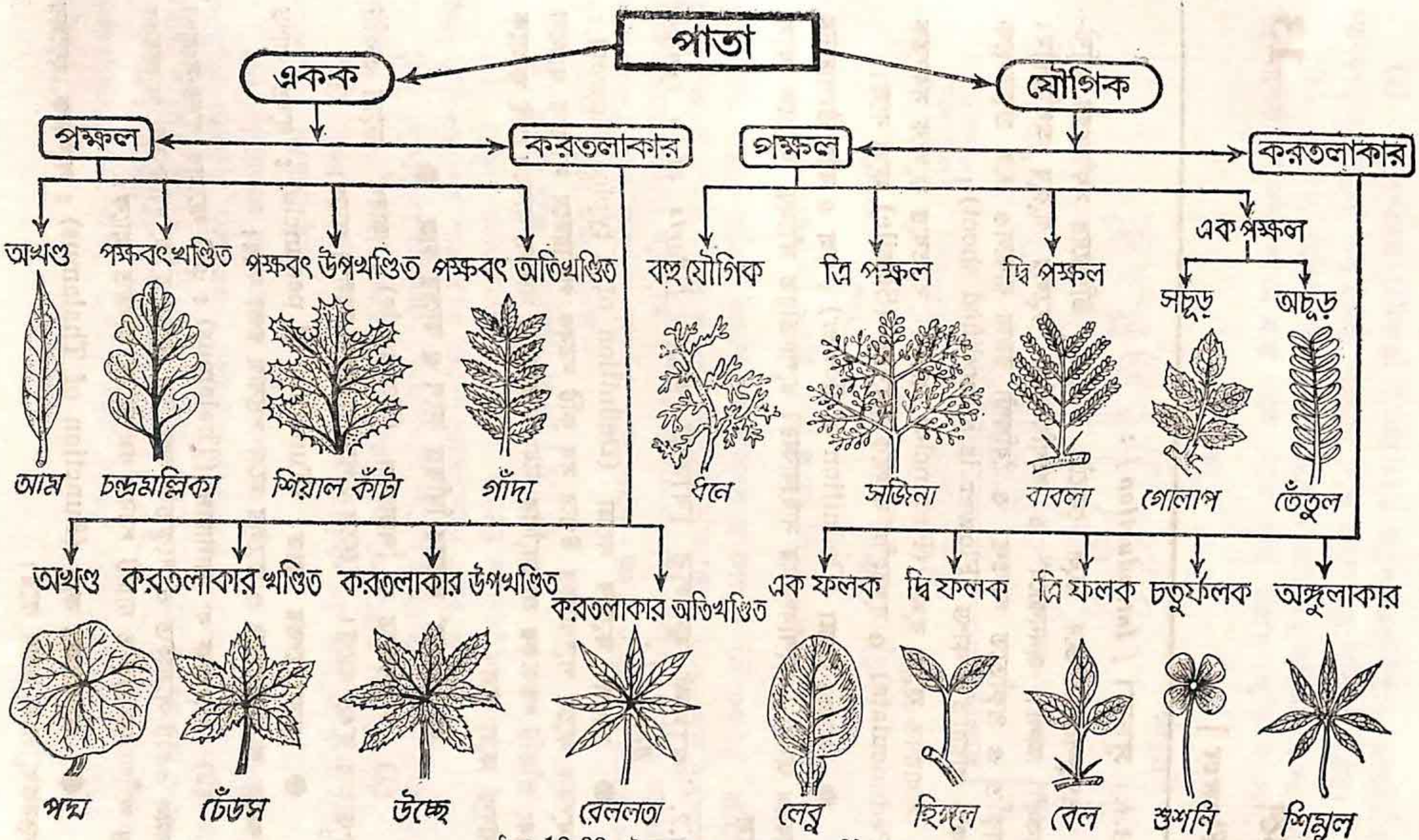
(i) **ঘটপত্রীর** পত্রাগ্র কলস গঠন ক'রে কীটপতঙ্গ ধরে।

(ii) **সূর্যশিশির** ফলকের কিনারা থেকে কর্ষিকা গঠন ক'রে কীটপতঙ্গ ধরে।



চিত্র 12·32—সূর্যশিশির, পাতাঝাঁঝি ও ঘটপত্রী।

(iii) **পাতাঝাঁঝি জলের তলায় পাতা** থেকে থলি তৈরি করে কীটপতঙ্গ ধরে।



চিত্র 12·33—উদাহরণসহ পাতার শ্রেণীবিভাগ।

18. **শূন্যস্থান পূর্ণ করঃ**

(ক) আমাদের দেশে প্রচলিত উদ্ভিদ শ্রেণীবিভাগের প্রবক্তা —।

(খ) টেরিডোফাইটা হইতেছে — উদ্ভিদের মধ্যে সর্বোন্নত গোষ্ঠী।

(গ) মূল, কান্ড বা পাতায় বিভক্ত হয় না, এমন অপুষ্পক উদ্ভিদ দেহকে — বলে।

(ঘ) যে গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদে বীজ ফলের মধ্যে লুকান থাকে তাহার নাম —।

(ঙ) ক্ষণপদ উৎপন্ন করা — বৈশিষ্ট্য।

(চ) — পর্বভুক্ত প্রাণীর মুখকে ঘিরিয়া কর্ষিকা থাকে।

(ছ) কেঁচো — র সাহায্যে চলাফেরা করে।

(জ) — পর্বভুক্ত প্রাণীরা ম্যানটল্ ও খোলকের অধিকারী।

(ঝ) যে প্রাণীর দেহের পৃষ্ঠ-বরাবর ফাঁপা স্নায়ুসূত্র আছে, তাহা — পর্বভুক্ত।

(ঞ) চুল ও বহিঃকর্ণের অধিকারীরা —।

19. **মৌখিক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ**

(ক) শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তা কি? (খ) কোন্ কোন্ উদ্ভিদকে স্বভোজী বলা হয় এবং কেন? (গ) দুই বীজপত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদকে কি বলে? (ঘ) পেনিসিলিয়ম কোন্ গোষ্ঠীর উদ্ভিদ? (ঙ) মেটাজোয়া কথার অর্থ কি? (চ) কোন্ পর্বভুক্ত প্রাণীর মুখ আছে কিন্তু পায়ুছিদ্র নাই? (ছ) প্রকৃত সিলোমের অধিকারী কাহারা? (জ) কোন্ প্রাণীর দেহে মাংসল পদ আছে? (ঝ) কোন্ প্রাণী নালীপদের সাহায্যে চলাচল করে? (ঞ) কোমলাস্থিবিশিষ্ট মাছকে কি বলে? (ট) শিক্ষামূলক ভ্রমণে কি উপকার হয়?

20. **বাঁদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত করঃ**

বাঁদিক	ডানদিক
(ক) যে উদ্ভিদে ফুল হয় না তাহাকে	একবীজপত্রী উদ্ভিদ বলে।
(খ) ছত্রাক থ্যালোফাইটার অন্তর্গত	অপুষ্পক উদ্ভিদ বলে।
(গ) শেওলা	স্বভোজী উদ্ভিদ।
(ঘ) ভুট্টা গাছকে	মৃতজীবী উদ্ভিদ।
(ঙ) নিডারিয়া পর্বভুক্ত প্রাণীর দেহে	পরিফেরার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
	সিউডোসিল আছে।
(চ) কেবল গোলকৃমির দেহেই	মেসোগ্লিয়া আছে।
(ছ) অসংখ্য নালিকাযুক্ত প্রাণীকেই	প্রোটোজোয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
(জ) এককোষী সমস্ত প্রাণীতেই	নিমাটোসিস্ট আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সাধারণ প্রশ্ন (*General Questions*) ঃ

1. আমরা কাহাদের জীব বলি? জীবের সহিত জড়ের কোন সম্বন্ধ আছে কি? জীবের দেহে প্রোটোপ্লাজমের ভূমিকা উল্লেখ কর।

2. জীবের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া জড় হইতে ইহার কি প্রভেদ, তাহা দেখাও।

3. বিপাক কথার অর্থ কি? জীবদেহে কয়েকটি বিপাক-ক্রিয়া আলোচনা কর।

4. উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্যগুলি পর্যালোচনা কর। কোন্ জীবগোষ্ঠীর দেহে প্লাস্টিড আছে? প্লাস্টিড থাকার তাৎপর্য কি?

5. **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ**

(ক) অভিযোজন, (খ) উত্তেজিতা, (গ) পুষ্টি, (ঘ) রেচন, (ঙ) জরা, (চ) শ্বসন, (ছ) জনন ও (জ) জীবন-চক্র।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন [*Objective Questions*] ঃ

6. **পাশের বন্ধনী হইতে উপযুক্ত শব্দ নির্বাচন করিয়া বাক্য সম্পূর্ণ কর ঃ**

(ক) জীবকোষের জীবন্ত অংশটির নাম — **(কোষরস, প্রোটোপ্লাজম, গহ্বর)**।

(খ) জীবকোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমের সম্প্রসারণই — **(চলন, বিপাক, বৃদ্ধি)**।

(গ) শ্বসন দ্বারা তাপসৃষ্টির ক্ষমতা আছে কেবল — **(জীবের, জড়ের, সকল পদার্থের)**।

(ঘ) নিজদেহে শর্করা খাদ্য উৎপাদন করিতে পারে — **(শেওলা, ছত্রাক, স্বর্ণলতা)**।

(ঙ) উদ্ভিদকোষের প্রাকার প্রধানতঃ গঠিত হয় — **(কাইটিনে, সেলুলোজে, প্লাসটিডে)**।

(চ) উদ্ভিদের শ্বসন-অঙ্গ হইল — **(পত্ররন্ধ্র, ফুসফুস, ভ্যাসকুলার বান্ডিল)**।

(ছ) শ্বসনের সময় অক্সিজেন গ্রহণ করে — **(প্রাণী, উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই)**।

(জ) খাদ্যে তালাবন্ধ শক্তি উন্মোচনের জন্য চাবিকাঠির কাজ করে — **(নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন)**।

(ঝ) কুইনিন হইল রেচনজাত — **(উপক্ষার, পুষ্টিকর দ্রব্য, এনজাইম)**।

7. **বাঁদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত কর ঃ**

বাঁদিক	ডানদিক
(ক) কেবলমাত্র জীবেরই আছে	আকার, আয়তন পরিবর্তনের ক্ষমতা।
(খ) জীবনের ভৌত ভিত্তি হ'ল	অভিযোজন ক্ষমতা।
(গ) প্রাণীদেহের গহ্বরগুলির নাম	প্রোটোপ্লাজম।
(ঘ) প্রাণীদেহের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ অঙ্গ হ'ল	ভ্যাকুওল।
	প্লাজমালিমা।
(ঙ) প্রাণীকোষের বাহিরের সজীব পর্দার নাম	সেন্ট্রোজোম।

ফুল 13
[Flower]

13.1. সূচনা [*Introduction*] :

সপুষ্পক উদ্ভিদে ফুল ফোটে। ফুলই উদ্ভিদের সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি-আকর্ষী অঙ্গ। জননকার্যে ও বংশবিস্তারে ফুলের গুরুত্ব অপরিসীম। আকৃতি ও প্রকৃতিতে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখলেও ফুল প্রকৃতপক্ষে একটি পরিবর্তিত কান্ড (Flower is a modified shoot)।

সাধারণত ফুলে বৃন্ত (Peduncle) থাকে। বৃন্তযুক্ত ফুলকে **সবৃন্তক** (Pedunculate) ও বৃন্তহীন ফুলকে **অবৃন্তক** (Sessile) ফুল বলে।

● **ফুলের সংজ্ঞা** (Definition of flower) : **ফল ও বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে জনন ও বংশবিস্তারে সাহায্যকারী রূপান্তরিত সীমিত বিটপকে ফুল বলে।**

13.2. আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশ [*Parts of a typical flower*] :

● **আদর্শ ফুলের সংজ্ঞা** (Definition of a typical flower) : **সবৃন্তক ফুলে পুষ্পাক্ষের উপরে সব কটি স্তবক পর্যায়ক্রমে সজ্জিত থাকলে এবং প্রতিটি স্তবকের অংশগুলির মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকলে সেই ফুলকে আদর্শ ফুল বলে।**

● **আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কাজ** ●

(1) **পুষ্পবৃন্ত** বা **পিডাংকল** (Peduncle) : আদর্শ ফুলে একটি দণ্ডাকার বৃন্ত থাকে। বৃন্তের উপরে পুষ্পাক্ষ সংলগ্ন থাকে।

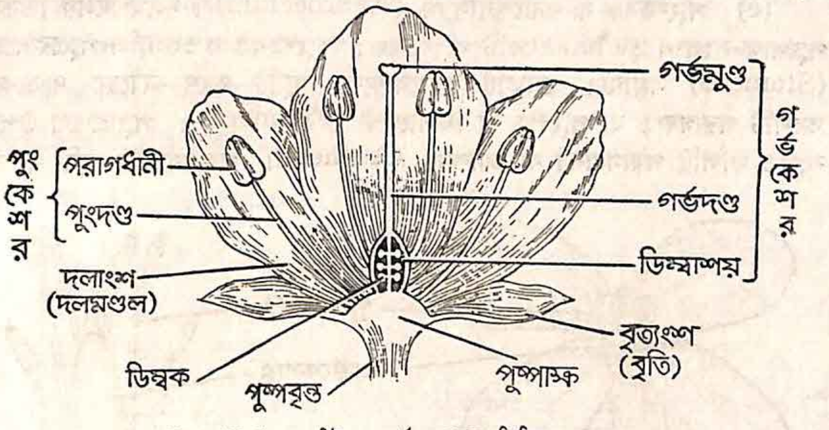
● **পুষ্পবৃন্তের কাজ** (Function of peduncle) : বৃন্ত কাণ্ড (অথবা শাখা-প্রশাখা) ও ফুলের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে।

(2) **পুষ্পাক্ষ** বা **থ্যালামাস** (Thalamus) : এটি ফুলের বৃন্ত-সংলগ্ন এমন একটি সুসংহত ও সংকুচিত অক্ষ যার উপরে বৃতি, দলমণ্ডল, পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক প্রভৃতি চারটি স্তবক ক্রমপর্যায়ে সজ্জিত থাকে।

● **পুষ্পাক্ষের কাজ** (Function of Thalamus) : পুষ্পাক্ষ ফুলের স্তবকগুলিকে ধারণ করে।

(3) **পুষ্পস্তবক** (Floral whorls) ঃ পুষ্পাক্ষের উপরে নিম্নলিখিত স্তবকগুলি বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে ক্রমপর্যায়ে সজ্জিত থাকে।

(a) **বৃতি** বা **ক্যালিক্স** (Calyx) ঃ ফুলের একেবারে বাইরের যে স্তবকটি পুষ্পাক্ষের সর্বনিম্ন স্থানে যুক্ত থাকে তাকে বৃতি বলে। বৃতি কতকগুলি



চিত্র 13·1—একটি আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশ।

খণ্ড নিয়ে গঠিত। প্রতিটি খণ্ডের নাম **বৃত্যংশ** বা **সেপাল** (Sepal)। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃত্যংশের রং সবুজ। বৃত্যংশগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে পরস্পর পৃথক থাকে—অর্থাৎ **মুক্তবৃতি** (Polysepalous—যেমন সরিষা, মুলা), আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলি পরস্পর যুক্ত থাকে—অর্থাৎ **যুক্তবৃতি** (Gamosepalous—যেমন জবা, ধুতরা)।

● **বৃতির কাজ** (Functions of Calyx) ঃ

(i) মুকুল অবস্থায় বৃতি ফুলের অন্যান্য স্তবকগুলিকে রোদ, বৃষ্টি এবং কীট-পতঙ্গের আক্রমণ ও অন্যান্য প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করে।

(ii) বৃতির রং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সবুজ—সুতরাং প্রয়োজনে বৃতি সালোকসংশ্লেষ চালিয়ে শর্করা খাদ্য প্রস্তুত করতে উদ্ভিদকে সাহায্য করতে পারে।

(iii) রঙীন বৃতি দ্বারা কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট হয় এবং এইভাবে বৃতি পরাগযোগে সহায়তা করে।

(b) **দলমণ্ডল** বা **করোলা** (Corolla) ঃ বৃতির উপরে পুষ্পাক্ষ-সংলগ্ন দ্বিতীয় স্তবকটি দলমণ্ডল। দলমণ্ডল সাধারণত রঙীন, তবে সাদা হ'লে মিষ্টি গন্ধযুক্ত হয়। দলমণ্ডলের পৃথক খণ্ডগুলির নাম **দলাংশ** বা **পেটাল** (Petal)। বৃত্যংশের মতো দলাংশও পরস্পর যুক্ত—অর্থাৎ **যুক্তদল** (Gamopetalous, যেমন—জবা, ধুতরা) অথবা **মুক্তদল** (Polypetalous, যেমন—সরিষা)।

8. **শূন্য স্থান পূর্ণ কর:**

(ক) জীব সুনির্দিষ্ট — অধিকারী।

(খ) খেজুর রস, গরু-ছাগলের দুগ্ধ প্রভৃতি — পদার্থ।

(গ) খাদ্যরস দেহের — অন্তর্ভুক্ত হয়।

(ঘ) পরিবেশে নিজেকে মানাইয়া লওয়ার ক্ষমতাকে — বলে।

(ঙ) প্রোটোপ্লাজমের সুনির্দিষ্ট — বহিঃপ্রকাশই —।

(চ) গঠনমূলক বিপাকক্রিয়ার নাম — এবং ধ্বংসমূলক বিপাকক্রিয়ার নাম —।

(ছ) উদ্ভিদ হইলেও — স্থানান্তরে গমন করিতে পারে।

(জ) গরানগাছে — অঙ্কুরোদ্গম দেখা যায়।

9. **মৌখিক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:**

(ক) উদ্ভিদের সেলুলোজ-নির্মিত কোষ-প্রাকার জীবিত না মৃত? (খ) কাজের জন্য কোন্ শক্তি প্রয়োজন? (গ) জীবন-চক্র কথাটির অর্থ কি? (ঘ) প্রোটোপ্লাজমকে জীবন বলা হয় কেন? (ঙ) খাদ্যরস হইতে কি উৎপন্ন হয়? (চ) সেন্ট্রোজোম কোন্ কোষে দেখা যায়? (ছ) ফানজাইয়ের কোষ-প্রাকার কোন্ পদার্থ দ্বারা গঠিত? (জ) জীব ও জড়ের প্রধান প্রার্থক্য কি? (ঝ) উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রধান পার্থক্য কি?

চতুর্থ অধ্যায়

● **সাধারণ প্রশ্ন** (*General Questions*) :

1. উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ।

2. অন্যোন্যজীবিত্ব কথাটির অর্থ কি? কোন্ কোন্ জীব উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করিবে?

3. উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অন্যকে কিভাবে সাহায্য করে? কয়েকটি উদাহরণ দিয়া তোমার বক্তব্য সমর্থন কর।

4. কোন্ গোষ্ঠীর জীব বায়ু শোধন করে? ইহাতে অন্য গোষ্ঠীর কি উপকার হয়? বায়ুর শোধন-কার্য কিভাবে সম্পাদিত হয় সংক্ষেপে বল।

5. **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ:**

(ক) সহকৃতি, (খ) অন্যোন্যজীবিত্ব ও (গ) নির্ভরতা।

● **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন [*Objective Questions*]ঃ**

6· **বাঁদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত করঃ**

বাঁদিক	ডানদিক
(ক) দেহপুষ্টির জন্য জীবের	অক্সিজেন প্রয়োজন।
(খ) জারণের জন্য জীবের	খাদ্য প্রয়োজন।
(গ) অন্যোন্যজীবিত্বের জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর	কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রয়োজন।
(ঘ) শর্করা খাদ্য উৎপাদনের জন্য উদ্ভিদের	দেহ সংযোগ প্রয়োজন।

7· **বন্ধনী হইতে উপযুক্ত শব্দ বসাইয়া বাক্য সম্পূর্ণ করঃ**

(ক) সহকৃতির সুন্দর দৃষ্টান্ত — **(কচু, আমেরিকান বাবলা, মটর)।**

(খ) উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য — **(অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার)।**

(গ) অক্সিজেন উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য — **(অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল)।**

(ঘ) শ্বসনের সময় অক্সিজেন গ্রহণ করে — **(উদ্ভিদ, প্রাণী, উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ে)।**

8· **মৌখিক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ**

(ক) উদ্ভিদের নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্যের উৎস কি? (খ) রাইজোবিয়ম কিভাবে জীবনযাপন করে? (গ) বায়ুর অক্সিজেন ক্রমাগত গৃহীত হইলেও উহা ভয়াবহভাবে কমিয়া যায় না কেন? (ঘ) অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড আদান-প্রদান কাজটি উদ্ভিদ ও প্রাণী কিভাবে চালায়? (ঙ) পুষ্টি ও ব্যাপ্তির সম্বন্ধ কি? (চ) খাদ্যের প্রলোভন দেখাইয়া কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট করিলে উদ্ভিদের কি উপকার হয়? (ছ) জাম, জামরুল, লিচু প্রভৃতি গাছে পিপড়া বাসা বাঁধে কেন?

পঞ্চম অধ্যায়

● **সাধারণ প্রশ্ন (*General Questions*)ঃ**

1· আদর্শ কোষ কি? একটি উদ্ভিদ বা প্রাণিকোষের গঠন বর্ণনা কর।

2· একটি উদ্ভিদ বা প্রাণিকোষের ছবি আঁকিয়া বিভিন্ন অংশ লেবেল কর। ‘কোষের মগজ’ কাহাকে বলা হয় এবং কেন?

3· কোষের শক্তি উৎপাদক কেন্দ্রের নাম কর। ইহার অবস্থান ও আকার সম্বন্ধে কি জান? গলগিবস্তু কি? কে ইহা আবিষ্কার করেন?

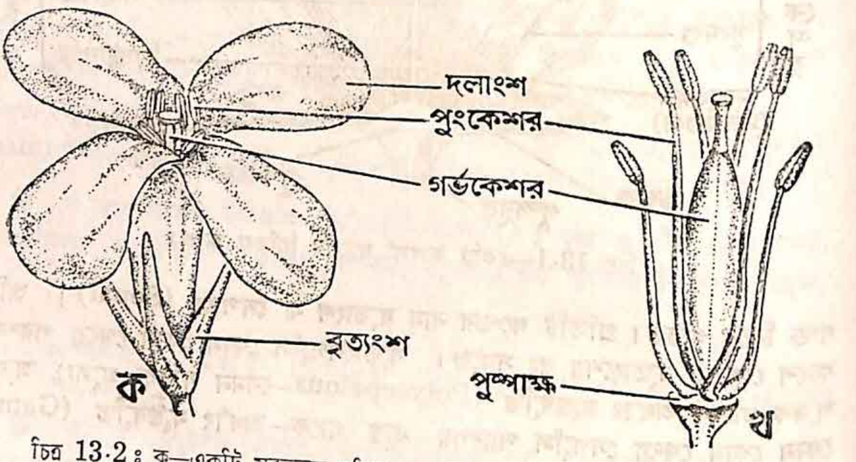
4· প্রোটোপ্লাস্ট কাহাকে বলে? সাইটোপ্লাজম ও প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি? প্রোটোপ্লাজমের চলন বলিতে কি বোঝ?

● **দলমণ্ডলের কাজ** (Functions of corolla) ঃ

(i) বৃতির মতোই দলমণ্ডল ফুলের জনন স্তবকগুলিকে রক্ষা করে।

(ii) দলমণ্ডলের উজ্জ্বল রং ও সুমিষ্ট গন্ধে আকৃষ্ট কীটপতঙ্গ পরাগ-যোগে সাহায্য করে।

(c) **পুংস্তবক** বা **অ্যাণ্ড্রোসিয়ম** (Androecium) ঃ দলমণ্ডলের ভিতরে পুষ্পাক্ষ-সংলগ্ন তৃতীয় স্তবকটি পুংস্তবক। পুংস্তবক কতকগুলি পুংকেশরের (Stamens) সমষ্টি। প্রতিটি পুংকেশরের দু'টি অংশ—নীচের দণ্ডাকার অংশটি **পরাগদণ্ড** বা **পুংদণ্ড** বা **ফিলামেণ্ট** (Filament)। পুংদণ্ডের উপরে স্ফীত থলিটি **পরাগধানী** বা **অ্যান্থার** (Anther)। পরাগধানীর দুটি খণ্ডের



চিত্র 13.2 ঃ ক—একটি সবৃন্তক সরিষা ফুল ও খ—ঐ পুংকেশর ও গর্ভকেশর।

মধ্যবর্তী বিশেষ কলা দ্বারা গঠিত অংশটি **যোজক** (Connective)। পুংদণ্ড লম্বা বা ছোট হয়। ফলে পরাগধানীর উচ্চতা ও অবস্থানের তারতম্য ঘটে। সময় সময় পুংদণ্ড একেবারেই থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাগধানী দু'টি খণ্ডে* বিভক্ত।

প্রতি খণ্ডের গহ্বরে অসংখ্য **পরাগ** বা **রেণু** বা **পোলেন** (Pollen grain) থাকে। পরাগধানীর গহ্বরকে **পরাগগহ্বর** (Pollen sac) বলে। পুংদণ্ডের সঙ্গে পরাগধানী নানাভাবে যুক্ত থাকে।

● **পুংস্তবকের কাজ** (Functions of Androecium) ঃ পরাগ উৎপাদন করাই পুংস্তবকের প্রধান কাজ।

(d) **স্ত্রীস্তবক** বা **গর্ভকেশর** বা **গাইনোসিয়ম** (Gynoecium) ঃ স্ত্রী-স্তবক ফুলের স্ত্রী জনন অঙ্গ। পুষ্পাক্ষের সর্বোচ্চ স্থানে স্ত্রীস্তবক বা গর্ভ-কেশর অবস্থিত। এটি এক বা একাধিক **গর্ভপত্র** বা **কারপেল** (Carpel) দ্বারা গঠিত। গর্ভপত্র তিনটি পৃথক অংশে বিভক্ত—নীচের স্ফীত অংশটি **গর্ভাশয়**

* ব্যতিক্রম—জবা।

বা ডিম্বাশয় বা **ওভারী** (Ovary)। ডিম্বাশয় সংলগ্ন উপরের দণ্ডাকার অংশটি গর্ভদণ্ড বা **স্টাইল** (Style) এবং গর্ভদণ্ডের শীর্ষে সামান্য স্ফীত বা খণ্ডিত অংশটি **গর্ভমুণ্ড** বা **স্টিগমা** (Stigma)। একাধিক গর্ভপত্র পরস্পর সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে যুক্ত থাকলে গর্ভকেশরটি **যুক্তগর্ভপত্রী** বা **সিনকার্পাস** (Syncarpous, যেমন—সরিষা, জবা) এবং গর্ভপত্রগুলি পরস্পর পৃথক থাকলে গর্ভকেশরটিকে **মুক্তগর্ভপত্রী** বা **অ্যাপোকারপাস** (Apocarpous, যেমন—পদ্ম, চাঁপা) বলে।

● **স্ত্রীস্তবকের কাজ** (Functions of Gynoecium) ঃ

(i) ডিম্বাশয়ের মধ্যে ডিম্বক এবং তার মধ্যে ভ্রূণস্থলী (Embryo sac) থাকে। ভ্রূণস্থলীতে অবস্থিত ডিম্বাণু নিষিক্ত হ'লে ডিম্বাশয় ও ডিম্বক যথাক্রমে ফল ও বীজে রূপান্তরিত হয়।

(ii) গর্ভমুণ্ড পরাগগ্রাহক অংগ। যৌন জননের পূর্বে পরাগ গ্রহণ কার্যটি অপরিহার্য।

(iii) গর্ভদণ্ড গর্ভমুণ্ডকে প্রকাশ্যে তুলে ধরে। পরাগনালিকা গর্ভদণ্ড ভেদ ক'রে প্রথমে ডিম্বাশয়ে এর পরে ডিম্বকে প্রবেশ করে।

13.3. বৃতি ও দলমণ্ডলের পার্থক্য *[Differences between Calyx and Corolla]* :

বৃতি (Calyx)	দলমণ্ডল (Corolla)
(1) বৃতি ফুলের বাইরের দিক থেকে প্রথম স্তবক।	(1) দলমণ্ডল ফুলের বাইরের দিক থেকে দ্বিতীয় স্তবক।
(2) সাধারণত সবুজ পত্রবৎ।	(2) সাধারণত রঙ্গীন বা শল্কপত্রবৎ।
(3) বৃতির প্রতিটি অংশের নাম বৃত্যংশ (Sepal)।	(3) দলমণ্ডলের প্রতিটি অংশের নাম দলাংশ (Petal)।
(4) গন্ধযুক্ত নয়।	(4) সাধারণত গন্ধযুক্ত।
(5) বৃতি ভিতরের অন্যান্য স্তবককে রক্ষা করে।	(5) রক্ষার কাজে তত গুরুত্ব পায় না।
(6) সাধারণত সবুজ হওয়ায় সালোক-সংশ্লেষে সক্ষম।	(6) সালোকসংশ্লেষে সক্ষম নয়।
(7) সাধারণত পরাগযোগে সাহায্য করে না (ব্যতিক্রম মুসাণ্ডা)।	(7) পরাগযোগে সাহায্য করাই দলমণ্ডলের প্রধান কাজ।

5. একটি নিউক্লিয়সের গঠন বর্ণনা কর। কোষের সজীব পদার্থগুলির নাম কর এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের পার্থক্য দেখাও।

6. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ

(ক) মেটাপ্লাসটিক বস্তু, (খ) কোষরস, (গ) প্লাসটিড, (ঘ) সেণ্ট্রোজোম, (ঙ) প্লাজমালিমা, (চ) গলগিবস্তু, (ছ) মাইটোকন্ড্রিয়া, (জ) নিউক্লিয়স ও (ঝ) প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকল।

● নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন [*Objective Questions*]ঃ

7. বাঁদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত করঃ

বাঁদিক	ডানদিক
(ক) উদ্ভিদকোষে	সেণ্ট্রোজোম থাকে।
(খ) শ্বেতসার উদ্ভিদকোষে	প্লাসটিড থাকে।
(গ) প্রাণিকোষে	বিপাকজাত পদার্থ।

8. বন্ধনী হইতে উপযুক্ত শব্দ নির্বাচন দ্বারা বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করঃ

(ক) কোষের মগজ হইল—(মাইটোকন্ড্রিয়া, নিউক্লিয়স, গলগিবস্তু)।

(খ) সকল উদ্ভিদ-কোষেই থাকে—(প্লাসটিড, সেন্ট্রিওল, মেটাপ্লাস্টিক বস্তু)।

(গ) কোষগহ্বর পূর্ণ থাকে—(ভ্যাকুওলে, সাইটোপ্লাজমে, কোষরসে)।

(ঘ) নিউক্লিয়স বাদে প্রোটোপ্লাজমের বাকি অংশকে বলে—(সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়স, কোষরস)।

9. শূন্যস্থান পূর্ণ করঃ

(ক) কোষে আবদ্ধ প্রোটোপ্লাজমের চলনকে—বলে।

(খ) নিউক্লিয়সের আবিষ্কর্তার নাম—।

(গ) —নামে বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

(ঘ) —প্রোটোপ্লাজমকে 'প্রাণের ভৌত ভিত্তি' বলেন।

(ঙ) কোষ নামটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন—।

(চ) কোষতত্ত্বের প্রবক্তা—ও—।

10. মৌখিক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

(ক) শুক্রগতি কাহাকে বলে? (খ) সাইক্লোসিস কথাটির অর্থ কি? (গ) উদ্ভিদ কোষের কোষ-প্রাকার সজীব না নির্জীব? (ঘ) আদর্শ কোষ বলিতে কি বোঝ? (ঙ) প্লাসমোডেসমাটা কি? (চ) প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকল কাহাকে বলে? (ছ) প্রোটোপ্লাজমের নামকরণ কে করেন? (জ) গলগিবস্তুর আবিষ্কর্তা কে? (ঝ) প্রোটোপ্লাজমের চরিত্র কিরূপ? (ঞ) উদ্ভিদমূলে প্লাসটিড থাকে কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়

● **সাধারণ প্রশ্ন** (*General Questions*) ঃ

1. কোষ কেন বিভাজিত হয়? দেহকোষ বিভাজনের তাৎপর্য কি? আমাইটোসিস প্রক্রিয়া কিভাবে কোথায় চলে?

2. মাইটোসিস বিভাজন কাহাকে বলে এবং কোথায় হয়? মাইটোসিসের বিভিন্ন দশার নাম কর। প্রত্যেকটি দশার ছবি আঁকিয়া লেবেল কর।

3. আমাইটোসিস ও মাইটোসিসের পার্থক্য দেখাও। মাইটোসিসকে ইকুয়েশানাল বিভাজন বলা হয় কেন? মায়োসিসের তাৎপর্য কি?

4. সংবহন কাহাকে বলে? উদ্ভিদদেহে দুই প্রকার সংবহন-কোষের গঠন বর্ণনা কর।

5. মায়োসিস কোথায় ঘটে? মায়োসিস বিভাজনের পরিণতি কি? এক্ষেত্রে একটি কোষ থেকে সর্বমোট কয়টি কোষ উৎপন্ন হয়?

6. ভাজক কলা কাহাকে বলে? ভাজক কলা ও স্থায়ী কলার প্রভেদ কি? কয়েকটি জটিল কলা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দাও।

7. একটি সপুষ্পক উদ্ভিদে ক্রোমোজোম সংখ্যা 32 হইলে, ঐ উদ্ভিদের নিম্নলিখিত অঙ্গগুলির কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা কত হইবে এবং কেন?

(ক) মূল, (খ) বীজ, (গ) শুক্রাণু ও ডিম্বাণু, (ঘ) পাতা, (ঙ) জাইগোট, (চ) ফল, (ছ) বীজ ও (জ) কাণ্ড।

8. কলা কাহাকে বলে? দুইটি আবরণী কলা ও দুইটি যোগকলার বিবরণ দাও। একটি নার্ভকলার ছবি আঁকিয়া অংশগুলি লেবেল কর এবং উহার কাজের উল্লেখ কর।

9. **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ**

(ক) সেন্ট্রোমিয়ার, (খ) বেমতন্তু, (গ) সাইটোকাইনেসিস, (ঘ) সোমা, (ঙ) আমাইটোসিস, (চ) হ্রাসকরণ বিভাজন, (ছ) প্রত্যক্ষ বিভাজন, (জ) ইন্টারফেজ, (ঝ) ক্রোমাটিড, (ঞ) ইকুয়েশানাল বিভাজন, (ট) নিউরন, (ঠ) হৃৎপেশী, (ড) রক্ত, (ঢ) স্তরীভূত কলা, (ণ) আবরণী কলা, (ত) জাইলেম, (থ) ফ্লোয়েম, (দ) ট্রাকীড, (ধ) স্ক্লেরাইড, (ন) ক্যালাস প্যাড, (প) র‍্যাঁভিয়ে পর্ব ও (ফ) সাইনাপস।

● **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন** [*Objective Questions*] ঃ

10. **বাঁদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত কর ঃ**

বাঁদিক	ডানদিক
(ক) আমাইটোসিসে ক্রোমোজোমের সংখ্যা	দ্বিগুণ হয়।
(খ) মায়োসিসে ক্রোমোজোমের সংখ্যা	অর্ধেক হয়।
(গ) মাইটোসিসে ক্রোমোজোমের সংখ্যা	সমান থাকে।
(ঘ) নিউক্লিয়স যে প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয় তাহাকে	সাইটোকাইনেসিস বলে।

13.4. পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবকের পার্থক্য [*Differences between Androecium and Gynoecium*] :

পুংস্তবক (Androecium)	স্ত্রীস্তবক (Gynoecium)
(1) এটি ফুলের তৃতীয় স্তবক।	(1) এটি ফুলের কেন্দ্রস্থ চতুর্থ স্তবক।
(2) এটি পুংলিঙ্গধর অংশ।	(2) এটি স্ত্রীলিঙ্গধর অংশ।
(3) এটি দেখতে স্ফীতাগ্র দণ্ডের মতো।	(3) এটি দেখতে ফ্লাস্কের মতো।
(4) পুংস্তবকের এক একটি একককে **পুংকেশর** (Stamen) বলে।	(4) স্ত্রীস্তবকের এক একটি একককে **গর্ভপত্র** (Carpel) বলে।
(5) **পুংদণ্ড** ও **পরাগধানী**—এই দুটি অংশে পুংকেশর বিভক্ত।	(5) ডিম্বাশয়, গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড—এই তিনটি অংশে গর্ভপত্র বিভক্ত।
(6) পরাগধানীর মধ্যে **রেণু** বা পরাগ উৎপন্ন হয়।	(6) ডিম্বাশয়ে ডিম্বক উৎপন্ন হয়।
(7) পুংকেশরের শীর্ষে অর্থাৎ পরাগধানীতে পরাগ উৎপন্ন হয়।	(7) গর্ভপত্রের শীর্ষে—অর্থাৎ গর্ভমুণ্ডে পরাগ গৃহীত হয়।
(8) পরাগনালিকায় শুক্রাণু গঠিত হয়।	(8) ডিম্বকমধ্যস্থ ভ্রূণস্থলীতে (Embryo sac) ডিম্বাণু গঠিত হয়।
(9) নিষেকের পর পুংস্তবক শুকিয়ে যায়।	(9) নিষেকের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গর্ভমুণ্ড ও গর্ভদণ্ড **শুকিয়ে যায়।**
(10) পুংস্তবক ফলের সঙ্গে কদাচিৎ যুক্ত থাকে।	(10) ডিম্বাশয় পরিবর্তিত হয়ে ফল গঠিত হয়।

13.5. সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ফুল [*Complete and Incomplete flowers*] :

● **সম্পূর্ণ ফুলের সংজ্ঞা** (Definition of a complete flower) : **যে ফুলে বৃতি, দলমণ্ডল, পুংকেশরচক্র এবং গর্ভকেশরচক্র—এই চারটি স্তবকের সব কটিই থাকে, সেই ফুলকে সম্পূর্ণ ফুল** (Complete flower) **বলে।**

উদাহরণ—**সরিষা**, জবা, বেগুন, বকফুল প্রভৃতি সম্পূর্ণ ফুল।

● **অসম্পূর্ণ ফুলের সংজ্ঞা** (Definition of an incomplete flower) : **যে ফুলে বৃতি, দলমণ্ডল, পুংকেশরচক্র ও গর্ভকেশরচক্র—এই চারটি**

স্তবকের মধ্যে যে কোন এক বা একাধিক স্তবক অনুপস্থিত থাকে, সেই ফুলকে অসম্পূর্ণ ফুল বলে।

উদাহরণ—কুমড়া, লাউ, কচু প্রভৃতি অসম্পূর্ণ ফুল।

বৃতি, দলমণ্ডল ফুলের **সাহায্যকারী স্তবক** (Accessory whorl) এবং পুংকেশরচক্র ও গর্ভকেশরচক্র অত্যাবশ্যকীয় স্তবক (Essential whorl)। সাধারণত সাহায্যকারী স্তবক জননে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না। তবে কীটপতঙ্গ আকর্ষণ করার কাজে সাহায্যকারী স্তবকের ভূমিকা আছে। অত্যাবশ্যকীয় স্তবক জননকোষ গঠন করে।

13.6. সাহায্যকারী ও অত্যাবশ্যকীয় স্তবক *[Accessory and Essential whorls]* :

● **সাহায্যকারী স্তবকের সংজ্ঞা** (Definition of accessory whorl) **: অন্যান্যভাবে সহায়তা করলেও ফুলের বৃতি, দলমণ্ডল নামক যে দু'টি স্তবক জননে সরাসরি অংশগ্রহণ করে না তাদের সাহায্যকারী স্তবক বলে।**

● **অত্যাবশ্যকীয় স্তবকের সংজ্ঞা** (Definition of essential whorl) **: ফুলের পুংকেশরচক্র ও গর্ভকেশরচক্র নামক যে দু'টি স্তবক জনন-কোষ উৎপাদন দ্বারা জননক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করে তাদের অত্যাবশ্যকীয় স্তবক বলে।**

13.7. পুষ্পপত্রবিন্যাস *[Aestivation]* :

● **সংজ্ঞা** (Definition) **: পুষ্পমুকুলে বৃত্যংশ বা দলাংশের বিশেষ সজ্জারীতিকে পুষ্পবিন্যাস বা এস্টিভেশান বলে।**

পুষ্পপত্রবিন্যাস বিভিন্ন প্রকার, যেমন—

(1) **ভালভেট** (Valvate) : এক্ষেত্রে পুষ্পপত্রের (বৃত্যংশ বা দলাংশের) প্রান্তগুলি পরস্পরকে কেবল স্পর্শ ক'রে থাকে অথবা খুব কাছাকাছি বিন্যস্ত থাকে কিন্তু কখনই একে অন্যকে আবৃত করে না।

উদাহরণ—**আতা, কাঁঠালিচাঁপা, লজ্জাবতী** ইত্যাদি।

(2) **টুইস্টেড** (Twisted) : এক্ষেত্রে প্রতিটি পুষ্পপত্রের একপ্রান্ত পাশের পুষ্পপত্রটিকে আংশিকভাবে আবৃত রাখে।

উদাহরণ—**জবা, করবী** ইত্যাদি।

(3) **ইমব্রিকেট** (Imbricate) : এক্ষেত্রে পাশাপাশি দুটি বৃত্যংশ **বা** দলাংশের মধ্যে অন্ততঃ একটির দু'প্রান্ত আবৃত থাকে এবং একটির দু'প্রান্ত অনাবৃত থাকে ; বাকি পুষ্পপত্রগুলি টুইস্টেড প্রকৃতিতে সজ্জিত থাকে।

উদাহরণ—**কালকাসুন্দা, কৃষ্ণচূড়া** ইত্যাদি।

(4) **ভেক্সিলারী** (Vexillary) : এই ধরনের পুষ্পপত্রবিন্যাস **মটর** গোত্রীয় ফুলের **প্রজাপতিসম দলের** (Papilionaceous corolla) বিশেষত্ব।

বাঁদিক	ডানদিক
(ঙ) সাইটোপ্লাজম যে প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয় তাহাকে	ক্যারিওকাইনেসিস বলে।
(চ) ক্রমাগত বিভক্ত হওয়ার ক্ষমতা-সম্পন্ন কলা-ই হইল	স্থায়ীকলা।
(ছ) বিভাজন ক্ষমতা নাই এমন কলা হইল	ভাজক কলা।

11. **পাশের বন্ধনী-মধ্যস্থ উপযুক্ত শব্দ দ্বারা বাক্য সম্পূর্ণ কর:**

(ক) বিভাজিত হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুতকারী কোষকে বলা হয়—(**ইণ্টারফেজ কোষ, অপত্যকোষ, অপরিণত কোষ**)।

(খ) দুই প্রস্থ ক্রোমাটিড দুই মেরুর দিকে যাত্রা করে—(**অ্যানাফেজে, মেটাফেজে, প্রোফেজে**)।

(গ) জননকোষ বিভাজনের নাম—(**মাইটোসিস, আমাইটোসিস, মায়োসিস**)।

(ঘ) পেঁয়াজের মূলাগ্রের কোষ যে পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়, তাহার নাম—(**আমাইটোসিস, মাইটোসিস, মায়োসিস**)।

(ঙ) মেটাফেজে দুই প্রস্থ অপত্য ক্রোমোজোম অবস্থান করে—(**বিষুবপ্রদেশে, মেরুপ্রদেশে, মধ্যদেশে**)।

(চ) সীভ-টিউবের ছিদ্রযুক্ত প্রস্থপ্রাকারের নাম—(**ক্যালাস প্যাড, সীভপ্লেট, প্লাসমোডেসমাটা**)।

(ছ) নার্ভকোষের লম্বা সুতার মত উপবর্ধিত অংশই হইল—(**নিউরন, অ্যাকসন, ফ্ল্যাজেলা**)।

12. **শূন্যস্থান পূর্ণ কর:**

(ক) রক্তের শ্বেত কণিকায় আমাইটোসিস প্রক্রিয়াটি—লক্ষ্য করেন।

(খ) ক্রোমোজোম মাতাপিতার—বহন করে।

(গ) —-এর উপস্থিতি প্রাণিকোষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

(ঘ) প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বি বিদীর্ণ হইয়া দ্বিগুণ সংখ্যক—গঠন করে।

(ঙ) —মূলাগ্রে মাইটোসিস প্রক্রিয়াটি অতি সহজে পরীক্ষা করা যায়।

(চ) দেহগঠনে অংশগ্রহণকারী কোষকে—বলে।

(ছ) — দশায় সংলগ্ন দুই সেণ্ট্রোমিয়ারের বিকর্ষণ সুরু হয়।

(জ) বিভাজনোন্মুখ কোষকে—কোষ বলে।

(ঝ) যে নার্ভ মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড হইতে আবেগকে পেশীতে বহন করে, তাহাকে—নার্ভ বলে।

(ঞ) দুই নিউরনের সংযোগস্থলকে—বলে।

সপ্তম অধ্যায়

সাধারণ প্রশ্ন (*General Questions*)ঃ

1. অভিব্যক্তি কথাটির অর্থ কি? বিসৃষ্টিবাদ ও জৈব অভিব্যক্তির প্রভেদ কি? লামার্কের মতবাদ সংক্ষেপে ব্যক্ত কর।

2. প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ কি? এই মতবাদের প্রবক্তা কে? তাঁহার সহযোগীর নাম কর।

3. অভিব্যক্তির স্বপক্ষে যে-সকল প্রমাণ উপস্থাপিত করা হইয়াছে, সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

4. অভিযোজন কাহাকে বলে? উদ্ভিদ ও প্রাণী হইতে উদাহরণ দিয়া কোথায় কিভাবে অভিযোজন ঘটিয়াছে তাহা উল্লেখ কর।

5. বংশগতি বলিতে কি বোঝ? মেণ্ডেলের বংশগতির নিয়মগুলি কি? মেণ্ডেলের নিয়মের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে তোমার ব্যক্তিগত মতামত কি?

6. **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ**

(ক) নয়া ডারউইনবাদ, (খ) জীবাশ্ম, (গ) সংযোগরক্ষাকারী প্রাণী, (ঘ) মিউটেশান, (ঙ) জীবন সংগ্রাম, (চ) ব্যবহার ও অব্যবহারের আইন, (ছ) গৌণ অভিযোজন, (জ) বংশগতি, (ঝ) সংকর, (ঞ) মেণ্ডেলবাদ।

অষ্টম অধ্যায়

সাধারণ প্রশ্ন (*General Questions*)ঃ

1. নিম্নলিখিত উদ্ভিদগুলির যে-কোন একটির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও জীবন-ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করঃ (ক) **সরিষা,** (খ) **ধান**।

2. ফার্ণ কোন্ শ্রেণীর উদ্ভিদ? ফার্ণের দেহে জনুক্রম দেখা যায় কি? ফার্ণের জীবন-ইতিহাস আলোচনা করিয়া কিভাবে জনুক্রম ঘটে, ছকের সাহায্যে দেখাও।

3. মস কোথায় জন্মায়? মসের দেহ গ্যামেটোফাইট না স্পোরোফাইট? মসের জীবন-ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

4. মিউকোর কোন্ গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদ? ইহা কোথায় জন্মায়? মিউকোরের জননপদ্ধতি সংক্ষেপে বল।

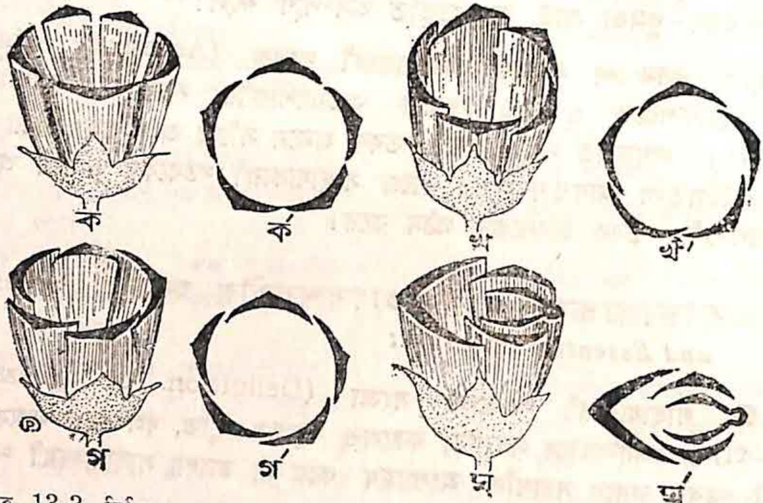
5. একটি স্পাইরোগাইরার গঠন-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। স্পাইরোগাইরা সালোক-সংশ্লেষ চালাইতে পারে কি? স্পাইরোগাইরার জননের বিশেষত্ব দেখাও।

6. কেঁচো কোন্ পর্বভুক্ত প্রাণী? ক্লাইটেলম কি? কেঁচোর পৌষ্টিকতন্ত্রের ছবি আঁকিয়া বিভিন্ন অংশ লেবেল কর।

7. কেঁচোর হৃৎপিণ্ডের প্রকৃতি কিরূপ? কেঁচোর কয়েকটি প্রধান রক্তবাহের নাম কর।

8. নেফ্রোস্টোম কি? একটি আদর্শ নেফ্রিডিয়মের গঠন বর্ণনা কর। ইহাদের কাজ কি?

পাঁচটি দলাংশের মধ্যে একটির নাম **ধ্বজা** (Vexillum or Standard)। ধ্বজা আংশিকভাবে **পক্ষ** (Wing) দুটিকে ঢেকে রাখে। অনুরূপভাবে পক্ষ



চিত্র 13·3—বিভিন্ন প্রকার পুষ্পপত্রবিন্যাসঃ ক-ক´—ভালভেট ; খ-খ´—টুইস্টেড ; গ-গ´—ইমব্রিকেট ; ঘ-ঘ´—ভেক্সিলারী।

টিও নৌকাকৃতি (Boat-shaped) যুগ্ম **তরীদল** (Keel or Carina)-কে আবৃত রাখে।

উদাহরণ—**অপরাজিতা, বকফুল, মটর** ইত্যাদি।

13.8. স্ত্রীপুষ্প ও পুংপুষ্প [*Female flower and Male flower*] :

● **স্ত্রীপুষ্পের সংজ্ঞা** (Definition of Pistillate flower) ঃ **অসম্পূর্ণ এবং একলিঙ্গ যে ফুলে গর্ভকেশর থাকে কিন্তু পুংকেশর থাকে না তাকে স্ত্রী-পুষ্প** (Pistillate flower) **বলে।**

● **পুংপুষ্পের সংজ্ঞা** (Definition of Staminate flower) ঃ অসম্পূর্ণ ও একলিঙ্গ যে ফুলে পুংকেশর থাকে, কিন্তু গর্ভকেশর থাকে না তাকে **পুং-পুষ্প** (Staminate flower) বলে।

উদাহরণ—**কুমড়া, লাউ, পেঁপে, তাল, কচু, ডুমুর** প্রভৃতিতে উভয় প্রকার পুষ্প দেখা যায়।

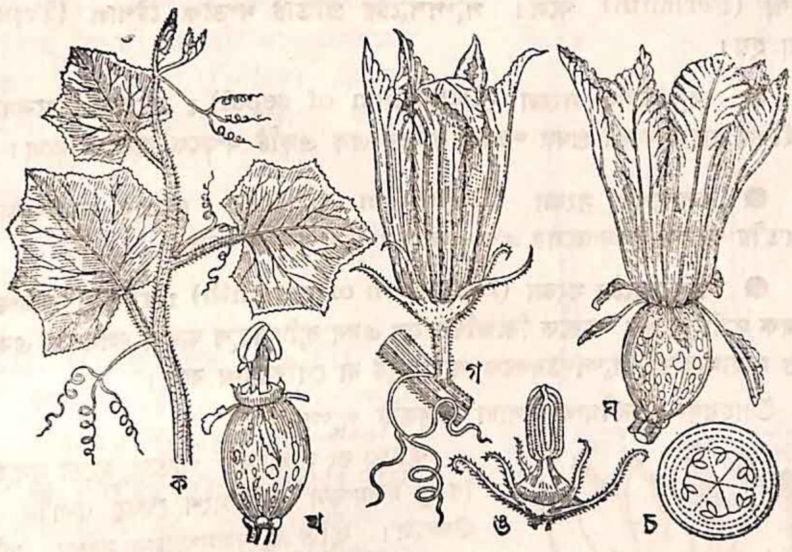
13.9. একলিঙ্গ ও উভলিঙ্গ পুষ্প [*Unisexual and Bisexual Flowers*] :

● **একলিঙ্গ পুষ্পের সংজ্ঞা** (Definition of unisexual flower) ঃ **যে ফুলে পুং অথবা স্ত্রী স্তবক যে কোন একটি থাকে তাকে একলিঙ্গ** (Unisexual) **পুষ্প বলে।**

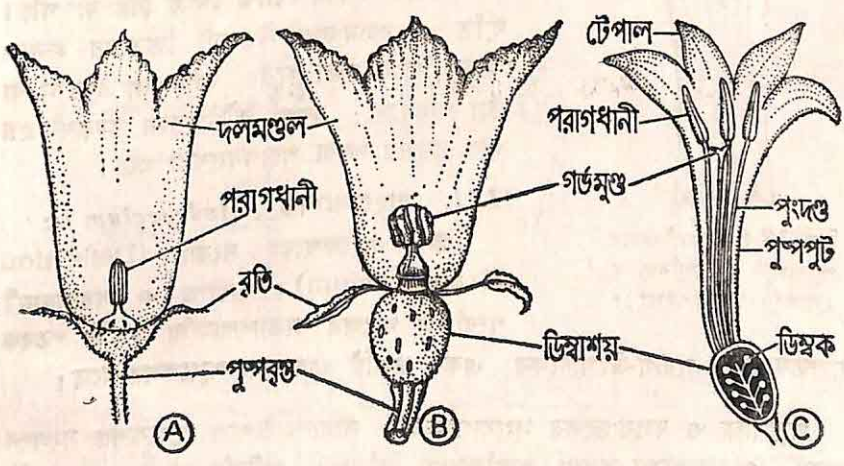
উদাহরণ—**কুমড়া, লাউ, ডুমুর, কচু, রাংচিতা** প্রভৃতির ফুল একলিঙ্গ।

● উভলিংগ পুষ্পের সংজ্ঞা (Definition of bisexual flower) : যে ফুলে পুং ও স্ত্রী উভয় স্তবকই থাকে তাকে উভলিংগ (Bisexual or Hermaphrodite) পুষ্প বলে।

উদাহরণ—জবা, বেগুন, সরিষা, নয়নতারা, রজনীগন্ধা ইত্যাদি ফুল।



চিত্র 13.4: ক—কুমড়া গাছের অংশ ; খ—দল অপসারণ করার পর স্ত্রী-পুষ্প ; গ—পুং-পুষ্প ; ঘ—স্ত্রী-পুষ্প ; ঙ—দল অপসারণ করার পর পুং-পুষ্প; চ—গর্ভাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ।



চিত্র 13.5—A ও B একলিংগ পুষ্প—কুমড়া: A—কুমড়ার পুংপুষ্প ; B—কুমড়ার স্ত্রীপুষ্প ; C—উভলিংগ পুষ্প—রজনীগন্ধা।

9. কে'চো একলিঙ্গ না উভলিঙ্গ প্রাণী? কে'চোর জনন-তন্ত্রের ছবি আঁকিয়া বিভিন্ন অংশ লেবেল কর।

10. ছবির সাহায্যে মাছের বহিরাকৃতি বর্ণনা কর।

11. শ্বসন কি? মাছের ফুলকার গঠন কিরূপ? মাছ কিভাবে শ্বাসকার্য চালায়?

12. অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র কাহাকে বলে? মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের কার্যকলাপ দেখাও। জিওল মাছে কি ধরনের শ্বাসযন্ত্র থাকে?

13. জিওল মাছও জলে ডুবিয়া মরে কেন তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর।

14. নিম্নলিখিত প্রাণীর মধ্যে যে-কোন একটির বহিরাকৃতি চিত্রযোগে বর্ণনা কর: (ক) টিকটিকি, (খ) ব্যাঙ, (গ) গিনিপিগ।

15. মস ও ফার্ণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখাও।

16. মিউকোর ও স্পাইরোগাইরার জীবনধারণ প্রণালীর পার্থক্য কর।

17. অস্থিময় ও তরুণাস্থিময় মাছের পার্থক্য কর।

18. কুনো ব্যাঙ ও সোনা ব্যাঙের মধ্যে পার্থক্যগুলি কি কি?

19. কুনো ব্যাঙ ও টিকটিকির পার্থক্যগুলি সারিবদ্ধ কর।

20. টিকটিকি ও গিনিপিগের পার্থক্য দেখাও।

21. কুনো ব্যাঙ ও গিনিপিগের পার্থক্য নিরূপণ কর।

22. **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ:**

(ক) প্রোথেলস, (খ) অণুমঞ্জরী, (গ) সোরস, (ঘ) স্পোরোফাইট, (ঙ) ভিন্নবাসী উদ্ভিদ, (চ) রেণুধারণ কলা, (ছ) জনুক্রম, (জ) মাইসেলিয়ম, (ঝ) স্পোরোগোনিয়ম, (ঞ) জাইগোস্পোর, (ট) পাইরিনয়েড, (ঠ) প্রোস্টোমিয়ম, (ড) টিফলোসোল, (ঢ) নেফ্রিডিওপোর, (ণ) নেফ্রিডিয়ম, (ত) শুক্রধানী, (থ) পটকা, (দ) অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র, (ধ) উপপল্লব, (ন) স্পর্শেন্দ্রিয় পার্শ্বরেখা, (প) ব্যাঙের অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদের বৈশিষ্ট্য, (ফ) অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র ও (ব) টিকটিকির পায়ের বৈশিষ্ট্য।

● নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন [*Objective Questions*]:

23. **বাঁদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত কর:**

বাঁদিক	ডানদিক
(ক) ফার্ণের দেহ একটি	গ্যামেটোফাইট।
(খ) মসের দেহ একটি	স্পোরোফাইট।
(গ) কে'চোর পার্শ্ব অন্ননালী রক্তবাহ	গিজার্ড, গ্রাসনালী ও গলবিলকে **রক্ত** সরবরাহ করে।
(ঘ) পৃষ্ঠরক্তবাহ	কে'চোর দেহের অগ্রভাগ হইতে **দূষিত** রক্ত গ্রহণ করে।
(ঙ) জিওল মাছ অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের দ্বারা	জলে দ্রব অক্সিজেন গ্রহণ করে।
(চ) মাছ ফুলকার সাহায্যে	ডাঙার বাতাসের অক্সিজেন গ্রহণ **করে।**

24. **পাশের বন্ধনী হইতে উপযুক্ত শব্দ বসাইয়া বাক্য সম্পূর্ণ কর :**

(ক) মেরুদণ্ডী প্রাণীর কেন্দ্রীয় রক্ত সরবরাহকারী যন্ত্রটির নাম—**(বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুলকা)।**

(খ) মাছের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল—**(আঁশ, লেজ, পাখনা)।**

(গ) কেঁচো সঙ্গমকালে যে অঙ্গটিতে অন্য কেঁচোর শুক্র জমা রাখে, তাহার নাম—**(নেফ্রিডিয়া, ডিম্বস্থলী, স্পারম্যাথিকা)।**

(ঘ) নেফ্রিডিয়ামের ভিতরের উন্মুক্ত সিলিয়াযুক্ত ফানেলাকৃতি অংশটি—**(নেফ্রোস্টোম, গলথিল, নেফ্রিডিওপোর)।**

(ঙ) কেঁচোর অন্ত্রনালীর পৃষ্ঠদেশের বিশেষ ভাঁজটির নাম—**(আন্ত্রিক সিকা, টিফলোসোল, প্রোস্টোমিয়াম)।**

(চ) মিউকোরের দেহ যে অসংখ্য ও শাখাবিশিষ্ট সুতার ন্যায় অঙ্গ দ্বারা গঠিত, তাহাকে বলে—**(হাইফা, মাইসেলিয়াম, রেণুস্থলী)।**

(ছ) একই উদ্ভিদ দেহে পুংধানী ও স্ত্রীধানী উৎপন্ন হইলে উদ্ভিদটি—**(সহবাসী, ভিন্নবাসী, উভলিঙ্গ)।**

25. **শূন্যস্থান পূর্ণ কর :**

(ক) ধানের ফলকে—বলে।

(খ) লম্বা গুঁড়িবিশিষ্ট ফার্ণকে—বলে।

(গ) ফার্ণের রেণু হইতে অঙ্কুরিত সবুজ ও চ্যাপ্টা হৃৎপিণ্ডাকৃতি অংশটির নাম—।

(ঘ) নিষিক্ত ডিম্বাণু—গঠন করে।

(ঙ) জননকোষ দুইটি মিলিতে সক্ষম না হইলে—গঠিত হয়।

(চ) কেঁচোর অর্ধচন্দ্রাকৃতি ঠোঁটের মত অংশটিকে—বলে।

(ছ) কেঁচোর প্রধান রেচন অঙ্গকে—বলে।

26. **মৌখিক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

(ক) কেঁচোর হৃৎপিণ্ড কিরূপ? (খ) মাছের বায়ুথলির ভূমিকা কি? (গ) জিওল মাছ কেন অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র ব্যবহার করে? (ঘ) মেরুদণ্ডীর গুরুত্ব-পূর্ণ পরিপাকগ্রন্থির নাম কি? (ঙ) কেঁচোর সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎভাগ কিভাবে চেনা যায়? (চ) পীতকোষ কাহাকে বলে, ইহার ভূমিকা কি? (ছ) কেঁচোর রক্তের গঠন কিরূপ? ইহাদের হিমোগ্লোবিন কোথায় থাকে? (জ) স্ক্যালারিফর্ম জনন কথাটির অর্থ কি? কোথায় ইহা দেখা যায়? (ঝ) আইসোগ্যামি কাহাক বলে? ইহার একটি উদাহরণ দাও। (ঞ) প্রোটোনিমা কোথায় কিভাবে গঠিত হয়? (ট) ক্যালিপট্রা কি এবং কোথায় হয়? (ঠ) সোরসের গঠন কিরূপ? ইহাকে কোথায় কিরূপে দেখা যায়?

নবম অধ্যায়

● **সাধারণ প্রশ্ন** (*General Questions*) :

1. ধুতরা গাছের বহিরাকৃতি বর্ণনা কর।

2. চিত্রযোগে ধুতরা ফুলের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর। ধুতরা পাতার আকৃতি কিরূপ? ইহাতে কি ধরনের শিরাবিন্যাস দেখা যায়?

13.10. বৃত্যংশ, দলাংশ ও টেপাল [*Sepal, Petal and Tepal*] :

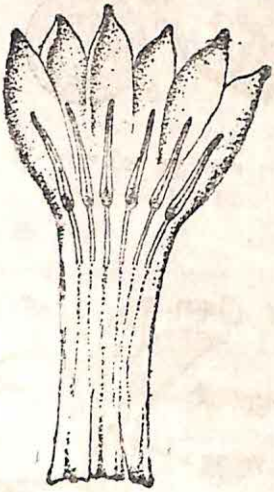
সাধারণত ফুলে বৃত্যংশ ও দলাংশ পৃথক পৃথক স্তবক রচনা করে। কিন্তু **কোন কোন ফুলে স্তবক দুটিকে পৃথক করা যায় না, কারণ সেগুলি হয় বৃত্যংশের মতো নয় তো দলাংশের মতো। এরূপ স্তবককে পুষ্পপুট বা পেরি-য়্যান্থ** (Perianth) **বলে। পুষ্পপুটের প্রতিটি খণ্ডকে টেপাল** (Tepal) বলা হয়।

● **বৃত্যংশের সংজ্ঞা** (Definition of sepal) **: ফুলের একেবারে বাইরের সাহায্যকারী প্রথম স্তবক বৃতির এক একটি খণ্ডকে বৃত্যংশ বলে।**

● **দলাংশের সংজ্ঞা** (Definition of petal) **: ফুলের সাহায্যকারী দ্বিতীয় স্তবক দলমণ্ডলের এক একটি খণ্ডকে দলাংশ বলে।**

● **পুষ্পপুটের সংজ্ঞা** (Definition of perianth) **: বৃতি ও দলমণ্ডল নামক দুটি পৃথক স্তবকে বিভেদিত নয় এমন বৃতিসদৃশ অথবা দলসদৃশ একটি মাত্র সাহায্যকারী পুষ্পস্তবককে পুষ্পপুট বা পেরিয়্যান্থ বলে।**

উদাহরণ—**রজনীগন্ধার সাদা স্তবকটি** পুষ্পপুট।



চিত্র 13·6—রজনীগন্ধার পুষ্পপুট বা পেরিয়্যান্থ (সংলগ্ন পুংকেশরসহ)।

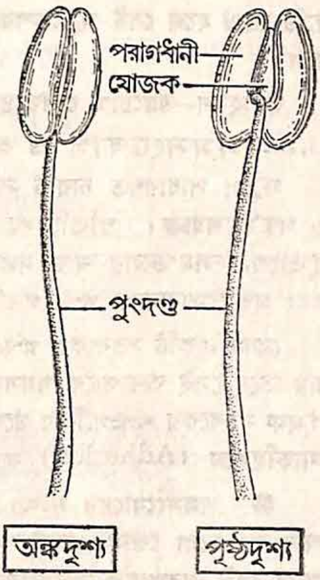
বৃতির রং সাধারণত পাতার মতো **সবুজ। কিন্তু** দলমণ্ডল অধিকাংশ ক্ষেত্রে রঙগীন **ও** উজ্জ্বল। বৃতি ও দলমণ্ডলের সংখ্যা প্রতি প্রজাতির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট থাকে। **একবীজ-পত্রী গাছের ফুলে বৃত্যংশ ও দলাংশের সংখ্যা প্রতি ক্ষেত্রে তিন।** কিন্তু **দ্বিবীজপত্রী গাছের ফুলে এই সংখ্যা প্রতি ক্ষেত্রে চার বা পাঁচ।** বৃতি ও দলমণ্ডল উভয়েই ভিতরের **জনন-**অঙ্গগুলিকে রক্ষা করে। দলমণ্ডল রঙগীন **বা** উগ্র গন্ধযুক্ত ; ফলে কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট **হয়** এবং তাদের দ্বারা পরাগসংযোগ ঘটে।

13.11. পুংকেশর [*Androecium*] :

● **পুংকেশরের সংজ্ঞা** (Definition of androecium) **: পুংদণ্ড ও পরাগধানী সম্বলিত ফুলের অত্যাবশ্যকীয় তৃতীয় স্তবক পুংস্তবকের পরাগ-উৎপাদকের এক একটি একককে পুংকেশর বলে।**

পুষ্পাক্ষ ও দলমণ্ডলের সংযোগস্থলের সামান্য উপরে পুংকেশর সংলগ্ন থাকে। পুংকেশরের সংখ্যা ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন। প্রতিটি পুংকেশরের দুটি অংশ—নীচের দণ্ডাকার অংশটি **পুংদণ্ড** (Filament) এবং পুংদণ্ডের উপরের

স্ফীত অংশটি **পরাগধানী** (Anther)। পরাগধানীর দ্দুটি খণ্ডের মধ্যবর্তী বিস্তৃত বিশেষ কলা দ্বারা গঠিত অংশটিকে **যোজক** (Connective) **বলে** (চিত্র 13.7)। পুংদণ্ড লম্বা অথবা ছোট। সময় সময় পুংদণ্ড একেবারেই থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাগধানী দু'খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ডের গহ্বরে **পরাগ** বা **রেণু** (Pollen) থাকে ; পরাগধানী গহ্বরকে **পরাগ গহ্বর** (Pollen sac) বলে। পুংদণ্ডের সঙ্গে পরাগধানী নানাভাবে যুক্ত থাকে ; চিত্র 13.8-এ কয়েকটি সংযোগ পদ্ধতি দেখান হল।

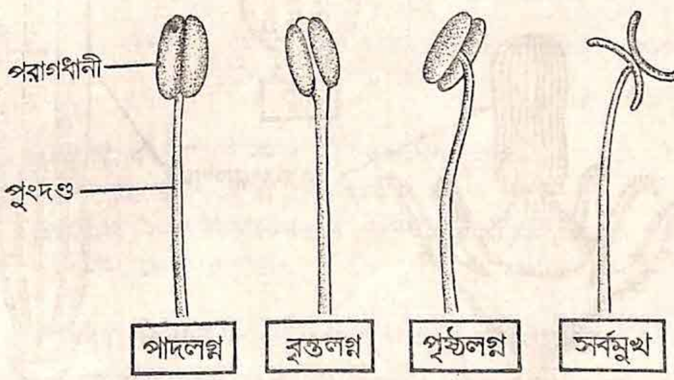


চিত্র 13.7—পুংকেশরের গঠন।

13.12. দীর্ঘচতুষ্টয়ী ও দীর্ঘদ্বয়ী পুংকেশর *[Tetradynamous and Didynamous stamens]* :

● **দীর্ঘচতুষ্টয়ী পুংকেশরের সংজ্ঞা** (Definition of tetradynamous stamens) ঃ **ফুলে ছটি পুংকেশরের মধ্যে ভিতরের চারটি বড় এবং বাইরের দুটি তুলনামূলকভাবে ছোট হলে সেই পুংকেশরকে দীর্ঘচতুষ্টয়ী পুংকেশর বা টেট্রাডিনেমাস স্ট্যামেন বলে।**

উদাহরণ—**সরিষা** (চিত্র 13.2খ), মুলা প্রভৃতি।



চিত্র 13.8—পুংদণ্ডের সঙ্গে পরাগধানীর বিভিন্ন প্রকার সংযোগ ঃ পাদলগ্ন (Basifixed) ; বৃন্তলগ্ন (Adnate) ; পৃষ্ঠলগ্ন (Dorsifixed) ; সর্বমুখ (Versatile)।

দশম অধ্যায়

সাধারণ প্রশ্ন (*General Questions*) ঃ

1. মূলের সংজ্ঞা দাও। ছবি আঁকিয়া মূলের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা কর। পরবর্তিত মূল কাহাকে বলে?

2. অস্থানিক মূল কাহাকে বলে? কয়েকটি অস্থানিক মূলের উদাহরণ দাও। খাদ্য সঞ্চয়কারী অস্থানিক মূলের নাম কর।

3. প্রধানমূল, শাখামূল ও অস্থানিক মূলের পার্থক্য কি? চিত্রের মাধ্যমে কয়েকটি অস্থানিক মূলের উদাহরণ দাও এবং তাহাদের কাজের উল্লেখ কর।

4. নিম্নলিখিত উদ্ভিদগুলির যে অংশ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, চিত্র ও কারণসহ তাহাদের অঙ্গসংস্থানগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর ঃ

(ক) মূলা, (খ) রাঙা আলু, (গ) শালগম বা বীট ও (ঘ) গাজর।

5. মূলের সাধারণ কাজ কি? ইহা কি কি বিশেষ কাজ করে? পরিবর্তিত অস্থানিক মূলের বিশেষ কাজ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

6. মূলজ প্রেষ কাহাকে বলে? মূলজ প্রেষের একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

7. মূলের বিভিন্ন পরিবর্তন কোথায় হয় এবং কেন হয়? ইহাতে কি কি সুবিধা হয় তাহা উদাহরণযোগে উল্লেখ কর।

8. অভিস্রবণ কাহাকে বলে? মাটি হইতে জল শোষণে অভিস্রবণের ভূমিকা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ কর।

9. **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ**

(ক) আত্তীকরণ মূল, (খ) ভেলামেন, (গ) শ্বাসমূল, (ঘ) ঠেশমূল, (ঙ) পরাশ্রয়ী মূল, (চ) গুচ্ছিত মূল, (ছ) চোষক মূল, (জ) কন্দমূল, (ঝ) বলয়াকৃতি মূল, (ঞ) পরিচক্র, (ট) মূলজ প্রেষ, (ঠ) অন্তঃঅভিস্রবণ, (ড) মূলজেব ও (ঢ) বহুযোজী মূলত্র।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন [*Objective Questions*] ঃ

10. **বাঁদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত কর ঃ**

বাঁদিক	ডানদিক
(ক) মূলের আগায় সব সময়	মূকুল থাকে।
(খ) মূল সর্বদাই	পর্ব ও পর্ব মধ্যে বিভক্ত।
(গ) কাণ্ড সর্বদাই	শাখামূল গঠন করে।
(ঘ) কাণ্ডের আগায় সব সময়	মূলত্র থাকে।
(ঙ) মূলের জাইলেমে সৃষ্ট ঊর্ধ্ব-চাপকে	অসমোসিস বা অভিস্রবণ বলে।
(চ) পর্দা মাধ্যমে দুইটি অসম ঘনত্ব-যুক্ত তরলের ব্যাপন-ক্রিয়াকে	মূলজ প্রেষ বলে।

11. পাশের বন্ধনী হইতে উপযুক্ত শব্দ নির্বাচন করিয়া বাক্যগুলি সম্পূর্ণ কর:

(ক) বৃহদায়তন জাইলেমগুলিকে বলে—(**মেটাজাইলেম, প্রোটোজাইলেম**)।

(খ) ঘাসের স্ফীত ও সংকুচিত মূল হইল—(**বলয়াকৃতি, গুচ্ছিত, মালাকৃতি**)।

(গ) প্রস্তুত খাদ্য যে বিশেষ মূলগুলির সাহায্যে টানিয়া লওয়া হয়, তাহার নাম—(**ভেলামেন, চোষকমূল, পরাশ্রয়ীমূল**)।

(ঘ) কেয়া, আখ প্রভৃতির অস্থানিক মূল হইল—(**স্তম্ভমূল, আরোহীমূল, ঠেসমূল**)।

(ঙ) মূলা, গাজর, শালগম প্রভৃতি হইল পরিবর্তিত—(**অস্থানিক মূল, স্থানিক মূল, কাণ্ড**)।

(চ) মূলত্রের ঠিক পিছনের অংশকে বলে—(**মূলরোম অঞ্চল, বর্ধনশীল অঞ্চল, স্থায়ী অঞ্চল**)।

(ছ) ভ্রূণমূল হইতে উৎপন্ন মূল হইল—(**অস্থানিক মূল, স্থানিক মূল, শাখা মূল**)।

12. **মৌখিক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:**

(ক) মূলের বৈশিষ্ট্য কি? (খ) মূলরোম এককোষী না বহুকোষী? কেন? (গ) অভিস্রবণের প্রয়োজনীয়তা কি? (ঘ) মূলজ প্রেষের পরীক্ষার দ্বারা কি প্রমাণিত হয়? (ঙ) ভাণ্ডারমূল কয় প্রকার, নাম কর। (চ) গুলঞ্চ-র মূলকে আত্তীকরণ মূল বলা হয় কেন? (ছ) মূল কেন পরিবর্তিত হয়? কয়েকটি পরিবর্তিত মূলের নাম কর। (জ) মূলজেব ও মূলত্রের প্রভেদ কি? বহুযোজী মূলত্র কোথায় পাওয়া যায়? (ঝ) শিফামূল কিভাবে এবং কেন গঠিত হয়?

একাদশ অধ্যায়

সাধারণ প্রশ্ন (*General Questions*):

1. কাণ্ড ও মূলের প্রভেদ কি? মুকুল কি এবং কয় প্রকার? একটি বৃহত্তম মুকুলের নাম কর।

2. কাণ্ডের বিভিন্ন অংশের নাম কর। বিরুৎ বা গুল্ম বা বৃক্ষের মধ্যে প্রভেদ কি? বর্ষজীবী, দ্বিবর্ষজীবী বলিতে কি বোঝায়?

3. রোহিণী ও ব্রততীর মধ্যে পার্থক্য কি? ইহাদের একটি করিয়া উদাহরণ দাও। ইহারা কোন্ জাতীয় উদ্ভিদ?

4. চিত্র ও উদাহরণসহ মৃৎগত পরিবর্তিত কাণ্ডগুলির উদাহরণ বর্ণনা দাও। উহারা কি কি কাজ করে?

5. চিত্র ও উদাহরণসহ নিম্নলিখিত ভক্ষ্যাংশের অঙ্গসংস্থানগত প্রকৃতি উল্লেখ কর:

(ক) গোল আলু, (খ) পেঁয়াজ, (গ) আদা বা হলুদ ও (ঘ) ওল।

6. পরিবর্তন কাহাকে বলে? তিন প্রকার ভূনিম্নস্থ কাণ্ডের চিত্র ও লেবেলসহ বর্ণনা দাও। উহাদের মূল বলা হয় কেন?

● **দীর্ঘদ্বয়ী পুংকেশরের সংজ্ঞা** (Definition of didynamous-stamen) ঃ **চারটি পুংকেশরের মধ্যে বাইরের দুটি বড় এবং ভিতরের দুটি ছোট হলে সেই পুংকেশরকে দীর্ঘদ্বয়ী পুংকেশর বা ডাইডিনেমাস স্ট্যামেন বলে।**

উদাহরণ—**রক্তদ্রোণ, শ্বেতদ্রোণ, তুলসী** প্রভৃতি।

13.13. সমসংযোগ ও অসমসংযোগ [*Cohesion and Adhesion*]:

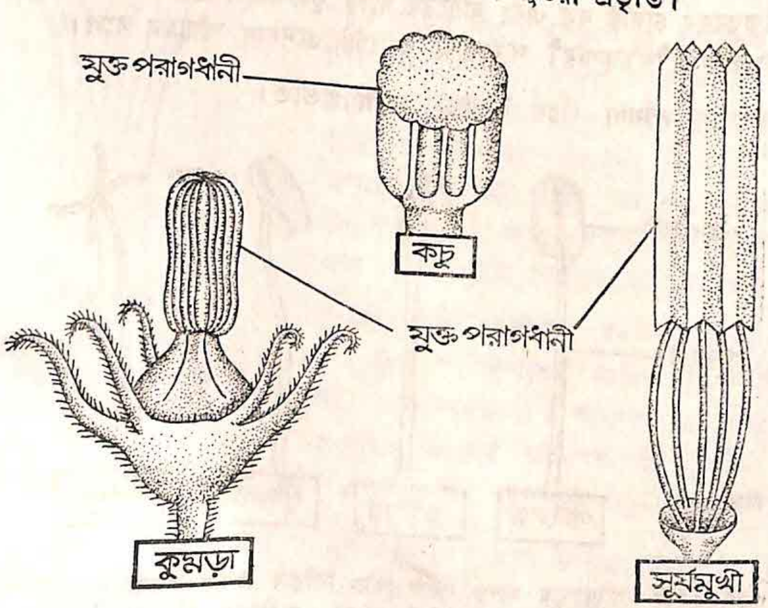
ফুলে সাধারণত চারটি স্তবক থাকে, যথা—**বৃতি, দলমণ্ডল, পুংকেশরচক্র ও গর্ভকেশরচক্র**। প্রতিটি স্তবক আবার একাধিক খণ্ডে বিভক্ত। বৃতির খণ্ড বৃত্যংশ, দলমণ্ডলের খণ্ড দলাংশ বা পাপড়ি, পুংকেশরচক্রের খণ্ড পুংকেশর এবং গর্ভকেশরচক্রের খণ্ড গর্ভপত্র।

কোন একটি স্তবকের খণ্ডগুলি যদি নিজেদের মধ্যে, অর্থাৎ পরস্পর জুড়ে যায় তবে সেই অবস্থাকে **সমসংযোগ** বা **কোহিসান** (Cohesion) বলে। দুটি পৃথক স্তবকের খণ্ডগুলির মধ্যে সংযোগ ঘটলে সেই অবস্থাকে **অসমসংযোগ** বা **অ্যাডহিসান** (Adhesion) বলে।

● **সমসংযোগের সংজ্ঞা** (Definition of cohesion) ঃ **ফুলের চারটি স্তবকের মধ্যে কোন একটি স্তবকের খণ্ডগুলি নিজেদের মধ্যে পরস্পর জুড়ে গেলে সেই অবস্থাকে সমসংযোগ বলে।**

● **সমসংযোগের প্রকারভেদ** (Variety of cohesion) ঃ

(1) **বৃত্যংশের সমসংযোগ—উদাহরণ ঃ জবা, ধুতরা প্রভৃতি।**



চিত্র 13·9—যুক্ত পরাগধানী পুংকেশর।

(2) দলাংশের সমসংযোগ—উদাহরণ : ধুতরা, কলমি, নয়নতারা প্রভৃতি।

(3) পুংকেশরের সমসংযোগ :

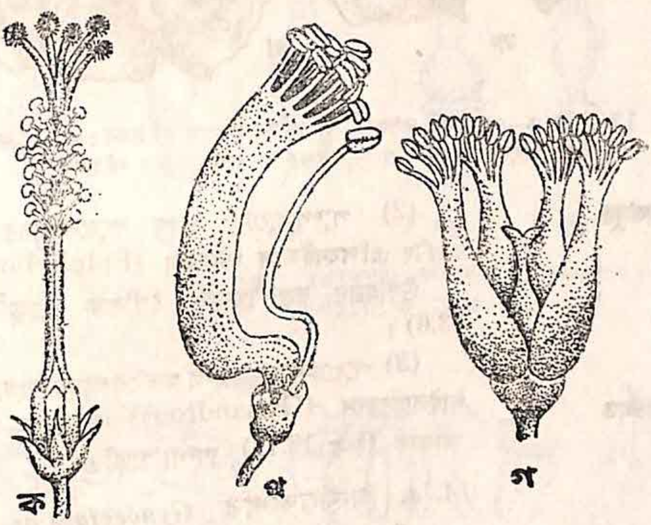
(A) যুক্তপরাগধানী বা সিন্‌জেনেসিয়াস পুংকেশর (Syngenesious Stamen)—কেবল পরাগধানী দ্বারা।

উদাহরণ—কুমড়া, সূর্যমুখী, কচু প্রভৃতি (চিত্র 13.9)।

(B) কেবল পুংদণ্ড দ্বারা (চিত্র 13.10)।

(i) একগুচ্ছ বা মোনাডেলফাস (Monadelphous)।

উদাহরণ—জবা, তুলা প্রভৃতি।



চিত্র 13.10 : ক—একগুচ্ছ পুংকেশর (জবা); খ—দ্বিগুচ্ছ পুংকেশর (বকফুল); গ—বহুগুচ্ছ পুংকেশর (লেবু)।

(ii) একগুচ্ছ বা ডায়াডেলফাস (Diadelphous)।

উদাহরণ—বকফুল, অপরাজিতা প্রভৃতি।

(iii) বহুগুচ্ছ বা পলিআডেলফাস (Polyadelphous)।

উদাহরণ—শিমুল, লেবু প্রভৃতি।

(4) গর্ভপত্রের সমসংযোগ—উদাহরণ : জবা, ঢেঁড়স প্রভৃতি।

● অসমসংযোগের সংজ্ঞা (Definition of adhesion) : ফুলের চারটি স্তবকের মধ্যে যে কোন দুটি পৃথক স্তবকের খণ্ডগুলি পরস্পর জুড়ে গেলে সেই অবস্থাকে অসমসংযোগ বলে।

7. উদ্ভিদ-অঙ্গের রূপান্তর বলিতে কি বোঝ? পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত কাণ্ডের প্রধান পার্থক্য কি? কয়েকটি রূপান্তরিত কাণ্ডের বর্ণনা দাও এবং প্রতি ক্ষেত্রে উহাদের বিশেষ কাজের উল্লেখ কর।

8. কোনও উদ্ভিদের একটি ভূনিম্নস্থ অঙ্গ তোমাকে দেওয়া হইল,—উহা মূল না কাণ্ড বহিরাকৃতি দেখিয়া তাহা কিভাবে নিরূপণ করিবে?

9. চিত্রের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, (ক) ধারক, (খ) গ্রন্থিকাণ্ড এবং (গ) সময় বিশেষে প্রধান মূল পরিবর্তিত অঙ্গ।

10. কাণ্ডের সাধারণ কাজ কি? উদাহরণসহ পরিবর্তিত কাণ্ডগুলির কাজ উল্লেখ কর।

11. উদ্ভিদের উপর আলো ও অভিকর্ষের প্রভাব দুইটি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাও।

12. একটি কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের দৃশ্য লেবেলযুক্ত চিত্রযোগে দেখাও। মূলের সহিত ইহার প্রভেদ কোথায়?

13. রসের উৎস্রোত বলিতে কি বোঝ? একটি পরীক্ষার দ্বারা উদ্ভিদে যে উৎস্রোত ঘটে দেখাও।

14. **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ**

(ক) প্ররোহ, (খ) গ্রন্থিকাণ্ড, (গ) পর্ণকাণ্ড, (ঘ) ক্ল্যাডোড, (ঙ) বক্রধাবক, (চ) টিউবার, (ছ) রসের উৎস্রোত, (জ) অভিকর্ষবৃত্তি, (ঝ) কেন্দ্রস্তম্ভ, (ঞ) ক্যাম্বিয়ম, (ট) শ্বেতসার স্তর, (ঠ) হ্রস্বধাবক, (ড) শল্কপত্র, (ঢ) বাল্‌বিল ও (ণ) মিশ্র মুকুল।

● **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন [*Objective Questions*]ঃ**

15. **বাঁদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত করঃ**

বাঁদিক	ডানদিক
(ক) মুকুল প্রকৃতপক্ষে একটি	সংকুচিত চাকতির মতো অঙ্গ।
(খ) পেঁয়াজের কাণ্ডটি প্রকৃতপক্ষে	অপরিণত ও অপরিবর্তিত কাণ্ড।
(গ) তৃণকাণ্ড হইল	অবলম্বন জড়াইয়া ওঠার উপযোগী অঙ্গ।
(ঘ) বল্লী হইল	শাখা-প্রশাখাযুক্ত নিরেট শক্ত পর্ব ও ফাঁপা পর্বমধ্যযুক্ত কাণ্ড।
(ঙ) রাইজোমের দেহে খাদ্য	মোটেই সঞ্চিত থাকে না।
(চ) কন্দর কাণ্ডে খাদ্য	সঞ্চিত থাকে।
(ছ) আমরুল, শুশনি প্রভৃতি	হ্রস্বধাবকের উদাহরণ।
(জ) চন্দ্রমল্লিকা	ধাবকের উদাহরণ।
(ঝ) বড় পানা হইল	ঊর্ধ্ব ধাবকের উদাহরণ।

16. **পাশের বন্ধনী হইতে উপযুক্ত শব্দ নির্বাচন দ্বারা বাক্য সম্পূর্ণ করঃ**

(ক) সূর্যমুখী কাণ্ডের জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যে আছে — (ক্যাম্বিয়ম, বান্ডল শীথ, মজ্জারশ্মি)।

(খ) প্ররোহের উদাহরণ — (ফণিমনসা, পেঁয়াজ, কচুরিপানা)।
(গ) কন্দের খাদ্য সঞ্চিত থাকে — (শল্কপত্রে, কাণ্ডে, মূলে)।
(ঘ) গ্রন্থিকাণ্ড একটি — (মৃৎগত কাণ্ড, অর্ধবায়বীয় কাণ্ড, বায়বীয় কাণ্ড)।
(ঙ) আম, কাঁঠাল গাছ — (তৃণকাণ্ড, গম্বুজাকৃতি, অশাখকাণ্ড)।
(চ) আমরুলের কাণ্ডকে বলে — (রোহিণী, ব্রততী, বল্লী)।
(ছ) কাষ্ঠল অংশবিহীন ছোট রসাল কাণ্ডযুক্ত গাছকে বলে — (গুল্ম, বৃক্ষ, বিরুৎ)।
(জ) খামালুর খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য পরিবর্তিত মুকুলকে বলে — (আকর্ষ, বাল্বিল, কণ্টক)।

17. **মৌখিক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**
(ক) কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য কি? মুকুল কত রকমের হয়? এগুলি কোন্ জাতের মুকুল? (খ) কাণ্ড ও মূলের প্রধান প্রধান প্রভেদগুলি উল্লেখ কর। (গ) আনুষঙ্গিক মুকুল কোথায় হয়? মিশ্রমুকুল কথাটির অর্থ কি? (ঘ) বিরুৎ, গুল্ম ও বৃক্ষের প্রকৃতি কি? ইহাদের কাণ্ডের প্রভেদ কি? (ঙ) কাষ্ঠললতা কোন্ জাতীয় উদ্ভিদ? (চ) মৃৎগত কাণ্ডকে কাণ্ড বলিয়া কিরূপে চেনা যায়? (ছ) কাণ্ড মাটির মধ্যে থাকিয়া কেন পরিবর্তিত হয়? (জ) কাণ্ডের দুইটি আভ্যন্তরীণ গঠন-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। (ঝ) রসের উৎস্রোত ঘটিলে উদ্ভিদের কি উপকার হয়?

দ্বাদশ অধ্যায়

● **সাধারণ প্রশ্ন** (*General Questions*) ঃ

1. আদর্শ পাতা কাহাকে বলে? আদর্শ পাতার অংশগুলি চিত্রযোগে বর্ণনা কর।
2. একক পত্র ও যৌগিক পত্রের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করা যায়?
3. পাতার কাজ কি? যে-কোন একটি পাতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
4. শিরাবিন্যাস কি? চিত্র ও উদাহরণযোগে বিভিন্ন প্রকার শিরাবিন্যাস বর্ণনা কর। শিরার কাজ কি? একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী পাতার শিরাবিন্যাস কি একই প্রকার?
5. পত্রবিন্যাস কাহাকে বলে? পত্রবিন্যাসের উপযোগিতা কি?
6. একটি বিষমপৃষ্ঠ পাতার অন্তর্গঠন বর্ণনা কর। সমাঙ্গপৃষ্ঠ পাতা হইতে ইহার প্রভেদ কি?
7. পাতায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। সালোকসংশ্লেষে যে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়, তাহা পরীক্ষা দ্বারা দেখাও।
8. শ্বসন কাহাকে বলে? শ্বসন কয় প্রকার? শ্বসনের উদ্দেশ্য কি? শ্বসনের একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।
9. বাষ্পমোচন ও বাষ্পায়নের পার্থক্য কি? বাষ্পমোচনের একটি সহজ পরীক্ষা বর্ণনা কর। বাষ্পমোচনের তাৎপর্য কি?

● **অসমসংযোগের প্রকারভেদ** (Variety of adhesion) ঃ

(1) দলমণ্ডলের সঙ্গে পুংকেশরের সংযুক্তি, অর্থাৎ **দললগ্ন** বা **এপিপেটালাস পুংকেশর** (Epipetalous)।

উদাহরণ—**বেগুন, ধুতরা, নয়নতারা** প্রভৃতি (চিত্র 13.11)।

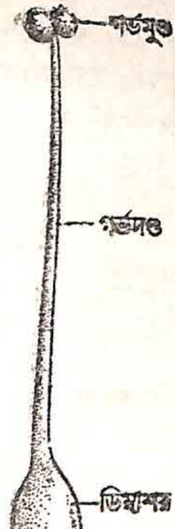


চিত্র 13.11 ঃ ক—বেগুনের দললগ্ন বা এপিপেটালাস স্টামেন ; খ—আকন্দের গর্ভকেশরের সঙ্গে যুক্ত পুংকেশর বা গাইন্যানড্রাস স্টামেন।

(2) পুষ্পপুটের সঙ্গে পুংকেশরের সংযুক্তি অর্থাৎ **এপিফাইলাস স্ট্যামেন** (Epiphyllous) *।

উদাহরণ—**রজনীগন্ধা, পেঁয়াজ** প্রভৃতি (চিত্র 13.6)।

(3) পুংকেশরের সঙ্গে গর্ভকেশরের সংযুক্তি অর্থাৎ **গাইন্যানড্রাস** (Gynandrous) স্ট্যামেন—উদাহরণ ঃ আকন্দ (চিত্র 13.11), রাস্না প্রভৃতি।



চিত্র 13.12—গর্ভকেশর।

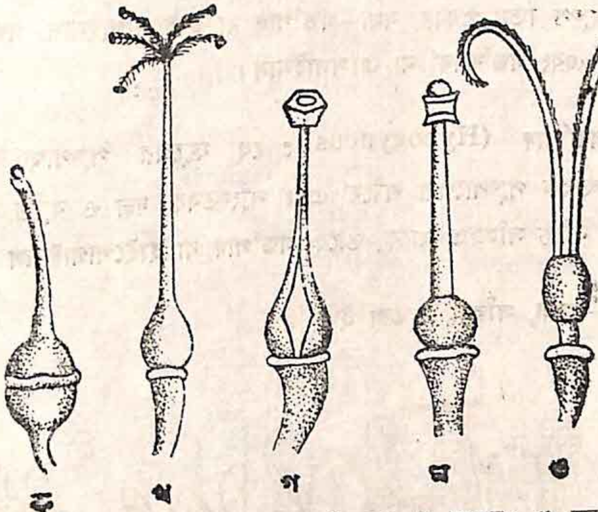
13.14. গর্ভকেশর [*Gynoecium or Pistil*] :

● **গর্ভকেশরের সংজ্ঞা** (Definition of gynoecium) **পুষ্পাক্ষের কেন্দ্রে সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত এবং ডিম্বাশয়, গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড সম্বলিত ফুলের অত্যাবশ্যকীয় চতুর্থ স্তবককে গর্ভকেশর বলে।**

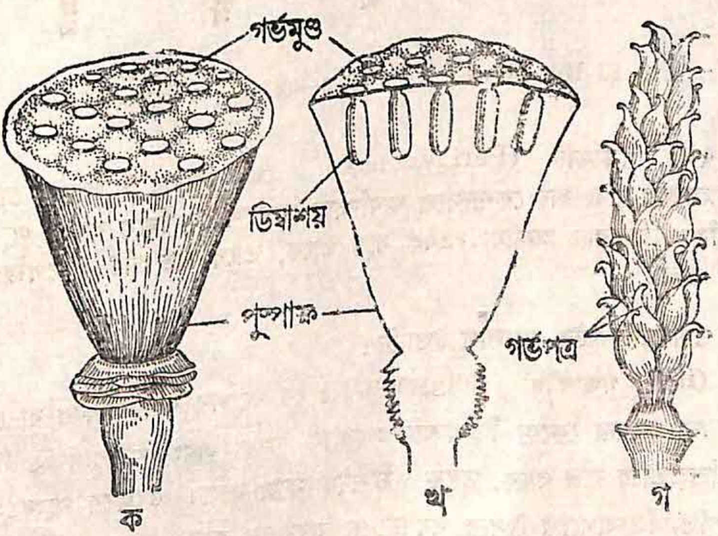
পুষ্পাক্ষের (Thalamus) সর্বোচ্চ স্থানে গর্ভকেশর অবস্থিত। এটি এক বা একাধিক গর্ভপত্রের সমন্বয়ে গঠিত। গর্ভকেশর তিনটি পৃথক অংশে বিভক্ত। নীচের স্ফীত অংশটি **গর্ভাশয়** বা **ডিম্বাশয়** (Ovary)। ডিম্বাশয়ের উপরে দণ্ডাকার অংশটি **গর্ভদণ্ড** (Style) এবং শীর্ষদেশের সামান্য স্ফীত বা খণ্ডিত অংশটি **গর্ভমুণ্ড** (Stigma) (চিত্র 13.12)। একাধিক গর্ভপত্র

* এই প্রকার পুংকেশরকে পুষ্পপুটলগ্ন পুংকেশর বা এপিফাইলাস স্ট্যামেন (Epiphyllous Stamen) বলে।

পরস্পর সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে যুক্ত থাকলে, তাকে **যুক্তগর্ভপত্রী** বা **সিনকার্পাস** (Syncarpous) গর্ভকেশর বলে। যেমন—**সরিষা**, **জবা** ইত্যাদি। গর্ভপত্রগুলি পরস্পর পৃথক থাকলে, তাকে **মুক্তগর্ভপত্রী** বা **অ্যাপোকার্পাস** (Apocarpous) গর্ভকেশর বলে। যেমন—**পদ্ম**, **চাঁপা** ইত্যাদি (চিত্র 13.14)।



চিত্র 13·13—বিভিন্ন প্রকার গর্ভকেশরঃ ক—বেগুন ; খ—জবা ; গ—আকন্দ ; ঘ—করবী ; ঙ—পিঙ্ক।



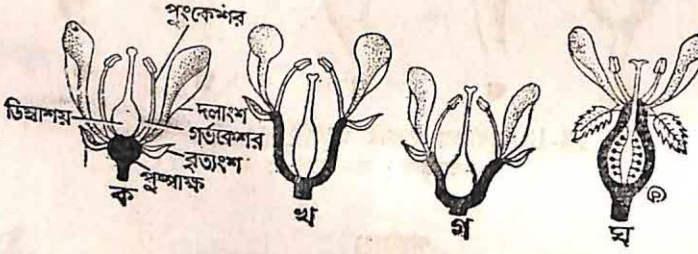
চিত্র 13·14—মুক্তগর্ভপত্রী গর্ভকেশরঃ ক ও খ—পদ্ম ; গ—চাঁপা।

13.15. গর্ভপাদ, গর্ভকটি ও গর্ভশীর্ষ পুষ্প [*Hypogynous, Perigynous and Epigynous flower*] :

পুষ্পাক্ষের গঠন এবং পুষ্পাক্ষের উপর গর্ভকেশরের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বৃতি, দলমণ্ডল ও পুংকেশরচক্রের বিন্যাস প্রধানত তিন প্রকার। তদনুযায়ী পুষ্পে তিন প্রকার, যথা—**গর্ভপাদ** বা **হাইপোগাইনাস**, **গর্ভকটি** বা **পেরিগাইনাস** এবং **গর্ভশীর্ষ** বা **এপিগাইনাস**।

(i) **গর্ভপাদ** (Hypogynous) : যে ফুলের পুষ্পাক্ষ উত্তল বা শাঙ্কব, স্ত্রীস্তবক পুষ্পাক্ষের শীর্ষে এবং পুংস্তবক, দল ও বৃতি ক্রমপর্যায়ে একে অন্যের নীচে সজ্জিত থাকে, তাকে **গর্ভপাদ** বা **হাইপোগাইনাস** বলা হয়।

উদাহরণ—**জবা, সরিষা, ধুতরা** ইত্যাদি।



চিত্র 13.15 : ক—গর্ভপাদ ; খ ও গ—গর্ভকটি ; ঘ—গর্ভশীর্ষ পুষ্প।

(ii) **গর্ভকটি** (Perigynous) : যে ফুলের পুষ্পাক্ষ চ্যাপ্টা ও পেয়ালাকার এবং যার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ডিম্বাশয়কে ঘিরে অথবা পুষ্পাক্ষের প্রসারিত কিনারায় অন্যান্য স্তবক যুক্ত থাকে, তাকে **গর্ভকটি** বা **পেরিগাইনাস** ফুল বলে।

উদাহরণ—**মটর, গোলাপ** ইত্যাদি।

(iii) **গর্ভশীর্ষ** (Epigynous) : যে ফুলের অবতলাকার বা পেয়ালাকার পুষ্পাক্ষের কেন্দ্রে ডিম্বাশয় অবস্থান করে এবং পুষ্পাক্ষ ও ডিম্বাশয় অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থাকে, তাকে গর্ভশীর্ষ ফুল বলে। এক্ষেত্রে পুংস্তবক, দল ও বৃতি, ডিম্বাশয়ের উপরে পর্যায়ক্রমে অবস্থান করে।

উদাহরণ—**কুমড়ো, সূর্যমুখী** ইত্যাদি।

13.15 নং চিত্রে তিন প্রকার পুষ্পের পুষ্পাক্ষ, বৃত্যংশ, দলাংশ, পুংকেশর এবং গর্ভকেশর প্রভৃতির পারস্পরিক অবস্থান দেখান হয়েছে। গর্ভপাদ ও গর্ভকটি পুষ্পের **ডিম্বাশয় অধিগর্ভ** বা **সুপিরিয়র** (Superior) এবং গর্ভশীর্ষ পুষ্পের ডিম্বাশয় **অধোগর্ভ** বা **ইন্‌ফিরিয়র** (Inferior)।

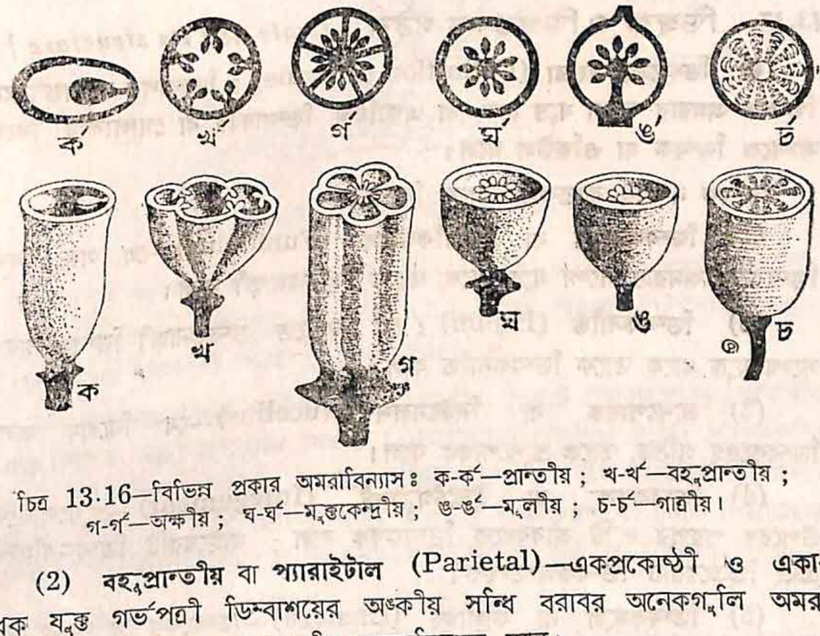
13.16. অমরা ও অমরাবিন্যাস [*Placenta and Placentation*]:

● অমরা ও অমরাবিন্যাসের সংজ্ঞা (Definition of placenta and placentation) : **ডিম্বাশয়ের অন্তঃপ্রাকার থেকে উদ্গত ডিম্বকবাহী বিশেষ স্থূল অংশকে অমরা বা প্ল্যাসেণ্টা বলে। অমরার সজ্জাপদ্ধতিকে অমরাবিন্যাস বা প্ল্যাসেনটেশান বলে।**

অমরাবিন্যাস বিভিন্ন প্রকার, যথা—

(1) **প্রান্তীয়** বা **মারজিনাল** (Marginal)—একপ্রকোষ্ঠী ও একগর্ভপত্রী গর্ভকেশরে অঙ্কীয় সন্ধি বরাবর অমরা উৎপন্ন হলে, তাকে প্রান্তীয় অমরাবিন্যাস বলে।

উদাহরণ—**মটর, সীম, ছোলা, বকফুল** ইত্যাদি।



চিত্র 13.16—বিভিন্ন প্রকার অমরাবিন্যাস: ক-ক´—প্রান্তীয় ; খ-খ´—বহুপ্রান্তীয় ; গ-গ´—অক্ষীয় ; ঘ-ঘ´—মুক্তকেন্দ্রীয় ; ঙ-ঙ´—মূলীয় ; চ-চ´—গাত্রীয়।

(2) **বহুপ্রান্তীয়** বা **প্যারাইটাল** (Parietal)—একপ্রকোষ্ঠী ও একাধিক যুক্ত গর্ভপত্রী ডিম্বাশয়ের অঙ্কীয় সন্ধি বরাবর অনেকগুলি অমরা উৎপন্ন হলে, তাকে বহুপ্রান্তীয় অমরাবিন্যাস বলে।

উদাহরণ—**পেঁপে, শশা, কুমড়ো** ইত্যাদি।

(3) **অক্ষীয়** বা **অ্যাক্সাইল** (Axile)—একাধিক গর্ভপত্রবিশিষ্ট যুক্তগর্ভপত্রী ডিম্বাশয়ের কেন্দ্রে গর্ভপত্রগুলি জুড়ে গিয়ে যদি বহু প্রকোষ্ঠ গঠন

7. উদ্ভিদ-অঙ্গের রূপান্তর বলিতে কি বোঝ? পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত কাণ্ডের প্রধান পার্থক্য কি? কয়েকটি রূপান্তরিত কাণ্ডের বর্ণনা দাও এবং প্রতি ক্ষেত্রে উহাদের বিশেষ কাজের উল্লেখ কর।

8. কোনও উদ্ভিদের একটি ভূনিম্নস্থ অঙ্গ তোমাকে দেওয়া হইল,—উহা মূল না কাণ্ড বহিরাকৃতি দেখিয়া তাহা কিভাবে নিরূপণ করিবে?

9. চিত্রের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, (ক) ধারক, (খ) গ্রন্থিকাণ্ড এবং (গ) সময় বিশেষে প্রধান মূল পরিবর্তিত অঙ্গ।

10. কাণ্ডের সাধারণ কাজ কি? উদাহরণসহ পরিবর্তিত কাণ্ডগুলির কাজ উল্লেখ কর।

11. উদ্ভিদের উপর আলো ও অভিকর্ষের প্রভাব দুইটি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাও।

12. একটি কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের দৃশ্য লেবেলযুক্ত চিত্রযোগে দেখাও। মূলের সহিত ইহার প্রভেদ কোথায়?

13. রসের উৎস্রোত বলিতে কি বোঝ? একটি পরীক্ষার দ্বারা উদ্ভিদে যে উৎস্রোত ঘটে দেখাও।

14. **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ**

(ক) প্ররোহ, (খ) গ্রন্থিকাণ্ড, (গ) পর্ণকাণ্ড, (ঘ) ক্ল্যাডোড, (ঙ) বক্রধাবক, (চ) টিউবার, (ছ) রসের উৎস্রোত, (জ) অভিকর্ষবৃত্তি, (ঝ) কেন্দ্রস্তম্ভ, (ঞ) ক্যাম্বিয়ম, (ট) শ্বেতসার স্তর, (ঠ) হ্রস্বধাবক, (ড) শল্কপত্র, (ঢ) বাল্‌বিল ও (ণ) মিশ্র মুকুল।

● **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন [*Objective Questions*]ঃ**

15. **বাঁদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত করঃ**

বাঁদিক	ডানদিক
(ক) মুকুল প্রকৃতপক্ষে একটি	সংকুচিত চাকতির মতো অঙ্গ।
(খ) পেঁয়াজের কাণ্ডটি প্রকৃতপক্ষে	অপরিণত ও অপরিবর্তিত কাণ্ড।
(গ) তৃণকাণ্ড হইল	অবলম্বন জড়াইয়া ওঠার উপযোগী অঙ্গ।
(ঘ) বল্লী হইল	শাখা-প্রশাখাযুক্ত নিরেট শক্ত পর্ব ও ফাঁপা পর্বমধ্যযুক্ত কাণ্ড।
(ঙ) রাইজোমের দেহে খাদ্য	মোটেই সঞ্চিত থাকে না।
(চ) কন্দর কাণ্ডে খাদ্য	সঞ্চিত থাকে।
(ছ) আমরুল, শুশনি প্রভৃতি	হ্রস্বধাবকের উদাহরণ।
(জ) চন্দ্রমল্লিকা	ধাবকের উদাহরণ।
(ঝ) বড় পানা হইল	ঊর্ধ্ব ধাবকের উদাহরণ।

16. **পাশের বন্ধনী হইতে উপযুক্ত শব্দ নির্বাচন দ্বারা বাক্য সম্পূর্ণ করঃ**

(ক) সূর্যমুখী কাণ্ডের জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যে আছে — (**ক্যাম্বিয়ম, বাণ্ডিল** টুপি, মজ্জারশ্মি)।

(খ) প্ররোহের উদাহরণ — (ফণিমনসা, পেঁয়াজ, কচুরিপানা)।

(গ) কন্দের খাদ্য সঞ্চিত থাকে — (শল্কপত্রে, কাণ্ডে, মূলে)।

(ঘ) গ্রন্থিকাণ্ড একটি — (মৃৎগত কাণ্ড, অর্ধবায়বীয় কাণ্ড, বায়বীয় কাণ্ড)।

(ঙ) আম, কাঁঠাল গাছ — (তৃণকাণ্ড, গম্বুজাকৃতি, অশাখকাণ্ড)।

(চ) আমরুলের কাণ্ডকে বলে — (রোহিণী, ব্রততী, বল্লী)।

(ছ) কাষ্ঠল অংশবিহীন ছোট রসাল কাণ্ডযুক্ত গাছকে বলে — (গুল্ম, বৃক্ষ, বিরুৎ)।

(জ) খামালুর খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য পরিবর্তিত মুকুলকে বলে — (আকর্ষ, বালবিল, কণ্টক)।

17. **মৌখিক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

(ক) কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য কি? মুকুল কত রকমের হয়? (খ) কাণ্ড ও মূলের প্রধান প্রধান প্রভেদগুলি উল্লেখ কর। (গ) আনুষঙ্গিক মুকুল কোথায় হয়? এগুলি কোন্ জাতের মুকুল? মিশ্রমুকুল কথাটির অর্থ কি? (ঘ) বিরুৎ, গুল্ম ও বৃক্ষের প্রভেদ কি? (ঙ) কাষ্ঠললতা কোন্ জাতীয় উদ্ভিদ? ইহাদের কাণ্ডের প্রকৃতি কি? (চ) মৃৎগত কাণ্ডকে কাণ্ড বলিয়া কিরূপে চেনা যায়? (ছ) কাণ্ড মাটির মধ্যে থাকিয়া কেন পরিবর্তিত হয়? (জ) কাণ্ডের দুইটি আভ্যন্তরীণ গঠন-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। (ঝ) রসের উৎস্রোত ঘটিলে উদ্ভিদের কি উপকার হয়?

দ্বাদশ অধ্যায়

● **সাধারণ প্রশ্ন** (*General Questions*) ঃ

1. আদর্শ পাতা কাহাকে বলে? আদর্শ পাতার অংশগুলি চিত্রযোগে বর্ণনা কর।

2. একক পত্র ও যৌগিক পত্রের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করা যায়?

3. পাতার কাজ কি? যে-কোন একটি পাতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

4. শিরাবিন্যাস কি? চিত্র ও উদাহরণযোগে বিভিন্ন প্রকার শিরাবিন্যাস বর্ণনা কর। শিরার কাজ কি? একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী পাতার শিরাবিন্যাস কি একই প্রকার?

5. পত্রবিন্যাস কাহাকে বলে? পত্রবিন্যাসের উপযোগিতা কি?

6. একটি বিষমপৃষ্ঠ পাতার অন্তর্গঠন বর্ণনা কর। সমাঙ্গপৃষ্ঠ পাতা হইতে ইহার প্রভেদ কি?

7. পাতায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। সালোকসংশ্লেষে যে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়, তাহা পরীক্ষা দ্বারা দেখাও।

8. শ্বসন কাহাকে বলে? শ্বসন কয় প্রকার? শ্বসনের উদ্দেশ্য কি? শ্বসনের একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

9. বাষ্পমোচন ও বাষ্পায়নের পার্থক্য কি? বাষ্পমোচনের একটি সহজ পরীক্ষা বর্ণনা কর। বাষ্পমোচনের তাৎপর্য কি?

করে এবং অক্ষীয় সন্ধির ভিতরের দিকে অমরার সৃষ্টি হয়, তবে তাকে অক্ষীয় অমরাবিন্যাস বলে।

যেমন—**রজনীগন্ধা, জবা, ধুতরা** ইত্যাদি।

(4) **মুক্তকেন্দ্রীয়** বা **ফ্রি-সেণ্ট্রাল** (Free central)—এটি মূলতঃ অক্ষীয় বিন্যাস। কিন্তু ডিম্বাশয় পরিণত হলে প্রকোষ্ঠগুলির বিভেদ-প্রাকার বিলুপ্ত হয় এবং ডিম্বাশয় একপ্রকোষ্ঠী হয়ে যায়।

উদাহরণ—**গিমেশাক, পিঙ্ক** ইত্যাদি।

(5) **মূলীয়** বা **বেসাল** (Basal)—একপ্রকোষ্ঠী ডিম্বাশয়ে পুষ্পাক্ষের উপরে সরাসরি একটিমাত্র ডিম্বক উৎপন্ন হলে, সেই অমরাবিন্যাসকে মূলীয় বলে।

উদাহরণ—**গাঁদা, সূর্যমুখী** ইত্যাদি।

(6) **গাত্রীয়** বা **সুপারফিসিয়াল** (Superficial)—মূলত অক্ষীয় হলেও এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অক্ষ ও বিভেদ প্রাকার থেকে **সমভাবে** অমরা উৎপন্ন হয়।

উদাহরণ—**পদ্ম, শালুক** ইত্যাদি।

13.17. ডিম্বক ও ডিম্বকের গঠন *[Ovule and its structure] :*

● **ডিম্বকের সংজ্ঞা** (Definition of ovule) ঃ **ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয়ের ভিতরে অমরার সঙ্গে যুক্ত এক বা একাধিক ডিম্বাকার বা গোলাকার বিশেষ অঙ্গকে ডিম্বক বা ওভিউল বলে।**

ডিম্বক নীচের কয়েকটি অংশে বিভক্ত ঃ—

(1) **ডিম্বকনাড়ী** বা **ফানিকিউলস** (Funiculus)—যে সরু বৃন্ত ডিম্বককে অমরার সঙ্গে যুক্ত রাখে, তাকে ডিম্বকনাড়ী বলে।

(2) **ডিম্বকনাভি** (Hilum) ঃ যে বিন্দুতে ডিম্বকনাড়ী ডিম্বক গাত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাকে ডিম্বকনাভি বলে।

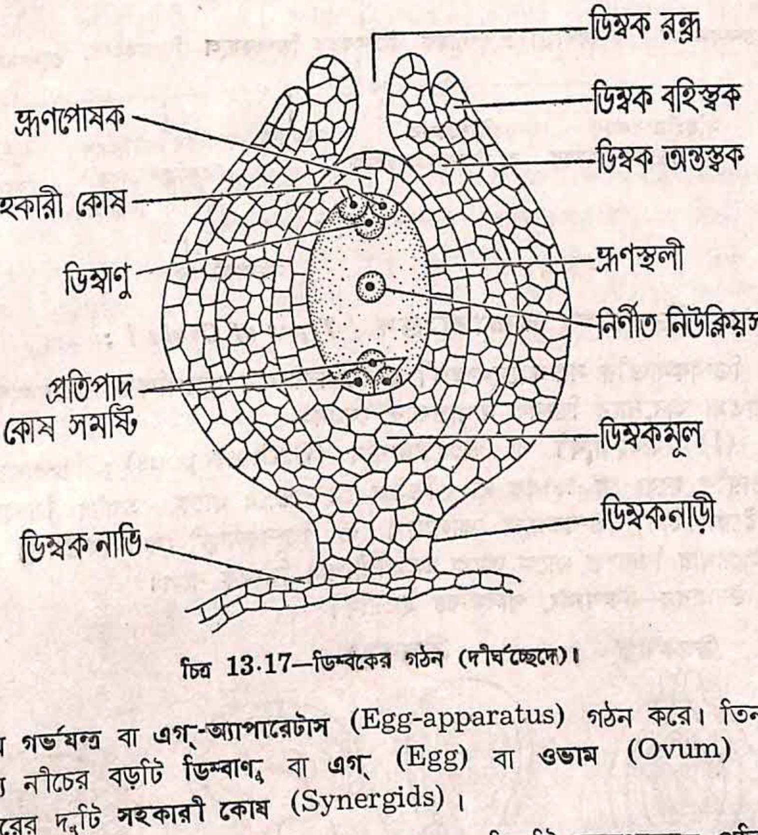
(3) **ভ্রূণপোষক** বা **নিউসেলস** (Nucellus)—যে বিশেষ কলায় ডিম্বকদেহ গঠিত, তাকে ভ্রূণপোষক বলে।

(4) **ডিম্বকত্বক্** বা **ইনটেগুমেণ্ট** (Integument)—ভ্রূণপোষকের উপরের পরপর দুটি আবরণকে ডিম্বকত্বক বলে ; বাইরেরটি ডিম্বকবহিস্ত্বক এবং ভিতরেরটি ডিম্বকঅন্তস্ত্বক।

(5) **ডিম্বকমূল** বা **কালাজা** (Chalaza)—ডিম্বকের যে স্থান থেকে ডিম্বকত্বক উৎপন্ন হয়, সেই স্থানকে ডিম্বকমূল বলে।

(6) **ডিম্বকরন্ধ্র** (Micropyle)—ডিম্বকত্বকের দ্বারা আবৃত ডিম্বকের ছিদ্রকে ডিম্বকরন্ধ্র বলে।

(7) **ভ্রূণস্থলী বা এম্ব্রিওস্যাক** (Embryo sac)—ডিম্বকরন্ধ্রের নিকট ভ্রূণপোষকের মধ্যে অবস্থিত ডিম্বাকার থলিকে ভ্রূণস্থলী বলে। ভ্রূণস্থলীতে আটটি নিউক্লিয়স বিশেষ পদ্ধতিতে সাজান থাকে (চিত্র 13.17)। এগুলির মধ্যে ডিম্বকরন্ধ্রের নিকটবর্তী তিনটি নিউক্লিয়স একটি সূক্ষ্ম পর্দায় আবৃত



চিত্র 13.17—ডিম্বকের গঠন (দীর্ঘচ্ছেদে)।

হ'য়ে **গর্ভযন্ত্র বা এগ্-অ্যাপারেটাস** (Egg-apparatus) গঠন করে। তিনটির মধ্যে নীচের বড়টি **ডিম্বাণু** বা **এগ্** (Egg) বা **ওভাম** (Ovum) এবং উপরের দুটি **সহকারী কোষ** (Synergids)।

ডিম্বকমূলের দিকে পর্দার দ্বারা আবৃত তিনটি কোষগুচ্ছকে **প্রতিপাদ কোষসমষ্টি** বা **অ্যান্টিপোডাল সেলস** (Antipodal cells) বলে। ভ্রূণস্থলীর মাঝের নিউক্লিয়স দুটিকে **পোলার নিউক্লিয়স** (Polar nucleus) বলে। পোলার নিউক্লিয়স দুটি মিলিত হ'য়ে **নির্ণীত নিউক্লিয়স** বা **গৌণ নিউক্লিয়স** (**Definitive nucleus or Secondary nucleus**) গঠন করে।

● **ডিম্বকের কাজ** (Functions of ovule) :

(i) পরিণত ডিম্বক **ডিম্বাণু** বা **ওভাম** বা এগ্ উৎপাদন করে। ডিম্বাণু শুক্রাণুর সঙ্গে মিলিত হ'লে ভ্রূণ (Embryo) সৃষ্টি হয়।

(ii) ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়স অপর একটি শুক্রাণুর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে **শস্য নিউক্লিয়স** (Endosperm nucleus) গঠন করে।

10. সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের পার্থক্য কি? এই দুটি প্রক্রিয়ার সম্বন্ধই বা কি? প্রক্রিয়া দুটি কখন কোথায় চলে?

11. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ

(ক) সমাঙ্গপৃষ্ঠ পাতা, (খ) পত্রক, (গ) প্যালিসেড প্যারেনকাইমা, (ঘ) পত্ররন্ধ্র, (ঙ) বাষ্পমোচন, (চ) ফোটোলিসিস, (ছ) আলোকদশা, (জ) গ্লাইকোলিসিস, (ঝ) অবাতশ্বসন, (ঞ) মেসোফিল, (ট) সালোকসংশ্লেষ।

● **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন [*Objective Questions*]ঃ**

12. **বাঁদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত করঃ**

বাঁদিক	ডানদিক
(ক) কুমড়াপাতার শিরাবিন্যাস	একশিরাল বা পক্ষল জালিকা।
(খ) তেজপাতার শিরাবিন্যাস	অপসারী করতলাকার সমান্তরাল।
(গ) অশ্বত্থপাতার শিরাবিন্যাস	অপসারী করতলাকার জালিকা।
(ঘ) তালপাতার শিরাবিন্যাস	অভিসারী করতলাকার সমান্তরাল।

13. **বন্ধনী হইতে সঠিক শব্দ নির্বাচন করিয়া বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করঃ**

(ক) শিমুল পাতা — (**একক পত্র, যৌগিক পত্র**)।

(খ) পত্রক দেখা যায় — (**আমগাছের পাতায়, গোলাপগাছের পাতায়, ধানগাছের পাতায়**)।

(গ) ভুট্টা, ধান, প্রভৃতি পাতার বিন্যাস — (**আবর্ত, একান্তর, অভিমুখ**)।

(ঘ) ছাতিমপাতার, করবীপাতার বিন্যাস — (**অভিমুখ, একান্তর, আবর্ত**)।

(ঙ) আকন্দপাতার, শিউলীপাতার বিন্যাস — (**আবর্ত, অভিমুখ, তির্যকপত্র, একান্তর**)।

(চ) গাছ খাদ্য প্রস্তুত করে — (**ফুলে, পাতায়, মূলে**)।

(ছ) গাছের শক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে বলে — (**সালোকসংশ্লেষ, শ্বসন, বাষ্পায়ন**)।

(জ) খাদ্যে আবদ্ধ শক্তির প্রধান উৎস — (**সূর্য, বাতাস, জল**)।

(ঝ) গাছের উদ্বৃত্ত জল পরিত্যাগ প্রক্রিয়ার নাম — (**শ্বসন, বাষ্পমোচন, সালোক-সংশ্লেষ**)।

(ঞ) অবাতশ্বসনে গাছ প্রধানতঃ উৎপন্ন করে — (**জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড, কোহল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড**)।

(ট) সালোকসংশ্লেষে শক্তি — (**নির্গত হয়, সঞ্চিত হয়, যেমনকার তেমনি থাকে**)।

14. **শূন্যস্থান পূর্ণ করঃ**

(ক) সালোকসংশ্লেষ কেবল — অঙ্গেই চলে।

(খ) কিউটিকল আবরণীর মাধ্যমেও — সম্ভবপর।

(গ) — পাতাগুলির ভূপৃষ্ঠের সহিত তির্যকভাবে বিন্যস্ত থাকে।

(ঘ) একাধিক পত্রক পত্রবৃন্তের অগ্রবিন্দুতে যুক্ত থাকিলে, তাহাকে — বলে।

(ঙ) বৃন্ত না থাকিলে পাতাকে—বলে।
(চ) —পাতার ঊর্ধ্বত্বক অধিকতর গাঢ় সবুজবর্ণের হয়।

15. **মৌখিক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

(ক) পাতার প্রয়োজনীয়তা কি? গাছের পাতা না থাকিলে কি হয়?

(খ) পাতার শিরাগুলির কাজ কি? শিরাবিন্যাস দেখিয়া গাছ একবীজপত্রী না দ্বিবীজপত্রী ঠিক করা যায় কি?

(গ) পাতায় বৃন্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা কি? সমাঙ্গপৃষ্ঠ পাতা কি দেখিয়া চেনা যায়?

(ঘ) বিষমপৃষ্ঠ পাতায় মেসোফিল কিরূপ? মেসোফিলের প্রধান কাজ কি?

(ঙ) পাতার কোন্ কলায় ক্লোরোফিল থাকে? অন্ধকারে সালোকসংশ্লেষের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে কি বলে?

(চ) সালোকসংশ্লেষের সময় গ্যাসীয় পদার্থের আদান-প্রদান পাতার কোন্ অঙ্গের মাধ্যমে চলে?

(ছ) বাষ্পমোচনের তাৎপর্য কি?

(জ) সালোকসংশ্লেষে সামগ্রিক বিক্রিয়াটিকে সমীকরণের দ্বারা প্রকাশ করা যায় কি?

(ঝ) অবাতশ্বসন ও সবাতশ্বসনের সম্বন্ধ কি? গ্লাইকোলিসিস কাহাকে বলে?

(ঞ) শ্বসন সালোকসংশ্লেষের উপর, না সালোকসংশ্লেষ শ্বসনের উপর নির্ভরশীল?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

● **সাধারণ প্রশ্ন** (*General Questions*) :

1. ফুলের সংজ্ঞা দাও। একটি আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশের ছবি আঁকিয়া লেবেল কর। অংশগুলির কাজ কি? বৃন্তহীন ফুলকে কি বলে?

2. সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ এবং একলিঙ্গ ও উভলিঙ্গ ফুলের প্রভেদ কি? পুষ্পপুট কাহাকে বলে? গর্ভপত্র বলিতে কি বোঝ?

3. অমরা কাহাকে বলে? ডিম্বক কি এবং ইহা কোথায় থাকে? পরাগযোগের সহিত ডিম্বকের কোন সম্পর্ক আছে কি? গর্ভাধানের সহিত ডিম্বকের কোন সম্পর্ক আছে কি? গর্ভাধানের পর ডিম্বকের কি পরিণতি হয়?

4. পরাগযোগ কাকে বলে? স্ব-পরাগযোগ ও ইতর-পরাগযোগ বলিতে কি বোঝ? একটি বায়ুপরাগী ও একটি পতঙ্গপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য বল। ইতর পরাগযোগের সুবিধা কি?

5. ডিম্বাণুর নিষেক কিভাবে ঘটে, তাহা চিত্রের সাহায্যে দেখাও। নিষিক্ত হইবার পর ডিম্বাণু, ডিম্বক ও ডিম্বাশয় যথাক্রমে কোন্ কোন্ অঙ্গ গঠন করে?

6. সস্য কি? সকল বীজেই কি সস্য থাকে? সস্যের উৎপত্তি কিভাবে ঘটে? সস্যল ও অসস্যল বীজের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

(iii) নিষিক্ত ও পরিণত ডিম্বক বীজে রূপান্তরিত হয়।

ডিম্বকের গঠনের ছক ঃ

ডিম্বক

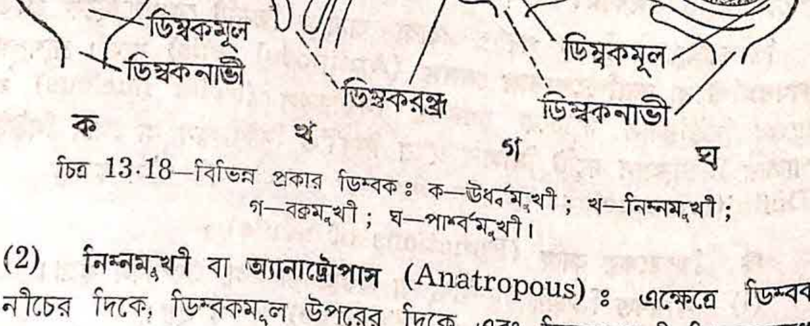
- ডিম্বকনাভী
- ডিম্বকনাড়ী
- ভ্রূণপোষক
- ডিম্বকত্বক
  - বহিঃডিম্বকত্বক বা ডিম্বকবহিস্ত্বক
  - অন্তঃডিম্বকত্বক বা ডিম্বকঅন্তস্ত্বক
- **ডিম্বকমূল**
- ডিম্বকরন্ধ্র
- ভ্রূণস্থলী
  - গর্ভযন্ত্র
    - ডিম্বাণু
    - সহকারী কোষ
  - পোলার নিউক্লিয়স (একত্রিত হয়ে নির্ণীত নিউক্লিয়স)
  - প্রতিপাদ কোষসমষ্টি

13.18. ডিম্বকের প্রকারভেদ [*Types of Ovule*] :

ডিম্বকনাভীর সঙ্গে ভ্রূণস্থলী ও ডিম্বকরন্ধ্রের আপেক্ষিক সজ্জা পদ্ধতির তারতম্য অনুসারে ডিম্বক নানাপ্রকার, যেমন—

(1) **ঊর্ধ্বমুখী** বা **অর্থোট্রোপাস** (Orthotropous) ঃ ডিম্বাশয় বা ওভারীর মধ্যে যে ডিম্বক বা ওভিউল সোজাভাবে থাকে, অর্থাৎ ডিম্বকরন্ধ্র (মাইক্রোপাইল), ডিম্বকমূল (কালাজা) ও ডিম্বকনাড়ী (ফানিকিউলস) একই সরলরেখায় বিন্যস্ত থাকে তাকে **অর্থোট্রোপাস** ডিম্বক বলে।

উদাহরণ—**টকপালং, পানমরিচ** ইত্যাদি।



চিত্র 13.18—বিভিন্ন প্রকার ডিম্বক ঃ ক—ঊর্ধ্বমুখী ; খ—নিম্নমুখী ; গ—বক্রমুখী ; ঘ—পার্শ্বমুখী।

(2) **নিম্নমুখী** বা **অ্যানাট্রোপাস** (Anatropous) ঃ এক্ষেত্রে ডিম্বকরন্ধ্র নীচের দিকে, ডিম্বকমূল উপরের দিকে এবং ডিম্বকনাড়ী ডিম্বকরন্ধ্রের কাছে অবস্থান করে।

উদাহরণ—**মটর, রেঁড়ি** ইত্যাদি।

(3) **বক্রমুখী** বা **ক্যাম্পাইলোট্রোপাস** (Campylotropous) : যখন ডিম্বকনাড়ীর উপর ডিম্বকটি ঈষৎ বক্রভাবে অবস্থান করে এবং তার আকৃতি ঘোড়ার খুরের মতো বাঁকা হয় তাকে **বক্রমুখী** ডিম্বক বলে।

উদাহরণ—**গিমেশাক, কৃষ্ণকলি** ইত্যাদি।

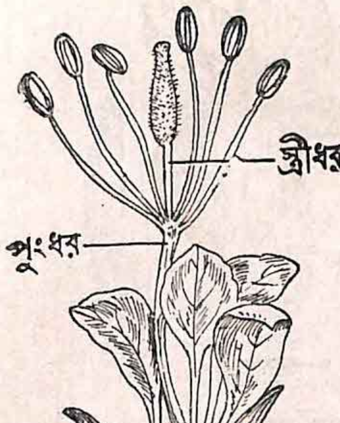
(4) **পার্শ্বমুখী** বা **অ্যাম্ফিট্রোপাস** (Amphitropous) : যখন ডিম্বকমূল ও ডিম্বকরন্ধ্র একই সরলরেখায় থাকে কিন্তু ডিম্বকনাড়ীর সঙ্গে লম্বভাবে থাকে তাকে পার্শ্বমুখী ডিম্বক বলে।

উদাহরণ—**পোস্ত, ক্ষুদিপানা** ইত্যাদি।

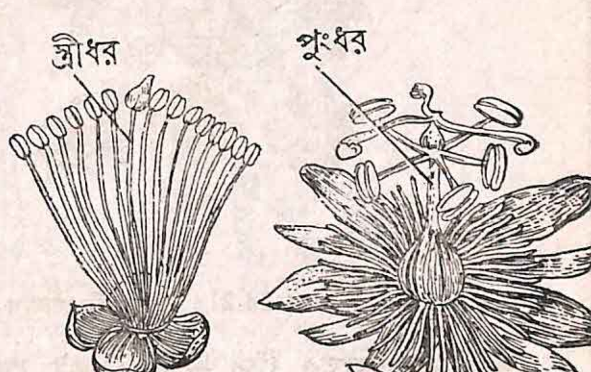
13.19. পুষ্প পরিবর্তিত বিটপ [*Flower is a modified shoot*] :

কান্ড ও পাতার সম্মিলিত রূপ বিটপ। নানা আকৃতির ফুলের সঙ্গে বিটপের প্রকৃতই কোন সম্বন্ধ আছে কিনা আপাতদৃষ্টিতে তা বোঝা যায় না। কিন্তু উভয়ের উৎপত্তি, অবস্থান, সামগ্রিক গঠন পর্যালোচনা করলে পুষ্পাক্ষটিই যে কান্ড, এমন কি বৃত্যংশ, দলাংশ, পুংকেশর, গর্ভকেশর প্রভৃতি পুষ্পাংগ প্রকৃতপক্ষে যে পাতারই পরিবর্তিত রূপ, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এর সপক্ষে নীচে কতকগুলি যুক্তি দেওয়া হল।

(A) **পুষ্পাক্ষের কান্ড-প্রকৃতি** (Axis-nature of the Thalamus) : কান্ড ও শাখা-প্রশাখা পাতা বহন করে। পুষ্পাক্ষও কান্ডের মত পুষ্পপত্র



চিত্র 13·19—শ্বেত হুরহুরের ফুল।



চিত্র 13·20 : ক—ক্যাপারিস ; খ—ঝুমকোলতা।

ধারণ করে। কান্ডের মতো পুষ্পাক্ষেরও পর্ব ও পর্বমধ্য আছে, তবে সেগুলি অস্পষ্ট। শ্বেত হুরহুরে (চিত্র 13·19), বাঘ আঁচড়া, ঝুমকোলতা (চিত্র

7. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :

(ক) ভ্রূণ, (খ) পরাগনালিকা, (গ) ভ্রূণস্থলী, (ঘ) পরাগযোগ, (ঙ) একলিঙ্গ পুষ্প, (চ) পুষ্পপুট, (ছ) অমরাবিন্যাস, (জ) পুষ্পাক্ষ, (ঝ) পরাগ ও (ঞ) গর্ভপত্র।

● নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন [*Objective Questions*] :

8. বাঁদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত কর :

বাঁদিক	ডানদিক
(ক) বৃন্তযুক্ত ফুলকে বলে	পুষ্পপুট।
(খ) দলাংশ ও বৃত্যাংশ সদৃশ একটি স্তবককে	সবৃন্তক।
(গ) ডুমুর, রাংচিতা, কুমড়ার ফুল	উভলিঙ্গ।
(ঘ) সরিষা, মটর, বেগুনের ফুল	একলিঙ্গ।
(ঙ) পরাগধানীর নীচের দণ্ডাকার অংশকে	গর্ভদণ্ড বলে।
(চ) ডিম্বাশয়ের উপরের দণ্ডাকার অংশকে	পুংদণ্ড বলে।
(ছ) দ্বিগর্ভাধানের ফলে	সস্য উৎপন্ন হয়।
(জ) গর্ভাধানের ফলে	ভ্রূণ উৎপন্ন হয়।

9. বন্ধনী হইতে সঠিক শব্দ নির্বাচন করিয়া বাক্যগুলি সম্পূর্ণ কর :

(ক) ফুল প্রকৃতপক্ষে—(পরিবর্তিত পত্র, পরিবর্তিত মূল, পরিবর্তিত কাণ্ড)।

(খ) চারটি স্তবক যে ফুলে থাকে, তাহাকে বলে—(অসম্পূর্ণ পুষ্প, সম্পূর্ণ পুষ্প, একলিঙ্গ পুষ্প)।

(গ) পুংকেশর হইতে উৎপন্ন হয়—(পুংদণ্ড, পরাগ, পরাগধানী)।

(ঘ) বায়ুপরাগী ফুল সব সময়—(উজ্জ্বল হয়, অনুজ্জ্বল রংয়ের হয়)।

(ঙ) ভ্রূণস্থলীর মধ্যের নিউক্লিয়স দুটির নাম—(সেকেণ্ডারী নিউক্লিয়স, অ্যান্টিপোডাল কোষ, সাইনারজিড)।

10. শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) যে ফুলে পুং ও স্ত্রী উভয় অঙ্গই থাকে, তাহাকে — বলে।

(খ) পরাগধানী হইতে পরাগ গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হইলে, তাহাকে — বলে।

(গ) ফুলে এক বা একাধিক স্তবক থাকিলে সেই ফুল — ।

(ঘ) অসম্পূর্ণ ফুলে পুং পুষ্প না থাকিলে তাহাকে — বলে।

(ঙ) শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনকে — বলে।

11. মৌখিক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) ফুল কাহাকে বলে? (খ) পুষ্পপুট বলিতে কি বোঝ? (গ) ফুলের সাহায্যকারী স্তবকগুলির নাম কর। (ঘ) গর্ভকেশর চক্র কাহাকে বলে? (ঙ) পুষ্পাক্ষ

কি? (চ) সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ফুল কি? ইহাদের উদাহরণ দাও। (ছ) ইতর পরাগযোগ কাহাকে বলে? ইতর পরাগযোগের সুবিধা কি কি? (জ) সস্য কিভাবে উৎপন্ন হয়?

চতুর্দশ অধ্যায়

● **সাধারণ প্রশ্ন** (*General Questions*):

1. ফলের সংজ্ঞা দাও। আদর্শ ফলের বিভিন্ন অংশের নাম কর। ফল প্রধানত কয় প্রকার? উদাহরণ দাও ও চিত্রসহ বিবৃত কর।

2. নিরস অবিদারী ফল বলিতে কি বোঝ? ফল বিস্তৃত হয় কেন? কয়েক প্রকার বিস্তার-পদ্ধতির নাম কর।

3. মটরশুঁটি, আম, পেয়ারা, ধান প্রভৃতি ফল কোন্ জাতীয়? ইহাদের কোন্ অংশগুলি খাওয়া হয়?

4. প্রকৃত ও অপ্রকৃত ফল বলিতে কি বোঝ? পুষ্পাক্ষ বা বৃতি রূপান্তরিত হইয়া যে সব ফল হয়, তাহাদের উদাহরণসহ নাম বল।

5. **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ:**
(ক) ক্যাপসিউল, (খ) ক্যারিওপসিস, (গ) গুচ্ছিত ফল, (ঘ) যৌগিক ফল, (ঙ) তন্তুময় ড্রুপ ও (চ) অপ্রকৃত ফল।

● **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন** [*Objective Questions*]:

6. **বাঁদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত কর:**

বাঁদিক	ডানদিক
(ক) কাঁঠাল, আনারস	সরল ফল।
(খ) আতা, নোনা	যৌগিক ফল।
(গ) টমেটো, লেবু, ঢেঁড়স	গুচ্ছিত ফল।
(ঘ) ধানের যে অংশ খাওয়া হয়, তাহার নাম	মধ্যত্বক।
(ঙ) আমের যে অংশ খাওয়া হয়, তাহার নাম	সস্য।
(চ) লেবুর যে অংশ খাওয়া হয়, তাহার নাম	ডিম্বাশয়ের রসস্ফীতকোষ।

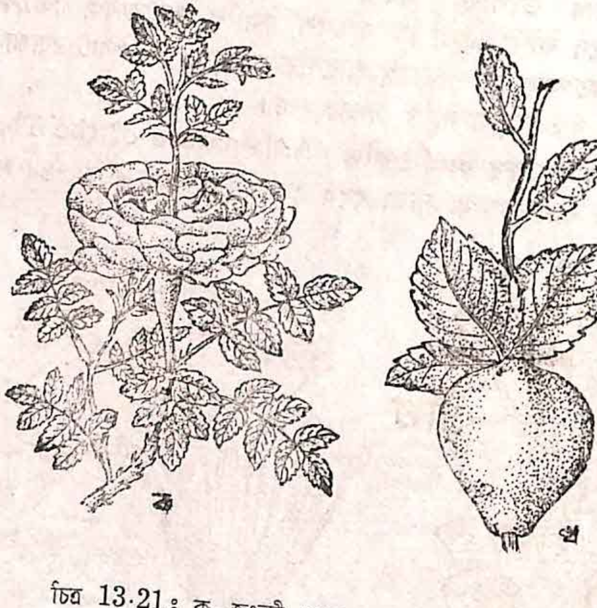
7. **বন্ধনী হইতে সঠিক শব্দ নির্বাচন করিয়া বাক্যগুলি সম্পূর্ণ কর:**
(ক) নারিকেল ফলের নাম—(**ক্যেরিওপসিস, অ্যাকিন, তন্তুময় ড্রুপ**)।
(খ) কদবেল ফলের নাম—(**পেপো, অ্যাম্ফিসারকা, অ্যাকিন**)।
(গ) বিদারী ফলের উদাহরণ—(**কলা, ঢেঁড়স, আতা**)।

8. **শূন্যস্থান পূর্ণ কর:**
(ক) —ফলত্বক ও বীজত্বক অবিচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন থাকে।
(খ) অপরাজিতার ফল—প্রকোষ্ঠযুক্ত ডিম্বাশয় হইতে গঠিত হয়।

13·20খ) প্রভৃতি ফুলের ক্ষেত্রে পুষ্পাক্ষ যথেষ্ট লম্বা। এতে পর্ব ও পর্ব-মধ্য স্পষ্ট। এইসব ক্ষেত্রে দলমণ্ডল ও পুংস্তবকের মধ্যবর্তী দীর্ঘ পর্ব-মধ্যকে **পুংধর বা অ্যান্ড্রোফোর** (Androphore) বলে। পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবকের মধ্যবর্তী দীর্ঘ পর্বমধ্য **স্ত্রীধর বা গাইনোফোর** (Gynophore)।

উদাহরণ—**ক্যাপারিস** (চিত্র 13·20ক), **শ্বেত হুরহুরে** (চিত্র 13.19) ইত্যাদি।

শীর্ষদেশে স্ত্রীস্তবক থাকায় পুষ্পাক্ষের বৃদ্ধি সাধারণতঃ সীমিত। কিন্তু, চারটি স্তবক ধারণ করার পরেও জংলী গোলাপের পুষ্পাক্ষ (চিত্র 13·21ক) ফুলকে ভেদ করে পুনরায় স্বাভাবিক কাণ্ডের মতো শাখা-প্রশাখা ও পাতা ধারণ করে এবং এইভাবেই পুষ্পাক্ষের কাণ্ড চরিত্র প্রকাশ পায়। সময়



চিত্র 13·21ঃ ক—জংলী গোলাপ ; খ—নেসপাতি।

সময় নেসপাতিতেও (চিত্র 13·21খ) এই ধরনের পুষ্পাক্ষ-বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। পুষ্পাক্ষ যে প্রকৃতপক্ষে কাণ্ড এই দৃষ্টান্তগুলি তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

(B) **পুষ্পপত্রের পত্র-প্রকৃতি** (**Leaf-nature of the Floral leaves**) ঃ

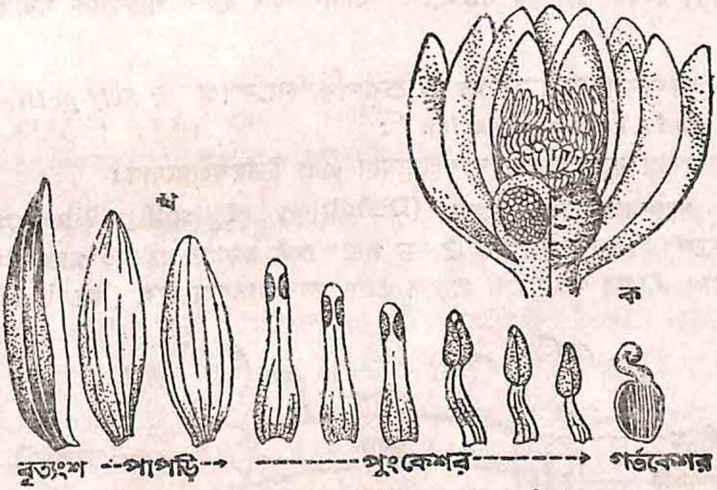
বৃত্যংশ প্রধানত পাতার মতো সবুজ। বৃত্যংশের শিরাবিন্যাস রীতি পত্রের শিরাবিন্যাস রীতির অনুরূপ, তাছাড়া উভয় ক্ষেত্রেই পত্ররন্ধ্র আছে। **মুসাণ্ডার** (Mussaenda) (চিত্র 13·22) পাঁচটি বৃত্যংশের মধ্যে অন্ততঃ একটি হুবহু সাধারণ পাতায় রূপান্তরিত হয়।

পুংকেশরের আকৃতি সাধারণত পাতার মতো নয়। কিন্তু **শালুক ফুলের** পুংকেশর পর্যবেক্ষণ করলে কিভাবে বৃত্যংশ পরিবর্তিত হয়ে ক্রমশঃ পুংকেশর ও গর্ভকেশরের আকৃতি লাভ করে, তা স্পষ্ট বোঝা যায় (চিত্র 13·23)।

অনেক ক্ষেত্রেই **জবা, অপরাজিতা, রজনীগন্ধা, স্থলপদ্ম, গোলাপ** প্রভৃতি ফুলের অধিকাংশ পুংকেশর পাপড়িতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং উপরের দৃষ্টান্ত থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, পুংকেশর, দলাংশ, বৃত্যংশ প্রভৃতি পুষ্পপত্রগুলি প্রকৃতপক্ষে পাতার পরিবর্তিত রূপ।



চিত্র 13·22—মুসাণ্ডা।



চিত্র 13·23ঃ ক—শালুক ফুলের তিন-চতুর্থাংশ কর্তিত অবস্থায়; খ—শালুকের বৃত্যংশ, দলাংশ (পাপড়ি) প্রভৃতির ক্রম-পরিবর্তন।

(C) পুষ্পপত্রের সজ্জা-পদ্ধতি (Arrangement of Floral leaves) ঃ

বৃত্যংশ, দলাংশ, পুংকেশর প্রভৃতি পুষ্পপত্রগুলির সজ্জা-পদ্ধতি, পত্রবিন্যাস রীতিকেই অনুসরণ করে। অর্থাৎ পুষ্পপত্রগুলি পাতার চরিত্র প্রকাশ করে।

(D) পুষ্পমুকুল ও জায়মান মুকুলের সাদৃশ্য (Similarities between Floral buds and Vegetative buds) ঃ

উভয় মুকুলই কাণ্ডের শীর্ষে বা পাতার কক্ষে জন্মায়। জায়মান মুকুলের পত্রবিন্যাস ও পুষ্পমুকুলের পত্রবিন্যাস একইপ্রকৃতির।

(গ) বৃতি ফল গঠনে অংশ লইলে সেই ফল— ।
(ঘ) —অন্তস্ত্বক ও মধ্যত্বক রসাল হয়।

9. **মৌখিক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ**

(ক) ফল ও বীজের তফাৎ কি?
(খ) সরল ও যৌগিক ফলের পার্থক্য উদাহরণ দিয়া বোঝাও।
(গ) একটি ফলিকল-এর নাম কর। ইহা কোন্ জাতীয় ফল?
(ঘ) এমন একটি সরস ফলের নাম কর, যাহাতে একটি গর্ভপত্র থাকে।
(ঙ) এমন একটি ফলের নাম কর, যাহা সম্পূর্ণ পুষ্পমঞ্জরী হইতে গঠিত হয়।
(চ) ধান কোন্ জাতের ফল?

পঞ্চদশ অধ্যায়

● **সাধারণ প্রশ্ন** (*General Questions*) :

1. বীজ কিভাবে গঠিত হয়? বীজ কয় প্রকার? বীজের বাহিরের ত্বককে কি বলে?

2. অসস্যাল ও সস্যাল বীজ কাহাকে বলে? একটি অসস্যাল বীজের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। ঐ বীজের খাদ্য কোথায় জমা থাকে?

3. ডিম্বকরন্ধ্র, ডিম্বকনাভী বলিতে কি বোঝ? ভ্রূণ কাহাকে বলে? একবীজপত্রীর ভ্রূণকে কি বলে?

4. অঙ্কুরোদ্গম বলিতে কি বোঝ? অঙ্কুরোদ্গমের জন্য কি কি শর্ত প্রয়োজন? একটি পরীক্ষার মাধ্যমে ঐ শর্তগুলির প্রয়োজনীয়তা দেখাও।

5. ছবি আঁকিয়া একটি ভুট্টাবীজের গঠন দেখাও। ইহাতে কোন্ জাতীয় অঙ্কুরোদ্গম দেখা যায়?

6. **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ**

(ক) মৃদ্‌বর্তী ও মৃদ্‌ভেদী অঙ্কুরোদ্গম, (খ) ক্যারাঙ্কল, (গ) ভ্রূণাক্ষ, (ঘ) অন্তর্বীজ, (ঙ) সস্যাল ও অসস্যাল বীজ, (চ) স্ক্যুটেলাম, (ছ) মূলাবরণী, (জ) বীজপত্রাধিকাণ্ড ও বীজপত্রাবকাণ্ড, (ঝ) যান্ত্রিক বিস্তার, (ঞ) প্যাপাস ও (ট) বিস্ফোরক ফল।

● **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন** [*Objective Questions*] :

7. **বাঁদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত করঃ**

বাঁদিক	ডানদিক
(ক) বীজের বাহিরের আবরণকে	অন্তর্বীজ বলে।
(খ) ভ্রূণাক্ষের বীজপত্র-সংলগ্ন নীচের অংশকে	বীজ বহিস্ত্বক বলে।
(গ) বীজত্বক অপসারিত হইলে যে অংশ থাকে, তাহাকে	বীজপত্রাবকাণ্ড বলে।
(ঘ) রেড়ি বীজে	মৃদ্‌বর্তী অঙ্কুরোদ্গম দেখা যায়।
(ঙ) ছোলা বীজে	মৃদ্‌ভেদী অঙ্কুরোদ্গম দেখা যায়।

8· **বন্ধনী হইতে সঠিক শব্দ নির্বাচন করিয়া বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করঃ**

(ক) রেড়িবীজের বীজত্বকের ভিতরের সাদা অংশটির নাম—(**বীজপত্র, সস্য, ভ্রূণাক্ষ**)।

(খ) ছোলাবীজ—(**সস্যল, অসস্যল**)।

(গ) ভুট্টাবীজের ভ্রূণমুকুলের আবরণটির নাম—(**ভ্রূণমূলাবরণী, ভ্রূণমুকুলাবরণী**)।

9· **মৌখিক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ**

(ক) স্ট্রফিওল কাহাকে বলে? (খ) বীজ কিভাবে গঠিত হয়? (গ) বীজের কোন্ অংশকে ক্যারাঙ্কল বলে? (ঘ) ডিম্বকনাভীচিহ্নের কাজ কি? (ঙ) বীজের কোন্ অংশটিকে অন্তবীর্জ বলে? (চ) বীজপত্রাবকান্ড ও বীজপত্রাধিকান্ডের সহিত অঙ্কুরোদ্গমের সম্বন্ধ কি? (ছ) অসস্যল বীজ কাহাকে বলে? একটি উদাহরণ দাও ও (জ) বিস্ফোরক ফল কাহাকে বলে?

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

1· যে কোন একটি ফুলের বর্ণনা দাও।

2· একটি সম্পূর্ণ উভলিঙ্গ ফুলের সচিত্র বর্ণনা দাও।

3· একটি একলিঙ্গ ফুলের সচিত্র বিবরণ দাও।

4· একটি সম্পূর্ণ, অসমাঙ্গ কিন্তু উভলিঙ্গ ফুলের ছবি আঁক ও বিভিন্ন অংশ লেবেল কর।

সপ্তদশ অধ্যায়

● **সাধারণ প্রশ্ন** (*General Questions*)ঃ

1· ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ আঁকিয়া লেবেল কর। পৌষ্টিক গ্রন্থিগুলির নাম করিয়া কোন্‌টি কি কাজ করে বল।

2· শ্বসন কাহাকে বলে? ব্যাঙের ফুসফুসীয় শ্বসন-পদ্ধতির বর্ণনা দাও। অন্যান্য কি উপায়ে ব্যাঙের শ্বাসকার্য চলে?

3· ব্যাঙের রক্তের গঠন বল। হৃৎপিন্ডের একটি ছবি আঁকিয়া হৃৎপিন্ডের মধ্য দিয়া কিভাবে রক্তের চক্রাবর্তন ঘটে বিবৃত কর।

4· ব্যাঙের রেচনতন্ত্র ও জননতন্ত্রের কোন পার্থক্য আছে কি? বিডার-এর অঙ্গের ও চর্বি অঙ্গের কাজ কি?

5· রূপান্তর বলিতে কি বোঝ? ব্যাঙের জীবন-ইতিহাস বিবৃত করিয়া প্রাণীটির রূপান্তর চিত্রের মাধ্যমে বিবৃত কর।

6· **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ**

(ক) বহিঃস্থফুলকা, (খ) ব্যাঙাচি, (গ) গর্বিনী, (ঘ) সাইনাস ভেনোসাস, (ঙ) ব্যাঙের জিব ও (চ) পিত্তথলি।

(E) **পুষ্পমুকুলের জায়মান মুকুলের রূপান্তর** (Transformation of Floral buds to vegetative buds) ঃ

খামআলু, গ্লোব্বা প্রভৃতি গাছের পুষ্পমুকুল **বাল্‌বিল** (Bulbil) নামক **জায়মান** মুকুলে রূপান্তরিত হয়। আনারসের মঞ্জরীদণ্ডের উপর অবস্থিত এক বা একাধিক মুকুল এই পরিবর্তনের সপক্ষেই সায় দেয়।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, **পুষ্প প্রকৃতপক্ষে একটি পরিবর্তিত বিটপ** (Flower is a modified shoot)।

13.20. পরাগযোগ [*Pollination*] :

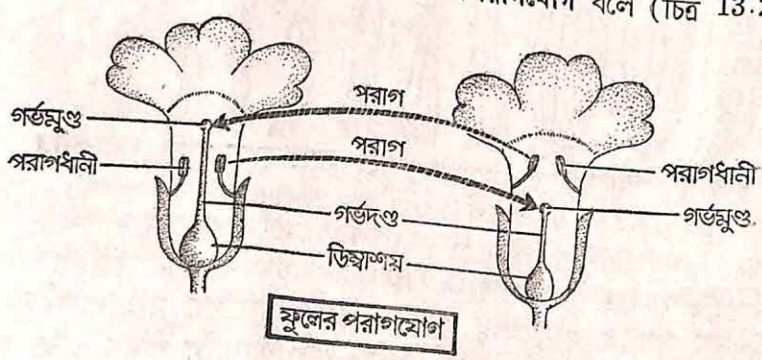
বংশবিস্তারে সাহায্য করাই ফুল ফোটার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গর্ভমুণ্ডে পরাগের স্থানান্তরিত হওয়া প্রয়োজন। পরাগের এই স্থানান্তর প্রক্রিয়াই পরাগযোগ।

● **পরাগযোগের সংজ্ঞা** (Definition of pollination) ঃ **ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হবার প্রক্রিয়াকে পরাগযোগ বলে।**

13.21. স্বপরাগযোগ ও ইতরপরাগযোগ [*Self-pollination and Cross-pollination*] :

পরাগযোগ দু প্রকার ঃ **স্বপরাগযোগ** এবং **ইতরপরাগযোগ।**

● **স্বপরাগযোগের সংজ্ঞা** (Definition of self-pollination) ঃ কোন ফুলের পরাগধানী থেকে উৎপন্ন পরাগ সেই ফুলের বা সেই গাছে উৎপন্ন অন্য কোন ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়লে তাকে **স্বপরাগযোগ** বলে (চিত্র 13.25)।



চিত্র 13.24—দুটি ফুলের মধ্যে পরাগযোগ।

● **ইতর পরাগযোগের সংজ্ঞা** (Definition of cross-pollination) ঃ কোন ফুলের পরাগধানী থেকে উৎপন্ন পরাগ একই প্রজাতির অন্য কোন গাছে উৎপন্ন ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়লে তাকে **ইতর পরাগযোগ** বলে (চিত্র 13.25)।

(A) **স্বপরাগযোগ ঘটানোর জন্য কলাকৌশল বা অভিযোজন** (Contrivances or adaptations for self-pollination) :

(1) **উভলিঙ্গতা** বা **বাইসেক্সুয়্যালিটি** (Bisexuality) : সাধারণ প্রায় সব উভলিঙ্গ ফুলেই স্বপরাগযোগ ঘটার অধিক সম্ভাবনা থাকে। কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম ঘটে। অর্থাৎ উভলিঙ্গতা স্বপরাগযোগের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

(2) **সমপরিণতি** বা **হোমোগ্যামী** (Homogamy) : স্বপরাগযোগ ঘটার জন্য ফুল উভলিঙ্গ হ'লেও তার পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক একই সময়ে পরিণত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বপরাগযোগ কার্যকর করতে বিশেষ বিশেষ কলাকৌশল অবলম্বিত হয়। কৃষ্ণকলি ফুলের পুংদণ্ড গর্ভদণ্ডকে বেষ্টন করে থাকে। সূর্যমুখীর গর্ভদণ্ড ক্রমশঃ পরাগধানীর নিকটবর্তী হয়। ডিজিটালিসের পরাগধানীসমন্বিত দলাংশ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গর্ভমুণ্ডের উপরে পড়ে। এইভাবে নানাপ্রকার অভিযোজন মাধ্যমে স্বপরাগযোগ অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে।

(3) **অনুন্মীলন** বা **ক্লিস্টোগ্যামী** (Cleistogamy) : কোন কোন ফুল কখনই প্রস্ফুটিত হয় না, ফলে এই জাতীয় ফুলে স্বপরাগযোগ অবশ্যম্ভাবী। উদাহরণ—**আমরুল, কমেলিনা বেঙ্গালেনসিস** ইত্যাদি।

(B) **ইতর পরাগযোগ ঘটানোর জন্য কলাকৌশল বা অভিযোজন** (Contrivances or adaptations for cross-pollination) :

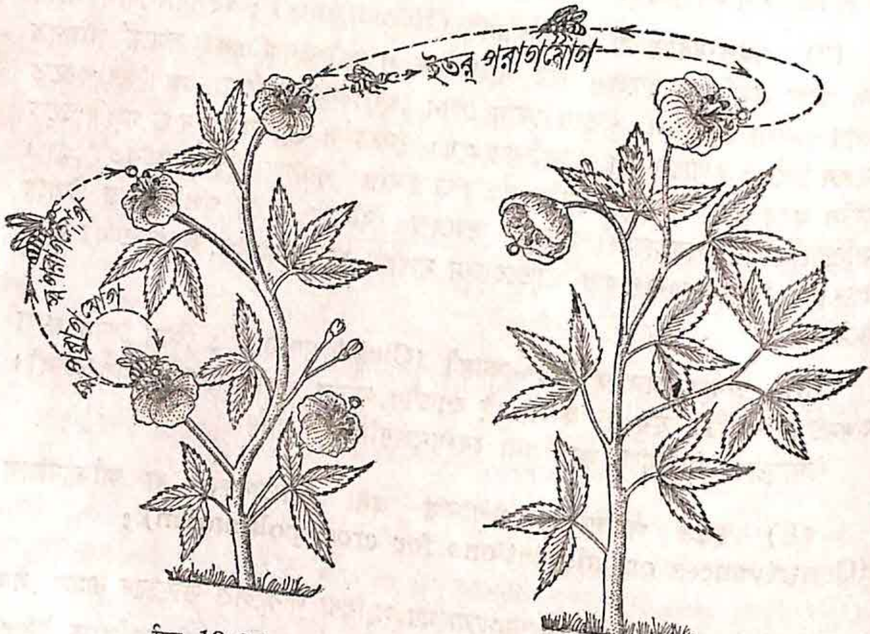
স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক স্বপরাগযোগের সুবিধা থাকলেও উদ্ভিদে এমন সব কলাকৌশল অবলম্বিত হয় যাতে স্বপরাগযোগের পরিবর্তে প্রকৃতিতে ইতর-পরাগযোগের ঘটনা বেশী ঘটে। কারণ ইতরপরাগযোগের ফলে নতুন বংশক্রমে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহনকারী **জিনের মিশ্রণ ঘটে। ফলে নতুন বংশধররা সুস্থ, সবল, রোগপ্রতিরোধক্ষম** এবং **অধিক বলবান ও পুষ্ট হয়।** নীচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কলাকৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল।

1. **একলিঙ্গ** বা **ডাইক্লাইনি** (Dicliny) : ভিন্নবাসী উদ্ভিদের একলিঙ্গ ফুলে কেবল ইতর পরাগযোগই সম্ভব। পেঁপে, তাল প্রভৃতির ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক উদ্ভিদে পুং ও স্ত্রী পুষ্প থাকে। এই সব ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই ইতর পরাগ-যোগ ঘটে।

2. **বিষমপরিণতি** বা **ডাইকোগ্যামী** (Dichogamy) : অনেক সময় ফুল উভলিঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে স্বপরাগযোগ সম্ভবপর হয় না। কারণ সেক্ষেত্রে

পুংকেশর ও গর্ভপত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিণতি লাভ করে। ইতরপরাগযোগ কোন কারণে সম্ভবপর না হ'লে সেখানে কদাচিৎ স্বপরাগযোগ হ'য়ে থাকে। বিষমপরিণতি দু'প্রকার, যেমন—

(i) **প্র-পুংপরিণতি বা প্রোট্যান্ড্রি** (Protandry) ঃ **পুংকেশর গর্ভপত্রের আগেই পরিণত হ'য়ে পরাগ** ছড়িয়ে দিলে সেই অবস্থাকে প্র-পুংপরিণতি বলে।



চিত্র 13.25—স্বপরাগযোগ ও ইতর পরাগযোগ পদ্ধতি।

এইভাবে অন্য গাছের গর্ভমুণ্ডে সেই পরাগের স্থানান্তর ফলপ্রসূ হ'লেও নিজ ফুলের গর্ভমুণ্ডের সংস্পর্শে পরাগ নিষ্ক্রিয় থেকে যায়।

উদাহরণ—**গাঁদা, জবা** প্রভৃতি।

(ii) **প্র-স্ত্রীপরিণতি বা প্রোটোগাইনি** (Protogyny) ঃ এক্ষেত্রে ফুল উভলিঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও **পুংকেশর পরিণত হবার আগেই গর্ভপত্র পরিণত হয়।** তাই স্বপরাগযোগ কার্যকরী হয় না। যেমন—আতা, নোনা গোত্রীয় (অ্যানোনাসী) বহু ফুল এবং **কনকচাঁপা, ম্যাগনোলিয়া** প্রভৃতি ফুল। এক্ষেত্রে পরিণত গর্ভপত্রকে পরাগযোগের জন্য স্বগোত্রীয় অন্য উদ্ভিদের পরাগের উপর নির্ভর করতে হয়।

3. **স্বসংগমরোধী** (Herkogamy) ঃ এমন অনেক উভলিঙ্গ ফুল আছে,

যাদের **পুংকেশর ও গর্ভপত্র একই সময়ে পরিণত হ'লেও কেবল গঠনগত বাধার জন্য স্বপরাগযোগ সম্ভবপর হয় না।** এইসব ক্ষেত্রে ইতর পরাগযোগ অপরিহার্য। যেমন—

(i) সরিষা গোত্রীয় অধিকাংশ ফুলে পুংকেশর গর্ভমুণ্ডের অনেক নীচে অবস্থান করে।

(ii) ঘেঁটু ফুলের গর্ভদণ্ড বেঁকে এমনভাবে দূরে চ'লে যায় যে, সেই ফুলের পরাগ গর্ভমুণ্ডে পড়ার সুযোগ পায় না।

(iii) **উলটচণ্ডাল** (*Gloriosa*) ফুলের পরাগধানী গর্ভমুণ্ডের উল্টো-দিকে ফেটে যায়। সুতরাং সেখানে স্বপরাগযোগ সম্ভব নয়।

(iv) **আকন্দ ও অর্কিড ফুলে** পলিনিয়া গঠিত হবার ফলে স্বপরাগযোগ অসম্ভব। মৌমাছি জাতীয় পতঙ্গ পলিনিয়াকে টেনে বার ক'রে তাকে অন্য গাছের ফুলে ব'য়ে নিয়ে যায় এবং যথারীতি ইতর পরাগযোগ ঘটায়।

4. **অসম অঙ্গসংস্থান** বা **হেটারোমরফিজম** (Heteromorphism) ঃ অনেক গাছে দু'রকম আকৃতিবিশিষ্ট (ডাইমরফিক) বা তিনরকম আকৃতিবিশিষ্ট (ট্রাইমরফিক) ফুল হয় যাদের পুংকেশর ও গর্ভমুণ্ডের উচ্চতা ভিন্ন ভিন্ন রকমের। ফুলে যদি বিভিন্ন উচ্চতার (দৈর্ঘ্যের) গর্ভদণ্ড থাকে তবে সেই অবস্থাকে **হেটারোস্টাইলি** (Heterostyly) এবং বিভিন্ন উচ্চতা বা দৈর্ঘ্যের পুংকেশর থাকলে সেই অবস্থাকে **হেটারোঅ্যান্থি** (Heteroanthy) বলে।

বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের গর্ভদণ্ডযুক্ত ফুল **দ্বিরূপ** অর্থাৎ **ডাইমরফিক** (Dimorphic) বা **ত্রিরূপ** অর্থাৎ **ট্রাইমরফিক** (Trimorphic) হয়।

(i) **ডাইমরফিক ঃ** ডাইমরফিকের ক্ষেত্রে দু'ধরনের ফুল হয়। এদের একটিতে লম্বা গর্ভদণ্ড ও তার নীচে পুংকেশর থাকে। অন্যটিতে ছোট গর্ভ-দণ্ড ও অনেক উপরে পুংকেশর থাকে।

উদাহরণ—**পাথরকুচি, পানমরিচ, প্রাইমুলা** ইত্যাদি।

(ii) **ট্রাইমরফিক ঃ** ট্রাইমরফিকের ক্ষেত্রে তিন ধরনের ফুল হয়। এই-সব ফুলে বেঁটে, মাঝারি ও লম্বা পুংকেশর ও গর্ভদণ্ড হয়।

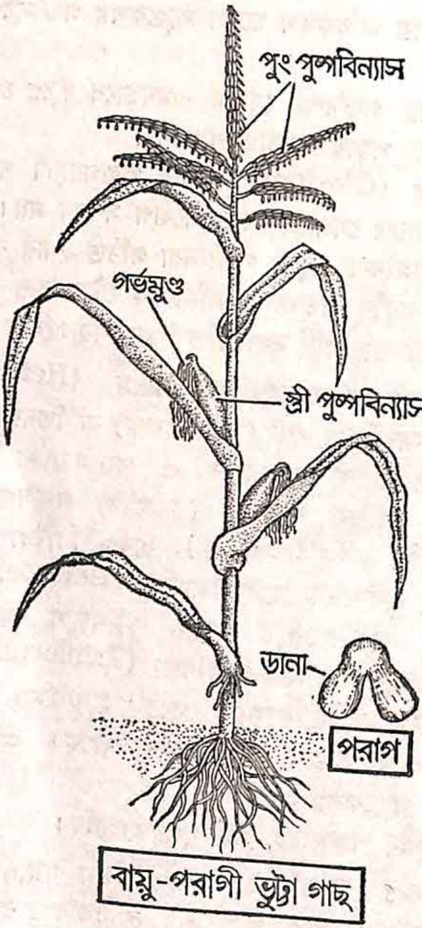
উদাহরণ—**কামরাঙ্গা, আমরুল** ইত্যাদি।

13.22. পরাগযোগের বাহক [*Agents of Pollination*]:

উভলিঙ্গ ফুলে কোন কোন ক্ষেত্রে বাইরের সাহায্য ছাড়াই স্বপরাগযোগ ঘটে। তবে অধিকাংশ পরাগ স্বেচ্ছায় অধিক দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে না।* তাই পরাগযোগের জন্য কোন না কোন বাহকের প্রয়োজন। **বায়ু, জল, পতঙ্গ** ও অন্যান্য প্রাণী পরাগযোগের বাহক হিসাবে কাজ করে। বাহকের প্রকৃতির উপর নির্ভর ক'রে ফুলকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

* ব্যতিক্রম—পাইনের পরাগ নিজস্ব ডানায় ভর করে বহুদূর অতিক্রম করিতে পারে।

(1) **বায়ুপরাগী** বা **অ্যানিমোফিলাস ফুল** (Anemophilous flowers) ঃ যে ফুলের পরাগ বায়ু দ্বারা বাহিত হয়, তাকে বায়ুপরাগী ফুল বলে।



চিত্র 13·26—বায়ুপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য (পাশে পাইনের ডানাযুক্ত পরাগ)।

● **বায়ুপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য** (Characteristic features of anemophilous flowers) ঃ

(i) ফুলগুলি সাধারণত **সাদা** বা **অনুজ্জ্বল, ক্ষুদ্রাকৃতি** এবং দেখতে **সুন্দর নয়**।

(ii) ফুলে **গন্ধ থাকে না**।

(iii) ফুলে **মকরন্দ** (Nectar) জমে না।

(iv) পুংদণ্ড লম্বা, তাই **দোদুল্যমান পরাগধানী দলমণ্ডলের বাইরে চলে** আসে।

(v) বাহিত হবার সময় পরাগের অপচয় পূরণ করার জন্য **বেশী পরিমাণে পরাগ সৃষ্টি** হয়।

(vi) ওড়ার সুবিধার জন্য **পরাগ অত্যন্ত হাল্কা হয়।**

(vii) **গর্ভমুণ্ড শাখাসম্বলিত ও পক্ষল** (Feathery) হয় যাতে উড়ন্ত পরাগ সহজে ধরা পড়ে।

ধান, ভুট্টা (চিত্র 13.26) প্রভৃতি গাছের ফুল বায়ুপরাগী। ভুট্টা গাছের আগায় পুং পুষ্পবিন্যাস থাকে। অপেক্ষাকৃত নীচে পাতার কক্ষে একাধিক স্ত্রী পুষ্পবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। ভুট্টার গর্ভমুণ্ড একগুচ্ছ রেশমী সুতোয় পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতোগুলি এমনভাবে ঝুলতে থাকে যাতে গাছের উপরের দিকে অবস্থিত পুংপুষ্পের পরাগ বাতাস-বাহিত হয়ে সহজেই ঐ সুতোর সংস্পর্শে আসতে পারে। পাইনের পরাগ ডানাযুক্ত এবং হলুদ বর্ণের। পাইনের অসংখ্য পরাগ একত্রে বায়ু তাড়িত হয়ে অন্যত্র উড়ে যায়। উড়ে যাওয়ার সময় এগুলিকে **গন্ধকের ধুলো** (Sulphur dust) বলে মনে হয়।

(2) **জলপরাগী** বা **হাইড্রোফিলাস ফুল** (Hydrophilous flowers) : জলের সাহায্যে পরাগযোগ ঘটলে ফুলকে **জলপরাগী** বলে। কেবল জলজ উদ্ভিদের পরাগই জলের দ্বারা বাহিত হবার সুযোগ পায়। জলের তলদেশে বা উপরিতলে পরাগযোগ সংঘটিত হয়।

● **জলপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য** (Characteristic features of hydrophilous flowers) :

(i) বায়ুপরাগী ফুলের মতো এই ফুলগুলিও **আকারে ছোট** এবং **অনুজ্জ্বল।**

(ii) **জলের ভিতরে পরাগযোগ ঘটে এমন ফুলের পরাগ ভারী হয়।**

(iii) পাতাশেওলা, ঝাঁঝি প্রভৃতি ফুলের পরাগযোগ জলের উপরিতলে ঘটে।

পাতাশেওলা (*Vallisneria*) **গাছে পরাগযোগের বৈশিষ্ট্য :** পাতাশেওলা ভিন্নবাসী উদ্ভিদ। পরিণত হলে পুংপুষ্প বৃন্তচ্যুত হয়ে জলের উপরে উঠে আসে এবং ঢেউয়ের দোলায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভেসে বেড়ায়। স্ত্রী-পুষ্প লম্বা বৃন্তযুক্ত। অপরিণত অবস্থায় বৃন্ত প্যাঁচানো থাকে। পরিণত হলে বৃন্তের প্যাঁচ আলগা হয়ে ফুলটি জলতলের উপরে উঠে আসে। স্ত্রীপুষ্প

● **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন [*Objective Questions*]ঃ**

7. বাঁদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত করঃ

বাঁদিক	ডানদিক
(ক) ব্যাঙ শ্বাসকার্য চালায়	ফুলকার সাহায্যে।
(খ) ব্যাঙাচি শ্বসন চালায়	ত্বকের সাহায্যে।
(গ) যকৃৎ ব্যাঙের	শ্বাসযন্ত্র।
(ঘ) ফুসফুস ব্যাঙের	পাচন-গ্রন্থি।

8. বন্ধনী হইতে সঠিক শব্দ নির্বাচন করিয়া বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করঃ

(ক) ব্যাঙের লোহিত কণিকায়—(**প্লাজমা থাকে, হিমোগ্লোবিন থাকে, অনুচক্রিকা থাকে**)।

(খ) ব্যাঙের জিবের অগ্রভাগ—(**খোলা থাকে, মুক্ত থাকে**)।

(গ) অগ্ন্যাশয় হইতে ক্ষরিত পদার্থের নাম—(**দেহরস, অগ্ন্যাশয় রস, পিত্ত**)।

9. মৌখিক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

(ক) পিত্তের কাজ কি? ইহা কোথায় উৎপন্ন হয়? (খ) ট্রাঙ্কাস আর্টারিও-সাসের কাজ কি? (গ) হিমোগ্লোবিনের কাজ কি? (ঘ) সিস্টোল ও ডায়াস্টোল কথার অর্থ কি? ও (ঙ) ব্যাঙের ডিম্বাশয় দেখিতে কিরূপ?

অষ্টাদশ অধ্যায়

1. ব্যাঙকে সংজ্ঞাহীন করার পদ্ধতি ও ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

2. কুনোব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি বর্ণনা কর এবং পৌষ্টিকতন্ত্রের সচিত্র বর্ণনা দাও।

3. কুনো ব্যাঙের ধমনী আর্চ ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি বর্ণনা কর এবং আর্চগুলির ছবি এঁকে লেবেল কর।

4. পুরুষ বা স্ত্রী কুনো ব্যাঙের রেচনতন্ত্র ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতির বর্ণনা দাও এবং রেচনতন্ত্রের ছবি এঁকে প্রয়োজনীয় অঙ্গাগুলি লেবেল কর।

5. পুরুষ কুনো ব্যাঙের জননতন্ত্র ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি বর্ণনা কর। ব্যবচ্ছেদিত অঙ্গের ছবি এঁকে লেবেল কর।

6. স্ত্রী কুনো ব্যাঙের জননতন্ত্র ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি বর্ণনা কর। ব্যবচ্ছেদিত অঙ্গের ছবি এঁকে লেবেল কর।

ঊনবিংশ অধ্যায়

● **সাধারণ প্রশ্ন** (*General Questions*) ঃ

1. মনুষ্য জীবন সম্পর্কিত জীব বলিতে কি বোঝ? কয়েকটি জীবের নাম কর এবং যে কোন একটি জীব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

2. তুলা, পাট আমাদের কি কাজে লাগে? মারসিরাইজ সুতা বলিতে কি বোঝ?

3. ধান, নারিকেল কিভাবে মানুষের উপকারে আসে বল। কিভাবে ইহাদের চাষ হয় ও ইহাদের উপযোগিতা বিবৃত কর।

4. কেঁচো কৃষকের বন্ধু কেন?

5. মাছি আমাদের কিভাবে ক্ষতি করে? মাছির জীবনচক্র ও মাছি দমন সম্বন্ধে লেখ।

6. মাছিবাহিত রোগগুলির নাম কর। মাছির বিজ্ঞানসম্মত নাম লিখ। মাছি দমন কিভাবে সম্ভব?

7. কত রকম মৌমাছি আছে? মৌমাছির উপযোগিতা কি? কর্মী-মৌমাছি কি কি কাজ করে? মোম কিভাবে উৎপন্ন হয়?

8. মৌমাছিকে সমাজবন্ধ জীব বলা হয় কেন? মানবজীবনে মৌমাছির গুরুত্ব বিস্তারিত লেখ। মৌমাছির বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখ।

9. মশার জীবন-চক্র বর্ণনা কর। মশা কত রকমের এবং এরা কি কি রোগ সৃষ্টি করে? মশা দমনের উপায়গুলি সম্বন্ধে বল।

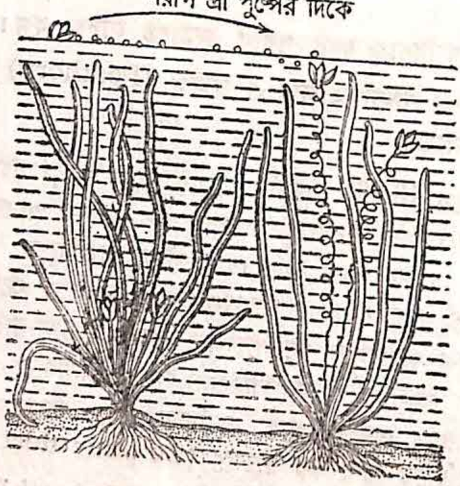
10. **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ**

(ক) ড্রোন, (খ) ডেঙ্গুজ্বর, (গ) যৌন দ্বিরূপতা, (ঘ) মাছি, (ঙ) অ্যানোফিলিস মশা, (চ) পিউপা, (ছ) মৌ মোম, (জ) মধু ও (ঝ) মধুনিষ্কাশক যন্ত্র।

11. **পার্থক্য নির্দেশ করঃ—**

(ক) মশা ও মৌমাছির শূককীট, (খ) ড্রোন ও কর্মী মৌমাছি, (গ) অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশা।

পুংপুষ্পের সংস্পর্শে আসা মাত্র পরাগধানী ফেটে যায় এবং পরাগ গর্ভমুণ্ডে লাগে। পরাগযোগের পর স্ত্রী পুষ্পের বৃন্তটি আবার গুটিয়ে স্বস্থানে ফিরে যায়।



চিত্র 13·27—জলপরাগী পাতাশেওলার পরাগযোগ।

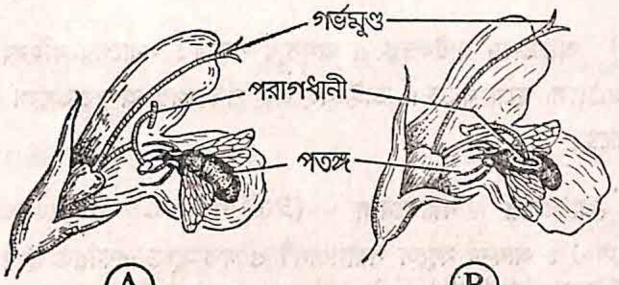
(3) **পতঙ্গপরাগী বা এণ্টোমোফিলাস ফুল** (Entomophilous flowers) ঃ যে ফুলের পরাগ কীট-পতঙ্গাদির সাহায্যে বাহিত হয় তাকে পতঙ্গপরাগী ফুল বলে। এই ফুল নানা দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কারণ কীট-পতঙ্গ আকর্ষণ করার মতো নানান চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এই সব ফুলে প্রকাশ পায়।

● **পতঙ্গপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য** (Characteristic features of entomophilous flowers) ঃ

(i) **উজ্জ্বল বর্ণ** ঃ পতঙ্গপরাগী অধিকাংশ ফুলই **আকৃতি ও রং-এর বাহারে দৃষ্টি আকর্ষী**। বহু ক্ষেত্রে **দলমণ্ডল** বহুবর্ণরঞ্জিত হওয়া ছাড়াও এতই উজ্জ্বল হয় যে কীট-পতঙ্গ সহজেই আকৃষ্ট হয়। দলমণ্ডলের আকর্ষণ না থাকলেও **মুসাণ্ডা নামক** গাছে বিশেষ এক ধরনের অভিযোজন লক্ষ্য করা যায়। সেখানে এক বা **একাধিক বৃত্যংশ পাতার মতো** বড়ো হয় এবং হলুদ, গোলাপী বা সাদা বর্ণের হয়ে পতঙ্গাদি আকর্ষণ করে। **বাগানবিলাস** গাছে ফুলের **মঞ্জরীপত্র রঙ্গীন** হ'য়ে পরাগযোগে সহায়তা করে। তবে অধিকাংশ রঙ্গীন ফুলের দলগুলি অতি সহজেই কীটপতঙ্গ আকর্ষণ করতে সক্ষম।

(ii) **গন্ধ** ঃ বর্ণহীন ফুলও অনেক সময় কীটপতঙ্গ আকর্ষণে সমর্থ। বিশেষ ক'রে যে সব ফুল রাতে ফোটে, তারা এমন মিষ্টি গন্ধ ছড়ায় যে বহুদূর থেকে কীটপতঙ্গ ছুটে আসে। **যুঁই, রজনীগন্ধা, বেল, হাসনুহানা** প্রভৃতির

ফুল সাদা। এই সব ফুল রাতে ফোটে। তবু এদের **অপূর্ব গন্ধের আকর্ষণ** কীটপতঙ্গ অবহেলা করতে পারে না।



চিত্র 13·28—পতঙ্গ পরাগী ভুঁইতুলসী ফুলের মিষ্টিরস আহরণের পূর্বে (A) ও পরে (B) পরাগধানীর অবস্থান।

(iii) **সুমিষ্ট রস** : অধিকাংশ যুক্তদলমণ্ডলবিশিষ্ট ফুলে সুমিষ্ট রস নিঃসৃত হয়। **রসগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস** কীটপতঙ্গকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানায়। এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা কীট-পতঙ্গের পক্ষে সম্ভব হয় না। রস সংগ্রহের সময় প্রাণিদেহে পরাগ **লেগে** যায় এবং অন্য ফুলে সেই পরাগ বাহিত হয়। ভুঁইতুলসী ফুলে (চিত্র 13·28) ইতরপরাগযোগ পদ্ধতি লক্ষ্য করার মতো।

(iv) **সুস্বাদু পরাগ** : কীট-পতঙ্গ অনেক সময় সুস্বাদু পরাগকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই পরাগ সংগ্রহের জন্য তারা ফুলে বিচরণ করে। গোল-আলু, শালুক, শিয়ালকাঁটা, চাঁপা প্রভৃতি ফুলের পরাগ অত্যন্ত মিষ্টি—তাই এইসব ফুলের পরাগ এদের বেশী পছন্দ। স্বভাবতই কীটপতঙ্গের অজ্ঞাতসারে পরাগ অন্য ফুলে বাহিত হয়।

(v) **প্রশস্ত অবতরণ ক্ষেত্র** : **গঠন ও রং-এর বাহারে অর্কিডের ফুল অতুলনীয়**। তা সত্ত্বেও কীট-পতঙ্গের সহজভাবে অবতরণ ও সেখানে তাদের স্বচ্ছন্দে বিচরণের সুযোগ করে দেবার জন্য পুষ্পপুটের অংশবিশেষ প্রসারিত হয়ে **লেবেলম (Labellum)** নামে বিশেষ একপ্রকার মঞ্চ গঠিত হয়। এই অংশটি পরাগধানীর নিকটে অবস্থিত হওয়ায় পরাগ অতি সহজে কীট-পতঙ্গের গায়ে লাগার সুযোগ পায়।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এর প্রশ্নপত্র

ADDITIONAL BIOLOGY

1984

ক—বিভাগ

(১নং প্রশ্ন ও অন্য যে কোনও দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

১। সালোকসংশ্লেষ কাহাকে বলে? ইহার প্রয়োজন কি? উদ্ভিদের কোন্ অঙ্গে এবং কখন সালোকসংশ্লেষ হয়? সালোকসংশ্লেষের রাসায়নিক সমীকরণ দাও। চিত্র সহযোগে সালোকসংশ্লেষের একটি পরীক্ষা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ১৮
[উঃ। 12·27 দেখ]

২। পরাগযোগ কি? উদ্ভিদের পরাগযোগের প্রয়োজনীয়তা কি? পরাগযোগ কত প্রকার হয়? তাহাদের সুবিধা ও অসুবিধার বিশদ বিবরণ দাও। ১৬
[উঃ। 13·20, 13·21 এবং 13·23 দেখ]

৩। বীজপত্রের সংজ্ঞা দাও ও ইহার বিভিন্ন কার্য উল্লেখ কর। চিত্রসহ একটি দ্বিবীজপত্রী বীজের গঠন বর্ণনা কর। ২+৪+১০=১৬
[উঃ। **বীজমধ্যস্থ ভ্রূণের অক্ষসংলগ্ন সাধারণত একাধিক স্থূল বা পত্রসদৃশ** অঙ্গকে বীজপত্র বলে।

বীজপত্রের কাজঃ

(1) অঙ্কুরোদ্গমের প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণাক্ষকে খাদ্য সরবরাহ করা।
(2) অঙ্কুরোদ্গমের পর বীজপত্র পাতার মতো সবুজ হ'য়ে সালোকসংশ্লেষ চালায়।
(3) একবীজপত্রীর বীজে বীজপত্র (স্কুটেলম) সস্য থেকে পৌষ্টিক পদার্থ শোষণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

শেষাংশের জন্য 15·2 বা 15·3 দেখ]

৪। প্রোথ্যালাস কি? চিত্রসহ ফার্ণের জীবনচক্রে প্রোথ্যালাসের গঠন বর্ণনা কর।
[উঃ। পৃঃ 282—286 দেখ] ২+১৪=১৬

৫। টীকা লিখঃ—
(ক) সাইটোকাইনেসিস, (খ) জাইগোস্পোর, (গ) দ্বিনিষেক, (ঘ) ধান গাছ। ৪×৪=১৬
[উঃ। (ক) পৃঃ 169 ও 177 ; (খ) পৃঃ 301—303 ; (গ) 13·25 ; (ঘ) 8·2 ও পৃঃ 619 দেখ]

খ—বিভাগ

(৬নং প্রশ্ন ও অন্য যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

৬। গিনিপিগ ও ব্যাঙের বহিরাকৃতির চিত্র অঙ্কন করিয়া পার্থক্য উল্লেখ কর।
[উঃ। চিত্র 8·47 ও 8·51 এবং 8·23 দেখ] ১২+৬=১৮

৭। চিত্রসহ কেঁচোর বহিরাকৃতির বর্ণনা দাও। ১০+৬=১৬
[উঃ। 8·13 (iv) দেখ]
৮। ব্যাঙের পাচনতন্ত্রের চিত্র দাও ও ইহার কার্য বর্ণনা কর। ৮+৮=১৬
[উঃ। চিত্র 17·2 এবং 17·2 দেখ]
৯। লার্ভা কি? চিত্রসহ মশার জীবন ইতিহাস বর্ণনা কর। ২+৮+৬=১৬
[উঃ। 19·3 (A) -2 দেখ]
১০। নিম্নোক্ত প্রাণিগুলির সহিত মানুষের সম্পর্ক কি? ৫+৫+৬=১৬
(ক) মাছি, (খ) মাছ, (গ) মৌমাছি।
[উঃ। (ক) 19.3 (A) -4 ; (খ) 8.14 (A) এবং (গ) 19·3(4) দেখ]

1985

ক—বিভাগ

(১নং প্রশ্ন ও অন্য যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

১। বাষ্পমোচন কি? উদ্ভিদ জীবনে বাষ্পমোচনের প্রয়োজনীয়তা কি? কোন্ কোন্ অঙ্গ দ্বারা উদ্ভিদদেহে বাষ্পমোচন সম্পন্ন হয়? উদ্ভিদে বাষ্পমোচন পদ্ধতি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর এবং পরীক্ষার ব্যবস্থাপনার চিত্র অঙ্কন কর।

[উঃ। 12·23, 12·25 ও 12·26 দেখ]

২। কাণ্ডের সাধারণ কার্যগুলি উল্লেখ কর। দুইটি পরিবর্তিত কাণ্ডের চিত্রসহ বিবরণ দাও ও উহাদের বিশেষ কার্যাবলী বর্ণনা কর।

[উঃ। 11·12 (A) ; 11·10 দেখ]

৩। বীজের ও ফলের বিস্তার বলতে কি বোঝ? উদ্ভিদ জগতে উহার প্রয়োজনীয়তা কি? জল ও প্রাণী দ্বারা বীজ ও ফলের বিস্তার উদাহরসণহ ব্যাখ্যা কর।

[উঃ। 15·11 দেখ]

৪। মস্ কোন্ গ্রুপের অন্তর্গত? চিত্রসহ মসের জীবনেতিহাস বর্ণনা কর।

[উঃ। 8·4 দেখ]

৫। টীকা লিখ ঃ—

(ক) স্পাইরোগাইরার কোষের গঠন, (খ) সস্য, (গ) যৌগিক পত্র, (ঘ) সরিষা গাছ।

[উঃ। (ক) 8.11 (iii) ; (খ) 13.25 ও 15.4 (iii) ; (গ) 12.10 ; (ঘ) 8.1 দেখ]

খ—বিভাগ

(৬নং প্রশ্ন ও অন্য যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

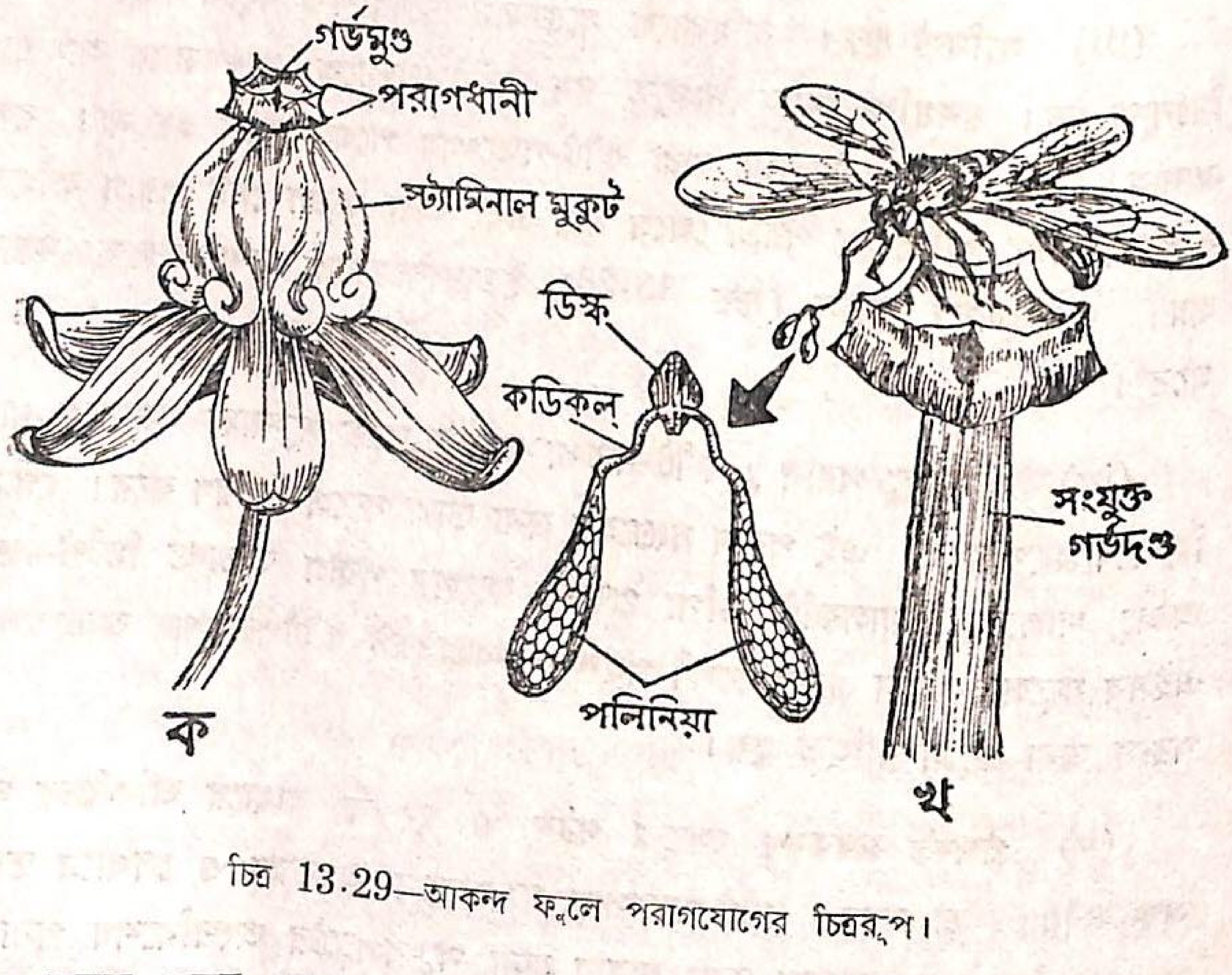
৬। রূপান্তর কি? চিত্রসহ কুনোব্যাঙের জীবন ইতিহাস অবলম্বনে রূপান্তর বর্ণনা কর।

[উঃ। পৃঃ 589, চিত্র 17·20 ও পৃঃ 586 দেখ]

(vi) **আঠালো ও অমসৃণ গর্ভমুণ্ড ঃ** গর্ভমুণ্ড পরিণত হলে একপ্রকার আঠালো রস নির্গত হয়। পতঙ্গের গা থেকে পরাগ সহজেই অমসৃণ গর্ভমুণ্ড বা গর্ভমুণ্ডের এই রসে ধরা পড়ে।

(vii) **আঠালো, কণ্টকত্বক ও অমসৃণ পরাগ ঃ** পরাগের বহিস্ত্বক কণ্টকময়, এমনকি আঠালো হয়ে থাকে। তাই সহজেই পতঙ্গের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরাগ লেগে থাকতে পারে।

● **আকন্দের পরাগযোগ** (Pollination mechanism in *Calotropis*) ঃ আকন্দ ফুলে পরাগধানী ও গর্ভমুণ্ড একত্রিত হয়ে **গাইনোস্টেজিয়ম** (Gynostegium) গঠন করে। পরাগধানীর পরাগ সংযুক্ত হয়ে **পলিনিয়া** (Pollinia) গঠিত হয় (চিত্র 13.29)। দুটি পলিনিয়া কডিকল নামে সূত্রের সাহায্যে একটি চটচটে ডিস্কের সঙ্গে যুক্ত থাকে। মৌমাছি



চিত্র 13.29—আকন্দ ফুলে পরাগযোগের চিত্ররূপ।

ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াবার সময় মৌমাছির উপাঙ্গে ডিস্কটি আটকে যায় এবং মৌমাছি উড়ে যাবার সময় এটিকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। অন্য ফুলে বসার সময় পলিনিয়া গর্ভমুণ্ডের সংস্পর্শে আসে।

● **প্রাণীপরাগী** বা **জুওফিলাস ফুল** (Zoophilous flower) : **শিমুল,** ছাতিম প্রভৃতি ফুলের পরাগ বাদুড়, কাঠবিড়ালী প্রভৃতির দ্বারা বাহিত **হয়।** সেজন্য ফুলগুলিকে **প্রাণীপরাগী ফুল** বলা হয়।

13.23. পরাগযোগের সুবিধা ও অসুবিধা *[Advantages and disadvantages of Pollination] :*

● **স্বপরাগযোগের সুবিধা :**

(1) অন্য কোন গাছ ও তার ফুলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।

(2) পরাগযোগ না ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম।

(3) পতঙ্গ আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় কলাকৌশল অবলম্বন করতে হয় না।

(4) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি যথাযথভাবে অপত্য বংশে পরিবাহিত হয়।

● **স্বপরাগযোগের অসুবিধা :**

(1) জিনোটাইপঘটিত নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আসার আদৌ সম্ভাবনা নেই।

(2) স্বপরাগযোগের ফলে ক্রমাগত একই বৈশিষ্ট্য অপত্য বংশে আসার ফলে বংশক্রমের অবনতি ঘটে।

(3) উত্তর পুরুষ—অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্ম ক্রমশঃ দুর্বল এবং রোগ প্রতিরোধে অক্ষম হওয়ায় মৃত্যুর হার বেশী হয়।

● **ইতর পরাগযোগের সুবিধা :**

(1) জিনোটাইপঘটিত নতুন নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাবের সম্ভাবনা প্রবল।

(2) ক্রমাগত বিভিন্ন গুণের মিশ্রণের ফলে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উন্নতি হয়।

(3) উত্তরপুরুষ সরল, রোগ-প্রতিরোধক্ষম হওয়ায় বাঁচার হার বৃদ্ধি পায়।

● **ইতর পরাগযোগের অসুবিধা :**

(1) পরাগধানী থেকে পরাগ গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হবার সময় পরাগের যথেষ্ট অপচয় ঘটে।

৭। চিত্রসহ মাছের বহিরাকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা দাও। কিভাবে ইহারা শ্বাসকার্য করে? অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র কি? একটি মাছের নাম কর যাহার ইহা আছে।

[উঃ। 8.14 (A) দেখ]

৮। চিত্রসহ ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশগুলি বর্ণনা কর। ব্যাঙের রক্ত সংবহনে উহাদের ভূমিকা বর্ণনা কর।

[উঃ। পৃঃ 573 হৃৎপিণ্ডের গঠন অংশ এবং 17.5 দেখ]

৯। প্রাণীজগতের প্রধান পর্বগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। প্রতি পর্বের একটি ভারতীয় প্রাণীর নাম উল্লেখ কর।

[উঃ। 2.8 দেখ]

১০। টীকা লিখ :—

(ক) ব্যাঙের শিকার ধরার পদ্ধতি। (খ) কি পদ্ধতিতে মাছ জলে ভাসে? (গ) ব্যাঙের পদের বৈশিষ্ট্য। (ঘ) কেঁচোর অর্থনৈতিক উপকারিতা।

[উঃ। (ক) পৃঃ 565 ; (খ) পৃঃ 329 বায়ুথলি অংশ ; (গ) 8.17 ; (ঘ) পৃঃ 313 কেঁচোর উপযোগিতা অংশ দেখ]

1986

ক—বিভাগ

(১নং প্রশ্ন এবং অন্য যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর লিখ)

১। পাতার প্রধান তিনটি শারীরবৃত্তীয় কার্যের উল্লেখ কর। উদ্ভিদ জীবনে সালোকসংশ্লেষের প্রয়োজনীয়তা কি? একটি পরীক্ষার সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতি বুঝাইয়া দাও।

[উঃ। 12.22 ; 12.27 ও 12.28 দেখ] ৩+২+১৩

২। মূলের সাধারণ কার্যগুলি উল্লেখ কর। একটি স্থানিক মূলের বিভিন্ন অংশগুলি চিত্র সহযোগে বর্ণনা কর। দুইটি পরিবর্তিত মূলের চিত্রসহ বিবরণ দাও ও উহাদের কার্যাবলী বর্ণনা কর।

[উঃ। 10.4 ও 10.8 দেখ] ২+৪+৫+৫=১৬

৩। জীবের বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। জীব ও জড়ের প্রধান পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর।

[উঃ। 3.1 ও 3.2 দেখ] ৮+৮=১৬

৪। স্পাইরোগাইরা কোন্ গ্রুপের অন্তর্গত? চিত্রসহ স্পাইরোগাইরার জীবন-ইতিহাস বর্ণনা কর।

[উঃ। 8.11 দেখ] ১+৮+৭=১৬

৫। টীকা লিখ:—

(ক) প্রোথ্যালাস, (খ) গুঁড়িকন্দ, (গ) বীজপত্র, এবং (ঘ) পুংধানী। ৪×৪

[উঃ। (ক) 282—286 ; (খ) 11.10 (A)-3 ; (গ) 1984-এর 3নং প্রশ্নের উত্তর দেখ ; (ঘ) পৃঃ 288 দেখ]

খ—বিভাগ

(৬নং প্রশ্ন এবং অন্য যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর লিখ)

৬। প্রাণী-জগতের শ্রেণীবিন্যাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রতিটি শ্রেণীর দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর ও একটি উদাহরণ দাও। ৮+৫+৫

[উঃ। 2.8 দেখ]

৭। উভলিঙ্গ প্রাণী কাহাকে বলে? একটি এইরূপ প্রাণীর উদাহরণ দাও এবং চিত্রসহ উহার বহিরাকৃতি বর্ণনা কর। ২+১+৮+৫

[উঃ। যে প্রাণীর দেহে একই সঙ্গে পুং ও স্ত্রী জনন অঙ্গ থাকে তাকে উভলিঙ্গ প্রাণী বলে।

কেঁচো একটি উভলিঙ্গ প্রাণী।

শেষাংশের জন্য 8.13 (iv) দেখ]

৮। লার্ভা কাহাকে বলে? চিত্রসহযোগে মৌমাছির জীবন-ইতিহাস বর্ণনা কর। ২+৮+৬

[উঃ 19.3 (A)-4 দেখ]

৯। মাছ ও ব্যাঙাচির বহিরাকৃতির চিত্র অঙ্কন করিয়া পার্থক্য উল্লেখ কর।

[উঃ। 8.14 (A) ও পৃঃ 587 দেখ]

১০। টীকা লিখঃ— ৪×৪

(ক) মাগুর মাছ কিভাবে শ্বাসকার্য চালায়? (খ) টিকটিকির পায়ের বৈশিষ্ট্য কি? (গ) মশা কোন্ কোন্ রোগ জীবাণু বহন করে? (ঘ) গিনিপিগের দেহ রোমাবৃত কেন?

[উঃ। (ক) পৃঃ 331; (খ) পৃঃ 345; (গ) পৃঃ 625; (ঘ) গিনিপিগ স্তন্যপায়ী প্রাণী—সেজন্য এদের দেহ রোমাবৃত থাকে। গিনিপিগ উষ্ণশোণিত প্রাণী। বিভিন্ন পরিবেশে ও ঋতুতে দেহের তাপমাত্রার সমতা বজায় রাখার জন্য এদের দেহ রোমাবৃত হয়।]

1987

ক—বিভাগ

(১নং প্রশ্ন এবং অন্য যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর লিখ)

১। উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রধান পার্থক্যগুলি লিখ। উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরতা আলোচনা কর। ১০+৮=১৮

[উঃ। 3.3 ও 4.1 দেখ]

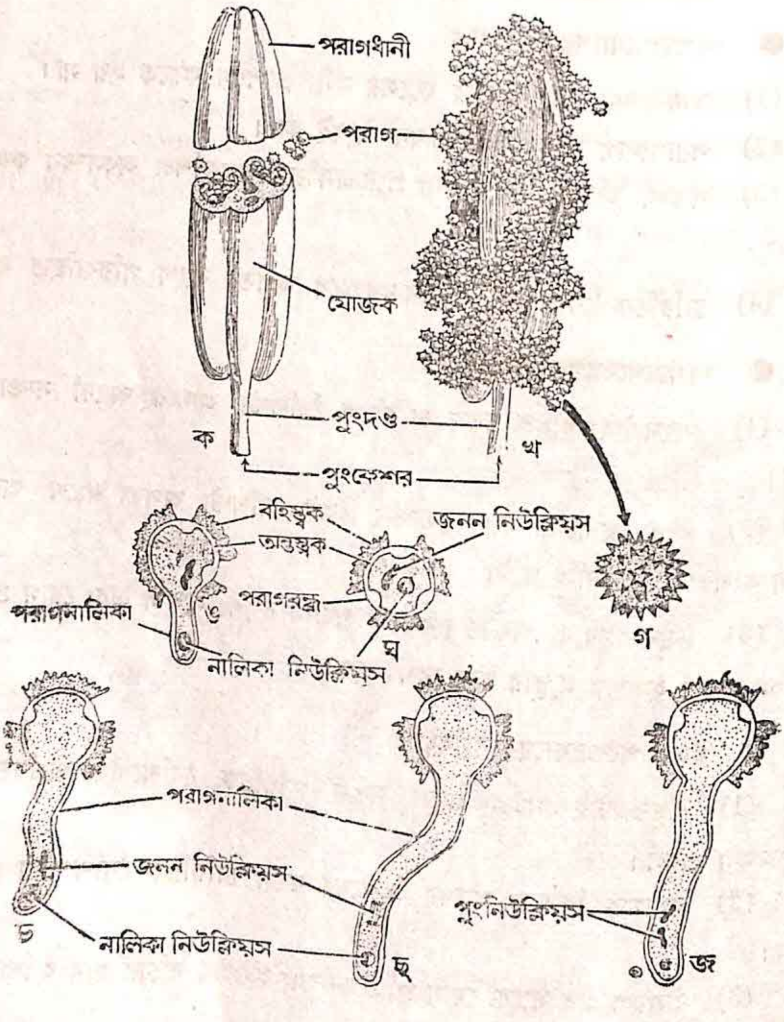
২। একটি অঙ্কুরিত বীজের কোন অংশ হইতে কাণ্ডের উৎপত্তি ঘটে? কাণ্ডের বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত চিত্র সহযোগে বর্ণনা কর ও প্রতিটি অংশের কার্য উল্লেখ কর। দুইটি মৃদ্‌গত পরিবর্তিত কাণ্ডের উদাহরণ ও চিত্র সহ বিবরণ দাও। ১+৭+(৪+৪)=১৬

[উঃ। 11.1 শেষাংশ; 11.3 ও 11.10 দেখ]

(2) ইতর পরাগযোগ নানারূপ বাহকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সেজন্য পরাগযোগের নিশ্চয়তা কমে।

13.24. নিষেক বা গর্ভাধান [*Fertilization*] :

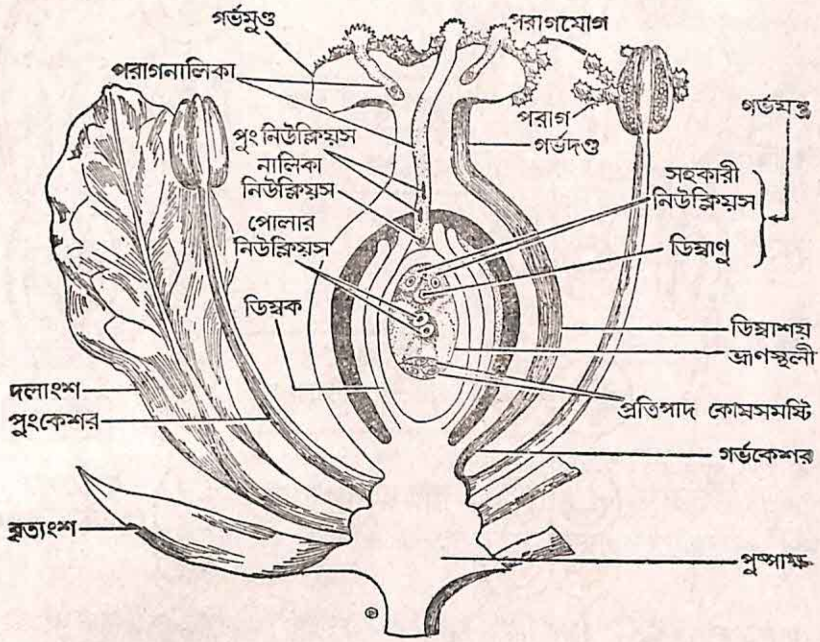
গর্ভমুণ্ডের সংস্পর্শে এসে পরাগ অংকুরিত হয় এবং পরাগনালিকা গঠন করে। পরাগনালিকা গর্ভদণ্ড ভেদ ক'রে প্রথমে ডিম্বাশয় ও পরে ডিম্বকে



চিত্র 13·30—নিষেকের আগে পরাগে পরিবর্তন।

পৌঁছায়। পরাগনালিকার আগায় থাকে একটি **নালিকা বা নালী নিউক্লিয়স** (Tube nucleus) এবং পিছনে থাকে লম্বা **জনন নিউক্লিয়স** (Generative

nucleus)। জনন নিউক্লিয়স থেকে দুটি **পুং-নিউক্লিয়স** বা **শুক্রাণু** (Sperm) উৎপন্ন হয়। এদিকে ডিম্বক-মধ্যস্থ ভ্রূণস্থলীর নিউক্লিয়স পর পর



চিত্র 13·31—নিষেকের আগে ভ্রূণস্থলীতে পরিবর্তন।

তিনবার মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়ে আটটি নিউক্লিয়স গঠন করে। এগুলি তিন প্রস্থে সজ্জিত হয়। উপরে ও নীচের দিকে তিনটি ক'রে এবং মধ্যে দুটি নিউক্লিয়স থাকে। 13·31 চিত্রে উপরের তিনটি নিউক্লিয়সের মধ্যে নীচেরটি **ডিম্বাণু** (Egg or Ovum)। **শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলনকে নিষেক বলে।** ডিম্বাণু-সংলগ্ন নিউক্লিয়স দুটিকে **সহকারী নিউক্লিয়স** বা **সাইনারজিডস** (Synergids) বলা হয়।

ভ্রূণস্থলীর মধ্যস্থলের নিউক্লিয়স দুটি হ'ল **পোলার নিউক্লিয়স** (Polar nucleus)। পোলার নিউক্লিয়স দুটি মিলিত হয়ে **সেকেন্ডারী** বা **নির্ণীত নিউক্লিয়স** (Secondary or definitive nucleus) গঠন করে।

৩। চিহ্নিত চিত্র সহযোগে একটি সম্পূর্ণ আদর্শ পুষ্পের বিবরণ দাও। পুষ্পের বিভিন্ন স্তবকের কার্য বর্ণনা কর।

[উঃ। 13.2 দেখ] ৮+৮=১৬

৪। মিউকর কোন্ গ্রুপের অন্তর্গত? চিত্রসহ মিউকরের জীবন-ইতিহাস বর্ণনা কর।

[উঃ। 8.10 দেখ] ১+৮+৭=১৬

৫। টীকা লিখঃ—

(ক) অ্যামাইটোসিস (amitosis) ; (খ) মূলত্র ; (গ) ধানগাছ ; (ঘ) প্রোথ্যালাস। ৪×৪=১৬

[উঃ। (ক) 6.3 ; (খ) 10.4(1) ; (গ) 8.2 ও 19.2(3) ; (ঘ) পৃঃ 282—রোমাবৃত হয়।]

খ—বিভাগ

(৬নং প্রশ্ন এবং অন্য যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর লিখ)

৬। চিহ্নিত চিত্র সহযোগে একটি আদর্শ প্রাণীকোষের বর্ণনা দাও এবং উহার যে কোন দুইটি অংশের কার্যের বিবরণ দাও। যোগকলা কাহাকে বলে? একটি তরল যোগকলার উদাহরণ দাও।

[উঃ। 5.16 ও চিত্র 5.35 ; 6.31 প্রথমাংশ এবং পৃঃ 215—রক্ত একটি তরল যোগকলা] ১০+৩+৩+১+১=১৮

৭। প্রাণীজগতের শ্রেণীবিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও এবং যে কোন ছয়টি পর্বের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

[উঃ। 2.8 দেখ] ১০+৬=১৬

৮। গিনিপিগ কোন্ শ্রেণীভুক্ত প্রাণী? ঐ শ্রেণীর যে কোন চারিটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। চিহ্নিত চিত্র সহযোগে গিনিপিগের হৃৎপিণ্ড বর্ণনা কর।

[উঃ। 8.21 দেখ] ২+৪+১০=১৬

৯। যে কোন দুইটি পতঙ্গের নাম উল্লেখ কর যাহার একটি মানুষের উপকারী ও অপরটি অপকারী। উহাদের যে কোন একটির জীবন-চক্র বিবৃত কর।

[উঃ। 19.3-3 ও 19.3-4 দেখ] ২+১৪=১৬

১০। টীকা লিখঃ— ৪×৪=১৬

(ক) কই মাছের শ্বসন পদ্ধতি। (খ) টিকটিকির পদের বৈশিষ্ট্য। (গ) কেঁচোর অর্থনৈতিক উপকারিতা। (ঘ) উভচর প্রাণী।

[উঃ। (ক) পৃঃ 330 অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র প্রদর্শন অংশ ; (খ) পৃঃ 345 ; (গ) পৃঃ 313 শেষাংশ ও 19.3 ; (ঘ) পৃঃ 68 দেখ]

1988

ক—বিভাগ

(১নং প্রশ্ন এবং অন্য যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর লিখ)

১। পাতার প্রধান তিনটি শারীরবৃত্তীয় কার্যের উল্লেখ কর। উদ্ভিদ জীবনে শ্বসনের প্রয়োজনীয়তা কি? একটি পরীক্ষার মাধ্যমে শ্বসন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৩+২+১৩=১৮

[উঃ। 12.22 ; 12.29 প্রথমাংশ এবং 12.33 দেখ]

২। কান্ডের সাধারণ কার্যাবলী উল্লেখ কর। বায়বীয় এবং মৃদগত পরিবর্তিত কান্ডসমূহের চিত্রসহ বিবরণ দাও ও উহাদের কার্যাবলী বর্ণনা কর। ৪+৬+৬=১৬

[উঃ। 11.12 ; 11.11 ও 11.10 দেখ]

৩। উদাহরণসহ উদ্ভিদ জগতে শ্রেণীবিন্যাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ১৬

[উঃ। 2.6 দেখ]

৪। চিত্রসহ ধান এবং সরিষা গাছের বহিরাকৃতির বিবরণ দাও। উহাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর। ১০+৬=১৬

[উঃ। 8.2 (v) ও 8.1 (v) এবং 8.2 (vi) ও 8.1 (vi) দেখ]

৫। টীকা লিখঃ

(ক) মূলরোম ; (খ) স্ফীতকন্দ ; (গ) অ্যামাইটোসিস (amitosis) ; (ঘ) মাইসেলিয়াম (mycelium)।

[উঃ। (ক) 10.4 (3) ; (খ) 11.10 (2) ; (গ) 6.3 ; (ঘ) 8.10 (iii) দেখ]

খ—বিভাগ

(৬নং প্রশ্ন ও অন্য যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর লিখ)

৬। চিহ্নিত চিত্র সহযোগে একটি আদর্শ প্রাণীকোষের বর্ণনা দাও এবং উদ্ভিদ কোষের সহিত উহার পার্থক্য লিখ। প্রাণিকলা কয় প্রকার ও কি কি? ১০+৪+৪=১৮

[উঃ। 5.12 ও চিত্র 5.35 ; 5.17 এবং 6.28 দেখ]

৭। চিত্রসহযোগে ব্যাঙের ধমনীতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ব্যাঙ এবং গিনিপিগের হৃৎপিন্ডের গঠনগত পার্থক্য কি? (৭+৭)+২=১৬

[উঃ। 17.6 ; ব্যাঙের হৃৎপিন্ডে দু'টি অলিন্দ ও একটি নিলয় এবং সেই সঙ্গে সাইনাস ভেনোসাস ও কোনাস আর্টারিওসাস বর্তমান। গিনিপিগের হৃৎপিন্ড স্তন্যপায়ীর হৃৎপিন্ডের অনুরূপ। সেখানে কেবল দু'টি অলিন্দ ও দু'টি নিলয় বর্তমান। সাইনাস ভেনোসাস ও কোনাস আর্টারিওসাস নামক দু'টি অতিরিক্ত অংগ গিনিপিগের হৃৎপিন্ডে নাই।]

৮। কেঁচো কোন্ পর্বভুক্ত প্রাণী? ঐ শ্রেণীর যে কোন দুইটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। চিহ্নিত চিত্র সহযোগে কেঁচোর বহিরাকৃতি বর্ণনা কর। কেঁচোকে চাষীর বন্ধু বলা হয় কেন? ২+২+১০+২=১৬

[উঃ। 2.8 অন্তর্গত পৃঃ 56-এ আর্নেলিডা পর্ব দেখ; 8.13 (iv) ও পৃঃ 313-র শেষাংশ দেখ]

৯। লার্ভা কাহাকে বলে? চিত্র সহযোগে মশার জীবন ইতিহাস বর্ণনা কর। ২+৮+৬=১৬

[উঃ। 19.3 (A)-3 দেখ]

১০। টীকা লিখঃ— ৪×৪=১৬

(ক) ফুলকা, (খ) সিটা, (গ) তরুণাস্থি, (ঘ) পুঞ্জাক্ষি।

[উঃ। (ক) পৃঃ 326 শেষাংশ; (খ) 8.13 (iv)-(9); (গ) 6.31 পৃঃ 213 (a); (ঘ) আরথ্রোপডা বা সন্ধিপদী পর্বভুক্ত মশা, মাছি, প্রজাপতি ইত্যাদি প্রাণীর দর্শনেন্দ্রিয় পুঞ্জাক্ষি। একাধিক সরল চক্ষু একত্রে ঘনসন্নিবিষ্ট হ'য়ে পুঞ্জাক্ষি গঠিত হয়। সেজন্য পুঞ্জাক্ষিতে একই সঙ্গে একাধিক প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।]

TRIPURA MADHYAMIK

BIOLOGY (Additional)

1984

Time—3 Hours

Full Marks—100

১নং **প্রশ্নের** অবশ্যই উত্তর করিতে হইবে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক বিভাগ হইতে কমপক্ষে **একটি** করিয়া আরও **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি প্রশ্নের পূর্ণমান দ্যোতক।

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ— ১×২০

(ক) লালাতে উপস্থিত জলঅঙ্গার পদার্থ বিভাজক উৎসেচকটির নাম লিখ।

[উঃ। লালাতে উপস্থিত জলঅঙ্গার পদার্থ বিভাজক উৎসেচকটির নাম টায়ালিন]

(খ) লিপ্তপদ কোন্ কোন্ প্রাণীর আছে?

[উঃ। ব্যাঙ, হাঁস ইত্যাদি প্রাণীর লিপ্তপদ আছে]

(গ) নেফ্রিডিয়া কি?

[উঃ। অমেরুদণ্ডী প্রাণী কেঁচো, হাইড্রা ইত্যাদির রেচনযন্ত্রকে নেফ্রিডিয়া বলে]

(ঘ) হরমোন কি?

[উঃ। বিশেষ বিশেষ কোষস্থ বা অনালগ্রন্থি নিঃসৃত যে রাসায়নিক পদার্থ বৃদ্ধি ও শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে হরমোন বলে]

(ঙ) পুষ্পের অপরিহার্য অঙ্গগুলি কি কি?

[উঃ। পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক পুষ্পের অপরিহার্য অংগ]

(চ) ক্লোরোপ্লাসটিডের রং সবুজ কেন?

[উঃ। ক্লোরোপ্লাসটিডে সবুজ রঞ্জক-ক্লোরোফিল থাকার জন্য ক্লোরোপ্লাসটিডের রং সবুজ]

(ছ) প্রবাল ও কাঁকড়া কোন্ পর্বভুক্ত?

[উঃ। প্রবাল নিডারিয়া এবং কাঁকড়া আর্থ্রোপডা পর্বভুক্ত প্রাণী]

(জ) প্রোটোনিমা কি?

[উঃ। মস জাতীয় উদ্ভিদের রেণু অঙ্কুরিত হ'য়ে শাখা-প্রশাখাযুক্ত যে সূত্রাকার অঙ্গ গঠন করে তাকে প্রোটোনিমা বলে]

(ঝ) টিকটিকির বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।

[উঃ। হেমিডেকটাইলস ফ্লুভিভিরিডিস টিকটিকির বৈজ্ঞানিক নাম]

(ঞ) যে ভিটামিনের অভাবে রিকেট রোগ হয় তাহার নাম কি?

[উঃ। ভিটামিন 'ডি'-এর অভাবে রিকেট রোগ হয়]

(ট) সরিষা গাছের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।

[উঃ। সরিষা গাছের বৈজ্ঞানিক নাম ব্রাসিকা নাইগ্রা]

(ঠ) উপপল্লব কি এবং ইহা কোথায় দেখা যায়?

[উঃ। মেরুদন্ডী প্রাণীর চক্ষুর উপরে আংশিক আচ্ছাদন রচনাকারী পাতলা ঝিল্লিকে উপপল্লব বলে]

(ড) ইন্ডুসিয়াম কি?

[উঃ। ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের সোরসে রেণুস্থলীর উপরে আচ্ছাদন রচনাকারী ঢালের মতো অঙ্গকে ইন্ডুসিয়ম বলে]

(ঢ) J. D. Hooker-এর সম্পূর্ণ নাম লিখ।

[উঃ। সম্পূর্ণ নাম যোশেফ ডালটন হুকার]

(ণ) গুচ্ছমূল কাহাকে বলে এবং ইহা কোথায় দেখা যায়?

[উঃ। ক্ষণস্থায়ী প্রধান মূল বিনষ্ট হবার পর ভ্রূণমূলের উৎপত্তিস্থল থেকে সরু সূতোর মতো যে মূলগুচ্ছ উৎপন্ন হয় তাকে গুচ্ছমূল বলে। পেঁয়াজ, ধান ইত্যাদিতে গুচ্ছমূল দেখা যায়]

(ত) ফলকাকার উপপত্র কাহাকে বলে? একটি উদাহরণ দাও।

[উঃ। পাতার আকৃতি বিশিষ্ট উপপত্রকে ফলকাকার উপপত্র বলে। যেমন—মটর গাছের উপপত্র]

(থ) সালোকসংশ্লেষের সাধারণ বিক্রিয়াটি লিখ।

[উঃ। $6CO_2+12H_2O \xrightarrow[\text{সূর্যালোক}]{\text{ক্লোরোফিল}} C_6H_{12}O_6+6H_2O+6O_2$]

(দ) একগুচ্ছ পুংকেশর কি এবং ইহা কোথায় দেখা যায়?

[উঃ। অজস্র পুংকেশরের পুংদন্ডগুলি একত্রিত হ'য়ে একটিমাত্র গুচ্ছ রচনা করলে তাকে একগুচ্ছ পুংকেশর বলে। জবা ফুলে একগুচ্ছ পুংকেশর দেখা যায়]

(ধ) RNA-এর সম্পূর্ণ নাম লিখ।
[উঃ। RNA-এর সম্পূর্ণ নাম রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড]
(ন) তালপাতার শিরাবিন্যাস কিরূপ?
[উঃ। তালপাতার শিরাবিন্যাস বহুশিরাল অভিসারী সমান্তরাল]

ক—বিভাগ

২। একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষের চিত্র অঙ্কন করিয়া অংশগুলি চিহ্নিত কর এবং বর্ণনা কর। নিউক্লীয়াস, মাইটোকণ্ড্রিয়া ও প্লাস্টিড-এর কার্য সম্পর্কে লিখ।
[উঃ। 5.15 দেখ] ১০+৬

৩। অংশচিহ্নিত চিত্রের সাহায্যে মাইটোসিস প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও। কোথায় এবং কখন মাইটোসিস সংঘটিত হয়?
[উঃ। 6.5 অথবা 6.6 দেখ] ১৪+২

৪। টীকা লিখঃ—
(ক) আদ্যপ্রাণীর বৈশিষ্ট্য; (খ) নাইট্রোজেন চক্র; (গ) সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ; (ঘ) স্ক্লেরেনকাইমা কোষ। ৪×৪
[উঃ। (ক) পৃঃ 45 শেষাংশ; (খ) পৃঃ 112; (গ) পৃঃ 20; (ঘ) পৃঃ 193 দেখ]

খ—বিভাগ

৫। অংশচিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করিয়া স্পাইরোগাইরার অঙ্গজ গঠন বর্ণনা কর। এই উদ্ভিদটির জীবনচক্র আলোচনা কর।
[উঃ। 8.11 দেখ] ৮+৮

৬। মাছের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি চিত্রসহ বর্ণনা কর। ইহা কোন্ শ্রেণীভুক্ত?
[উঃ। পৃঃ 67 শ্রেণী অস্টিকথিস দেখ] ১৪+২

৭। টীকা লিখঃ—
(ক) মসের স্ত্রীধানী; (খ) ধানগাছের ফুল; (গ) কেঁচোর হৃদযন্ত্র; (ঘ) গিনিপিগের শ্রেণীবিন্যাস এবং উহার জীবনধারণ প্রণালী। ৪×৪
[উঃ। (ক) পৃঃ 289 (b); (খ) পৃঃ 275 (B) অন্তর্গত (3) ফুল অংশ দেখ; (গ) পৃঃ 317; (ঘ) 8.21 (ii) ও পৃঃ 252 দেখ]

গ—বিভাগ

৮। ভুট্টাবীজের অংশচিহ্নিত চিত্রাঙ্কন কর। ছোলাবীজের অঙ্কুরোদ্গম পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
[উঃ। 15.4 ও 15.6 দেখ] ৬+১০

৯। ব্যাঙের হৃদযন্ত্রের চিত্র অঙ্কন করিয়া অংশ চিহ্নিত কর। ইহার মধ্য দিয়া রক্ত চলাচল পদ্ধতি বর্ণনা কর।
[উঃ। 17.4 হৃৎপিণ্ডের গঠন ও 17.5 দেখ] ৮+৮

১০। টীকা লিখঃ— ৪×৪

(ক) মেদপুঞ্জ ; (খ) ব্যাঙের বৃক্ক ; (গ) বাষ্পমোচন ; (ঘ) গ্রন্থিকাণ্ড।

[উঃ। (ক) 17·10 পৃঃ 583 ; (খ) 17.9 ; (গ) 12.23 ; (ঘ) 11.10 (A) (1) দেখ]

ঘ—বিভাগ

১১। (ক) কেঁচোকে প্রাকৃতিক কৃষক বলা হয় কেন? ৮

(খ) মানবজীবনে ধানগাছের গুরুত্ব কি? ৮

[উঃ। (ক) পৃঃ 313 'কৃষিকার্যে কেঁচোর উপযোগিতা' অংশ ; (খ) পৃঃ 619 দেখ]

১২। (ক) মশা কিভাবে রোগ ছড়ায়? ৮

(খ) পাটগাছের বিভিন্ন অংশ কিভাবে আমাদের কাজে লাগে? ৮

[উঃ। (ক) 19·3 (A) ও প্রথমাংশ এবং (খ) পৃঃ 618 দেখ]

1985

১নং প্রশ্নের অবশ্যই উত্তর করিতে হইবে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক বিভাগ হইতে **কমপক্ষে একটি** করিয়া আরও **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি প্রশ্নের পূর্ণমান দ্যোতক।

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ— ১×২০

(ক) সোপানাকার সমমিলন কি এবং ইহা কোথায় দেখা যায়?

[উঃ। বহিরাকৃতিতে অভিন্ন কিন্তু পুং ও স্ত্রী গুণসম্পন্ন সমান্তরালে বিন্যস্ত দুটি সূত্রাকার দেহের মধ্যে দুটি সন্নিহিত কোষের নলাকার উপবৃদ্ধির মিলনকে সোপানাকার মিলন বলে। ইহা স্পাইরোগাইরা নামক শেওলায় দেখা যায়]

(খ) একটি প্রাণীর নাম কর যে খোলস ত্যাগ করিয়া রেচনকার্য সমাধা করে।

[উঃ। সাপ খোলস ত্যাগ করিয়া রেচনকার্য সমাধা করে]

(গ) কোন কোন মাছ কেন অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র ব্যবহার করে?

[উঃ। কর্দমাক্ত পরিবেশে অপর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন পাওয়ার জন্য জিওল মাছ অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র ব্যবহার করে]

(ঘ) কোন্ মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে?

[উঃ। অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে]

(ঙ) সোরাস কি এবং ইহা কোথায় পাওয়া যায়?

[উঃ। সোরাস হল রেণুস্থলীগুচ্ছের সমাবেশ। ফার্ণে সোরাস পাওয়া যায়]

(চ) কোন্ হরমোনের অভাবে বহুমূত্র রোগ হয়?
[উঃ। ইনসুলিন নামক হরমোনের অভাবে বহুমূত্র রোগ হয়]

(ছ) টিকটিকি কিভাবে ছাদের সমতলে চলাফেরা করে?
[উঃ। টিকটিকির অঙ্গগুলির মাঝখানে অঙ্কদেশে নরম মাংসল গদি সদৃশ অবতল অংশ বর্তমান। এই গদির নিম্নাংশ থেকে বায়ু নির্গমন ও সেই সঙ্গে বাইরের বায়ুর চাপ প্রয়োগের ফলে টিকটিকি ছাদের সমতলে চলাফেরা করতে পারে]

(জ) প্রোস্টোমিয়াম কি এবং ইহা কোথায় দেখা যায়?
[উঃ। কেঁচোর মুখকে ঘিরে ঝুলন্ত মাংসপিণ্ডকে প্রোস্টোমিয়াম বলে]

(ঝ) প্রোথ্যালস কি এবং ইহা কোথায় পাওয়া যায়?
[উঃ। সমরেণুপ্রসূ টেরিডোফাইটাভুক্ত উদ্ভিদের রেণু অঙ্কুরিত হয়ে হরতনাকার যে স্ত্রীধানী ও পুংধানী ধারণকারী অঙ্গ গঠন করে তাকে প্রোথ্যালাস বলে। ইহা ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদে দেখা যায়]

(ঞ) পোম ও হেসপেরিডিয়মের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।
[উঃ। পোম ও হেসপেরিডিয়মের উদাহরণ যথাক্রমে আপেল ও লেবু]

(ট) মাছের পটকার ভূমিকা কি?
[উঃ। মাছের পটকা মাছকে জলের বিভিন্ন স্তরে ওঠানামা করতে সাহায্য করে]

(ঠ) বহুযোজী মূলত্রের একটি উদাহরণ দাও।
[উঃ। কেয়ার মূল বহুযোজী মূলত্রের উদাহরণ]

(ড) কোন্ প্রাণী নালীপদ দ্বারা চলাফেরা করে?
[উঃ। একাইনোডারমাটা পর্বভুক্ত প্রাণীরা নালীপদ দ্বারা চলাফেরা করে]

(ঢ) কোন্ প্রাণীর মাংসলপদ আছে?
[উঃ। মলাস্কা পর্বভুক্ত প্রাণীর মাংসলপদ আছে]

(ণ) কোন্ প্রাণীদের হিমোসিল আছে?
[উঃ। আথ্রোপডা ও মলাস্কা পর্বভুক্ত প্রাণীদের হিমোসিল থাকে]

(ত) দুইটি উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ সংগ্রহশালার নাম লিখ।
[উঃ। সেণ্ট্রাল ন্যাশানাল হারবেরিয়ম—শিবপুর ও কিউ হারবেরিয়ম—গ্রেটবৃটেন]

(থ) কোষ (cell) নামকরণটি কে করেন?
[উঃ। 'কোষ'—নামকরণ করেন রবার্ট হুক]

(দ) অনুকৃতি (মিরমিকোফিলি) কি?
[উঃ। প্রাণীর সহায়তায় উদ্ভিদের দেহরক্ষাজনিত বিশেষ প্রতিরোধী ব্যবস্থাকে অনুকৃতি বলে। লিচু গাছে পিপড়ার বাসা বাঁধা অনুকৃতির দৃষ্টান্ত]

(ধ) রক্ততঞ্চনে সহায়ক ভিটামিনটির নাম লিখ।
[উঃ। রক্ততঞ্চনে সহায়ক ভিটামিনের নাম ভিটামিন 'কে']

(ন) জরুরীকালীন হরমোন কাহাকে বলে?
[উঃ। ভয় বা বিপদের মুখে জীবকে সাহস যোগাতে সক্ষম অ্যাড্রিনালিন নামক হরমোনকে জরুরীকালীন হরমোন বলে।

ক—বিভাগ

২। সজীব ও নির্জীব বস্তুর বৈশিষ্ট্যগুলি লিখ। ১৬

[উঃ। 3·2 দেখ]

৩। উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের পদ্ধতিগুলি কি? এই পদ্ধতিগুলির প্রবক্তাদের নাম লিখ। বেন্থাম এবং হুকার-এর পদ্ধতি অনুসারে উদ্ভিদ জগতের শ্রেণীবিভাগ কর। ৩+৩+১০

[উঃ। 2·5 ও 2·6 দেখ]

৪। টীকা লিখঃ— ৪×৪

(ক) অ্যামাইটোসিস; (খ) সন্ধিপদ প্রাণী; (গ) প্রোটোপ্লাজমের চলন; (ঘ) ভাজক কলা।

[উঃ। (ক) 6·3; (খ) পৃঃ 58; (গ) 6·40; (ঘ) 6·15 দেখ]

খ—বিভাগ

৫। মিউকোরের গঠন ও জীবনচক্রের চিত্রাঙ্কন কর ও বর্ণনা কর। ইহার অঙ্গজগঠনের সহিত স্পাইরোগাইরার তফাৎ কি? ১২+৪

[উঃ। 8·10 ও 8·12 দেখ]

৬। চিত্রসহ কেঁচোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। ইহা কোন্ পর্বভুক্ত প্রাণী? ১৪+২

[উঃ। 6·13 দেখ]

৭। টীকা লিখঃ— ৪×৪

(ক) কৈ মাছের অতিরিক্ত শ্বাস অঙ্গ; (খ) ব্যাঙাচি; (গ) মসের ক্যাপসিউল; (ঘ) সরিষা গাছের ফুল।

[উঃ। (ক) পৃঃ 331 ও 328; (খ) পৃঃ 588—589; (গ) পৃঃ 290 শেষাংশ থেকে পৃঃ 291; (ঘ) পৃঃ 271 দেখ]

গ—বিভাগ

৮। একটি আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশের অংশচিহ্নিত চিত্রাঙ্কন কর ও বর্ণনা কর। কাণ্ডের সহিত ইহার পার্থক্য কি? ১২+৪

[উঃ। 10·4 ও 11·14 দেখ]

৯। কুনো ব্যাঙ কিভাবে শ্বসনকার্য করে বর্ণনা কর। ১৬

[উঃ। 17·3 দেখ]

১০। টীকা লিখঃ— ৪×৪

(ক) অভিস্রবণ; (খ) পত্রবিন্যাস; (গ) বিডার অঙ্গ; (ঘ) ব্যাঙের রক্ত।

[উঃ। (ক) 10·15; (খ) 12.15; (গ) 17.10; (ঘ) 17.4 দেখ]

ঘ—বিভাগ

১১। (ক) আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে তুলার ব্যবহারগুলি কি? ৮

(খ) মানবজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মাছির গুরুত্ব কি? ৮

[উঃ। (ক) পৃঃ 617 ও (খ) 19·3-2 দেখ]

১২। (ক) নারিকেল গাছের বিভিন্ন অংশ কেন আমাদের নিকট প্রয়োজনীয়? ৮

(খ) একটি সামাজিক ও উপকারী পতঙ্গের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৮

[উঃ। (ক) 19·2(4); (খ) 19·3-4 দেখ]

1986

১নং প্রশ্নের অবশ্যই উত্তর করিতে হইবে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক বিভাগ হইতে **কমপক্ষে একটি** করিয়া আরও **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি প্রশ্নের পূর্ণমান দ্যোতক।

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ— ১×২০

(ক) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নাসিকাখণ্ড কাহাকে বলে?
[উঃ। 6.39 (1) —2 দেখ]
(খ) হ্যাভারসিয়ান নালী কি?
[উঃ। পৃঃ 213 দেখ]
(গ) ফ্লেমকোষ পাওয়া যায় এরূপ একটি প্রাণীর নাম লিখ।
[উঃ। চ্যাপ্টাকৃমি প্ল্যানেরিয়ায় ফ্লেমকোষ পাওয়া যায়।]
(ঘ) উদ্ভিদের বৃহত্তম অঙ্গজ মুকুল কোন্‌টি?
[উঃ। বাঁধাকপি উদ্ভিদের বৃহত্তম অঙ্গজ মুকুল]
(ঙ) পত্রনস্রা কি? একটি উদাহরণ দাও।
[উঃ। 12.16 দেখ]
(চ) দ্বিস্তরবিশিষ্ট প্রাণী কি? উদাহরণ দাও।
[উঃ। পৃঃ 51 শেষাংশ—হাইড্রা দ্বিস্তরবিশিষ্ট প্রাণীর উদাহরণ]
(ছ) পতঙ্গভুক উদ্ভিদ কাহাকে বলে?
[উঃ। পৃঃ 38-এর শেষাংশ]
(জ) পর্ণবৃন্ত কি?
[উঃ। পৃঃ 437 দেখ]
(ঝ) কোন্ মাছি পীতজ্বরের জীবাণু বহন করে?
[উঃ। কোন মাছিই পীতজ্বরের জীবাণু বহন করে না। **পক্ষান্তরে এডিস** জাতীয় **মশা** পীতজ্বরের জীবাণু বহন করে]
(ঞ) তরুক্ষীর কি?
[উঃ। 6.25—1 দেখ]
(ট) অ্যারেনকাইমা কাহাকে বলে?
[উঃ। পৃঃ 191 দেখ]
(ঠ) ডেনড্রাইট কি?
[উঃ। 6.36 (ii) দেখ]
(ড) স্কুটেলাম কাহাকে বলে?
[উঃ। 15.4 (b) — (ii) দেখ]
(ঢ) শল্ককন্দ কি?
[উঃ। পৃঃ 412 দেখ]
(ণ) পুঞ্জাক্ষি আছে এমন দুইটি প্রাণীর নাম উল্লেখ কর।
[উঃ। মৌমাছি ও মাছির পুঞ্জাক্ষি আছে]
(ত) মৃৎবর্তী অঙ্কুরোদ্গম কাহাকে বলে?
[উঃ। 15.5 (1) দেখ]

(থ) দ্বিরাশিক নামকরণ কাহাকে বলে ?

[উঃ। 2·4 দেখ]

(দ) কলিওপটাইল ও কলিওরাইজা কি ?

[উঃ। 15·8 দেখ]

(ধ) সবাতশ্বসনকালে কি পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় ?

[উঃ। সবাতশ্বসনকালে 673 কিলোক্যালরি পরিমাণ তাপশক্তি নির্গত হয়]

(ন) ডি· এন· এ-র সম্পূর্ণ নাম লিখ।

[উঃ। ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড ডি. এন. এ.-র সম্পূর্ণ নাম]

ক—বিভাগ

২। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে দেখা একটি আদর্শ প্রাণীকোষের অংশ-চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর ও বর্ণনা কর। কোষপর্দা, সেন্ট্রোসোম ও গলগি বডির কার্য সম্পর্কে লিখ। ১০+৬

[উঃ। 5.16 ও চিত্র 5.35 ; কাজ—5.15 (1) শেষাংশ ; 5.21 শেষাংশ ; 5.20 শেষাংশ দেখ]

৩। অংশচিহ্নিত চিত্রসহ উদ্ভিদ কোষের মাইটোসিস্ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। কোন্ প্রকারের কোষে মাইটোসিস্ সংঘটিত হয় ? ইহার তাৎপর্য কি ? ১২+২+২

[উঃ। 6·5 ও 6·6 দেখ]

৪। টীকা লিখঃ— ৪×৪

(ক) তরুণাস্থি ; (খ) আঁইশআকার আবরণী কলা ; (গ) প্লাস্টিড ; (ঘ) সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ।

[উঃ। (ক) 6.31—(3) (a) ; (খ) 6.29 (A)—(1) ; (গ) 5.22 ; (ঘ) পৃঃ 20 দেখ]

খ—বিভাগ

৫। সরিষা উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম এবং ব্যবহার উল্লেখ কর। ১২+২+২

[উঃ। 8·1 দেখ]

৬। একটি আদর্শ মাছের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কি ? চিত্রসহ উহা বর্ণনা কর। ইহা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত ? ৬+৮+২

[উঃ। 8·14 (A) দেখ]

৭। টীকা লিখঃ— ৪×৪

(ক) টিকটিকির চলন ; (খ) কেঁচোর হৃদযন্ত্র ; (গ) ফার্ণের প্রোথ্যালাস ; (ঘ) মিউকোরের ভ্রূণরেণু (জাইগোস্পোর)।

[উঃ। (ক) পৃঃ 345 পায়ের বৈশিষ্ট্য অংশ ; (খ) পৃঃ 317 ; (গ) পৃঃ 282 শেষাংশ ; (ঘ) পৃঃ 301 দেখ]

গ—বিভাগ

৮। ব্যাঙের রেচন জননতন্ত্রের চিত্র অঙ্কন করিয়া বর্ণনা কর। ১৬

[উঃ। 17·9 ও 17·10 দেখ]

৯। একটি সমাঙ্গ পুষ্পের বিভিন্ন অংশের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর। প্রতিটি অংশের কার্য উল্লেখ কর। পুংকেশর চক্র ও গর্ভকেশর চক্রকে কেন ফুলের অত্যাবশ্যকীয় স্তবক বলা হয় ? ৮+৬+২

[উঃ। 13·2 দেখ]

১০। টীকা লিখঃ—

(ক) অগ্ন্যাশয় ; (খ) ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড ; (গ) ছোলা বীজের গঠন ; (ঘ) বাষ্পমোচন। ৪×৪

[উঃ। (ক) পৃঃ 567 ; (খ) পৃঃ 573 শেষাংশ ; (গ) 15·2 ; (ঘ) 12·23 দেখ]

ঘ—বিভাগ

১১। (ক) জমির উর্বরা শক্তির ক্ষেত্রে কেঁচোর ভূমিকা কি? ৮

(খ) একটি পাটগাছের বিভিন্ন অংশ কিভাবে আমাদের কাজে লাগে? ৮

[উঃ। (ক) পৃঃ 313 শেষাংশ ; (খ) 19·2 (2) দেখ]

১২। (ক) মশা কিভাবে রোগ ছড়ায়? ৮

(খ) মানবজীবনে ধানগাছের গুরুত্ব কি? ৮

[উঃ। (ক) 19·3 (A)-3 এবং (খ) 19·2 (3) দেখ]

1987

The figures in the margin indicate full marks.

১নং প্রশ্নের অবশ্যই উত্তর করিতে হইবে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক বিভাগ হইতে **কমপক্ষে একটি** করিয়া আরও **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ

(ক) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্য কি? ১×২০

[উঃ। 6·39—3 দেখ]

(খ) লালাতে উপস্থিত জলঅঙ্গার পদার্থ বিভাজক উৎসেচকটির নাম লিখ।

[উঃ। লালাতে উপস্থিত জলঅঙ্গার পদার্থ বিভাজক উৎসেচকটির নাম টায়ালিন]

(গ) জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম কি?

[উঃ। পৃঃ 539 দেখ]

(ঘ) মানব রক্তের উপাদানগুলি কি?

[উঃ। মানব রক্তের উপাদানগুলি হল লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেতরক্তকণিকা, অণুচক্রিকা ও প্লাজমা]

(ঙ) দ্বিনিষেক কাহাকে বলে?

[উঃ। 13·25 দেখ]

(চ) সহকৃতি (মিরমিকোফিলি) কি?

[উঃ। পৃঃ 106 দেখ]

(ছ) গুচ্ছিত ও যৌগিক ফলের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

[উঃ। গুচ্ছিত ফলের উদাহরণ আতা এবং যৌগিক ফলের উদাহরণ আনারস]

(জ) যে ভিটামিনের অভাবে রিকেট রোগ হয় তাহার নাম লিখ।

[উঃ। ভিটামিন D-এর অভাবে রিকেট রোগ হয়]

(ঝ) সোপানাকার সম্মিলন কি এবং ইহা কোথায় দেখা যায়?

[উঃ। 1985-এর ১।(ক) প্রশ্নের উত্তর দেখ]

(ঞ) জরুরীকালীন হর্মোন কাহাকে বলে?

[উঃ। 1985-এর ১।(ন) প্রশ্নের উত্তর দেখ]

(ট) বাঁশপাতার শিরাবিন্যাস কিরূপ?

[উঃ। বাঁশপাতার শিরাবিন্যাস সমান্তরাল বহুশিরাল অভিসারী]

(ঠ) কোন্ প্রাণীদের জলনালীতন্ত্র আছে?

[উঃ। কণ্টকত্বক বা একাইনোডারমাটা পর্বভুক্ত প্রাণীদের জলনালীতন্ত্র আছে]

(ড) প্রোটোনেমা কি?

[উঃ। পৃঃ 291 দেখ]

(ঢ) প্রবাল ও কাঁকড়া কোন্ পর্বভুক্ত?

[উঃ। প্রবাল নিডারিয়া এবং কাঁকড়া আর্থ্রোপডা পর্বভুক্ত প্রাণী]

(ণ) সমীকরণের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষের সাধারণ বিক্রিয়াটি লিখ।

[উঃ। পৃঃ 459 দেখ]

(ত) ফ্লোয়েমকলার কোষীয় উপাদানগুলি কি?

[উঃ। পৃঃ 198 দেখ]

(থ) বিডার্স অঙ্গ কাহাকে বলে?

[উঃ। পৃঃ 583 দেখ]

(দ) কোষপ্রাচীরের রাসায়নিক উপাদানগুলি কি?

[উঃ। পেকটিন, সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, লিগনিন প্রভৃতি কোষ-প্রাকারের রাসায়নিক উপাদান]

(ধ) এ. টি. পি.-র সম্পূর্ণ নাম লিখ।

[উঃ। অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট এ. টি. পি.-র সম্পূর্ণ নাম]

(ন) রবার্ট হুক কে ছিলেন?

[উঃ। ইংরাজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক কর্কের ছিপির সূক্ষ্মচ্ছেদ পরীক্ষা করার সময় মৌচাকের মতো যে সব কুঠরী দেখতে পান তিনি সেগুলির নাম দেন 'কোষ']

ক—বিভাগ

২। উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার সরল স্থায়ীকলার অংশচিহ্নিত চিত্রাংকনসহ বর্ণনা কর ও কার্য উল্লেখ কর। ১৬

[উঃ। 6·19 দেখ]

৩। মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য কি? অমেরুদণ্ডী প্রাণী কয় ভাগে বিভক্ত? প্রত্যেকটির একটি বৈশিষ্ট্য ও একটি উদাহরণ দাও। ৪+১২

[উঃ। 2·10 ও 2·9 দেখ]

৪। টীকা লিখঃ— ৪×৪

(ক) নার্ভকলা; (খ) নিউক্লীয়াস; (গ) জাইলেম; (ঘ) উদ্ভিদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্য।

[উঃ। (ক) 6·36; (খ) 5·26; (গ) পৃঃ 196; (ঘ) 2·13 দেখ]

খ—বিভাগ

৫। পরিচ্ছন্ন চিহ্নিত চিত্রাঙ্কনসহ কেঁচোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। ইহা কোন্ পর্বভুক্ত? ১৪+২

[উঃ। 8·13 (i) ও (iv) দেখ]

৬। ফার্ণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির চিত্র অংকন কর ও বর্ণনা দাও। রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহার জীবনচক্র বর্ণনা কর। ১০+৬

[উঃ। 8.3 (iii) ও চিত্র 8.15 দেখ]

৭। টীকা লিখঃ— ৪×৪

(ক) মাগুর মাছের অতিরিক্ত শ্বাস অঙ্গ ; (খ) ব্যাঙাচি ; (গ) স্পাইরোগাইরার ক্লোরোপ্লাস্ট ; (ঘ) মিউকোরের রেণুস্থলী।

[উঃ। (ক) পৃঃ 331 ; (খ) পৃঃ 587 শেষাংশ থেকে পৃঃ 589 ; (গ) 8.11 (iii) ; (ঘ) পৃঃ 299 শেষাংশ দেখ]

গ—বিভাগ

৮। ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্রের অংশচিহ্নিত চিত্রাঙ্কনসহ বর্ণনা কর। ১৬

[উঃ। 17.2 দেখ]

৯। একটি আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশের চিহ্নিত চিত্রাঙ্কন ও বর্ণনা কর। মূলের কার্যাবলীর উল্লেখ কর।

[উঃ। 10.4 দেখ] ১০+৬

১০। টীকা লিখঃ—

(ক) কুনো ব্যাঙের খাদ্য ধরার পদ্ধতি ; (খ) মেদপুঞ্জ ; (গ) শ্বসন ; (ঘ) উপপত্র। ৪×৪

[উঃ। (ক) পৃঃ 565 ; (খ) পৃঃ 583 ; (গ) 12.29 ; (ঘ) 12.4 দেখ]

ঘ—বিভাগ

১১। (ক) একটি নারিকেল গাছের বিভিন্ন অংশ কিভাবে আমাদের কাজে লাগে? ৮

(খ) মানবজীবনে মাছির গুরুত্ব কি? ৮

[উঃ। (ক) 19.2 (4) ও (খ) 19.3—2 দেখ]

১২। (ক) আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে তুলার ব্যবহারগুলি কি? ৮

(খ) একটি সামাজিক ও উপকারী পতঙ্গের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৮

[উঃ। (ক) 19.2 (1) ; (খ) 19.3—4 দেখ]

1988

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ— ১×২০

(ক) পুঞ্জাক্ষি আছে এমন দুইটি প্রাণীর নাম উল্লেখ কর।

[উঃ। মাছি ও মশার পুঞ্জাক্ষি আছে]

(খ) জাইলেমকলার কোষীয় উপাদানগুলি কি?

[উঃ। ট্রাকিড, ট্রাকিয়া, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও জাইলেম ফাইবার জাইলেম কলার কোষীয় উপাদান]

(গ) উদ্ভিদের বৃহত্তম অঙ্গজ মুকুল কোন্‌টি?

[উঃ। বাঁধাকপি উদ্ভিদের বৃহত্তম অঙ্গজ মুকুল]

(ঘ) দ্বিস্তরবিশিষ্ট প্রাণী কাহাকে বলে? উদাহরণ দাও।

[উঃ। পৃঃ 51 শেষাংশ দেখ]

(ঙ) পুষ্পের সাহায্যকারী অঙ্গ কোন্‌গুলি?

[উঃ। বৃতি ও দলমণ্ডল পুষ্পের সাহায্যকারী অঙ্গ]

(চ) পতঙ্গভুক উদ্ভিদের একটি উদাহরণ দাও।
[উঃ। ঘটপত্রী পতঙ্গভুক উদ্ভিদের উদাহরণ]
(ছ) ইউগ্লিনা কোন্ পর্বভুক্ত?
[উঃ। ইউগ্লিনা প্রোটোজোয়া পর্বভুক্ত প্রাণী]
(জ) র‍্যামেণ্টা কাহাকে বলে?
[উঃ। পৃঃ 280 দেখ]
(ঝ) পুষ্পপত্র বিন্যাস কি?
[উঃ। 13.7 দেখ]
(ঞ) ব্যাঙ এবং কেঁচো-র বৈজ্ঞানিক নাম উল্লেখ কর।
[উঃ। যথাক্রমে বিউফো মেলানোস্টিকটস ও ফেরিটিমা পোস্থুমা]
(ট) রক্ততঞ্চনে সহায়ক ভিটামিনটির নাম লিখ।
[উঃ। রক্ততঞ্চনে সহায়ক ভিটামিনটির নাম 'K']
(ঠ) কোন্ মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে?
[উঃ। অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে]
(ড) কারোলাস লিনিয়াস কে?
[উঃ। পৃঃ 12 শেষাংশ দেখ]
(ঢ) লিপ্তপদ আছে এমন দুইটি প্রাণীর নাম লিখ।
[উঃ। ব্যাঙের ও হাঁসের লিপ্তপদ আছে]
(ণ) ডি. এন. এ.-এর সম্পূর্ণ নাম লিখ।
[উঃ। ডি. এন. এ.-র সম্পূর্ণ নাম ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড]
(ত) খোলস ত্যাগ করিয়া রেচনকার্য সমাধা করে এমন দুইটি প্রাণীর নাম কর।
[উঃ। সাপ ও গিরগিটি খোলস ত্যাগ করে রেচনকার্য সমাধা করে]
(থ) দুইটি সচল উদ্ভিদের নাম লিখ।
[উঃ। ক্ল্যামাইডোমোনাস ও ভলভক্স]
(দ) কোন্ হরমোনের অভাবে বহুমূত্র রোগ হয়?
[উঃ। ইনসুলিনের অভাবে বহুমূত্র রোগ হয়]
(ধ) প্রোথ্যালাস কি?
[উঃ। 1985 ১। (ঝ)-এর উত্তর দেখ]
(ন) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নাসিকাখণ্ড কাহাকে বলে?
[উঃ। 1986 ১। (ক)-এর উত্তর দেখ]

ক—বিভাগ

২। মেরুদণ্ডী প্রাণী কাহাকে বলে? উহারা কয় শ্রেণীতে বিভক্ত? প্রত্যেক শ্রেণীর দুইটি বৈশিষ্ট্য ও একটি উদাহরণ দাও। ৩+১+১২

[উঃ। পৃঃ 65 দেখ]

৩। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষের অংশচিহ্নিত চিত্রাঙ্কন কর এবং বর্ণনা দাও। নিউক্লিয়াস, মাইটোকণ্ড্রিয়া ও প্লাষ্টিডের কার্য সম্পর্কে লিখ। ১০+৬

[উঃ। 5.19 এবং 5.26, 5.19 ও 5.12 দেখ]

৬। ফার্ণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির চিত্র অঙ্কন কর ও বর্ণনা দাও। রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহার জীবনচক্র বর্ণনা কর। ১০+৬

[উঃ। 8.3 (iii) ও চিত্র 8.15 দেখ]

৭। টীকা লিখঃ— ৪×৪

(ক) মাগুর মাছের অতিরিক্ত শ্বাস অঙ্গ ; (খ) ব্যাঙাচি ; (গ) স্পাইরোগাইরার ক্লোরোপ্লাস্ট ; (ঘ) মিউকোরের রেণুস্থলী।

[উঃ। (ক) পৃঃ 331 ; (খ) পৃঃ 587 শেষাংশ থেকে পৃঃ 589 ; (গ) 8.11 (iii) ; (ঘ) পৃঃ 299 শেষাংশ দেখ]

গ—বিভাগ

৮। ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্রের অংশচিহ্নিত চিত্রাঙ্কনসহ বর্ণনা কর। ১৬

[উঃ। 17.2 দেখ]

৯। একটি আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশের চিহ্নিত চিত্রাঙ্কন ও বর্ণনা কর। মূলের কার্যাবলীর উল্লেখ কর। ১০+৬

[উঃ। 10.4 দেখ]

১০। টীকা লিখঃ— ৪×৪

(ক) কুনো ব্যাঙের খাদ্য ধরার পদ্ধতি ; (খ) মেদপুঞ্জ ; (গ) শ্বসন ; (ঘ) উপপত্র।

[উঃ। (ক) পৃঃ 565 ; (খ) পৃঃ 583 ; (গ) 12.29 ; (ঘ) 12.4 দেখ]

ঘ—বিভাগ

১১। (ক) একটি নারিকেল গাছের বিভিন্ন অংশ কিভাবে আমাদের কাজে লাগে? ৮

(খ) মানবজীবনে মাছির গুরুত্ব কি? ৮

[উঃ। (ক) 19.2 (4) ও (খ) 19.3—2 দেখ]

১২। (ক) আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে তুলার ব্যবহারগুলি কি? ৮

(খ) একটি সামাজিক ও উপকারী পতঙ্গের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৮

[উঃ। (ক) 19.2 (1) ; (খ) 19.3—4 দেখ]

1988

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ— ১×২০

(ক) পুঞ্জাক্ষি আছে এমন দুইটি প্রাণীর নাম উল্লেখ কর।

[উঃ। মাছি ও মশার পুঞ্জাক্ষি আছে]

(খ) জাইলেমকলার কোষীয় উপাদানগুলি কি?

[উঃ। ট্রাকিড, ট্রাকিয়া, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও জাইলেম ফাইবার জাইলেম কলার কোষীয় উপাদান]

(গ) উদ্ভিদের বৃহত্তম অঙ্গজ মুকুল কোন্‌টি?

[উঃ। বাঁধাকপি উদ্ভিদের বৃহত্তম অঙ্গজ মুকুল]

(ঘ) দ্বিস্তরবিশিষ্ট প্রাণী কাহাকে বলে? উদাহরণ দাও।

[উঃ। পৃঃ 51 শেষাংশ দেখ]

(ঙ) পুষ্পের সাহায্যকারী অঙ্গ কোন্‌গুলি?

[উঃ। বৃতি ও দলমণ্ডল পুষ্পের সাহায্যকারী অঙ্গ]

(চ) পতঙ্গভুক উদ্ভিদের একটি উদাহরণ দাও।
[উঃ। ঘটপত্রী পতঙ্গভুক উদ্ভিদের উদাহরণ]
(ছ) ইউগ্লিনা কোন্ পর্বভুক্ত?
[উঃ। ইউগ্লিনা প্রোটোজোয়া পর্বভুক্ত প্রাণী]
(জ) র‍্যামেণ্টা কাহাকে বলে?
[উঃ। পৃঃ 280 দেখ]
(ঝ) পুষ্পপত্র বিন্যাস কি?
[উঃ। 13·7 দেখ]
(ঞ) ব্যাঙ এবং কেঁচো-র বৈজ্ঞানিক নাম উল্লেখ কর।
[উঃ। যথাক্রমে বিউফো মেলানোস্টিকটস ও ফেরিটিমা পোস্থুমা]
(ট) রক্ততঞ্চনে সহায়ক ভিটামিনটির নাম লিখ।
[উঃ। রক্ততঞ্চনে সহায়ক ভিটামিনটির নাম 'K']
(ঠ) কোন্ মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে?
[উঃ। অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে]
(ড) কারোলাস লিনিয়াস কে?
[উঃ। পৃঃ 12 শেষাংশ দেখ]
(ঢ) লিপ্তপদ আছে এমন দুইটি প্রাণীর নাম লিখ।
[উঃ। ব্যাঙের ও হাঁসের লিপ্তপদ আছে]
(ণ) ডি. এন. এ.-এর সম্পূর্ণ নাম লিখ।
[উঃ। ডি. এন. এ.-র সম্পূর্ণ নাম ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড]
(ত) খোলস ত্যাগ করিয়া রেচনকার্য সমাধা করে এমন দুইটি প্রাণীর নাম কর।
[উঃ। সাপ ও গিরগিটি খোলস ত্যাগ করে রেচনকার্য সমাধা করে]
(থ) দুইটি সচল উদ্ভিদের নাম লিখ।
[উঃ। ক্ল্যামাইডোমোনাস ও ভলভক্স]
(দ) কোন্ হরমোনের অভাবে বহুমূত্র রোগ হয়?
[উঃ। ইনসুলিনের অভাবে বহুমূত্র রোগ হয়]
(ধ) প্রোথ্যালাস কি?
[উঃ। 1985 ১। (ঝ)-এর উত্তর দেখ]
(ন) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নাসিকাখণ্ড কাহাকে বলে?
[উঃ। 1986 ১। (ক)-এর উত্তর দেখ]

ক—বিভাগ

২। মেরুদণ্ডী প্রাণী কাহাকে বলে? উহারা কয় শ্রেণীতে বিভক্ত? প্রত্যেক শ্রেণীর দুইটি বৈশিষ্ট্য ও একটি উদাহরণ দাও। ৩+১+১২

[উঃ। পৃঃ 65 দেখ]

৩। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষের অংশচিহ্নিত চিত্রাঙ্কন কর এবং বর্ণনা দাও। নিউক্লিয়াস, মাইটোকণ্ড্রিয়া ও প্লাস্টিডের কার্য সম্পর্কে লিখ। ১০+৬

[উঃ। 5·19 এবং 5·26, 5·19 ও 5.12 দেখ]

৪। টীকা লিখঃ—

(ক) ভাজককলা ; (খ) স্ক্লেরেনকাইমা ; (গ) আরথ্রোপোডা ; (ঘ) রক্ত। ৪×৪

[উঃ। (ক) 6.15 ; (খ) পৃঃ 193 ; (গ) পৃঃ 58 ; (ঘ) পৃঃ 572 দেখ]

খ—বিভাগ

৫। একটি আদর্শ মাছের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কি? চিত্রসহ উহা বর্ণনা কর। একটি মাছের নাম কর যাহার অতিরিক্ত শ্বাস-অঙ্গ বিদ্যমান। ১৫+১

[উঃ। 8.14 (A) ও মাগুর মাছ]

৬। রেখাচিত্রের সাহায্যে মিউকোরের জীবন-চক্র উপস্থাপন কর। ইহার অযৌন-জনন চিত্রসহ বর্ণনা কর। ইহা কি জাতীয় উদ্ভিদ? ৮+৭+১

[উঃ। চিত্র 8.26 ; 8.10 (B) ও 8.10 (i) দেখ]

৭। টীকা লিখঃ—

(ক) ধানগাছের ফুল ; (খ) ফার্ণের সোরাস ; (গ) কেঁচোর হৃদযন্ত্র ; (ঘ) গিনিপিগের মস্তক অঞ্চলের বহির্গঠনের বৈশিষ্ট্য। ৪×৪

[উঃ। (ক) পৃঃ 275 শেষাংশ ; (খ) পৃঃ 280 শেষাংশ ; (গ) পৃঃ 317 ; (ঘ) পৃঃ 350 দেখ]

গ—বিভাগ

৮। ব্যাঙের হৃদযন্ত্রের অংশচিহ্নিত চিত্রাঙ্কন কর। ইহার মধ্য দিয়া রক্তচলাচল পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৮+৮

[উঃ। পৃঃ 573 হৃৎপিণ্ডের গঠন অংশ ও 17.5 দেখ]

৯। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের নিষেকপদ্ধতি উপযুক্ত চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর। নিষেকের পর ডিম্বকের যে পরিবর্তনগুলি দেখা যায় উল্লেখ কর। ১০+৬

[উঃ। 13.24 ও 13.25 দেখ]

১০। টীকা লিখঃ—

(ক) সালোকসংশ্লেষ ; (খ) গ্রন্থিকাণ্ড ; (গ) বিডার অঙ্গ ; (ঘ) ব্যাঙের রক্ত। ৪×৪

[উঃ। (ক) 12.27 ; (খ) 11.10 (A) - (1) ; (গ) পৃঃ 583 ; (ঘ) পৃঃ 572 দেখ]

ঘ—বিভাগ

১১। (ক) কেঁচোকে প্রাকৃতিক কৃষক বলা হয় কেন? ৮

(খ) মানবজীবনে ধানগাছের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৮

[উঃ। (ক) পৃঃ 314 ; (খ) 19.2 (3) দেখ]

১২। (ক) মশা কিভাবে রোগ ছড়ায়? ৮

(খ) পাটগাছের বিভিন্ন অংশ কিভাবে আমাদের কাজে লাগে? ৮

[উঃ। (ক) 19.3 (3) দেখ ; (খ) 19.2 (2) দেখ]

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এর প্রশ্নপত্র

1989

BIOLOGY

(M.P.—Regular)

Time—Three Hours Full Marks—100

Special credit will be given for answers which are brief and to the point. Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting.

ক-বিভাগ

[১নং প্রশ্ন এবং অন্য যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর লিখ।]

১। সালোক-সংশ্লেষ কাহাকে বলে? উদ্ভিদ জীবনে সালোক-সংশ্লেষ এর প্রয়োজনীয়তা কি? উদ্ভিদ দেহের কোন অংশে ইহা সংঘটিত হয়? সালোক সংশ্লেষ এ আলো (light) এবং CO_2 এর প্রয়োজনীয়তা দুইটি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ কর। ২+২+২+৬+৬=১৮

[উঃ। 12·27 ও 12·28 (3) ও (2) দেখ।]

২। একটি বর্ধনশীল মূলের চিত্র অঙ্কন করিয়া বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত কর। মূলের সাধারণ কার্যের উল্লেখ কর। দুইটি বিভিন্ন প্রকার কার্য সম্পাদন করে এরূপ দুইটি অস্থানিক রূপান্তরিত মূলের বিবরণ দিয়া উহাদের বিশেষ কার্যের উল্লেখ কর। ৬+৪+৪+২=১৬

[উঃ। চিত্র 10·2 ; 10·9A ও 10·8 (B) দেখ।]

৩। চিহ্নিত চিত্রসহ একটি আদর্শ উদ্ভিদ কোষ এবং একটি আদর্শ প্রাণী-কোষ-এর পার্থক্যগুলি দেখাও। একটি আদর্শ উদ্ভিদ-কোষ-এর বিভিন্ন অংশের কার্য সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে আলোচনা কর। ১০+৬=১৬

[উঃ। 5·17 এবং চিত্র 5·36 ; 5·15 দেখ।]

৪। ফার্ন (Fern) এবং মস্ (Moss) কোন গ্রুপ বা শ্রেণীর অন্তর্গত? চিত্র সহযোগে এই দুই প্রকার উদ্ভিদের জীবন-চক্র-এর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ। ২+(৪+৩)+(৪+৩)=১৬

[উঃ। 8.3 ও 8.4 ; চিত্র 8.15 ও 8.21 সহ 8.3 এবং 8.4 দেখ।]

৫। নিম্নলিখিত উদ্ভিদসমূহের কোনগুলি একবীজপত্রী এবং কোনগুলি দ্বি-বীজপত্রী? ইহাদের মধ্যে একটি একবীজপত্রী এবং একটি দ্বি-বীজপত্রী-উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাহা জান লিখঃ—

(ক) কার্পাস, (খ) ধান, (গ) নারিকেল, (ঘ) পাট। ৪+৬+৬=১৬

[উঃ। (ক) কার্পাস—দ্বিবীজপত্রী ; (খ) ধান—একবীজপত্রী ; (গ) নারিকেল—একবীজপত্রী ; (ঘ) পাট—দ্বিবীজপত্রী এবং 19·2 দেখ।]

খ-বিভাগ

[৬নং প্রশ্ন এবং অন্য যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর লিখ।]

৬। অ্যাম্ফিবিয়া বা উভচর শ্রেণীভুক্ত একটি প্রাণীর নাম কর। অ্যাম্ফিবিয়া শ্রেণীর যে কোন তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। উল্লেখিত প্রাণীটির পৌষ্টিকতন্ত্রের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কণ এবং বর্ণনা কর। খাদ্য পরিপাকে নিম্নলিখিত অঙ্গগুলির কার্য উল্লেখ কর ঃ—

(ক) যকৃৎ (liver), (খ) পিত্তাশয় (gall bladder),
(গ) অগ্ন্যাশয় (pancreas)।

[উঃ। পৃঃ 68 ; 17.2 দেখ।] ১+৩+৮+৬=১৮

৭। মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি উল্লেখ কর। নিম্নলিখিত প্রাণীগুলি নিজ নিজ পর্বে (phylum) অন্তর্ভুক্ত করঃ ৮+৮=১৬

(ক) অ্যামিবা (খ) হাইড্রা
(গ) গোলকৃমি (ঘ) স্পঞ্জ (sponge)
(ঙ) মৌমাছি (চ) অক্টোপাস
(ছ) তারামাছ (জ) বাদুড়

[উঃ। 2.10 ; (ক) প্রোটোজোয়া ; (খ) নিডারিয়া ; (গ) অ্যাস্কেলমিনথিস ; (ঘ) পরিফেরা ; (ঙ) আথ্রোপডা ; (চ) মলাস্কা ; (ছ) একাইনোডারমাটা এবং (জ) মার্মেলিয়া।]

৮। একটি মাছের বহিরাকৃতির চিহ্নিত চিত্র অঙ্কণ কর। ইহার দৈহিক গঠনে পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা কর। অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র কাহাকে বলে? ইহার সার্থকতা উল্লেখ কর। অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে এমন দুইটি মাছের নাম লিখ।

৫+৬+১+২+২=১৬

[উঃ। চিত্র 8.40 ; 7.7(A) অন্তর্গত 1 ; পৃঃ 328-329 ; কৈ ও মাগুর।]

৯। কেঁচো, টিকটিকি এবং গিনিপিগের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। ইহারা কোন্ শ্রেণী (class) বা পর্বভুক্ত (phylum) ?

[উঃ। 8.13, 8.18, 8.21 দেখ।] ৯+৩+৪=১৬

১০। (ক) মানবজীবনে মাছির গুরুত্ব কি?

(খ) মানুষের উপকারী একটি পতঙ্গের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা কর।

(গ) মৌমাছিকে সামাজিক প্রাণী বলা হয় কেন? কর্মী মৌমাছি কি কাজ করে?

(ঘ) মশা ও মৌমাছির শূককীটের পার্থক্য উল্লেখ কর। মশক-বাহিত দুইটি রোগের নাম লিখ।

৪×৪=১৬

[উঃ। (ক) 19.3-2 ; (খ) ও (গ) 19.3-4 এবং 19.4 ; মশক-বাহিত দুইটি রোগের নাম—ম্যালেরিয়া ও গোদ।]

● পরিশিষ্ট ●

ক্রোমোজোম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা

[An idea about Chromosome]

নিউক্লিয়স সংগঠনের বিচারে জীবকোষ দু' প্রকার—**প্রোক্যারিওটিক** (Prokaryotic) ও **ইউক্যারিওটিক** (Eukaryotic)। আদি নিউক্লিয়সযুক্ত অসংগঠিত কোষকে **প্রোক্যারিওটিক কোষ** এবং আদর্শ নিউক্লিয়সযুক্ত সংগঠিত কোষকে **ইউক্যারিওটিক কোষ** বলা হয়।

ইউক্যারিওটিক কোষের নিউক্লিয়স-মধ্যস্থ ক্রোমাটিন জালক কোষবিভাজনের সময় জল পরিত্যাগ ক'রে ঘনীভূত হয় এবং জীবের প্রজাতি ভেদে নির্দিষ্ট সংখ্যক সূত্রাকার বস্তু গঠন করে। বিজ্ঞানী **ওয়ালডেয়ার** (Waldeyer) 1888 খ্রীষ্টাব্দে এই বস্তুগুলিকেই **ক্রোমোজোম** (Chromosome, গ্রীক—*Chroma* =রং+*Soma*=দেহ) আখ্যা দেন। 1933 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী **বোভেরী** (Bovery) প্রমাণ করেন যে, ক্রোমোজোমই বংশগতির ধারক ও বাহক।

● ক্রোমোজোমের সংজ্ঞা (Definition of chromosome) :

কোষের নিউক্লিয়স মধ্যস্থ ক্রোমোটিন জালক সৃষ্ট ও নিউক্লিক অ্যাসিড দ্বারা গঠিত সপ্রজননক্ষম এবং বংশগতির ধারক ও বাহক যে সূত্রাকার বস্তু প্রজাতির পরিব্যক্তি (Mutation), **প্রকারণ** (Variation) **ও বিবর্তনের** (Evolution) **সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাকে ক্রোমোজোম বলে।**

● ক্রোমোজোমের গুরুত্ব (Importance of chromosome) :

ক্রোমোজোমের মধ্যে জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকারী **'জিন'** (Gene) নামক অতি সূক্ষ্ম রাসায়নিক একক বর্তমান। জীবকোষের নিউক্লিয়সে অবস্থিত প্রতিটি ক্রোমোজোমে জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারক বহু জিন বর্তমান। প্রকৃতপক্ষে ক্রোমোজোমে অবস্থিত DNA অণুর যে অংশ বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী সেই অংশটিকেই জিন নামে চিহ্নিত করা হয়। জিনের মাধ্যমে পিতা-মাতার দেহ থেকে বংশপরম্পরায় সন্তান-সন্ততির দেহে বংশগতির ধারা সঞ্চালিত হয়। সেই কারণেই ক্রোমোজোম **'বংশধারার বাহক'** (Hereditary vehicle) নামে পরিচিত। ক্রোমোজোম দ্বারাই কোষের সব রকম জৈব-রাসায়নিক ও শারীর-বৃত্তীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। জননমাতৃকোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোম-খণ্ডের পরিবর্তন বা আদান-প্রদানের উপরেও কোষতত্ত্ববিদরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ এর ফলে জিনের পুনর্বিন্যাস (Gene recombination) ঘটে। জিনের পুনর্বিন্যাসের উপরে অভিব্যক্তির ধারা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

খ-বিভাগ

[৬নং প্রশ্ন এবং অন্য যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর লিখ।]

৬। অ্যাম্ফিবিয়া বা উভচর শ্রেণীভুক্ত একটি প্রাণীর নাম কর। অ্যাম্ফিবিয়া শ্রেণীর যে কোন তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। উল্লিখিত প্রাণীটির পৌষ্টিকতন্ত্রের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কণ এবং বর্ণনা কর। খাদ্য পরিপাকে নিম্নলিখিত অঙ্গগুলির কার্য উল্লেখ কর ঃ—

(ক) যকৃৎ (liver), (খ) পিত্তাশয় (gall bladder), (গ) অগ্ন্যাশয় (pancreas)।

[উঃ। পৃঃ 68 ; 17.2 দেখ।] ১+৩+৮+৬=১৮

৭। মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি উল্লেখ কর। নিম্নলিখিত প্রাণীগুলি নিজ নিজ পর্বে (phylum) অন্তর্ভুক্ত করঃ ৮+৮=১৬

(ক) অ্যামিবা (খ) হাইড্রা
(গ) গোলকৃমি (ঘ) স্পঞ্জ (sponge)
(ঙ) মৌমাছি (চ) অক্টোপাস
(ছ) তারামাছ (জ) বাদুড়

[উঃ। 2.10 ; (ক) প্রোটোজোয়া ; (খ) নিডারিয়া ; (গ) অ্যাস্কেলমিনথিস ; (ঘ) পরিফেরা ; (ঙ) আর্থ্রোপডা ; (চ) মলাস্কা ; (ছ) একাইনোডারমাটা এবং (জ) ম্যামেলিয়া।]

৮। একটি মাছের বহিরাকৃতির চিহ্নিত চিত্র অঙ্কণ কর। ইহার দৈহিক গঠনে পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা কর। অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র কাহাকে বলে? ইহার সার্থকতা উল্লেখ কর। অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে এমন দুইটি মাছের নাম লিখ।

৫+৬+১+২+২=১৬

[উঃ। চিত্র 8.40 ; 7.7 (A) অন্তর্গত 1 ; পৃঃ 328-329 ; কৈ ও মাগুর।]

৯। কেঁচো, টিকটিকি এবং গিনিপিগের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। ইহারা কোন্ শ্রেণী (class) বা পর্বভুক্ত (phylum)?

[উঃ। 8.13, 8.18, 8.21 দেখ।] ৯+৩+৪=১৬

১০। (ক) মানবজীবনে মাছির গুরুত্ব কি?

(খ) মানুষের উপকারী একটি পতঙ্গের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা কর।

(গ) মৌমাছিকে সামাজিক প্রাণী বলা হয় কেন? কর্মী মৌমাছি কি কাজ করে?

(ঘ) মশা ও মৌমাছির শূককীটের পার্থক্য উল্লেখ কর। মশক-বাহিত দুইটি রোগের নাম লিখ।

৪×৪=১৬

[উঃ। (ক) 19.3-2 ; (খ) ও (গ) 19.3-4 এবং 19.4 ; মশক-বাহিত দুইটি রোগের নাম—ম্যালেরিয়া ও গোদ।]

● পরিশিষ্ট ●

ক্রোমোজোম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা

[An idea about Chromosome]

নিউক্লিয়স সংগঠনের বিচারে জীবকোষ দু' প্রকার—**প্রোক্যারিওটিক** (Prokaryotic) ও **ইউক্যারিওটিক** (Eukaryotic)। আদি নিউক্লিয়সযুক্ত অসংগঠিত কোষকে **প্রোক্যারিওটিক কোষ** এবং আদর্শ নিউক্লিয়সযুক্ত সংগঠিত কোষকে **ইউক্যারিওটিক কোষ** বলা হয়।

ইউক্যারিওটিক কোষের নিউক্লিয়স-মধ্যস্থ ক্রোমাটিন জালক কোষবিভাজনের সময় জল পরিত্যাগ ক'রে ঘনীভূত হয় এবং জীবের প্রজাতি ভেদে নির্দিষ্ট সংখ্যক সূত্রাকার বস্তু গঠন করে। বিজ্ঞানী **ওয়ালডেয়ার** (Waldeyer) 1888 খ্রীষ্টাব্দে এই বস্তুগুলিকেই **ক্রোমোজোম** (Chromosome, গ্রীক—*Chroma* =রং+*Soma*=দেহ) আখ্যা দেন। 1933 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী **বোভেরী** (Bovery) প্রমাণ করেন যে, ক্রোমোজোমই বংশগতির ধারক ও বাহক।

● **ক্রোমোজোমের সংজ্ঞা** (Definition of chromosome) :

কোষের নিউক্লিয়স মধ্যস্থ ক্রোমোটিন জালক সৃষ্ট ও নিউক্লিক অ্যাসিড দ্বারা গঠিত সপ্রজননক্ষম এবং বংশগতির ধারক ও বাহক যে সূত্রাকার বস্তু প্রজাতির পরিব্যক্তি (Mutation), **প্রকারণ** (Variation) ও **বিবর্তনের** (Evolution) **সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাকে ক্রোমোজোম বলে।**

● **ক্রোমোজোমের গুরুত্ব** (Importance of chromosome) :

ক্রোমোজোমের মধ্যে জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকারী 'জিন' (Gene) নামক অতি সূক্ষ্ম রাসায়নিক একক বর্তমান। জীবকোষের নিউক্লিয়সে অবস্থিত প্রতিটি ক্রোমোজোমে জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারক বহু জিন বর্তমান। প্রকৃতপক্ষে ক্রোমোজোমে অবস্থিত DNA অণুর যে অংশ বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী সেই অংশটিকেই জিন নামে চিহ্নিত করা হয়। জিনের মাধ্যমে পিতা-মাতার দেহ থেকে বংশপরম্পরায় সন্তান-সন্ততির দেহে বংশগতির ধারা সঞ্চালিত হয়। সেই কারণেই ক্রোমোজোম **'বংশধারার বাহক'** (Hereditary vehicle) নামে পরিচিত। ক্রোমোজোম দ্বারাই কোষের সব রকম জৈব-রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। জননমাতৃকোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোম-খণ্ডের পরিবর্তন বা আদান-প্রদানের উপরেও কোষতত্ত্ববিদরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ এর ফলে জিনের পুনর্বিন্যাস (Gene recombination) ঘটে। জিনের পুনর্বিন্যাসের উপরে অভিব্যক্তির ধারা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

● **ক্রোমোজোমের সংখ্যা** (Chromosome number) :

উদ্ভিদ বা প্রাণীর **জাতিজনি** (Phylogeny) নিরূপণ বা তাদের শ্রেণীবিন্যাসগত অবস্থান (Taxonomic position) নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদ বা প্রাণীর বৈচিত্র্যের মূলে আছে ক্রোমোজোম সংখ্যার তারতম্য। প্রতি প্রজাতির ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রোমোজোমের সংখ্যা সর্বদাই নির্দিষ্ট থাকে। কারণ একটি উন্নত প্রজাতির সমস্ত দেহকোষে থাকে **ডিপ্লয়েড** (Diploid) বা '$2n$' সংখ্যক ক্রোমোজোম এবং সমস্ত গ্যামেটে থাকে **হ্যাপ্লয়েড** (Haploid) বা 'n' সংখ্যক ক্রোমোজোম। জননকালে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় দেহেই **ডিপ্লয়েড জনন মাতৃকোষ** (Reproductive mother cell) হ্রাসকরণ বা মায়োসিস প্রক্রিয়ায় ভেঙে হ্যাপ্লয়েড জননকোষ তৈরী হয়। দুটি হ্যাপ্লয়েড জননকোষ মিলিত হলেই ডিপ্লয়েড বা ক্রোমোজোমের পূর্ণসংখ্যা ফিরে আসে। 1926 খ্রীষ্টাব্দে **বেলার** (Belar) **অলাক্যান্থায়** (*Aulakantha*) সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ প্রায় 1600 ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম দেখতে পান। গোলকৃমির একটি প্রজাতিতে* সর্বনিম্ন 2টি ক্রোমোজোম বর্তমান। দুটি ঘনিষ্ঠ প্রজাতির মধ্যে বা একই প্রজাতির অন্তর্গত বিভিন্ন জীবের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ পর্যালোচনা করতেও ক্রোমোজোম সংখ্যার তারতম্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নীচে কয়েকটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহকোষের ডিপ্লয়েড (2n) ক্রোমোজোম সংখ্যা দেওয়া হল :—

উদ্ভিদ		প্রাণী	
ধান	24	মানুষ	46
গম	42	কুকুর	78
ভুট্টা	20	বিড়াল	38
মটর	14	গিনিপিগ	64
আলু	48	ইঁদুর	42
পেঁয়াজ	16	গরু	60
টমেটো	24	ঘোড়া	66
বাঁধাকপি	18	মশা	6
চা	30	মাছি	12
কফি	44	ব্যাঙ	22

● **ক্রোমোজোমের আয়তন** (Size of chromosome) :

প্রতি প্রজাতির জীবের ক্রোমোজোমের আয়তন মোটামুটি নির্দিষ্ট। মেটাফেজ দশায় বিভিন্ন জীবের ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য সাধারণত $0{\cdot}1\mu$ থেকে 32μ এবং ব্যাস $0°2\mu$ থেকে 2μ। সাধারণত উদ্ভিদকোষের ক্রোমোজোমগুলি প্রাণিকোষের

* অ্যাসকারিস মেগালোকেফালা (*Ascaris megalocephala*)

ক্রোমোজোমের তুলনায় আয়তনে বড়। গমগাছের ক্রোমোজোম সবচেয়ে বড়—দৈর্ঘ্যে 32μ এবং ব্যাসে 2μ।

● **ক্রোমোজোমের আকৃতি** (Shape of chromosome) ঃ

ক্রোমোজোমে এক বা একাধিক চাপা অংশ বর্তমান। ঐ অংশ **অরসিন, কারমাইন** নামক রঞ্জক প্রয়োগেও বর্ণহীন থাকে। ঐ বিশেষ অংশকে **সেন্ট্রোমিয়ার** (Centromere) বা **কাইনেটোকোর** (Kinetochore) বা **মধ্য খাঁজ** বা



সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ক্রোমোজোম।

প্রাথমিক কনস্ট্রিকেশান (Primary constriction) বলে। সেন্ট্রোমিয়ারের দুদিকের দুই অংশকে বলে **বাহু** (arm)। 1938 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী **মুলার** (Muller) বাহুর বিশেষ গুণসম্পন্ন প্রান্ত দুটিকে **টেলোমিয়ার** (Telomere, গ্রীক—*Telo*=দূরবর্তী) বলেন। টেলোমিয়ার অন্য টেলোমিয়ারের সঙ্গে জোড়া লাগে না। ক্রোমোজোম ভেঙে গেলে ভাঙা অংশ টেলোমিয়ারের সঙ্গে জুড়ে যায় না। তাছাড়া টেলোমিয়ার না থাকলে ক্রোমোজোমের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোম চার প্রকার, যথা—

(a) **মেটাসেণ্ট্রিক** (Metacentric)—যে ক্রোমোজোমের মাঝামাঝি স্থানে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে তাকে মেটাসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। অ্যানাফেজ দশায় এটি 'V' আকার ধারণ করে।

(b) **সাবমেটাসেণ্ট্রিক** (Submetacentric)—যে ক্রোমোজোমের ডান বা বাঁদিক ঘেঁষে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে তাকে সাবমেটাসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। অ্যানাফেজ দশায় এটি 'J' আকার ধারণ করে।

● **ক্রোমোজোমের সংখ্যা** (Chromosome number) :

উদ্ভিদ বা প্রাণীর **জাতিজনি** (Phylogeny) নিরূপণ বা তাদের শ্রেণীবিন্যাসগত অবস্থান (Taxonomic position) নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদ বা প্রাণীর বৈচিত্র্যের মূলে আছে ক্রোমোজোম সংখ্যার তারতম্য। প্রতি প্রজাতির ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রোমোজোমের সংখ্যা সর্বদাই নির্দিষ্ট থাকে। কারণ একটি উন্নত প্রজাতির সমস্ত দেহকোষে থাকে **ডিপ্লয়েড** (Diploid) বা '$2n$' সংখ্যক ক্রোমোজোম এবং সমস্ত গ্যামেটে থাকে **হ্যাপ্লয়েড** (Haploid) বা 'n' সংখ্যক ক্রোমোজোম। জননকালে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় দেহেই **ডিপ্লয়েড জনন মাতৃকোষ** (Reproductive mother cell) হ্রাসকরণ বা মায়োসিস প্রক্রিয়ায় ভেঙে হ্যাপ্লয়েড জননকোষ তৈরী হয়। দুটি হ্যাপ্লয়েড জননকোষ মিলিত হলেই ডিপ্লয়েড বা ক্রোমোজোমের পূর্ণসংখ্যা ফিরে আসে। 1926 খ্রীষ্টাব্দে **বেলার** (Belar) **অলাক্যান্থায়** (*Aulakantha*) সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ প্রায় 1600 ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম দেখতে পান। গোলকৃমির একটি প্রজাতিতে* সর্বনিম্ন 2টি ক্রোমোজোম বর্তমান। দুটি ঘনিষ্ঠ প্রজাতির মধ্যে বা একই প্রজাতির অন্তর্গত বিভিন্ন জীবের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ পর্যালোচনা করতেও ক্রোমোজোম সংখ্যার তারতম্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নীচে কয়েকটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহকোষের ডিপ্লয়েড (2n) ক্রোমোজোম সংখ্যা দেওয়া হল :—

উদ্ভিদ		প্রাণী	
ধান	24	মানুষ	46
গম	42	কুকুর	78
ভুট্টা	20	বিড়াল	38
মটর	14	গিনিপিগ	64
আলু	48	ইঁদুর	42
পেঁয়াজ	16	গরু	60
টমেটো	24	ঘোড়া	66
বাঁধাকপি	18	মশা	6
চা	30	মাছি	12
কফি	44	ব্যাঙ	22

● **ক্রোমোজোমের আয়তন** (Size of chromosome) :

প্রতি প্রজাতির জীবের ক্রোমোজোমের আয়তন মোটামুটি নির্দিষ্ট। মেটাফেজ দশায় বিভিন্ন জীবের ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য সাধারণত 0.1μ থেকে 32μ এবং ব্যাস $0{\cdot}2\mu$ থেকে 2μ। সাধারণত উদ্ভিদকোষের ক্রোমোজোমগুলি প্রাণিকোষের

* অ্যাসকারিস মেগালোকেফালা (*Ascaris megalocephala*)

ক্রোমোজোমের তুলনায় আয়তনে বড়। গমগাছের ক্রোমোজোম সবচেয়ে বড়—দৈর্ঘ্যে 32μ এবং ব্যাসে 2μ।

● **ক্রোমোজোমের আকৃতি** (Shape of chromosome) ঃ

ক্রোমোজোমে এক বা একাধিক চাপা অংশ বর্তমান। ঐ অংশ **অরসিন, কারমাইন** নামক রঞ্জক প্রয়োগেও বর্ণহীন থাকে। ঐ বিশেষ অংশকে **সেণ্ট্রোমিয়ার** (Centromere) বা **কাইনেটোকোর** (Kinetochore) বা **মুখ্য খাঁজ** বা



সেণ্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ক্রোমোজোম।

প্রাথমিক কনস্ট্রিকশান (Primary constriction) বলে। সেণ্ট্রোমিয়ারের দুদিকের দুই অংশকে বলে **বাহু** (arm)। 1938 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী **মুলার** (Muller) বাহুর বিশেষ গুণসম্পন্ন প্রান্ত দুটিকে **টেলোমিয়ার** (Telomere, গ্রীক—*Telo*=দূরবর্তী) বলেন। টেলোমিয়ার অন্য টেলোমিয়ারের সঙ্গে জোড়া লাগে না। ক্রোমোজোম ভেঙে গেলে ভাঙা অংশ টেলোমিয়ারের সঙ্গে জুড়ে যায় না। তাছাড়া টেলোমিয়ার না থাকলে ক্রোমোজোমের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

সেণ্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোম চার প্রকার, যথা—

(a) **মেটাসেণ্ট্রিক** (Metacentric)—যে ক্রোমোজোমের মাঝামাঝি স্থানে সেণ্ট্রোমিয়ার থাকে তাকে মেটাসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। অ্যানাফেজ দশায় এটি 'V' আকার ধারণ করে।

(b) **সাবমেটাসেণ্ট্রিক** (Submetacentric)—যে ক্রোমোজোমের ডান বা বাঁদিক ঘেঁষে সেণ্ট্রোমিয়ার থাকে তাকে সাবমেটাসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। অ্যানাফেজ দশায় এটি 'J' আকার ধারণ করে।

(c) **অ্যাক্রোসেণ্ট্রিক** (Acrocentric)—ক্রোমোজোমের যে কোন প্রান্তের কাছাকাছি সেণ্ট্রোমিয়ার থাকলে তাকে অ্যাক্রোসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। অ্যানাফেজ দশায় এটি 'I' আকার ধারণ করে।

(d) **টেলোসেণ্ট্রিক** (Telocentric)—ক্রোমোজোমের যে কোন প্রান্তের শীর্ষদেশে সেণ্ট্রোমিয়ার থাকলে তাকে টেলোসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। অ্যানোফেজ দশায় এটিও 'I' আকার ধারণ করে।

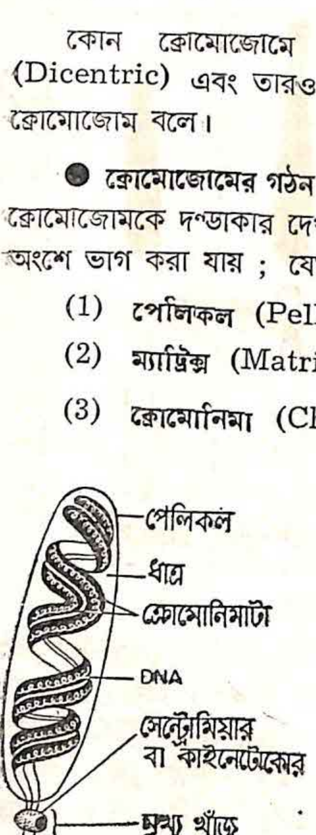
কোন ক্রোমোজোমে দুটি সেণ্ট্রোমিয়ার থাকলে তাকে **ডাইসেণ্ট্রিক** (Dicentric) এবং তারও বেশী থাকলে তাকে **পলিসেণ্ট্রিক** (Polycentric) ক্রোমোজোম বলে।

● **ক্রোমোজোমের গঠন** (Structure of chromosome) ঃ মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোমকে দণ্ডাকার দেখায়। তখন ক্রোমোজোমকে নিম্নলিখিত প্রধান তিনটি অংশে ভাগ করা যায় ; যেমন—

(1) **পেলিকল** (Pellicle),

(2) **ম্যাট্রিক্স** (Matrix) বা **ধাত্র** এবং

(3) **ক্রোমোনিমা** (Chromonema)।



একটি ক্রোমোজোমের গঠন।

(1) **পেলিকল** ঃ

ক্রোমোজোমের বাইরের আবরণকে পেলিকল বলে। কোন কোন বিজ্ঞানী পেলিকলের অস্তিত্ব না মানলেও এর উপস্থিতির বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে।

(2) **ম্যাট্রিক্স বা ধাত্র** ঃ

পেলিকল বা আবরণীর ভিতরে জেলির মতো পদার্থটি। ম্যাট্রিক্স। প্রোফেজ দশায় নিউক্লিওলস থেকে ম্যাট্রিক্স তৈরী হয় এবং টেলোফেজে ম্যাট্রিক্স থেকে নিউক্লিওলস পুনর্গঠিত হয় বলে অনেকের ধারণা।

(3) **ক্রোমাটিড** (Chromatid) ঃ

সংজ্ঞা ঃ মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য বরাবর যে দু'টি সম-আকৃতি ও সম প্রকৃতির কুণ্ডলীকৃত তন্তু দেখা যায় তাদের ক্রোমাটিড বলে।

ক্রোমাটিড দু'টি সেণ্ট্রোমিয়ারের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ক্রোমাটিডের অপর নাম **জিনোনিমা** (Genonema)।

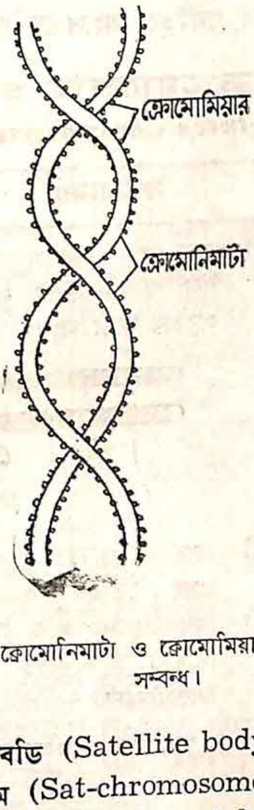
(4) **ক্রোমোনিমা** (Chromonema) ঃ

সংজ্ঞা ঃ ক্রোমাটিডের দৈর্ঘ্য বরাবর সর্পিলাকারে বিন্যস্ত পৃথক সূতোর মতো তন্তু দুটির প্রত্যেকটিকে ক্রোমোনিমা* বলে।

(5) **ক্রোমোমিয়ার** (Chromomere) ঃ

সংজ্ঞা ঃ ক্রোমোনিমায় লম্বালম্বি বিন্যস্ত অসংখ্য দানাময় পদার্থগুলিকে ক্রোমোমিয়ার (Chromomere) **বলে।**

মাইটোসিস অপেক্ষা মায়োসিসে ক্রোমোমিয়ার সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। অনেকের মতে ঐ স্থানগুলিতে **'জিন'** থাকে।



ক্রোমোনিমাটা ও ক্রোমোমিয়ারের সম্বন্ধ।

(6) **সেণ্ট্রোমিয়ার** (Centromere) ঃ

সংজ্ঞা ঃ বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থের দ্বারা স্টেন করলে ক্রোমোজোমের যে চাপা অংশে রং ধরে না—সেই সংকীর্ণ অংশকে **সেণ্ট্রোমিয়ার** (Centromere) বা **কাইনেটোকোর** (Kinetochore) বা **মুখ্য** খাঁজ বা প্রাইমারি **কনসট্রিকশান** (Primary constriction) বলে।

এছাড়া ক্রোমোজোমের দুই বাহুর একটিতে বা দুটিতেই সুস্পষ্ট চাপা অংশ থাকে। এগুলি **গৌণ খাঁজ** বা **সেকেণ্ডারী কনস্‌ট্রিকশান** (Secondary constriction)। সেকেণ্ডারী কনস্‌ট্রিকশান ছাড়াও বাহুর শেষ প্রান্তে ক্রোমোজোমের যে ক্ষুদ্র অংশটি থাকে তাকে **স্যাটালাইট বডি** (Satellite body) বলে। স্যাটালাইটযুক্ত ক্রোমোজোমকে **স্যাট-ক্রোমোজোম** (Sat-chromosome) বলা হয়। **ম্যাক্‌ক্লিনটক ও তাঁর সহযোগীরা** (MaClintock and his associates) মনে করেন স্যাটালাইটের গোড়ায় কোন এক স্থানই হল নিউক্লিওলস গঠনের কেন্দ্রস্থল।

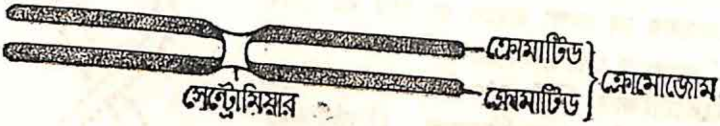
● **ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন** (Euchromatin and Heterochromatin) ক্রোমোজোম ক্রোমাটিন পদার্থ দ্বারা গঠিত। ক্রোমাটিন প্রধানত দু' প্রকার—অর্থাৎ ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন। ক্রোমোজোমের প্রধান অংশ গঠনকারী ক্রোমাটিনকে **ইউক্রোমাটিন** বলে। মেটাফেজ দশায় বিশেষ রঞ্জক (বেসিক ফুকসিন) ব্যবহার করলে **ইউক্রোমাটিন অংশ হাল্কা রং নেয়।** বংশগতির ব্যাপারে অধিকতর সক্রিয় ইউক্রোমাটিন অংশে অনেক বেশী DNA থাকে ; অর্থাৎ এখানে দৈর্ঘ্য অনুপাতে অধিকসংখ্যক জিন বর্তমান। পক্ষান্তরে ক্রোমোজোমের স্বল্প অংশ গঠনকারী ক্রোমাটিনকে **হেটারোক্রোমাটিন**

* বহুবচনে—ক্রোমোনিমাটা।

বলে। **এই অংশটি গাঢ় রং নেয়।** হেটারোক্রোমাটিন অংশে DNA-র পরিমাণ কম (অর্থাৎ এখানে দৈর্ঘ্য অনুপাতে জিনের সংখ্যা অল্প) এবং RNA-এর পরিমাণ বেশী থাকে। বংশগতির ব্যাপারে এই অংশ নিষ্ক্রিয় হলেও নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষে অত্যন্ত সক্রিয়। ক্রোমোজোমের আলগা অংশে ইউক্রোমাটিন এবং ঘনীভূত অংশে হেটারোক্রোমাটিন লক্ষ্য করা যায়।

ক্রোমোজোম ও ক্রোমাটিডের পার্থক্য *[Differences between Chromosome and Chromatid]* :

ক্রোমোজোম	ক্রোমাটিড
(1) ক্রোমোজোম নিউক্লিয়সের ক্রোমাটিন জালক থেকে সৃষ্ট সরু সুতোর মতো অংশ।	(1) ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য বরাবর বিভাজিত অর্ধাংশ ক্রোমাটিড।
(2) ক্রোমাটিড পরিণত হয়ে ক্রোমোজোম গঠিত হয়।	(2) ক্রোমোজোম পরিণত হয়ে ক্রোমাটিড গঠিত হয় না।
(3) ক্রোমোজোমের মধ্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট সংকুচিত স্থানটি সেন্ট্রোমিয়ার।	(3) সেন্ট্রোমিয়ারের উভয় পাশে ক্রোমাটিড যুক্ত থাকে।



ক্রোমোজোম ও ক্রোমাটিডের পার্থক্য।

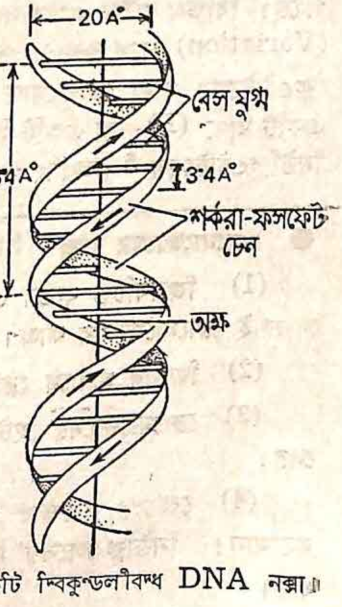
DNA ও RNA-র পার্থক্য (Differences between DNA and RNA)

DNA	RNA
(1) DNA নিউক্লিয়স মধ্যস্থ ক্রোমোজোমে পাওয়া যায়।	(1) RNA প্রধানতঃ সাইটোপ্লাজমে পাওয়া যায়, যদিও নিউক্লিয়সে সামান্য মাত্রায় থাকে।
(2) সাধারণত জিন বহন করে।	(2) সাধারণত জিন বহন করে না।
(3) DNA-র গঠন প্রধানতঃ দ্বিকুণ্ডলীবদ্ধ* (Double stranded)। কুণ্ডলী দুটির সর্পিল বিন্যাস বিপরীতমুখী।	(3) RNA-র গঠন এক কুণ্ডলীবদ্ধ। কখনও কখনও এটি আপন অক্ষে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে।

* ব্যতিক্রম—*E. coli* নামক ব্যাকটিরিয়ম ; যেখানে এক কুণ্ডলীবদ্ধ DNA দেখা যায়।

DNA	RNA
(4) DNA-র শর্করা অণুর প্রকৃতি ডিঅক্সিরাইবোজ।	(4) RNA-র শর্করা অণুর প্রকৃতি রাইবোজ।
(5) DNA বংশগতির বাহক।	(5) RNA* প্রধানতঃ প্রোটিন সংশ্লেষে অংশ নেয়।

● **ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন** (Chemical structure of Chromosome) ঃ প্রধানত দু' ধরনের রাসায়নিক বস্তু দিয়ে ক্রোমোজোম গঠিত, যথা—**প্রোটিন** (Protein) ও **নিউক্লিক অ্যাসিড** (Nucleic acid)। নিউক্লিক অ্যাসিড দু' প্রকার—DNA (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) এবং RNA (রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড)। ক্রোমোজোমে DNA-র মাত্রা বেশী (45%)—সেই অনুপাতে RNA-র মাত্রা কম† (1.2—1.4%)। জননের সঙ্গে DNA সংশ্লেষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। প্রাথমিক বিচারে ক্রোমোজোম-মধ্যস্থ DNA-ই হল এমন এক গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ যা বংশগতির নিয়মে মাতাপিতার দেহ থেকে গুণগত বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততির দেহে বহন করে। **জে. ডি. ওয়াটসন** (J. D. Watson) ও **এফ্. এইচ. সি. ক্রিক** (F. H. C. Crick) 1953 খ্রীষ্টাব্দে DNA-র একটি আদর্শ নক্সা তৈরী করেন। তাঁদের মতে DNA অণু একটি অক্ষকে ঘিরে পাকে পাকে জড়ানো দুটি অণুতন্তু দিয়ে গঠিত। অণুতন্তু দুটি পরস্পর ডানদিকে ঘোরানো সিঁড়ির মতো পেঁচানো থাকে। একটি সম্পূর্ণ পাকের দূরত্ব 34A°। পেঁচানো অবস্থায় দুটি অণুতন্তুকে **দ্বি-কুণ্ডল** বা **ডাবল্ হেলিক্স** (Double helix) বলে। ডাবল্ হেলিক্সের ব্যাসার্ধ 10A° অর্থাৎ এর মোট ব্যাস 20A°।



একটি দ্বিকুণ্ডলীবন্ধ DNA নক্সা।

প্রতিটি হেলিক্সের অণুতন্তু **ফসফেট যৌগ** (P) ও **শর্করা** (S) দিয়ে গঠিত। দুদিকের অণুতন্তুর মধ্যে আড়াআড়িভাবে যোগসূত্র রচনা করে

* উদ্ভিদ ভাইরাসে RNA বংশগতির বাহক।
† তবে সাইটোপ্লাজমে RNA-র মাত্রা বেশী।

নাইট্রোজেন বেস (Nitrogenous base) যুগ্ম। নাইট্রোজেন বেস দুপ্রকার—**পিউরিন** (Purine) ও **পাইরিমিডিন** (Pyrimidine)।

প্রতি সংযোগে একটি পিউরিন বেস [**অ্যাডিনিন** (Adenine) ; সংক্ষেপে *A* অথবা **গুয়ানিন** (Guanine) ; সংক্ষেপে G] ; একটি পাইরিমিডিন বেস [**থাইমিন** (Thymine) ; সংক্ষেপে *T* অথবা **সাইটোসিন** (Cytocine) ; সংক্ষেপে C]-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এদের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে **হাইড্রোজেন বন্ধন** (Hydrogen bond)। বেসের একটি সংযোগ (ঘোড়ানো সিঁড়ির এক একটি ধাপের সঙ্গে তুলনীয়) ও পরবর্তী অন্য একটি সংযোগের দূরত্ব 3.4A°।

প্রতিটি নিউক্লিক অ্যাসিড কতকগুলি **নিউক্লিওটাইড** (Nucleotide)-এর সমষ্টি মাত্র। এক একটি নিউক্লিওটাইড তৈরী হতে প্রয়োজন হয় এক অণু শর্করা (S), অ্যাডিনিন (A) অথবা থাইমিন (T) এবং সাইটোসিন (C) অথবা গুয়ানিন (G)। মনে রাখতে হবে A-এর সঙ্গে সর্বদা T-এর (A=T) এবং C-র সঙ্গে সর্বদা G-র (C=G) যোগাযোগ ঘটে। এইভাবে যোগাযোগ ঘটলেও T, A-র স্থান বা G, C-র স্থান দখল করতে পারে। **বিভিন্ন জীবে এদের সজ্জা পদ্ধতি বিভিন্ন। এই বিভিন্নতাই প্রকারণের** (Variation) **মূল কথা। প্রকারণ বিবর্তনের অগ্রদূত।** যাইহোক দুটি নিউক্লিওটাইডের মধ্যে যোগাযোগ ঘটায় ফসফেট যৌগ, তথা ফসফরিক অ্যাসিডের একটি অণু (P)—যা একটি নিউক্লিওটাইডের 3 (অর্থাৎ তৃতীয়) স্থানে ও অপর নিউক্লিওটাইডের 5 (অর্থাৎ পঞ্চম) স্থানের সঙ্গে যুক্ত।

● **ক্রোমোজোমের কাজ** (Functions of chromosome) ঃ

(1) জিনঘটিত বার্তা এক কোষ-জনু থেকে অন্য কোষ-জনুতে পেঁছে দেওয়াই ক্রোমোজোমের কাজ।

(2) জিনের মাধ্যমে ক্রোমোজোম জীবের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

(3) ক্রোমোজোমের হেটারোক্রোমাটিন অংশ নিউক্লীয় বস্তু উৎপাদনে অংশ নেয়।

(4) কোষের সংশ্লেষ ক্ষমতার সঙ্গে ক্রোমোজোমের অপ্রত্যক্ষ যোগাযোগ বর্তমান। নিউক্লিওলসের RNA, সাইটোপ্লাজমে জিনঘটিত বার্তা বয়ে নিয়ে যায়।

● **দৈত্যাকার বা অসাধারণ ক্রোমোজোম** (Giant or special chromosomes) ঃ

সাধারণ ক্রোমোজোম ছাড়াও কতকগুলি অদ্ভুত আকৃতির দৈত্যাকার ক্রোমোজোমের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে (1) **ল্যাম্প ব্রাশ ক্রোমোজোম**

(Lampbrush chromosome) ও (2) **পলিটিন ক্রোমোজোম** (Polytene chromosome) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(i) **ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম :** ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম **রাকার্ট** (Ruckert) কর্তৃক 1892 খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। এটি বিভিন্ন অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর **উসাইট** (Oocyte)-এ পাওয়া যায়। এর দৈর্ঘ্য 5,900μ পর্যন্ত হয়। আলো বা টেস্টটিউব পরিষ্কার করার ব্রাশের মতো দেখতে বলে ক্রোমোজোমটির ঐ ধরনের নামকরণ হয়েছে। ক্রোমোনিমার বৃদ্ধির জন্যেই এগুলি দৈত্যাকার লাভ করে বলে মনে হয়।

(ii) **পলিটিন ক্রোমোজোম :** 1881 খ্রীষ্টাব্দে **বলবিয়ানী** (Balbiani) প্রথম পলিটিন ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেন। ক্রোমোজোমে অনেক ক্রোমোনিমা থাকে বলে এর নাম হয়েছে পলিটিন ক্রোমোজোম (Polytene, *poly*=অনেক, *chromatin*=ক্রোমাটিন)। **ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাসটার** (*Drosophila melanogaster*) নামক ফলের মাছির পলিটিন ক্রোমোজোম দেহকোষের ক্রোমোজোম অপেক্ষা 1000 গুণ বড়। এই ক্রোমোজোমের পুরো দৈর্ঘ্যের মাপ 2000μ। নির্দিষ্ট রঞ্জক প্রয়োগ করলে ক্রোমোজোমটিতে দু'রকমের বন্ধনী ; অর্থাৎ **কাল বন্ধনী ও অন্তর্বন্ধনী** দেখা যায়। ক্রোমোজোমের যে-কোন বন্ধনীর অংশ ফুলে উঠলে তাকে **ক্রোমোজোম পাফ** (Chromosome puff) বলে।
